লোটাকম্বল

লোটাকম্বল



সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সপ্তর্ষি
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৭০

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

মুদ্রাকর ঃ
প্রদ্যুৎকুমার মান্না
বিশ্বকর্মা প্রেস
২/১/এ, আশুতোষ শীল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

যাত্রা-শুরু

এ আমার আত্মজীবনী নয় তবে আত্মজীবনীব মত করে লেখা অসংলগ্ন প্রলাপ। বস্তু আছে কিনা জানি না তবে বাস্তব কিছু থাকতে পারে। পৃথিবীতে অনেকেই অনেক কিছু করতে আসে। আমার স্কুলেব প্রধান শিক্ষক মশাই ক্লাসে এসে প্রায়ই বলতেন, ওরে এসেছিস যখন তখন দেয়ালে একটা আঁচড় রেখে যা। স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাবতাব বামকৃষ্ণ, বামমোহন, বিদ্যাসাগর, হুড়হুড় করে একগাদা নাম উচ্চারণ কবতে কবতে রবীন্দ্রনাথে এসে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। চোখ ছলছলে হয়ে উঠত। তারপর চটাক করে সেই চটকা ভেঙে শেষ বেনচের কোণের দিকে বসে থাকা শম্ভু সাঁতরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলতেন, অ্যায়, উঠে দাঁড়া। শম্ভু কলের পুতুলের মত উঠে দাঁডাত। ইংরিজী কর, রামেরা দুই ভাই। শম্ভু বার কতক রাম নাম করে চেত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত একপাশে কেতরে পড়ত। সেই বয়েসেই বুঝেছিলুম, ত্রেতায় রাম নামের যথেষ্ট পাওযার থাকলেও কলির শেষপাদে একেবারেই শক্তিহীন ; কারণ এব পরেই হেডমাস্টার মশাই শম্ভুর পিঠে লিকলিকে বেত দিয়ে সপাসপ আঁচড় কাটতে শুরু করেছেন। এবপব ওই রাম তার যোগ্য ভ্রাতাকে নিয়ে ইংরিজী হবার জন্যে ঘুরে ঘুরে আমাদের সকলের কাছেই আসছে আর আমরা যথাবীতি বেত্রাহত হয়ে আঁচড়কাটা মহাপুরুষ না হয়ে আঁচড় খাওয়া মানব সন্তান হয়ে নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছি। একটি প্রশ্ন এবং পর্যায়ক্রমে ক্লাসের বড়, ছোট, দামড়া ষাটজন মনুষ্যশাবককে পেটাতে পেটাতেই সময় কাবার হয়ে যেত। টেব্‌লের ওপর বেত ফেলে দিয়ে হেডমাস্টাবমশাই কোঁচার খোঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে দিনের শেষ কথাটি বলতেন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তুমি কেঁদেছিলে জগৎ হেসেছিল, তুমি যখন যাবে হাসতে হাসতে যাবে, আর সারা জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুটি বাতাসা বের কবে তিনি মুখে ফেলতে না ফেলতেই স্কুলের দারোয়ান এসে বেত, ডাস্টার আর মোটা ডিক্‌শনারিটা তুলে নিয়ে চলে যেত। কাঁধে চাদর ফেলে আমাদের প্রধান শিক্ষক উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে সাবধানে নেমে আসতেন, তারপর আপন মনে আঁচড় কেটে যা, আঁচড় কেটে যা বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চলে যেতেন। আমরা সদলে ডোরাকাটা জেব্রার মত বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতুম দাগ রেখে যাওয়া ব্যাপারটা কত সহজ ! কিছুই না, একটা বেত আব মনুষ্যরূপী গাধাদের কালো, সাদা পিঠ আর একটি প্রশ্ন। এই তিন মালকে মেলাতে পারলেই মহাপুরুষ। মার খেতে খেতে শম্ভু সত্যিই মহাপুরুষ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে তার পিঠের আর কোনো সাড় নেই। মারলেও লাগে না। কানমলার চোটে ডানকান বাঁ কানের চেয়ে দুসুতো লম্বা হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে সাচ্চা সাধুর মত সব সময় শালা বেরোচ্ছে।

পেটাই হতে হতে, পেটাই হতে হতে জলছাত তৈরি হয়। গোটা কুড়ি পাঠঠা মেয়েমানুষ জলের আরক ছিটোয়, পিচিক পিচিক করে খইনির থুতু ফেলে আর কাঠের মুগুর দিয়ে পেটাতে থাকে যদ্দিন না পেটাইয়ের কাঠ তড়াং তড়াং করে লাফিয়ে ওঠে। এইভাবে হিট প্রুফ, ওয়াটার প্রুফ ছাদ তৈরি হলেও অভিমানশূন্য মানুষ তৈরি হয় কি ? কেরিয়ারও কি তৈরি হয় ? হলে আমি সত্যিই মহামানব হয়ে যেতুম। ওটা আলাদা ব্যাপার। আমার সম্পর্কে একদিন একটি মন্তব্য শুনে বড় মুসড়ে পড়লুম। হাজারবার ধুলেও কয়লা সাদা হয় না। পেতল মাজলেও সোনা হয় না। মানুষ নিয়ে আসে। অদৃশ্য একটি পুঁটলি নিয়ে কুঁজো হয়ে অন্ধকার রাতে মাতৃজঠরে, মুক্তোর পেটে স্বাতী নক্ষত্রের জলের মত ঢুকে, ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তারপর একদিন অয়েল ক্লথে ওঁয়া ওঁয়া করে গড়িয়ে পড়ে। গর্ভে

মহাপুরুষ এলে মায়ের জ্যোতি বেড়ে যায়। শেষ রাতে পিতা স্বপ্ন দেখেন, আষ্টেপৃষ্ঠে বটের ঝুরি জড়ান ভগ্ন দেউল থেকে জ্যোতিষ্মান এক দেবশিশু বেরিয়ে এসে বলেন, আমি তোর কাছে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার ঘুম ভেঙে যায়। স্বেদ, কম্প, পুলক প্রভৃতি দেখা দেয়। তিনি মাকে ঠেলা মারতে মারতে বলতে থাকেন, ওগো, শুনছো, শুনছো, তিনি আসছেন, তিনি আসছেন। শেষের দিকে আনন্দে গলা ভেঙে আট রকম শব্দ বেরোতে থাকে। আগমন সংবাদ অকটেভে খেলে বেড়ায়। ঘুম চোখে মা হয়তো জিজ্ঞেস করেন, কে আসছে গো? পিতা মশারির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে ভাবাশ্রু বর্ষণ করতে করতে বলেন, যেসাস হতে পারেন, কৃষ্ণের অবতার হতে পারেন, স্বয়ং মহাদেব হতে পারেন। কে বলতে পারে, সময়ের ঘূর্ণনে দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হচ্ছে কি না! ক্ষুদিরাম ত এইভাবেই গদাধরকে পেয়েছিলেন। জগন্নাথ পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে। মায়ের খাতির অমনি বেড়ে যায়। মহাপুরুষের ডিম্ব ধারণ করেছেন। অলৌকিক জ্যোতি দেখা দিয়েছে লৌকিক শরীরে। যৌথ পরিবারের ছাদে ভাদ্রের চাঁদি ফাটা রোদে বসে বসে বড়ি কি কয়লার গুল আর দিতে হবে না। বাগানের পাঁচিলে থ্যাপাক থ্যাপাক করে ঘুঁটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য তলব করা হল। তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে ঘোষণা করলেন, এ বস্তুটির আবির্ভাব মুহূর্তে ছোট বউদির চেহারায় কোনো অলৌকিক পরিবর্তন আসেনি। স্বপ্ন একটা দেখেছিল মনে হয়, বাবা পঞ্চানন ষাঁড়ের পিঠে চেপে আসছেন। পঞ্চাননতলার পঞ্চানন? সে দেবালয় ভেঙে কালের গর্ভে চলে গেছে। তা ছাড়া বাবা পঞ্চাননের তেমন দেবমর্যাদা ছিল না। পূজারী বেচারা গাঁজায় দম মেরে মেরে অকালেই দমহারা হয়ে পরপারে। মনে পড়েছে, তিনি বছর বয়েসে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই পুঁয়ে পেয়ে ছেলে শুকোতে লাগল। সাত সমুদ্রের কডলিভার মালিশ করে করে, মালিশ করে করে, রোদে ফেলে রাখা হত ধুতি চাপা দিয়ে। কি বরাত! যে বয়েসে শিশু কোলে কোলে, বুকে বুকে ত্যাত্যা, ব্যাব্যা করে বেড়াবে, গোলগাল, মোটা মোটা হাতের কচি কচি আঙুল দিয়ে নাক খামচাবে, চশমা ধরে টানবে, সেই বয়েসেই অস্পৃশ্য, মৎসগন্ধ হয়ে দাওয়ায় পড়ে রইল। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কাছে এগোতে হত, এই যে আমার বাবুটা, এই যে আমার ব্যাবাটা। মুখে শিশুর স্বর্গীয় হাসি ছিল না। নাড়ুগোপালের মত হামা ছিল না। কোমরের লাল ঘুনসিতে তামার ফুটো পয়সা কাপ হয়ে বসে ছিল না। সংসারের চাতালে এক দুঃস্বপ্নের আবির্ভাব। তিমিরে কডলিভার মর্দিত তিমিশিশু। হাতে তার গুনছুঁচ। তবিল ফুটো করে সব সঞ্চয় লিক করিয়ে দিলে। এ মহাপুরুষ হল চৌবাচ্চার সেই বিখ্যাত ছেঁদা। যাঁর আগমনে সংসারটাই ড্যামেজ হয়ে গেল।

পুত্রের জন্মে পিতার ভূমিকা কি আমার জানা হল না। তবে মা আর তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মাতুল বংশের অবদানে আমি যে একটি গেঁজে যাওয়া পদার্থ এ সত্যটি পাকেপ্রকারে নানাভাবে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছিল। ওই যে তোমার কাঠামো, ওটা তোমার মামার দিকেই গেছে বাপু। এ বংশে কারুর বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ছিল না। মিনিমাম ছত্রিশ, ম্যাকসিমাম ছেচল্লিশ। হাতের কবজি কারুর অমন প্যাকাটির মত ছিল না। ঘড়ি পরবে কি? পরতে হলে বাজুবন্ধ করে পরতে হবে। অমন সখীমার্কা চুল ওই বংশেরই পেটেন্ট করা জিনিস। বকের মত লম্বা ঘাড়। ঘোড়ার মত মুখ। ও মুখে আর ও মাথায় বাস্তব বুদ্ধি থাকতে পারে না। ইমোশান, সেন্টিমেন্ট, ক্রোধ এই সবই ভ্যাট ভ্যাট করছে। অহংকার, আলস্য, ঈর্ষা যাবতীয় তমোগুণে শরীর পাকতেড়ে। এরপর একটি ইংরেজী বাক্যে আমার চরিত্র সম্পূর্ণ, হি ইজ গুড ফর নাথিং। ওকে একটা নরম বিছানা আর গোটাকতক তুলতুলে বালিস দাও, ঘুমিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিক। অগ্নিতে ঘৃতসংযোগের লোকের অভাব সংসারে হয় না। তাঁরা কুটুস কুটুস করে বলতে লাগলেন, ওর মায়ের লিভারটা কমজুরি ছিল তাই গায়ে গত্তি লাগে না। ওর মায়ের সর্দিকাশির ধাত ছিল, টনসিল ছিল তাই বারো মাসই হাঁচি, কাশি, সর্দি লেগেই আছে। এই যার স্বাস্থ্য তার জন্যে সংসার নয়, স্যানাটোরিয়ামই উপযুক্ত স্থান। মা ঊর্ধ্বলোকে পালিয়ে বেঁচেছেন, আমি পালাতে পারিনি। ফ্যাসা কলে পড়ে ফেঁসে গেছি। মায়ের জন্যে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। রোজই একটা না একটা কারণে তাঁকে নামান হয়, আর তাঁর অপদার্থ সন্তানকে উপলক্ষ করে বাক্যবাণে এফোঁড় ওফোঁড় করে আবার ওপর দিকে তুলে দেওয়া হয়।

আমার মরুভূমিতে মরুদ্যান ছিল না, ছিল মরীচিকা। সকলের মুখই কঠিন কঠোর। নিজের মুখ যতই বিষণ্ণ করি না কেন অন্যের মুখে স্নেহের নরম ছায়া নামে না। একটু ভালবাসা কোথায় পাওয়া যায়? গোকুলে নিশ্চয় কেউ বাড়ছে যে এই অধমকে ভালবাসবে। কল্পনায় সেই মুখটিকে পোস্টারের মত বুকে সেঁটে একদিন খুব আবেগের গলায় গাইছি, বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি; কিভাবে জানি না, আমার সেই আবেগ চর্চা পিতৃদেবের কানে গিয়ে পৌঁছোল। তিনি রায় দিলেন, ছোকরা সঙ্গী খুঁজছে। হরমোন সিক্রিসানের এই তো বয়েস। তা বাপু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটি বাঁকা ভুরু খুঁজে নিলেই হয়।

কে বোঝাবে ও গান হর্মোন গাওয়ায়নি। চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুরে কাঠঠোকরা যখন সশব্দে নারকেল গাছ ফুটো করে, ঘুঘু যখন নির্জন বাগানে দুপুরকে উদাস করে তোলে, ঘাসজ্বলা মাঠে গাভী যখন কষ্টের হাম্বাস্বরে বোঝাতে চায় বড় কষ্ট, বড় কষ্ট, তখন মনে একটু বিরহের সুর আসতেই পারে। তাতে শরীরস্থ গ্ল্যাণ্ডের কোনো কারসাজি নেই। কথা শুনে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বিদ্যে যদ্দুর হয়েছে তদ্দুর ভাল। আর না। এবার ভাগ্যান্বেষণ। একটা কিছু হতে হবে। হয়ে দেখাতে হবে, আমিও হতে পারি।

আমি যা হতে পারি তার একটা ছবি বেশ ভালভাবেই আঁকা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার হতে পারব না,বড়ই দুর্বল। অঙ্কে মাথা নেই। যার সরল কর-র উত্তর বেরোয় ন' হাজার সাতশো সত্তর বাই আঠারশো ছত্রিশ তার দ্বারা ব্রিজ বানান কি ড্যাম তৈরি অসম্ভব ব্যাপার। ও ওই চুল উলটে মিনমিনে গলায় সখী সংবাদ করুক। বড় ইচ্ছে ছিল ফ্যামিলিতে একজন ডাক্তার হোক। বিধানচন্দ্র কি নীলরতন না হোক আমাদের ভুজঙ্গভূষণের মত হলেও চলত। রাতবিরেতে কারুর শরীর খারাপ কি আত্মীয়স্বজনের ডেলিভারি কেস। হায় ভগবান! সে গুড়েও বালি। যে ছেলে রক্ত দেখলে অক্ত, অক্ত করে লাফায়, রাস্তায় বলহরি শুনলে, একলা ঘরে শুতে পারে না, ভূত দেখে, সে হবে ডাক্তার! ওর ওই চুল উলটে চোখ বড় বড় করে, রে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোরই ভাল। এর বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়। আইনের জগতে রাসবিহারী, সেও কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। মেটাল দেখলেই বোঝা যায় ধারালো কিছু হবে কি ভোঁতা কোদাল হবে। যে লোক দেখলে লাজুক হেসে তোতলাতে থাকে তার পক্ষে সেলসম্যান হওয়াই অসম্ভব, বাঘা ব্যারিস্টার তো বহু দূরের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ফোঁড়ন কাটলেন, ধাতু দৌর্বল্য। অভিভাবক মেনে নিলেন, হতে পারে, নরানাং মাতুলক্রম। টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখতে বল, মাস গেলে যা হোক তিন চারশো হবে। ওইতেই বাঁকা ভুরু হবে, আঁকা টিপ হবে। আমাদের সব স্বপ্ন ওই ছোকরা ভেস্তে দিলে।

কি হতে পারব না যখন স্পষ্ট, কি হতে হবে তাও যখন নির্দিষ্ট তখন একটা নতুন পথ বেছে নিতে হবে। দেখিয়ে দোব, কোন্ পথে কে চলে। পৃথিবীটা ভোঁদকা মানুষে ছেয়ে গেছে। চওড়া চওড়া বুক, মোটা মোটা কবজি, ভুঁড়ি, কলাগাছের মত উরু, থামের মত ঠ্যাং। এক একবারে পাহাড়প্রমাণ ভাত উড়ছে, পাঁঠার ঠ্যাং, ডবল ডিমের ওমলেট। ঢক ঢক করে জলখাওয়া, ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর তোলা, চ্যাকর চ্যাকর পান চিবোনো। সমস্ত ব্যাপারটাই লাউড, নয়েজি, অ্যাণ্ড ভালগার। আমার উক্তি নয়, আমার মাতুলের। কাঁধে লাল ভিজে গামছা, ঢাকের মত পেটের তলায় লুঙ্গির কষি বাঁধা, বুকের পাটা দুটো থলথল করে ঝুলছে, মোটা মোটা চুলের সুঁড়ি পথ উঠে গেছে ওপর দিকে। ঘাম গড়াচ্ছে। নাকের ফুটো থেকে চুল ঝুলছে খাণ্ডার গোঁফের ওপর। থেকে থেকে থুতু ফেলছে হ্যাক থু। গামছায় ফোঁ ফোঁ করে নাক ঝাড়ছে। মেয়েকে ডাকছে পুঁটি, পুঁটি। ছেলের নাম রেখেছে হুলো। একপাল ছেলেমেয়ে আর ধুমসী বউ নিয়ে বাঙালী কত্তার সংসার। চুলোচুলি, ঠ্যাঙাঠেঙি। এই হ্যা হ্যা করে হাসছে, এই প্যানপ্যান করে কাঁদছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালগলা ফুলিয়ে হাঁকছে, হুলো, হুলো, নস্যির ডিবেটা দিয়ে যা, মার কাছ থেকে পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে আয়। জানলা খুলে প্রতিবেশীর প্রশ্ন, পুঁটির পেট ধরেছে? উত্তর, না না, আম পড়ছে। প্রশ্ন, বায়ু আছে, বায়ু? উত্তর, আরে-বায়ুতেই তো মেয়েটাকে খেলে। সিদ্ধান্ত, গাঁদালের ঝোল খাওয়াও।

সকালে বেশ করে তেল মেখে চান। পাট করে আঁচড়ান চকচকে চুল। পেটের কাছে পাট করা

কোঁচা। গায়ে কামিজ। সাদা কাপড়ের ব্যাগে টিফিন কৌটো। ভেতরে আধডজন রুটি, একনাদা কুমড়োর ঘাঁট। কত্তা চললেন অফিসে। দুগগা দুগগা। সবচেয়ে ছোটটা দোরগোড়া থেকে চেল্লাচ্ছে, বাবা, থিগিগর থিগিগর আছবে। এই কত্তাই বিয়ের ভোজে বসে চিংকার ছাড়ছেন, মাছটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও। দইয়ের মাথা, দইয়ের মাথা। লেডিগেনিটা আর একবার। মন্দিরে গিয়ে ঠ্যাং ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজিয়ে বিকট ডাক, মা, মা, জগদম্বে! বুউ উ উ বুম, ব্যোম, শিব শ্যাম্ভু। চোখ উলটে কয়েক সেকেণ্ড দণ্ডায়মান। তারপর হন হন করে ছুটছেন, পাঁচুর পেছনে বাঁশ দিতে।

মন ভেবে দেখ, তুই কি ওই রকম হতে চাস? মন বললে, না। তা হলে? মামার সঙ্গে নিজাম ফ্যামিলির এক আত্মীয়ের বাড়িতে গানের আসরে গিয়েছিলুম। মামার সে কি সুন্দর পোশাক! গলাবন্ধ সিল্কের ঝকঝকে কোট। পা চাপা পাজামা। সোনার চেন ঝুলছে বুক পকেটের কাছে। চোখে রিমলেশ চশমা, মিহি আতরের গন্ধ। চলার মধ্যেও একটা হালকা নাচের ছন্দ। নবাব পরিবারের বিরাট গাড়ি চেপে আসরে যেতে যেতে মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দুটি মেরু, হয় রাজা না হয় মহারাজ। মহারাজ মানে সন্ন্যাসী। এর মাঝে যা কিছু সবই উঞ্ছবৃত্তি। ইয়া পুরু কার্পেট মোড়া বিশাল হলঘর। ঝাড় লণ্ঠনের ঝাড় দেখে মাথা ঘুরে যায়। বেনারসী কেটে জানলার পর্দা হয়েছে। বাড়ি বললে ভুল হবে। প্যালেস। গৃহস্বামীর গায়ের রঙ চাঁপাফুলের মত। পোশাক রূপকথার মত। আর সেই বাড়ির মহিলারা! স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। এক ঝলক দু' ঝলকের দেখা। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডিমের মত মুখ। খাড়াখাড়া নাক। পটলচেরা চোখ। দুধেআলতা রঙ। ধনুকের মত বাঁকা বাঁকা ভুরু। এমন পরিবেশ, এমন আদবকায়দা নড়তে চড়তে ভয় লাগে। আমার মাতুলের এ সব রপ্ত ছিল। গান ধরলেন যমুনা কা তীর। কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হল, চাঁদের আলোয় তাজমহল তৈরি হচ্ছে। স্বয়ং সাজাহান বসে আছেন আরাম চেয়ারে। ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে ধীরে ধীরে নাচাচ্ছেন। নাগরার জরি তারের আগুনের মত চমকে চমকে রিরি করে উঠছে। কফিনের ডালা খুলে মমতাজ আসছেন চাঁদের আলোর পোশাক পরে। সেদিন যমুনার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হয়েছিল ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করলে মন্দ হয় না। এই শেরোয়ানি, এই আচকান এই আতরদান, এই মলমল, মখমল, মেহেন্দির আলপনা আঁকা চাঁপার কলি আঙুল, সুরমাটানা তীক্ষ্ণ চোখ, উর্দু, শায়ের। মসজিদ উঠে গেছে আকাশের চাঁদোয়ায়, আজানের শব্দ। রোগনজুস থেকে ভেসে আসা জাফরান আর আতরের গন্ধ। না, ধর্ম বদলালে কিছু হবে না। চালকলা বাঁধা বামুনের রক্তে রঙ ধরবে না। চ্যাটাই পেতে মেটে দাওয়ায় আড় হয়ে শুয়ে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ চ্যাটাস চ্যাটাস করে মশা মারতেন আর প্রপিতামহীকে গালাগাল দিতেন। সকালে ফতুয়া পরে বগলে রঙচটা ছাতা নিয়ে পাঠশালে গিয়ে বাঁদরদের শুভঙ্করী শেখাতেন। সকালের নাস্তা বেগুনপোড়া দিয়ে একবাটি মুড়ি। বড়াখানা আলোচালের পিণ্ডি, কাঁচকলা ভাতে, পপিতা সেদ্ধ, থানকুনি পাতার ঝোল, হিংচে শাক। তসা পিতা উদূখলে চালভাজা গুঁড়ো করে ফোকলা মুখে ফক ফক করে খেতেন। বুড়ী বুড়োকে গালাগাল দিয়ে বলতেন, মরবে এইবার পেছনপটকে। মাঝে মাঝেই পরিবারে চালু নানান চুটকির মধ্যে যে'টি কানে আসে, খুব সূক্ষ্ম নয় স্থূল, যথা: পণ্ডিতং পণ্ডিতং মুখ কেন সিটকেতং? উত্তর, কোঁচায় পটুতং। প্রশ্ন, যাও না কেন নদী? উত্তর, বাকি আছে দধি। সেই রক্তে কি আর পারস্যের বুলবুল গান গাইতে পারে? তৈমুর কি চেঙ্গিজের সন্তান হলে দেখা যেত। এ তো অসি ধরা মেজাজ নয়। মসি ধরে চলে আসছে জীবিকার ধারা। গাড়ু হাতে মাঠ ভেঙে প্রাতঃকৃত্য। কেঁতা বগলে শয়ন। দাঁতন মুখে প্রভাতে উত্থান।

রক্তে যদি গানের বীজ থাকত তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। মামার মত ক্লাসিক্যাল মেজাজ নিয়ে রাজা মহারাজার বাড়িতে আসর মারতুম। সুরের পথ বেয়ে বেয়ে চলে যেতুম অতীতের ঐশ্বর্যে। মামার মত ব্যাকব্রাশ করা চুল। ঘাড়ের কাছে বাবরি। আঙুলে হীরের আঙটির ঝিলিক। চারপাশে সুন্দরী। দিনকতক মামার কাছে তালিম নিতে বসলুম। প্রথমেই গলা সাধা ভূপালী, এ তানা যোবানা পরমা মানা করিয়ে। কেঠো সুর। অর্ধেক পর্দা লাগে না। এ তানা যোবানা পরমা, একটু থমকেই সপাট তান, সা রে গাপা ধাসা, গাপা গারে সা, হাঁটুতে এক চাপড়, এ তানা যোবানা। সেই অঙ্কের ব্যাপার।

ফাঁকা, সম। তিন তালের তা ধিন্ ধিন তা, না তিন তিন তা। লয় চলেছে টুকুস টুকুস। যে যেখান থেকে পেরেছে পৃথিবীটাকে জটিল করে রেখেছে। গলা শুনে গুরু বললেন, হচ্ছে, তবে নাকি সুর এসে যাচ্ছে দোক্তা বাঁড়ুজ্যের মত। ভদ্রলোকের আসল নাম লোকে ভুলে গেছে। পানদোক্তা ঠেসে গান ধরেন, সোনে কা থালমে খা রাহি হ্যায়, এ কালী কমলি সুঘারা বানাও। চড়ার দিকেই যত গোলমাল। পাঁঠা কাটা গলা। তালে, লয়ে মাস্টার। স্টক অনেক। শুধু গলা নিয়েই গণ্ডগোল। গলাকাটা গাইয়ে।

মামা বললেন, তোর ন্যাক আছে। থাকতেই হবে। আমাদের বংশের ব্লাড ঘুরছে শরীরে। তবে সাধতে হবে। বারো ঘণ্টা, তেরো ঘণ্টা। সারে, গাপা, ধাসা, ধাপা, গারে, গাসা। আর ওই নাকটাকে বাদ দিতে হবে। ঐ তাঁনা পরমাঁ নাঁ নাঁ। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সামনে আধ হাত জিভ বের করে সিংহের মত আ, আ করবি। একগলা জলে দাঁড়িয়ে নাদ সাধনা করবি হুম, হুমমম। সঙ্গীত মানে নাসিকাবাদ্য নয়, গলা বাজান।

দাদু বললেন, দিনকতক আমার হাতে ছেড়ে দে। ধ্রুপদ দিয়ে গলার গার্দা বের করে দি, তারপর মোচড় দিয়ে মুচড়ে খেয়াল, ঠুংরি, গীত, গজল। মামা বলে ফেললেন, গলা হয়তো হবে তবে জীবনে আর সুরে বলবে না। আপনার মত বাজখাঁই হয়ে যাবে। বাস্, লেগে গেল ঝটাপটি দু'জনে। জানিস আমি মণি মুকুজ্যের ছাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ অস্বীকার করছি না, তবে যেমন গুরু তেমন চেলা। গানের গ্রামার তিনি ভালই বুঝতেন, জানতেন, গাইতে পারতেন না। দাদু বললেন, অহংকার। অতি দর্পে হতালঙ্কা। আমার গলা আকাশের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করবে। আর তোর মিনমিনে গলা দু'হাত এগিয়ে ঝরা ফুলের মত নেতিয়ে পড়ে।

মামার সঙ্গে দাদুর তেমন বনিবনা নেই। তেহাই মেরে কথা চলে। দাদু হলেন পুরুষসিংহ। মুখের চেয়ে হাত চলে বেশি। পাঠানদের মত দশাসই চেহারা। জাপানী আপেলের মত গায়ের রঙ। বাড়ির বাইরে আউট হাউসে থাকেন। স্বপাকে খান। তন্ত্রসাধনা করেন। রোজ চণ্ডীপাঠ। প্রতি বছর কালী পূজা। কোথা থেকে এক কাপালিক এসে পুজোয় বসেন। সেদিন একটু কারণবারি চলে। মায়ের মূর্তিও অসাধারণ। শিবের বুকে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, আধহাত জিভ বের করে। পূজারী আর তন্ত্রধারক দু'জনেরই পরনে রক্তাম্বর। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল লাল টিপ। সব লাল। জবা লাল, মা লাল, চাঁদোয়া লাল। চোখ লাল। লালে লাল। সেই পুজো দেখতে গা ছমছম করে উঠত। বাইরের মিশকালো আকাশে বাজি উঠছে। দুমদাম শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপছে। মাতামহ পুজোর আসনে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন হাঁড়িকাঠে গলাটা ফিট করে দিয়ে ঘপাং করে একটা কোপ মারলেই হয়। কপালে হোমের টিপ পরাতে পরাতে হাত কাঁপত। আমার গা কেঁপে উঠত। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, মা, মা। উহ্য থেকে যেত, মেয়ের ছেলে মা, তাই লোভ সামলাতে হল, নয়তো ধড় মুণ্ডু আলাদা করে ফেলে দিতুম তোমার পায়ে। লাভের মধ্যে প্রসাদ, লুচি, মাংস। মাংস আসত কালীঘাটের মন্দির থেকে। এক ঝটকায় কাটা ছাগশিশু।

মাতামহের স্নেহের কমতি ছিল না। কথায় কথায় বলতেন, তুই আমার সুদের সুদ। আদর করে নাম রেখেছিলেন পান্তুরানী। কেন রেখেছিলেন কে জানে! ভীষণ পান্তুয়া খেতে ভালবাসতেন সেই কারণেই বোধহয় পান্তুরানী। ছোট্ট ঘরে বিশাল এক সিন্দুক। সেই সিন্দুকেই যত স্থাবর সম্পত্তি। মাঝে মাঝে খুলতেন আর বন্ধ করতেন। খোলার সময় সন্দেহের চোখে চারপাশে তাকাতেন। বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতেন। কি যে রহস্য ছিল ওই বিশাল কাঠের বাকসে! আর ছিল একটি তানপুরা।

মাতুলের তালিমে নানা ফ্যাচাং। এতই শাস্ত্রসম্মত ও আটকাঠ বাঁধা যে সুর থাকে ত তাল থাকে না, তাল থাকে ত লয় থাকে না। একঘর সুন্দর সুন্দরীর সামনে বিড়ম্বনার একশেষ। মাঝে মধ্যে কানমলা, গাঁট্টা, দাঁত খিচুনি। সুরের মধ্যে এত যে অসুর থাকে কে জানত! এমনিই ত বেশ গাওয়া যায়, জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পার, সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও। অভিমানে টসটসে মন, কান্না কান্না গলা। কার জন্যে এই অভিমান বলা শক্ত। অবশ্যই অদৃশ্য কোন রমণী। ইতিমধ্যে যে দু' একজন রমণীর সঙ্গে

পরিচয় হয়েছে তারা কেউই যে আমার জীবনে দীপ জ্বালাবার জন্যে জন্মায়নি, এ সত্যটি আবিষ্কার করা গেছে। রমণীরা একটু ডাকাবুকো, ফচকে ছোঁড়াদেরই পছন্দ করে। রসের কথাটথা বলবে। সাহস করে এমন কিছু করবে যা ভাবলেও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তেমন ছেলের তো অভাব নেই। এমন রমণী কোথায় আছে যার কাছে জ্যামিতির একস্ট্রা করে দেখালে, মাই লাভ বলে গলাধরে ঝুলে পড়বে! তাছাড়া আমার পথ তো আলাদা। আমি তো সংসার করতে আসিনি। ত্যাগ করতে এসেছি। মনে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলে দোষ আমার নয়। ট্রেনিং-এর অভাব। সাধনা তেমন হয়নি। কামার্ত সন্ন্যাসী গরম বালিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলেন, পুড়ে যা, পুড়ে যা, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যা।

আমার মাতামহই ভাল। আমি আসর মারতে চাই না। সুর দিয়ে চরণ ছুঁতে চাই। যাঁকে ছুঁতে চাই তাঁর কাছ থেকে সামান্য সিদ্ধাই টিদ্ধাই পেতে চাই। যৎসামান্য যাতে মানুষকে একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। কারুর ক্ষতি করতে চাই না.। একটু ভড়কে দিতে চাই। সেই ভারটি চাই যাতে মনে হতে পারে, লোক না পোক। আগে শক্তি চাই। তারপর প্রেমিক হব। রমণীর নয়। জীবের। চোখ দুটো হয়ে যাবে কাচের মত। উদাস। উজ্জ্বল মুখ। বুকের মাঝখানটা সিঁদুরে লাল। যেমন ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। সাধকের কি কি লক্ষণ হতে পারে সবই আমার জানা! বই পড়ে জেনেছি। আমেরিকার থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। এক মাথা চুল। চোখ দুটো অদ্ভুত সুন্দর। যোগীর চোখ। দ্যুতি বেরোচ্ছে। বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ব্রাদার্স অ্যাণ্ড সিস্টার্স বলে শুরু করে সব স্তব্ধ করে দিয়েছেন। আ্যা মঙ্ক ফ্রম দি ইস্ট। আঃ স্বামীজীর মত যদি হতে পারা যেত! ওই রকম স্বাস্থ্য, সাহস, বাগ্মিতা মেধা। ব্রিটানিকার পাতায় একবার চোখ বুলিয়েই পুরোটা মুখস্থ হয়ে গেল। আর আমি! হাজার চেষ্টা করেও গ্লুকোজের স্ট্রাকচার মনে রাখতে পারি না। ডকটর ব্যানার্জির কাছে ধমক খেয়ে মরি! রহস্যটা কি? সবই নাকি রেতর খেলা। বীর্য ধারণ করে উর্ধ্বরেতা হতে হবে। মাতুলের আসরে মন বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্বামীজীর বদলে জী বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটি হবার সাধ জাগে প্রাণে। হাঁটুতে হাঁটু বেঁকিয়ে বসে থাকে উমা। তারও এ তানা যোবানা, আমারও এ তানা যোবানা। গলায় গলা মিলিয়ে কোরাসে, এ তানা, সারে গাপা ধাসা। গানের চেয়ে গায়িকার আকর্ষণ বড় বেশি। আমাকে সংসারে টেনে নামাবার জন্যেই যেন উমার এই মর্তে আগমন। ঠোঁট এত লাল হয়! গাল এত গোলাপী হয়! শরীরে এত বিদ্যুৎ থাকে! গায়ে গা ঠেকলেই সেই ব্যাঙ নাচান সাহেবের ব্যাঙের মত কেঁপে কেঁপে উঠতে হয়। রাতের স্বপ্নে উমা রাজকাপুরের ছবির নার্গিসের মত ধোঁয়ার স্রোত ঠেলে এগিয়ে আসতে থাকে। আতঙ্কের চিৎকার, আর না, আর না। স্বপ্নের উমাকে থামায় কার পিতার সাধ্য! প্রাতে বড়ই বিমর্ষ। স্বপ্নে স্বামিজী এলেন না পরিব্রাজক বেশে। রামকৃষ্ণ এলেন না সমাধিস্থ হয়ে। এসে গেল উমা। বাস্তবে এলেও না হয় বোঝা যেত। স্বামীজীকে উলটে রেখে ওমর খৈয়ামকে টেনে নামান যেত। ও লাইনে লায়লা মজনু, হীর বনঝা কম্বিনেশান তো রয়েই গেছে। ইতিহাসের দিকে আর একটি জুটি ঠেলে দেওয়া যেত, উমা পিণ্টু। এতক্ষণে আমার নাম প্রকাশ করা গেল। ভাল নামে দরকার নেই। পিণ্টুই ভাল। বেশ পয়েণ্টেড। ইনটুব মত।

পিতৃদেব নাস্তিক, মাতামহ আস্তিক। মায়ের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জানা নেই। নাস্তিকের আর আস্তিকের রক্তে আমি বোধহয় এক জগাখিচুড়ি। পিতাঠাকুর বললেন, যাচ্ছ কোথায়? বিশ্বরহস্য খানিক শুনে যাও। স্বর্গ নেই নরকও নেই মাণিক। আছে কেবল কর্ম। এ জন্মে যদি ভাল করে, তন-মন-ধন হয়ে জ্যামিতি কর তাহলে আসছে জন্মে ইউক্লিড। যদি পদার্থবিদ্যায় মন দাও পরের জন্মে বাথটব থেকে লাফিয়ে উঠে রাজপথ ধরে রাজবাড়ির দিকে ছুটবে ইউরেকা, ইউরেকা করে। মাতামহ বললেন, ওই দেখ দেয়ালে ঝুলছেন জগদম্বা। ও মাগী যা করাবে তাই করতে হবে।

এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা ॥
কি রূপ কি গুণভঙ্গি, কি ভাব কিছুই না যায় বলা

যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥

উতারো তানপুরা। লাগাও সুর। আহা যেন আহা যেন ওঁকার ধ্বনি উঠছে চরাচর ব্যাপ্ত করে। উঁহুঁ, ভাবে বসলে চলবে না। বসতে হবে হাঁটু গেড়ে বজ্রাসনে। এখন সকাল। ধরো ভাঁয়রো, মা মা রবে নসুখে মন ত্রিতন্ত্রী একবার বাজরে। মা মা বলবে অনেকটা ঢেঁকুর তোলার মত করে। তলপেট থেকে ঠেলে উঠবে হৃদয়ের দিকে। কুলকুণ্ডলিনী চমকে চমকে উঠবে। একবার যদি জেগে যায়, আর পায় ক ? নাও ধরো, মা, মা রবে মনসুখে। মামা ঠিকই বলেছিলেন। আবেগে, বীরভাবে, রাগে দাদুর গলা ছড়ে যে জিনিস মুক্তি পেল, তাতে সুর নেই, ভাঁয়রো, ভৈরবী, ধানেশ্রী, পুরিয়া, বেহাগ সব মিলে মিশে কাকার। দর দর করে জল ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। এত অশ্রু কেন ? ও গলার সঙ্গে আমি পারব কেন ? াঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি করে মা রব ছাড়ছি। মূলাধার চমকে চমকে উঠছে কই ! দাদু পাছে হার্টফেল রেন এই ভেবে নিজের হার্টই ধরফড় করছে। খালি হাত আকাশে বাতাসে কিছু একটা খামচে ধরার চষ্টা করছে। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের মাস্তুলের মত তানপুরা দুলছে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। াস্তার দিকের জানালায় সারি সারি কুঁচোকাঁচার মুখ। পথে চ্যাংড়া ছেলেরা ঘেউ ঘেউ করছে। দাদু মন ত্রতন্ত্রীকে বাজাবার চেষ্টা করছেন। মহরমের হাসান হোসেনের মত বুকে চাপড় মারছেন। তানপুরার ঞ্চমেব তারটা পটাস করে ছিঁড়তেই দাদুর ভাব সমাধি হল। সমাধি ভাঙতেই জানলার দিকে তাকিয়ে শ্লীল খিস্তি করলেন। মুখের সারি ভেঙচি কেটে সরে গেল। জগদম্বার ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, বটী আজ খুব দিয়েছে। আমায় মাতিয়ে দে মা। আমি এমন করে মেতে যাই যেন এক মাতা হাতি !

চিঁ চিঁ করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, বুঝেছ পান্তুরানী। সিংহের মত ডাকতে হবে। নাদ ছাড়তে বে। নাদ ব্রহ্ম। চিঁ চিঁ করে মেয়েছেলেকে ডাকা চলে, ওগো, শুনছো ? দ্যাকোতো আমার পিঠের খানটায় যেন কি একটা কামড়েছে ? এট্টু চুলকে দাও। ওই বেটিকে পেতে হলে পুরুষকার চাই। আয় া রণে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ! এই বসলুম আসনে। দেহ শুকিয়ে ঝরে যাক, কুছ পরোয়া নেই, মি সামনে এসে না দাঁড়ান পর্যন্ত উঠছি না। সাধন করনা চাহি রে মনুয়া, ভজন করনা চাই। তোর বীরটা বড় ন্যালবেলে। ওইটাকে একটু ফোলাতে হবে। ডঙ্কামারা বুক চাই। নে ওঠ। উঠেছিস ? নে বাস। আবার ওঠ। ওঠ বোস, বোস ওঠ। উঠতে তারা বসতে তারা। এমন দিন কি হবে মা তারা, বে তারা তারা মা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা। রোজ পঞ্চাশবার।

আর ওই দ্যাখ। ঘরের কোণে বিশাল দুটো মুগুর দুই পালোয়ানের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে। টোকে দু'হাতে ধরে দাদু অক্লেশে তুলে ফেলে বারকতক পটাপট ভেঁজে ফেললেন। ওপর বাহু আর াঁধের গুলি ঠেলে ঠেলে উঠল। মুগুর মাথার ওপর যখন চক্রাকারে ঘুরছে তখন বেশ ভয় ভয় াগছে। এতে উঁচুতে উঠছে, সিলিঙে না লেগে যায়। মুগুর দুটোকে পায়ের কাছে জোড়জুরের ভঙ্গিতে রেখে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে দাদু বললেন, নে তোল। এক হাতে একটাকে চেষ্টা করে দেখলুম। মপসিবল। অসম্ভব ভারি। দু'হাতে কোনো রকমে জমি থেকে তুলে আবার নামিয়ে রাখলুম। হাত াঁপছে, শরীর কাঁপছে, পা কাঁপছে। মাতামহ হা হা করে হেসে উঠলেন আলাদিনের দৈত্যের মত। াটা বংশের মুখ ডোবাবি। ডেলি পঁচিশটা ডন, পঞ্চাশটা বৈঠক। তারপর মুগুর, সঙ্গে কুস্তি। আর ানা। খেতে হবে। খোরাক চাই।

সকালে একমুঠো কলবেরোন ছোলা, আখের গুড়, কয়েকদানা চীনেবাদাম। দুপুরে নুন দিয়ে একবাটি ্যান। পর্বত প্রমাণ ভাত আর ডাল। মাছ মাংস ডিম না হলেও চলবে। রাতে গোটা দশেক মোটা মোটা আটার রুটি একবাটি ছোলার ডাল। প্রচুর ব্যায়াম। মাইল পাঁচেক হণ্টন। মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শয়ন। ল্যাঙট পরিধান, সূর্য নমস্কার, গায়ত্রীজপ। সংসার ছাড় আর না ছাড়, সাধু তৈরি হবে ভেতরে ভেতরে। অমরনাথের বরফের শিবলিঙ্গের মত। হঠাৎ একদিন গুহার পাথর সরিয়ে দেখা গেল ই' ফুট উঁচু তুষার লিঙ্গ। অন্ধকারে ফট ফট করছে। আহা, বড় আশার কথা ! কিন্তু সাধন পথের তিনদিনেই মৃত্যুর মুখোমুখি।

'তৃণ হয়ে ভাসি জলে'

প্রচণ্ড রক্ত আমাশা। তেমনি জ্বর। কোমরে অসহ্য ব্যথা। নাইকুণ্ডলের কাছটা খামচে খামচে উঠছে। বাথরুম বেডরুম, বেডরুম বাথরুম এই চলছে। পাশে মাতামহ নেই। বিনা অনুমতিতেই ল্যাঙট খুলে বিকচ্ছ হয়ে পড়ে আছি। যাক কাছা খুলিয়ে ছেড়েছে, এইটাই একটা ভাল লক্ষণ। কাছা না খুললে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। লর্ড ক্লাইভের আমলের পুরোন বাড়ি। নোনা ধরা দেওয়াল। এ বাড়ি ছেড়ে আমার পিতৃদেব কোথাও যাবেন না। রাজপ্রসাদেও না। এটি হল স্মৃতি সৌধ। বাড়িটি নেবার সময় শুভানুধ্যায়ীরা অনেক সাবধান করেছিলেন। হানাবাড়ি নেবেন না মশাই। এই তো বাগচীরা! ওই বাড়িতে কিছু দিন ছিল। তার মধ্যে যা হবার সব হয়ে গেল। দুপুরে বড় বউয়ের শাড়ি ঝুলছিল দোতলার বারান্দা থেকে পাতকো তলার দিকে। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই। সেই বড় বউ এখন ঘোর উন্মাদ। যান না একদিন গিয়ে দেখে আসুন। ওই তো মালাপাড়ার দিকে উঠে গেছে। সকাল, সন্ধে যখন খুশি যেতে পারেন। সবাই যায়। ভূতে পাগলী করেছে। একমাথা শনের নুড়ি চুল। দাওয়ায় বসে বসে পটাস পটাস ছিঁড়ে বাতাসে ওড়াচ্ছে, আর বলছে, এই ছিল, এই নেই। সিনেমার পাগল নয়, রিয়েল পাগল।

যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি ভূতে বিশ্বাসী হবেন? অসম্ভব। পিতৃদেবের কড়া উত্তর, যদি বলি আপনার ওই বাগচী আর তার মা নির্যাতন করে করে বউটিকে শেষ করে ফেলেছে, কিছু বলার আছে? আপনাকে আমি যখন তখন, যেখানে সেখানে ভূত দেখাতে পারি। দেখবেন নাকি?-কি করে দেখাবেন? অতই সোজা?-ভূত আমি ম্যানুফ্যাকচার করি মশাই।

বাড়িটা যে ভূতের বাড়ি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দোমহলা বাড়ি। অসংখ্য ঘর। ঘোরান প্যাঁচান বারান্দা। পেছন দিকে একটা ঝোপঝাপঅলা বাগান। নিচের তলা পড়ে আছে ফাঁকা পাতালপুরী। সে যুগের বাড়ি। একতলার ঘরে কোনও জানালা নেই। ঘরের মধ্যে ঘর। ড্যাম্প অন্ধকার। দিনেরবেলাই টর্চ হাতে ঢুকতে হয়। অন্ধকারে যদি ভূতের জন্ম হয় তাহলে ওই আঁধারে কত যে প্রেতাত্মা বসে আছে আমার অবিশ্বাসী পিতা-ঠাকুরকে শায়েস্তা করার জন্যে? বাগান নামক বস্তুটিতে সাপ আছে নানা জাতের, ছুঁচো, ইঁদুর, গিরগিটি, তেঁতুলে বিছে। মাঝরাতে নিচের ঘরে ছুঁচোর কীর্তন শুরু হয়। ইঁদারার মত বিশাল এক কুয়ো মাঝখানে মুখব্যাদন করে আছে। বহু নিচে আলকাতরার মত জল। মাঝামাঝি জায়গায় একটা খিলানের মত ছিল। মুখটা বোজান ছিল ইট দিয়ে। একদিন ঝপাস করে একটা ইট খুলে পড়ল জলে। ঝালাই মিস্ত্রীরা এসে রহস্য আবিষ্কার করল। একটি সুড়ঙ্গ। কতদূর গেছে কে জানে? গবেষণায় মেনে নেওয়া হল, সুড়ঙ্গ পথ গঙ্গা পর্যন্ত গেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে টর্চ নিয়ে পিতৃদেব ঝুলে পড়লেন। রহস্য অনুসন্ধানে তাঁর জুড়ি নেই। সন্তান যে কত অপদার্থ, কত ভীতু তা আর একবার প্রমাণ করার জন্যে পিতা লাটখাওয়া বালতির মত ঝুলতে লাগলেন‧সেই সুড়ঙ্গের মুখে, হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। অসাধারণ কায়দায় ঢুকে পড়লেন সেই গহ্বরে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য দড়ির অগ্রগতি দেখে বোঝা গেল তিনি চলছেন। ঝালাইঅলারা বলতে লাগল, বাবু আমাদের পাওনাগণ্ডাটা মিটিয়ে ঢুকলেই ভাল হত। ও তো মহাপরস্থানের পথ। কতকালের গ্যাস জমে আছে এক সময় দড়ি থেমে গেল। ঝুলতে লাগল ন্যাজের মত। নট নড়নচড়ন। ব্যাস, বাবু ফিনিশ। মৃতস্ত্রী পিতারা বড় বেপরোয়া হন। শাসন করার কেউ থাকে না ত সংসারে! মা থাকলে সম্ভব হত কি ওই সুড়ঙ্গে ঢোকা! নাও এবার বোঝো ঠ্যালা! গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির প্রবীণ মানুষ আশুবাবু দৌড়ে এলেন, কি হয়েছে বাবা?

মিস্ত্রী: বাবু ঘুষ্যা।

প্রবীণ মানুষদের যে কোনো জিনিসই বুঝতে বেশ দেরি হয়, কিন্তু একবার বুঝলে আর রক্ষা নেই কে ঢুকেছে বাবা? তোমার বাবা? আজ্ঞে হ্যাঁ। পাতকোর পারে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি মারলেন। দড়ি ঝুলছে, মানুষ নেই। কিছুতেই বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা কি? পাতকোর মাঝামাঝি জায়গায় সুড়ঙ্গ

কোথায় এমন আছে ? ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান ব্যাবিলনেই ছিল। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। পাতকো বসাতেই ভিটেমাটি চাঁটি, মাঝে আবার সুড়ঙ্গ। কোন পাঁঠার কাজ ? এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন আমি এক রামছাগল ! খুব বকাঝকা করে আশুবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, তোমার বাবা প্রায়ই দুঃখ করেন, তুমি একটি অপদার্থ, এখন মনে হচ্ছে তোমার বাবা তোমার চেয়েও অপদার্থ। যাও, মাটিকে তো খেয়েছ এখন বাবাটিও পাতাল প্রবেশ করলেন। নাও এবার গলায় কাছা নেবার ব্যবস্থা কর। আচ্ছা, দড়িটাকে একটু টেনে দেখলে হয় না ?

কার সাহস হবে ওই দড়ি টেনে দেখার ? আমার অত সাহস নেই। দড়ি ধরে টানলে যে মানুষটি বেরোবেন তাঁকে আমি চিনি। আমি খাঁকশেয়াল হলেও তিনি ব্যাঘ্র। সব জল্পনা-কল্পনা থেমে গেল। ঝোলা দড়ি আরও খানিকটা ঝুলে গেল। ঝুলেছে, ঝুলেছে বলে আশুবাবু কিঞ্চিৎ উল্লাস প্রকাশ করলেন। তোমার বাবা ব্যাক করছেন পিণ্টু। অবশেষে একটি মুখ দেখা গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে সম্ভবত পিচ্ছিল পথে হড়কে হড়কে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। হাত নেড়ে বললেন, খিচো। সুড়ঙ্গ-মুক্ত পুরুষ মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলতে ঝুলতে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। এ গ্রেট ওয়ার্ক অফ কনসট্রাকসান ইঞ্জিনিয়ারিং।

ওপরে উঠে এলেন। হাতে একটা কি যেন রয়েছে। আশুবাবু উদগ্রীব, হ্যাঁগো, গুপ্তধন টুপ্তধন কিছু আছে না কি ? সংক্ষিপ্ত উত্তর, থাকলে আশ্চর্য হব না। আবার প্রশ্ন, হাতে ওটা কি ? কচ্ছপের খোলা। বলো কি ? তাহলে ত এ জায়গাটা দেখছি পীঠস্থান। কূর্মপীঠ। তা কতদূর গিয়েছিলে ? মাইলখানেক হবে ?

হাত তিনেক গিয়েছিলুম। আহা ! এলিসের ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। ছোট একটা ছেলে পেলে দেখে নিতুম, শেষ কোথায় ?

এইরকম একটি বাড়িতে রক্ত আমাশার মত অসুখ। কাবহিডের ড্রামে ভর্তি জল। প্রায় শেষ করে ফেলেছি। একতলার পাতকোর থেকে টেনে টেনে জল ভরতে হবে ভাবলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। খালি যখন করেছি ভরতে তো হবেই। আইন হল আইন। শুনেছি এই আইনের ঠ্যালায় আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই আধমরা হয়েছিলেন। সারা ভারত জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন চললেও, গঙ্গার তীরবর্তী এই ক্ষুদ্র জনপদের ভুতুড়ে বাড়িতে আইন অমান্যের সাহস কারুর ছিল না। দুঃখের দিনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে মনের দেয়ালে সারি সারি বীর, যোদ্ধা, মহাপুরুষদের ঝুলিয়ে রাখতে হয়। সামনে দাঁড়াও। চোখ বুজিয়ে বল, শক্তি দাও, একটু স্পিরিট ধার দাও। রোমেলকে স্মরণ করি। এই অবস্থায় রোমেল না হলে উদ্ধারের আশা খুবই অল্প। শুয়ে শুয়ে সাব খেতে হবে। সেই অনুচ্ছেদটি একবার ঝালিয়ে নি। রোমেলের জীবনীর তেত্রিশপাতায়, নিচের দিকে আছে। ১৯১৪ সাল। আমি তখন কোথায় ? বাইশে আগাস্ট। ভোর পাঁচটা। স্থান, ফরাসী দেশ। গ্রামের নাম ব্লিইড। ফরাসীদের আক্রমণ করতে চলেছেন যুবক রোমেল। ধরা যাক, এখন আমার যা বয়েস, তখন তাঁর সেই বয়েস। রোমেল যাবেন যুদ্ধে, আমি যাব ড্রামে জল ভরতে। দু'জনের শরীরের অবস্থাই সমান। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে রোমেল ঘোড়ার পিঠে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার ওপর খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে পেট ছেড়েছে। শরীর ভেঙে আসছে। ঘোড়ার জিন থেকে পড়ে যাবার মত অবস্থা হচ্ছে। তবু পড়ছেন না, কারণ তিনি রোমেল। রোমেল অসুস্থ হতে পারেন, কিন্তু মুখ চুন করে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে পারেন না। কারেজ্জে ইয়ে মরেজ্জে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন ঘোড়ার পিঠে। জ্ঞান ফিরে এলেই বলছেন, নেভার মাইণ্ড। জার্মান ভাষায় নেভারমাইণ্ডের অনুবাদ জানা নেই। ইংরেজীর মত অতটা মোলায়েম হবে না। গান্দা গোপ্পা ভাষা। উচ্চারণে হাপরের মত বাতাস বেরোবে। শব্দেই চাঙ্গা। ঠিক হোক না হোক আমারও একটা শব্দ চাই। রোমেল কুয়াশা ভেদ করে যুদ্ধের দিকে চলেছেন। আমি ধেড়ে বালতি হাতে ভাঙা-ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামব। রোমেলের ফুডপয়জনিং, আমার পেটে মাতামহের খাদ্যতালিকার প্রলয় নাচন। ও নটরাজ, নটরাজ, প্রলয় নাচন, নাচবে যখন। আলোচালের ফ্যানটাই মনে হয় প্রধান আসামী। নেভার মাইণ্ড ! গুটেনবার্গেন হ্যাফট হাফেভেন।

জল ভর্তি বালতির টানে—উলটে ডিগবাজি খেয়ে পাতকোর মধ্যে পড়ে যাবার মত হচ্ছে। হঠাৎ হোয়াইট নাইটের কথা মনে পড়লো। জলকে আমার দিকে আকর্ষণ না করে, জল যদি আমাকে জলের দিকে আকর্ষণ করত তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। মাঝে মাঝে পৃথিবীটাকে ঘুরিয়ে নিতে পারলে বেশ হয়। আপসাইড ডাউন। আমি জল না তুলে জল যদি আমাকে তুলত ! তেমন একটা শরীর পেলে দেখিয়ে দিতুম। এক বালতি তুলেই মনে হল রোমেল যে ধাতুতে তৈরি ছিলেন আমি সে ধাতুতে তৈরি হইনি। ব্যর্থ চেষ্টা। হেলে কখনো কেউটে হতে পারে না।

চৌবাচ্চার পাড়ে বসে একটু দম নিচ্ছি আর ভাবছি আর একটা ঘটনার কথা। বেশি দিন আগের নয়। দুপুরে পইতেব মধ্যাহ্নভোজনে পংক্তিতে বসেছি। পাশেই পিতাঠাকুর। আমরা একটু বেশি খাতিরের নিমন্ত্রিত। তাই আহার চলেছে কলাপাতা, মাটির গেলাসে নয়। কাঁসার থালা, ধুম্বো কাঁসার গেলাস। ভীষণ তেষ্টা। জলের গেলাস এত ভারি, যতবার চেষ্টা করি তুলতে আর পারি না। আঙুলে লেগে আছে তেল ঘি। মাটি থেকে সামান্য ওঠে আর ঠকাস করে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম কেউ দেখছেন না। গৃহস্বামীর চোখ এড়াল না। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দাঁড়াও, আমি তুলে ধরি, তুমি খাও। পিতাঠাকুরও দেখছিলেন আড়চোখে। তিনি বললেন, খবরদার, নো সাহায্য। নিজে তুলতে পারে খাবে, না হলে খাবে না। আচ্ছা, আমি তাহলে একটা হালকা গেলাসে জল এনে দি। আজ্ঞে না। সমস্যাকে সহজ করে দেবার কোনও অধিকারই আপনার নেই। জীবন যখন যে ভার কাঁধে চাপিয়ে দেবে সে ভার বইবার শক্তি অর্জন করতে হবে। এই বয়েসে ওই গেলাস তোলা উচিত। দিস ইজ এ ডিসগ্রেস। আহা ! হাতে ঘি লেগে আছে যে ! থাক না। সো হোয়াট ! এই তো আমি তুলছি। আমার গেলাসটা তিনি বারকতক তুললেন আর নামালেন। এক, দুই, তিন। গৃহস্বামীকে বললেন, কিছু বলার আছে ? বলার আর কি থাকতে পারে ? অত ঝামেলা জানলে কে আর সাধ করে এগিয়ে আসত ! তিনি এমন একটা মুখ করে চলে গেলেন যেন, আপনার পাঁঠা আপনি বুঝুন। আমার কি ?

আমি সেই পাঁঠা, রোমেল হবার ব্যর্থ চেষ্টায় পেট খামচে বসে আছি। দোতলার বারান্দা থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন, কি হল কি তোমার ? ওখানে লাট খাচ্ছ ?

জীবনীকার লিখছেন রোমেল মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন কিন্তু কখনও ঊর্ধ্বতনের কাছে গিয়ে নাকে কাঁদতেন না, আমার মাথা ঘুরছে, পেট ব্যথা করছে। সুতরাং উত্তর, না কিছু হয় নি ত !

তবে কি জৈন ধর্ম অবলম্বন করেছ ? মশাকে রক্ত খিলাচ্ছ ?

তেড়েফুড়ে উঠতে গিয়ে লাট খেয়ে পড়ে গেলুম। চেতনায় ভাসতে ভাসতে মনে হল মচকাব তবু ভাঙব না। তারপর আর কিছু মনে রইল না। কঠোর মানুষ যখন কোমল হন তখন একেবারে কুসুমের মত হয়ে যান। সে প্রমাণ এ সংসারে মাঝে-মাঝে পাওয়া যায়।

পরের দৃশ্যে নিজেকে দোতলার বিছানায় আবিষ্কার করলুম। ঘরে দুই বিশাল ছায়া। পিতাঠাকুর আর মাতামহ। দু'জনে একটু ঝগড়ার ভাবেই রয়েছেন মনে হল। দাদু বলছেন, তোমাদের নিয়মটা বাপু বুঝি না, হোমিওপ্যাথি দিয়ে শুরু, বিভূতিতে শেষ। ওই করে আমার মেয়েটাকে মারলে।

আমি মারলুম না আপনার কবরেজে মারল ?

কবিরাজে মারে না হরিশঙ্কর, একেবারে শেষের সময় প্রদীপ যখন নিবু নিবু তখন ডাক্তার গুডিভ এলেও কিছু করতে পারতেন না।

আপনি মাননীয়, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আপনি বসুন, আমি শ্যামবল্লভকে কল দিয়ে আসি।

আমার মনে হয় নগেন কবিরাজই ভাল হত। নাড়িতে একবার আঙুল রেখেই ধরে ফেলত বায়ু, পিত্ত কি কফ ! কোন নাড়ি অতি প্রবল। এ ব্যাপারে অবশ্য কথা বলা মানেই অনধিকার চর্চা। তোমার পাঁঠা, তুমি ন্যাজেই কাট আর মুড়োতেই কাট কিছু বলার নেই, তবে মেয়ের ছেলে ত, একটি মাত্র নাতি। মড়ার মত পড়ে থেকে দু'জনের বাক্যালাপ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, জামাই আর শ্বশুরমশাইয়ের সম্পর্ক কখনই মধুর হয়না। এক ধরনের শত্রুতা থেকেই যায়। সুযোগ পেলেই ঠুসঠাস। এপক্ষ

।পক্ষকে একটু আঘাত করতে পারলেই বড় খুশি। অপদস্থ মাতামহকে পাশে রেখে পিতৃদেব হামিওপ্যাথকে কল দিতে ছুটলেন।

ঘর খালি হতেই দাদু বললেন, নিজের মনেই, বড় একরোখা। কারুর কথাই শুনতে চায় না। অনেকটা আমার মতই। তেঁটিয়া স্বভাবের। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কপালে আঙুল রেখে ড়িব-বিড়ির করে নাড়াতে লাগলেন। চোখ পিট-পিট করে দেখলুম ঠোঁট নড়ছে। বীজমন্ত্র চলেছে। কালীনামের গণ্ডী পড়ছে চারপাশে। জগদম্বা বলে ভীষণ এক হুঙ্কার ছাড়লেন। চোখ খুলে গেল।

কি রে ব্যাটা?

পেট ছেড়েছে দাদু। তিন দিনে, তিন জামবাটি আলোচালের ফ্যান খেয়েছি। আধসের ছোলা, একপো চীনেবাদাম। মাতামহ হাঁ হয়ে গেলেন। সর্বনাশ! ভাগলপুরী ধুম্বো গাইয়ের খোরাক যে রে বাপ! তা একেবারে আলোতে গেলি কেন? সেদ্ধ দিয়ে শুরু করলে কি হত!

গণেশের মায়ের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। বিধবা মানুষ। একবেলা আলোচালের ভাত খান, আলু, কাঁচকলা, পেঁপে ভাতে দিয়ে। সেদ্ধর ফ্যান পাচ্ছি কোথায়!

দাঁড়া, ও ব্যামোর ওষুধ আমার কাছে আছে। শরীর গরম হয়ে গেছে। শীতল করতে হবে। ভাল খাওয়া আছে! রান্নাঘরে ঘিয়ের টিন ছিল। ঘি তেল মোটামুটি ভালই চলে এবাড়িতে। ভোগী আর যোগী দুতরফেরই ঘৃত বিধি। ভোগেও ঘি, যোগেও ঘি। এক চামচে কাঁচা গব্যঘৃতের সঙ্গে একটু কাশীর চিনি মেড়ে দাদু আমার মুখে ফেলে দিলেন। মাতামহের ওপর অপার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে সেই অপূর্ব খাওয়াই গিলে ফেললুম। সন্দেহ রইল, মরে না যাই। শুনেছি ব্যাসিলাই ডিসেনট্রি বড় সাংঘাতিক অসুখ। পাহাড়ে পর্বতে বহু বড়বড় সাধু ওইতে দেহত্যাগ করেছেন। খুবই অপমানজনক মৃত্যু। ব্রহ্মতালু ফেটে শ্রীশ্রী আটলক্ষ বাবার মহাসমাধি নয়।

প্রবীণ হোমিওপ্যাথ যখন এলেন তখন আমাদের ঘি-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আমরা তখন হরিদ্বারে কালীকমলির ধর্মশালায় সবে গিয়ে পৌঁছেছি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার হর হর শব্দে দু'জনেই বিভোর। স্টেশন থেকে বেরোলেই চৌমাথায় মহাদেবের মূর্তি। ঘটি ধরা একটি হাত মাথার ওপরে তোলা। অবিরাম জল পড়ছে হুড়হুড় করে। সেই পাথরের শিবই দাদুর চোখে আসল শিব। থাকেন আর আহা, আহা করে ওঠেন। হ্যারা হ্যারা শব্দে জল পড়ছে।

ডাক্তারবাবু ছোটখাট খড়খড়ে মানুষ। ভারি উজ্জ্বল চেহারা। নিজের হাতেই হাজার খানেক ওষুধ, তাই বয়েস হার মেনেছে যেন। একযুগ আগে যে চেহারা ছিল এখনও তাই বজায় আছে। একটুও টসকায় নি। কুচকুচে কালো চুল। ধবধবে শরীর। ধবধবে সাদা ধুতি, সিল্কটুইলের শার্ট। উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ। হাতে ওষুধের বাক্স। গলায় বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র, ছেলেবেলায় খোকাবাবু বলতেন, এখনও তাই। খোকার এদিকে গোঁফ বেরিয়ে বসে আছে, বাবা হবার হাঁকডাক চলেছে রক্ত নদীর ধারায় ধাবায়। সিরসিরিয়ে যৌবন এসেছে। চাহনি তেরছা হয়েছে।

কি হয়েছে খোকাবাবু?

সারা বছরের আমার অসুখ-বিসুখের একটি নির্ঘণ্ট পিতা ঠাকুর করেই রেখেছেন। সিজন শুরু হয় অকটোবরে। শিশির এল, শিউলি এল, টনসিল তেউড়ে উঠে ঘুংরি কাশি। নভেম্বরে সর্দি জমে শ্বাসকষ্ট, ঘুসঘুসে জ্বর। ডিসেম্বরে হাঁপানি। সারারাত গলায় অর্গান বাজছে, খণ্ডন ভব বন্ধন জগ। জানুয়ারি জকারান্ত শব্দ সুতরাং জ্বর হবেই। কেঁপে কেঁপে আসবে ঘাম দিয়ে ছাড়বে। এই ভাবেই ঋতুর রথচক্রে ব্যাধিচক্র বাঁধা। আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। উত্তর দিলেন অভিভাবক।

পাতকোতলায় দাঁত ছিরকুটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, মনে হয় হিস্টিরিয়া।

ফ্যামিলিতে হিস্টিরিয়ার হিসট্রি আছে না কি?

এ বংশে নেই, যদি থাকে মাতুল বংশে।

মাতামহ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, কি বললে হরিশঙ্কর? গঙ্গানারায়ণ মুকুজ্যের বংশে

হিস্টিরিয়া ? নিজেদের দিকটা ভাল করে খুঁজে দেখ। মনে পড়ে তোমার মেজ ভাই কালাজ্বরে ফৌত হয়ে গেল।

আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় জিওগ্রাফি। আসামের জঙ্গল থেকে ধরিয়ে এসেছিল। আপনি গেলে আপনারও হত।

তা হলে তোমার বড় ভাই কেন দোতলার বারান্দা থেকে লাফ মেরে অণ্ডকোষ ফেটে মারা গেল ?

আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় শাইকোলজি। অত বড় ব্যবসা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আপনি মনুমেণ্ট থেকে লাফ মারতেন। তা হলে, তোমার মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গিয়ে টাক বেরিয়ে পড়ছে কেন ? এই বয়েসেও আমার চুল দেখ। আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় ব্যাড মেনটিনেন্স। ম্যানেজমেণ্টের ব্যাপার। যত্ন আর তদারকির অভাব।

সাধুদেব জটা দেখেছ ? তারা চুলের কি যত্ন করে হরিশঙ্কর ?

আপনি অন্য লাইনে চলে যাচ্ছেন। তাহলে বলতে হয় আপনারা সকলে অকালপক্ক কেন ?

অকালপক্ক ? হাসালে। পঁয়ষট্টিতে চুল পাকবে না ? চুলের বাবা পাকবে।

তাহলে ওই দেখুন, আমাব পিতাঠাকুরেব ছবি। কুচকুচ করছে একমাথা কালো চুল।

ওটা কলপ হরিশঙ্কর। গোঁফ জোড়া দেখেছ ? পেকে ফটফট করছে।

ডাক্তাববাবু মৃদু হেসে বললেন, আপনারা কি আরম্ভ করলেন দু'জনে। শুনুন, শুনুন, হিস্টিরিয়া হল মেয়েদের অসুখ। কোথা থেকে কোথায় চলে গেলেন !

পিতৃদেব অম্লান মুখে বললেন, ওকে আমি পুরুষ বলে মনে করি না, মহিলা, এফিমিনেট স্বভাবের। চুল আঁচড়াচ্ছে ত আঁচড়াচ্ছেই, গালে রুমাল ঘষছে ত ঘষছেই। ভাল করে গোঁফ পর্যন্ত বেরোল না। মাতুল বংশেব দিকে চলে গেছে। চুলের বাহাব দেখেছেন। খোঁপা বাঁধলেই হয়।

দাদু বললেন, ওহে হরিশঙ্কর, এক তরফা খুব ত বলে যাচ্ছ, ফাঁকা মাঠে হারোয়া লাঠি ঘুরিয়েই চলেছ। আমার মুখেব দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। গোঁফজোড়া দেখেছ। দেউড়ির দরোয়ানকেও হার মানায়।

আপনার কথা আলাদা। আমি বলেছি মাতুল বংশ।

মাতামহ ছাড়া মাতুল আসে কোথা থেকে বৃন্দাবনচন্দ্র !

আমার নাম হরিশঙ্কর। নাম বিকৃত করা আপনার এক বদস্বভাব। শাস্ত্র বলছেন, নরানাং মাতুলক্রম, মাতামহক্রম নয়। ধর্মের পথে আছেন যখন একটু শাস্ত্রটাস্ত্র উলটে দেখলে লাভ বৈ লোকসান হবে না।

ডাক্তারবাবু এবার বেশ সশব্দে হাসলেন, স্ত্রী বিয়োগ হলে মানুষের মস্তিষ্ক যে বিকৃত হয়, আপনারাই তার প্রমাণ।

তার মানে ? দুজনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন। আমরা পাগল ?

পাগল বললে ভুল হবে, সামান্য ছিটগ্রস্থ। সামান্য বিষয় নিয়ে যে ভাবে কচলাকচলি করছেন দু'জনে ?

দাদু বললেন, প্রতিবাদ কর হরিশঙ্কর, প্রতিবাদ।

আই প্রোটেস্ট, কে বলেছে স্ত্রীবিয়োগ হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আপনার হ্যানিম্যান সায়েব ? মুকুজ্যেমশাই আপনি কত বছর উইডোয়ার ?

তা হবে, বছর তিরিশ তো হবেই।

আমার হাফ, প্রায় পনের বছর। আমার কি ইনস্যানিটি আপনি দেখলেন ?

দাদু ভাল মানুষের মত মুখ করে বললেন, কিছুই না, যা ছিল তাই আছে।

তার মানে ? পিতা ঠাকুর আবার তেড়ে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু ওদের দু'জনকে অগ্রাহ্য করে এবার আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বাপু ? সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, উনি এইভাবেই কথা বলেন। রোগীদের মনে হয় বয়স বাড়ে না। যতটা সম্ভব চাপা গলায় বললুম, রক্ত আমাশা।

রক্তআমাশা ? পিতৃদেবের কান এদিকেও ছিল, লাফিয়ে উঠলেন, হরিগিরির ডালবড়া, বাজার থেকে যারা কাঁচা-পয়সা পকেটে গজগজ করছে, ডালবড়া চলছে, ফুলুড়ি চলছে, কচুরি, ঘুগনি চলছে, পেটের আর দোষ কি ! নাও এবার তিনমাস বিছানায় লটকে পড়ে থাক। পিতার হোটেলে। দাদু সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

ডাক্তারবাবু শান্ত গলায় বললেন, আহা, আপনারা অত উতলা হচ্ছেন কেন ? আমাকে যখন আনলেন, একটু দেখতে দিন। তা বাবা, কি খেয়েছিলে ? কোনো গুরুপাক কিছু ?

দাদু চোখ টিপলেন। অর্থাৎ ফ্যানের কথাটা গোপন রাখ।

আজ্ঞে না, তেমন ত কিছু খাই নি।

পিতৃদেব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, মিথ্যে কথা। কার্য না থাকলে কারণ থাকে না। কিছু না খেলে কিছু হয় না। একে লিভার নেই, তার ওপর গোটা চল্লিশ ডালবড়া, তার ওপর কনস্টিপেসান, যাবে কোথায় ? বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ঘুঘু তোর–।

তুমি তখন থেকে অত ডালবড়ার দিকে ঝুঁকে আছ কেন বল ত ? মাতামহের প্রশ্ন।

আমি ওর যে উইকনেস জানি। আপনার যেমন ছোলার ডাল আর লুচি ওর তেমনি ডালবড়া।

এটা তুমি ঠিক বলেছ হরিশঙ্কর। চাপ চাপ ছোলার ডাল, আর গোটা চল্লিশ ফুলকো ফুলকো লুচি আর শেষে তোমার হাতের ঘি চপচপ হালুয়া। আহা ওটা তুমি যা বানাও না ! খেতে খেতে মনে হয় কে যেন পটাপট, পটাপট কাথবার্টসন হার্পারের বাড়ির জুতো হাঁকড়াচ্ছে গালে। অনেক দিন হয় নি, একদিন যাক।

আড়চোখে একবার দেখে নিলুম, পিতাঠাকুরের মুখ নিমেষে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। স্বভাব অনেকটা রের মত। অল্পেই তুষ্ট। মাতামহ এইমুহূর্তে খুবই মনের মানুষ। মোহনভোগ বস্তুটিতে বাবা সিদ্ধিলাভ করেছেন। বড়ে গোলাম আলি যেমন মালকোষ রাগে। সুজি শুকনো কড়ায় কতক্ষণ নাড়তে হবে, কখন, কতটা ঘি দিতে হবে, প্ল্যাস্টারের মশলার যেমন ভাগ আছে, এতটা বালিতে এতটা সিমেনট, সেই রকম চার কাপ সুজিতে এক কাপ চিনি, ফোর ইজ টু ওয়ান, জলের মাপ আরও সাংঘাতিক, একটু এদিক ওদিক হলেই মোহনভোগ হয়ে যাবে লেই। মোগলাই ব্যাপার। ময়ূর সিংহাসনে বসে বাদশাহরা খেতেন সুমটানা চোখে।

পিতাঠাকুর মহোৎসাহে বললেন, হলেই হয়। আজই হতে পারে। রাতে আমার মনে হয় রোগীর পথ্য হবে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা চারখানা লুচি আর একটু নুন। কি বলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু বললেন, হতে পারে, তবে রুগীকে ত এখনও ঠিক মত দেখাই হল না।

আমি মনে মনে বলছি, হে ডাক্তারবাবু বাগড়া দেবেন না। দাদু বললেন, এর আর অত দেখার কি আছে ! ইয়ংম্যান পেটটা একটু ছেড়েছে। তা ছাড়ুক না। এক ডোজ অ্যাকোনাইট থ্রি এক্স দিলেই ত মিটে যায়।

অ্যাকোনাইট থ্রি এক্স দোব কেন ? মার্কসলও ত দিতে পারি।

পিতাঠাকুর বললেন, হোয়াই নট মার্কুরি !

মাতামহ বললেন, হোয়াই নট নাক্সভম !

ডাক্তারবাবু খুট্‌স করে ওষুধের ব্যাগ বন্ধ করে বললেন, আমি উঠি। রোগের চেয়েও আপনারা মারাত্মক। চিকিৎসা আপনারাই করুন।

কুছ পরোয়া নেহি। মাতামহ উল্লাসে ফেটে পড়লেন। বেশ গুঁট জলে ফুটিয়ে, তোকমারি দিয়ে মেড়ে, চিনি সহযোগে প্রাতে সেবন করিয়ে দোব। মধ্যাহ্নে পেট সিলমোহর করা লেফাফা।

তোকমারি ? সে ত ফোঁড়া ফাটায় ! আপনি ভুল করছেন। পিতার সংশয়।

ভুল করব কেন, ওই তো সাদা, সাদা, হড়হড়ে, ভু, ভু··· । আটকে গেলেন। স্মৃতি কমছে। বয়েস।

ইসবগুল, ইসবগুল। ডাক্তারবাবু তীব্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, আসল বস্তুটির নাম বলে দিলেন। তা

দিতে পারেন, ভালই হবে। এমনিই লুজ আরো লুজ হয়ে যাবে।

তুমি ডাক্তারির কিস্যু জান না।

হতে পারে। তবে আপনিও যে খুব বেশি জানেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

দাদুর মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি খেলে গেল। তিনি ডাক্তারি থেকে সরে, আধ্যাত্মিক লাইনে চলে গেলেন। আচ্ছা ডাক্তার তুমি ত সব তীর্থ ঘুরে এসেছ, কৈলাস, মানস, অমরনাথ, গঙ্গোত্রী। বেশ, বলো দেখি স্বয়ম্ভু পৃসন কাকে বলে?

ডাক্তারবাবু বললেন, পারব না মুকুজ্যেমশাই! শাস্ত্রজ্ঞানে আপনার জুড়ি নেই। আমি জানি, নাক্‌স, ইপিকাক, অ্যালো, **জেলসিমিয়াম**। আমি ঘুরি দেশ দেখার ধান্দায়। আপনি খোঁজেন ভারতাত্মা, আমি খুঁজি মানবাত্মা।

হাঃ হাঃ তাই বল। তাহলে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ কাকে বলে তাও নিশ্চয় জান না!

আজ্ঞে না।

সেই শঙ্খ গভীর রাতে আপনি বাজতে থাকে। সাধকের ইড়া, পিঙ্গলায় তখন ওঁকারধ্বনি ওঠে।

ডাক্তারবাবু ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বসতে বসতে বললেন, তাহলে অ্যাকোনাইট থ্রিএক্‌সই দিয়ে যাই।

দাদু বললেন, দেবেই ত, দেবেই ত। ও ছাড়া আর কোনও ওষুধই নেই। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের মত আমার মুখ দিয়ে বেটি ঠিক ওষুধের নামটি বের করে দিয়েছে। জান ত সিদ্ধপুরুষের বাক্যে বজ্রপাত হয়। ত্রেতায় হত, দ্বাপরে হত। মহাকলিতে সব গেছে। এক ডোজ ওষুধ দাও না ডাক্তার যাতে কুলকুণ্ডলিনীটা খুলে যায়।

মাতামহ প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু এক পুরিয়া ওষুধ বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার জিভে উজাড় করে দিলেন। দাদু বললেন, এক একটা গুলি, এক একটা বীজমন্ত্রের মত পেটে পড়ে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিক। ডাক্তার তোমাকে নয়, তোমার বিশ্বাসকে আমি ভক্তি করি। এবার যখন পাহাড়ে যাবে আমার জন্যে একটু শিলাযুত আর এক ডেলা মৃগনাভি আনবে।

আচ্ছা মনে থাকবে, বলে ডাক্তারবাবু চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের বাইরে প্রায় চলে গেছেন, দাদু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, ডাক্তার, ডাক্তার আহারের বিধানটা দিয়ে গেলে না?

সকালে উপবাস। মিছিরির জল চলতে পারে। রাতে টাকা সাইজের চারখানা লুচি, নুন দিয়ে লুচি ভাজার আগে ঘিয়ে কয়েক কুঁচি আদা ভেজে নেবেন। এত ভজঘট করবে কে?

পিতাঠাকুর হাঁটুতে তাল ঠুকে বললেন, কেন আমি!

আপনার অফিস?

অফিস আগে, না ছেলে আগে ডাক্তার!

শ্যামবল্লভ মৃদু হেসে চলে যেতেই মাতামহ বললেন, দাঁত থাকতে লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। কি এখন তোমার মনে হচ্ছে না হরিশঙ্কর, স্ত্রী বেঁচে থাকলে কত সুখে থাকতে পারতে?

আজ্ঞে না, সুখ আমার জীবনে নেই। আমি জন্মেছি বেঁচে থাকার মাশুল দিতে। ওর মা বছর তিনেক সুস্থ ছিল, তারপরই ত শয্যাশায়ী। সারা জীবন আপনি ঘি খেয়ে, দুধে কাঁঠালের ক্ষীর খেয়ে তীর্থ আর মহাপুরুষ করেই কাটিয়ে গেলেন। ছেলেমেয়ের কথা যদি একটু ভাবতেন?

বলো কি হরিশঙ্কর?

হরিশঙ্কর ঠিকই বলে, কারুর পরোয়া করে না। আপনার মেয়ের মত অত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মহিলার সংসারধর্ম করতে আসাটাই অন্যায় হয়েছিল। আমাকে অনাথ করে, স্মৃতিটুকু ফেলে রেখে চলে গেল ড্যাং ড্যাং করে। স্বার্থপর, সেলফিশ, এসকেপিস্ট। ওপরে গিয়ে একবার দেখা হলে আমি গায়ে গায়ে শোধ তুলব। নাঃ, ওপর বলে ত কিছু নেই! সবই এখানে। সবই এখানে। হিয়ার, হিয়ার অ্যাণ্ড হিয়ার। চোখে জল। দু'জনের চোখেই জল।

কৌপীনবন্ত : খলু ভাগ্যবন্ত

কোমরের কাছ থেকে ছোট্ট একটুকরো কাপড় বের করে পিতৃদেব চোখ মুছলেন। আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিলেন। উঃ পিতা হবার কি জ্বালা! আমার মত সৌভাগ্যবান ক'জন আছে। জন্মেই মরুভূমি। ধরে বেঁধে রাখার মত কেউ কোথাও নেই। পরিস্থিতি লম্বা আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করছে, পিণ্টু, লোটাকম্বল। কৌপীনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং। জয় শিবশম্ভু, উখার দে মকান, লাগা দে তম্বু। চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, আর এক গৌতমবুদ্ধ। মানুষের কি কষ্ট। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মানুষ জেরবার হয়ে গেল। এ থাকে ত ও যায়, ও থাকে ত এ যায়। কি যে কেলোর কীর্তি চার দিকে। প্রবীণরা এসে মাঝে মাঝেই শুনিয়ে যান, হরিশঙ্কর, তোমরা শুনলে না তখন, এই ভূতের বাড়িতে এসে ঢুকলে! অত বড় সংসার, একে একে সবাই চলে গেল। এখন বংশে বাতি দেবার মত কেউ থাকে কি না দেখ! হরিশঙ্কর তখন বুক ফুলিয়ে বলেন, কেউ না থাকে আমি থাকব। সেই ছাত্রজীবনে বাঙলার শিক্ষক আমাদের চাঁদসদাগর পড়াতেন, হাতে লাঠি নিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছেন সদাগর, সব গেছে তবু নতি স্বীকাব করব না।

মাতামহ অনেকটা টর্পেডোর ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে পড়ে জামাইয়ের দিকে এগিয়ে এলেন। ধরা ধরা গলায় বললেন, হরিশঙ্কর আমার এই জিভ, আমার এই নোলায় একটু ছেঁকা দিতে পার! সামনে জিভ ঝুলছে লকলক করে।

পিতা বললেন, ওটাকে আপনি ভেতরে গুটিয়ে রাখুন। ছেকা দেবার ব্যবস্থা আমি করছি। তার আগে হিসেবটা লিখে নি।

দাদু চেয়ারে বসে গান ধরলেন, এখনও কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত।

পিতা ক্যাশ বাক্স খুলে সেই বিখ্যাত হিসেবের খাতাটি খুললেন। যার পাতায় পাতায় প্রতিদিনের হিসেব লেখা। পাই পয়সার এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। প্রতিদিনের হিসেব মেলাতে গিয়ে একটি কথা লিখতেই হবে, শর্ট, এত পয়সা। পাশে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বড়ই সন্দেহ। কেন শর্ট? কে মেরেছে? আমি নয় ত! মিথ্যে বলব না, দু এক দিন মেরেছি। বেশ নরম করে ভাজা বোকাদার দোকানের ডিমের ওমলেট বড়ই সুস্বাদু! মনের ওপর এখনও যে তেমন সংযম আসে নি। একটু আধটু এদিকে, সেদিকে পা ফেলে। কিন্তু সে ত মাঝে মধ্যে। তা হলে রোজ শর্ট হয় কি করে ' কে জানে? এ দিকে শুনি হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না।

ডাক্তারবাবুকে দু'টাকা ভিজিট দিয়েছেন। সকালে নর্দমা সাফ করার লোক এসেছিল, তাকে এক সিকি। ভিখিরি এসেছিল, দুপয়সা। ওয়েস্ট নট ওয়াণ্ট নট। চুল চেরা ব্যাপার। আমি যদি সত্যি বুদ্ধদেব হতুম, তাহলে কবে বোধিবৃক্ষের তলায় গিয়ে বসতুম। রোজ এই সব ছোটখাট অপমান। বাজার থেকে পয়সা মেরেছি। অসুখে পড়ে ডাক্তার খরচ করিয়েছি। অহঙ্কারে লাগে। আবাব মহাপুরুষরা বলছেন, অহঙ্কার কি রে ব্যাটা!

> পাঁড়ে ন করসী বাদ-বিবাদ। যা দেহী বিন সবদ না স্বাদ।
> অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড ভী মাটী। মাটী নবনিধি কায়া।

আরে পাঁড়েজি তর্কাতর্কি মাত করো। এই দেহে শব্দ নেই, স্বাদ নেই, স্রেফ মাটি রে ভাই। অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ড সবই মাটি। ওই যে আমার পিতৃদেব টাকা টাকা করছেন, ওঁর কানের কাছে আমি যদি নাকি সুরে দু'কলি গেয়ে উঠি;

> মন রে রতন কাগজ কা পুতলা।
> লাগে বুঁদ বিনসি জাই ছিল মৈঁ গরব করৈ ক্যা ইতনা॥

মন রে, ধন রত্ন সব কাগজের খেলনা। বুদ্বুদ এই উঠছে এই মিলিয়ে যাচ্ছে। এত গর্ব কিসের!

আর কিছু না পাবি বেশ দু'চারটে শ্লোক, দোঁহা টোঁহা মুখস্থ করে, পিপুল পাকা অবস্থায় পৌঁছে

গেছি। নাকে রসকলি করে সামনে পুঁথি খুলে কথকতায় বসলেই হয়। গলায় গাঁদাফুলের মালা, সামনে মরা, আধমরা, বড়ি খোঁপা, পানদোক্তা খাওয়া হরেক মেজাজের এক পাল বিধবা।

মাতামহ বেশ তারিফের গলায় বললেন, বড় ভাল অভ্যাস হরিশঙ্কর! মরো আর বাঁচো রোজ হিসেবটি লিখে যাবে। নিজেকে সংযত রাখার এর চেয়ে ভাল রাস্তা আর কিছুই নেই। ওড়ার আগেই ডানাটি কেটে ফেল। খাতার দিকে তাকাও আর শামুকের মত গুটিয়ে যাও। মহাত্মা গান্ধী শুনেছি রোজ হিসেব লিখতেন। সাধে স্বাধীনতা আনতে পেরেছিলেন! ইংরেজ বললে, বাবা বড় সাংঘাতিক লোক কাপড় হাঁটুর ওপর তুলেছে। আরো ওপরে তোলার আগেই সরে পড়।

আপনার সব ভাল, মাঝে মধ্যে এই যে একটু গ্রাম্য হয়ে পড়েন, তখনই পিত্তি চটে যায়। হচ্ছে হিসেবের কথা, চলে গেলেন মহাত্মা গান্ধীতে। উত্তর পশ্চিম জ্ঞানের বড়ই অভাব।

তুমি ঠিক বলেছ হরিশঙ্কর। আমার মুখটা একটু আলগা। এক একটা কথা ফস করে মুখ দিয়ে বেরোয়, চমকে চমকে উঠি। রিভলভারের গুলির মত বেরোবার সময় ধাক্কা দিয়ে যায়। তখন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করি, ওরে তোর মুখ না পেছন? অ্যাই, অ্যাই দেখ, যেই বললুম অমনি ধাক্কা খেলুম। উপমাটা তেমন সুবিধের হল না। মুখকে যার সঙ্গে তুলনা করলুম, সে জায়গাটা খুব সভ্য নয়।

কে আপনাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে?

কেউ বলে নি। তোমাকে দেখালুম আমি একেবারে গবেট নই। বোধবুদ্ধি আছে, কেবল অভ্যাসটা নেই। ঢলকো ছিপির মত! কি রাগ করছ না কি? রেগে গেলে তোমার আবার জ্ঞান থাকে না। ভুলে যাবে, আমি তোমার শ্বশুরমশাই। এখুনি বলবে, আপনি তাহলে আসুন। আমার লুচি-হালুয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বেটির সামনে আসনে বসে মন আর কিছুতেই স্থির হবে না। হরু পাগলার মত গাইতে হবে

থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই
কোথা তোর রাঙা চরণ, ভাসছে চোখে মণ্ডামেঠাই।
থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই।

খাতা ক্যাশ বাকসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চাবিটি লাগাতে ভুল হল না। দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আহারাদি তা হলে আজ এখানেই হোক।

গান থেমে গেল। লাজুক লাজুক মুখে বললেন, স্বপাকে ভাতে ভাত খাই, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। ওরে কাঙাল ভাত খাবি? না, হাত ধুয়ে বসে আছি। তা, কি কি পদ হবে হরিশঙ্কর?

ধরুন খুব সরু চালের ভাত। তার ওপর পরিমাণ মত গব্য ঘৃত।

আহা, আহা!

পালং শাক পোস্ত দিয়ে ভাজা।

বড়ি আর মুলো পড়বে?

পড়বে।

তোফা তোফা।

সোনা মুগের ডাল।

বলো কি?

পাকা রুই মাছের কালিয়া।

কেয়া বাত, কেয়া বাত।

একটু চাটনি আর দই।

সর্বাঙ্গ সুন্দর।

কিন্তু কে করবে?

কে করবে? হ্যাঁ তাও তো বটে, কে করবে? এ তো শ্মশান ভূমি। চারদিক হা হা করছে, খাঁ খাঁ। তা হলে বললে কেন?

স্বপ্ন দেখালুম মুকুজ্যেমশাই। দিবা স্বপ্ন।

তা হলে কি হবে ?

জগা খিচুড়ি। চালে, ডালে, লাউ ডাঁটায়, আলুতে, পটলে এক মহা সম্মেলন। কি, দুঃখ হচ্ছে ?

কিছু মাত্র না। দুঃখু কিসের ? মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পানিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্ত কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ বুঝলে হরিশঙ্কর।

হ্যাঁ, বুঝলুম বই কি। হীন বল ভারতীয়ের ভাগ্যের সঙ্গে সহজ রফা। পুরুষকারের অভাব। ওর সঙ্গে যোগ করুন তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরোহপি সহিষ্ণুনা, লেংটি পরে লটকে বেড়াই, মুখে কেবল কথার বড়াই। যা বলেছি তাই হবে। নো ট্রাকস্টার অ্যাণ্ড হাকস্টার উইথ ফেট।

তুমি কথায় কথায় বড় ইংরেজী বল সায়েববাচ্চার মত। ওই ভাষাটা আমি আবার তেমন বুঝি না।

এ হল তাদের ভাষা যারা কর্মযোগে বিশ্বাস করে। যারা লেংচে চলে না। মার্চ করে।

সবই বুঝলুম হরিশঙ্কর, তবে কি না নাতিটার পেট ভাল নেই, এতগুলো পদ রাঁধবে, আর আমরা খেলিয়ে খেলিয়ে খাব, সেটা কি ঠিক হবে ?

ওর জন্যে আমি বেলের মোরব্বা তৈরি করব।

আহা বড় ভাল জিনিস ! আমাকেও দিও কিঞ্চিত, না কোরো বঞ্চিত। তা হলে এখন একটু চা হোক। চিনির বদলে আমাকে গুড় দিলেও চলবে।

কেন, চিনির অভাব আছে নাকি ? আপনার মেয়ে নেই, ঠিক আছে। নেই তো নেই, আমি তো আছি !

অ্যাঁ, তুমি এত বড় কথা বললে ? আমার পুত্র, পুত্রবধূ যে কখনও এমন কথা বলতে পারলে না। পায়ের নিচে এখনও তা হলে জমি আছে ! হরিশঙ্কর জমি তা হলে আছে ?

আলবাৎ আছে। আপনার মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি। আজ নেই বলে বলছি না, থাকলেও বলতুম। সে ছিল দেবী। আপনি তার কিস্যুই জানেন না। আনইয়ুজুয়াল ডটার অফ নট সো ওয়ার্দি এ ফাদার।

একটু বাঙলা করে বলো হরিশঙ্কর। শুনতে বড় ভাল লাগছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে।

বাঙলা করলে শুনতে আর তেমন ভাল লাগবে না।

তা হলে ইংরিজীই থাক।

হ্যাঁ, সেই ভাল, হোয়্যার ইগনোরেনস ইজ ব্লিস দেয়ার-।

উঃ, সব ভাল ভাল কথাই তুমি ম্লেচ্ছ ভাষায় বলছ, আচ্ছা তোমার সংস্কৃত আসে না ?

আসে, তবে ইংরিজীর মত নয়। ইংরিজীতে বেশ মোলায়েম করে গালাগাল দেওয়া যায়।

তুমি কি তা হলে এতক্ষণ গালাগাল দিচ্ছিলে ?

কুঁচো নিমকি আর চা দিয়ে স্টার্ট করা যাক। কি বলেন ?

ওঃ ফার্শক্লাস ! কালো জিরে দেওয়া ?

হ্যাঁ পূর্ণাঙ্গ জিনিস।

নাতিটা ডাল বড়া।

পিতৃদেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মত হেসে বললেন, কি বুঝছ পান্তুরানী ?

বেশ জমেছে।

এ রকম জামাই তুমি ভূ-ভারতে পাবে না। আনন্দ, আনন্দ। আজ যেন আনন্দের হিল্লোল বইছে ! বেটি কোন্ দিন যে কি করে দেয় ! এই কাঁদাচ্ছে, এই হাসাচ্ছে ! এই রাজবেশ, এই কৌপীন। এই মহাভোজ, এই উপবাস।

তবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে
সে জন না যায় তীর্থ পর্যটনে

খুব জোর গান ধরেছিলেন। বিভোর ভাব। গায়ে হাফ হাতা পাঞ্জাবি। পইতেটি সামান্য বেরিয়ে আছে।

দরজায় পিতৃদেবের মুখ দেখা গেল, স্টপ, স্টপ, পরমানন্দময়ী হরিমটর ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা রাখেন না, উঠে পড়ুন। এখন আর মিউজিক নয়, মাস্‌লসের খেলা চলবে। বাটনা বাটতে পারেন?

ভাব জগৎ থেকে দমাস করে বাস্তবজগতে আছাড় খেয়ে মাতামহ কেমন যেন হয়ে গেলেন। তবু হাসি হাসি মুখে বললেন, ওই শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে তারপর গড়াগড়ি করে মাখামাখির ব্যাপার ত.! জীবজগতে অহরহ যা চলছে? আহা, জাঁতা ঘুরতে দেখে কবীর দাস একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন। জাঁতার দুটো ফাটার মধ্যে পড়লে কেউ কি অক্ষত থাকবে রে ভাই,

চলতী চক্কী দেখিকে দিয়া কবীরা রোয়

দুই পট ভীতর আয়কে সবিত গয়ান কোয়।

এ আপনার জাঁতা কলে জীবজগত নয়, হলুদের কথা হচ্ছে। চলে আসুন। চা ছাঁকতে পারেন?

তা আর পারব না! কিন্তু তুমি যে বললে সেই কালো জিরে দেওয়া কুঁচো নিমকির কথা! ভুলে গেলে না কি?

আপনার ওই পরমানন্দময়ীব জগৎ ছেড়ে বেরোতে পারলেই সর্বপ্রকার জীবানন্দ পাবেন।

তুমি বড় নাস্তিক হে হবিশঙ্কর, কিছুতেই তোমার বিশ্বাস আসে না!

আমি কালাপাহাড; বলে পিতাঠাকুর অদৃশ্য হলেন। মাতামহ গেলেন চা ছাঁকতে।

সেই কুঁচো নিমকি আছে আলমারিতে। আঙটায় ঝুলছে সাত লিভারের থাণ্ডার লক। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি। পিতার অফিসের বন্ধুর স্ত্রী এক জার আমের মোরব্বা করে পাঠিয়েছিলেন। ফিনকি ফিনকি করে কাটা, কিসমিস টিসমিস দেওয়া বড় সুস্বাদু বস্তু। রাতে একটু চাখার পর স্বভাবটা কেমন যেন বেড়ালের মত হয়ে গেল। ছোঁক ছোঁক করে মরি। কোনো কাজেই মন বসে না। ঘুরি ফিরি আমের মোরব্বা। সেই কথামৃতের কথা: ঘুরছে ফিরছে, বান্না করছে, চুল বাঁধছে, মন পড়ে আছে উপপতির দিকে। দুপুরেব দিকে একবারই একটু নিয়েছিলুম। বেশি না, চামচে দু এক। ধরা পড়লুম রাতে। মোরব্বার ওপর তখন বিদিগিচ্ছিরি কটি অব কুমড়োব ছক্কা চেপে বসেছে। মোরব্বার জারে কোথায় একটা কি চিহ্ন-ফিহ্ন করা ছিল। খুললেই তিনি স্থানচ্যুত হবেন। জাগতিক দিক থেকে ব্যাপারটা খুবই সামান্য; কিন্তু নৈতিক দিক থেকে অসামান্য।

তুমি নিয়েছ?

যথারীতি উত্তর, আজ্ঞে না ত।

আজ্ঞে না তোও ও!

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটুখানি। এই এতটুকু।

মুখ যতদূর সম্ভব কাঁচুমাচু। সামনে আয়না থাকলে ছিচকে চোরের মতই দেখাত। মাথায় বাবরি, অথচ চোর। সেই পাড়ার প্রসন্নদার মত। গগলস পরে অফিসের টাইপরাইটার চুরি করেছিল। স্যুট আর ঝকঝকে জুতো, চোখে রঙীন চশমা, এদিকে কোমরে কাছি বাঁধা। শ্রী ঘরে চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে। সামনে পেছনে দুই সেপাই চলেছে হেলেদুলে, খইনি মলতে মলতে। একই ত ব্যাপার। বললে, কাপতেন চুরি করে মরেছে। পিতৃদেব বলবেন, ব্যাটার মাথায় চাঁচরঅ চিকুরঅ এদিকে মোরব্বা চুরি করে মরেছে। কদম ছাঁট কি ন্যাড়া চোরে সহ্য হয়। ননীচোরা কৃষ্ণকে দেবতা বলে রেসপেক্ট করা চলে, বস্ত্র হরণ, বাঁশী বাজন, রাধাভিসার, ক্ষমনীয় অপরাধ কারণ তিনি এক গীতাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিৎপাত করে দিয়েছেন। তুমি বাছা কি করেছ? কিন্তু কেমন করে ধরলেন?

কি করে ধরলুম! আমি শার্লক হোমসের বাবা। ঢাকনাটা শেষ প্যাঁচে এনেও আমি আরও একটু চাপ দিয়ে মোক্ষম বাঁধনে বেঁধেছিলুম। যাতে খোলার সময় বেশ একটু বেগ পেতে হয়। লক্ষ্য করেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ কোস্তাকুস্তি করেই খুলতে হয়েছিল।

হোমস বলছেন, অপরাধী অপরাধের জায়গায় সূত্র রেখে যাবেই। তুমি কি করলে, ঢাকনাটা লাগালে

তোমার ক্ষীণজীবী শরীরের দুর্বল হাতে। পার্ফেক্ট ক্রিমিন্যাল পৃথিবীতে আজও জন্মায়নি পিণ্টু। পার্ফেক্ট সাধু কিন্তু জন্মেছেন ; কারণ সতের পথ সোজা। ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইলে তিনি হাত ধরে টেনে নেন। স্বর্গে জায়গা পাওয়া সহজ, নরক গুলজার, সেখানে লাইন দিতে হয়। তা হলে ! সেই লোভ, যে লোভ তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে, সেই লোভের কাছে এই আহুতি।

যজ্ঞে আহুতি দেবার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে পিতৃদেব পুত্রের সামনে নতজানু। সময় মধ্য রাত। বাইরে বসন্তের উতলা বাতাস। সিংহমশাইয়ের চায়ের দোকানের সামনে কাঁচি দিয়ে ভুলোর ন্যাজ ছাঁটা হচ্ছে। আর্তচিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ। আর্য ঋষির মত তিনি বলছেন, পিণ্টুর লোভ প্রজ্জ্বলিত হও, মোরব্বাকে দহন করে চিরকালের জন্যে প্রশমিত হও।

সামনে থেকে সরে যাবার উপায় নেই। পায়ের গোছ চেপে ধরে আছেন। খেতে হবে, পুরোটাই তোমাকে খেতে হবে। খেয়ে অসুস্থ হলে আমি বিধান রায়কে ডেকে আনব। হেলা চরিত্র চাই না, চাই খাড়া স্ট্রেট লাইক পাইন নিডল।

সে স্মৃতি কি ভোলা যায় ! ওয়াটার্লুর যুদ্ধের মত। মাতালের অত্যাচারে ভুলো শেষ। তবু এখনও কুকুর কাঁদলে মোরব্বার কথা মনে পড়ে। চরিত্রও পালটেছে। লোভ আছে, অভিমানে চাপা। খেতে হলে নিজের রোজগারে, নয় ত আকাশবৃত্তি। মাতামহ বলেন, অজগর বৃত্তি। হাঁ করে পড়ে থাকবি। মুখের সামনে এলে গিলে খাবি, আবার চোখ উলটে পড়ে থাকবি।

ঠ্যান্ করে কি একটা পড়ল ওপাশে। পিতাঠাকুরের কিঞ্চিৎ উত্তেজিত গলা শোনা গেল, যাঃ, সব ফেললেন ত। নিন সরুন। খুব হয়েছে। এত কম সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকা যায় ! পৃথিবীর সব ধেড়ে ধেড়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী লোপাট হয়ে গেল। ধূর্ত শৃগাল কিন্তু ঠিক আছে।

মাতামহের অসহায় গলা, কেটলির ঢাকনাটা যে ফট করে খুলে যাবে, বুঝতে পারি নি হরিশঙ্কর !

ধীরে ধীরে উঠে গেলুম। তখন থেকে বড়ই অপদস্থ হচ্ছেন। যে মানুষটির পাল্লায় পড়েছেন তাঁকে চেনা অত সহজ নয়। চাপাতা সমেত এক গাদা লিকার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কেটলি থেকে চা ছাঁকার অভ্যাস না থাকলে ঢাকনা এই ভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

আমি একটু সাহায্য করতে পারি ?

চায়ের কাপে চিনি গুলতে গুলতে পিতা বললেন, তুমি ? তুমি যে উঠে এত দূর আসতে পেরেছ, এই যথেষ্ট। ব্র্যাভো, ব্র্যাভো বলে হাততালি দেওয়া উচিত। তুমি ত সামান্যেই কাতর !

একটু আগের তিরস্কার ভুলে মাতামহ আমার পক্ষ নিলেন, পেটের অসুখে মানুষ বড় দুর্বল হয়ে পড়ে তা ছাড়া ও ত এমনিই একটু কাহিল।

তবে শুনবেন ? চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে পিতা চললেন অন্যের বীরত্বের কাহিনীতে। বীরের সংখ্যা ত নয়। কৃতি পুরুষেরও ছড়াছড়ি। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র চলেছে আমাকে আরও আরও করার জন্যে। কেউ ট্রাইপস পাচ্ছে, কেউ র‍্যাংলার হচ্ছে, কেউ ছটা লেটার পেয়ে আজীবন পর ব্যবস্থা করে নিচ্ছে, কেউ এফ. আর. সি. এস হয়ে এসে ক্যাচক্যাচ মানুষ কাটছে, বড় দিদার গুনছুঁচ দিয়ে পেট সেলাই করছে, কেউ এভারেস্টের মাথায় উঠে পতাকা জাপটে ধরে স্টাইলে ছবি ছেন।

দাদু ফড়ড়্ করে চায়ে চুমুক দিতেই পিতৃদেবের ভুরু কুঁচকে গেল। পদার্থ বিদ্যায় পড়েছিলুম, এভরি হ্যাক্ত ইকোয়াল, অ্যাণ্ড অপোসিট রিআকসান। ফড়ড় মানেই এক ধরনের গ্রাম্যতা। চীনের , পরিবেশন করতে হবে জাপানী কায়দায়, খেতে হবে বিলিতি প্রথায়। এতটুকু শব্দ হবে না। চুক করে নে নিয়ে, সুড়ুত করে গিলে ফেলা। গলকম্বল উঠল আর নামল। ইতিমধ্যে মাতামহ আর একটি দুর্ধর্ষ মেরেছেন, ফড়ফড় ফড়াক করে। ভুরুতে এবার একাধিক ভাঁজ। মাতামহের চোখে পড়েছে। পারলেন না ব্যাপারটা কি ! অতি সরল প্রশ্ন, কি, মাথা ধরছে হরিশঙ্কর ?

আজ্ঞে না, মাথা আমার ধরে না, অম্বল আমার হয় না, আমি শুধু ভাবছি, মানুষ কি রকম খাল কেটে আনে, ঝাড় কেটে বাঁশ আনে।

তা যা বলেছ ? খাল বেয়ে অবশ্য মাছও আসে, রুই, কাতলা, মৃগেল। তোমার কুমির কোন দিক দিয়ে এল হরিশঙ্কর ?

এবাব বেশ খেলান চুমকি। একতলা, তিনতলা।

পিতৃদেব বললেন, সামনের দরজা দিয়েই এল।

সে কুমির এখন কোথায় ? মাতামহ নিমকি চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করলেন।

আমার সামনে।

কি জানি বাবা, আমাকে বলছ না ত !

হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। চা খাচ্ছেন বেনারসের বিধবাদের মত। চা খেতে অত শব্দ করেন কেন ?

মাতামহ হাঁ হয়ে গেলেন। হাতের নিমকি হাতে, চায়েব কাপ প্লেটে। ছেলেমানুষ বকুনি খেলে যে রকম মুখ হয় ঠিক সেই মুখে তাকিযে আছেন। ভয়ে কাপের দিকে আর হাত বাড়াচ্ছেন না। খেতে গেলে আবার যদি শব্দ হয়।

এই দেখুন আমার চুমুক। এক চুমুক চা টেনে নিলেন। কোনও শব্দ হল ?

মাতামহ ঘাড় নাড়লেন নিঃশব্দে।

নিন, কাপ ওঠান, চেষ্টা করুন। এমন কিছু শক্ত নয়।

মাতামহ ফ্যালফ্যাল করে তাকিযে আছেন। হাত আর কাপের দিকে এগোবার সাহস পাচ্ছে না

কি হল ? চেষ্টা করুন। যা দশে শেখেন নি, তা ষাটে শিখুন।

আমি আব চা খেতে চাই না হরিশঙ্কর।

চোখের কোণ দুটো ছলছলে। আলগা মুঠো থেকে মেঝেতে নিমকি খসে পড়ল। এতক্ষণ নিমকি নিমকি করে লাফাচ্ছিলেন। সেই নিমকির ওপরও আব তেমন টান নেই। সব ছেড়ে উঠে পড়লেন প্লেটে নিমকি, আধ কাপ চা।

পিতা জিজ্ঞেস কবলেন, কোথায় চল্লেন ?

যাই, কোথাও ত যেতে হবে। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

বসুন। বেশ আদেশের সুর।

কখন কি অসভ্যতা করে ফেলি হরিশঙ্কর ! তোমার মত লেখাপড়া শিখি নি, তেমন সহবতও না। রেলের মাল গুদামের বড়বাবু ছিলুম এক কালে, পয়সাও অনেক কামিয়েছি ; কিন্তু তোমার সামনে বসার মত সভ্যতা ত আমাকে কেউ শেখায় নি হরিশঙ্কর। ছেলে বলে, ওলড ফুল, তুমিও ত আর এক ছেলে, তোমার মুখেও সেই এক কথা,

যাবদ্বিত্তোপার্জন শক্ত-স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাজ্জাবতি জর্জরদেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে ॥

যতদিন রোজগার ছিল, বোলবোলা ছিল, তত দিন রাজনারায়ণের খুব খাতির ছিল হে, এখন গতায়ু বৃদ্ধ জরাএসে চেপে ধরেছে, এখন কে কার ! ভুলেও কেউ একবার জিজ্ঞেস করে না, বুড়ো কেমন আছ

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং

বৃদ্ধ না কুত্র যাতি। পিতা হাত ধরে চেপে বসালেন। বসুন। অত অভিমান কিসের ? সংসারে আপনা অভিমানের কে তোয়াক্কা করে ! শঙ্করাচার্য পড়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছেন ? সাধন মার্গের দুটো পথ, জানে ত ? নেতি নেতি। ইতি, ইতি। চায়ে চুমুক দিলে শব্দ হয়, অতএব চায়ে চুমুক দেবো না, নেতির পথ এমন ভাবে চুমুক দেবো শব্দ হবে না, এ হল ইতির পথ। নিন, স্টার্ট চুমুক, ওয়ান, টু, থ্রি

মাতামহ উবু হয়ে বসে ছোট্ট একটি চুমুক ছাড়লেন ভয়ে ভয়ে। কি হরিশঙ্কর, কি বুঝলে

পরাফেক্ট। যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

মাঝারি ধরনের আর একটি চুমুক মেরে বললেন, এইবার ?

সাবাশ !

নিমকির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে টেনে নিলেন। মুখে নিমকি পড়লে যে একটু মুচমুচ শব্দ হবে। মুচমুচ অ্যালাউ করা যায়, কারণ ওটা বস্তুর ধর্ম, কিন্তু তারপর যদি চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ হয় তখনই হবে অভ্যাস দোষ।

তা হলে থাক বাবা। দরকার নেই খেয়ে।

না, না, ইতিবাচক সাধনা। খেয়ে প্রমাণ করতে হবে সিদ্ধপুরুষ।

মাতামহের ট্রেনিং-পর্ব চলেছে। আমাকে উপলক্ষ করে সেই বীবত্বেব কাহিনী ধামা চাপা রইল। পরে পড়াই ভাল। পিতার চোখ পড়ল এতক্ষণে, তুমি তা হলে কি ভাবে সাহায্য করবে ?

যে ভাবে বলবেন !

যে ভাবে বলব ? বেশ, তাহলে একটা কর্ম-তালিকা তৈরি করা যাক। মুকুজ্যেমশাই হলুদ আর সরষে বাটার চেষ্টা করবেন আর যে কোনও একটা পদ রাঁধবেন।

রান্না কি আমাব আসবে হবিশঙ্কর ?

রেঁধে প্রমাণ করতে হবে আপনি মহিলা নন, পুরুষ।

সে আবার কি কথা ?

পৃথিবীর সমস্ত বড বড় রাঁধিয়েই হল পুরুষ, গঞ্জালেস, আবু বকর, স্ট্যার্টলয়েড আমাদের হালুইকর বচিত্রবীর্য। সব পুরুষ। রান্নাব জগতে মেয়েছেলের স্থান নেই। আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাছবে চাল। তোমাব ওই বমণীমোহন চাঁচর চিকুরে ওই মেয়েলি কর্মটিই ভাল মানাবে।

আহা, তুমি আবাব ওকে নিয়ে পড়লে।

পড়ব না ! চুল ছাডা ওর আব আছে কি ? ভেবেছে চুল দিয়ে নারী-চিত্ত জয় করবে ! কৃষ্ণের হাতে শুধু বাঁশি ছিল না, সুদর্শন চক্রও ছিল। বুকেব পাটা চাই। হাতেব গুলো চাই। এই দ্যাখো, তোমার সামনে, তোমার পিতা, তোমার মাতামহ। সব ছেচল্লিশ ইঞ্চি।

সব ভুলে পিতাব পাশে দাঁড়িয়ে সিমুলিয়ার ব্যায়ামবীরেব মত মাতামহ হাতের গুলি দেখাতে লাগলেন।

ছায়া, মায়া, কায়া

রান্নাঘরে এক ডেকচি জলের মত ঝোলের তলদেশে ছাল ছাড়ান আস্ত একটি মাগুর কাঁচকলার বালিশ মাথায় দিয়ে শেষ শয্যায় শুয়ে আছে। জমাট অশ্রুবিন্দুর মত গুটি পাঁচেক মরিচ শোকে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর একটি পাত্রে শ্রাদ্ধের পিণ্ডের মত অতি পুরোন চালের এক ড্যালা ভাত। পিতাঠাকুর পেটরোগা ছেলের আহার প্রস্তুত করে রেখে, চোগাচাপকান চাপিয়ে অফিসে চলে গেছেন। খাঁ খাঁ বাড়ি। পৃথিবীব চাকা ঘুরছে। এখানে মুহূর্ত যেন স্থির। কিছুই করার নেই। মোটা মোটা, ভারি ভারি বই আছে। দেয়ালে দেয়ালে জ্ঞান ভাণ্ডাব ঝুলছে, ঝুলের আবরণে। পণ্ডিত হতে চাইলে হওয়া যায়। মগজে গোবর। দাঁতের জোর থাকলে ইঁদুরের মত চিবোন যেত। সেও ত পোকা খেয়ে ভাঙা, ধভাঙা হয়ে বসে আছে। প্রায়ই পিতার সামনে হাঁ করে দাঁড়াতে হয়। ভাগ্য ভাল, তাঁর দাঁতও তেমন ধর নয়। আমার গেছে যত্ন না নিয়ে, তাঁর গেছে অতি যত্নে। যখনই সময় পান শক্ত বুরুশে ঞ্চিখানেক পেস্ট নিয়ে খসর খসর করে ঘষতে থাকেন। ঘর্ষণে পাথর ক্ষয়ে যায়, দাঁতের এনামেল ত কথা।

বিজয়দা বলেছিলেন, সাইকেল শিখতে চাস ? তা হলে সাইকেল হাঁটাতে শেখ।

বিজয়দা একটা মোটা খাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ট্যাক্স আদায় করতেন, আর আমি তাঁর পেছন পেছন

বিশাল ভারি এক র‍্যালে সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটে পায়ের খিল খুলে মরি। মাঝে মাঝে লগবগে হয়ে নর্দমায় পড়ে যাবার মত হয়। প্যাডেলের খোঁচা খেয়ে পায়ের ছাল চামড়া উঠে যায়। মাঝে মাঝে সংশয় জাগে, এতে আমার কি লাভ হচ্ছে! বিজয়দার মতে, এ হল জোড়ে হাঁটা। অনেকটা বিয়ের মত। গাঁটছড়া বেঁধে সাত পা হাঁটলেই বোঝা যায়, যার সঙ্গে ঘর করতে চলেছে, তার ধাতটি কেমন! তিনি কোন দিকে টাল খান, চলন কেমন? জোড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় আরও কিছুটা বুঝে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্যালেনস এসে গেল। বুঝে গেলে, কি ভাবে চড়তে হবে, চালাতে হবে। দু'চাকার সাইকেল আর স্ত্রী জাতি একই জিনিস। নাড়াচাড়া না করলে, দূর থেকে ধাত কি স্বভাব বোঝা যায় না। চালাতে জানলে চলবে, নয় ত ফেলে দেবে নালায়।

পিতারও সেই এক কথা। এ জীবনটা বইয়ের ধুলো-টুলো ঝেড়ে যাও, নেড়েচেড়ে দেখে যাও আসছে বার ভেতরে ঢুকতে পাবরে। মানুষের মত চেহারা হলেই মানুষ হয় না। জন্ম হল অঙ্কের ব্যাপার, ফ্রিকোয়েনসির ব্যাপার। এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বহুকোষী প্রাণী ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, বাঁদর, প্রথম মানুষ জনম। দেহ, আকৃতি মানুষের মত, ভেতরটা গাধা-বাঁদর কম্বিনেশান। গাধা যুক্ত নর ইজ ইকোয়ালটু গানর। গাবানব। সেই গল্পের মত, মনুষ্যচর্মাবৃত একটি গর্দভ, লাস্ট বেঞ্চে বসে পেনসিল চিবোচ্চে। দিনের অর্ধেক কেটে গেল নিলডাউন হয়ে হাতে থান ইট নিয়ে। এইবার জন্মে যাও। জন্মাতে, জন্মাতে, জন্মাতে নিউটন কি রাসেল, ব্যাফেল কি রোদেনস্টাইন লাখোবার জন্মালে তবেই আকৃতি আর প্রকৃতি দুটোতেই মানুষ হবে। তাব আগে নয়। দু'জন পাশাপাশি বসে আছে, ট্রেনে কি ট্রামে। দু'জনই মানুষের মত দেখতে। হলে হবে কি? একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেই বেরিয়ে পড়বে, একজন মানুষ আর একজন কোটপ্যান্ট পরা বনমানুষ।

সোম থেকে শনি, বইয়ের ধুলো ঝাড়ার ক্যালেণ্ডার তৈরিই আছে। রবিবার যেন লিপ ইয়ার কাজের ওপর কাজ। সারা বাড়িতে গোটা চোদ্দ মোগলাই আলমারি। তার মাথা আছে, তলা আছে দেয়ালের দিকে পিছন করা পৃষ্ঠদেশ আছে। চেয়ারের ওপর টুল ফিট করে মাথা সাফ কর। টুলের চারটে পাযাই স্ট্যাণ্ড-অ্যাট-ইজের ভঙ্গীতে ছেতরে থাকে। চেয়ারে তিনি কোনও ক্রমে খাড়া হবেন। সব সময়েই ভয়, সীমানা ছেড়ে যে কোনও একদিকে ঝুলে না পড়েন। জয় তারা বলে সেই মনুমেণ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বল, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে! হাতে একটি ঝাড়ন। ঝাড় ধুলো। প্রথম ঝাপটাতেই নাকে কিছু ঢুকবে। সঙ্গে সঙ্গে গোটাকতক হাঁচি গেট খোলা কুকুরের মত তেড়ে বেরিয়ে আসবে। স্বর্গের কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই বিপুল হাঁচির বেগে টুলচ্যুত হয়ে দেবতার মর্তে পপাত হবার সম্ভাবনা ষোল আনার জায়গায় আঠাব আনা হবে। পিতা তখন হয়ত এমরি পেপার ঘষে পোর্টম্যানের মরচে তুলছেন। কমলালেবু রঙ পালটে এবার নীল রঙ হবে। নিত্য নতুন রূপে সংসারকে সাজাতে হবে। নয়ত জীবনরসে ভাঁটা পড়বে। মাই ডিয়ার স্যার, স্ট্যাগনেশান ইজ ডেথ। শূন্যে তাকিয়ে পিতা বললেন, নাক টিপে, নাক টিপে।

সময় সময় নাকে রুমাল বেঁধে রঘুডাকাতের বাচ্চা হয়ে ধুলো ঝাড়া চলে। সে বড় অসুবিধের ডাকাতি আর ডাস্টিং, ডকারান্ত হলেও, আকাশ পাতাল প্রভেদ, এক নয়। মাথা সাফাইয়ের পর, তলা সাফ। সারা সপ্তাহের মালমশলা তলদেশে তরিবাদি করে জমিয়ে রাখা হয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে, ঘাড় হেঁট করে, খাটো ঝাঁটা দিয়ে টেনে টেনে বের কর। ইঁদুরের ডাইনিংরুম। শালপাতার ঠোঙা, পাঁউরুটির খোল, ডাঁটার ছিবড়ে, মাছের কাঁটা, যখন যা পেয়েছে, টেনে টেনে নিয়ে গেছে। ভোজের পর বিয়ে বাড়ির বাইরের আঁস্তাকুড়ের অবস্থা। তকতকে পরিষ্কার চাই। মনে রাখবে, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। দেয়াল আর আলমারির মাঝখানের অংশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, বাঘা বাঘা একসপ্লোরারদেরও অজানা, ডার্কেস্ট আফ্রিকা। মানচিত্রে স্থান নেই। ঝুল, মাকড়সা, আরশোলা। ড্রাকুলা, এমনকি ভ্যাম্পায়ার বেরোলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সব শেষ, ভেতর। মাল নামাও, ঝাঁড়, আবার মাল তোল। ওঠ বোস। বোস ওঠ। তখনই ভাবনা আসে, সংসার এক বিচিত্র পুতুল খেলা। কিছু বই, কিছু বাকস, প্যাঁটরা, কৌটো-কাওটা, ন্যাকড়া

চোপড়া, গোটাকতক শাল, আলোয়ান, জাম্পার, মাফলার, পুলওভার। সব নিয়ে ন্যাজে গোবরে। একবার এদিকে রাখছে, ওদিকে রাখছে। ইঁয়া কা মাল হুঁয়া, হুঁয়া কা মাল ইঁয়া। তালা, চাবি, হিসেবের খাতা, ক্যাশ বাকস। বারিশের হিসেব সামলাতে চুল পড়ে মাথায় মসৃণ টাক।

ভব পান্থবাসে এসে
কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে
ভুগে ভুগে কেশে কেশে
দেশে দেশে ভেসে ভেসে

জীবনটা যে এত হিসেবের, আগে জানলে, তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না। সব সময়েই যেন যুদ্ধ চলেছে। একটু তালে ভুল হলেই ছিটকে চলে গেলে। আর ফেরার পথ নেই। শুধু এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কোথায়? আর কোনও জবাব নেই। থাকলেও, খুব হেঁয়ালির উত্তর। কেন? জীবনের লক্ষ্যে। কে যে কিসের লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে! সবাই যেন সুকুমার রায়ের সেই লড়াই-ক্ষ্যাপা। কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে। উৎসাহেতে গরম হয়ে তিড়িং বিড়িং নাচে। মাতামহের কাছ থেকে পিতাঠাকুর একটি কথা শিখেছেন, ভোগ একপ্রকার রোগ বিশেষ। উঠতে বসতে এখন সেই নয়া বিধানের প্রয়োগ। ওই এক ব্রহ্মাস্ত্রে সব চাওয়া-পাওয়া ওঠা-বসা খারিজ।

কেউ এসে বললেন, আহা ছেলেটার শরীর বড় খারাপ, একটু মেটের ঝোল, সঙ্গে একটি গুর্দা দিতে পারলে গত্তি লাগত। সঙ্গে সঙ্গে খারিজ, ভোগ এক **প্রকার** রোগ বিশেষ। একটা করে নরম পাকের **শাঁখ সন্দেশ**? সঙ্গে সঙ্গে সেই এক খারিজ মন্ত্র। এর ওপর কোথা থেকে পাড়ায় এক মেনীদা নামক ভদ্রলোক এসেছেন! এ সব মানুষের খবর পিতার বীর ভাণ্ডারে আসবেই। তিনি দশমাইল পথ হেঁটে অফিসে যান, হেঁটে ফিরে আসেন। অভাব নয়, স্বভাব। সব অসুখই তাঁর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় সারে। সর্দি-জ্বর' নাসে, মাসে, বাসে। তিনি প্রথম দুটি রেখে মাঝের মাংস দাওয়াইটি বাতিল করে দিয়েছেন। এ বেলা একটু সরষের তেল দু'নাকে সাঁ করে টেনে নাও, মেরে দাও এক গেলাস জল। ও বেলাও তাই। নাস আর উপবাস। তারপর ছোট্ট একটি গালাগাল সহ উপসংহার, সর্দিজ্বরের বাবা সারবে শালা। পেটের গোলমাল? তলপেটে মৃত্তিকার প্রলেপ। প্রথমে উলঙ্গ। **দ্বিতীয় ধাপে, মাটি ফাইন করে** মেড়ে সেরটাক তলপেটে চাপিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক। শুকোতে, শুকোতে এক সময় ঝরতে থাকবে। পেটে তিনবার চাটি মেরে উঠে পড়। এই সর্বনেশে মানুষটি আমার বাবোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। চেহারা, শুষ্কং কাষ্ঠং। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে রোগা হওয়া সম্ভব নয়। এই বস্তুটির সঙ্গে একজন স্ত্রীজাতি আছেন। তাঁর তৈরি প্রায় আধ ডজনের মত ভবিষ্যতের স্ত্রীং-পুং মেনী আছে। আমার বন্ধু সুখেন একটু অকালে পেকেছে। নর-নারীর যৌন জীবন নিয়ে তার নিত্য নতুন আলোকপাতে আমরা সময় সময় বেসামাল হয়ে পড়ি। সে বলে পুং মেনী আর স্ত্রী মেনির ঘর্ষণে রাতে ওঁদের উত্তরের ঘরে আগুন জ্বলে। কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে কি হয় রে ব্যাটা? দু'টোইত চকমকি? ডজন কমপ্লিট করে রিটায়ার করবে। সে যাই হোক। কে কি করবে, তা নিয়ে সুখেনের মাথাব্যথা থাকলেও আমার নেই। সেদিন গভীর রাতে মেনীদা বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের জানলার গরাদে হাত আলুলায়িত করে মিসেস মেনীকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করছেন। গলা প্রেমরসে টসটসে। ঘুমচোখে স্বামীর মুখ দেখে স্ত্রী বুবু করে অজ্ঞান। মুখে গাঁজলা। ছোট্ট পাড়া। তা ছাড়া যে পাড়ায় সুখেনের মত প্রতিভা, সে পাড়ায় এমন একটা ঘটনা, কাগজে ছাপা না হলেও, ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

এই ক'দিন একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। শরীর ঢকঢকে হয়ে আছে। সব সময় ঘুম পাচ্ছে। মনের দেয়ালে আরাম হারাম হ্যায় বাণীটি সব সময় ঝোলান থাকলেও, শুলে উঠতে ইচ্ছে করে না, বসলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। বেশ ঘুম ঘুম চোখে, হাই তুলে তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আকাশ, গাছের পাতা, পাখি, রাস্তায় মানুষের স্রোত দেখে দেখে ক্রমশই দার্শনিক হয়ে উঠছি। আমি চাই না মাগো রাজা হতে। উঠতে গেলে হাত পা কাঁপে। বেশ আছি মা এলিয়ে বসে!

দোতলার বারান্দা। জানালার কাছে বেনচ পাতা। দেয়ালে পিঠ। ঠ্যাং দু'টো সোজা ছড়ান। পায়ের

পাতার ওপর পাতা। বাঁপাশে টেবিল। টেবিলের ওপর বাঁ হাত আলগোছা ঝুলছে। এক বিঘৎ দূরে একটি বই, রজেটস থেসারস। একটি ইংরেজী কাগজ। কর্মখালির বিজ্ঞাপনের পাতায় এখানে ওখানে লাল পেনসিলেব ঢ্যারা মারা। কর্মস্থলে যাবার আগে দুটি নির্দেশ আমার জন্যে রেখে গেছেন। থেসারস মুখস্থ করে যাও। ওই বিদ্যেটি ত ভালই জানা আছে। অঙ্কের মগজ থাক আর না থাক। ইংরেজীটা যদি ভাল করে রপ্ত কবতে পার, তা হলে কোন মতে দু'বেলা দুটো অন্ন হয়ত জুটবে। পিতার হোটেল চিরকাল খোলা থাকবে না রে দামড়া। দ্বিতীয় নির্দেশ, ঢ্যারা মারা জায়গায় চিঠি ছেড়ে যাও। বলা যায় না লাগলেও লেগে যেতে পারে। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই, মিলিলেও মিলিতে পারে পরশ পাথর। দু'টো কাজই বেশি এগোয়নি। আকাশে মেঘের ফর্মেশানে হিমালয়। শরীরে তাগত এলেই, একদিন উড়বে সাধের ময়না। মাটির চেয়ে আকাশ কত উদার! এখানে কচু, ঘেঁচু, মুলো, ময়লা, আবর্জনা, গোঁফ, দাড়ি, ঘামের গন্ধ, তিরস্কার। ওপরে, ট্রপোসফিয়ার, আয়নোসফিয়ার, ইথার, ওজোন, মেঘ, পাখি, মহাওঙ্কারধ্বনি। নিচে ভাগাভাগি, মারামারি, পাঁচিল তোলাতুলি, পার্টিশান, ডিক্রি। অস্থির পঞ্চম অবস্থা।

রাস্তার দিকেই চোখ ছিল। একটা গাড়ি আসছে। আমাদের বাড়ির সামনেই থামল। এই ভূতমহলে, অসময়ে, বিনা নোটিসে কার আগমন রে বাবা! দরজা খুলে সামনের আসন থেকে যিনি নামলেন, তাঁর চেহারা ডবলডিমের ওমলেটেব মত। সাদা জিনের প্যাণ্ট, হাফ হাতা সাদা জামা, মাথায় একটা শোলার টুপি। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সামনে ভুঁড়ি ঠেলে আছে আদ হাত। জলভরা বেলুনের মত থিরি থিরি নাচছে। বাড়ির ঠিকানা দেখে হুঙ্কার ছাড়লেন, হ্যাঁ, এই ত সাতান্ন নম্বব! ঠিক এসেছি। নেমে আয়।

নেমে আয় বলামাত্রই আমি পা গুটিয়ে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। কে নামে, কে নামে! পেছনের আসন থেকে একটা পা ঝুলে পড়ল। সুন্দর, মনোহর, লেডিজ স্লিপার। ফুল ফুল শাড়ির প্রান্ত। সর্বনাশ! মহিলা। একজন নয়, ওয়ান আফটার এনাদার, দু'জন। বুড়ী নয়, যুবতী। খেল খতম, পয়সা হজম। নির্জন বাড়িতে, বেন্চে বসে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হবার বারোটা বেজে গেল। বুকের মধ্যে ভয় হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। কি করে সামলাব এই অপসরাদের। জিভ উলটে টাগরায় গিয়ে ঠেকেছে। মেয়ে দেখলেই আমি অবশ হয়ে পড়ি। খাটের তলায় কি জালার কোণে ঢুকে লুকোতে ইচ্ছে করে। আমি ত সুখেন নই।

সদরের কড়া নড়ে উঠল। মাথায় টুপি থাকায় ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পাননি। টুপির কার্নিসে দৃষ্টি ঠোক্কর খেয়েছে। মেয়ে দু'টি ওপরে চোখ ঘুরিয়েই আমাকে দেখে ফেলেছে। আমার ছাগল দাড়ি, শীর্ণ ঘোড়ার মত মুখ, দু'টো ড্যাবা ড্যাবা নির্বোধের মত চোখ, বকের মত গলা। এমন ভজুয়া মার্কা চেহারা আর দু'টি নেই।

সদর খুলে সামনে দাঁড়াতে হল। ভদ্রলোক টুপি খুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি? হরিবাবুর ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা কোথায়?

অফিসে।

জানতে আমরা আসব?

আজ্ঞে না।

একটা চিঠি পাওনি তোমরা?

না ত!

তা হলে জান না আমরা কে?

আজ্ঞে না।

না জানাই স্বাভাবিক।

চৌকাঠের এপারে আমাকে সাসপেনসে রেখে ভদ্রলোক ড্রাইভার আর মেয়েদের বললেন, এই সামান উতার। মেয়ে দু'টির নজর আর আমার ওপর আর নেই। একবারই চোখে চোখে ঠোকাঠুকি

াছিল। এমন কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়। অনেকটা রামছাগলের মত। চারটের বদলে দুটো কেঠো কেঠো কলিকে পা। বরং বাড়িটা দর্শনীয়। নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টুকে চোখ উলটে বললে, দেখেছিস মুকু, ড়টা কি ভীষণ পুরনো। ঘাড়ে ভেঙে পড়বে না ত!

যাক, একজনের নাম জানা গেল মুকু। পরক্ষণেই জানা গেল আর একজনের নাম, কনক। দ্রলোক ভেতর থেকে একটা সুটকেস বের করে বললেন, দাঁড়িয়ে থেক না, কনক। সাহায্য কর, হায্য কর।

মুকু ছোট, কনক বড। মুকু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললে, দিদি, এ যেন স্বর্গের সিঁড়িরে। নেরই হাতে মালপত্র। আমার ভাগে পড়েছে সুন্দর একটি বেতের বাসকেট। জীবনে এমন বস্তু খিনি, দেখবও না। সর্ব অঙ্গে কারুকাজ। পিতার ভাষায় বলতে হয়, আহা, একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট। জের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, মন খারাপ করে ঘণ্টাখানেক বসে থাক। অনুশোচনায় অন্তর্শুদ্ধি হয়। দোতলার বারান্দায় মালপত্তর এসে জমল। বেশি কিছু না, গোটা তিনেক সুটকেস, একটা বেড া, বিশাল একটা স্টিল-ট্রাঙ্ক। ওপরে আনতে ভদ্রলোক আর গাড়ির ড্রাইভার হিমসিম খেয়ে লন। রিয়েল মাল যদি কিছু থাকে তো ওর মধ্যেই আছে। আরও গোটা দুই বেতের বাসকেট আর -ব্যাগ। দুই বোন, একবার এ-দিকে ফিরছে, একবার ও-দিকে ঝুঁকছে। একবার এটা তুলছে, ওটা চ্ছে। চুলের বেণী চাবুকের মত, গরুর ন্যাজের মত সপাসপ ডাইনে বাঁয়ে দোল খাচ্ছে। কথায় . আহা, তিনি যেন ঘর আলো করে বসে আছেন! সত্যিই তাই। দুই বোন, যেখানে যাচ্ছে, যেদিকে চ্ছ সেই দিকটাই আলো হয়ে যাচ্ছে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার একই সঙ্গে আবির্ভাব। স্বামী টানন্দের হাত ধরে দুই ফুটফুটানন্দ। এখন বেশ গলা ছেড়েই গাওয়া যায়, আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের লা কে দেখবি আয়।

অস্পষ্ট একটা পরিচয় পাওয়া গেল। মেজ জ্যাঠাইমার বোনের স্বামী। বহুকাল আগে একবার াছিলেন। থাকতেন রেঙ্গুনে। আইনজীবী ছিলেন। তখন আমাদের সংসার জমজমাট। সুন্দরী, বী বউ। পিসিমাদের আসা যাওয়া। অতিথি অভ্যাগত। গান-বাজনা। পায়ে পায়ে ঘুরছে সাদা সাদা লী বেড়াল। হাজার টাকার ঝাড়বাতি জ্বলছে। বাড়িটাও তখন এত জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি। তারপর শা মৃত্যু এল কালো ওড়না গায়ে দিয়ে। আমরা তখন গভীর ঘুমে। ফুঁ দিয়ে একটি একটি করে বাতি য়ে দিয়ে গেল। সব মৃত্যুই শেষ রাতে। অদ্ভুত অদৃষ্ট লিপি। অসুখ, মৃত্যু, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বোঝার বড় তখনও হই নি। খুব ছোট গাছ। ঝড় বইছে ওপরে। ডালপালা নড়ছে। শব্দ শুনছি। গায়ে াছে না। ভোরে উঠে দেখি দীপ নিবে গেছে। ফিকে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। যে ছিল সে নেই। শূন্য ঘর। শূন্য শয্যা। এ কেমন যাওয়া! কেউ তেমন সহজ করে বলতেই পারে না। কেন যা, কেনই বা তবে আসা। শিশুকে বোঝান হত, তিনি গেছেন, দূরে, আসবেন, তবে দেরি হবে। নাও, তোমার ছবির বই, খেলনা, এয়ারগান। ভুলে যাও, ভুলে থাক। মেতে থাক। সংসারে অনেক , অনেক আশা। খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে খোলা ছাদে। রাত যার মাথার ওপর থমকে থাকে া-চমকান আকাশ। সেই সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যেবেলা রোজই গা ছম-ছম করে উঠত। মনে হত ও সে আসবে নাকি! ভোরে উঠে দেখব আমাদের আর একজন কেউ নেই। সেই চলে যাওয়া ফিরে না আসার অভিমান মনের সুরটাই চিরকালের জন্যে এমন ভাবে বেঁধে দিয়ে গেছে, এখনও ট ফোলে। মনে হয় তাঁরা আছেন যাঁরা নেই। নির্জন দুপুরে এ-বয়েসের সংলাপ:

যারা ছিল একদিন; কথা দিয়ে, চলে গেছে যারা;
যাদের আগমবার্তা মিছে বলে বুঝেছি নিশ্চয়;
স্বয়ম্ভু সংগীতে আজ তাদের চপল পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে ইশারা॥

ত মনে নেই সেদিনের কথা। শীতের সকালে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকার মত। অস্বচ্ছ পর্দার পড়ে আছে জীবনের ফেলে আসা দিন। কে হাত ধরেছিল; কে কোলে নিয়েছিল, কে চুমু

খেয়েছিল   আদব করে ! সবই অস্পষ্ট, ভাসা, ভাসা । কল্পনা করা যায়, জোর করে কিছু বলা যায় না
আজ জ্যাঠাইমাও নেই, জ্যাঠামশাইও নেই । কিছু আগে পরে দু'জনেই চলে গেছেন ।

টেবিলের ওপর টুপি নামিয়ে রেখেছেন। মাথার চুলে কমাণ্ডার কাট । চোখ দুটো মাংসর চাপে ছো
ছোট । মুখ গোলাকার । দু'টি চিবুক তৈরি হয়েছে । বেল্টের চাপে পেট ফাটো ফাটো । মানুষের ম
কত খারাপ দিকে ছোটে ! হঠাৎ মনে হল, এইরকম ভদ্রলোকের কেমন করে এমন সুন্দর দুটি মে
হল ? অবাক কাণ্ড ! জন্ম-রহস্যটা যদি জানা যেত ! মনকে এক ধমক, ব্যাটা ! পড়াশোনা চুলোয় গে
যা জানলে কাজ হয় তা জানা হল না। জন্ম-রহস্য !

দু'পাশে দু'টো পা ছড়িয়ে ভদ্রলোক বসেছেন । মাথার চুলে কুচুর কুচুর হাত বুলোতে বুলো
বললেন, আমি তা হলে গিয়ে তোমার মেসো হলুম ।

যা হয় একটা কিছু হলেই হল । একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে বেশ অবাক হচ্ছি । সেটা হল আম
শরীর । এতক্ষণের দুর্বলতা, কিছু না করার ইচ্ছে, আলস্য, সব হাওয়া । শরীরে যেন বেশ বল এ
গেছে । কামিনী আর কাঞ্চন, এর চেয়ে ভাল টনিক আর কি আছে ! আমার কথা নয়, নির্মল পাগলার
খুব জ্ঞানী মানুষ । গোটাকতক বিষয়ে এম-এ । সব কটাতেই ফার্স্টক্লাস । পড়ে পড়ে পাগল
জমিদারের ছেলে । নেই নেই করে এখনও বেশ আছে । বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন । মালকোঁচা ম
ধুতি । সার্টের ওপর গেঞ্জি । ধুতির ওপর আণ্ডার-ওয়্যার । লোকে যা করে তিনি তার উল্টোট
করবেন । নির্মলদার গল্প, বাহাত্তর বছরের বুড়ো, খাবিখাওয়া অবস্থা । উঠোনে কেত্তন-পার্টি রেডি
খোলের ওপর হাত নিসপিস করছে । বুড়ি ঘর থেকে কেঁদে উঠলেই, কপাক কপাক করে খোল বে
উঠবে । বুড়োর চোখ গেল দরজার দিকে । রকে বসে মানদা বাসন মাজছে কোমর দুলিয়ে । বেশ ডাঁ
যৌবন । বুড়ো থপাক করে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল । আরে কর কি, ক
কি ?

বড় অশ্লীল !

নির্মলদা বলবেন, চপ শালা । সারা পৃথিবীতে মানুষের শরীরে মাদল বাজছে । কামের জন্যে
come. পুড়ে ছাই হলে তবেই calm, ও-সব সাধুগিরি আমার কাছে ফলাতে আসিস নি । নির্মলদা
রণহুঙ্কার · I storm and I roar, and I fall in a rage,
and, missing my whore, I bugger my page.

কি জানি বাবা, কিসে কি হয় । আমার এই ভাবনা পিতাঠাকুর কোনওক্রমে জানতে পারলে হতা
আত্মহত্যা করবেন । উঃ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে ! কেন যে ছেলেরা পিতার হাতছাড়া হয়ে যায় !
ভাবনার কথা !

একটু গরম জল হলে·· মেসোমশাই কিন্তু কিন্তু গলায় বললেন ।

চা ? আমার প্রশ্ন ! একটু চা করে এঁদের সেবা করতে পারলে ভাবব, তবু একটা কাজের কাজ হ

না, চা আমরা কেউই খাই না । তোমার নামটা কি বাবা ? ভুলে গেছি, অনেকদিন আগে এর
এসেছিলুম, তখন তুমি এতটুকু ।

আমার নাম পিন্টু । গরম-জল কি করবেন ?

স্নান । করতে হবে । নতুন জায়গা, ঠাণ্ডা-জল গায়ে ঢালতে চাই না ।

খুবই চিন্তার কথা । প্রাইমাস স্টোভে চায়ের জল গরম হতে পারে, তিন জনের স্নানের জল
করতে হলে উনুন ধরাতে হবে । সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ।

একটু বসুন তা হলে, উনুন ধরাই ।

তুমি ধরাবে কেন ? কনক ! মেয়েকে ডাকলেন ।

দু'বোন কিছু দূরে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল । কি ভাবে কি করবে বুঝতেই পারছিল না ।
বাড়ি । কোনও মহিলা নেই । প্রায় ধর্মশালার মতই ।

আসি, বলে কনক জানালার ধার থেকে সরে এল ।

তুমি সব দেখেশুনে নাও। তোমাদের দু'বোনকেই সব করতে হবে বাপু। আসার পথে বাজার দেখে লুম, আমি কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে আসি।

সবই বাড়িতে আছে। আপনাকে আর বাজারে যেতে হবে না। ডিম আছে, তরিতরকারি আছে, ল-ডাল, সব আছে।

তা হলেও!

তা হলে আবার কি?

বেশ, যা আছে তাইতেই হোক। তোমার বাবা আসুন, তারপর যা হয় হবে। কনক, তুমি ওদিক ামলাও, মুকু, তুমি এদিকে সব খুলে টুলে ফেল। আগে স্নান, তারপর কাপড়-টাপড় ছেড়ে রান্না। ামান্য কিছু করলেই হবে। বেশি বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

আমাদের রান্নাঘর আর এক মহলে। দু'টি মহল বারান্দা দিয়ে জোড়া। বারান্দার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে নক বললে, বাঃ, তোমাদের বাড়ির এদিকটা ত ভারি সুন্দর। ওদিকটা শহর, এদিকটা গ্রাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ, গাছপালা রয়েছে ত। একটু এগোলেই গঙ্গা।

আমাকে অত ভক্তি করে আজ্ঞে বলতে হবে না। আমি তোমার দিদি হই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার সেই আজ্ঞে?

কি করি বলুন, কি রকম একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

আবার বলুন! আমার সঙ্গে খবরদার আপনি, আজ্ঞে করবে না। নিচেটায় পাতকো বুঝি? বারান্দার াঙা রেলিং ধরে সামান্য ঝুঁকতেই আঁ-হাঁ আঁ-হাঁ করে হাতের ওপর দিকটা ধরে আমি টেনে নিলুম, াঙা, ভাঙা, পড়ে যেতে পারেন।

কোথায় ভাঙা?

এই যে রেলিং। সারা বাড়িটাই ত ভেঙে-চুরে খলখলে।

একটু সারাও-টারাও না কেন? এমন সুন্দর বাড়ি! কত বড বল তো।

টুকটাক সারাই বাবা নিজের হাতেই করেন। বিবাট ব্যাপার ত, একা ঠিক সামলাতে পারেন না। আর ামি ত একটা অপদার্থ।

তুমি কি করবে? মিস্ত্রী লাগালেই ত হয়!

বাবা বলেন, সেলফ হেলফ ইজ বেস্ট হেলপ।

পিতাঠাকুর রান্নাঘরটিকে সকালেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছেন। কথায় কথায় বলেন, । হল পুরুষের কিচেন, মেয়েদের হেঁসেল নয়। আঁস্তাকুড় আর আঁতুড় এই হল বাঙালীর দুই বৈশিষ্ট্য। ান্নাঘরের সামনে বারান্দা পূব দিকে কিছু প্রশস্থ। সেই অংশে গুছিয়ে রাখা কয়লা আর ঘুঁটে। ওই যে নচের বাগানে পড়ে আছে কয়লার রঙে কালো একটি পাথর, পাশেই সদ্যোজাত সন্তানের মত গড়াগড়ি াচ্ছে একটি হামানদিস্তের হাতল। কয়লা আগে ওইখানে আসবে। ঘন্টাখানেকের পরিশ্রমে টুকরো করো হয়ে, ভারে ভারে ওপরে উঠবে।

কনক বললে, বাঃ ভারি পরিষ্কার ত! কে এমন সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে? তুমি?

না, ফাদার। বাব্বাঃ, মেয়েছেলেও হার মেনে যাবে!

মনে মনে ভাবলুম, মেয়েছেলে? মেয়েছেলে সম্পর্কে পিতার ধারণার কথা জানলে মেয়েছেলে হয়ে ন্মাবার সাধ চিরকালের মত ঘুচে যাবে।

আমি তা হলে লেগে পড়ি, কি বল?

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে কনক কয়লার গাদার সামনে উবু হয়ে বসল। শাড়িটা মনে হয় বেশ ামী।

কয়লার গুঁড়োয় ময়লা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ কার্যটি ত রোজ সকালে আমাকেই করতে হয়। ামিই কেন হাত লাগাই না! এর নামই বোধহয় দুর্বলতা! কোনও গুফো লোক যদি এই মুহূর্তে

কয়লার গাদায় বসতেন আমার মন কি এমন আকুলি-বিকুলি করত !

সরুন, আমি উনুন সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দি।

কেন ?

শাড়িতে কালি লেগে যাবে যে !

বাঃ, লজ্জা ত বেশ কেটে এসেছে ! জিভ ত আর তেমন জড়িয়ে যাচ্ছে না। কেমন মিঠি-মিঠি বা বেরোচ্ছে ! এর নামই কি অ্যাটাচমেন্ট ! পিতা যেমন মাঝেমধ্যে জগৎ-সংসারের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কা ছাড়েন, ছায়া, মায়া, কায়া।

কয়লা তোলার, নিয়ে যাবার অনেক সাজসরঞ্জাম আছে। পিতার উদ্ভাবন। হাত না ঠেকালে চলে। যেমন মিনি বেলচা। ছোট বালতি। কয়লার গাদায় বেলচা চালাতেই এঁকে-বেঁকে, কিলি-বিলি করে লাল মত যে প্রাণীটি বেরিয়ে এল, সেটি একটি মধ্যম মাপের, দাঁড়াটাড়াঅলা তেঁতুলে বিছে গেঁটে-গেঁটে শরীর।

মাগো, বলে কনক স্প্রিং-এর ইঁদুরের মত লাফিয়ে সরে গেল। আমার ত তেমন সাহস নেই। ভীতু বলা চলে ; কনকের শরীরের আড়াল থেকে সেই রসহীন, শুষ্ক প্রাণীটিকে একবার দেখে নিলুম চালচলন আমার মতই উদ্দেশ্যহীন। নিতান্ত ভীরু ব্যক্তিও বাহবার লোভে বড় কাজ করে ফেলে আমার উক্তি নয়, স্বামী বিবেকানন্দের। ভাগ্যিস পা দিয়ে থেঁতো করার চেষ্টা করি নি। বেলচা দিয়ে এ ঘা লাগাতেই তিনি কেতরে কেতরে আবার কয়লার গাদায় গিয়ে ঢুকলেন।

কনক বললে, এইবার কি হবে ?

বীরের উক্তি, কি আবার হবে ? পাশ থেকে কয়লা নিয়ে উনুন ধরাব।

যদি কামড়ায় ?

ওষুধ আছে। কেরসিন তেলে কয়লা ঘষে লাগিয়ে দোব। কিছুক্ষণ জ্বলবে, তারপর সব ঠাণ্ডা তোমাদের বাড়িতে আর কি কি আছে ?

আর এক রকম বিছে আছে, তার নাম কাঁকড়া বিছে। নিচের বাগানে গোটা কতক পোষা সা আছে। বড় বড় পাঞ্জামাপের মাকড়সা আছে। টনখানেক আরসোলা আছে। ইঁদুর আর ছুঁচোর অভা নেই। সন্ধেবেলা বেশ বড় সাইজের একটা চামচিকি বেড়াতে আসে। মাঝরাতে চিলেকোঠায় ব ডাকে এক জোড়া প্যাঁচা।

মহীশূরের টানা টানা চোখ, পাঞ্জাবের খাড়া নাক আর কুলু আপেলের রঙে রাঙান গাল নিয়ে কন অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নাকের ডগায় ছটি-হীরে-ঘাম।

Nothing begins and nothing ends.

উনুনে আগুন পড়েছে। ধোঁয়া বের করার একটা কেরামতি আমার পিতা ঠাকুরেরই উদ্ভাবনী মা থেকে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, ডিসপোজালে এখানে ওখানে নানা রকমে জিনিস বিক্রি হত। সেই পড়তি মালের আড়ত থেকে হরেকরকমের জিনিস কেনার একটা নেশা চে গিয়েছিল বেশ কিছু দিন। অনেক কিছুই এসেছিল, কাজেও লেগেছিল। সব চেয়ে কাজে লেগে জাহাজের একটা চিমনি। ঠ্যালাগাড়িতে লোড হয়ে সেই বস্তু যখন পাড়ায় ঢুকল, হাতি দেখার মত ভি জমে গেল। কি তার বাহার ! কালোর ওপর লালের ডোরা। ঠ্যালায় চেপে চিমনি চলেছে, পেছ পেছন চলেছে একপাল কুঁচোকাঁচা। হই হই ব্যাপার।

প্রতিবেশী রকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আজ দেখছি পেল্লায় জিনিস পেয়ে গেছ হরিশঙ্কর ! ওটা কি দেখতেই পাচ্ছেন, জাহাজের চিমনি।

এবার তাহলে একটি মাস্তুল যোগাড় করে চাঁদসদাগরের মত ভেসে পড় জলে।

মিস্ত্রীকে হুকুম হল, ফিট কর রান্নাঘরের ছাদে। দেখেই তার চক্ষুস্থির। ছাদ এ লোড নিতে পারবে না বাবু। ঘর নেমে আসবে। তুমি লোডের কি বোঝ হে। যা বলছি তাই কর, রোজ বুঝে নিয়ে সরে পড়। মিস্ত্রী বললে, এর ফাঁদটা একবার দেখেছেন বাবু? ছাদের অতটা খাবলে তুলে নিলে, ছাদের আর থাকে কি? সবটাই ত চিমনি হয়ে গেল। বর্ষায় ত বান ডাকবে ঘরে। তা ঠিক, বলে ভাবতে বসলেন। চিমনি কিছু দিন পড়ে রইল আড় হয়ে। এক জোড়া দোয়েল এসে সংসার পেতে বসল। বাচ্চাকাচ্চাও হল গুটিকয়েক। সকাল সন্ধ্যে খুব গান শোনা গেল বছর খানেক। অবশেষে সেই চিমনি ছাঁটকাটে সরু হয়ে দেয়াল ফুঁড়ে সোজা উঠে গেল আকাশে। আস্ত একটা পাঁঠাকে কাবাব বানান যায় এমন একটি কড়া উপুড় হল উনুনের মুখে। কড়া যেদিন এল সেদিনও প্রতিবেশী বললেন, যাক, এতদিনে তা হলে পেলে। এই বার চিমনি ফিট করে ভেসে পড় সাত সমুদ্রের জলে।

চিমনি দিয়ে যেদিন ভলকে ভলকে ধোঁয়া উঠল আকাশে, সেদিন কি আনন্দ! জমিদারবাবু যেন পায়রা ওড়াচ্ছেন! ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, হোয়াট এ গ্র্যাণ্ড সাকসেস! প্রতিবেশীরা দেখতে এলেন, জনে জনে। একটা কল বানিয়েছে বটে হরিশঙ্কর, তোমার মাথা আছে! ব্যাণ্ডেজ করা ডান হাত তুলে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর জানাচ্ছেন আহত হরিশঙ্কর হাসি মুখে। চিমনি ছাদে ওঠার আগে মোক্ষম একটি লাথি ঝেড়ে গেছে পিতার ডান হাতে।

সেই কড়া এখন আমাদের প্রায় কাত করে ফেলেছে। ভল ভল করে ধোঁয়া উঠছে। কড়া বিদ্রোহ করে বসে আছে। টানা হ্যাঁচড়া চলেছে খুব। কনকের চুল ফুঁড়ে ধোঁয়া উঠছে। অবশেষে তিনি ঘাড়ে চাপলেন। চোখ লাল, জলে ভরা। কনক বললে, বাব্বাঃ, চোখে এখন সরষে ফুল দেখছি।

কনকের চালচলন দেখে মনে হচ্ছে মনটা বেশ সাদা। খুব একটা অহঙ্কার টহঙ্কার আছে বলে মনে হয় না। সুখেনের থিয়োরিই ঠিক। যারা সুন্দর, তাদের সব কিছুই সুন্দর। বিপদ কটা-সুন্দরীদের নিয়ে। দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। ঠোঁট সব সময় উলটেই আছে, আমার ভাই দুধটুধ ভাল লাগে না। মা যখন রাতে শোবার আগে দুধ নিয়ে সাধাসাধি করে আমার কান্না পায়। যাদের দুধ জোটে না, তারা বেশ আছে! সুখেন বলে, মেলামেশা করতেই যদি হয় ত সাতপুরুষে বড়লোকদের সঙ্গে মিশতে পারিস, একপুরুষে দেখলেই সাত হাত দূরে ছিটকে পালাবি।

আঁচলে চোখ মুছে কনক বললে, এইবার তোমার কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও। বেশি ঝামেলার দরকার নেই। শরীর আর বইছে না গো! একটু শুতে পারলে ভাল হয়।

আমি একটু-আধটু বাঁধতে পারি। যদি আপত্তি না থাকে!

থাক আর রেঁধে দরকার নেই। তোমার কেরামতি পরে দেখা যাবে।

মাছ ছাড়া সবই আছে। সুব্যবস্থার শেষ নেই। ফর্দ করে বাজার হয়। তেল, নুন, মশলাপাতি সারা মাসের মত মজুত। লেবেল আঁটা ঝকঝকে টিনে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাকে পাশাপাশি ক্যাটালগ মিলিয়ে অবস্থান করছে। লাইব্রেরীর বইয়ের মত। ঝালের দিকে ঝাল, মিষ্টির দিকে মিষ্টি। চিনি, মোটা, মাঝারি, মিহি দানার, ভেলি, কাশীর চিনি। লাইন দিয়ে চলেছে ডালের কৌটো। এমন মানুষকে দেখিয়েই লোকে বলে, বিয়ে হলে তোমার বউ বড় সুখে থাকবে হে। আর কি হবে! সবই ত শেষ হয়ে গেছে। মা ত আর ফিরে আসবে না। কনককে দেখে মনটা কেমন যেন করে উঠছে। স্বপ্নে পুরানো ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য দেখা দিয়ে ভেসে চলে যায়। মায়ের চেহারা আমার মনে নেই। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা থেকে একটা সাদৃশ্য তৈরি হয়েছে কল্পনায়। আমার মা বোধহয় কনকের মতই দেখতে ছিলেন। পাতলা, পাতলা পায়ের চেটো, ছিপছিপে গড়ন, কোমর ছাপান চুল। আমি অবশ্য ভোলা মামার মত, আমার মা এসেছেন, আমার মা এসেছেন বলে চিৎকার করব না। ভোলামামার এই পাড়াতেই বাস। মাছের ভেড়ি আছে। রোজ রাত বারোটার সময় মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন। মামী রোজই ঝাঁটা পেটা করেন। এক এক ঘা ঝাঁটা পড়ছে পিঠে, মামা চিৎকার করছে, আমার মা এসেছে, মা। মায়েরা যেমন ছেলেকে মুখপোড়া বলে, মামীও তেমনি মামাকে মুখপোড়া বলেন, ঠিক ওই সময়টিতে। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা সেই

স্ত্রীলোকটিকে সোহাগ করে বলেন, আহা তোমার কি ভাগ্য মা,রোজই ঝেঁটিয়ে স্বামীকে ঘরে তুলতে হয় ! তবে এই গ্রীষ্মের দুপুরে কোনও এক রমণীর চলনে বলনে অতীতের দিন ফিরে এসেছে মনে করে, মন যদি সুখী হতে চায়, হোক না !

এই হল তোমার গিয়ে আলু। কনক হিসেব মেলাচ্ছে। পটল, কুমড়ো, ঢেঁড়স, ঝিঙ্গে, করলা, বরবটি, পেঁপে, কাঁচকলা, মোচা, থোড়, কিছুই দেখছি বাকি নেই। ও বাবা, ডুমুরও রয়েছে দেখছি। তুমি কি খাবে ?

আমার যে খানা পাকান আছে সে খানা দেখলে কনক ঘাবড়ে যাবে। যেমন তার বর্ণ, তেমনি তার গন্ধ।

আমার আছে রুগীর ঝোল আর গলা ভাত। সবে পেটের অসুখ থেকে উঠেছি ত !

তা হলে আমিও ঝোল ভাত করে ছেড়ে দি।

ডিম আছে।

না ডিম চলবে না গো। বাবার আবার অনেক বায়নাক্কা। ডিম খেলে মানুষের পেট গরম হয়। পেট গরম হলে মাথা গরম হয়। ডিম না খেয়ে বাবার মাথা যে কত ঠাণ্ডা হয়েছে দু'এক দিনের মধ্যেই টের পাবে। যাক উনুন ধরতে ধরতে চানটা সেরে ফেলা যাক। তোমাদের চানের ঘর ?

নিচে। চৌবাচ্চায় জল আছে। পাতকো থেকে টাটকা তুলেও নেওয়া যায়।

তা হলে আমিই আগে যাই।

মুকু বেড়াতে বেড়াতে এপাশে চলে এসেছে। এরই মধ্যে চুলটুল খুলে ফেলেছে। হাতে একটা চিরুনি। পেছনটা রুপো বাঁধান। চুলের ডগা ধরে খেঁচাত খেঁচাত করে বার কতক আঁচড়ে বললে, বাড়িটা বেশ নির্জন, না রে দিদি ?

জন্তু জানোয়ারও আছে। রাত আসুক দেখতে পাবি।

ওপাশ থেকে ডাক ভেসে এল, মুকু, মুকু, আমার সুটকেসের চাবি কোথা, মুকু, আমার সুটকেসের চাবি কোথায় ?

আসি, বলে মুকু চলে গেল। এরা দু'বোনই কেউ ডাকলে আসি বলে উত্তর দেয়। গলার স্বরও বেশ মিষ্টি।

আর কি কি ভাল ভাল জিনিস স্বভাবে লুকিয়ে আছে কে জানে ? আমার পিতাঠাকুর প্রথমে মুগ্ধ হবেন, তারপর আমার স্বভাবের খুঁত বের করে, এই উৎকৃষ্ট উদাহরণের পাশে ফেলে আমাকে নিচে নামাতে নামাতে মনুষ্যাধম জন্তু বলে, তলায় একটি রেখা টেনে দেবেন।

পেছন মহল ছেড়ে বার মহলে এসে দেখা গেল এলাহি ব্যাপার। বিশাল ট্রাঙ্কের ডালা খোলা। তার মধ্যে শুধু বই আর বই। জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, লাঠি, চশমা, তোয়ালে, গামছা, ধরাশায়ী সৈনিকের মত চারপাশে ছড়ান। একটা সুটকেস মুখ ভার করে পড়ে আছে একপাশে। তার সামনে থেবড়ে বসে আছে মুকু।

মেসোমশাই হাঁটুতে চাপড় মারতে মারতে বললেন, তুমি আজকাল ভীষণ কেয়ারলেস হয়ে যাচ্ছ মুকু। আমার বেশ মনে আছে তোমাকে আমি চাবিটা দিয়েছি। দেবার সময় একথাও বলেছি, দেখো হারিও না যেন।

মুকু খুব ধীর গলায় বললে, সব চাবিই ঠিক রইল, আর ওইটাই হারিয়ে গেল ?

এ কথার মানে ? তার মানে তুমি বলতে চাইছ, আমি মিথ্যে কথা বলছি ! তোমাকে না দিয়ে বলছি দিয়েছি। আমি তোমার চোখে এত হীন, এত নীচ ! তা হলে ত আমার আর বেঁচে থাকা চলে না। আমার আত্মহত্যাই করা উচিত। তোমার মা ঠিকই বলে, মেয়েরা কখনও আপনার হয় না।

মুকুর মুখ চুন। কনক কিছু বলব বলব করেও বলার সাহস পাচ্ছে না। মেসোমশাই টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে নিলেন। মনে হয় টুপি পরেই আত্মহত্যা করবেন। যেতে হলে সেজেগুজেই যাওয়া ভাল। আমাদের পাড়ার গবা গামছা পরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। মহিলারা দেখতে ছুটলেন। ফিরে

আসতে আসতে বললেন, মুখপোড়া ভারি অসভ্য। কুমুদবাবু ফুলশয্যার পোশাকে গলায় মালাটালা পরে কলকাতার ভাল হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে বিষ খেয়ে মারা গেলেন। নীল চিঠির কাগজে লিখে গেলেন, চিন্তামণি, আমার এই দেহখানি তুলে ধর, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর। ইতি, কুমুদের লাশ। কে এই রমণী! সবাই বললে, ফিলমের হিরোইন।

টুপিটা তুলতেই কনক. কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের গলায় বললে, ওই ত আপনার চাবি।

মেসোমশাই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। রিঙে লাগান ছোট্ট দু'টি চাবি। মুকু ফোঁস করল। কপাল ক্রমশ হাঁটুর দিকে ভাঙছে। পিঠ নুয়ে পড়ছে। ফুলে ফুলে উঠছে। মেসোমশাই বললেন, বয়েস বাড়ছে, বয়েস। কিচ্ছু করার নেই। এজলাসে উঠে বাদী, বিবাদী নাম ভুল হয়ে যায়। ছ'বার কোঁত পেড়ে আজকাল শিবস্তোত্র পড়তে হয়। বাতে ধরেছে। তবু কান্না! কনক আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। বল, টু আর ইজ হিউম্যান, টু ফরগিভ ডিভাইন।

কনক মুকুর পিঠে হাত রেখে বললে, কি হচ্ছে কি? শুধু শুধু কাঁদছিস কেন?

দিদির কথায় ফল উলটো হল। মুকু হাপরের মত ফুলতে লাগল আর সাপের মত হিস হিস।

বাড়ি ভরে গেছে মেয়েলী জিনিসপত্রে। লম্বা লম্বা শাড়ি নেমে গেছে দোতলা থেকে একতলায়। তারে ঝুলছে শায়া, ব্লাউজ। বারান্দায় হিল তোলা জুতো। চুল বাঁধার ফিতে, মাথার কাঁটা, সেফটি পিন, মাথায় মাখার তেল, সাবান। সারা বাড়িতে একটা মেয়েলী গন্ধ। জানি না বাবা, পিতাঠাকুর ফিরে এসে কি মূর্তি ধরবেন। একটা নয়, দু-দুটো মেয়ে। ছোট হলে কথা ছিল না, বেশ বড় সড়। অতিথিরা খাওয়াদাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে একটু কাত হয়েছেন। দীর্ঘ ট্রেনভ্রমণের ক্লান্তি কাবু করে ফেলেছে। মেসোমশাইয়ের নাক ডাকছে মিঠে সুরে। যতটুকু জানা গেল, এঁরা মাসখানেক থাকবেন। মুকু বি .এ পরীক্ষা দেবে, কনকের হবে চিকিৎসা। টনসিলে বেচারা বড়ই ভুগছে। কনক বি .এ পাশ করে বসে আছে। আরও পড়বে না বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে, এই নিয়ে দোটানা চলছে। পড়লে ফিলজফি নিয়ে এম .এ করবে। অসম্ভব ভাল রাঁধে। এত সুন্দর ঝোল রেঁধেছিল, মুখে লেগে আছে এখনও। ওই সেই সংগীতের মত। পিতা রান্নার থিয়োরি খুব ভালই জানেন, প্র্যাকটিক্যাল কনকের কাছে গো-হারাণ হারবেন।

আমিও শুয়ে পড়েছি। আরাম হারাম হ্যায় নোটিসটি আপাতত উলটে রেখেছি মনের দেয়ালে। যেখানে শুয়ে আছি, সেখান থেকে কনক আর মুকুর পা দেখা যাচ্ছে। মেসোমশাইয়ের ভুঁড়িটি ওঠানামা করছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। নির্জন দুপুরে আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে যুবকের যুবতীর সুডৌল পদযুগল দর্শন সম্পর্কে শাস্ত্রের কি সাবধান বাণী আছে জানি না। চোখ যদি অনবরতই ওদিকে চলে যেতে চায় তাহলে আমি কি করতে পারি! বিল্বমঙ্গল হয়ে যাব? রে চক্ষু, এই কাঁটার খোঁচায় দিলুম তোর বারোটা বাজিয়ে। সে মনের জোর আমার নেই। বাঁ দিকের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারে কেষ্টঠাকুর বসে আছেন কদমতলায় নধর একটি গাভীর গলা জড়িয়ে। সেদিকে তাকাতে কি হয়! দ্বারকা, মথুরা হয়ে সোজা কুরুক্ষেত্রে চলে যাও না কেন! সেখান থেকে ঠেলে ওঠ মহাপ্রস্থানের পথে। মন যার লোভী সে হবে সন্ন্যাসী! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার শখ। একবার করে ক্যালেণ্ডারের দিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছি, ঘাড় অটোম্যাটিক ঘুরে যাচ্ছে উলটো দিকে। লাল মেঝের ওপর দিয়ে চিনিলোভী পিঁপড়ের মত দৃষ্টি গুটি গুটি গিয়ে ঠেকছে সঠিক স্থানে। পা। পা থেকেই কি পাপ শব্দ এসেছে! ভাষাতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন। সায়ার সামান্য অংশ, শাড়ির পাড়। চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে। যে নিজেকেই নিজে সামলাতে পারে না, সে সামলাবে জগৎ! এই বড় বড় চোখে তাকিয়ে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত তাবৎ মানবকুলকে স্তম্ভিত করে ফেলবে! দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয়ে পৃথিবী কাঁপাবে! কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে ঠিকই তবে তিনি সহস্রারে না উঠে নিচের দিকে নেমে বসে আছেন। ভিমরুলের চাকে খোঁচা। এই ত গত পরশু দিনই পড়লুম, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—কামিনীকাঞ্চন ভোগ। যে ঘরে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুশকিল। আমি কি বিকারের রোগী! তিন দিন আগে আমাশার রোগী। আজ দেখছি বিকারের রোগী। মনের কোন উন্নতি হয় নি। অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে

গেল। আহা, ছি ছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় সুখেন চিৎকার করছে, পিন্টু, পিন্টু। একটা গলা করেছে বটে। যেমন ষাঁড়ের মত চেহারা, তেমনি গলা। স্কুলে পণ্ডিতমশাই সুখেনের নাম রেখেছিলেন, সুখেন ষণ্ড। দিবা স্বপ্ন চটকে গেল। মেসোমশাই ধড়ফড় করে উঠে বসে বললেন, কে, কে ? উঠবেনই ত। গলা শুনে মরা মানুষও উঠে বসবে। জানালার ধারে গিয়ে বলছি, দাঁড়া, দাঁড়া, মেসোমশাই আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেঘগর্জনের সুরে বললেন, অসভ্যের মত চেঁচাচ্ছ কেন, রাসকেল ! মেরে মুখ ছিঁড়ে দোব। সুখেন কেমন যেন হয়ে গেল। এই ধরনের আকাশবাণীর জন্যে প্রস্তুত ছিল না ! এ আবার কে রে বাবা ! বোঝো ঠ্যালা ! বাবারও যেমন বাবা থাকে, ষাঁড়ের ওপরেও ষাঁড় থাকে।

আমাকে প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কে ? তোমার বন্ধু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইডিয়েট।

কনক আর মুকু দু'জনেই উঠে এসেছে চোখ রগড়াতে রগড়াতে। পৃথিবীর সমস্ত পিতাই যেন ষড়যন্ত্র করে বসে আছেন। বজ্রের মত কঠোর। দাদু না হওয়া পর্যন্ত কোমল হব না। স্রেফ চাবকে যাও। মেয়েদের এক ধমক লাগালেন, ওখানে কি, ওখানে ? যাও ভেতরে যাও। জানোয়ার দেখ নি ?

ধমক দিয়ে ভালই করেছেন। আমার সমর্থন আছে। সুখেনের সামনে সুন্দরীদের না বেরোনই উচিত। যেমন করেই হোক সুখেন ভাব জমাবে। উভয়পক্ষ ক্রমশই জমাট হয়ে উঠবে। অন্য কেউ আর পাত্তা পাবে না।

সুখেন বলে, তোমরা যে যাই বল, আমার জন্ম মেয়েদের জন্যেই। খেঁদীই হোক, বুঁচীই হোক, অপ্সরাই হোক, সব আমার। বেশ হয়েছে ব্যাটা। চেঁচা গাঁক গাঁক করে।

নিচে নেমে দরজা খুলতেই সুখেন বললে, লোকটা কে রে ?

মেসোমশাই।

রাস্তায় দেখা হোক, একদিন পেছন থেকে কাছা খুলে দিয়ে পালাব।

খুলে দেখ না ! জজ সাহেব। ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন।

মেয়ে দু'টো কে রে ? নিচু ফিসফিসে গলায় সুখেন জানতে চাইল।

মেসোমশাইয়ের মেয়ে।

সুখেন সামান্য দমে গেল। সুর পালটে বললে, জজসাহেবের মেজাজ এইরকম না হলে মানায় না। কত মারাত্মক, মারাত্মক আসামীকে ফাঁসিতে লটকাতে হয় বল ? চল, ওপরে চল, প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে নি।

তুমি যাও ডালে ডালে। তোমাকে আমি চিনি না! মাতামহের গান, থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই। আর একটু ভয় না দেখালে সুখেন ঠেলে ঠুলে ওপরে উঠে পড়বে, তার পর ব্যাপার কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে ? আকাশ প্রদীপ হয়ে বসে থাকবে। যেমন করেই হোক সুখেনকে ঠেকাতে হবে।

প্রণাম করার চেষ্টা আর ক'র না। ভীষণ রাগী মানুষ। আইনের কোন ধারায় ফেলে দেবেন জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এই ত সকালে যখন এলেন, পেছন পেছন পুলিসের দু'টো গাড়ি এল। এরই মধ্যে বড় দারোগা তিন বার সেলাম বাজিয়ে গেলেন। এই রকে বোস। এখন মাসখানেক আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষার চেষ্টা করো না।

সুখেন মন খারাপ করে রকে বসে পড়ল। বাইরে গ্রীষ্মের দাবদাহ। বেলা পড়ে এসেছে। পথে লম্বা লম্বা ছায়া। উত্তাপ কিন্তু এতটুকু কমে নি। ঢোকার গলিতে এই রকটি বেশ ঠাণ্ডা। ভেতর বাড়ি থেকে লম্বা একটা নর্দমা এই পথেই বাইরে চলে গেছে। একটু আধটু গন্ধ নাকে এলেও গ্রীষ্মের দুপুর কাটাবার বড় ভাল জায়গা। বসে বসে প্রাণের কথা, মনের কথা বল নিশ্চিন্ত আরামে। সুখেন বললে, দেশলাইট আন ত একবার।

দেশলাই ? তুই এখানে সিগারেট খাবি না কি ?
কেন, কি হয়েছে ?
আমাকে বাড়িছাড়া করতে চাস ? সিগারেটের গন্ধ ওপরে উঠবে, তারপর আমার কি হবে ?
তুই দেখছি ভয়ে ভয়েই মরলি। মায়ের আঁচল ধরা ছেলে দেখেছি, বাপের এমন কাছাধরা ছেলে নি ! তোর ওই মেয়েলী, মিনমিনে স্বভাবটা ছাড়। পৃথিবীটা অনেক অনেক বড়। পুরুষ হয়ে সব রকমের অভিজ্ঞতা না হলে পরে ওই বেচারার মত পড়ে পড়ে মার খাবি সারা জীবন। ব বাবাই তোর মাথাটি খেয়েছেন। মা-মরা ছেলে, মা-মরা ছেলে বলে আগলে আগলে এমন একটি তৈরি করেছেন, এর পর শাড়ি পরিয়ে কপালে টিপ এঁকে কারুর পুত্রবধূ করে সাত পাকে ঘুরিয়ে না ন।
তোর মত এঁচড়ে পেকে লাভ নেই।
তুমি আর এঁচড়টি নেই ভাই। মেঘে মেঘে মন্দ বেলা হয় নি। তুমি একটি খাজা কাঁঠাল। খবর যেছি, বেশ সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হচ্ছে।
তার মানে ?
মানে ? তুই আজকাল রেগুলার ওই পোড়ো মন্দিরটায় যাস কেন ?
কোন পোড়ো মন্দির ?
কিছুই যেন জানিস না, না ? বিন্দুবালার শীতলাতলায় ?
সাধন ভজন করতে।
এত দেব দেবী থাকতে মা শীতলা ! কস্মিনকালে তুই কোনও শীতলাসিদ্ধ মহাপুরুষের নাম ইতিহাসে ? কালী, তারা, শিব, দুর্গা, শোনা গেছে। তা, মা শীতলা ত সামনে বসে আছেন গাধার পিঠে, টা হাতে, তুমি ব্যাটা পেছন দিকে বিন্দুবালার দাওয়ায় গিয়ে ওঠ কেন ? ওখানে তোমার কি মধু ?
কোনি মধুই নেই।
মারব ব্যাটা এক থাপ্পড়। ছায়া আর মায়ার নাম শুনেছিস ?
বিন্দুবালার ভাইয়ের মেয়ে। কেন কি হয়েছে ? কেউ কোথাও নেই তাই পিসীর কাছে মানুষ হচ্ছে। খারাপ কি হয়েছে ?
ওদের কিছুই খারাপ হয়নি, হয়েছে তোর। তুই এবার দয়ে পড়ে মজবি। মজবি কি, রিপোর্ট বলছে জ গেছিস।
সে কি রে ? ছায়া ত পিসীর মত গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছে, আর মায়া ? অতি সাধাসিধে মেয়ে।
ঘুঘু তুমি ভিটে দেখেছ, এইবার ফাঁদ দেখবে। সে ফাঁদে পড়লে তোমার পিতারও ক্ষমতা নেই টেনে করেন। ওই মা শীতলার গাধা হয়ে দাওয়ায় বাঁধা থাকবে।
আরে বাঃ ?
নাবালক ছেলে, বাড়ি বসে হেঁসেল ঠেলিস, মেয়েরা যে কি কল বুঝবে সেদিন, যেদিন ছায়া, মায়া বিন্দুবালা এক সঙ্গে চেপে ধরবে।
জানিস, আমি মেয়েদের পায়ের দিকে ছাড়া আর কোনও দিকে তাকাই না ?
পা বেয়েই সুড়সুড় করে পিঁপড়ে ওপর দিকে ওঠে। ব্যাধ কাঠির ডগায় আঠা মাখিয়ে পাখি ধরে, ত ?
সুখেন খুব খানিকটা জ্ঞান দান করে উঠে পড়ল। নতুন নেশা ধরেছে, সিগারেট। এখানে বসে দিন গোটা তিনেক ফোঁকা হয়ে যেত। ছাদে উঠে উত্তর দিকের আলসেতে দাঁড়িয়ে পাশের টোপ ফেলার চেষ্টা হত। অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চলছে। আমার জন্যেই বিশেষ সুবিধে করতে না। সুখেন ব্যায়াম করে ভাগাবে, কান ধরে নিলডাউন হব আমি। মেয়েটিও কম যায় না। মা

আরও সাংঘাতিক। সেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, নকল করতুম। কড়ে রাঁড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে 'যা-ই'। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, 'ও তোপ মাছওলা'। নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সেজে সিঁথে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সঙ্গে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা। আমিও আজকাল বুঝতে পারি ঠাকুর চিনতে পারি না, হয় ত পারব এক দিন, আর একটু ঝড়ঝাপটা খাই, মেয়েছেলের ব্যাপারস্যাপার বে ভালই বুঝি। উত্তরের ওই বাড়িটি বড় সুবিধের নয়। ও দিককার ছাতে পিতাঠাকুরের চন্দ্রমল্লিকার চা আবাদ। গোটা পঞ্চাশ টব বসান আছে। তিনি ও তল্লাটে যান ছাতা মাথায় দিয়ে। তার স্বরে ইংরেজ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে। কুহকিনীর হাত থেকে যেন শেকসপীয়ারই রক্ষা করবেন, ক্যানস্ট দা নট মিনস্টার টু এ মাইণ্ড ডিজিজড। প্লাক ফ্রম দি মেমারি এ রুটেড সরো। একবার নিচু হয়ে বসতে পারলে শেকসপীয়রের ছুটি। তখন গাছেদের সঙ্গে নানা সমস্যার আলোচনা। সবই তাদের জগতের নাঃ তোমাকে আর বাড়তে দিলে না মানু। বুরুশ দিয়ে পাতার পিঠ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি কালো পোক ঝাড়েন আর বলেন, ব্লাডি বাগারস।

Nothing begins, and nothing ends,
That is not paid with moan,
For we are born in other's pain
And perish in our own.

মাথায় মাথায় তিনটে ম্যাগনাম সাইজের বউ। গতর যেন ফেটে পড়ছে। তেমনি বেশবাস। স আমায় ধর ধর। মালা পর পর। পুরুষ একজন! কদাচিৎ তাঁকে দেখা যায়। ঘাড়ে শাঁস বের করা চুলে ছাঁট। ঠোঁট দুটো পুরু পুরু। সিল্কের পাঞ্জাবি। দিশী ধুতি। তিনি যেন সব সময় এলিয়েই আছেন। মু সদাসর্বদাই হাসিতে ভুবড়ে তাবড়ে আলুর পুতুল। সুখেন ঠিক জলেই চার করেছে। মাছের নাম জবা বেশ খেলিয়ে মাছ। আমার তাতে কাঁচকলা। বেল পাকিলে কাকের কি? তবে এটাও ঠিক, এ এত বড় একটা ছাত পড়ে থাকতে আমারই বা কি দরকার ঘেঁষটে ঘেঁষটে ওই উত্তরে যাবার? রোদ পড়ে এলে ঝারি নিয়ে ফুল গাছে জল দেওয়া আমার একটা ডিউটি। মাথা নিচু করে সেই সমাধা করে সরে পড়লেই হয়! তা হলে অত বারে বারে, আড়ে আড়ে তাকান কেন? এ আবার তর ব্রহ্মচারী! ওই জবাসুন্দরীর জন্যে পিতাকে এক দিন নির্ভেজাল মিথ্যে বলেছি। গাছে এসেছে ফুল নাম তার গ্লোবল। চুলে আয়েস করে চিরুনি চালাতে চালাতে জবা নিজে থেকেই বললে, কি হয়েছে! ব্যাস্, আর যায় কোথায়? মনের সাঁকো নড়ে ঝপাৎ করে জলে। ফুলের ব্যাখ্যানা হল মিনিট। জবা হেসে হেসে, চোখ বড় বড় করে, ছোট ছোট করে, মাথার ওপর হাত ঘুরিয়ে চুল বা বাঁধতে, খোঁপা করতে করতে শুনে গেল। যেন কতই মনোযোগী চন্দ্রমল্লিকার ছাত্রী! লাল ব্লাউজ হাত তোলাতুলির শোভা দেখতে দেখতে কুপোকাৎ। কোথায় ব্রহ্ম, কোথায় আদি অনন্ত! মুখে কুটো। শেয়ানা মন মাঝেমধ্যে খোঁচা মারছে, অ্যায়, কি হচ্ছে! আর একটা মন সঙ্গে সঙ্গে উঠছে, চোপ্। একে বলে সৌন্দর্যের শিল্পীসুলভ কদর। নারীর সৌন্দর্য। কালিদাস বড়, না মুনি বড়? র‍্যাফেল, দাভিনচি, না, স্বামী অঘোরানন্দ! ঈশ্বর তা হলে মহিলাদের সৃষ্টি করেছিলেন কেন

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশ দক্ষং
পুষ্পোদ্‌ভেদং সহকিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ

কি বর্ণনা! আমার পিতাও ত এই রচনায় মুগ্ধ, বিমুগ্ধ, তড়িতাহত। কালিদাস, দি গ্রেট পোয়েট আত্মহারা হয়ে যান। রূপ বর্ণনা মহৎ, রূপ দর্শন লাম্পট্য, এ যুক্তি কি জজে মানবে? তুই মনের তারিয়ে তারিয়ে জবাকে দেখ।

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং— ক্ষেয়োদীত, বৃষকাষ্ঠ অধরপণ্ডিতও এই অংশটি

কবতে করতে বসে হাবুডুবু রাজভোগেব মত হয়ে যেতেন। কই ফণীবাবুকে কি কেউ এমন করে দেখে কাবা করবেন,

নধরকান্তি ঘটোৎকচং
তিন তিসি লোটাগর্দানং।
সগুমফ গোলাকারং
টাকাঙ্কিত তিন্তিড়িবৃক্ষং॥

সেই জবাসুন্দরীকে সম্মোহিত হয়ে একটি স্নোবল উপহার দিয়ে ফেলেছিলুম। জীবনের প্রথম এবং আপাতত শেষ পাপ কার্য। গভীব রাতে চোখ বুজলেই জবাসুন্দরীর রক্তবাঙা উন্নত ব্লাউজ। সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ বুজলেই জবাকুসুম সঙ্কাশং, ঠিক সেই অবস্থা। অনুশোচনায় মরি আর কি? এ কি অধঃপতন। জবাকে কুসুম দেবাব এত মালী ছিল যে আমার মত কৃশকায়, খেঁকুরে ছাদমালীকে আর মনেই রইল না। সেই ঘটনা থেকেই বুঝেছিলুম, আমি একটি বোকা পাঁঠা। হয় বৃষকাষ্ঠ, না হয় কাঠিয়াবাবা হবার জন্যে জন্মেছি।

সুখেন একটা ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল। অনেক দিন হয়ে গেল, মায়া এক শিশি কালি চেয়েছিল। মেয়েটি খুব সুন্দর ছবি আঁকে। হাতেব লেখা যেন ছাপার অক্ষর। যখন কাজ করে পাশে বসে দেখতে বড় ভাল লাগে। কেমন কবে আঁকছে, রঙ করছে, লিখছে। পরনে কনট্রোলের লালপাড, সাদা শাড়ি, গেরুয়া ব্লাউজ। পিঠে ছড়ান রুক্ষ চুল। কেমন একটা শিল্পী শিল্পী চেহাবা। সুখেনের সবেতেই পাপ। আমার কেউ কোথাও নেই। ছায়া, মায়া ত আমার বোনের মত। ছায়া আমাব চেয়ে বয়েসে ঢেব বড়। মুখে বড বড বসন্তেব দাগ। গেরুয়া নিয়েছে। তার সঙ্গে কারুর কোনও প্রেম, ভালবাসা, বিযে হতে পারে? সুখেন শুধু একটা কথাই জানে, যন্তর। ওর বাবার উচিত ছেলের শ'খানেক বিয়ে দিয়ে একটা আডতে এক বছব বন্ধ কবে রাখা। আমাব পিতা যেমন বাত বারোটার সময় গলায় ডাণ্ডা পুবে এক জাব মোরব্বা খাইয়েছিলেন জোর করে।

মায়াকে আজ এক দোয়াত কালো কালি দিয়ে আসতেই হবে। দেবার মত আমার আব কি আছে? পিতার ধনে পোদ্দারি। নানা জিনিস তৈবি তাঁর হবি। লেখাব কালি তৈরি তার মধ্যে একটি। বড কঠিন কাজ। সব চেয়ে দুরূহ কেরামতি হল কালো কালি তৈবি। এতটুকু তলানি পড়বে না, ঝরনা কলমের মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম ধারায় বেরতে থাকবে অবিরাম। বিলিতি কালির কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, স্টিফেনস স্ক্রিপ, কুইঙ্ক, ওয়াটাবম্যান, সোয়ান। সারি সারি বোতল, মুখে ফোঁদল আর বিভিন্ন ঘনত্বের ফিলটার পেপার। সারাদিন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পডছে পরিশ্রুত কালি। নির্জন নিঃস্তব্ধ ঘরে কান পাতলে শোনা যাবে বিন্দুপতনের শব্দ, টুপ, টুপ। এমন সব উপমা মাঝে মাঝে মনে আসে যা কালিদাসের পিতাও ভাবতে পারবেন না। বিশাল পালঙ্কে সময় শুযে আছে। ডান হাত ঝুলে আছে পালঙ্কের পাশে। তলায় একটি পাত্র। ধমনী চিরে গেছে ধারাল অস্ত্রে। রক্তের বিন্দু পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। পাণ্ডুর হয়ে আসছে শরীর। দিন যায়, দিন যায়। গ্রীক পদ্ধতিতে সময়ের আত্মহত্যা। এর নাম কালি-ঘর। মাটির গামলায় বেদানার খোলা আর হরীতকী পচছে। তাকে তাকে অসংখ্য শিশি। কোনও কোনও শিশি মৃত্যুর মত নীল, খুনীর মত লাল। চিনির দানার মত শুভ্র জরান এক ধরনের পদার্থ, অকজ্যালিক অ্যাসিড। বাদামী ট্যানিক অ্যাসিড। ঝুলের আবরণে হরেক শিশি বসে আছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। ঘরটা তেমন আলোকিত নয়। শীতের শেষ দ্বিপ্রহরে ঢুকলে মনে হবে প্রেতাত্মা নৃত্য করে চলেছে নূপুর পায়ে।

মায়ার জন্যে কালি আমাকে চুরি করতে হবে। এ শিশি থেকে একটু, ও শিশি থেকে একটু। এ চুরিতে নীতির প্রশ্ন নেই। অর্থ নয়, অলঙ্কার নয়, সামান্য তরল পদার্থ। বিদ্যার্জনের প্রয়োজনে লাগবে। তা ছাড়া একটা গর্বও আছে। আমার পিতা কি না পারেন? আমি সামান্য হলেও তিনি অসামান্য। কত কি পাবেন, যা কেউ পারে না।

শিশিতে কালি ঢালাঢালি চলছে, কনক এসে ঘরে ঢুকল। নিচে কি করছিলে এতক্ষণ? এঁদো সাঁতসেঁতে গলিতে?

ওই যে আমার এক বন্ধু এসেছিল সুখেন।

বেশ দেখতে ছেলেটিকে। কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য! তোমার যদি ওই রকম হত। একটু চেপে খাওয়াদাওয়া কর না! দুধ, ঘি, মাখম। সকালে তোমার খাওয়া দেখলুম ত! পাখির আহার!

হুম্‌।

স্বাস্থ্য তুলে কথা বললে উত্তর এক অক্ষরেই হওয়া উচিত। শরীর ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কিছুই নেই। এ যেন গো-হাটায় গরু বিক্রি। নধর গাভীটির দিকে সবাই দৌড়বে। দাম উঠবে চড়চড় করে। শাস্ত্র বলছেন, দেহটা কিছুই নয়। আসল হল আত্মা। সে বাবা এমন জিনিস, আগুনে পোড়ে না, জলে গলে না, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না। নাও, কি করবে কর। মেয়েদের কথাবার্তাই যেন কেমন কেমন। চুল ওলটান ফচকে ছোঁড়া দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেল। কি ? না, শরীর! সাতটা বাঘে রুল অফ থ্রির হিসেবে রোজ এক ঘণ্টা করে খেলে তিন দিনে সুখেন ফুরোবে। আর আমাকে ? বাঘ দেখেও দেখবে না। এক যদি কোনও এয়োস্ত্রী বাঘ কাটোয়ার ডাঁটা ভেবে একটু চিবিয়ে দেখে। তাতে হয়েছেটা কি! সুখেনের ভেতর দেখ, আর আমার ভেতর দেখ! শ্রী চৈতন্যদেবের চেহারা কি গোয়াবাগানের ব্যায়ামবীরের মত ছিল! শ্রী রামকৃষ্ণ পেটরোগা ছিলেন। সারদা মা কাঁচকলার ঝোল ভাত রেঁধে খাওয়াতেন। বুদ্ধদেব কি রোজ গুপেগুণ্ডার মত মুগুর ভাঁজতেন। পুণ্যের শরীর এক রকম, পাপের শরীর আর একরকম। মেয়েরা বোঝে না কেন ?

কনক উবু হয়ে আমার গা ঘেঁষে বসল। বসল ত ভারি বয়েই গেল। আমি ত আর সুখেন নই যে ভেতরটা জল থেকে তোলা মাছের মত ছটফট করবে। আমি ত আগমার্কা ঘি। কোনও ভেজাল নেই। খুব বেসামাল হয়ে পড়লে, একবার শুধু বলব, মা, বিপত্তারিণী রক্ষা কর। গেল, গেল বুঝি সব রসাতলে। কনক ফিস ফিস করে বললে, কি হচ্ছে কি এসব ? সারি সারি বোতল!

কালি ফিল্‌টার হচ্ছে।

কি হবে এত বোতল বোতল কালি ?

লেখা হবে।

বাব্বা, মহাভারত লেখা হয়ে যাবে যে!

আমার কলমে একটু ভরে দেবে ? দেখি কেমন কালি!

এ জিনিস বাজারে মিলবে না। ঝুল কালো। নিবে আটকায় না। যে কাগজে লিখবে সে কাগজে ভাগ্যের লিখনের মত চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

বাঃ পাক্কা সেলসম্যান ভাস্করবাবুর মত কথা বলতে পারছি। একটুও আটকাচ্ছে না। পিতার ইচ্ছে কালি যদি কালীর মত দাঁড়িয়ে যায় মহাদেবের বুকে, মহাদেব মানে বাঘমার্কা সাদা কাগজ, আর লজ্জায় যদি জিভটি না বেরোয়, তা হলে নেমে পড়বেন ব্যবসায়। নামও ঠিক, ইলিসিয়াম ইঙ্ক। আমি হব সেলসম্যান। দোকানে দোকানে অফিসে অফিসে ঘুরব। লেখার কালি দিয়ে শুরু করে, স্ট্যাম্প প্যাড ইনক, মার্কিং ইঙ্ক, শেষ হবে ছাপার কালিতে।

কনকের সোনার কলমে কালি ভরা হল। এমন কমল আমি জীবনে দেখিনি। নাম লেখা আছে পার্কার। এঁরা বেশ বড়লোক। চালচলন, সঙ্গের জিনিসপত্র, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, মেসোমশাই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই দেবীরই কৃপা লাভ করেছেন।

মাটির যে গামলাটায় বেদানার খোলা আর হরীতকী পচছিল সেটা হঠাৎ নড়ে উঠল। কনক বললে, ওই দেখ জ্যান্ত কালি। ভুড় ভুড় করছে।

ও অমন হয়, ফার্মেন্টেশান হচ্ছে ত। নিজের জ্ঞান জাহির করতে পেরে বেশ গর্ব হল। গামলা থেকে কি একটা লাফিয়ে উঠে আবার গবাৎ করে গামলাতেই পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। কনক বললে, ওই দেখ কালির ন্যাজ বেরিয়েছে।

দুজনেই গামলার দিকে ঝুঁকে পড়লুম। কালির আবার ন্যাজ কি রে বাবা! পিতা চেয়েছিলেন বিলিতি কোয়ালিটি। তিনি ত ন্যাজ চান নি। ফিল্‌টার করলে লাঙ্গুল বাদ যাবে কি! বাঁদরকে ফিল্‌টার

করলে মানুষ হবে ? ডারউইন সায়েব বেঁচে থাকলে একটা বেয়ারিং চিঠি লিখতুম।

আমিও ত আর এক পণ্ডিত। অনেক ভেবেচিন্তে বললুম, এটা হল সেই ব্যাপার বুঝলে কনক, জলে বিচিলি ভিজিয়ে রাখলে দিন কতক পরে ছোট ছোট সাদা সাদা, ন্যালবেলে পোকা হয়, মাছের খাদ্য। কেমন হয় ত ?

কি জানি, হয়ত হয়।

কি জানি মানে ? আমি নিজে করে দেখেছি। আমার একটা গোলডফিশ ছিল। বেড়ালে খেয়ে না ফেললে আজ কত বড় হত। বেদানা কাবুলে জন্মায়, হরীতকী সাধুদের আহার। কাবুলীদের চেহারা দেখেছো ? সাত ফুট বাই পাঁচ ফুট। সেই বেদানার খোলা পচে যে পোকা হবে তার আকার আকৃতি একটু বড়সড়ই হবে। এ ত কমন সেনস্।

আমার থিসিসও শেষ হল আর সেই কাবুলীপোকা তিড়িং করে এক লাফ মেরে, পড়বি ত পড় কনকের কোলে।

ওরে বাব্বা, খেজুর, বলে কনক উলটে পড়ল। সেই পা ! পা থেকেই পাপ। পরিপূর্ণ তিনটি বোতল সুন্দরীর পদাঘাতে তিন গুণ্ডার মত, তিন দিকে ছিটকে গেল। একেই বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পিতৃদেবকে রাতে কি কৈফিয়ত দেবে ?

মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল

পণ্ডিতের ঘরেই মূর্খ জন্মায়। আবার মূর্খরাই পণ্ডিত হয়। সেই তিন পণ্ডিতের গবেষণার গল্প। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চাষার কোদালে একটি তালের আঁটি উঠেছে। জটাজুটধারী। কি বস্তু কে জানে ? কোনও দেবতা-টেবতা নয় ত ! তিন পণ্ডিত এলেন। টিকি নেড়ে, নস্যি নিয়ে, একজন বললেন, এ বস্তুটি হল শকুনের বাসসা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দু'জন পণ্ডিত কখনও একমত হতে পারেন নি। দ্বিতীয় পণ্ডিত বললেন, তুমি কস্যু জান, এটা বাদুরের বাস্‌সা। তৃতীয় পণ্ডিত বললেন, প্রণাম কর, ইনি হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাথা। চাষা ব্যাটা কোদালের কোপে ধড় থেকে নামিয়ে এনেছে। কুষ্মাণ্ডকে নিয়ে চল কতোয়ালের কাছে, বিচার হবে। কারুর সর্বনাশের রাস্তা খোলা হলে পণ্ডিতরা সঙ্গে সঙ্গে একমত। আহা ব্যাটা শূলে চড়বে। হাকিম শূলে প্রায় চড়িয়েই ফেলেছিলেন। হাকিমের স্ত্রী বললেন, আরে ওটা ত তালের আঁটি। আমাকে দাও, ভেঙে ফোঁপলটা খেয়ে ফেলি।

গামলার প্রাণীটি যে একটি নেংটি ইঁদুর দুই পণ্ডিতে বুঝে উঠতে পারি নি। কনকের কোল থেকে মেঝের উপর তার পলায়নের রেখা টেনে জলচৌকির নিচে গিয়ে ঢুকেছে। আর তাকে পায় কে ? এদিকে তিন বোতল কালির স্রোত মেঝের ঢাল বেয়ে নর্দমার দিকে গড়িয়ে চলে গেছে। নীল, কালো, নীলকালো, সব মিলে মিশে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের মত একাকার। মাঝখানে আমি এক শ্রীরামকৃষ্ণ হাত উর্ধ্বাকাশে তুলে সমাধিস্থ। কনক এক মহামায়া, ভূমিশয্যায় আড়কাত হয়ে হেসে কুটোপুটি। দরজায় উঁকি মারছে আর এক মহাশক্তি, মুক্ত। কে যেন বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার। আমার মাতামহ। মাতামহী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হয়ত বলেছেন, স্বর্গদ্বার। শৃগাল অনেক লম্ফ-ঝম্পর পর নাগাল না পেয়ে বলেছিল, দ্রাক্ষাফল টক। মাতামহী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরে পড়ার পর সেই স্বর্গদ্বার হয়ে গেল নরকের দ্বার। আমার তেমন কোনও বন্ধন নেই, প্রায় নাঙ্গাবাবা, আমি ভেবে চিন্তেই বলছি, বাক্যটির মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে। আমি যদি সরাইকেল্লার মহারাজা হতুম, তা হলে মায়ার কাছে যেতুম গজমতির হার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে। এক শিশি কালি ত সেই গজমতির হার। কনট্রোলের শাড়ি পরা রাজকুমারীর মনে সামান্য আঁচড় কাটার চেষ্টা। মানুষের অভাব বেড়েছে, স্বভাব কিছুই পালটায় নি। তপস্যা করলেও বেড়াল বেড়ালই থেকে যাবে। উপনিষদ কত আগেই বলে রেখেছেন, নান্য পন্থা। আদি রিপুকে মালসায় ফেলে গন্ধকের আগুনে পোড়ালেও কিছু হবে না।

ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিঙড়ে নিঙড়ে ওই কালিকে যতটা সম্ভব বোতলে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে রাতে এই সুন্দরীদের সামনে আমার নাজেহাল অবস্থা হবে। বারে বারে শুনতে হবে তিন চরণ কবিতা.

Sons dangle their fathers with a rope, creation kills the creator,
even the Almighty Lord.

কার লেখা কে জানে. বারে বারে শুনে শুনে কান পচে গেছে। ঘরের নর্দমার ছোট্টমুখে একটি গোল কাঠ গোঁজা। সেখানে তৈরি হয়েছে কালির আরব সাগর। এমন এক পাপ ছড়িয়েছে যাকে আর সহজে চাপা দেওয়া যাবে না। নর্দমা চুঁইয়ে ওপাশে সিঁড়ির দেয়াল দাগরাজি করবেই। এতক্ষণে করেও ফেলেছে। কতরকমের রসিকতা আছে! মুক্ বললে. আহা আমার বড় ইচ্ছে করছে ওই কালি পুকুরে একটা কাগজের নৌকা ভাসাই। কনক বললে. থাক. বুড়ী বয়েসে আর ছেলে-খেলার দরকার নেই। বাবা কোথায় রে?

বাথরুমে?

কনক বললে. এসো. দু'জনে মিলে যতটা পারি তুলি।

তুমি আবার হাতে কালি. মুখে কালি করবে কেন?

আমার অপকর্ম আমাকেও সামলাতে হবে।

এতক্ষণ আমরা কেউই লক্ষ করি নি. কেমন সহজে তুমি-তে নেমে এসেছি! পাশাপাশি বসে কালি তোলা হচ্ছে। বোতলের পাপ বোতলেই ফিরে যাচ্ছে একাকার হয়ে। ঘরে একটি মাত্র ছোট জানালা। তেমন আলো বাতাস আসে না। বেশ গরম হচ্ছে। এই প্রথম টের পেলুম. বেদান্তেও যা লেখা নেই. নারীদের শরীর থেকে অদ্ভুত একটা গরম হলকা বেরোয়। দীর্ঘ রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে প্রথম বৃষ্টি পড়লে যেমন একটা সুবাস ছড়ায়. তেমনি একটা গন্ধও আছে। ওদিকে আমার মন যাবার কথা নয় তবু যাচ্ছে। এমনও মনে হচ্ছে. হে প্রভু. রোজই যেন একবার করে বোতল ওলটায় এই ভাবে। আমার মনটা যেন কেমন কেমন করছে। গলায় চিক চিক করছে ছিলে কাটা সোনার হার। হাতের চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ। নাকছাবির পাথর এক একবার চমকে উঠছে। খেঁকুরে মনের পোড়া শ্মশানে বসে. বিসমিল্লা খাঁ সানাইয়ে ধরেছেন. পূরীয়া ধানেশ্রী। বৈশাখী সন্ধ্যায় ফুলওয়ালী হেঁকে চলেছে বেলফুল। তরঙ্গ মিলায়ে যায়. তরঙ্গ উঠে। সুখেন ঠিকই বলে গেল. পৃথিবী বিশাল। বেরিয়ে পড়. বেরিয়ে পড়। পুরানা কাগজ বলে থলে কাঁধে হেঁকে বেড়ালে সের সের কাগজ মিলবে. লোহা-লক্কড. শিশি-বোতল. ভাঙা কাচ মিলবে। মন মিলবে না. স্নেহ. ভালবাসা মিলবে না। যে পায়. সে পায়। এসব ভেসে ভেসে কোথায় চলে যাবে! ঘর থাকবে. বৈশাখ থাকবে. সন্ধ্যার নম্র অন্ধকার থাকবে,মানুষ থাকবে না। মেয়াদ এক মাস। তারে ঝোলা শাড়ি সরে যাবে. ফিতে. কাঁটা. চিরুনি. সাবান. তেলের সুবাস. চুড়ির শব্দ. সব. সব মিলিয়ে যাবে। আবার সেই শূন্য বাড়ি. শেষ বেলার ছায়া. দূরে বহু দূরে কোনও মায়ের চিৎকার-পিণ্টু ঘরে আয়।

এই ঠোট ফোলান ন্যাকামির জন্যেই ছেলেটার কিছু হবে না। কাব্য করেই কেবলে মোলো। কেউ বলে নি. নিজেকেই নিজের তিরস্কার। একটা দিনও পার হল না. মনেই মথুরা তৈরি করে নট-ঘট অবস্থা। একে কয়লার গোলায় চাকরি করে দাও। বোঝা মাথায় বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই রস মরে পুরুষ হবে। আর্মিতে পাঠাও প্যারেড করে জীবন যন্ত্রণা জুড়োবে। কালি বোতলে তোলো. মেঝে থেকে তুলে মেঝেতে নিঙড়চ্ছ কেন? স্বপ্ন দেখছ না কি?

তাই ত! কনকের কথায় চমক ভাঙল। কোন কল্পনাজগতে ভাসছিল মন!

সন্ধে হয়ে আসছে। মায়াকে কালির শিশিটা দিয়ে আসতেই হবে। প্রায় সাত দিন হয়ে গেল. দেখা সাক্ষাৎ নেই। সুখেন যাই বলুক বিন্দুবালার গাধা হয়েও সুখ আছে। যে সংসারে পুরুষ নেই সে সংসারে মেয়েদের স্বাধীনতার চেহারাই আলাদা। ভাল সারযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত আবহাওয়ায় ফুল যদি ফুটতে পারে সে ফুলের চেহারাই আলাদা। চেনাকেও অচেনা মনে হয়। মনে আছে কালিম্পঙে গিয়ে গন্ধরাজ

দেখে অবাক। কি ফুল ? কি ফুল ? মহা বিরক্ত হয়ে একজন বললেন, গর্দভ গন্ধরাজ চেন না। এদিকে গন্ধরাজ পুরোটা ফোটেই না।

যেন কণ্বমুনিব আশ্রম। হরিণ ছাড়া সবই আছে। ছিটে বেড়া। গাব ভ্যারেণ্ডার ঝোপ। সারি সারি কলকে, টগর, করবী। উঠনের মাঝখানে তেল চুক-চুকে পাতা, কাঁঠাল গাছ। তলায় বাঁধা হাবলা-গোবলা একটি ছাগ শিশু, লোটা লোটা কান। পেছন দিকে একটা ডোবা মত আছে। বর্ষায় ভেসে উঠন পর্যন্ত চলে আসে। মাটির উঠনে একটা চৌকি পাতা আছে। মেঘশূন্য চাঁদিনী রাতে ব্যাপাবটা ভীষণ জমে ওঠে। কাঁঠাল গাছের মাথার ওপব চাঁদ ওঠে। তারাদের জলসা। দক্ষিণের হৃদয় বিদারক বাতাস। ধূপ-ধূনোব গন্ধ। ঘণ্টাধ্বনি। রাতচরা পাখিব কটাস কটাস বন্ধন খোলা ডাক। চাঁদের আলো উদ্ভাসিত মাযাব পোড় খাওয়া মুখ। বিন্দুবালার সাধন জগতের কথাবার্তা। ভিজে কাপড়ে ছায়ার চলে যাওযা। কেমন কবে বৈরাগ্য আসে প্রভু ! জলে জাল ফেলে জেলে বসে আছে জলে।

সারাদিন রোদে পড়ে থেকে ডোবার জল এখন বাষ্প ছাড়ছে। গাছপালাব পেছনটা নীল নীল ধোঁয়া ধোঁয়া। মাযাবিনীর আঁচল উড়ছে। ছাগলটা চোখ বুজিয়ে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে। বেড়ার গায়ে একটি নীল শাড়ি শুকোচ্ছে। মায়া ঘরেব সামনের দাওযায় বসে, ঊরুতে ফেলে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে। গোটা কুড়ি হয়ে গেছে। আর কটা হবে কে জানে। দৃশ্যটি দর্শনীয় হলেও উটকো পুরুষেব দেখা উচিত হবে কি না বুঝতে পাবা যাচ্ছে না। শাস্ত্র এ-সম্পর্কে নীরব। অথচ প্রদীপের জন্যেই সলতে। সলতের জন্মস্থান মহিলাদেরই কদলিকাণ্ড সদৃশ জঙ্ঘার তৈলাক্ত, মসৃণ দেহ ভাগে। প্রদীপ না জ্বললে ধর্ম হয় না। সলতে না হলে প্রদীপ জ্বলে না। যুবতীব ঊরু না হলে সলতে হয় না। আমাদের মেনীদা যদি ঠ্যাং বেব করে সলতে পাকাতে বসেন, তাহলে এক পাকেই ত চিৎকার উঠবে। কাঁচি আন, ব্লেড আন। লোম বোল হয়ে সলতে সেঁটে আছে জোঁকেব মত। পরিণত পবিণতি লোম-ফোঁড়া।

তা হলেও, মাযা একটু বেশি বাড়াবাড়ি কবে ফেলেছে। অতটা অনাবৃত কবার প্রয়োজন ছিল না। বাড়িতে কোনও পুরুষ না থাকলে মেয়েদের সাহস বড় বেড়ে যায় ! এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। দলমাদল সামনে পড়ে আছে। কোথাও এতটুকু মরচে নেই। যাহা অন্তঃপুরে থাকে তাহা কি এত বিস্ময়কর ভাবে শুভ্র হইয়া থাকে ! বালক, প্রশ্নের উত্তর তোমার চক্ষুর সম্মুখেই প্রসারিত। লুকাইয়া, লম্পট জমিদাব পুত্রেব ন্যায় দেখিও না। মহাবীরেব মত হুপ্ করিয়া লাফাইয়া সামনে গিয়া পড়। পাপ পুণ্য হইয়া যাইবে। শৃগাল সিংহের বলপ্রাপ্ত হইবে। বলদা, মোক্ষদা, মায়া, অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া দেবকার্য কবিতেছে। তুমি বহুবার পাঠ করিয়াছ, দেবকার্য—লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকিতে নয়।

বযস্ক পুরুষদের দেখেছি অন্তঃপুরে ঢোকাব সময় গলায় এক ধরনের শব্দ করেন, যা কাশিও নয়, চাপা হাঁচিও নয়। ছোট মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে গেলে আমরা ওই রকম শব্দ করি। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাবা সচেতন হয়ে বক্ষদেশে আঁচল তুলে দেন। কাপড় গুছিয়ে নেন। ব্যতিক্রম স্থূলাঙ্গী মহিলারা। মেদ বিপরীত লিঙ্গীদের কেমন যেন উদম, উদাস করে রাখে।

গলার শব্দে মায়া সচেতন হল না। চেনা মানুষ আর ছাগলে তেমন উনিশ-বিশ নেই বলেই মনে হয়। সলতে পাক খেয়ে ঊর্ধ্বপদখণ্ডের ছায়ায়, সুন্দবী এ কি করলে বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। মুখ হয়ে উঠেছে মেঘৈর্মেদুরম্বরং-এর মত। একেই কি বলে, কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা !

আমি এলুম।

সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

রামগড়ুরের ছানার মত, রামলীলার প্যান্ট পরা, খড়ের সোঁটা ন্যাজ ওঁচান হনুমানের মত, অশোক কাননে নির্বাসিতা সীতার সামনে শিশি হাতে দণ্ডবৎ। বসতে বলছে না। অভিমান হয়েছে। হাম্বীর রাগে মাতুলের শেখান সেই সংগীতের দু'চরণ গাইব না কি, জানি না মানিনী, তড়াক্, সম-এ এসে পড়লুম, কেন এ অভিমান, ফাঁক। তেটে ধিন ধিন তা, কৎ ধাগেনাগে, ধাগেনাগে, ধেবে কেটে, মেরে ধরে। জানি না মানিনী।

বসতে পার।

বসতে ত পারি। বসাব লোভে প্রাণ মৎস্যাসী হুলোব মত ছোঁক ছোঁক করছে। উচিত হবে কি। মায়া যে বিধাতাব উদ্যানের প্রথম আপেলে এখনও কামড লাগায নি। যে ভঙ্গীতে ছিল সেই ভঙ্গীতেই বসে আছে। তাছাড়া এমন একটি কর্ম করে বসল যাতে হৃদয হোঁচট খায়। এক ফোঁটা তেল দিয়ে মসৃণ ত্বককে মেজে ঘষে পলতে বিলাসী করে ফেলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পডল। ভয়ে ভয়ে যতটা সম্ভব দূরে বসলুম। বসতে না বসতেই কাঁঠাল তলাব ছাগলটা ব্যাআা কবে ডেকে জানিযে দিলে, তুমিও এক বলির পাঁঠা। ব্যাটা জ্ঞানপাপী হাজাব বাব পডেছিস, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কাঁদে। পৃথিবীটা যদি আমাদের দু'জনের হত, তাহলে কথা ছিল না। হঠাৎ যদি সন্ন্যাসিনী পিসী ডোবার ধার থেকে চ্যালা কাঠ হাতে তেড়ে আসেন। মানুষের মুখে পাপের ছাযা ইংরেজী সিক্সও ব্লক শেডের মত ঘনিয়ে আসে। বোঝা যায় সুবোধ বালক মনে মনে পাঁয়তারা কষছে।

এই যে তোমাব কালি।

ফেলে দাও।

শুধু শুধু বাগ করছ। জান আমাব কি হয়েছিল! অসুখে কাত হয়ে বিছানার পড়েছিলুম তিন দিন। একবার খবর নিয়েছিলে?

তোমাব খবব নেবার উপায় আমাব আছে? তুমি না এলে জানব কি কবে?

তা অবশ্য ঠিক। মা কোথায়?

ছেলে কম সেয়ানা নয়। মা শব্দটি এমন মিঠে কবে উচ্চাবণ কবলুম, যেন আমার মা। দেখতে পেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে! ওঁয়া ওঁযা কবে উঠল বলে! আসলে ভযে মরছি। এ-বাড়ির শাসন অনুশাসন কোনটাই তেমন জানা নেই। মায়া বললে, পিসীমা আর দিদি হালিসহর গেছে, ফিরতে রাত হবে।

ভেতরে ব্যাং লাফাল। একা। আমবা দু'জন। মনেব কোণে কে যেন হালুম করে উঠল। আমি নই। আমি যে পবিত্র গঙ্গার জল। পাপ ধোযা তুলসী পাতা। মায়ার সলতে পাকান শেষ হয়ে গেল পা ঢেকে বললে, তোমাব মুখটা খুব শুকিয়ে গেছে। আমার কাছে দিন কতক থাকলে দুধ খাইয়ে মোটা করে দিতুম!

কিসের দুধ?

ফস্ করে বেরিয়ে গেছে। জিভ কাটলুম। মায়া কিছুই মনে করে নি। এ হল চরিত্রের ওপর সুখেনের প্রভাব! পিতা ঠিকই বলেন, সঙ্গ দোষেই ভুজঙ্গ! প্রশ্নটা তেমন নিরীহ নয়।

[ওহে! বর্ণচোরা আম বেশি অশ্লীলতা করলে কান ধরে উপন্যাস থেকে বের করে দোব। বেশ পেকেছ। মনটাকে মানুষ কব। অবাক হবার কিছু নেই। এ কণ্ঠস্বর আমার। রাশ আলগা হযেছে ভেবে কাটা ঘুড়ির মত চেত্তা খেও না টানতে কতক্ষণ। জীবন একটা আধার। ধরলে অমৃত ধবা যায়, আবাব বিষপাত্র হয়ে মৃত্যুকেও ডেকে আনা যায়। তুমি অমৃতের পুত্র হবে, না পুতনার স্তন! মনে মনে তিনবাব বীজমন্ত্র জপ করে নাও। জিহ্বা শুদ্ধ হোক।

Truth never come where lust
    and fame and greed
of gain reside. No man who
    thinks of woman
As his wife can ever perfect be
Nor he who owns however little
            nor he
Whom anger chains can ever pass
    through Maya's gates
so give these up, Sannyasin bold
Say Om Sat Om.

সন্ন্যাসীর গীত তোমাকে শুনিয়ে দিলুম। এই মায়া, আর ওই মায়ায় বিশেষ তফাৎ নেই। তা হলে আরও শোন, আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। কাহার? স্বামী বিবেকানন্দের। তুমি অবশ্য তাঁহার এক গাছা কেশেরও যোগ্য নহ। একে জগদব্যাপী প্রতিষ্ঠা, তাহাতে সর্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলাগণ আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বামী! আমার সর্বস্ব ও আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম।' স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, 'ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী। আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা।' তুই হলে কি করতিস ব্যাটা! তেত্রিশটা বউ নিয়ে লোটাকম্বল ফেলে, ন্যাজে-গোবরে হয়ে বসে থাকতিস স্বামী **পিনখাড়ানন্দ**।

মায়ার লম্বা ডান হাত আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। সরু সরু আঙুল। ওপর হাতে লাল সুতো দিয়ে একটা তাবিচ বাঁধা। ওই সর্বনেশে হাত আমার আমসির মত গাল টিপতে আসছে। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। দু' আঙুল দিয়ে নিচে থেকে টিপে ধরেছে। আহা! আমার গালে যদি একটু মানুষের মত মাংস থাকত! তত্ত্বজ্ঞান না, বৈরাগ্য নয়, পোয়াটাক মাংস দু'গালে।

তোমাকে আমি খাঁটি গরুর দুধের সিন্নি খাইয়ে খাইয়ে ইয়া মোটা করে দিতুম। আহা, রে! শাসনে শাসনে ছেলেটা আমার শুকিয়ে গেল।

চুলের ঝুঁটি ধরে কোলের দিকে **টানছে**। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে আসার মত কোল এগিয়ে আসছে। মায়ার দরজা পার করে দাও প্রভু।

বাঘিনী বাঘ নিয়ে খেলে
সিংহ নতজানু বিশেষ সময়ে
শৃগালের হাহা হাসি
হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, ক্যা হুয়া, কেয়া হুয়া॥

আমি জানি, এখন কি হবে! মায়ার আবেগ বড় সাংঘাতিক! বার কয়েক ওই আটচালায় তার প্রমাণ মিলে গেছে। অপত্য স্নেহে কোলে ফেলে তাল চটকান চটকাতে থাকবে। সারা শরীর কাঁপতে থাকবে। দেহের অনাবৃত অংশ ঘর্মাক্ত হবে। কেবল বলবে, দুষ্টু, দুষ্টু, চটকে শেষ করে দোব। সুখের পাঁচা। দৈহিক নয়, বড় নৈতিক যন্ত্রণা। আমার ধর্ম গেল। সতীত্ব গেল। ধ্যার মূর্খ। শাক্ত থেকে বৈষ্ণব হয়ে যা, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল॥

রূপসীর কালো ওড়নার মত সন্ধ্যা ঘিরে আসছে। লোম উস্কোখুস্কো দুটো কুকুরের মত মায়া আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। খুব এক চোট হয়ে গেল। কি থেকে যে কি হয়ে যায়! মনের কাঁধে পা ঝুলিয়ে আর একটা কি বসে আছে! সে যে দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, যায় না তারে ধরা।

মায়া ঘর থেকে একটা আধভাঙা টিনের বাকস নিয়ে এল। সাজের সাজসরঞ্জাম। দাড়া ভাঙা চিরুনি। চুল বাঁধার ফিতে। সোনালি টিপ, কাঁচ পোকার ডানা কাটা। চিরুনি হাতে নিয়ে মায়া আমার সামনে মাটিতে দু'হাঁটু ফেলে খাড়া হয়ে বসে, বুকের দিকে মাথাটা টেনে নিয়ে ঘাড়ের দিকের চুলে চিরুনি চালাতে লাগল।

চুল নয় ত, জটে বুড়ীর জটা। কি করে রেখেছ মাথাটা। দেখি মাথা তোলো।

সামনে ঝুঁকিয়ে, পেছনে হেলিয়ে, পাশে ফিরিয়ে মায়া আমার চুল ঠিক করতে লাগল। গোল হাতে বাঁধা তাবিজের লাল সুতো সাপের মত ঝুলছে। মাঝে মাঝে ছোবল মেরে যাচ্ছে। একটু বাসী তেলের গন্ধ, জলের গন্ধ, বুকের গন্ধ। সন্ধ্যা আসে ঘিরে। পাতায় বাতাস লেগেছে। পৃথিবীরও একটা মোহিনী আঁচল আছে। অদৃশ্য সব ফাঁক ফোকর থেকে সুখ নেমে আসে। মহাকাশের মহা অন্ধকারে মাথা তুলে আছে নির্জন পর্বতশ্রেণী। ফাটল চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে জল বিন্দু, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর মত। জমে উঠছে টোপা টোপা মুক্তর দানার মত। সূর্যের আলোয় অশ্রু হয়ে উঠবে হীরকের হাসি। সবই অলক্ষে। কখন কোথায় কি হয়ে চলেছে এই বিরাট বিশ্বে কে আর নজর রাখছে!

মায়া কোল থেকে আঁচল তুলে নিয়ে তেলতেলে মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, তুমি অনেক দেরিতে বুড়ো হবে। আমি মরে যাবার অনেক পরে তুমি মরবে। এখনও একবারে কচি আছ। দেখি একটা কাচপোকার টিপ পরালে কেমন দেখায় ?

ছোট্ট কৌটোয় ধুনোর আঠা। সেই আঠায় ঠেকিয়ে একটি টিপ ভুরুর মাঝখানে প্রথম আঙুলের চাপ দিয়ে পরাতে পরাতে বললে, তুমি আমার কে বল ত !

এ বড় শক্ত প্রশ্ন ! এই পৃথিবীতে কে যে কার। যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। এই তো হালফিল যে ঘটনা ঘটে গেল পাড়ায় ! হারু আর হারুর মা, হারুর বাবাকে ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দিলে। বুড়ো ভাল দেখে না, কানে ভাল শোনে না। ঘষা কাচের ডাঁটি ভাঙা চশমা চোখে। নাকের কাছে তুলো জড়ান। বুড়ো কয়লার দোকানের পেছনে পড়ে রইল এক মাস। উঠতে পারে না, চলতে পারে না। দু'হাতে সেবা করে গেল কে ? মেয়ে স্কুলের কর্মচারী মেনকাদি। বিয়ে করলে যে কোনও রাজপুত্তুরকে বিয়ে করতে পারতেন। জীবন কাটাচ্ছেন আতুরের সেবায়। এক মাস সকাল বিকেল মেনকাদি জল, দুধবার্লি, কাঁথা, কম্বল যোগালেন। বুড়ো দ্বিতীয়পক্ষের বউ, প্রথমপক্ষের ছেলেকে রেখে একদিন শেষ রাতে চলে গেলেন মহাযাত্রায়। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। মেনকাদি কেঁদে ভাসালেন। তবে ? মায়া আমার কে ? আমি মায়ার কে ? কোথাও কোনও অদৃশ্য লিপিতে কি ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন ?

একটা ভাঙা আয়নায় পাকা বউ-এর মত মুখ দেখতে দেখতে মায়া বললে, তোমার বাবার তৈরি ব্রনর কোনও ওষুধ আছে ?

বোরোফ্যাক্স আছে।

কাল একটু এন ত।

ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কার ওষুধ কোন গালে এসে লাগবে ? যদি একবার জানাজানি হয়ে যায় ! ন্যাড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে উলটো করে বসিয়ে, ঢাক ঢোল ফেস্টুন সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করাবেন।

কই বললে না ত তুমি আমার কে ?

তুমি আমার ভৈরবী।

সে আবার কি ?

আমার একটা পরিকল্পনা আছে মায়া। একদিন শেষ রাতে তুমি আর আমি গৃহত্যাগ করব। আমার এই বড়বড় চুল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে রক্তাম্বর। এক হাতে চিমটে, আর এক হাতে ত্রিশূল। পাশে তুমি আমার ভৈরবী। রুক্ষ, এলো চুল। লাল শাড়ি। কপালে এতখানি গোল সিঁদুরের টিপ। যেতে, যেতে, যেতে, যেতে, কোনও এক মহাশ্মশানের পাশে দু'জনে ধুনি জ্বালিয়ে বসব। একটু একটু করে মহামায়াকে জয় করে সিদ্ধ সাধক হয়ে বসব। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সব আমাদের পায়ের তলায়।

তার মানে বউ !

ঠিক বউ নয়। সে কিরকম এক ধরনের ব্যাপার, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি নিজে বুঝে, তোমাকে বুঝিয়ে দোব।

ও সব সাধুটাধু হতে পারব না বাপু। আমার ভীষণ মাছের লোভ। চুনোমাছ বেশ সরষে বাটা, আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে গবগরে ঝাল তৈরি করে এক থালা গরমগরম ভাত। তারপর এক খিলি পান। ডুরে শাড়ি। ওগেরুয়া মেরুয়া সব ভণ্ডামি। চটকলে অনেক লোক নেবে শুনলুম। চেষ্টা করে দেখ না। তা হলে বেশ পালান যায় !

কি বলে রে ? আমি কার ছেলে ? কত বড় আমাদের বংশ। ইচ্ছে করলে আমি কি না হতে পারি ! ওকালত, কালোয়াত ! ইচ্ছে করি না তাই ! নাবালিকা। লঘুগুরু জ্ঞানশূন্য।

উঠে পড়ি বাবা ! সন্ধেটন্ধে দিতে হবে।

টিনের বাকস হাতে মায়া ঘরের দিকে চলেছে। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। শাড়ি একটু উঁচু করে পরা। কত পাপ যে করেছি! লুকিয়ে লুকিয়ে বিদ্যাসুন্দর পড়েছি। তাকাতে গিয়ে যে সেই লাইনটাই মনে আসছে,

নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সাব-অবলম্ব ॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায় ॥

বাড়ি ফিরতেই কনক বললে, তুমি ত আচ্ছা। কথা আটকে গেল। তোমার কপালে ওটা কি?

মেরেছে। সেই কাচ পোকার টিপ। বৈষ্ণব পদাবলীর সেই দৃশ্য। অভিসার শেষে রাধা ফিরছেন কুঞ্জ হতে। অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে। ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি। কপাল থেকে চট করে টিপটা খুলে নিয়ে পাকা অভিনেতার মত বললুম, কিছু লেগেছিল বোধহয়। ভাগিস সময়টা সন্ধে। নয় ত ধরা পড়ে তুম।

মেসোমশাই ডাকছেন, কনক, কনক। সন্ধে হল।

আসি বাবা। কনক যেতে যেতে বললে, তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে এস। প্রার্থনায় বসতে হবে।

সে আবার কি? সে ত বহুকাল আগের কথা। অস্পষ্ট স্মৃতি। সকালে হাত জোড় করিয়ে, হাঁটু মুড়ে বসিয়ে এক নারীমূর্তি আমাকে প্রার্থনা করাচ্ছেন,

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি ॥

তিনি হয়ত আমার মা ছিলেন কিংবা জ্যাঠাইমা। এই ছাড়া গরুকে কে আবার গোয়ালে তুলতে চায়! সাঁঝাল দিতে চায়। সব ত চুকেবুকে গেছে। আমার মনে যে বড় বেদনা! আমার যে কেউ কোথাও নেই। আমি ঈশ্বরকেই চাই, তবে পুরুষের বেশে নয়। নারীর বেশে। যত মত তত পথ। তুমি আমার প্রেমিকা হয়ে এস।

তোমার দিন কি এইভাবেই কাটে পিন্টু। মেসোমশাই সামনে দাঁড়িয়ে। তুমি কি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ?

আজ্ঞে না! এই একটু লাইন চেনজের সময় ত!

তার মানে? তুমি রেল গাড়ি, না কলকাতার ট্রামগাড়ি: দুপুরবেলা বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহল্লা করছ। সন্ধে উতরে যাবার পর বাড়ি ফিরছ। হরিদা সারাদিন অফিসে থাকেন। ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বিকেলে আমাকে একটু বেড়াতেই বলেছেন।

ফাজিল ছেলেদের মতো মুখে মুখে তর্ক কোরো না। যাও ঠাকুর ঘরে যাও।

প্রদীপের শিখা স্থির। ডগার দিক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। গরদের কাপড় পরে মেসোমশাই আসনে বসেছেন। ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। পেছনে আমরা তিনজন। সামনে পেতলের ও-এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। পটে মা লক্ষ্মী। মায়ের হাতে লাগান সিঁদুরের দাগ এখনও লেগে আছে। নিস্তব্ধতা। দূরে, বহুদূরে কোনও মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। প্রদীপের শিখা মাঝে মাঝে ফটফট করে উঠছে।

হঠাৎ আমরা সংগীতে ভেঙে পড়লুম, ভবসাগর তারণ কারণ হে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। সুর ঢেউ-এর মত একবার করে উঠছে, একবার করে পড়ছে। মন বলছে, ঈশ্বর, মেসোটি যেন রাতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা না মারেন!

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে

আপনার প্রথম চিঠি আমি পেয়েছি কিন্তু আপনার দ্বিতীয় চিঠি, যে চিঠিতে আপনি দিন, তারিখ লিখে জানিয়েছেন বলছেন, সে চিঠি আমি পাইনি। দেখুন পোস্ট করেছেন কি না !

কি বলছেন আপনি হরিদা ? আমি নিজে হাতে লাল ডাকবাক্সের ঠোঁটে টুক করে গলিয়ে দিলুম, কোর্টে যাবার পথে। আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। আইনের ব্যবসা করি। মক্কেল চরিয়ে খাই।

আপনি ত গোড়াতেই গলদ করে বসে আছেন বিনয়দা। যে সব ডাকবাক্স পথের ধারে ষাঁড়ের মত বসে আছে, তাদের স্বভাব আপনার জানা নেই। কিছু গলায় রাখে, কিছু পেটে। চিঠি ফেলতে হলে কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে। সে চিঠি এখনও আপনার আটকে আছে। লেটার বক্স ডাইজেস্ট করতে পারেনি।

হতে পারে। পৃথিবীকে আমি আর বিশ্বাস করি না। এর অনেক মুখ। জাস্ট লাইক এ কারবাঙ্কল। তবে ডাকবাকসে আমি আর জীবনে হাত ঢোকাব না। সে চিঠি যাক আর না যাক।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা। কারণটা কি ?

সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ডাকবিভাগের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

কনক চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকছিল। তার গলা দিয়ে কুঁক করে একটা শব্দ বেরোল। যেন পাতিহাঁস একবার ডেকেই পেছন উলটে জলে গলা ডোবাল। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে পেরেছে। এই যা রক্ষে। দুই অভিভাবকই ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছেন। দু'জনেই মনে হয় সমানধাতের মানুষ। একই ধাতুতে তৈরি। টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। কনক আমার পিতাঠাকুরের সামনে খুব কায়দা করে চায়ের কাপ রেখে বললে, আপনার চা মেসোমশাই। দুধ কম, চিনিও কম।

দ্যাটস ফাইন। তুমি কি করে জানলে, আমি দুটোই কম পছন্দ করি ?

আমি যে জেনে নিয়েছি আগেই।

তোমার সব দিকে এত নজর ?

সবে আধ ঘণ্টাও পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। পিতা অফিস থেকে ফিরেছেন। এর মধ্যেই কনকের নজরে অভিভূত। মেয়েদের এই একটা সুবিধে। সহজেই মন জয় করে নিতে পারে। পিতা এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন সন্ধিপুজোর মুহূর্তে ধূপধুনোর ধোঁয়ার পাতলা আবরণের আড়ালে দেবী দুর্গাকে দেখছেন ভক্তের চাহনিতে। স্তোত্রটি পড়ে ফেললেই হয়, নমস্তে সিদ্ধসেনানী, আর্যে মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কপালী, খড়গখেটকধারিণী।' উপায় থাকলে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পৃথিবীটাকে বাকি জীবনের জন্যে একবার দেখে নিতুম। ন্যাজে খেলান কাকে বলে ! মুকুর প্রশংসা ত আগেই এক পক্কড় হয়ে গেছে। গার্গী, মৈত্রেয়ীর সমপর্যায়ে উঠে পড়ার টেবিলে গ্যাঁট হয়ে বসে, গনর গনর করে কি একটা মুখস্থ করছে। এলো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। সুখেন হলে নেচে নেচে গাইত, এলো চুলে গৌরী আমার শাঁখা, সিঁদুর পরেছে।

বাবা তোমার গরমজল কি এখন আনব ?

গরম জল ? আচ্ছা নিয়ে আয়।

আমার পিতার হঠাৎ খেয়াল হল কনকের পিতার এই অসময়ে গরমজল আবার কি হবে ? প্রশ্ন করলেন, গরমজল কি হবে ? চান করবেন ?

না না। গরম জল খাব।

কেন চা ?

চা আমার চলে না। যৌবনে বিশ কাপ, পঁচিশ কাপ ডেলি খেয়েছি। লিভার পাকতেড়ে মেরে গেছে। রোজ সন্ধের দিকে অম্বল। ডাঃ রায়ের প্রেসক্রিপসান – গরমজল।

চায়ে লিভার খারাপ করে এ থিয়োরি আপনি কোথায় পেলেন ?

প্র্যাকটিক্যাল করে সিদ্ধান্তে এসেছি।
আপনার লিভার ত মশাই ডাক্তারের বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। সাত,আট লেয়ার চর্বির ায় যেভাবে চাপা পড়ে আছে! ওটাকে ওভাবে বাড়তে দিলেন কেন? উত্তরপ্রদেশ বড় করুন। জ লাগবে। মগজটাই ত সব। অবশ্য ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিতে মধ্যপ্রদেশই বড়।
এ কি আর ইচ্ছে করে করেছি দাদা! মেড বাই অম্বল। আপনি কিন্তু চেহারাটাকে বেশ ফিট খছেন!
াখার কৌশল আছে। জানতে হয়। সব কিছুই সাধনার ব্যাপার। আছেন ত এক মাস। আপনাকে টা চেহারা দেখাব।
ও সব ব্যায়ামবীরদের কথা আমাকে বলবেন না। এনাফ অফ দেম। ফ্যাশানেব্‌ল স্ত্রী আর লম্যান, দে আর গুড ফর নাথিং।
আরে না মশাই, ওসব দেহধর-ফেহধরদের আমিও জানি। তেল মেখে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে শি নাচান ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। আপনাকে একটা সিসটেম দেখাব। আমাদের ন্যাশানাল টর মত ঝনঝনে।
ন্যাশান্যাল ফ্রুট কি জিনিস? কাঁঠাল? যা আমরা এতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের মাথায় ভেঙে সছি। যা চিরকাল গাছেই থেকে গেল আর আমরা গোঁফে তেল দিয়ে দিয়ে তেল ফুরিয়ে ফেললুম। মন্দ বলেননি। কাঁঠালের জাতীয় ফল হবার সব গুণই আছে। তবে আমি জাতীয় ফল করে রেখেছি মড়াকে। আদর্শ বাঙালী চরিত্র। আঁটি চর্মসার। দাঁতে ঠেকান, বাপ্ বলে লাফিয়ে উঠতে হবে। ওই বসে আছে। তাকিয়ে দেখুন। নিশ্চিন্ত আরামে। হাত পা এলিয়ে। চোখের দৃষ্টি দেখুন। উদাস, ালম্ব। যেন এণ্ড অফ দি ওয়ার্লডে পৌঁছে গেছে। গান ধরলেই হয়, হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হল। হলো দিশি আমড়া।
ওর সিসটেম কি খুব ভাল?
কনক কাচের গেলাসে গরম জল এনে সামনের টেবিলে রেখে চলে যেতে যেতে আমার দিকে কাল। এক ফুটের গরম জল দেখলেই বোঝা যায়। বুজকুড়ি ভাসছে। অনেকটা মাথার গালের যুবতী নর মত। মেয়েদের গালে ব্রণ এলেই বুঝতে হবে আম গাছে মুকুল এসেছে। মৌ মৌ সুবাস। ারের ভ্যানর ভ্যানর। তোমার মুখে জুতো। কেন? কে তুমি? আমি তোমার সাত্ত্বিক মন। এত লাধোনা হয়েও তোর শিক্ষা হয় না রে! মন ছুটছে মায়াপুর।

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল ॥

তোর দেহ থেকে পাঁচটা ডাল পাঁচ পাশে হাত বাড়িয়ে উদম নৃত্য করছে, মনের অঙ্গনে ঢুকে বসে ছে মহাকাল। মন তুই কৃষ্ণ কথা বল, কৃষ্ণ কথা বল।
ওর সিসটেম? পিতা চায়ে চুমুক দিয়ে এমন একটা মুখ করলেন যেন পৃথিবীর বাইরে অন্ধকার ভেলায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দু হাতে কাপডিশ। কাপ ডিশ থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে লছে। আবার বললেন, অনেকটা ঘুম ঘোরে, ওর সিসটেম? আহারে অনাহার শ্রমে বিশ্রাম, চিন্তায় , দর্শনে অদর্শন, ভাবে বিভাব, উনি এক শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ। দয়া করে পাটকাঠি সদৃশ এক ধারে ধরা পড়েছেন। একদিন মট করে ভাঙবেন আর উড়ে চলে যাবেন। আমি যাঁর কথা বলছি এ পাড়ায় থাকেন নাম মেনীবাবু। জীবনে একবারও অসুস্থ হননি। শরীর কঞ্চির মত। মন রালো তলোয়ারের মত। বায়ুর বেগে চলেন। তড়িৎ বেগে কথা বলেন। খাদ্য? চা আর জর্দাপান। আপনি লিভার লিভার করছেন? জেনে রাখুন শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।
মেসোমশাই গরম জল খেতে লাগলেন। পিতা উঠে পড়লেন চেয়ার ঠেলে। বসবার সময় থায়? কথায় কথায় বলেন, আই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যাণ্ড অ্যাণ্ড স্টেয়ার। রান্না মহল থেকে হাঁক লো, চলে এস। অন্য দিন হলে এই ডাকে আমার ময়দা মাখা শুরু হবার কথা। দু কৌটো ময়দা, মাঝে

গাবব্ তৈরি করে দু চামচে ভাদ্যা. একটু নুন । নাও ঠেসে যাও । ঠাসতে, ঠাসতে হাতের কব্জি, কাঁধ টন টন করতে থাকবে । ততক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হুকুম হয়, স্টপ ।

ভেতরের দরজার পাশে কনক চুপ করে দাঁড়িয়েছিল । ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, এখন কি হবে ?

একের পর এক নাটকের অঙ্ক হয়ে চলেছে সেই উত্তীর্ণ সন্ধ্যা থেকে । পর্দা পড়ছে আর উঠছে । সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছড়ান ছেটান জিনিস দেখে বললেন, এ কি এয়াররেড হয়ে গেছে নাকি ? কনক, মুকু আর মেসোমশাইকে সামনে দেখে বললেন, আপনাবা আবার কে ? চেনাচিনি হয়ে যাবাব পব হাওয়া মোটামুটি ধীরেই বইছিল । আবাব ঝড় বইতে শুরু কবেছে ।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে অতিথিদেব কি ব্যবস্থা করেছিলে ? কিছু জুটেছিল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ । সবই ত ছিল । ওঁরাই সব তৈরি-টইরি করে নিলেন ।

তা হলে রাতের ব্যবস্থা করা যাক । ওঁরা কি আহারাদি করবেন জানতে পাবলে ভাল হত ।

অন্ধকার থেকে কনক সাহস কবে এগিযে এল । পিতা যেন আশাব আলো দেখতে পেলেন, এই যে কাঞ্চন, তোমরা রাতে কি খাবে ?

উত্তর দেবার আগে কনক নামটা সংশোধন করাবার জন্যে বললে, আজ্ঞে আমি কনক ।

ও হ্যাঁ, তুমি কনক । কনক কাঞ্চন !

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কাঞ্চন সাধাবণত ছেলেদেবই নাম হয ।

দ্যাট আই নো । কনক মানে কি ?

সোনা ।

কাঞ্চন মানে কি ?

সোনা ।

তাহলে ? আমার ভুলটা দেখলে কোথায় ? আমি ওকে স্বর্ণ বলে ডাকতে পাবি, সোনা বলে ডাকতে পাবি । একই মানে । রোজ সকালে কয়েক পাতা করে অমরকোষটা মুখস্থ কর । তাতে তোমার ওই বোকা বোকা ভাবটা কিঞ্চিৎ কেটে যাবে ।

উঃ, কি থেকে কি হয়ে গেল ! দু'জনেই অপ্রস্তুত । গাধার মত দাঁড়িয়ে ঘা চাটছি । কনকেব কিন্তু সাহস কম নয় ! পবিস্থিতি একটু থিতোতেই প্রশ্ন করল, আপনাবা রাতে কি খান জানতে পাবলেই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব তৈবি হয়ে যাবে । আমরা যে ক'দিন আছি, আপনাকে আর রান্নাবান্না নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না ।

খুব ভাল কথা । আমি কিন্তু তা হতে দোব না । আমার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে । তোমবা চলে যাবার পর বিপদে পড়ে যাব ।

এ আপনি কি বলছেন মেসোমশাই ! জ্ঞানী মানুষের কখনও অভ্যাসের দাস হওয়া উচিত নয় ।

উঃ, সাবাস । ভয়ে চোখ আর দম দুটোই বন্ধ । বোমেব পলতেয় আগুন পড়েছে । দেখতে পাচ্ছি ফিচির ফিচির ফুলকি ছাড়তে ছাড়তে এগোচ্ছে । ফাটল বলে । মৃদু হাসিব শব্দে চোখ খুলে গেল । বোমা ফাটল না । কনকের মেসোমশাই হাসছেন । মেয়েদের কি মহিমা রে ! আগুনে আগুন নেই । তাপে তাপ নেই । জলে জল নেই । আমার মায়া ! বিকেলে যখন চটকাচটকি করছিল, শরীরের উত্তাপ দেখে মনে হয়েছিল, ম্যালেরিয়া । তুমি কাঁপছ । তোমার জ্বর । কুইনিন খাও ।

আজ্ঞে না গর্দভ । মেয়েদের আর বেড়ালের তাপ একটু বেশিই হয় । বুড়ী হয়ে বৃন্দাবনে গেলে তবেই এ জ্বর ছাড়বে ।

আবার সেই মায়া ? মায়ায় মজেছে মন । ভালই গাও, মজল আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে । শ্যামামাকে আর কষ্ট দিও না । মন টোল খেয়েছে, টাল খেয়েছে । শ্যামা কোটে মায়া বসাও ।

পিতা বললেন, হেরে গেলুম তোমার কাছে ।

এ যেন নিমাইয়ের কাছে রঘুনাথ শিরোমণির হার। হারতেই হবে। অতবড় একটা কাবুলীকে ছোট্ট মিনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। মুঠোমুঠো কিসমিস, আখরোট, মনাক্কা, খুবানি। ঝুলি থেকে বেরোচ্ছে ত বেরোচ্ছেই। কনক হাসতে হাসতে বললে, এতে হারজিতের কিছু নেই মেসোমশাই, কাজ মেয়েরাই করবে।

তা ঠিক, তা ঠিক। পিতা মাথা নাড়লেন।

কনক কথাটা এমন করুণ করুণ মুখে বললে যেন, কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়ে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কেই যদি এই কুকুর আর প্রভুর ভাবটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর কোনও সমস্যা থাকে না। ন্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘরে যাও।

রাতে তাহলে লুচিই হোক।

তাই হোক মেসোমশাই। এক হাতে কাচের গেলাস, আর এক হাতে তাসের মত ধরা দুটো বড় নোট।

আপনার ত আবার অম্বল হয়েছে?

আই ডোণ্ট কেয়ার। সোডি বাই কার্ব ইজ দেয়ার।

তাহলে লুচি হোক, রাতটা নিরামিষেই চলুক, চীনে ঘাস দিয়ে দুধের পায়েস, একটু গোলাপের তবক। মারভ্যালাস!

গেলাসটা মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, মেসোমশাই দুবার গলা ঝেড়ে বললেন, হরিদা, সবার আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া যাক, এই দুটো আপাতত আপনার কাছে রাখুন।

মেসোমশাই হাসি হাসি মুখে গুটি গুটি এগোচ্ছেন। পিতার মুখ ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এইবার বোমা ফাটবে।

হোয়াট!

বাতাসের ধাক্কায় মেসোমশাই দুলে উঠলেন। এত জোরে হোয়াট বেরোবে কে আর ভেবেছিল?

আপনি আমাকে টাকা দেখাতে এসেছেন? এত অহঙ্কার! অহঙ্কারং বিমূঢ়াত্মা।

ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন হরিদা! এতে আপনি অহঙ্কারের কি দেখলেন?

সেই বোধটুকু থাকলে আপনি ওভাবে টাকার পেখম মেলে বাঈজী বাড়ির বাবুর মত এগিয়ে আসতেন না। আপনি আমার অভিমানে ধাক্কা মেরেছেন। ভাবতেই পারলেন না যে আপনি আমার আত্মীয়। আপনি ক্ষুদ্র, আপনি বীভৎস। আপনার সভ্যতার ঝুলি থেকে হুলো বেরিয়ে পড়েছে।

পিতা ধাপে ধাপে চড়ছেন, মেসোমশাইয়ের কপালের কোঁচ একটি একটি করে বাড়ছে। প্রতিবাদের জন্যে ঠোঁট নড়ছে, শব্দ বেরোবার ফাঁক মিলছে না। সিনেমা হলের দরজা দিয়ে যখন গলগল করে লোক বেরোতে থাকে তখন ঢোকার লোকেরা এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে গা বাঁচিয়ে। যত জোরে হোয়াট দিয়ে শুরু করেছিলেন ততোধিক জোরে একটি হাঁচি দিয়ে মেসোমশাই নিধন পর্ব শেষ হল।

মেসোমশাই বললেন, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি টাকা দেখাবার জন্যে টাকা দেখাইনি। এই বাজারে তিনজন এক মাস এ বেলা ও বেলা খাবে তার একটা খরচ আছে ত! আমি সেই ভেবেই শেয়ার করতে চেয়েছিলুম। আপনি আমার পয়েণ্টটা না বুঝেই বেশ কিছু কটু কথা হুড় হুড় করে বলে গেলেন, আপনার যেমন সেণ্টিমেণ্টে লাগল, আমার তেমনি লাগল প্রেসটিজে। এ এক ধরনের অপমান।

দুই যোদ্ধার মাঝে কনক এসে দাঁড়াল। এ মেয়ে অ্যানি বেসান্ত কি হেলেন কেলারের দ্বিতীয় সংস্করণ। লেডি উইথ দি ল্যাম্প। কনক বললে, ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মেসোমশাই আপনি শান্ত হোন। বাবা, আপনি একটু কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন।

সমর্থন পেয়ে পিতা আবার লাফিয়ে উঠলেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি জিনিসটার কুৎসিত দিকটা ঠিক ধরতে পেরেছ। এটা ত হোটেল নয়, সরাইখানা নয়, পাঞ্জাবির পকেট থেকে কড়কড়ে নোট বের করে নাকের ডগায় ছুঁড়ে দেবেন, এই নিন। এক মাস কেন? আপনারা এখানে এক বছর থাকুন অতিথি

হয়ে। আমার কে আছে বিনয়দা। রাজ্যপাট ভেঙে গেছে, সভাসদরা বিদায় নিয়েছে। আপনার এসেছেন এই তো আমার সৌভাগ্য। বহুদিন পরে গাছের ডালে পাখি এসে বসেছে। কতকগুল নোঙরা কাগজ নেড়ে সুর কেটে দেবেন না। আমার অনুরোধ।

গলা যেন একটু ধরা ধরা। এই যে সব থাকা আর না থাকা, আমি আছি, তোমরা নেই, এই স বিচ্ছেদের ব্যাপারট্যাপার সংসারী মানুষকে বড় বিচলিত করে। একটু বেদান্তের দিকে সরতে পারলে বগল বাজিয়ে ঘোরা যায়, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি, খাই দাই আর মজা লুটি।' জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ আমিতেই মেরেছে। আমির বোধেই, তোমার বোধ। নিচে আগুন জ্বলছে, হাঁড়িতে ডাল, ভাত, আ পটোল সব টগবগ করছে। লাফাচ্ছে, আর বলছে, 'আমি আছি', আমি ধিনতা ধিনা লাফাচ্ছি। শরী সেই হাঁড়ি, মনবুদ্ধি জল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি, ডাল, ভাত, আলু, পটোল, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার। অহং যে তাদের অভিমান, আমি ফুটছি, ফাটছি। সচ্চিদানন্দ, তুমিই সেই অগ্নি। আহা, জগৎজোড়া কারখানা। থুড়ে থুড়ে কিমা। প্রশ্ন, কিমাং কিম করোতি। আসল জ্ঞান কি ব্যাকরণে আছে ? আস জ্ঞান কি গণিতে আছে ? পাঁজিতে অনেক জলের কথা লেখা আছে। নিঙড়লে এক ফোঁটাও বেরো না। আসল জ্ঞান ফুটে ওঠে। প্রথমে একটু জ্বর জ্বর, কোমর ব্যথা, তারপর কপালে একটি গুটি, ' দুটি, পিঠে তিনটি ! ব্যাপার কি ? পকস। ফকসের সংসারে পকসের মত এই ভাবেই গুটি কয়ে মানুষের মনে ব্রহ্মজ্ঞানের গুটি বেরোয়। বাকি সব অহং-এর কচকচি। বয়েস-ফয়েস কিছুই নয়। ধ্রু প্রহ্লাদ, সব কাঁচা বয়েসেই যোগী।

পিতার শেষ কথায় পরিস্থিতি শীতল হয়ে এল। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, শূন্যতা প্রৌঢ় মানুষদের সহজেই কা করে ফেলে। যুবকদের সমস্যা অনেক কম। এই যেমন আমি। কনকরা চলে যাবার পর দিন তিনে মন হু হু করবে, বাউল আর ভাটিয়ালী গানের মত। বাথরুমে জলপড়ার ঝরঝর শব্দের সঙ্গে, মন মা তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না মিলিয়ে, ছলছলে চোখে নাঙ্গা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ি থাকা। তাতে কনকেরও কিছু এসে যাবে না, আমারও কাঁচকলা। দশ বছর পরে দেখা যাবে কনক হয়ে মেয়ে কোলে কোনও এক্স ওয়াই জেডের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব দুঃখ হবে মায়ার কিছু হলে না, মায়ার কথা যখন তখন ভাবা উচিত নয়। মায়া আমার মাঝরাতের মালকোষ, ভোররাতে যোগীয়া।

মেসোমশাই এগিয়ে এসে পিতার হাত ধরে বললেন, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট। যা হয়ে গেল, হচ্ছে প্রিনসিপ্‌ল-এর লড়াই।

হাতধরা অবস্থাতেই পিতা বললেন, আজ্ঞে না, একে বলে অহং-এর ঠোকাঠুকি। কেউ কারুর কা ছোট হব না। অহং-এর বাষ্পে দৃষ্টি আচ্ছন্ন, বিচারবুদ্ধি ঘোলাটে। মোটর বাইক কি ভাবে স্টার্ট নে দেখেছেন ?

দেখলেও খেয়াল করিনি।

পিতা হাত মুক্ত করে নিলেন। দু হাতে অদৃশ্য মোটর সাইকেলের হাতল। সামনে শরীর একটু ঝুঁ আছে। বাঁ পা স্টার্টারে। ফার্স্ট কিক্, সেকেণ্ড থার্ড কিক্। ভট্‌ভট্, ভট্‌ভট্। একেই বলে অহং-এ লাথি।

মেসোমশাই, কনক দু'জনেই হেসে উঠলেন। যাক বাবা, আবহাওয়া ময়ান দেওয়া ময়দার ম মোলায়েম হয়ে গেল। দুই ব্যাঘ্র চলে গেলেন বার মহলে। ছায়া ছায়া বারান্দায় কনককে কি সুন্দ দেখাচ্ছে ! বুল বুল গান গায় নার্গিস বনে। বিচিলি রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ধারাল চেহারা চকচকে কালো চুল। চোখে আলো পড়লে নীল সাগরে ভেসে থাকা কালো মণি ঝলসে ঝলসে উঠছে

কনক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, তোমার একজন বোন থাকলে বেশ হত।

তুমি ত আছ।

আমি আর ক'দিন বল ?

তা ঠিক। যদিন আছ তদিনই বাড়ি জমজমাট। তারপর সংসার চলবে শেষবেলার জলের চাকা

মত। চাষার ক্লান্ত হাতে চাকা জলে নামছে, ঘুরে ঘুরে, ধীরে ধীরে উঠছে। সরষে ক্ষেতে জল পড়ছে ছিড়িক ছিড়িক করে।

থাক আর কাব্য করতে হবে না। এখন লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম। ঘড়ির কাঁটা কোথায় গেছে দেখেছ!

ডাক উঠল, পিণ্টু, পিণ্টু। এক মিনিট দেরি করার উপায় নেই। আজ্ঞে বলে ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিনের মত দৌড়তে হবে। দুই পিতাই আবার চেয়ারস্থ। বেশ ভাব হয়ে গেছে দু'জনের। প্রসঙ্গটা কি জানি না। মেসোমশাই খুব কাকুতি মিনতি করছেন, ও সব হাঙ্গামাব দরকাব নেই হরিদা। খাদ্যতালিকা যা তৈরি করেছেন যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে আপনার কথা বলার কোনও অধিকার নেই বিনয়দা। আপনি আমার সম্মানিত অতিথি। আমাদের বংশের একটা ধারা আছে।

বংশই নেই ত বংশের ধাবা! শেষ বাতিটি কে জ্বালাবে! আমি ত আজ আছি কাল নেই। গুরু পেলেই বৃন্দাবন। তখন ত অনেক কথাই ফিরিয়ে নিতে হবে, যেমন দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল। পিতা বললেন, একটা কাজ করতে পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন পারব না!

পরেশের দোকানে গরম রসগোল্লা ক'টার সময়ে নামে?

রাত বারোটা নাগাদ।

তুমি ঘোড়ার ডিম জান।

আমি সেই রকমই শুনেছি।

কার কাছে?

কে যেন বলছিল। ওই পেটেব গোলমাল হয়েছিল। বাত বাবোটায় গিয়ে পর পর তিন দিন ছটা করে রসগোল্লা খেয়ে সেরে উঠেছে।

সে তোমার কোন গেঁজেল বন্ধু। আমি জানতুম, তোমার দ্বারা চুলের কেয়ারি ছাড়া অন্য আর কিছু হবার উপায় নেই। আমিই যাচ্ছি। কতক্ষণ লাগবে? যেতে তিন মিনিট, আসতে তিন মিনিট।

আমি ত যাব না বলিনি!

তবে যাও। বলে এস রাত দশটার সময় এক সের গরম বসগোল্লা চাই। সবচেয়ে বড় সাইজের যেটা সেইটা।

মেসোমশাই আর একবার মৃদু গলায় বললেন, কেন হাঙ্গামা করছেন হরিদা?

এটা আমাদের ব্যাপার বিনয়দা। যাও, তুমি আবার তানা নানা করছ কেন?

গরম হাওয়া পেলে বেলুন ফুস করে ঠেলে আকাশে ওঠে। রাস্তায় পা রেখে মনে হল আমারও সেই অবস্থা। বাড়ির দিকে তাকিয়ে ফিরে ফিরে দেখছি। খোলা জানালায় আলো ফট ফট করছে। মানুষের ছায়া নড়ছে দেয়ালে। বাইরে থেকে দেখলে মনেই হবে না, গরাদহীন উন্মাদ আশ্রম! পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন বললেন, কি দেখছ হে ঘুরে ঘুরে? আমাদের পাড়ার বিধু জ্যাঠা। পাটের দালাল। বেশ ভোগীর চেহারা। বগলে একটা ব্যাগ। চোখে সোনালী চশমা।

বাড়ি দেখছি জ্যাঠামশাই।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বরূপ শেষ রাতে গৃহত্যাগ করছেন, জানালায় দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। হরি ফিরিছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একবার মনে করিয়ে দিও ত! আমি যা বলেছিলুম সেটাব কি হল? রবিবার আমি অবশ্য একবার দেখা করার চেষ্টা করব।

পরেশদা ছানায় ভাক দিচ্ছেন। পরনে সেই গামছা, গোলগলা আধময়লা গেঞ্জি। রসে ডোবা চমচমের মত চেহারা নিচেব দিকটা তাকিয়ার মত, ওপর দিকটা মাথার বালিশের মত। তার ওপর

একটা তিন নম্বর ফুটবল। দুটো বারকোসের মাঝখানে কাপড় জড়ান ছানার নাদা। ছাদে উঠে পরেশদার লেফটরাইট চলেছে। এক একবার চাপ পড়ছে আর সাদা সাদা জল বেরিয়ে আসছে। পরেশদা দিন দিন কি হচ্ছে ! সত্যিই এর নাম 'টনিক ময়রা'। মিষ্টির দোকানে কাজ করতে পারলে, মাসখানেকের মধ্যেই মুটিয়ে যেতুম। নধরকান্তি একটি বটব্যাল।

পরেশদা, গরম রসগোল্লা কখন নামবে ?

ছানার ওপর নাচতে নাচতে বললেন, ওই ত রস জ্বাল হচ্ছে। এইবার পড়বে।

দশটা নাগাদ ?

এসো দেখা যাবে।

এক সের বুক করে গেলুম। সবচেয়ে বড়টা।

বুক পেট জানি না। নামলেই নিয়ে যেও।

রাত ক্রমশই রসগোল্লার মত বসস্থ হয়ে উঠছে। সাত নম্বর বাড়িতে গানের আসর বসেছে। তবলায় চাঁটি পড়ছে। পান বিড়ির দোকানে রেডিও বাজছে। ফট ফট করে আলো। বোকাদা ডিম ভেঙে সকালকে সুপ্রভাত করেছিলেন। এখনও ভেঙে চলেছেন। বিদায় রজনী হবে রাত বারোটায়। ইংরেজী মতে তখন নতুন দিন শুরু হয়ে গেছে। জবাদেব বাড়ির সেই সদাহাস্যমুখবাবুটি হাতে একগাদা প্যাকেট ঝুলিয়ে নেচে নেচে চলেছেন, রাত হল, রাত হল, দ্বার খোলো প্রমদা।

গরম রসগোল্লা রেডি হচ্ছে। রাত দশটা নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।

দেখেছ, তোমার ইনফরমেশান কত ভুল ! এই ভুল ইনফরমেশানের জন্যে অতবড় হিটলারের পতন হল। ইংরেজের রাজত্বে সূর্য ডুবে গেল। সত্য শ্রবণে নেই সত্য দর্শনে।

হুড়মাড় দুদ্দাড় করে কনক উত্তরমহল থেকে দক্ষিণ মহলে ছিটকে এল। হাতে একটা খুন্তি। সমস্বরে প্রশ্ন, কি হল, কি হল ?

কোনওরকমে দম ফেলে কনক বললে, আরসোলা, অসংখ্য আরসোলা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে।

পিতা মেসোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, নাপচিয়াল ফাইট, বুঝলেন বিনয়দা ! এখন দরকার ঝ্যাঁটা ট্রিটমেন্ট। এ রোগের দাওয়াই হল ঝ্যাঁটা পেটা। চল পিন্টু।

কনকের চেয়ে আমার কিছু বেশি সাহস নেই। মাতুলক্রমঃ। সেই ঘটনাটি মনে পড়লে এখনও আমার হাসি গুমরে গুমরে ওঠে। কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে বসেছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর। সময় সকাল। মাতুল ধরেছেন গুর্জরী টোড়ি। আলাপ জমে উঠেছে। দুটো তানপুরা দু পাশ থেকে মিঞাও মিঞাও করছে। তবলচির হাত উসখুস করছে তবলায়। গানের মুখ এলেই তেরে কেটে করে লাফিয়ে পড়বেন। ডানপাশ থেকে বাঁপাশে ফিরর্ করে কি একটা উড়ে গেল। সুর বোধহয় পক্ষ বিস্তার করেছে। সুর নয় আরসোলা। পেছনের সাদা পর্দায় বসে তাল খুঁজছে। কে জানত, মাতুলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করছে। আরসোলা যাঁহাতক উড়েছে দ্বিতীয় চক্করে, তবলা, তবলচি, মাইক্রোফোন, হারমোনিয়াম, গাইয়ে সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে স্টেজ থেকে সামনের সারির দর্শকদের ঘাড়ে। গানের মুখ সবে ধরেছিলেন অব মেরে নইয়া। নইয়া পারে ভেড়ার আগেই ডুবে গেল। হই হই ব্যাপার। বেনারসের ওস্তাদ চিৎকার করছেন, কেয়া হুয়া ওস্তাদজি ? ওস্তাদজি, তবলচি তখন হামা দিচ্ছেন সামনের প্যাসেজে।

রান্নাঘরের আকাশে লাল বিমানবহর। সপাসপ ঝ্যাঁটা চলছে। ডাইনে বাঁয়ে। মাঝে-মধ্যে দু-এক ঘা পরস্পরের পিঠেও পড়ছে। পিতা বলছেন, নেভার মাইণ্ড, নেভার মাইণ্ড। এক একবার চাপস মারছেন। কখনও বলছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে কিছু বড় সাইজের টিকটিকি ইমপোর্ট করতে হবে। কখনও বলছেন, ছাতাওয়ালা গলির পিংলিংকে খবর দেবেন। এ জিনিস মেরে শেষ করা যাবে না, খেয়ে শেষ করতে হবে।

প্রেমোন্মাদ শেষ আরসোলাটিকে ঝ্যাঁটায় চেপে ধরে পিতা হাঁকলেন, কনক, অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।

সারমন অন দি মাউণ্ট

আমাদের নোনাধরা দেয়ালের যে জায়গাটায় দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র তৈরি হয়েছে সেখানে ।কটা আদ্যিকালের বদমেজাজী ঘড়ি ঝুলছে। পেণ্ডুলামের চেহারাটা হেডমাস্টারের মত। গুরুগম্ভীর ।ুখে দুলছে ত দুলছেই। ছন্দটা এইরকম : নো, নো, আই ওণ্ট টলারেট। বাজনার সুর রসকষহীন। ঃপুর রোদে হাঁকছে যেন, শিলকাটাও। বাজাব এক মিনিট আগে জানান দেয়, খ্যাঁডাড়াক।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পিতাঠাকুর চুলে টাকপড়া বুরুশ চালাতে চালাতে বললেন, ক্লক স্ট্রাইকস টেন। যাও, রসগোল্লা।

ক্লক স্ট্রাইকস বললে কেমন একটা রহস্যেব দরজা খুলে যায়। মধ্যরাতে ঘড়ি বাজে, কবর খুলে ।াদুড ওড়ে। চশমার খাপ থেকে দশটা টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। স্নান সেরেছেন। বেশ তাজা দেখাচ্ছে। ছাদের ঘরে ব্যায়াম হযেছে। ঠাকুবঘরে বসা হয়েছে। ধর্মের জন্যে নয়, একাগ্রতার জন্য। সব কাজ সারা। এইবার রাত বাডবে, পড়া চলবে, পাতার পর পাতা। টেবিলের একধারে ।ইয়েব পাহাড়। কি নেই। উপন্যাস, দর্শন, গণিত, ভূবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, কৃষি বিজ্ঞান। স্বল্পং স্তথা ।ায়ু বহবশ্চ বিঘ্না। শিশির ভাদুডীর মত হাত পা নেড়ে বলেন, জ্ঞান অর্জন করে যাও, জ্ঞান অর্জন করে যাও। এক জীবনে সব হবে না। যতটা পারা যায়, যতটা পারা যায়।

টাকাটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কডার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। একটি একটি করে হাঁড়িতে তুলবে ।খন, দেখবে। চোখ বুজিয়ে থেক না। চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরদর্শন হয়, জগৎ দর্শন হয় না। টাটকা আর ।াসী মিশিয়ে ছেড়ে দেবে। এ বড শক্ত ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

বিশাল উনুনে ঢাউস কড়ায় রস ফুটছে। রসে টাবুরটুবুর কবছে রাশী রাশী রসগোল্লা। শর্করার ।ন্ধমাখা ফিনফিনে ধোঁয়া উঠছে বাঁশের বাতার দিকে। কড়ার সামনে নৌকোর হালের মত কাঠের হাতা ।নয়ে টুলে বসে আছেন পরেশদা। চোখের চেহাবা দেখেই মালুম হচ্ছে দু-চার ছিলিম চেপে গেছে। ।মবাজ বসে আছেন গ্যাঁট হয়ে। তপ্ত কটাহে জীবজগৎ হাবুডুবু। ভিযেন দেখলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রসে ।াড়ু ডুবিয়ে তুলে দেখে ময়রা। এক সুতো। দু সুতো। পাঁচ সুতায় পাকাপাক। পঞ্চেন্দ্রিয় চুর হলে জীব মুক্তি পায। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

পবেশদা, এক সের বড রসগোল্লা।

অপেক্ষা কর, হয়ে এসেছে।

বাঁশের খোঁটায় হুক লাগান। সেই হুকে সোনপাঁপড়ির সুতো লাগিযে আব এক ভীমভবানী টানাটানি ।ালিয়েছে। এও আর এক খেলা। যত টানবে তত খাস্তা হবে। ততই মজবে ভাল। মাঞ্জামারা সোনপাঁপড়ি। বসের চাঁচর দাঁতে কাটবে নাগর। নাগর শব্দটা তেমন ভাল নয়। এসব কথা কেন মনে ।াসছে : বালযোগী সাবধান। ক্ষুরস্যধারা।

পরেশদা হাঁক মারলেন, নিতাই, নিতাই।

ইজের পবা নিতাই দোকানের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল। একসেরী হাঁড়ি আন একটা। ভিজে হাঁড়ি জল শুষছে। পাশ দিয়ে যাবাব সময় ফিস ফিস শব্দ ছেড়ে গেল, বড তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা। ওজন-টোজনের প্রয়োজন হল না। বড় রসগোল্লা কটায় এক সের হয় পরেশদার জানা।

ছোট্ট বিঁড়ের ওপর হাঁড়ি। মুখে শালপাতার আবরণ। পাটের দড়ি দিয়ে কায়দা করে বাঁধা। হাঁড়ি ঝুলছে ডান হাতে। ফাউ চাইলে একটা মুগের নাড়ু মিলত। লোভ জয় করে ফেলেছি। চরিত্রের কি শক্তি! ওদিকে সারি সাবি পাঁচপো মাপের হাঁড়ি লাইন দিয়ে বসেছে। দুধে টইটম্বুর, সাজা দিয়ে ফেলে রেখেছে। কাল সকালে জমে দই হবে।

রাতের রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। মধুবাবুর সাইকেল মেরামতের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রকে একটা কালো কুকুর শুয়ে শুয়ে গা চাটছে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কুকুরটা হঠাৎ উঠে

দাঁড়িয়ে, একটা ডন মেরে রাস্তায় নেমে এল। ভয়ের কিছু নেই। কে চোর, কে সাধু, চেনার ক্ষমতা কুকুরের মত আর কোনও প্রাণীর নেই। সাধে কুকুর পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথের সঙ্গী হয়েছিল?

আমি চলেছি! পেছন পেছন কুকুর চলেছে ফোঁস ফোঁস করতে করতে। চলতেই হবে, আমি যে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। মহাপ্রস্থান করার সময় তোকে নিয়ে যাবরে ভুলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু সন্দেহ হল। ভুলো আমার সাত্ত্বিক চরিত্রকে অনুসরণ করে আসছে বলে মনে হচ্ছে না ত! ডান হাতে ঝোলান হাঁড়িটা শুকতে শুকতে আসছে।

এতে রসগোল্লা আছে মানু। মাংস নেই। গরম রসগোল্লা।

ভুলো রাসকেলের এই মতলব ছিল কে জানত! সামনের দু পা তুলে মারল টান। হাত ছেড়ে হাঁড়ি পড়ল রাস্তায়। ভটাস করে একটা শব্দ। ঘটাকাশ আর চিদাকাশ এক হয়ে বন্ধনমুক্ত জীবের মত সাদা সাদা রসগোল্লা। আমরা চললুম পিণ্টু, ভুলোর মুখ দিয়েই স্বর্গদ্বারে পৌঁছোব, তোমার পিতৃদেবকে বলে দিও। উপবাসী শয়তান কাবার জ্ঞানেই রসগোল্লা খেতে লাগল। ন্যাজটি কিন্তু নাড়তে ভোলেনি শয়তান হলেও কুকুর ত! অন্ধকার রাস্তা। দোকানপাট সব বন্ধ। নর্দমার ধার থেকে আর একটি ছায়ামূর্তি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল। এইবার প্রেতের হাসি। খিল খিলে শব্দ। এ সেই মণি পাগলী। কুকুরটা একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। আনন্দমঠের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য। পাগলী উবু হয়ে বসে রসগোল্লা খাচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ।

মণি কত বড় বাড়ির মেয়ে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে কি ভাবে পাগল হয়ে গেল? এক সময় কি সুন্দর চেহারা ছিল। ভাল ফুল ত ফোটার উপায় নেই। মানুষ এসে ছিঁড়বেই। মণিকে যারা শেষ করে গেল, তারা এখন কোন ফুলে গিয়ে বসেছে কে জানে। ডাঁসা ডাঁসা ভোমরা উড়ছে। যৌবনের পরাগ ঝরে ঝরে পড়ছে। ভাগ্যিস মেয়েছেলে হইনি। ভাদ্র মাসে ভুলোরা শেষ করে দিত। হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ।

মণি পাগলীকে দেখে মনের জোর বেড়ে গেল। রসগোল্লার বদলে বকুনি খাবার জন্যে আমি এখন প্রস্তুত। প্রমাণ সহ পিতার সামনে উপস্থিত হতে হবে। প্রমাণ ছাড়া তিনি কিছু বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না, সুতরাং তিনি নাস্তি। মাটির হাঁড়ির একটা টুকরো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিলুম। ভুলোর একটা টুকরো নিতে পারলে ভাল হত।

মণি গান ধরেছে, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, পেটের ছেলের বড় দাম।

শূন্য হাতে ফিরতে দেখে, পিতা বললেন, কি এখনো নামেনি নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ নেমেছে। আনতে আনতে কুকুরে ছিনিয়ে নিলে। এই যে ভাঙা হাঁড়ির টুকরো। ভুলো আর মণিপাগলী ভাগাভাগি করে খেয়েছে। নির্ভীক স্বীকারোক্তি। বুক ফুলিয়ে সত্যভাষণ। জর্জ ওয়াশিংটন ত তাই করেছিলেন। পিতার শখের গাছ তলোয়ারের এক কোপে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পিতা, এই অপকর্ম আমি করিয়াছি।

মেসোমশাই মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, ভগবানের ইচ্ছে নেই হরিদা। আপনি চেষ্টা করলে হবে কি?

ভগবান-ফগবান আমি মানি না বিনয়দা। যখন যেমন, মানুষের ইচ্ছেই ভগবানের ইচ্ছে বলে চালান হয়। আমি পুরুষকারে বিশ্বাস করি। ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই! গরম রসগোল্লা আমি খাওয়াবই আর ওকে দিয়েই আনাবো।

আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না? কি আশ্চর্য! তাঁর ইচ্ছেতেই ত জগৎ চলছে। জীব আসছে যাচ্ছে। গাছের পাতা নড়ছে। ফুল ফুটছে। পাখি ডাকছে। যেখানে যা দরকার তাই দিয়ে পৃথিবী সাজিয়েছেন। এ এক অনন্ত লীলা! আপনার আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়! ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণি-গণা ইব।

মেয়ের বই দেখে আমাকে আর স্যাংস্কৃট আওড়াবেন না। আমি সার বুঝেছি, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। ঈশ্বর আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি আগে আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইব

যাচাই করে নোব ইমপোস্টার কি না ? আমি মনুর সন্তান মানুষ। আমার সেই পিতার পিতা তস্য পিতা, প্রি-ইনফাইনাইট পিতা বলে গেছেন, যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোহস্য স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনঃ। তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বিত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ। যে কাজ করলে অন্তরাত্মার তৃপ্তি হয় আমি সেই কাজই করব। ওসব গডস্ উইশ-ফুইশ আমি বুঝি না।

আগে ত আপনি এইরকম ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন না। কি করে এরকম হয়ে গেলেন ?

ঈশ্বর হলেন ধনীর বিলাসিতা, দরিদ্রের দুর্বলতা। এই সংসারে একের পর এক যখন মৃত্যু নামছে, একটা করে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন মাঝরাতে, নির্জন ছাতে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, জলভরা চোখে দিনের পর দিন বলেছি, প্রভু, আর না, আর না, এনাফ অফ ইট, এবার ক্ষান্ত হও। একেবারে শ্মশান করে দিও না। আপনার ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব ঈশ্বর উল্কায় জ্বলেছেন, তারায় মিটমিট করেছেন, অ্যাণ্ড নাথিং মোর। ভীরুর কল্পনায় তাঁর মন্দির। ওয়াণ্ট, ডেস্ট্রাকসান, ডেসটিটিউশান, মিউটিলেশান, রেপ, ব্যাম্‌পেজ, ডিভাসটেশান, আপনার ঈশ্বরের পৃথিবীর নিত্য ঘটনা। হার্ড লিকার। চিনি দিলেও মিষ্টি হবে না। এই নাও দশটা টাকা। এইবার মাথায় করে আনবে। দেখি এইবার ঈশ্বরের কেমন ক্ষমতা ! দ্যাট নন এগজিস্ট্যাণ্ট অলমাইটি লর্ড, আই চ্যালেঞ্জ ইওর অথরিটি।

পরেশদার ভিয়েন নেমে গেছে। দোকানের বেনচিতে বসে আছেন। বাচ্চা ছেলেটা ঘ্যাসর ঘ্যাসর করে পিঠের ঘামাচি চুলকে দিচ্ছে। ছেলেটাকে দেখে বড় কষ্ট হয়। কে যে কি করার জন্যে জন্মায় ! কি ভাবে বিকিয়ে যায় ! এই ভবের হাটে অনবরত চলছে বেচা-কেনা। কে কোন রাতে নিজের তাগিদে জন্ম দিয়ে সরে পড়েছে। এখন তুমি ভুগে মর। নির্মলদা ঠিকই বলেন, তোমার আনন্দ আর একজনের দুঃখ। 'প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত। জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত। ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট, বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।'

আয়েসে পরেশদার চোখ বুজে এসেছে। ছেলেটি তার গ্রাম্য ভাষায় বললে, খদ্দের এসেছে গো।

আসুক গে তুই শালা চুলকো।

আমার গলা না শুনলে আয়েস কাটবে না। পরেশদা, এক সের গরম রসগোল্লা।

পরেশদা ঘাড় তুলে চিনলেন, আরে সেই ছোঁড়াটা আবার এসেছে। কি হল ? এই তো নিয়ে গেলে।

ছোঁড়া শব্দটা শুনে পা থেকে মাথা অবদি জ্বলে গেল। ব্যাটার পয়সা হয়েছে। পয়সা হলে কি হবে কালচার নেই। না, রাগলে চলবে না। গীতা বলছেন, বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। গীতাকে ত আবার ব্যঙ্গ করেছেন ডি এল রায়। 'গীতার জোরে সচ্ছে ঘুঁষি, সচ্ছে কানুটিটে, গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে।' নানাভাবের ধাক্কায় পৃথিবীর পথ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ছে।

বেশ ঝরঝরে গলায় বলতে হল, দেরি হবে না কি !

বাবা, তুমি যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ ?

হ্যাঁ, তাড়া আছে। আমার কাজ আছে।

ব্যাজার মুখে পরেশদা দোকানে ঢুকলেন। বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। আগেও দেখেছি দোকানে কোনও নিম্নশ্রেণীর মহিলা এলে, অন্য খদ্দের ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রসালাপ করবেন। স্বামীজী কেমন করে বললেন, মানুষই ঈশ্বর। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। কি দৃষ্টি লাভ করলে পরেশকে ঈশ্বর ভাবা যায় ! পরেশ ঈশ্বর, মণিপাগলী ঈশ্বর। আমিও ঈশ্বর। ঈশ্বরে ঈশ্বরে ছয়লাপ। পৃথিবী গিজগিজ করছে রে বাবা !

এবার আর কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। মাথায় না চাপালেও, প্রায় বুকের কাছে গরম হাঁড়ি চেপে ধরে গুটি গুটি এগোতে থাকি। কৃষ্ণকোলে নন্দলালা যমুনা পার হচ্ছেন। আর কোনদিন রাস্তার কুকুরকে সোহাগ করে বলতে যাব না, মাণু আমার, মাংস নয়, রসগোল্লা। অন্ধকারে ভোঁস করে একটা শব্দ হল। ইনি আবার কে ? আমাদের পাড়ার সেই বিখ্যাত ষাঁড়টি। যার আতঙ্কে যুবতী গরুরা রাস্তা হাঁটে ভয়ে ভয়ে। যে থানার বড় দারোগাকে শিঙে ঝুলিয়ে রেখে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। খ্যাতিমান পুরুষ এখন প্রাণায়াম করছেন। কুলকুণ্ডলিনী ধ্যানস্থ। ইড়া পিঙ্গলায় মহেশ্বরের আসা-যাওয়া শুরু

হয়েছে। চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার মত গাভী সুন্দরীরা এখন গোয়ালে জাবর কাটছে। প্রকৃতিতে বড় কামপ্রভাব। পজেটিভ আর নেগেটিভ এক হবার জন্যে সদাই ছটরফটর করছে। তাতে তোর কিরে শালা। এ যে রামকৃষ্ণের গলা। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।

আমাদের বাড়িতে মধ্যরাতে সন্ধ্যা নামে। সব নিদ্রাজয়ী মহাযোগী। কোন বাড়িতে রাত বারোটার সময় কর্তা হাঁকেন, চা চাপাও ত! পিতৃদেব গর্ব করে বলেন, আমি হলুম নকটারন্যাল বার্ড। কালপ্যাঁচা। কেন এমন হয়েছে জানেন, একের পর এক রুগীর পাশে বসে রাতের পর রাত জেগে জেগে আমার বায়োলজিক্যাল ক্লক ঘুরে গেছে। পৃথিবী যখন ঘুমোয় আমি তখন জাগি। সেনটিন্যাল অফ দি নাইট। নাইটজার। পিতার স্টকে কত যে ভাল ভাল শব্দ আছে। আমাব মাঝে মাঝে মনে হয, ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে সারা জীবন এমন পিতার পাশে থেকে সেবা করে যেতুম।

হাতে হাঁড়ি দেখে পিতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, এসেছে, এসেছে। পেরেছে পেরেছে। আপনাব ঈশ্বর পরাজিত হয়েছেন বিনয়দা। মেসোমশাই মুখ তুলে তাকালেন। সহজে হারতে চান না। মৃদু হেসে বললেন, বিচার হবে শেষের সে দিনে, যেদিন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হব।

মৃত্যু একটা ন্যাচারাল প্রসেস। ওখানে ঈশ্বর নেই। আছে কাল। ইজ থেকে ওয়াজ।

Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.

জলের বিম্ব জলেতে মিলায়—অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত মরতে মবতে একেবারে মরণটারে মারত॥

ব্যাস! মেসোমশাই কুপোকাত। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত সব একেবারে পাঞ্চ করে ছেড়েছেন। ভোলাময়রা আর হরু ঠাকুরেব ধুন্ধুমার লডাই। ভুরভুরে ঘিযের গন্ধ নাকে আসছে। মুকু চেয়ারে নেই। রান্নাঘরে গেছে দিদিকে সাহায্য কবতে। হঠাৎ মাতামহকে মনে পড়ল। এই মুহূর্তে কি কবছেন কে জানে? বাগানের একপাশে নারকেল গাছের তলায় ছোট্ট একানে ঘব। বিশাল এক সিন্দুক। একটু পরেই আমরা লুচি খাব। তিনি কি খেলেন? মাতুলের সংসারেব সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অভিমানে দূরে সরে আছেন। কিছু প্রশ্ন করলেই হা হা হাসি, গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম।

মুকু গোটাকতক আসন হাতে বড় ঘরে ঢুকল। হল ঘরই বলা চলে। শুনেছি এক সময় এই ঘরে বড় বড় আসর বসত। বাত ভোর হযে যেত গানে গানে। বড বড় সব ওস্তাদ আসতেন। মাতুল তখন কিশোর। সেই কিশোর বয়েসেই তাক লাগিয়ে দিতেন। মুকু হাতের ইশারায় ডাকল।

সেই সঙ্গে থেকে একনাগাড়ে পড়ে পড়ে পড়ে চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। কোন দিকে মুখ করে খেতে বসতে হয় জান?

দক্ষিণ ছাড়া, যে কোন দিকেই মুখ করে বসা যায়। দাও আমি পেতে দিচ্ছি। মুকু তিনটে আসন এনেছে। দুটো আসন পেতে দিলুম।

তোমারটা পাতলে না?

আমি পরে তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসব।

খেতে বসে পিতৃদেব নানা ফ্যাচাং বের করেন। কনক সামলাতে পারবে না। তাছাড়া অপরিচিত মেসোমশাইয়ের সামনে বসে তাঁরই মেয়ের ভেজে ভেজে দেওয়া ফুলকো লুচি খেতে লজ্জায় মরে যাব। রান্নাঘরে উনুনের আগুনের আভায় কনককে একেবারে বউমার মত দেখাচ্ছে। ওবেলা একটু আড়ষ্ট ছিল। এবেলা সব পুরোমাত্রায় দখলে এসে গেছে। মাঝে মাঝে ডিকটেটারের মত মুকুকে হুকুম চালাচ্ছে।

একটা নকল কাশি দূর থেকে এগিয়ে আসছে। পিতা আসছেন। কনকের একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে সিঁথি দেখছিলুম। কেন দেখছিলুম তা বলতে পারব না। ভাল লাগছিল। সম্মানজনক দূরত্বে সরে গেলুম। যতই শিশুর মত নিষ্পাপ মুখ করি না কেন, পিতার চক্ষুবীক্ষণে মনের ফেঁসো ধরা পড়বেই।

মনরে তুই শোঁয়াপোকা।

তালতলার চটি পটাস পটাস শব্দ করছে। কনকের কিছু দূরে এসে শব্দ থেমে গেল। পিড়েতে পেছন ঠেকিয়ে কনক বসে আছে উবু হয়ে। ইয়া এক খোঁপা ঘাড়ের কাছে লটকে আছে। সামনে অ্যালুমিনিয়ামের কড়ায় আধা ঘিয়ে-লুচি ফুলছে ফোঁস করে।

পিতা তারিফ করলেন, বাঃ বেশ ফুলছে। একেবারে নিখুত, নিটোল হয়ে। আচ্ছা এবার তুমি ওঠ। তোমার কাজ শেষ। এবার আমাদের শুরু।

কনক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, তার মানে ?

তার মানে, তোমরা এইবার খেতে বসবে, আমরা পিতাপুত্রে পরিবেশন করব।

এ আবার কোন্ দেশী নিয়ম !

তোমরা অতিথি। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ আহারে বসবে, এই হল নিয়ম। নিয়ম শাস্ত্রেই থাক। আপনারা খেতে বসুন। মেয়েলী শাস্ত্র আলাদা।

কনক কথা বলছে আর লুচি ভেজে চলেছে। মেসোমশাইকে বেশ কায়দায় ফেলে দিয়েছে। মেয়েরা কেমন সহজেই শাসক হতে পারে ! ভয়ডর কিছুই নেই। সাধে পরের বাড়ি গিয়ে সহজে জাঁকিয়ে বসে ? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়।

পিতা বললেন, কথা তা হলে শুনবে না !

না, মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এসেছি। অতিথি-ফতিতি আবার কি ? যদ্দিন আছি, এ মহলে আপনার প্রবেশ নিষেধ।

ঠ্যাং করে কড়াতে ঝাঁজরিতে একটা শব্দ হল। পিতার চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। বহু দূর থেকে যেন তাকিয়ে আছেন। দীর্ঘ জলযাত্রার পর নাবিক যে দৃষ্টিতে তমাল তটরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থির, অচঞ্চল। চটির শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। এ কি জয় ? এ কি পরাজয় ? পরাজয় মাঝে মাঝে ভাল।

কনক এবার আমার দিকে তাকাল। একটা চোখ আধবোজা। কড়ার ভাপ এসে লাগছে। এ এক মারাত্মক চাহুনি। একে আমার একটু কবি কবি ভাব। থেকে থেকে আকাশে কালিদাসকে দেখি। ছাদে উঠে ডানা মেলে উড়ে যেতে চাই। বিরহী যক্ষের মত জানালা দিয়ে উত্তরের শ্যামবৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার দিকে এমন ধারাল মুখ যদি আধবোজা চোখে তাকায়, তা হলে কি হয় ? নাও ভেসে যায় নদীর জলে।

কনক বললে, তুমি বসছ না কেন ?

আমার কি লুচি চলবে ?

ওমা সে কি কথা !

দেখলে না, সকালের খাদ্য।

তোমার ত পেট সেরে গেছে ?

অত্যাচারে যদি বেড়ে যায় ?

ঘোড়ার ডিম হবে। গরম লুচিতে পেট ভাল হয়।

তা হলে, তোমাদের সঙ্গে বসব।

রাত হয়েছে বেশ। তোমার খিদে পায়নি ?

না, না খিদে পাবে কেন ?

খিদে পেয়ে পেয়ে মরে মরে এখন আর খিদে কাকে বলে ভুলেই গেছি। কনক ত আর জীবনের সব ঘটনা জানে না। মরা গাছে ফল শুকিয়ে পাকে। রঙ থাকে স্বাদ থাকে না।

মুকু পরিবেশন করছে। শাড়ির আঁচল ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। মেসোমশাই বললেন, কতদিন বলেছি, আঁচল কোমরে জড়াবে।

মুকু বাঁ হাতে কোনরকমে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। মুকুর চুল বেশ কোঁকড়ান কোঁকড়ান।

দুজনের আহার বেশ জোরকদমে চলেছে। অম্বুলের রুগী হলে কি হবে, মেসোমশাই বেশ ভালই টানছেন। এক এক গ্রাসে, এক একখানা লুচি উড়ে যাচ্ছে।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছি। দু বোন আমাকে কোন কাজই করতে দেবে না। পিতা পাত থেকে মুখ তুলে বললেন, কি বুঝলে তাহলে ?

বোকার মত তাকিয়ে রইলুম ঘুম ঘুম চোখে। কোন্ বোঝার কথা বলছেন ?

একটি নধর পটল আঙুল দিয়ে ফুটো করতে করতে বললেন, সেই ছাগলের ঘটনা মনে আছে নিশ্চয়।

ওরে বাবা, খুব মনে আছে। অনেকটা এই ভুলোর মতই ব্যাপার। পিতাপুত্রে বাজার সেরে ফেরা হচ্ছে। আমার হাতে বিশাল দুটো কপি। চারপাশে লতাপাতা ঝুলছে। পথের পাশে একটা ছাগল শুয়েছিল। হঠাৎ মনে হল কপির পাতা ত কাজে লাগবে না। আহা কৃষ্ণের জীব খাইয়ে যাই। কপি সমেত পাতা মুখের সামনে ধরলুম। নে, খা, পাতা খা। ছাগলটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আচমকা এক টান মেরে কপি দুটো হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মার দৌড়। দুজনেই ছুটছি ছাগলের পেছনে। হই হই, রই রই ব্যাপার। ছাগল এক খানা টপকাবার জন্যে মারলে লাফ। কপি ছিঁড়ে পড়ল নর্দমায়। পাতা মুখে ছাগল পালাল ওপারে। রাস্তার লোকের সে কি আনন্দ ! মানুষ বোকা বনে গেলে তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে ! পিতার চোখমুখ রাগে লাল। বাড়ি ফিরে বললেন, ছাগলটাকে চিনতে পারলে ? ভাল মানুষের মত বললুম, আজ্ঞে না।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। দেখতে পাবে।

সামান্য দুটি কথা ; কিন্তু কি অসম্ভব জ্বালা। শুনেছি, শয়তানের মুখ নাকি ছাগলের মতই।

মুগের ডালের তারিফ করতে করতে পিতা বললেন, তোমার জন্যে আমি এক সেট 'সারমন অন দি মাউন্ট' তৈরি করে দিয়ে যাব। প্রথম সারমন হল, সবসময় ভাববে আমি মানুষ নই, একটা গাধা। পৃথিবীর অন্য সমস্ত জীবজন্তুর বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের বেশি।

মেসোমশাই ভরাট মুখে বললেন, সেই লেটারবক্সের ঘটনার পর আমিও নিজেকে তাই মনে করি।

পিতা কুচুরমুচুর করে লুচি খেতে খেতে বললেন, গ্রেট গাধাজ থিঙ্ক অ্যালাইক। হ্যাঁ, আপনার কি হয়েছিল ?

সেই লেটারবক্স। তখন ত বলা হল না। কোর্টে যাবার পথে একদিন একটা চিঠি পোস্ট করার ছিল। এই অবদি শুনেই কনক কুঁক কুঁক করে হেসে উঠল। মেসোমশাই মেয়েকে সমর্থন করলেন হাসিরই কথা। ভাবলে আমার নিজেরই এখনও হাসি পায়। চিরকাল শুনে আসছি চিঠি ঠিকভাবে না ফেললে লেটারবক্সের টাগরায় আটকে থাকে। তাই হাঁটু ভেঙে ডানপাশে কাত হয়ে হাতটাকে যতদূর পারা যায় ততদূর ঠেলে দিলুম ভেতরে। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঢুকে গেল। চিঠিটা টুক করে ছেড়ে দিলুম। এইবার যত হাত টানি, হাত আর বেরোয় না। লেটার বক্সের জিভ আছে। আপনি কি তা জানেন হরিদা ?

খুব জানি। লেটার বক্সও প্রাণী। সে থিওরি আমি আপনাকে পরে বলব।

যতবার হাত টানি মুখের সেই ফ্যাল ফ্যালে ফ্ল্যাপে কোটের ওপর হাতটা আটকে যায়। হাত আর বেরোয় না। তেমন জোরে টানতেও সাহস হচ্ছে না। কোট ত ছিঁড়বেই। সেই সঙ্গে একখানা মাংসেও যাবে। ইতিমধ্যে দু-একজন এসে গেছেন চিঠি ফেলতে। তাঁরা কেবলই জিজ্ঞেস করেন, কি হল আপনার ? আপনি কি নিজেকে পোস্ট করতে চাইছেন ? তা হলে চিঠির বাক্সে নয়, পার্সেলের বাক্সে গিয়ে পড়ুন, হয় ত ধরে যাবে। লজ্জায় বলতেও পারছি না, আটকে গেছি। শেষে বলতেই হল, দাদা হাত টেনে ধরেছে। হই হই ব্যাপার। ঠিক্কুর রোদে বেলা বারোটা পর্যন্ত সেইভাবে ঝুলে রইলুম। মজা দেখার জন্যে শহরের ছেলেবুড়ো সব ভেঙে পড়ল। এজলাসে মামলা মুলতুবি রইল। জায়গাটার নামই হয়ে গেল, উকিলমারি। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ডাকবাক্সে আর কখনও হাত ঢোকাব না।

চিঠিটা নিশ্চয়ই একটু ক্ষতিকারক ছিল।

তা একটু ছিল। উকিলের চিঠি ত ! কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস।

সেই কারণেই লেটার বক্স হাত কামড়ে ধরেছিল। মরামাছ প্রতিশোধ নেয় জানেন কি ?

কি রকম ?

এই ত কয়েকদিন আগে দাঁত আর মাড়ির ফাঁকে আড়াআড়ি ঢুকে গেল কাঁটা। কিছুতেই বেরোয় আঙুলে ধরা যায় না। কাঠি দিয়ে খোঁচান যায় না। জিভ দিয়ে ঠেলা যায় না। মাড়িতে পুঁতে ধারাল একটি খোঁচা বেরিয়ে রইল। সারাদিন কসরত। শেষে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ফেঁড়ে বার হল। মানুষ অপঘাতে মরলে ভূত হয়। মাছও তাই। মরে মেরে গেল।

ওটা জাস্ট একটা দুর্ঘটনা।

তাহলে শুনুন, দেয়াল কি ভাবে প্রতিশোধ নেয়। পেরেক পুঁতছেন। ইয়া গজাল। হাতুড়ি পড়ছে ঢাঁই। কে বলেছে দেয়ালে প্রাণ নেই ! যার কান আছে, তাব প্রাণও আছে। হাতুড়ির সঙ্গে ইশারায় থা হয়ে গেল। ব্যাস্, পরের ঘায়ে বুড়ো আঙুলের মাথাটা ছেতরে গেল। পৃথিবী কি সহজ জায়গা ! এখানে কি আছে আর কি নেই ! কি হয় আর কি হয় না, বলা ভারি শক্ত।

একটি রসগোল্লা মুখে পুরলেন। এ হেঃ প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। গরম রসগোল্লা দোকানের সামনে হযে বসে খেতে হয়। নিন, নিন টপাটপ মুখে পুরুন। তাহলে তোমার দর্দ বাডবে। হিন্দিতে দর্দ নে যন্ত্রণা।

ঘড়ি খ্যাঁড়াড়াক করে উঠল। সাড়ে এগারটা বাজবে। তিনমাথার মোড়ে কুকুর মড়াকান্না শুরু রেছে। মাঝ রাত এগিয়ে আসছে। এইবার ভূত বেরোবে। আমাদের চিলেব ছাতে প্যাঁচা ডাকবে চ্যাঁ করে।

রান্নাঘরে তিনজন পাশাপাশি খেতে বসেছি। মেয়েদের খেতে বসার ধরনটাই আলাদা। একটা হাঁটু াড়া থাকবে, আর একটা পাতা থাকবে জমিতে। তার ওপর থাকবে একটা হাত। ঠোঁট দুটো অল্প াঁক। খাবার ঢুকবে একটু একটু করে। খাচ্ছে কি খাচ্ছে না বোঝার উপায় থাকবে না। যে গতিতে ওয়া চলেছে, শেষ হতে রাত দুটো বাজবে। কনক নিজের পাত থেকে একটা পটল আমার পাতে লে দিল। তুলে দিয়েই খেয়াল হল, এ মা তোমার পাতটা এঁটো করে দিলুম যে।

আনন্দে সারা শরীর সির সির করে উঠল। কত কাছাকাছি চলে এসেছি। দুটো মহাদেশ যেন এক হ্ন। আমার একটা সেই মাছি মার্কা হাসি আছে। দাঁত বের করা, গালে টোল ধরান। সেই সাপের াসি যে বেদেয় চেনে। মুখটাকে গাটাপার্চারের মত করে বললুম, তাতে কি হয়েছে ! তুমি খেলে না কন ?

নতুন পটল। সুন্দর খেতে। তুমি একটা বেশি খাও। রান্না কেমন হযেছে ?

উঃ ; ওয়াণ্ডারফুল। কার কাছে শিখলে এমন রান্না।

মায়ের কাছে।

সব শেষ হতে বারোটা বেজে গেল। উত্তর মহলের আলো নিবে গেল। কনক বললে, মুকু তুই কি খন আবার পড়তে বসবি ?

আর শরীর বইছে না।

আজ তাহলে শুয়ে পড়।

ছাতে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে। পিতৃদেব পদচারণা করছেন। হজমের জন্যে যা অবশ্য করণীয়। াড়লে ছাতা মাথায় দিয়েও করতে হবে। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও সূর্য পূর্বদিকে ঠিকই ওঠে। নড়চড় নেই।

যামিনী জাগহি যোগী

পিতৃদেব অনেকক্ষণ কান খাড়া করে বসে আছেন। সামনে একটা মোটা বই আধাআধি জায়গায় খোলা। চাপা আলো সামনে ছড়িয়ে পড়েছে। মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে দেখছি। ঘুম চটে গেছে সহজে কি আর আসবে। হঠাৎ মশারির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ডাকছে বল ত ? মনে হচ্ছে দুটো কোলা ব্যাঙ মুখোমুখি বসে গলা সাধছে.! এখন ত বর্ষাকাল নয়। ব্যাঙ আসবে কোথা থেকে ?

আজ্ঞে ব্যাঙ নয়। মেসোমশাইয়ের নাক। দুটো ফুটো দু রকম শব্দ ছাড়ছে। আর মাঝে মাঝে গলাটা আমতা আমতা করে উঠছে।

রাত বারোটার পর পিতৃদেব একটু নরম হয়ে যান। তখন একটু রসিকতা-টসিকতা চলে। রোদ উঠলেই স্বভাবের জলাশয় উত্তপ্ত হতে থাকে। সূর্য যখন মধ্য গগনে মেজাজও তখন সপ্তমে। মেজাজেরও উদয় অস্ত আছে। আসলে এই ঘরে এই সময় ত মায়ের শোবার কথা। নীল শাড়ি, চুড়ির শব্দ। চুলে চিরুনি চালাবার গাঢ়, ঘন শব্দ। যেন বটের পাতায় হাওয়া লেগেছে.। আমার মা হলেও পিতার স্ত্রী ত ! দু'জনের সঙ্গে দু রকম সম্পর্ক। রিভারসিবল সোয়েটারের মত। দু'জনের কাছে দু রকম রঙ ! সেই জায়গায় কে শুয়ে আছে ! তাঁরই গর্ভজাত এক অষ্টাবক্র মুনি। দেহেও মর্কট, মনেও মর্কট। সন্ন্যাস নিলে, নিজেই নিজের নাম রাখব, স্বামী মর্কটানন্দ।

এ নাক কি শুলেই ডাকবে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরেও সমানে ডেকে গেছে।

তার মানে মিউজিক্যাল নোজ। আমাদের ফ্যামিলিতে কারুর কখনও নাক ডাকেনি। ডাকের বহর দেখে মনে হচ্ছে অ্যাফ্রিকান নোজ। মেয়ে দুটো ঘুমোচ্ছে কি করে ! এ যে ঘরের পাশে ঘোড়ার আস্তাবল।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সমস্যায় সলিলোকি। শেক্সপীয়ার চালু করে দিয়ে গেছেন। ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, রিভলভারে যদি সাইলেনসার ফিট করা যায়, নাকে কেন যাবে না ! নিশ্চয়ই যাবে। ওটা যদি গোল হয়, এটা হবে তিন কোণা।

রাতে চারপাশ শান্ত বলেই ডাকের জোর দুপুরের চেয়ে অন্তত একশো গুণ বেশি মনে হচ্ছে। একেবারে ষাঁড়ের ডাক। ঘোরতর আক্রোশ। দাঁতে দাঁত চেপে নাক শব্দ করছে গাঁ গাঁ। বিরাট লরির ইঞ্জিন খাড়াই বেয়ে ওঠার সময় এই রকম পরিত্রাহী শব্দ ছাড়ে। আর একটি উপসর্গ যোগ হয়েছে যা দুপুরে ছিল না। নিজের ডাকে নিজেই চমকে উঠে সাড়া দিচ্ছেন, কে কে ? চারবার কে বলে আবার নিচু পর্দা থেকে নাক ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে। সত্যিই আতঙ্কের বিষয়।

পিতার সলিলোকি, নাক কেন ডাকে ? নাক ডাকে, না গলা ডাকে ? বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকে। সে ত পুরুষের ডাক। পুরুষ ডাকছে প্রকৃতিকে। সে ত নাক নয়, গলার খেলা। দেখি বুক অফ নলেজ কি বলছে।

রাত দুটো। মানুষের ঘুম চলে গেলে মাথা কত দিকে খেলতে চায়। বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে বুক অফ নলেজ খুঁজছেন। হঠাৎ মাথাটা বাঁ পাশে হেলে গেল। যেন কোনও কিছুর ঝাপটা লাগল। চট করে বসে পড়লেন। গুড়িগুড়ি এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। হাত বাড়িয়ে আলো নেবালেন। বই বন্ধ করলেন ধপাস করে। একই কায়দায় ফিরে এলেন বিছানায়, মশারির ভেতরে। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, এসে গেছে।

ঘরে সুইশ্ সুইশ করে ডানার শব্দ হচ্ছে। সেই বিশাল চামচিকিটা। চক্কর দিয়ে উড়তেই থাকবে, উড়তেই থাকবে। পিতার মহামান্য অতিথি। আজ আমাদের বাড়ি ভর্তি অতিথি মেয়ের মত নাসিকা গর্জন, তাই তেমন গা ছমছম করছে না। নয় ত এই মধ্যরাতে, অন্যান্য দিন, দুটি প্রাণীর চোখের :

-মেলা-অন্ধকার যখন লাট খেতে থাকে তখন কেমন যেন মনে হয়। That horrible black fold dressed, That stapled block God sink the rest !

াধ্যে লাটখাওয়া চামচিকির প্রবেশ, পিতার গুড়ি গুড়ি বিছানায় এসে ঢোকা, কানের কাছে মুখ ফিসফিস বলা, এসেছে, এসেছে। ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস। অন্ধকারে অন্ধকারের তরঙ্গ তুলে অন্ধকারের অন্ধকার রেখা টেনে চলা, জগতের গর্ভমোচন করে অতিজাগতিকের রহস্যমুক্তির বিমূর্ত কোনও অনুভূতি। শরীর কেমন শিথিল হয়ে আসে। পিতা বলতে থাকেন, এ সোল, এ মহৎ কোনও আত্মা। আমাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। কার আত্মা ! আমাদের যত পূর্বপুরুষ ! আত্মার তলে ঈশ্বরের চাকিতে তিন কোণা পরোটার আকৃতি ধারণ করে উড়ে উড়ে ! শিক্ষিত মানুষের এমন বিশ্বাস আসে কি করে ? পরপর তিন দিন না এলেই বুঝবে বিপদ। একটা হাত মাথার বালিশে রেখে কাত হয়ে পিতা ঘরের অন্ধকারের দিকে উৎসুক হয়ে য়ে রইলেন। বোধিবৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট বুদ্ধকে শিষ্য পোত্থপদ জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু এই জগৎ অনন্তকালের নয় ? কোনও উত্তর নেই ? প্রভু, জগৎ কি সসীম ? বুদ্ধ নিরুত্তর। জগৎ কি তবে ? এ প্রশ্নেরও কোনও জবাব নেই। প্রভু, আত্মা আর দেহ কি এক ? এরও কোনও উত্তর নেই। ল কি পৃথক ? বুদ্ধ বললেন, এসব প্রশ্ন অর্থহীন। ধর্মের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। এর উত্তর জানা জানায় প্রশ্নকারীর কোনও লাভ নেই। মূল কথা হল, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ আর মার্গ। আত্মা কি, না চামচিকি আত্মা এ নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন করে ঘুমিয়ে পড়।

আচমকা, কে কে করে উঠলেন।

পিতা বললেন, কানের পাশে এই তূর্যনাদ চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের নার্ভাস ব্রেকডাউন যাবে। ঠেলে তুলতে হবে।

সেটা খুব অভদ্রতা হবে।

এই, এই হল বাঙালী মেন্টালিটি। নোলকনাড়া বউদের স্বভাব। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করব আর গিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করব। ইওরোপের নীতিটা কি জান ? সোজা মুখের ওপর বলা, ইউ এ নুইসেনস। আমার একটা হাই উঠল। খুবই অনুচিত কাজ। তবে আবেগ ত ! বেগ চাপা যায়

পিতা বললেন, ইউ আর এ নুইসেনস বুঝলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইটা হল ইওরোপিয়ান অ্যাপ্রোচ।

হাইটা চাপতে পারলাম না। চেষ্টা করেছিলুম। ছপ্পর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

তোমাকে বলিনি। হাইয়ের পাংচুয়েশানে আগের কথার জের টানলুম। তোমাকে ডিরোজিওর একটা গল্প বলি। জান ত তিনি কে ছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিন্দু কলেজে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। ডিরোজিও দেখছেন। হঠাৎ একটা ছেলে এসে সামনে আড়াল দাঁড়াল। যেমন তোমরা কর আর কি ? ডিরোজিও বললেন, মাই বয়, ইউ আর নট ট্রান্সপেরেন্ট। একেই বলে ইংলিশ অ্যাপ্রোচ। অভদ্র না হয়েও কাজের কথাটি বলে ফেলা। কিন্তু, যিনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন তাঁকে আপনি কি বলবেন ? না, ট্রান্সপেরেন্ট, না ওপেক, ? দেখবে তা হলে ! ব্যাপারটাকে কতদূর ফান্নি করে তোলা যায় ! দ্যাখো তা হলে। বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন। চামচিকি উড়ে চলে গেছে শেষ চক্কর মেরে। আলো জ্বলে উঠল। ঝতে সতরঞ্চি পড়ল ! কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটনা কোন দিকে যাবে। কি করতে চলেছেন। হয়ে খাটের তলা থেকে বাঁয়া তবলা টেনে বের করলেন।

হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মারলেন বার কতক। তাল বোঝার চেষ্টা করছেন। নাকের ডাকেরও তাল ! দেখি কোন্ তালে ভেড়ে ! তবলায় চাঁটি পড়ল। নেহাত বাগানঘেরা ভুতুড়ে বাড়ি ! তা না হলে

প্রতিবেশীরা ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসত। তবলা বোল ভাঙছে। বাঃ নাক দেখছি ঝাঁপতালে চলে
মিনিট দশেক হয়ে গেল, তবলা উদ্দাম বেজে চলেছে, ধা ধা, ধা, ধিন্‌তা তা। ধাগে নাগে পেলে, ধিক্কার দিয়ে যা। ভ্রূকুটি, মুকুটি, ভিরকুটি, ফেঁসে যা, ধসে যা, ধা, ধা, ধিন্‌তা, কৎ। যে ডাকে, সে কানে শুনতে পায় না। আর মেয়েরা একবার ঘুমোলে মৃত। বেহুলার কথা মনে লক্ষ্মীন্দর ঠ্যালা মারছে আর বলছে, উঠ উঠ বেহুলা/সাযাবেনের ঝি/তোরে খাইল কাল নিদ্রা/ খাইল কি ! আমাদের মেনিদা ত প্রায়ই সদর দরজার একটা পাল্লা কাঁধে করে রাতে গৃহপ্রবেশ শ্রীমতী মেনির এমনই ঘুম। দেয়ালে পাল্লা ঠেসিয়ে রেখে একটু দম নিয়ে স্ত্রীর নাক টিপে ধরেন। হাঁসফাঁস করে চোখ মেলে তাকিয়ে শ্রীমতী বলেন, ভেঙেছ ! একেই বলে, ভেঙেছ দুয়ার, জ্যোর্তিময়। সবই মিস বড় মেনির কাছে শোনা। মাঝে মাঝে দুপুরে আসে পড়তে। এমন নিঃক্ষ বঙ্গললনা সচরাচর চোখে পড়ে না। শব্দটা সুখেনের আবিষ্কার। যে শরীরে যৌবন ফেঁড়ে ফেলার ধার নেই সুখেনের ভাষায় তেমন শরীর হল নিঃক্ষত্রীয়। থিয়েটারে ছেলেরা মেয়ে সাজে। মেয়েরা ছেলে সাজতে চায় সবার আগে মিস মেনির ডাক পড়বে। সব সমতল। ও তলে অতল নেই। সু কৃপায় জ্ঞানভাণ্ডার যে রকম সমৃদ্ধ হয়েছে, পরিচয় পেলে পিতা হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ যে পি পিতা, বৃদ্ধ পিতা।

তবলা থেমে গেল। সাবেক কালের, লম্বা লম্বা গরাদ লাগান, খোলা, খাড়া জানালায় রাতের আ লেগে আছে। অন্ধকার যেন পাতলা চাদরের মত থিরথির কাঁপছে। ফ্যাকাশে চাঁদ অভিসার শেষ ওই পথেই যেতে যেতে উঁকি মেরে দেখছে। ঘরের মেঝেতে লম্বা হয়ে গরাদের ছায়া পড়েছে। পাশ কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। মোহনিশা সব সো অনিহারা। দেখছি স্বপ্ন অনেক প্রকারা ॥ জগ যামিনী জাগহি যোগী। পরমারথ পরপঞ্চ বিয়োগী। এই মোহরাত্রী। ভোগী জীব স্বপ্নে নিদ্রি কনক, মুকু, মেসোমশাই। আর এই যে আমরা পরমার্থানুসন্ধায়ী বিবেকী যোগী দু'জন সংসার জেগে বসে আছি। রাতের রেলগাড়ি চলেছে, চাঁদের পাহাড়ের পাশ দিয়ে তারাদের যাত্রী নিয়ে। ফাদার। আপনার জন্যেই এই নিশি যাপন। অসীমের রহস্য সন্ধান।

হাঁটুর ওপর হাত রেখে পিতা তাকিয়ে আছেন উন্মনা হয়ে। সারা শরীরে চাঁদের আলো। ব্রো মূর্তির মত দেখাচ্ছে। না ফিরেই বললেন, ঘুমোলে নাকি ?

আজ্ঞে না।

কি হবে ঘুমিয়ে ! নেমে এস। দেখি তুমি কেমন গান শিখেছো ?

মিলিটারি ডিসপোজ্জালে কেনা খাঁকি মশারির ঘেরাটোপ ছেড়ে নেমে এলুম। মেঝেতে রুপোর বইছে। ভাণ্ডারে তালে গাইবার মত দুটো গানই আছে। তাই হোক। তুলসীদাসকে মনে পড় অযোধ্যার পাহাড়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। ধরে ফেলি তাহলে, রাম নাম সুখদায়ী, সাঁচ্চা মনসে ভজ তো, একদিন মুক্তি পাই। গান বেশ জমে উঠল। সুরের মায়াজাল তৈরি করবার অদ্ভুত একটা আছে। মাতুলের মত কাজ, অলঙ্কার বসাতে না পারলেও চোখের সামনে রামচন্দ্রকে দেখতে পা কাঁধে ধনুর্বাণ, নন্দলাল বসুর আঁকা টানা টানা চোখ। অযোধ্যার বিশাল প্রাসাদ। সিংহাসনে দশরথ। চামর হাতে দু পাশে দুই সুন্দরী। অযোধ্যার রাতের বাজার। মশালের আলো। দোকানে ঝিলিক মারছে হীরে, চুনী, পান্নার হার। কি শান্তি ! কি আনন্দ ! রামনাম সুখদায়ী। রাম হ্যায় অমৃতধারা। রাম বিনা কোই নেহি হামারা। ভাবের ঘোরে হড়কে গিয়ে মাঝে মাঝে তাল কাট উত্তেজনায় লয় বেড়ে যাচ্ছে। প্রবল বেগে তবলা বাজাতে বাজাতে পিতা থেকে থেকে হুঁ হুঁ উঠছেন। ফাঁক চলে গেছে সমে। সম চলে এসেছে ফাঁকে। মরিয়া, তেরিয়া, খেপে গেছি। সাইকেল চালাতে শিখে রাস্তায় নামার মত। বেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। লয় বাড়ছে, মাথা দুল লাঠালাঠি ব্যাপার।

খুট্‌স করে কনকদের ঘরের দরজা খুলে গেল। রাম ভুলে চোখ চলে গেল ঘরের দিকে করে তিন তেহাই মেরে কালোয়াতের কালোয়াতি শেষ হল। কনক অবাক হয়ে গেছে। রাতের

কোন প্রহব ! চাঁদেব আলো আরও ম্লান হয়ে এসেছে। বৃষ্টি ভেজা প্রেয়সীর ওষ্ঠের মত। পিতাপুত্র সেই আলোতে বসে আছি বিবর্ণ ছবির মত।

কনক এগিয়ে এসে বললে, মেসোমশাই, কখন উঠলেন ?

তিড়িং করে তবলায় চাঁটি মেরে বললেন, শুতেই যাইনি, ত ওঠা ! নাও ধর ধর। মন্দ হচ্ছে না। ঘষামাজা কবলে হতে পাবে।

আমারও তর সইছে না। গলায় সুর এসেছে। সামনে কনক এসেছে। চার পাশে দুধ গোলা অন্ধকাব। মলিন উত্তরীয় জড়িয়ে পৃথিবী চেয়ে আছে পূবের দিকে। আর ত কিছু জানা নেই। ভাঁয়রোই চলুক। জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবব। পঞ্ছি বন বোলে। আহা সুর যা লাগছে ? আকাশের গায়ে সিঁদুরে রঙ ধরার মত।

কনক পা মুড়ে বসে পড়েছে। মেসোমশাইয়েব নাসিকা গর্জন থেমে গেছে। এ রকম ভীষণ উৎপাতে কে ঘুমোবে ! পুরো পরিবাব জেগে উঠেছে। ঝাপসা পাখি উড়ছে। কুমাব রঘুনাথকে জাগাবার জন্যে গাইয়েব কি ব্যাকুলতা ! রহস্যময়ী রাত চলে গেল। অচেনা পৃথিবী আবার চেনা হয়ে উঠছে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। কনক কাপড় জামা ছেড়ে প্রাইমাস স্টোভে চায়েব জল চাপিয়েছে। মেসোমশাই ঠাকুব ঘরে ধ্যানস্থ। পিতা দাঁতে কড়া বুরুশ ঘষছেন। স্টোভেব শব্দেব সঙ্গে বুরুশের শব্দ মিশে বেশ একটা ঐকতান তৈবি হয়েছে। সকালের গায়ে যেন শিবীশ কাগজ ঘষা হচ্ছে !

মেসোমশাই ঘরেব বাইরে এসে ধ্যানভাঙা চোখে জগৎ সংসারেব দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে বললেন, হবিদা, আপনাদেব এখানে কোথাও খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। খাঁটি দুধ !

পিতা ঘাড় ঘুবিয়ে বললেন, এ বাজারে খাঁটি কিছু আছে কি ? খাটাল আছে, গরু আছে, বাঁট থেকে সাদা জলও বেরোবে, তবে সে দুধে সবও পড়বে না, গোঁপে ঘিয়েব স্বাদও পাবেন না।

সেই ছেলেবেলা থেকেই সকালে দুধ খাওয়া অভ্যাস, যদি অনুমতি করেন একবার চেষ্টা করে দেখি।

কটাব সময় খাওয়া অভ্যাস ?

এই আটটা নাগাদ।

তার আগেই পাবেন। বালতি হাতে বামখেলোয়ান এল বলে।

তাহলে এই এক মাসের জন্যে দুধ একটু বাড়িয়ে দেবাব আজ্ঞা করুন।

কবলুম। তবে চাঁদির চাকতি ছোঁড়া চলবে না।

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সুটকেসে নোট গজগজ কবছে, খরচ করার সুযোগ মিলছে না। কনক চাযেব কাপ হাতে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, বাব্বাঃ, কখন দাঁত মাজতে বসেছেন মেসোমশাই ! এবাব উঠুন। চা এসে গেছে।

ব্রাশ হাতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, সকালের চা আমি যে গেলাসে খাই মা। ওইটুকু মধুপর্কির কাপে কি সানাবে ?

খালি পেটে এক গেলাস চা ?

ও বাপকো বেটি ! লিভারাতঙ্কে ভুগছ ! চা আমার লিভারকে কাবু করতে পারবে না। তুমি কিচ্ছু ভেব না। মেসোমশাই এবার দ্বিতীয় ফাঁকড়া বের করলেন, আপনাদের সকালের বাজারটা একবার দেখে এলে হত না ? গামছায় হাত মুছতে মুছতে পিতা বললেন, আপনি মশাই মহা ছটফটে লোক ! শান্ত হয়ে একটু বসুন ত ! বাজারে গিয়ে গোঁত্তা খেয়ে কি হবে ? এ কি আপনি মধুপুরে চেঞ্জে এসেছেন ? ড্যাঞ্চিবাবু হয়ে বাজারে ঘুরবেন ? তিন দিনের বাজার বাড়িতে ঠাসা। আগে খেয়ে শেষ করুন।

আমি যে মাছ কিনতে বড ভালবাসি।

সে সুযোগ রোব্বারে পাবেন।

পড়ার টেবিল থেকে মুকু ডাকল, বাবা।

পিতৃদেবের ভুরু ক্রমশই কুঁচকে উঠছে।

মেসোমশাই চলে গেলেন। পিতা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তুমি বাজার থেকে দেখেশুনে একটু মাছ আনতে পারবে ?

কেন পারব না ?

তাহলে নেমে পড়। তোমার মেকআপ, টেকআপ নিয়ে নাও।

কথায় একটু হুল থাকবেই। বসরাই গোলাপেও কাঁটা থাকে। মাতুল একটি মুখে ঘষার ক্রিম উপহার দিয়েছিলেন। সেই বস্তুটি একদিন মাখতে দেখে, কি অট্টহাসি ! ওহে লালিমা পাল পুং, বঙ্গের বীর সন্তান, চুলে পমেটম, গালে রঙচঙ, পকেট ঢনঢন, মুখে মিহিমিহি বুলি, চায়ের কাপে তুফান তুলি, বেড়াবি আর কতকাল। সেই দর্শনের দর্শনী আজও দিতে হচ্ছে।

হরি আছ ? হরিশঙ্কর ?

বেশ ভারি গলা। সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন আর হাঁক মারছেন। এত সকালে কার আগমন ? বিধু জ্যাঠা। গায়ে আসাম সিলকের পাঞ্জাবি। চওড়াপাড় দিশি ধুতি। কপালে লাল চন্দনের টিপ। তার মাঝে একটি চাল আটকে আছে। চুলে অ্যায়সা তেল ঢেলেছেন কপালের দু পাশে গড়াচ্ছে। মাতুল দেখলেই বলতেন, কলুর বলদ। সাতসকালে কারুর শুভাগমন কোনোকালেই তিনি ভাল চোখে দেখেন না।

বিধু জ্যাঠা আর একবার হাঁক পাড়লেন, হরি আছ ? হরিশঙ্কর ? আমাকে সামনে দেখে বললেন, ও তুমি ! বাবা উঠেছেন ?

কথায় আছে, তিন তিসি, লোটা গর্দান, দোনো হায় শয়তানকা নিশান। এই মানুষটি সেই লক্ষণাক্রান্ত। চোখে আবার ফ্যানসি চশমা ! আমার পেছনে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, আসুন। হঠাৎ এই সকালে !

এক সার বাঁধান দাঁত মেলে বিধু জ্যাঠা বললেন, বাধ্য হলুম আসতে। তুমি যেরকম ন্যাজে খেলছো !

তার মানে ?

তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে হে !

হ্যাঁ, আকাশ থেকেই পড়লুম। আপনার ন্যাজ আছে সে স্বীকারোক্তি এক ধরনের আত্মপ্রকাশ। মেনে নিতে রাজী আছি। তবে সে সোঁটা ন্যাজ নিয়ে আমি কোন্ দুঃখে খেলতে যাব।

রেগো না, রেগো না। ভেতরে চল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা চলে না ! ব্যাপারটা যখন দেনাপাওনার।

বিধু জ্যাঠা প্রায় ঠেলেঠুলেই ঘরে ঢুকে এলেন। একটা জ্বলন্ত উনুন যেন পাশ দিয়ে চলে গেল, এত উত্তাপ ! চেয়ারে যেন নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন। নিজের ডান পা-টাকেই বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখলেন যেন বন্দুক ঘোরাচ্ছেন ! পিতাও প্রায় সেইভাবেই চেয়ারে বসলেন। এঁদের শরীরে এখন খোঁচা মারলে রক্ত বেরোবে বলে মনে হয় না। রেলগাড়ির স্টিম বেরোবে ফ্যাঁস করে।

পিতা বললেন, কিসের দেনাপাওনা ! কিসের দেনাপাওনা ! আমার কাছে কেউ এক কপর্দকও পায় না।

পায় পায়, হরিশঙ্কর। নেবার সময় লোকে খুব কাঁদনি গায়, দেবার সময় তিড়িং তিড়িং লাফায়।

শুনুন, শুনুন, আমি আপনাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। জীবনে আপনার ত্রিসীমানা মাড়াইনি, মাড়াবার ইচ্ছেও নেই। না খেয়ে মরব সেও ভি আচ্ছা, তবু আপনার মত এক দালালের কাছে কখনও টাকা ধার করতে যাব না, বুঝলেন ? আর তা ছাড়া বাপ মায়ের আশীর্বাদে আমি ভিখিরি নই। নিজের ম্যাও নিজেই সামলাতে পারি। তার জন্যে দালালের দরজায় যেতে হবে না।

হরিশঙ্কর, অহঙ্কার ভাল, তবে কি জান, তোমার মেজদা, যার মেরে তোমার এই বোলচাল, তার শেষের দিনে এই বিধুশর্মাই ত ম্যাও ধরেছিল। তোমার মেজ বউদি যখন মরো মরো, তুমি ত তখন

উড়ছ। বাড়িতে আসর বসাচ্ছ, রাজ এস্টেট থেকে ওস্তাদ আনাচ্ছ, বাড়িতে রেখে বিরিয়ানি ওড়াচ্ছ, আর ওদিকে তোমার মেজদা দুবেলা আমার কাছে এসে হাত পাতছে।

গেট আউট, ইমিজিয়েটলি গেট আউট। লায়ার, শয়তান, রোগ।

পিতা ঘুষি পাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে সবেগে উঠতে গেলেন। গেঞ্জি গলে মোটা পইতে ঝুলেছিল। উত্তেজনার অবসরে পইতে যথাস্থলে, চেয়ারের কোণায় জড়িয়ে বসেছিল। পিতা উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার উঠল, পইতে ছিঁড়ে দু টুকরো হল, চেয়ার টাল খেয়ে সশব্দে উলটে পড়ল বইয়ের র‍্যাকের ওপর, র‍্যাক থেকে দুদ্দাড় করে বই পড়ল, বইয়ের ধাক্কায় চায়ের গেলাস ছিটকে গেল কোণের দিকে। সব ঘটে গেল পরপর, অনেকটা জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর অর্ডারে।

মেসোমশাই, মুকু, কনক তিনজনেই ছুটে এসেছেন। পিতা পইতে ছিঁড়ে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। প্রতিপক্ষ চেয়ারেই বসে আছেন পায়ের ওপর পা তুলে। মৃদু মৃদু হাসছেন। আমার সেই শয়তানের গল্পটি মনে পড়ল, ঈশ্বর বললেন, শয়তান, লোকে বলে তুমি খারাপ ছাড়া ভাল কিছু কখনও কর না। কেন বল ত ? শয়তান বললে, প্রভু আমার ভাগ্য। দুজনে ছদ্মবেশে এক মুদীর দোকানে বসে কথা বলছিলেন। শয়তান গুড়ের নাগরি থেকে আঙুলে এক ফোঁটা গুড় নিয়ে দোকানের বাঁশের খোঁটায় একটি টিপ পরিয়ে দিয়ে বললে, প্রভু, এটা কি কোনও অপকর্ম ? ভগবান বললেন, না, এ আর কি এমন অপকর্ম। তবে দেখুন ! দুজনেই স্থানত্যাগ করলেন। এদিকে সেই গুড়ের টানে সারি সারি পিঁপড়ে খোঁটা বেয়ে উঠতে লাগল। পিঁপড়ের লোভে তেড়ে এল গোদা টিকটিকি। টিকটিকি ধরতে এল বেড়াল। বেড়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে এল রাস্তার কুকুর। নিমেষে লণ্ডভণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড।

মেসোমশাই মেয়েদের এক এক টানে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে, দুম করে ডান পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ড্রয়ারের ওপর পাশাপাশি রাখা কাচের ফুলদানী চিন করে বেজে উঠল। চাপা হুঙ্কারে বললেন, কি হয়েছে হবিদা ?

নানা জিনিসের যুগপৎ পতনের শব্দে বিভ্রান্তিতে পিতা তূষ্ণীভূত হয়েছিলেন। মেসোমশাইয়ের প্রশ্নে ঘোর কেটে গেল। বাজারের পাশে একটা লোক বসে বসে ভেলকি দেখাচ্ছিল, লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি। হঠাৎ টাগরায় জিভ জড়িয়ে লোকটির সমাধি হয়ে গেল। সবাই ধন্য ধন্য করছে। কিছুক্ষণ পরে সেই ভাবটি যেই কেটে গেল, লোকটি অমনি লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি বলে চিৎকার শুরু করে দিল। পিতা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠলেন, গেট আউট, গেট আউট, ইউ স্কাউনড্রেল।

মেসোমশাই অগ্রপশ্চাৎ কিছুই শোনেননি ; কিন্তু বীরভাবের একটা স্পর্শদোষ আছে। মালকোঁচা মারা ধুতিপরিহিত মেসোমশাই বিধু জ্যাঠার চোখের সামনে তিড়বিড় করে নাচতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, গেট আউট, গেট আউট, ইউ স্কাউনড্রেল।

আমাদের তিনজনের এতক্ষণ কোনও ভূমিকা ছিল না। লম্ফঝম্ফ শুরু হওয়ায় আমরা তিনজনে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলুম, বাবা, কাচ, মেসোমশাই কাচ। বাবাতে, মেসোমশাইতে এমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, কে কার বাবা, কে কার মেসোমশাই ! সাবধানবাণী কেউই গ্রাহ্য করছেন না। এদিকে মেঝেতে লেবুর কোয়ার মত ফালা ফালা কাচ পড়ে আছে। একবার পায়ে ফুটলে হয় ! আমাদের সুখেন একবার বৃন্দাবনকে খুব ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। বৃন্দাবনের বাবা বৃন্দাবনের মাসীকে দ্বিতীয় পক্ষ করে আনলেন। সুখেন, বোকাসোকা বৃন্দাবনকে বুঝিয়ে দিলে, তোর বাবাকে আর ভুলেও বাবা বলে ডাকিসনি। ভীষণ রেগে যাবেন। অপমান করা হবে। তিনবার ফেল করেছিস, এইবার তা হলে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। মেসোমশাই বলবি। মাসীর বর মেসো হয় জানিস ত ! পরের দিন সকালে দেখা গেল, বৃন্দাবন উদম হয়ে বাইরের রকে বসে আছে। কি হল রে বৃন্দাবন ? কি বলব মাইরি, রাতে খাবারটাবার সব বাড়া হয়েছে, যেই ডাকলুম, মেসোমশাই খাবেন আসুন, এতদিনের বাবা মাইরি জুতো হাতে তেড়ে এলেন। শরীরের অবস্থা দেখ, মেসোতে আর মাসীতে মিলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিয়েছে রে ! সব কেড়ে নিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। বাবা মাইরি সত্যিই মেসো হয়ে গেছে।

বিধুজ্যাঠা এমন ভাবে বসে আছেন, যেন কুচিপুড়ি নৃত্য দেখছেন। প্রোগ্রাম শেষ হলে হাততালি দেবেন। কাচ পরিষ্কার করে নাচের নিরাপদ জমি তৈরি করার জন্যে কনক ঝাঁটা আনছিল। খেয়াল করেনি। সেই বাতের আরসোলা পেটান ঝাঁটা। একটা আধমরা, প্যান্তাখ্যাঁচা মাল কাঠির মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল। মেঝেতে নিচু হয়ে বোলকাটা জোড়া জোড়া পা বাঁচিয়ে যেই এক টান মেরেছে, আরসোলা ক্যাতরাতে ক্যাতরাতে হাত বেয়ে একেবারে সেই মোক্ষম আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল যেখানে বিবাহের আগে কোনও পুরুষের হাতের প্রবেশ নিষেধ। কনক ঝাঁটা ফেলে মেঝেতে কুমড়ো গড়াগড়ি। ওদিকে কুচিপুড়ি, এদিকে হিন্দি সিনেমার ভুঁই নাচ। শেম, শেম্ বলতে ইচ্ছে করছে। বিধুজ্যাঠা ছাড়া সকলেরই অবস্থা মত্ত মৃদঙ্গের মত। খ্যাচাখাঁই খ্যাচাখাঁই করে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেজেই চলেছে। গেট আউট বললেও কেউ যদি গেড়ে বসে থাকে, তা হলে তাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে হয়।

মেসোমশাইয়ের হঠাৎ বোধহয় আদালতের কথা মনে পড়ল, বাজখাঁই গলায় চেঁচাতে লাগলেন, পুলিস, পুলিস। ওদিকে সাহসী মুকু বক্ষলগ্ন আরসোলা সমেত কনককে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে, সেদিক থেকে নানা রকমের কাতর চিৎকার ভেসে আসছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমার ভীষণ সাহস। আরসোলা-ফারসোলায় আর কোনও ভয় নেই। হাত ঢুকিয়ে খপাত করে ধরেই ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দোব। অসাধারণ বীরত্ব। সেভিয়ার অফ ম্যানকাইণ্ড, উত্তম্যানকাইণ্ড। আহা, মানিক আমার। একটা উটকো লোক এসে পিতাকে অপমান করছে, সন্তান হয়ে গায়ে লাগছে না, রুখে দাঁড়াবার সাহস হচ্ছে না, মজা দেখছ, এরই মধ্যে আবার আরসোলা উদ্ধারের শখ। এই শোন্, রোজই ত কথামৃত পড়িস, তা হলে মন অত চুলবুল করছে কেন রে! 'সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক, থুথু ফেলে থুথু খাওয়া। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না।' আরে সে ত পড়েছি। আরসোলা ঢুকেছে যে'

বিধুজ্যাঠা পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে বললেন, সামান্য কটা টাকার জন্যে এত নাচানাচি, ভাঙাভাঙি!

ষোলকলা পূর্ণ হল। দরজার সামনে মাতামহ। কয়েকদিন অদর্শনের পর আজ উপস্থিত। বুকের কাছে দু হাতে ধরা একটি বিশাল ঠোঙা। কাগজ ফুঁড়ে তেল ফুটে উঠেছে। তার মানে রসদ সহ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন। মুড়ি আর তেলেভাজা। পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ চালাবার ইচ্ছে ছিল। ঘরের লণ্ডভণ্ড বকাণ্ড অবস্থা দেখে বললেন, কি ব্যাপার! বেড়াল ঢুকেছে নাকি? বেড়ালও চোর, তবে তার জন্যে আবার পুলিস কেন?

আজ্ঞে বেড়াল নয়, বিধুজ্যাঠা।

মাতামহ টর্পেডোর মত সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, তারপর দু পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আরে, আরে এটা যে দেখছি সেই সিন্ধুঘোটক জুট মার্চেন্টটা। আঁটকুড়োর ব্যাটা? তুই এখানে সাতসকালে কি করছিস? ফুটবল খেলছিস। ব্যাটার মুখ দেখলেও অযাত্রা।

ক্রোধে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলেও পিতার শালীনতা জ্ঞান নষ্ট হয়নি। মাতামহকে বললেন, এ আপনি কি বলছেন? আঁটকুড়োর ব্যাটা? আরও অনেক ভাল ভাল গালাগাল আছে, যেমন পিগ, রাসকেল, সান অফ এ বীচ, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার। সে সব ছেড়ে আপনি চলে গেলেন বস্তির ল্যাঙ্গোয়েজে। ওই আপনার দোষ। মুখের ফিলটার নষ্ট হয়ে গেছে।

মাতামহ একগুঁয়ে ছাত্রর মত বললেন, যা বলেছি, বেশ বলেছি। তুমি ওকে কতটা চেন হরিশঙ্কর? ও একটা চিট। দ্যাটস রাইট। হি ইজ এ চিট।

শুধু তাই নয়, ওই আগেরটাও। তুমি ওর জন্মবৃত্তান্ত জান? ওর মা ছিল নন্দলালের রক্ষিতা। সমাজের যে শাসন নেই, তাই আজ সিল্ক চড়িয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরছে। চুলে আবার পমেটম। তুই কোন্ সাহসে আমাদের সামনে চেয়ারে পা তুলে বসে আছিস? ওঠ। উঠে দাঁড়া। কান ধরে উঠে দাঁড়া।

মাতামহকে দেখে বিধুবাবু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন যেন জোঁকের মুখে নুনের ছিটে পড়ল।

বাধ্য ছেলের মত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সামান্য কটা টাকার জন্যে তা হলে কোর্ট কাছারিই করতে হচ্ছে !

আবাব টাকা ! কিসের টাকা ? কার টাকা ?

পিতা তেড়ে আসতে চাইছেন। হাতের মুঠো আবার পাকিয়ে উঠেছে। আমরা আবার কোরাস ধরেছি, বাবা কাচ, মেসোমশাই কাচ।

Dark idolatry of self

টাকার কথা আসছে কেন হরিশঙ্কব ? তুমি কি এই দালালটার কাছে টাকা ধার করেছিলে ?

মাতামহ ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। রঙ্গমঞ্চে আপাতত চরিত্ররা স্থির। চেয়ার পা উলটে পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অশ্বের মত। থানইটের মত কিছু কেতাব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। উত্তেজনায় মেসোমশাইয়ের ভুঁড়ি ইঞ্চিখানেক চুপসে যাওয়ায় কাপড়ের কষি আলগা হয়ে গেছে। টাইট কবে বাঁধার চেষ্টা করছেন। কনক আব একটা ঝাড়ু এনে উবু হয়ে বসে কাচের কোয়া ঠেলে ঠেলে এক জায়গায় জড় করছে। পিঠের দিকে খোলা অংশে শাড়িব আঁচল লাগলে আরসোলা ভেবে চমকে চমকে উঠছে। মুকু চেষ্টা কবছে বইয়েব র‍্যাকটাকে সোজা কবার। বিধুজ্যাঠা শাসিয়েটাসিয়ে, কোর্টকাছাবির ভয় দেখিয়ে পালিয়েছেন। মাতামহ বুকের কাছে ঠোঙাটি তখনও ধরে আছেন। অনেকক্ষণ লোভ সামলেছেন। আর পারলেন না। বেশ বড সাইজের একটি বেগুনি বের করে সযত্নে দাঁতে কাটলেন। মুচুড় করে শব্দ হল।

মুকু ভূপাতিত চেয়াবটিকে খাড়া করেছে। পিতা সাবধানে পেছনে সবে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। এতক্ষণ সব বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। আবার হিসেবজ্ঞান ফিরে আসছে। মাতামহ বিধুবাবুর বসে যাওয়া চেয়াবে বসলেন না। অপবিত্র হয়ে গেছে। পাশের আব একটা চেযারে বসলেন। মুখে বেগুনি, মাকালীর লাল জিভের মত সামনে লকলক করছে।

মেসোমশাই কোমরের কষি কোনও মতে বাগে আনতে পেরেছেন। আর একটা চেয়ারে বসে তাঁরও ওই একই প্রশ্ন, কি টাকা টাকা করছিল ওই স্কাউনড্রেলটা !

মাতামহ বেশ সন্দেহেব চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকালেন। চোখ ঘুরে গেল কনক আর মুকুর ওপর দিয়েও। এরা আবার কারা ? সংসারটা বেশ শ্মশানের মত হয়ে ছিল ! হঠাৎ শ্মশান জাগাতে এ কাদের আগমন ? প্রশ্ন করলেন, আপনাকে ত ঠিক চিনলুম না ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেব পবিচয় দিলেন, আমি হরিশঙ্করের শ্বশুরমশাই।

কি ট্রেনিং ! মুকু আর কনক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে গড়াগগড় তিনজনকে প্রণাম করে ঘরের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নৃত্যের একটা ছন্দ চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। মেসোমশাই বললেন, আমার মেয়ে।

মাতামহ একটা হাত বুকের কাছে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে সাপের ফণার মত তুলে ধরে বললেন, সে ত বুঝলুম, কিন্তু আমিটা কে ?

পিতা বললেন, এঁকে আপনি আগে হয়ত দেখেন নি, মেজদার ভায়রাভাই। পণ্ডিত মানুষ। ডাকসাইটে উকিল।

মাতামহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কি, চলবে ? বেগুনি, আলুর চপ, আলুর বড়া বা ফুলুরি ?

আজ্ঞে, সবই ত সু-স্বাদু, মুখরোচক। তবে আমি যে আবার অম্বলের রুগী !

মাতামহ হা হা করে হেসে বললেন, পুরুষমানুষের অম্বল ? হরিশঙ্কর, শুনেছ ? পুরুষমানুষের অম্বল ! ওত মেয়েদের অসুখ গো ! অম্বল, মাথাধরা, গেঁটে বাত, বাধক। গরম তেলেভাজা না খেলে তোমাব ও ব্যামো সারবে না বাপু ! সুখদা, মোক্ষদা মা আমার দিকে এস ত !

কনক আর মুকু এগিয়ে গেল। যাক, দু'জনের আর একজোড়া নতুন নাম হল। মাতামহ ঠোঙাটা কনকের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, বাঃ, বেশ মেয়েটি ত ? একেবারে দুর্গাপ্রতিমা ! নাতিটার বিয়ে দিয়ে দিলে হয়। এই ভস্মলোচনের সংসারে একটি অন্নপূর্ণার বড় প্রয়োজন। মাতা পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবা শিবভক্তাচ স্বদেশোভূবনত্রযম।

ঠোঙাটা বুকের কাছে ধরে, মাথাটাকে তার ওপর গুঁজে, মুকুর পা মাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা মেরে অন্নপূর্ণা ঘর ছেড়ে পালালেন। এই লাজুক লাজুক প্রস্তাবে বাচ্চা মহাদেবটিকেও কামরাঙার মত মুখ করে, দেয়ালে পিঠ ঘষে ঘষে গুটিগুটি সরে পড়তে হল।

রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই কনক বললে, যাও ! তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

আমার ত আবার সবেতেই পাকামো ! এই আহ্লাদে আটখানা, এই আবার বিষাদে ফুটিফাটা। এখন ভেতরটা নেত্য করছে।

কনক বসে বসে ঠোঙা থেকে তেলেভাজা বের করছে। চট করে আঁচলটা মাথায় তুলে দিলুম। মন ধমকে উঠেছিল, কি গ্রাম্য রসিকতা ! হৃদয় শোনেনি, হাত বশে থাকেনি।

আর মা অন্নপূর্ণা ! তিনি কপাত করে আমার হাত চেপে ধরে কটাস করে আঙুল কামড়ে দিলেন মোস্ট আন-অন্নপূর্ণাসুলভ কর্ম। দৃশ্যটি মুকু দেখে ফেললেন এবং মৃদু হেসে বুঝিয়ে দিলেন, বেশ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে, কোনও মেয়ে যদি কটাস করে আঙুলের মাথা কামড়ে দেয় তা হলে তার কি অর্থ ! সুখেন ? না সুখেন নয়। আরও পবিত্র কেউ। যে এর ভেতরের রোমান্সটা চটকে বের করে দিয়ে বিশ্রী একটা দেহের স্বাদ ঢুকিয়ে দেবে না। মায়া ? না, মায়াও নয়। তা হলে মাতামহকেই জিজ্ঞেস করব। প্রাণের কথা বলার মত এমন প্রাণ আর কোথায় পাব !

মাছ আনা মাথায় উঠেছে। বসার ঘরে তিন সংসারী আলোচনায় বসেছেন। ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি কদর্য। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা। একদিকে যেমন ভাল, আর একদিকে তেমনি খারাপ।

কি বলছে ব্যাটা ? তোমার মেজদা টাকা ধার নিয়েছিল ? মাতামহ আলুর চপ খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন।

কোনও ডকুমেন্ট আছে ? মেসোমশাইয়ের প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন।

ওর আস্তিনে কি আছে ওই জানে। মাঝেমাঝে কেবল তড়পে যাচ্ছে। আমার পরামর্শ ছাড়া মেজদা জীবনে কোনও কাজ করেনি। সে এই লোফারটার কাছে টাকা ধার করতে যাবে, আমি বিশ্বাস করি না। অসম্ভব। ইমপসিবল। আর টাকা তাকে ধার করতে হবে কেন ? তার কোনও অভাব ছিল ? সে ত ধার দিয়েই ফতুর। ওই রাসকেল আমাকে বলে গেল, মেজদার মেরে আমি বড়লোক ! ছি ছি কানে যেন গরম সীসে ঢেলে দিয়ে গেল। মেজদা যা রেখে গেছে, আমি কাকে দোব ? দোবটা কাকে ? কেউ ত নেই। মেজদার বংশই ত লোপাট হয়ে গেছে। আমি কি পার্সেল তার ওপরে পাঠাব !

মাতামহ বললেন, মেজকর্তা একটু খরচে ছিল। দানধ্যানও ছিল প্রচুর। তুমি সে তুলনায় বেশ হিসেবী।

এই রে, মরেছে রে ! আমার মাতামহের এই এক যা দোষ ! মনে যা এল, দুম করে বলে ফেললেন। মা ব্রুয়াত সত্যমপ্রিয়ম। কে কার কথা শোনে ! এইজন্যে যে অপ্রিয় হতে হয়, তা বোঝেন না। পিতা কঠিন মুখে তাকালেন, সংসারী মানুষকে একটু হিসেবীই হতে হয়। দিয়তাম, ভুজ্যতাম করলে আপনার ছেলেটির মত অবস্থা হবে। আয় একশো, ব্যয় হাজার, পাঁচজনের কাছে হাত পেতে বেড়াও। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। ব্যাটা যেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। রোজ মোগলাই খানা চাই। কানে আতর চাই। একপা হাঁটার ক্ষমতা নেই, গাড়ি চাই, সেবাদাসী চাই। বউ-এর কি তোয়াজ। ব্যাটা যেন বিল্বমঙ্গল ! পরশুদিন একটা শাড়ি এল, দাম শুনলে চক্ষু চড়কগাছ, দুশো টাকা !

বেহিসেবী হওয়া যেমন ভাল নয়, আবার আপনার মত ওয়ানপাইস ফাদারমাদার হওয়াটাও ঠিক

নয়।

আরে দূর, আমার পাইসই নেই তো ফাদারমাদার। তোমার যেমন কথা।

মেসোমশাই উসখুস করছিলেন। আলোচনা লাইন চেঞ্জ করে অজ্ঞাত দিকে চলেছে। পারিবারিক গোপনীয়তা বেরিয়ে আসছে। খক করে একবার কেশে চূড়ান্ত রায় দিলেন, হোয়েন দেয়ার ইজ নো ডকুমেণ্ট, দেয়ার ইজ নো ক্লেম। যিনি ধার নিয়েছেন তিনি আর জীবিত নেই। একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিন।

মাতামহ মহাউল্লাসে বললেন, এই ত আইন আমাদের পাশে, আমাদের কাত করে যাবে এক ব্যাটা দালাল! ঠুকে দাও, ঠুকে দাও। আমার জামাইকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব।

কত টাকা দাবি করছে? মেসোমশাই আর একটু গভীরে যেতে চাইলেন।

পাঁচ হাজার। বলছে ক্ষেপে ক্ষেপে দিয়েছে। মেজদা মুদিখানায় কিছু ধার রেখে গিয়েছিল, হাজার খানেকের মত। ভয়ে আমাকে বলেনি। সাধুখাঁ খাতা দেখাতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি, অফকোর্স উইথ এ প্রেয়ার, মেজদা এবার তুমি যেখানেই জন্মাও, লম্বা হাত খাটো করার মত এমন ভাই তোমার পাশে থাকবে না। তুমি সেই স্বভাব নিয়ে এস, যে স্বভাব-বলে, কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ।

মাতামহ বললেন, মুদিখানার হাজার তুমি না দিলেও পারতে। ওরা তিন টাকাকে তিরিশ টাকা করে রাখে। ওসব হল বানান খাতা।

তা বললে কি চলে? ও আপনি পারেন, আমি পারি না, আমার শাস্ত্র আলাদা। আর একটা ধার ছিল, অতি সামান্য। জানতেও পারতুম না, যদি না মেজদা স্বপ্নে এসে বলে যেতেন।

কি রকম? কি রকম? মাতামহ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পরকালের গন্ধ পেয়েছেন।

ভোর রাতে মেজদা এলেন। নিশ্চয়ই ট্রেন লেট ছিল। আমি এতকাল রেলকম্পানির মালবাবু ছিলুম। লেট না থাকলে কোনও ট্রেন শেষরাতে হাওড়ায় ইন করে না।

আপনি ছিলেন মালবাবু, কথা বলছেন জলপাইবাবুর মত।

অর্থ?

সুকুমার রায়। জল পাই আর জলপাই এক করে পাগল করে মেরেছিল। হচ্ছে স্বপ্নের কথা চলে গেলেন অন্য লাইনে, রেললাইনে।

বয়েসে হরিশঙ্কর। বয়েস। বয়েসে বাতুল। তুমি বল, বল। লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি। ব্লটিং পেপারে একটু চিটে গুড় পেলে জিভে সেঁটে ধরতুম।

কাশীর চিনি মিলতে পারে। চিটে গুড় পাবেন গুলিখোরদের আখড়ায়।

কনক চা নিয়ে এল না, এল মুকু। লজ্জা হয়েছে। বিয়ের কথায় মেয়েরা কেমন যেন মেদুর হয়ে যায়। আরে বোকা, ও ত মাতামহর ঠাট্টা। বৃদ্ধদের ওই ত রীতি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই একেবারে ফুলশয্যার ছবি আঁকা। লাল মেঝে। বাঘথাবা খাট। নীল কামুক মশারি। ফলাও সাদা চাদর। বিলাসী বালিশ। রজনীগন্ধার ছড়ি। যুঁইয়ের মালা বাজু বেয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে মাতোয়ালা। ইন্দ্রিয়ে সুবাসের সুড়সুড়ি। ফরাসডাঙ্গার ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে প্যাঙা বসে আছে গাঁটি হয়ে। বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি বেড়ে ছেচল্লিশ ইঞ্চি একটি প্রেমের তাকিয়াকে ধরবে বলে। আর পাকা মেয়েরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাঁচা অর্ঘ্যটিকে ভেতর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যাও না যাও, ওই যে বসে আছেন ঠুটো জগন্নাথ, জগন্নাথ স্বামী রসানন্দো রাধাসরসবপু-রালিঙ্গনসুখো। বৃদ্ধের চোখে হারিয়ে যাওয়া সেই অতীত রাতের ছবি। পাকা পেয়ারার মত দিদিমার বদলে ঘরে একটা কাঠের সিন্দুক। কতদিন দেখেছি, মাতামহ সিন্দুকের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন, হ্যাঁগা, শেষপারানির কড়িটি তুমি রেখেছ ত!

যাক, চা এসে গেছে বলে মাতামহ চায়ে একটা চওড়া চুমুক চালিয়ে বাপস্ বলে কাপ নামিয়ে রাখলেন। ঝালের জিভে গরম চা উত্তপ্ত শাবলের মত ঢুকেছে। ভয়াবহ মুখে ফেলে আসা আলোচনার টুকরো তুলে নিলেন, শেষরাতে মেজকত্তা এলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ ' তিনি এলেন উত্তরের দরজা দিয়ে।

হ্যাঁ, ওই দিকেই যে হিমালয় !

নো কমেন্টস। এটা জিওগ্রাফির ক্লাস নয়। দিস ইজ প্যারাসাইকোলজি।

বাবা, কতরকমের প্যারা আছে গো ! প্যারাটাইফয়েড, প্যারাচুট, প্যারালিসিস, প্যারাগ্রাফ, প্যারামর্শ।

প্যারামর্শটা কি ?

পরামর্শকে একটু বাঁকা পথে চালালেই প্যারামর্শ। উকিলরা যা দেয় তা হল প্যারামর্শ। ওই প্যারামর্শর ঠেলাতেই সারাজীবন কোর্টের খোঁটায় কলুর বলদের মত ঘুরেই চলেছি, মামলার তেলে আমার উকিল বঙ্কুবিহারী দিন দিন চকচকে হচ্ছে। মাগের গতর দেখলে সুন্দরবনের কেঁদোর জিভে জল আসবে।

মাগ ছাড়া অন্য শব্দ মাথায় এল না ?

আহা, ওই যার চেহারা তাকে আমি কেমন করে রমণী বলি ? একটা মানানসই শব্দ বলতে হবে ত ? তুমি সবেতেই যদি চটে যাও তাহলে ত বোবা হয়েই থাকতে হয়। তাহলে তুমি রামকৃষ্ণের ওপর রাগ, রামপ্রসাদের ওপর রাগ। আমি ত তাও মাগী বলিনি ' রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ সেই ভাবাবেশে। মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কত কষে।

আপনি অফ্‌ল।

নিশ্চয়ই কোনও বিলিতি ফুল। কুন্দ, কমল, বকুল, বেল, যুঁই, জবা, ঘেঁটুর দলে নয়। বুঝেছি খুব বিরক্ত হচ্ছ। কি করি বল, সারাদিন কথা বলার লোক পাই না। ছেলে ওলডফুল বলে মুখ বেঁকিয়ে সরে পড়ে। দেখেশুনে পুত্রবধূ নিয়ে এলুম। ছেলে সরে পড়ল ফুসলে নিয়ে। বড়লোকের মেয়ে, ছেলে শ্বশুরের সেরেস্তায় বন্ধক পড়ে গেল। বউ বললে, ওঠ ত ওঠ বোস ত বোস। সঙ্গী আমার কেউ নেই হরিশঙ্কর। দেয়াল, বেটীর ছবি দোরগোড়ার নারকোল গাছ, গোটাকতক কাক, আর আমার এই সুদের সুদ নাতি। মেরে তাড়ারে তাড়াও। তোমারই রকে গিয়ে বসব। লোকে বলবে জামাই শ্বশুরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। জান, গত তিনদিন আমার পেটে দানাপানি পড়েনি। কেউ একবার জিজ্ঞেস করেনি, বুড়ো তুমি কিছু খেয়েছ ? দোতলায় মোগলাই, একতলায় হরিমটর। মাতামহ চোখ রগড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে উহুঁ করে হাত সরালেন, বাপস্ জ্বলে গেল, আঙুলে আলুর চপের লঙ্কা লেগেছিল।

পিতার প্রশ্ন, দানাপানি জোটেনি কেন ?

আর বল কেন ? সে আর এক দুঃখের কথা। এখন সই করতে গেলে হাত কাঁপে। যতবার টাকা তোলার ফর্মে সই করি, পোস্টমাস্টার বলে সই মিলছে না। সাক্ষী ধরে আনুন। শেষে জিজ্ঞেস করলুম, মশাই আমি তাহলে কোন শালা ? সইয়ের আমি, না আমার সই !

আজ থেকে আপনি আমার এখানে খাবেন। যদ্দিন আমি বেঁচে থাকব। তবে একটা অনুরোধ, যতদূর সম্ভব হুগলী জেলার ওই গ্রাম্য শব্দগুলো ব্যবহার না করার চেষ্টা করবেন। শুনলেই আমার পিত্তি চটে যায়। মনে থাকবে ?

মাতামহ বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়লেন। গালে জলের রেখা। দুঃখ আর লঙ্কা নিঙড়ে বের করেছে।

মেসোমশাই বললেন, আমারও একটা প্রতিবাদ আছে। উনি একটু আগে উকিলদেরও একহাত নিয়েছেন। বলেছেন আমার মক্কেলকে যা দি তা হল প্যারামর্শ। মক্কেল মেরে, তেল বের করে আমাদের চেকনাই ! হাইলি অবজেকসানেবল।

মাতামহ জলভরা চোখে হেসে উঠলেন। কানন দেবীও এমনটি পারবেন না। অনেকটা রোদ আর বৃষ্টির মত। হাসতে হাসতে বললেন, তোমাকে বলিনি গো। তুমি ত আমাদের ঘরের উকিল। ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর। অনেকদিন আগে বিভক্তির শ্লোক মুখস্ত করেছিলুম, প্র,পরা, অপ, সম, নি, অভি,

দুর, বি। হরিশঙ্করের প্যারার সঙ্গে মেলাতে গিয়েই কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ। ও কিছু না। তোমাকে আমি কিছু বলিনি।

মুবগী বলাটা মনে হয় উপযুক্ত হল না, যতই হোক হিন্দুর ছেলে!

পিতার মুখ দেখে মনে হল ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। কথার জালে ক্রমশই এমন জড়িয়ে পড়ছেন কি ভাবে যে কেটে বেরিয়ে আসবেন ভগবানই জানেন। আঙুল তুলে মাতামহকে বললেন, আপনি অনেকটা গেঞ্জিব মত। কোণা ধবে টান দিলেই হল, ফডফড. ফড়ফড় খুলেই চলেছেন। ওব জন্যে আমি যেমন এক 'নব-সারমন-অন-দি মাউন্ট' তৈবি করছি, আপনার জনাও সেইরকম একটা তৈরি কবতে হবে।

ওই একটাতেই হবে হবিশঙ্কর। আবার নতুন কবে খাটবে কেন?

খাটাতেই হবে। দু'জনের দু'বকম নেচাব। আপনাব জন্যে পয়লা উপদেশ হবে, কম কথা বেশি আহাব। খাবাব না দেখলে ঠোঁট ফাঁক হবে না।

আঃ, চমৎকাব চমৎকাব! তুমি আমাদেব হিন্দু যীশু, তোমাকে শিশুব মত কোলে তুলে আমাব ধেই ধেই কবে নাচতে ইচ্ছে কবছে। প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌবহরি, হবিবোল। হবি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায নমঃ। যাদবায মাধবায কেশবায় নমঃ। মাতামহ মাথা নেড়ে নেড়ে সুর করে গাইতে লাগলেন। পিতা তড়াক কবে চেযাব ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাবসলিউটলি ব্যাড টেস্ট। নাম নিয়ে ব্যঙ্গ।

গান থেমে গেল। সবল মুখে মাতামহ বললেন, কেন, শাক্ত কি মাঝেমাঝে বৈষ্ণব হতে পারে না?

কেন পাববে না? সব ধর্মেবই শেষে মৃত্যু। তাবলে আপনি আমাব নাম নিয়ে সুব করে কবে হবি হবায নমঃ, হবি হবয়ে নমঃ কববেন? অত্যন্ত কুরুচিব পবিচয।

আবে এ হবি সে হবি নয। ইনি সেই লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্ববধবং হবিম্। তুমি ত শুধু হবি নও, হবি আব শঙ্কব একসঙ্গে পাটিসাপটা হয়ে বসে আছ। বেগে আছ ত, তাই বুদ্ধিবৈকল্য হয়েছে। না বাবা, তোমাব সামনে আব বসব না। কি বলতে কি বলে ফেলব!

মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। কোলেব ওপব থেকে গোটাকতক মুড়ি মেঝেতে ছিটকে পড়ল। ভয়ে ভয়ে মুড়ির দানা কটা মেঝে থেকে নিচু হয়ে তুলতে তুলতে বললেন, তোমাব কোনও কথাই শোনা হল না।

আপনিই ত সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

আচ্ছ বেশ, আমি যদি এখন একটাও কথা না বলে চুপ করে লক্ষ্মীছেলেব মত বসি!

চেষ্টা করে দেখুন।

মাতামহ চেযাবে বসে মেঝে থেকে কুড়নো মুড়িব একটা দানা মুখে পুরলেন। কার সামনে কি কাজ: পিতাব নজব সর্বত্র, আবে ছিঃ ছিঃ। আপনি ওই মেঝেব মুড়ি দাঁতে কাটছেন, ছি ছি ছিঃ। দেশে এতবড দুর্ভিক্ষ চলেছে জানতুম না ত! ক'দিন না খেযে আছেন?

মেঝেটা ত বেশ পবিষ্কাব হবিশঙ্কব।

আরে একটু আগেই ওখানে বিধু নেচে গেছে। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আপনাকে দেখছি এবাব কোমরে ঘুনসি বেঁধে, দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে, দামড়া গোপালের মত। দ্বিতীয় শৈশব শুরু হয়ে গেছে।

একদিন তোমারও হবে। না, না, হবে না, হবে না। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

স্তম্ভিত ঘরে মাতামহ মুখ ধুয়ে ফিবে এলেন। চেয়ারে বসলেন ধীরে ধীরে, যেন শব্দ না হয়। শুভ্র ব্যাকব্রাশ করা চুলে জল হাত বুলিয়েছেন। ধবধবে সাদা ভুরু জলে ভিজে ভিজে। তপঃক্লিষ্ট মুখ অদ্ভুত প্রসন্ন। কোঁচার খোঁটে মুখ মুছতে মুছতে বহু দূর থেকে বললেন, নাও শুরু কর।

কথা বলার ধরনে বেশ বোঝা যায়, দেহ-ঘরে মন উড়ে চলে গেছে বহু দূরে। আমাদের ছাতে বহুকাল ধরে এক একখণ্ড কাঠ পড়ে আছে। জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে শুকোয়, হিম খায়,

নতুন জীবন শুরু করতে। বিবাহিত জীবন মোমবাতির মত গলে গলে নিবে গেছে। চার বছরেই সব শেষ। মানুষ কি জীব দেখুন। লালসার জিভ লকলক করে বেরিয়ে এলেই হল।'চেক-ভাল্‌ভ' বলে কিছু নেই। এরাই আবার গর্ব করে বলে, অমৃতস্য পুত্রা।

মাতামহর প্রতিবাদ, একটা মানুষ দেখে সব মানুষকে গালাগাল দিও না। গরলের পুত্র একটা দু'টো, অমৃতের পুত্রই বেশি। তা ছাড়া তুমি ত বললে, লোকটা অসুস্থ! কি যেন অসুখ বললে? ও রোগের নাম বাপের জন্মে শুনি নি।

না শোনাই ভাল? কিছু অসুখ আছে যার ওষুধ হল লাঠি। লাঠ্যৌষধি। ব্রায়োনিয়া নয়, অ্যাকোনাইট নয়, পটপটি নয়। লালসার দাওয়াই হল শাশুড়ী-ছ্যাঁকা। জিভটি টেনে বের কর, আর খুন্তিকে লাল করে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা।

তুমি আমাকে বলছ না ত হরিশঙ্কব? পান্তুয়া দেখলে যে আমার নোলা সকসক করে ওঠে।

এ নোলা, সে নোলা নয়। এ হল নোলকের নোলা। প্রসট্রেট থেকে বেরিয়ে এসে কুলকুণ্ডলিনীতে সুড়সুড়ি দেয়। মানুষ তখন সারমেয়ের মত জিভ বার করে হ্যা হ্যা করতে থাকে। অমৃতের পুত্র উদম হয়ে হেঁচকি তোলে। সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নেই। আমার পাখিই ভাল, আমার পাখিই ভাল। সূক্ষ্ম আহার, সূক্ষ্ম বিয়োগ দু'টি ডিম। একটু তা। লাল ঠোঁট বাচ্চা। পালকের বাহার। অনন্ত আকাশ। গান, শুধু গান। দ্বিপদ প্রাণী যখন চতুষ্পদ হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা এত ভালগার হয়ে দাঁড়ায়? আমাদের ভোলা ষাঁড়, অনেক অনেক ডিগনিফায়েড।

মেসোমশাই সামান্য অধৈর্য হয়ে বললেন এখনও কিন্তু উপসংহারে এলেন না।

ও হ্যাঁ। ঠিকই ত। মানুষের ব্যবহারে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। যা বোঝাবার জন্যে এই গল্পের অবতারণা, তা হল, সেই হ্যাটকোটধারী পশুমানবটি কুপেতে আর বসতে পারলেন না, বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেক রাতে বাথরুমে যাবার পথে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে পিতা-পুত্রকে মুখোমুখি দেখলুম। ছেলে বাপকে জিজ্ঞেস করছে, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান ফাদার?

গলায় অভিমান, অভিযোগ। ফাদার ফাম্বল করছে। ইউ হ্যাভ ডান সাম রং। হোয়াই, হোয়াই? হোয়াই? হোয়াই? গলা ভেঙে এসেছে কান্নায়। আমি চাই না, আমি চাই না, আমার পুত্র, জীবিত আমি মৃত আমির সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগের আঙুল তুলে বলে, কেন, কেন, তুমি এমন কাজ করতে গেলে? আমার চরিত্রের অর্কিড হাউসে ও ঝুলতে থাকবে হিমালয়ের সৌন্দর্য নিয়ে। সেই কারণেই আমি বিধুকে পাঁচ হাজার টাকা দোব।

সে কি? মেসোমশাই, মাতামহ, দুজনেই আবার চিৎকার করে উঠলেন। এ যেন সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা বলে চিৎকার করে ওঠা।

সেকি-টেকি নয়, ডিসিসান ইজ ডিসিসান।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তোমারও ওই লাঠ্যৌষধি। বিধুকে তুমি টাকা দিয়ে দেখ?

মেসোমশাই বললেন, এ হল আইনের অবমাননা। লোকটাকে আমি জালিয়াতী কেসে ফেলে যাবজ্জীবন করে ছাড়ব ভেবেছিলুম। আপনি বাদ সাধলেন। কিল খেয়ে কিল হজম করে পুত্রবধূরা। কয়েকদিন পরেই আপনি শ্বশুর হবেন, আপনার এ কি ভীরুতা।

মাতামহ বললেন, ও হবে শ্বশুর? শ্বশুর হলুম আমি! এ জিনিস দ্বিতীয় আর পাবে না। মেয়ে নেই আমার জামাই আছে। আর তার ঘাড়ে বসে লুচি চলছে, মালপো চলছে। দু'বার তীর্থ ভ্রমণও হয়ে গেছে।

মেসোমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, বাথরুমে বসে ঠাণ্ডা মাথায় আর একবার চিন্তা করুন হরিদা।

চিন্তা? পিতা হাসলেন। পাঁচ হাজার টাকা আমাকে বেঁধে ফেলার আগেই লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারব। মন বড় দুর্বল। আমি ক্যাশ বাক্স খুলব, এখুনি টাকা বের করব, এখুনি দিয়ে আসব। কে জানে? মন বড় দুর্বল। মন বড় অপলকা। পিতা ক্যাশ বাক্সর দিকে এগোতে লাগলেন।

তা না হলে রক্ষক ভক্ষক হয়ে যায় ?

তার মানে ? পইতেব চাবিটি হাতে ধবে পিতা ঘাড ঘুরিযে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বললেন, ওই যে আমাব ট্রেনের বন্ধু !

নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম

দিন যেন ঝলসে যাচ্ছে। চনমনে রোদ। চারপাশ ঝনঝন করছে। সামনে গঙ্গা। জোয়ারে ভাবভরন্ত। সারা শবীবে ঢেউয়ের কুচুবমুচুব। একটু আগে একটা স্টিমাব চলে গেছে। তলপেটে চাকা ঘোরাতে ঘোবাতে। বড ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে ঘাট পর্যন্ত চলে এসেছে। পৈঠেতে জলেব ধাক্কা লেগে লপাৎ লপাৎ শব্দ হচ্ছে। শ্মশানের কাঠকযলা তালে তালে নাচছে—এই ছিল এই নেই সুরে। নৌকো ভেডার বাঁশেব সাঁকো তলিযে গেছে জলেব তলায়। নৌকো বাঁধাব খোঁটাটি শুধু জেগে আছে দূরে। একপাশে পতিত মাঝিব বৃদ্ধ নৌকো দুলে দুলে উঠছে। ঝুলোনেব মেলায় সেই প্রৌঢা নর্তকীব কোমর দুলিয়ে নাচার মত। যে নাচ দেখতে গিয়ে তাবুব ভেতবেই শশাঙ্ককাকাব কানমলা খেয়েছিলুম। বাইরের পোস্টাবে মাকডসা কন্যার জাল বোনাব কথা সাডম্বরে লেখা ছিল। ভেতবে যে ঘাঘবা নাচের আয়োজন কেমন করে জানব। সুখেন হযত জানত। তা না হলে ঢুকবে কেন ? কন্যাটন্যার মর্ম সেই বয়েসে সুখেনের চেয়ে ভাল কে আর জানত ! প্রথমে প্যাণ্ট পরা চোযাডে মার্কা একটা লোক কাঠের পাটাতনেব ওপর দাঁডিযে খুব খানিক অসভ্যতা করে, সিক সিক দু'বার সিটি মারতেই ততোধিক অসভ্য সেই মহিলা পেছনেব ছেঁডা চটেব পর্দা ঠেলে বেবিয়ে এল। মুখে খডি, ঠোঁট লাল। বুক দুটো ঠেলে বেবিয়ে আছে। সুখেনেব মত অ্যানাটমিই বা কে জানে ? ফিস ফিস কবে বললে ফলস্। শুরু হল অশালীন ক্রিয়াকলাপ। ভদ্ররুচির কোনও মানুষেব সে সব দেখা উচিত নয়। উঠে পালাবার উপায় নেই। সুখেন চেপে ধবে রেখেছে। আমাদেব পাশে লুঙ্গি পবা সব লোক বসেছে। মদের গন্ধ, রসুনের গন্ধ, তেলের গন্ধ, বিডিব গন্ধ। মঞ্চের লোকটা মাঝে মাঝে সেই মহিলাব বিশাল পাছায় পটাস পটাস চাপড মারছে, আর সকলে হায হায় কবে উঠছে। বুকফাটা আর্তনাদ। মানুষের কখন কি যে কেমনভাবে ফেটে যায় ! চিতায় বেলেব মত ফটাস কবে মাথা ফাটে। দুঃখে বুক ফাটে। এ আবার কি ফাটা ! আমাব পাশের লোকটা কনুইয়েব খোঁচা মেবে বলল, মাগীর রস আছে। রসগোল্লার রস হয। এ আবার কি রস বাবা ! কিন্তু শশাঙ্ককাকার মত প্রবীণ মানুষ কি জন্যে ওই রসমঞ্জবীব কাছে গিয়েছিলেন ? জবাব নেই।

এমন মজা, সেই থেকে, কিছু দুললেই, কান সুডসুড কবে ওঠে, আর সেই মেয়েমানুষটির কথা মনে পড়ে। আহা, এ যেন ভক্ত প্রহ্লাদ, ক বললেই, কৃষ্ণেব কথা ভেবে হাপুস। কিছু দূরে ঘাট-মাঝি চট পেতে, ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছেন। গঙ্গাব ধারে সাবা দিন বসে থেকে থেকে, নৌকোর পারাপার দেখে দেখে কেমন যেন দার্শনিকের মত মুখ। বসে আছেন ত বসেই আছেন। ইনি যেন সিদ্ধার্থের সেই ঘাট-মাঝি। হেবম্যান হেসের ওই বইটা কতবার যে পড়েছি। যতই পড় বাবা ! জীবন অনেকটা চুনো মাছের মত। আঁসটে গন্ধ কি সহজে যেতে চায়। ছাঁকা তেলে কড়কডে করে ভাজা না হলে !

পশ্চিমে রোদ ঝুলছে। জল থেকে মাঝে মাঝে হীরের আঙুল বেবিয়ে এসে চোখে খোঁচা মেরে যাচ্ছে। বাঁ পাশে বিশাল একটা বাগান বাড়ির জলটুঙি অতীত গৌরব হারিয়ে, আধভাঙা হয়ে জলের ওপর ঝুঁকে আছে। ছেলেবেলায় ওখানে সুন্দরীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। সময় উড়ছে, টাকা উড়ছে, পাখি উড়ছে। যাহা যায়, তাহা যায়। ডাকলেও আর আসে না। ফাটা রেকর্ড বাজতেই থাকে, শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়।

মাতামহ পাশে বসে আছেন গুম হয়ে। কনকের হাতের রান্না খেয়ে সেই দুপুর থেকে স্তব্ধ হয়ে

আছেন। নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন বুঝি ? খাবাব সময় ছাড়া ঠোঁট ফাঁক কর়বেন না। জল থেকে রোদের ঝিলিক উঠে মুখে লেগেছে। তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি, যদি কিছু কথা বলেন !

ভস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি দেখছিস ? কত দিন হয়ে গেল এই পৃথিবীতে এসেছি। জীবন যেন আর ফুরোতেই চায় না। যে শেষে যায় সে বড় কষ্ট পায়। একে একে হাত ধরে নৌকোয় তুলে দিয়ে, চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাক। দিন যায়, দিন যায়, সে আর আসে না।

কে দাদু ?

মৃত্যু রে বোকা, মৃত্যু।

মৃত্যুর কথা আসছে কেন ? সব বুড়োরই এক রোগ।

ওই জলটুঙিটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

সেই তখন থেকেই ত দেখছি।

ওইটার মতই আমি জীর্ণ আর প্রাচীন। হুহু করে জল বয়ে চলেছে। পোস্তা ভাঙছে। আর ভাঙছে। একদিন ধস কবে ধসে পড়ে যাবে। ওব আর কি কদর আছে বল ? আমার মতই। ভেঙে এসেছে। ভাঙল বলে।

এ তুলনার কোনও মানে হয় না। জড় পদার্থেব সঙ্গে সজীব পদার্থ। বিজ্ঞান মানবে না।

রাখ তোর বিজ্ঞান। জড়ে আব বৃদ্ধের জীবনে বিশেষ তফাৎ নেই রে ! দেহে সে শক্তি নেই, মনে সে জোর নেই, উপার্জনের ক্ষমতা নেই। বেঁচে থাকার অধিকাব কোথায় ? এ পৃথিবী হয় ভোগীর না হয় যোগীর। আমি যে কোনটাই নই।

বাবা আপনাকে বকেন বলে মনে দুঃখু হয়েছে ?

তোমার বাবা ? ও ত মানুষ নয় দেবতা। তুই চিনতে পারিস না ?

না।

তা পারবি কেন। পিতা সূর্যসমং জ্যোতিঃ মাতা সমুদ্রসমং সরঃ। পিতা পৃথিবৈঃ বর্ষীয়ান্ মাতুর্মাত্রা ন বিদ্যতে ॥ বুঝলে কিছু ? ও আমার পাগলা ছেলে। এই কড়া কথা, এই নরম কথা, এই দূর দূর করছে, এই আবার কোলে তুলে নিচ্ছে। ওব নখের যোগ্য হতে পারলে তোমার জীবন তরে যাবে।

একটু একগুঁয়ে।

গোঁ না থাকলে পুরুষকে মানায় না। গণ্ডারের মত গোঁ চাই। একেবারে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে যেতে হবে। পৃথিবী কি তোমার সহজ জায়গা ভেবেছ ? ওর তেজ ত তোমরা কিছুই দেখনি। সে আমরা দেখেছি। সবাই বলত আপনাব জামাই নয় ত আগ্নেয়গিরি। ওর সেই বিয়ের রাতের ঘটনাটা ! একেবারে প্রথম বাতে বেড়াল কাটার মত। এখনও মনে পড়লে একা একা কুঁই কুঁই কবে হাসি।

কি দাদু ?

হ্যাঁ রে শালা, বাপের বিয়ের ঘটনা শোনার খুব শখ। আচ্ছা শুনে রাখ, তোরই হয়ত কাজে লাগবে। বাপকো বেটা হতে হবে ত। তোর বিয়েও ত লাগল বলে !

হ্যাঁ, তাই ত ? ও পথে বাড়াস নে তুই পা।

তুই বাড়াবি কেন রে শালা, আমরাই বাড়িয়ে দেব।

আমি সারা জীবন ব্রহ্মচারী থাকব ভীষ্মের মত।

আমরা বেঁচে থাকতে তুমি ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরবে ভেবেছ ? ষণ্ড আর ভণ্ড এক জিনিস। পাত্রী উজিয়ে এসে ঘরে বসে আছে। একেবারে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। চোখ দুটো দেখেছিস, যেন মা দুর্গা ! হাতের রান্না দেখেছিস ? আমি খাব কি, আমাকেই খেয়ে ফেললে। কাপড়ের কষি কোথায় নেমেছে দেখেছিস ? মেয়েটিকে বড় পছন্দ হয়েছে আমার। মায়ায় বেঁধে ফেলেছে। ছোটটা তেমন নয়। একটু গুমোরে।

এতই যখন পছন্দ তখন করে ফেলুন।

হ্যাঁ রে শালা, তোর মত বয়েসে, আমাদের কালে দশ বিশটা বিয়ে করে ফেলত তেমন তেমন পুরুষ। কি সব দাপট ছিল তাদের। বিয়ের নামে তোর মত এমন কোঁচার খোঁট মুখে পুরে ছাগলের মত চিবোত না। বংশবৃদ্ধি করার সময় কারুর মুখের দিকে তাকাত না। পাশের ঘরে মা তালপাতার চ্যাটাইয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। মাথার কাছে এনামেলের চটা ওঠা বাটিতে সর পড়া বার্লি। ডেওপিঁপড়ে বিড় বিড় করছে। পাশের ঘরে পতিতপাবন মাগ জাপটে পড়ে আছে। মৃত্যু এসে দু' জানলাতেই উঁকি মারলে। ওরে ব্যাটাচ্ছেলে, গর্ভধারিণীকে নিয়ে চল্লুম। এখন তোর বীজ যিনি গর্ভে ধারণ করছেন খাতায় তার নামও লেখা আছে। গর্ভধারিণী হয়ে ওই খাট থেকে চ্যাটাইয়ে একদিন নামতেই হবে, তখন দেখা যাবে। দৃকপাত নেই। সব শালা চার্বাকের ব্যাটা। বললে, অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখম এব পরুষার্থঃ। যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। কি ভয় দেখাও মৃত্যু! বড় বউ, মেজ বউ, সেজ বউ। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, ছেলের পর ছেলে। রোলকল করে বাতে ঘরে তুলতে হয়। মুথো ঘাসের বংশ। শিকড়ে-বাকড়ে জড়িয়ে মুকুজ্যে বংশ কুঁড়োজালি তৈরি করে বসে আছি। টান মারলে মাটিসুদ্ধ উপড়ে চলে আসবে। কি ভয় মরণে। ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ। এক বাপ মরলে আরও একশো বাপ রয়ে গেল। যমরাজ তুমি কত নেবে? ধিনতাকের ব্যাটা তিনতাক্, আমি দিতে থাকি তুই নিতে থাক।

পালের ভারে কাত হয়ে তীব্র বেগে নৌকো ঘাটে এসে ভিড়ল। দু'জন মাঝি লগির ঠেকনা দিয়ে সান বাঁধান সিঁড়িতে নৌকোর মাথা ঠোকা অদ্ভুত কায়দায় বাঁচিয়ে দিল। নিত্য করে করে এমন অভ্যস্ত হয়েছে, টাল খায় না, ফসকায় না, পেটে খোঁচা লেগে ভুঁড়ি ফাঁসে না। নৌকোর মাঝখানে সাইকেল নিয়ে একজন দাঁড়িয়েছিলেন, বাহনের ওপর বাহন। বেশ মজা। তিনি ঠেলেঠুলে আগে নামতে চাইছিলেন। পারলেন না। ছইয়ের ভেতর থেকে ডুরে শাড়ি পরা বেশ পাঠ্‌ঠা চেহারার এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। পানের রসে পুরুপুরু ঠোঁট দুটি বেশ লাল। শরীরের উর্ধ্বভাগে অদ্ভুত এক ঝাঁকুনি দিয়ে কোমরে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে কাচ ভাঙা গলায় বললেন, যাচ্ছেন কোথায়? মাছের ঝুড়ি না নামলে নামবে কি করে? যাঁরা শেষে নামবেন বলে উদাস উদাস মুখে বসেছিলেন, মহিলা তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে টপকাতে টপকাতে গলুইয়ের পাশ দিয়ে টাল খেতে খেতে, মাঝিদের কোমর জাপটাতে জাপটাতে সামনে চলে এলেন। কে একজন বলে উঠলেন, গন্ধ। মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে ফোঁস করে উঠল, তোমার বউয়ের গায়ে কিসের গন্ধ? গোলাপের!

রসিক ছোকরা উত্তর দিল, বউ নেই গো আমার।

ঝুড়িটা মাথায় চাপিয়ে কোমর দুলিয়ে মেয়ে উত্তর দিলে, তাহলে রাতের বেলা লনঠন্ হাতে জেলে পাড়ায় এস, চাঁদা মাছ পাবে।

এনকোর, এনকোর! গরবিনী মাছ নিয়ে, হেলে দুলে, সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠে এল। ওপারের যাত্রীরা এপারে পারানীর কড়ি ফেলে। এপারের যাত্রীরা ওপারে। মহিলাকে কিছুই দিতে হল না। তিরছি নজরিয়াকি বাণ মেরে, ঘাটমাঝিকে কাত করে দিয়ে সরে পড়ল। পৃথিবীতে আদিরসের বড় ছড়াছড়ি। মৎস্যগন্ধা হলেও যৌবনে ডগমগে। আর যায় কোথায়? পৃথিবী ছেড়ে কথা কইবে? ঝুলোনের মেলায় আধবুড়ি, ঘাঘরা পরে, মুখে রঙ মেখে নাচছে। সমঝদার খোঁচা মেরে বলছে, রস আছি। পরেশ মাঝরাতে খেঁটে গামছা পরে ছাদের তালের ওপর নাচছে। জবা মাথার ওপর হাত তুলে চুল আঁচড়াচ্ছে। ফুল গাছের টবের আড়ালে বসে শিকারের চোখ অজগরের নিঃশ্বাসের টানে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে। আগুনে পতঙ্গের আত্মাহুতি। ও থাক। ও যেখানে লেখা আছে সেইখানেই থাক, দুঃখং সর্বং অনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্তয়েৎ, অজং সর্বং অনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি। পাগলা জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখের পৃথিবীতে সকাম হয়ে মরিসনি। সবই অজ। কিছুই নেই। তবে তুই ব্যাটা দামড়া ছাগল আঠাঅলা বটপাতা দেখে ব্যা ব্যা করে ছুটিস কেন? ডুরে শাড়ির ফাঁদ দেখলি। আর খোঁপা মাথায় মাছের ঝুড়িটা দেখতে পেলি না। চিদানন্দ সাগরে মাছ খেলছিল, টোপ ফেলে, বঁড়শি গেঁথে

আঁশ চুবড়িতে লাদাই করেছে। দশ টাকা সেব, দশ টাকা সের।

শেষ যাত্রী নেমে গেল। পাটাতনে লগি রাখার শব্দ হল। শিকলে বাঁধা নোঙর ঝপাং করে জলে পড়ল। মাতামহ বললেন, নে উঠে পড়। কখন ছাড়বে কে জানে?

ঢেউয়ের তালে তালে নৌকো দোল খাচ্ছে। আই অ্যাম হেল্‌পলেস, আই অ্যাম হেল্‌পলেস। পাপীর মাথা নড়ছে। পুণ্যাত্মার মাথা নডছে। জজ সাহেবের মাথা নড়ছে, আসামীর মাথা নডছে। আমার কাঁধে হাতের ভর রেখে মাতামহ উইকেট কিপারের ভঙ্গিতে টাল খেতে খেতে নৌকোয় উঠলেন।

ঘটেব মাথায় কাঁঠালি কলার মত নাতি আব মাতামহ নৌকোব মাঝখানে পাল টাঙাবাব বাঁশের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসেছি। এ সময় এপার থেকে ওপাবে কে আব যাবে! এখন সব ফেরাব সময়। কলকারখানায় ছুটির সময়। মাতামহ জোবে জোরে দু'বাব নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, জলের কেমন মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস? ভেতরটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসছে বাব জন্মে মাঝি হব। মাঝিরা খুব তাড়াতাড়ি ঈশ্বরকে পায। মরে স্বর্গে যায়। তুই কি হবি?

আমি গভীর জলের মাছ হব।

খুব ভাল ইচ্ছে। কারুব বাপেব ক্ষমতা নেই ধবে। মাঝে মাঝে শুধু ঘাই মেরে যাবি। তবে এ জন্মের সংস্কারে আসছে বাব তুই লেঙটি আব চিমটে নিয়ে জন্মাবি। এই পথেব মাঝখানে বসে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না রে, চল গলুইয়ের ওপর গিয়ে বসি।

যদি টাল খেয়ে পড়ে যাই!

ঠিক মামার ধাতটি পেয়েছিস। ভয়েই আধমবা। পুরুষমানুষকে একটু ডাকাবুকো হতে হয। আমাব শরীরে কত জায়গায় কাটার দাগ আছে জানিস? এই দ্যাখ।

সামনে একটা ঠ্যাং ছড়িয়ে দিলেন। গুলি থেকে উরু পর্যন্ত বড ছোট নানা ধবনেব দাগ।

দাদু, আপনি কি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

দূর ব্যাটা। যুদ্ধ কি থেমেছে নাকি? এখনও চলছে। এই দাগটা কিসেব জানিস?

উরুর মাঝখানে বেশ বড মাপের গভীব এক ক্ষত চিহ্ন।

এই দাগটা বেনারসের স্মৃতিচিহ্ন। বিশ্বনাথের গলিতে ষাঁডের লড়াই। ষাঁড়ে ষাঁড়ে নয়। ষাঁড়েতে আর আমাতে। সেই চাঁদবদনীকে বাঁচাতে গিয়ে এই অবস্থা। তুই হলে?

কোন চাঁদবদনী দাদু? আপনাব প্রেমিকা?

জিভের ডগাটা সামনে একটু বের কবে বললেন, তুই চাঁদবদনী বলিসনি। তোর গুরুজন, দিদিমা। সবে বিয়ে হয়েছে। মনেব যমুনায় তখন প্রেমের ঢেউ। রেল কোম্পানির 'পাশে' ভারত-ভ্রমণ হচ্ছে। তখনও ত পুরোনো হয়নি বউ। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনি গোছের অবস্থা। আর তোর কানে কানে বলি, প্রথম যৌবনে সেই মেয়েমানুষটিকে দেখলে তুইও ভিরমি যেতিস। টকটক করছে গায়েব রঙ। তেমনি চেহারা। যেন উড়িষ্যার মন্দিরের খোদাই করা পাথবের মূর্তি।

ছবি দেখেছি দাদু।

ধ্যুস্, ও ছবিতে সে চেহারাই নেই। ঘি আর মালাই খাইয়ে খাইয়ে কুমড়োপটাস করে দিয়েছি। তোকে আর একটা কথা বলে রাখি, সোহাগ ভাল অতি সোহাগ ভাল নয়। আদরের জিনিস তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

তারপর সেই ষাঁড়ের লড়াই?

হ্যাঁ, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই। বিশ্বনাথের গলি, একটা গাভী, দু'টো ষাঁড়।

নিজেকে ষাঁড় বলুন ক্ষতি নেই, দিদিমাকে গাভী বলাটা উচিত হচ্ছে?

তুই ত তার ভুঁড়ি দেখিসনি। দেখলে তুইও তাই বলতিস। আমি আদর করে নাম রেখেছিলুম ভগবতী। ঘর অন্ধকার করে যখন ঘুমোত, দূর থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলে মনে হত, মাঝরাতে গোয়ালে এসেছি। যা যা শালা, নিজের বউকে আমি যা খুশি বলতে পারি। তোর বউকে ত বলিনি!

সকালে বাবা আপনাকে যে সাবমন দিলেন ভুলে গেলেন। এই এত কথা বলছেন ? অভ্যাসটা থেকে যাবে, রাতে বকুনি খাবেন।

রাতে তোর বাপের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনতে যাচ্ছে কে ? নিজের মসনদে গিয়ে একগুলি আফিং খেয়ে বেটীর পায়ের তলায় পেছন উলটে পড়ব।

কনক যখন জিগ্যেস করল, বাতে কি খাবেন ? তখন লম্বা এক ফিরিস্তি ছাডলেন কেন ?

তুই বুঝিস না কেন ? এক বেলা খেতেই আমার লজ্জা করে। জামাই আমার বলেছে বলে দু'বেলাই খেতে হবে ! আমি কি তোর তেমন হ্যাংলা দাদু ?

কনক রাগ করবে।

বাগ করবে কেন ?

বাঃ, রান্না নষ্ট হবে না ?

তাও ত ঠিক। নাত বউকে ত বাগান চলবে না।

কেন বউ বউ কবছেন ? ব্যারিস্টাবের মেয়ে। সকালে ফট করে যখন বললেন মেসোমশাইয়ের মুখটা কিরকম গামলাব মত হয়েছিল, দেখেছিলেন ?

রাখ তোর ব্যারিস্টার। এমন সোনারচাঁদ ছেলে পাবে কোথায় ?

দু'আঙুলে আমাব গাল টিপে দিলেন। নৌকো দুলে উঠল। টকটকে লাল পাড শাড়ি পড়া এক বর্ষীয়ান মহিলা নৌকোয় ডান পা বেখে সঙ্গের ছেলেটিকে বলেছেন, বিষ্ণু, আমাকে ঠেলে তোল। দেখিস যেন দেবে যাসনি।

বিষ্ণু বললে, মা জননী তুমিও একটু চেষ্টা কব।

আমি কি আর চেষ্টা করছি না বাবা, এ ত আর সানবাঁধান পইঠে নয়, নৌকো যে ভব সইতে পারছে না। বিষ্ণু ঠেলছে আব বলছে, হেঁইও মাবি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

মাতামহ উঠে দাঁডালেন। পালেব খোঁটা ধরে টাল সামলে, সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত বাডিয়ে দিলেন, আসুন মা আমার হাত ধরে উঠুন।

শাঁখা পরা, গোল, টকটকে একটা হাত দাদুর হাতে ধরাতে ধরাতে সেই মা বললেন, বিষ্ণু, আর ভাবনা নেই, আমার বড ছেলে এসে গেছে।

কপালে এতখানি গোল সিঁদুবের টিপ পড়ন্ত বেলার সূর্যের মত টকটক কবছে। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। এক এক আঙুলে ঝিলিক মারছে এক এক বকম পাথরের আঙটি। দিদিমা বেঁচে থাকলে মনে হয় এইবকমই দেখতে হতেন ! চোখ দু'টো ভারি অদ্ভুত। নীলাব মত। যার দিকেই তাকাচ্ছেন দৃষ্টি যেন তাকে ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে। সামলে সুমলে বসতে হয়। অস্বস্তি হয়। মনে হয় উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি।

মহিলা পালেব খোঁটা ধবে দাঁড়াতেই মাতামহ হাঁসের মত পেছন উলটে পায়েব কাছে প্রণামে নামলেন। গাঙের জল ছলকে উঠল, মা, মা, জগদম্বে, সর্বমঙ্গলা, মঙ্গল্যে, মা, মা।

ওরে পা ছাড়, ওঠ, পাগল, ওঠ, নৌকো দুলছে, পড়ে যাব বাবা। এইখানটাতেই বসি। ছইয়ের ভিতরে গিয়ে কাজ নেই্। বিষ্ণু বললে, পড়ন্ত বেলার রোদ লাগবে গো।

ওরে মুখপোড়া, বেলা যার পড়ে এসেছে তাকে একটু দিনের আলোয় থাকতে দে। ঘরে ঘরে আলো দেখে লাগে ভালো, মোর হৃদিগেহ অন্ধকারে কালো। হ্যাঁগো বড় ছেলে, তোমার গান আসে ?

কথা বলতে বলতে মহিলা আসন পিঁড়ি করে নৌকোর মাঝখানে বসলেন। আহা ! একেই বলে মায়ের কোল। তেমন মানুষ হলে বলত, মা জননী আমার এক কাঠা জায়গা নিয়ে চারপাশ আলো করে বসেছেন। টুক করে আমিও একটি প্রণাম সেরে নিলুম। দু'হাতে আমার মাথাটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, ছেলেবেলায় মাতৃহারা হলে বড় কষ্ট রে ! এটি বুঝি তোমার নাতি ? মেয়ের মেয়ে ?

মাতামহ বসে পড়েছেন। তুমি কি করে বুঝলে মা ?

ও আমি বুঝতে পারি। কি করে পারি তা বলতে পারব না। সবই গুরুর কৃপা। এই ছেলেটি

পৃথিবীতে স্নেহ ছাড়া সবই পাবে। মরুভূমিতে হাঁটতে হবে, কাঁটা গাছ চিবোতে হবে উটের মত। তোমার জীবন বাবা খুব সুখের হবে না। তবে ঘাবড়ে যেও না। শত দুঃখ শতজ্বালা আসিবে আসুক। জীবন হল কাচের ফানুস। আলো যদি জ্বালাতে পার অন্ধকারে চাঁদের মত দেখাবে। ধারা নৈবপতন্তি চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূষণম/ যৎ পূর্বং বিধিনা ললাট লিখিতন্ তন্ মার্জিতুং কঃ ক্ষমঃ ? চাতকের মুখে যদি জল না পড়ে তাতে মেঘের কি দোষ বল ? বিধি তোমার ললাটে যা লিখেছেন, কার ক্ষমতা আছে তা মুছে দেয় ? তবু পথ আছে। বিপদি মহতাং ধৈর্য।

নৌকোর নোঙর উঠল। বাতাস লেগে পাল ফুলে উঠেছে। একপাশে কাত হয়ে জলে ফেনা কেটে কেটে নৌকো সবেগে ছুটেছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে হিস্ হিস্ করে। নৌকোর ধাক্কা লেগে ঢেউ ভেঙে পডছে টুকরো টুকরো কাচের মত। গায়ে জলের কণা এসে লাগছে। ভয়ে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাতামহ উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটো জ্বলছে। মনের মত সঙ্গ পেয়ে গেছেন। এ আব এক চাতক। না চাইতেই জল পেয়ে গেছেন।

মহিলা আমার মাথার পেছনে একটা হাত রাখলেন। কি ভারি হাত ! এ হাতে জগৎকে দাবিয়ে রাখা যায়। বললেন, কি রে ভয় করছে ? পরান মাঝি হাল ধরেছে, ভয় কিসের বোকা ! তুই না পুরুষমানুষ ! তুই বলবি, হরীফে জোশিশে দরিয়া নহী খুদাদারি-এ সাহিল। উদ্বেল সমুদ্রের শত্রু আমি নই, আমি তটেব দম্ভ। আমি পুরুষ। কি রকম পুরুষ ? জানতুম পর নিসার করতা হুঁ। মৈ নহী জানতা দুআ ক্যা হৈ। তোমার পায়ে নিজেকে ফেলে দিয়েছি, প্রার্থনা-ফ্রার্থনা জানি না।

মাতামহ বললেন, এ কি ?· এ ত দেখছি উর্দু ! তুমি উর্দু শিখলে কোথা থেকে ?

হঠাৎ নৌকো চরকিপাক খেয়ে গেল, মোচার খোলার মত। মাঝিদের হই, হই, পালের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, সামাল, সামাল। সামনের দিকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা চিৎকার জুড়লেন গেল গেল। নৌকোর দুলুনি দেখে প্রথম থেকেই আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হচ্ছিল। সাধিকা মাথায় হাত রেখে চেপে ধরেছিলেন। এখন মনে হল জলে ডুবে মরার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হয়। খোলসা হয়ে মরার আর এক আনন্দ। মাতামহ তারা তারা বলে চিৎকার শুরু করলেন। দড়ি ছেঁড়া পাল ছিটকে বেরিয়ে গেছে। নাগালের বাইরে পতপত করে উড়ছে। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান মেরে যাত্রীসমেত নৌকো উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হালমাঝি যেন লড়াই করছে। হাত আর পা দুটোই চলছে। এত ভয়েও সে দৃশ্য দেখে মনে হল, একেই বলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জার লড়াই ; মাতামহ এরই মাঝে ফিসফিস করে বললেন, পইতে থেকে সিন্দুকের চাবিটা খুলে নে। নামতে নামতে একেবারে নিচে নামবি, দেখবি একটা ছোট্ট বালিশ। বালিশটা তোর। বাকি সব ফেলে দিবি।

ডুবলে, আমরা দু'জনেই ত ডুবব। চাবি নিয়ে করবটা কি ?

তুই ত সাঁতার জানিস।

সে সাঁতারে এ নদী সাঁতরান যাবে না।

সাধিকার কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। মুখ দেখলে মনে হবে বেশ মজা পাচ্ছেন। বিষ্ণুও বসে আছে গ্যাঁট হয়ে। নিমীলিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। ঠিক মনে হল পেতলের চোখ। সে দৃষ্টি একমাত্র স্বপ্নেই হয়ত দেখা যায়। আমাকে বললেন, তোকে দুটো জিনিস শিখিয়ে দি।

এখন শেখাবেন ? সে শিক্ষা কি আর কাজে লাগান যাবে ? একমাত্র সাঁতার ছাডা আর কোন শিক্ষাই এখন কাজে লাগবে না।

কথার ফাঁকেই নৌকো আর একবার বাঁই করে ঘুরে গেল। যাঁরা আরও বেশিদিন বাঁচতে চান তাঁবা সেই ঘূর্ণায়মান পদ্মপত্রে বসে পতনোন্মুখ জলবিন্দুর মত হায় হায় করে উঠলেন। মাঝিরা পালেব দড়িটাকে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ভূত না হলে অত বড় হাত পাবে কোথায় ? সাধিকা ছেলেমানুষের মত বলে উঠলেন, বাঃ, বেশ মজা ত ! নাগব দেলায় চেপেছি রে বিষ্ণু।

দেরিতে হলেও বিষ্ণু এবার ভয় পেয়েছে। সে বলল, মা তুমি একটা কিছু কর।

আমি কি করব ? আমি কি ভগবান ? তোরা বড় চিৎকার করছিস। মরবি তো মানুষেব মত মর।

এমন・করছিস যেন ঘোড়াব আস্তাবলে আগুন লেগেছে। বড় ছেলে?

মাতামহ ফ্যাকাসে মুখে, শুকনো গলায় বললেন, বলো মা।

দড়িটাকে চেপে ধরনা বাবা।

আমি কি পাবব মা? আমার যে বযেস হয়েছে।

তা হলে হাওয়া কমুক। এমন ঝোড়ো বাতাস এল কোথা থেকে! তোমরা একটু স্থির হও, মনে স্থির, দেহে স্থির। সেই পেতলের চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত হয়ে বইল কিছুক্ষণ। হালের মাঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর পারছে না যেন সামাল দিতে। হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল। নদীর জল সম্পূর্ণ স্থিব। বহু টাকা উড়িয়ে বড়বাবুর দাপট যেমন কমে আসে, পালের ফটফটানিও সহসা থেমে গিয়ে নেতিয়ে পড়ল। ঘবেব ছেলে ঘরে এস বাবা। মাঝিরা দড়িটা আবার যথাস্থানে বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার সতীমাঈকি জয়।

নৌকোর মুখ কিন্তু ঘুবে গেছে। যে পার থেকে ছেড়েছে সেই পাবেব দিকেই মুখ। সতীমা চোখ খুললেন। হাসি হাসি মুখে তাকিয়েছিলুম। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন, বিষ্ণু, ছেলেটা মাবা গেল বাবা।

সে কি মা? এই ত দেখে এলে, হাসছে, দুধ খাচ্ছে।

নাঃ, বাতাস বড় জোবে বইছিল। প্রদীপ নিবে গেল। মাঝি তোবা বাবা নৌকোব মুখ আর ঘোবাসনি। আমাকে ফিবিয়ে নিয়ে চল।

মাতামহ জিজ্ঞেস কবলেন, কে মাবা গেল মা?

আমাব এক ভক্তেব ছেলে। এই নিয়ে তিনটি গেল। সবাই কি আব মা হতে পাবে। হয় ছেলে মবে, নয় ত মা মবে। আমি কি কবব? তোমবা সব পাপ করবে পাপের বোঝা নিয়ে আসবে। ফল ভুগতে হবে না!

তোমাব কে মা বুঝবে লীলে। তুমি কি নিলে কি ফিবিয়ে দিলে॥

নৌকো কোনাকুনি পাড়ি মেবে যে ঘাটে ভিড়ল, সেটা পারঘাটা নয়। চৈতন্যঘাট। ইতিহাসেব কোনও এক কালে এই ঘাটে শ্রীচৈতন্য নৌকো থেকে নেমেছিলেন। সময় সময়ের নদী দিয়ে বয়ে চলেছে। ঘাট পড়ে আছে আধভাঙা হয়ে জলধাবাব পাশে। ক্ষযা ক্ষযা পাথবে কালচে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ।

বিষ্ণু আগে নামল। বিষ্ণুর কাঁধে ভর বেখে তিনি সাবধানে নামলেন। ঘাট বেশ পিছল। মাতামহও নেশাগ্রস্তেব মত পেছন পেছন চলেছেন। মন পড়ে আছে সাধিকাব দিকে। নৌকোর দুলুনিতে তাই বোধহয় টালমাটাল হচ্ছেন না। আমাকেও নামতে হল। কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পাবছি না। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি জানি না। পিছলে পা হড়কাচ্ছে। পড়ে না যাই।

প্রভু যেমন পেছনে ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আসা কুকুরেব দিকে, 'কি রে কেন আসছিস' দৃষ্টিতে তাকান, সেই ভাবে তিনি আমাদেব দিকে তাকালেন। হাতে বিস্কুট নেই, তবু সেই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, কি বে কোথায় চল্লি তোরা?

মা একটু কৃপা। একটু কৃপা দিয়ে যাও মা। মাতামহ জমিদাবের পেছনে হাতকচলান নায়েবের মত সামনে কুঁজো হয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। মাঝে মাঝে পিছলে যাবার মত হচ্ছেন। কৃপাটৃপার কথা আমার কিছু মনে হচ্ছে না। আমি কেবল ভাবছি বাতাস উঠল কেন? বাতাস পড়ল কেন? এ কি শক্তি? না কোন স্বাভাবিক ঘটনা! কে মরল! সে খবরও কি বাতাসে ভেসে এল! নৌকো তীব ছেড়ে চলে গেল।

মা মহাদেবের বুকে দাঁড়ানো জগদম্বার মত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, কৃপা কি ভিক্ষে কবে পাওযা যায় বাবা? এ কি ছেলের হাতে মোয়া যে তুমি খাবে ভোগা দিয়ে! আধার প্রস্তুত কব। যন্ত্রটাকে বেঁধে নে তবে ত সুরে বাজবে।

সিঁড়ির দু'ধাপ নিচে আমি উদোবক্কা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্যাঁচাল মন। সহজে যেন বিশ্বাস আসতে চায় না। নাস্তিকের রক্ত শরীবে বইছে। আমার ঘোড়ার মত মুখেব দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকলেন,

এদিকে উঠে আয়। তোকে কানে কানে দু'টো কথা বলে যাই।

নিঃশ্বাসে গোলাপের গন্ধ। কানে ফোঁদল ফিট করে তপ্ত সীসেব মত গুটি কতক কথা তিনি ঢেলে দিলেন, তুই কখনও কাউকে ভালবাসার চেষ্টা কববি না, তাহলে তাব মৃত্যু হবে। কিছু আঁকড়ে ধবার চেষ্টা কববি না, সে পালিয়ে যাবে। সুখে থাকার চেষ্টা করলে অসুখে পড়বি। নিজেকে খুব কষ্টে রাখবি তা হলেই তোর সুখ হবে। তুই হলি শনি। নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম্॥ ওই তোর পথ, ওই দেখ। ধূধূ প্রান্তব। ধুলো উড়ছে। সাদা উত্তরীয় উড়িয়ে তুই চলেছিস, চলেছিস, ছায়া নেই, মায়া নেই, কায়া নেই, মমতা নেই, কনককান্তি নেই।

কি হল কে জানে? চোখের সামনে যেন মরীচিকা দেখছি। নদী অদৃশ্য। জনপদ লুপ্ত। সব যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। সত্যিই ধুলো ওড়া, রোদ জ্বলা প্রান্তব। দূরে বহু দূরে আমি আমাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ ভয়ে আমাব চিৎকার, এ তুমি কি করে দিলে? উত্তর এল দূর থেকে, ভয় পাসনি খোকা, আবার দেখা হবে, আবার, আবার।

কেয়া হুয়া, গোদ হুয়া

হিস্টিরিয়া, হিস্টিরিয়া, নাকের সামনে জুতোটা ধরুন। হ্যাঁ হ্যাঁ জুতোর গন্ধেই জ্ঞান আসবে। আমার মাসীমার মূর্চ্ছা রোগ আছে। যেই ভিরমি যায় মেসো অমনি নাকের কাছে কাঁচা চামড়ার জুতো ধরেন। ব্লটিং পেপারে শুকনো লঙ্কা গোল করে পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে সিগারেটের মত ধরতে পারলে আরও তাড়াতাড়ি কাজ হত।

আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসছে। যে কল্পজগতে সহসা চলে গিয়েছিলুম সেই জগৎ থেকে ধীরে ধীরে ফিরে আসছি। সেই ঘাট, সেই নদী, সেই ঢেউ, সেই শব্দ। আকাশের রঙটাই যা কেবল পালটে গেছে। অন্ধকারের আয়োজন চলেছে। একটি দুটি তারা ইতিউতি চোখ খুলব কি খুলব না করছে। কে একজন গলা জলে দাঁড়িয়ে অস্ত-আকাশের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে।

মাতামহ বলছেন, কেন হিস্টিরিয়া, হিস্টিরিয়া করছেন। এ অন্য ব্যাপার।

আমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে শুরু করলেন, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ।

এতক্ষণে নিজের অবস্থা টের পেলুম। শ্যাওলা ধরা ঘাটের পইঠেতে থেবড়ে বসে আছি। পাশে মাতামহ। তাঁর বুকের ওপর আমার মাথা। তিনি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। পিট পিট করে তাকালে সামনে ঝুঁকে থাকা এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি। হাঁটুর ওপর দুটো হাত। পেছন দিকে তোলা উনুনের মত ঠেলে আছে। দুভাগ করে আঁচড়ান চুল। চোখে রিমলেস চশমা। গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি। এতক্ষণ তিনিই জুতো শোঁকাবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, অন্য ব্যাপার মানে? গাঁজা নাকি?

আরে না মশাই। গাঁজা হবে কেন?

তা হলে? অন্য ব্যাপার মানেটা কি?

মাতামহ রেগে গিয়ে বললেন, আচ্ছা নেই আঁকুড়ে দাদা তো? অন্য ব্যাপার, মানে অন্য ব্যাপার।

ও, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। বিপদে পড়েছেন দেখে ওপর থেকে নিচে নেমে এলুম, এখন মেজাজ দেখান হচ্ছে? এক্ষুনি ভাবছিলুম একটা চামচে এনে দাঁতি লাগা ছাড়াবার ব্যবস্থা করব। এক গেলাস খাঁটি গরুর দুধ খাওয়াব, এইমাত্র দোয়া হল। ঠিক আছে, আমার কি? নিজের ম্যাও নিজে সামলান।

দুধের নামে মাতামহ নরম হয়ে গেলেন। বললেন, ও আপনি বুঝি এই বাড়িতেই থাকেন?

হ্যাঁ, এই ঘাটও আমাদের। পশ্চিমে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলুম, দেখলুম ছেলেটি

মাথা ঘুরে পড়ে গেল। থাকতে পারলুম না নেমে এলুম। পরোপকারে আমার পিতৃদেব দেউলে হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তস্যতস্য পিতা উমেদারের জ্বালায় খুন করে জেলে যাবজ্জীবন কাটিয়েছিলেন। সেই রক্তের ধারাই ত আমার শরীরে বইছে।

মাতামহ ঘাটের ওপর ঠেলে ওঠা তিনতলা বাড়ির দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন। আমিও পিট পিট করে একপলক তাকিয়ে নিলুম। ভাঙা ভাঙা হলেও বিশাল বাড়ি। একটা পাশ প্রায় ধসে পড়েছে। বটের ঝুরি নেমেছে। এক সময় সাদা রঙ ছিল। এখানে ওখানে ছাপকা ছাপকা সেই স্মৃতিচিহ্ন মরা হাতি লাখটাকার কথা ঘোষণা করছে। মাতামহ বললেন, মনে কিছু করবেন না, বয়েসে মেজাজ তিরিক্ষি। কি হয়েছে তা হলে বলি, এ হল, ঈশ্বরাবেশ।

আমি ফিসফিস করে বললুম, দাদু।

কানে মোচড় দিয়ে তানপুরার তার নামানর মত আমার কণ্ঠ নামিয়ে দিলেন। বোঝাতে চাইলেন, চুপ, লোকটাকে একটু খেলাই।

ভদ্রলোক বললেন, ঈশ্বরাবেশ মানে?

আমার এই নাতিটি ক্ষণজন্মা পুরুষ। মাঝেমাঝেই সমাধিস্থ হয়ে যায়। ঈশ্বরানুভূতিতে শরীর স্থির। দেহ এ জগতে চেতনা অন্য জগতে। তখন দর্শনটর্শন হয়। একথা ত সকলকে বলা যায় না।

অ্যাঁ, তাই না কি? বলেন কি? সমাধি ত মশাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের হত! তিনি কি আবার ফিরে এলেন না কি? গীতা অবশ্য বলেছেন, যদা, যদা হি ধর্মস্য; কিন্তু এঁর চেহারায় ত তেমন চেকনাই নেই। গোজেল দুধ না পেলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম। কি জানি বাবা!

অ্যায়? ওই জন্যেই অবিশ্বাসীদের কিছু বলতে নেই। কাঠিয়াবাবার নাম শুনেছেন?

আজ্ঞে না। গাঁঠিয়ার নাম শুনেছি। গুজরাটীরা আদা কুঁচি দিয়ে খায়।

তিনি ছিলেন যোগী, তান্ত্রিক। ছ ফুট লম্বা। কাঠির মত চেহারা। আসনে বসে হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে নেবু পেড়ে আনতেন।

এই উদীয়মান মহাপুরুষেরও কি সেই রকম কোনও শক্তি আছে?

থাকলেও দেখায় না। হরি ওম তৎ সৎ।

আমি আর আড় হয়ে শ্যাওলা, গঙ্গামাটি মাখামাখি ঘাটে শুয়ে থাকতে পারছিলুম না। মশায় সর্ব শরীর ছিঁড়ে দিচ্ছে। ঘোর কেটে গেছে। পুরো ব্যাপারটাকেই এখন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ওম্ তৎসৎ বলা মাত্রই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক ওরে ব্বাবারে বলে তীর বেগে দৌড়লেন। মহাপুরুষের ভয়ে মানুষ এমন তীর বেগে দৌড়তে পারেন, জানা ছিল না। যেন বাঘ দেখেছেন।

মাতামহ বললেন, যাঃ সব মাটি করে দিলি! দু গেলাস খাঁটি গরুর দুধ হাতছাড়া হয়ে গেল। সবে দোয়া হয়েছে। এখনও গরম। ফ্যানা উঠছে।

এইভাবে ধাপ্পা মেরে দুধ খাবেন! এক গেলাস দুধ ত আপনি বাড়িতেই পেতে পারেন। চলুন খাইয়ে দোব।

আরে ধ্যাস, সে দুধ আর এ দুধ! পকেটে আফিমের গুলি। টুক করে মুখে ফেলে, এক গেলাস ফ্যানা ফ্যানা দুধ চোঁচাঁ মেরে দাও। যত রাত বাড়ছে তত মৌতাত বাড়ছে। অন্যায়টা কি হত! সত্যিই ত তোর সমাধি হয়েছিল। আমি লক্ষণ মিলিয়েই বলছি। সমাধির তুই কি বুঝিস?

সমাধি না হাতি। ভবিষ্যতের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। সতীমা যা বলে গেলেন, তাই যদি সত্যি হয়?

ধর্মের লাইনে অনেক বুজরুকি আছে। সহজে ওসব বিশ্বাস করিস নি। তোকে বিভূতি দেখিয়ে গেলেন। যাঁরা কথায় কথায় বিভূতি দেখান, তাঁরা হলেন প্রথম স্তরের সাধু।

কিসে কি, সে পরে ভাবা যাবে, বাড়ি গিয়ে কি বলবেন তাই ভাবুন। কাল সকালেই ত ধনুরি আসবে।

মাতামহ দুর্ভাবনায় আবার উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঘুসুরি থেকে আমাদের তুলো আনার কথা।

কাল সকালেই পিতার প্রিয় ধুনুরি গফুর মিঞা আসবে। তোশক তৈরি হবে। তিন অতিথির শুতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। তুলো এল না। মিঞা সায়েবকে ফিরে যেতে হবে। যেদিন যা হবার কথা, সেদিন তা না হলে পিতৃদেব তুলো-ধোনা করে ছেড়ে দেবেন। নদী তরতর করে বেশ চলছে, বাধা পেলেই উদ্দাম, ক্ষিপ্ত।

মাতামহ বললেন, কি আছে, সত্যি কথাই বলব। এমন ঘটনা ত সহজে ঘটে না।

উনি বিশ্বাস করবেন না।

ওর বাপ করবে।

হ্যাঁ, তখন বুঝবেন ঠ্যালা। ঈশ্বর সিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ বলে যখন ঠেসে ধরবেন তখন আমার প্রপিতামহ অয়েল পেন্টিং-এ যেমন বসে আছেন তেমনি বসে থাকবেন। বাঁচাতে আসবেন না।

তা হলে আমি পালাই। তোমার বাবাকে তুমিই সামলাও। আমার ত জামাই।

তা ত বটেই। একে বলে সুবিধেবাদী। আমাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে গিয়ে বসবেন বেটির কাছে।

তা যা বলেছিস! মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। ওই সাধিকার মত শক্তি থাকলে আকাশে হাত বাড়িয়ে মেঘ থেকে পাঁজা তুলো ধরে আনতুম। বৃথাই সাধনা। রাতটা ভাগাভাগি করে বকুনি খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণ বার কতক চমকে উঠল। এক চাকলা মেঘ জমেছে। লক্ষণ ভাল না। বেশি রাতে বৃষ্টি নামতে পারে। মাইলখানেক হাঁটতে হবে। একটা দোকানে গরম সিঙাড়া ভাজছে। সেদিকে তাকিয়ে মাতামহ বললেন, তুলোর পয়সার কিছু সদ্ব্যবহার করে গেলে হয়! কি রকম হাবুডুবু খাচ্ছে দেখেছিস। একেবারে গরম গরম। এক এক কামড়ে হা হা করতে হবে। তোর বেশ দুর্বল দুর্বল লাগছে না? একটু চা না খেলে এতটা হাঁটতে পারবি?

বৃদ্ধর খুব লোভ হয়েছে। তুলোর পয়সা এদিক ওদিক করা আর ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভাঙা একই অপরাধ। বুকপকেটে নিজস্ব একটি টাকা মজুত আছে। মায়া সিনেমা দেখতে চেয়েছিল। অন্ধকার ঘরে দুজনে পাশাপাশি বসে চীনেবাদাম চিবোতে চিবোতে নদের নিমাই দেখব। কতদিনের পরিকল্পনা আমাদের। সেই টাকাতেই এখন সিঙাড়া হোক।

সিঙাড়া আর চা খেতে খেতেই আকাশ বেশ ঘোর হয়ে এল। যে কটি তারা চোখ মেলেছিল তাদের চোখ বুজে এল। পা চালা, পা চালা বলে মাতামহ দৈত্যের মত হাঁটতে শুরু করলেন। বৃদ্ধ হলেও তিনি আমার চেয়ে যুবক। পেছন পেছন আমি চলেছি নেচে নেচে।

বাড়ির সদরে পা রাখতেই দমকা হাওয়া শুরু হল। ভৈরব আসছে তেড়ে। দোর ভাঙার শব্দ হচ্ছে। দুই বোনে মনে হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জানালা দরজা একটা-আধটা নয় ত! উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরে আসতে আসতেই একটা না একটা দিক ভেসে যাবেই। সদর খোলা ছিল। গলিতে কাদের একটা ছাড়া গরু ঢুকে বসে আছে। ভোঁস ভোঁস করে জাবর কাটছে।

প্রথমেই কনকের সঙ্গে দেখা হল। এক গাদা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ বুকের কাছে ধরে ঘরে ঢুকছে। আমি আগেই উঠে এসেছি ওপরে। মাতামহ এখনও নিচে। গরুর বাঁট পরীক্ষা করছেন। যে দুধ ছেড়ে এসেছেন ওঁর ধারণা সেই দুধ বাড়ি বয়ে এসেছে। সাধিকার সঙ্গ বিফলে যাবার নয়। এখন থেকে অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার ঘটতেই থাকবে।

কনক হাসিমুখে বললে, যাক বাবা, এসে গেছ। আকাশ যা হয়েছে। ভেঙে পড়ল বলে।

হুস করে প্রবল একটা হাওয়া এল। রান্নাঘরের সামনের বারান্দা থেকে কয়লা তোলার খালি গামলাটা গড়াতে গড়াতে উনুনের দিকে চলে গেল।

ধরো ধরো, বলে কনক কাপড় জামার বোঝা ধরিয়ে দিয়ে দুদ্দাড় করে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োল। গেল, গেল সব গেল। কি গেল কে জানে? হয়ত কিছু নামিয়ে এসেছিল। রান্নার এখন খুব তরিবাদি চলছে ত! মরাগাঙে বান এসেছে। আমি এদিকে লক্ষ্মণ ফল ধরে হাঁদার মত দাঁড়িয়ে থাকি। প্রকৃতিতে

প্রলয় নাচন, মনেও তাই। এ তুমি কি ধরালে প্রভু ! বড় গরম লাগছে। গরম কি রে গাধা ! ধুর, বৃষ্টির শীতল বাতাস ভলকে ভলকে বয়ে আসছে। এক এক ঝাপটায় পেয়ারাগাছের ডাল ঝড়াস ঝড়াস করে বারান্দার টিনের চালে আছড়ে পড়ছে।

এ যে শাড়ি ! সকালে কনকের শরীরে পেঁচিয়ে ছিল। এ যে ব্লাউজ ! এখনও শরীরের ঘ্রাণ লেগে আছে। এ যে সেই, যা আরও তলায় থাকে। হে জগদম্বে ! ভেতরে ভিসুভিয়াস ভসর ভসর করছে।

মাতামহ ওপরে উঠে এসেছেন। পেছন থেকে বললেন, কি হে, আবার সেই সমাধি না কি ?

আজ্ঞে না।

তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন ? ওই ত পায়রার মত বুক ! নীলমণি হলে কে দেখবে !

পাপীর মন। কি যেন একটা চাপা দিতে চাইছে। আলিঙ্গনাবস্থায় গুরুজনের কাছে ধরা পড়ে গেছি না কি ? চোরের মন, সব সময় বোঁচকার দিকে। ঝড়ের ঝাপটা চলছে রান্নাঘরের দিকে তেড়ে। একহাতে মাথা আর মুখ আড়াল করে দেয়ালে কাঁধ ঘেঁষে ঘেঁষে কনক এদিকে এসে বললে, দাও। তুমি ঘরে ঢুকে গেলে না কেন ?

মাতামহ সাধক মানুষ। মনে সব সময় সুবাতাস বইছে। আমার মত কুবাতাসে পাড়ি দিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মরেন না। গ্রাহ্যই করলেন না। কি ঘটে গেল অন্তঃপুরে। এক গাল হেসে বললেন, কিস্যু নেই। ব্যাটা শুকনো হয়ে শুয়ে আছে।

ঢুকে পড়ুন, ঢুকে পড়ুন, বলতে বলতে ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে কনক আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। বারান্দায় চটপট, চটাপট বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে টুং-টাং শব্দ হচ্ছে। মনে হয় শিল পড়ছে। মাতামহ বললেন, অকৃতজ্ঞ দুনিয়া, শোরে এক জায়গায় দুধ দেবে আর এক জায়গায়।

কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে কনক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কি ?

ওই যে গরুটা। নিচে শুয়ে আছে। দুধটুকু দিয়ে এসেছে মালিককে।

থাকলে কি করতেন ?

একবার চেষ্টা করে দেখতুম।

পটাং-পটাং করে শিল পড়ছে। ন্যাপথালিনের বলের মত বারান্দার মেঝেতে লাফালাফি করছে ! শিল পড়ছে শিল। আধ কোঁচান কাপড় মেঝেতে ফেলে রেখে কনক ছুটল। দু'জনে নিচু হয়ে হয়ে শিল কুড়োচ্ছি আর মুখে পুরছি। বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। এক একটা শিল পড়ে পিংপং বলের মত লাফিয়ে উঠছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই যে এই একটা। এই আর একটা। এটা কত বড় ! তুমি নাও, তুমি নাও।

বয়েস, পরিবেশ ভুলে, দু'জনে ভীষণ ব্যস্ত। পেছনে পেছন ঠেকে যাচ্ছে। মাথায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে। বাতাসের আর্দ্রতায় কনকের সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। টাটকা ফোটা ভিজে গন্ধরাজের মত। এবার কিন্তু সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলব। তারপর যা থাকে বরাতে। কিন্তু ওই সাধিকা যে বলে গেলেন, কখনও কাউকে ভালবাসার চেষ্টা কোরো না, কাউকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা কোরো না। সে চেষ্টা ত আমি একবারও করিনি মা। আমার মত বোকচৈতন পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকেই ত ভালবেসে বেকুব হতে পারে। তাতে কার কি যায় আসে ! মূর্খরা ভালবেসে মরে। চালাকে কাজ গুছোয়।

মেসোমশাই এতক্ষণ ভেতরের ঘরে মুকুকে নিয়ে বোধ হয় ব্যস্ত ছিলেন। কখন পেছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা কেউই লক্ষ করিনি। বেশ রাগ রাগ গলায় বললেন, কনক, তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। একেই তোমার সেপটিক টনসিল, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে তোমার আর কি বল, বিপদে পড়ব আমি।

কনক উঠে দাঁড়াল। বারান্দার আলোটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। ঝোড়ো বাতাসে তার দুলে উঠলে আলো কাঁপে। নিবেও যেতে পারে। কনকের ধাবাল চোখে কেমন যেন একটা ছায়া নেমে এল। আমি জানি অভিমান কাকে বলে। মন কি ভাবে টসটসে হয়ে ওঠে। দরজা খুলে মানুষ কিভাবে

জগতের বাইরে ছিটকে চলে যায়। আমার পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে কনক ভেতরে চলে গেল। পেছনের দিকে গোড়ালির কাছে লেসের কাজ করা সায়ার অংশ ভিজে গেছে। সে যুগের ঋষিরা কত সাধারণ কথা কেমন অসাধারণ করে যুগের এপারে ওভাবে বাউণ্ডারি করে দিয়ে চলে গেছেন। প্রথম বয়সে মেয়েরা পিতার সম্পত্তি, তারপরই স্বামীর। মেসোমশাই মানুষটি তেমন সহজ সরল নন। অহঙ্কারের পুরিয়া।

মাতামহ চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। ইচ্ছে থাকলেও নিজের ডেরায় ফিরে যাবার উপায় নেই। বেশ ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। মেসোমশাই আবার ভেতরের ঘরে চলে গেছেন। মুকুকে পড়াতে বসেছেন। মেয়েকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ করে ছাড়বেন। কনক বকুনির ধাক্কা সামলে উঠেছে। আমার মত ওর ঠোঁট বেশিক্ষণ ফুলে থাকে না। সহজেই সামলে নিতে পারে। মেয়েদের তা না হলে ত চলবে না। প্রথম জীবনে পিতাকে সামলাও, শেষ আর মধ্যজীবনে স্বামীকে খেলাও। মাছ ধরার মত। সুতো ছাড় আর সুতো টান। আমার আর কতটুকু জ্ঞান। চার পাশে যা দেখছি আর কি। মেয়েছেলে যদি খেলোয়াড় না হয় তার অশেষ দুর্গতি। ওই জবা, জবার মা, মা কিনা সঠিক বলতে পারব না, জবার মাসী, মাসীই হবে, দু'জনকে প্রায় একই রকম দেখতে, ওদের মত হলে সুখের শেষ নেই। সুখের সব জানে। নিজেও মাঝে মাঝে দেখি ত। এই ত সেদিন। দুপুরবেলা বাড়িতে বোধহয় দুই মাতব্বরের কেউই ছিল না, যে ছেলেটাকে ওরা পিসতুতো ভাই বলে এতকাল চালিয়ে আসছে, সেই ষণ্ডামার্কাটা জবাকে পাঁজাকোলা করে বারান্দায় গোল হয়ে ঘুরছিল। কি খেলা কে জানে? সে জিনিস সিনেমা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। দুপুরবেলা সব কাজ ফেলে এক মদ্দা সোমত্ত এক মেয়েকে কোলে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে মরছে। নাও বোঝো ঠ্যালা। কে বাবা সেই উপদেশ মনে রাখছে, ওরে দাগ রেখে যা, দাগ রেখে যা। উলটো বুঝলি রাম। এবং মানুষ চরিত্র দাগবাজি করে পস্তে মরছে। মেসোমশাই কি আর সাধে গোঁফ পাকিয়ে তেড়ে এসেছিলেন! কনক হয়ত আমাকে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু আমার চালচলন ত দেখতে হবে। ফোঁস করে ছোবল মেরে দিলে কে সামলাবে। মানুষ ত আর ঢোঁড়া সাপ নয়। খড়ম মার্কা কেউটে। মেয়ে আমার নীলবর্ণ হয়ে যাবে। ভালবাসার ছোবল আর বাঘের কামড় কোনটাই কম যায় না। আঠারো ঘা।

জানালা ফাঁক করে কনক এতক্ষণ বৃষ্টি দেখছিল। গাছপালা সব জবুথবু হয়ে ভিজছে। এক দল দৌড়বীরের মত বৃষ্টি রাস্তার ওপর দিয়ে ধর ধর করে দৌড়েই চলেছে। ছোটার যেন শেষ নেই। পাল্লা বন্ধ করে কনক মাতামহর কাছে সরে এসে বললে, কি, চা খেতে ইচ্ছে করছে?

মাতামহ সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

পাঁপর ভাজা।

মেসোমশাই যে ঘরে বসে মুকুর সঙ্গে তর্কশাস্ত্র নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন সেই ঘরের দিকে উঁকি মেরে ভয়ে ভয়ে বললেন, বুড়োর খাই খাই দেখে তোমার বাবা যদি রেগে যান!

কনক হেসে বললে, বারে, রেগে যাবেন কেন?

আমতা আমতা করে মাতামহ বললেন, তাছাড়া জামাইটা বাইরে এই দুর্যোগে কোথায় এখন ভিজছে কে জানে? আমরা বেকারের দল মজা করে চা পাঁপর খাব, আর সে বেচারা ভিজে জাব হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি আসবে। সেটা কি ভাল দেখাবে নাতনী!

নিচে একটা হ্যাটহুট শব্দ শোনা গেল। যাক পিতৃদেব বেশি না ভাবিয়েই ফিরে এসেছেন। প্রকৃতির কাছে হেরে যাবার মানুষ তিনি নন। মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন, আমি একটা ট্যাঙ্ক। এমন কোনও শক্তি নেই আমাকে থামিয়ে রাখতে পারে।

পিতার গলা আবার শোনা গেল, দুধ খাবে একজন, আর গোবরে মাখামাখি হবে আর একজন। ব্যাটা, এটা তোমার মামার বাড়ি?

মাতামহ আনন্দে আটখানা, ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে। চলো চলো আমরা যাই। গোবরকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে আনি।

সামান্য গোলমাল, তাইতেই মেসোমশাই বিরক্ত । তুমি পড়, তুমি পড বলতে বলতে ভেতব থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন । একটা মানুষ বটে ! যাই বলো বাবা, বেশ স্বার্থপব । কনক কিন্তু একেবারে অন্যরকম । দু'জনের তফাৎ একেবারে উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু । কনক নিচে নেমে গেল । আমরা দু'জনে সিঁড়ির মাথায় বৃষ্টিধৌত বীরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে স্থিব দণ্ডায়মান ।

মারাত্মক কিছু একটা সিঁডিব দু'পাশের দেয়ালে ঠকাস ঠকাস করে ধাক্কা খেতে খেতে ওপরে উঠছে । পিতা কি শেষে বর্ম, শিবস্ত্রাণ পরে ফিরে এলেন ! কিছুই বিশ্বাস নেই । সব পাবেন । ধনুকের মত কি একটা ঘাড়ে কবে উঠছেন । পেছনে কনক । একেবারে বাধ্য মেয়ে । মেসোমশাইয়ের চেয়ে আমাব পিতাব সঙ্গে যেন বেশি মানিয়েছে ।

মাতামহ বললেন, বাঃ বাঃ, বেশ মানিয়েছে হে । মহাভাবতেব পাতা থেকে যেন গাণ্ডীব ধাবণ করে উঠে এলে ! বস্তুটা কি গো ! কোথাও হবধনু ভঙ্গেব কমপিটিশান হচ্ছিল না কি আজ ?

একটা দিক কনকের কাঁধে । জিনিসটাকে ধীরে ধীবে দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে পিতা কনকের পিঠে দু'বাব তাবিফেব চাপড মেরে বললেন, তুমিই হলে বিয়েল কর্মী । আব এঁবা হলেন মহামান্য দর্শক । ন্যাজ নাড়েন শিকার ধবেন না । হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন ? হবধনু ভঙ্গ ! তা হলে ত একটি সীতাও আসত বুড়ো রামচন্দ্রেব পেছন পেছন ।

মাতামহ গ্রাহ্যই কবলেন না । গীতাব মহাপুরুষ । আক্রমণ, অনাক্রমণে স্থিব, অচঞ্চল । তিনি সেই যন্ত্রেব ছিলেতে আঙুলেব টুসকি মাবলেন । ব্যাঙাও, ব্যাঙাও কবে শব্দ হল । বাঃ যন্ত্রটি বেশ ত ! দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জমবে ভাল । ইল্লেহেহে কুড়হুহু ।

আপনাব সঙ্গীতেব সঙ্গেও মানাবে ভাল । তবে বাজাতে পাববেন না । এ চালাতে হলে ষাঁডেব ডালনা খেতে হবে বছর দুই ।

মাতামহ বললেন, তোবা তোবা, তাহলে আনলে কেন ?

কনক বললে, মেসোমশাই এটা তুলোধোনা যন্ত্র না ?

আঃ ঠিক ধরেছ । ভেবি ইনটেলিজেণ্ট, ভেবি ইনটেলিজেণ্ট । তোমাব মত একজন কেউ আমাব পাশে থাকলে সংসারে ফুল ফুটিযে ছেড়ে দিতুম ।

পিতা ঘরে ঢুকলেন । হাতে একটা হাফ মুগুর । ওইটা দিয়ে তাঁতে আঘাত করলে ব্যাঙাও ব্যাঙাও করে শব্দ হয় । ছটফট, ছটফট কবে চার পাশে তুলো লাফাতে থাকে । শৈশবে বাড়ির বিশাল ছাতে ধুনুরি এসে বসলে আমাদেব উত্তেজনা বেড়ে যেত । মুগুরটাকে অনেকটা মিনাবেব মাথার মত দেখতে । কনক হাত থেকে নিয়ে ঘবের এক পাশে সাবধানে বেখে দিল । এই প্রথম চিন্তাটা মনে উঁকি দিয়ে গেল, কনক যদি আমার মা হয়ে এই সংসারে বেশ জাঁকিয়ে বসে, তাহলে কেমন হয় ? মন্দ কি ? বয়েসে একটু ছোট হবে । তা হলেও, মা ছোট হলেও মা । ছেলে হিসেবে আমি একটু বেমানান হয়ে যাব । এই যা সমস্যা ? ট্রেনের টিকিট চেকার সেই সুখেনকে ধবেছিল । হাফ টিকিটে ওপরের বাঙ্কে চাদর মুড়ি দিযে বোম্বাই যাচ্ছিল । চাদবেব বাইবে পা বেবিয়ে পড়েছে । চেকাবেব হাতে টিকিট, নজব পায়ের দিকে, এতনা মোটা গোড, এতনা লম্বা বাল, হাফ টিকিট ? সুখেনের দাদা বলছেন, মোটা হুয়া তো কেয়া হুয়া, গোদ হুয়া সাহাব । লোকে হয়ত বলবে, আহা মেয়েটার কি ভাগ্য, একেবারে বাজহাঁসের মত ছেলে নিয়ে চলেছে । ধেড়ে গলায় যখন ম্যা ম্যা কবে ডাকে তখন প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে যায় ? কেন যে এসব চিন্তা আসছে ! বড় পাপ ঢুকেছে মনে । হিংসে, অভিমান, লোভ, কামনা, সব মিলেমিশে মন নয ত, জগাখিচুড়ি ।

মাতামহ বললেন, হঠাৎ তুমি এই যন্ত্রটা কিনতে গেলে কেন হরিশঙ্কব ! ভাল দেখে একটা তানপুবা কিনলেই পারতে !

ভিজে জামা খুলতে খুলতে পিতা বললেন, তাতে ত আর তুলো ধোনা যেত না ।

তুমি তুলো ধুনবে ? সব ছেড়ে তোমার এমন অদ্ভুত ইচ্ছে কেন ?

সংসারে সব কিছু শেখা দরকার । সেল্‌ফ হেলপ । পবমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকব কেন ? নিজের

কাজ নিজে করে নোব। সংসারের সাশ্রয়।

এটাও কি তুমি ডিস্পোজাল থেকে কিনলে ?

আজ্ঞে না। দেখি কি তুলো আনলেন ? ভিজে যায় নি ত !

মাতামহ মাথা নিচু করলেন। এইবার সেই মুহূর্ত এসেছে। জীবন-মরণ সমস্যা। আমতা আমতা করে বললেন, তুলো আনা হয় নি হরিশঙ্কর।

কেন ?৲ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ? দিবানিদ্রা ?

না না, সে এক অলৌকিক ব্যাপার।

তার মানে ? তুলো উড়ে গেছে ?

না না, সে এক মহা অলৌকিক ব্যাপার।

আপনাদের সবেতেই দেখছি অলৌকিক ব্যাপার ! থাকেন লৌকিক জগতে, কাজ, কারবাব সব অলৌকিক জগতে ! মজা ত মন্দ নয়। আপনারা আমার সব প্ল্যান বানচাল করে দিলেন। বললেই পারতেন, পারব না।

কনক বললে, মেসোমশাই, এখন আব মেজাজ খারাপ করবেন না। পাঁপবভাজা আব চা খান, তুলোর চিন্তা পবে কবা যাবে।

তুমি বলছ বটে, তবে আমার সমস্ত পবিকল্পনা একেবাবে ভেস্তে গেল।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। এই ঝড়েব বাতে কাব আবার অভিসাব ! দবজা খোলা আর বন্ধের শব্দ। এই বাড়িতেই কেউ এলেন। গাড়ি চেপে কাব আগমন ? সুরেলা গলা উচ্চগ্রামে খেলে গেল, পিণ্টু, পিণ্টু !

মাতুল এসেছেন। আরে বাপবে ! মহামান্য অতিথি। তটস্থ হয়ে থাকতে হবে। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। আসুন, আসুন। অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে কাছা কোঁচা খুলে যাবাব মত অবস্থা। সেই পরিচিত সুবাস সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। সেই ফিনফিনে শৌখিন মানুষটি এবার দৃশ্যমান। আব একটু ফর্সা হলে মনে হত ধুতি পাঞ্জাবি-পবা সাহেব। আলো পড়ে বুকেব একসাব হীরে বসান বোতাম জলতরঙ্গের মত হাসছে। কখনও এটা কখনও ওটা। মাতুলেব পেছনে আব এক ভদ্রলোক। যে কোনও বিয়ে বাড়িতে এমন কাঠামোব মানুষ প্রায়ই দেখা যায। হৃষ্টপুষ্ট। লাগাম ছাড়লেই ফচকেমিতে ভেসে যাবেন। সমস্ত মহিলাই এঁব বউদি। চিবন্তন ঠাকুবপো। ঝুলোনতলার নাচেব তাঁবুতে লোকটি কনুইয়েব খোঁচা মেরে বলেছিল, মাগীব বস আছে। মহিলাবা এই মানুষটিকে অবশ্যই বলবেন, মিনসের বস আছে। গা থেকে সেই পরিচিত গন্ধ বেরোচ্ছে। পুরুষালী ঘাম, সিগারেট আর সেণ্ট। ব্যাকব্রাশ চুল। যৌবনের ব্রণ মুখে দু'চারটে ক্ষত বেখে চলে গেছে। এমন মানুষেব সঙ্গে মেশাব আগে মহিলাদেব খতিয়ে দেখা উচিত, কোথাকাব জল কোথায় গড়ায় ! অকাবণে মুখে যে হাসি লেগে আছে, সে হাসি দেখলেই পিতা বলতেন, উজবুকের মত হাসছ কেন বল ত ? পৃথিবীটা কি এতই আনন্দেব জায়গা !

মাতুল আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, সব ঠিক আছে ত ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবহাওয়া অনুকূল না প্রতিকূল ?

আলেকজাণ্ডার সেই পুরুকে জিগ্যেস করেছিলেন না ! তুমি কি বকম ব্যবহার প্রত্যাশা কর ? মাতুলেব প্রশ্নের উত্তর আমাকে আর দিতে হল না। পিতা পেছন থেকে আলেকজাণ্ডারের কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রকম আবহাওয়া চাও ?

মাতুল পুরুর মতই বীর দর্পে বললেন, মৃদু এবং মোলায়েম ! ময়েন দেওয়া লুচির মত। তৈরি করে নাও।

এসে যখন পড়েছি, অনুমতি পেলেই হাত লাগাব। বেতলব দে তো মজা উস-মেঁ সিবা মিলতা হৈ ! বোহগদা জিস-কো নহ হো খ্-এ সবাল, আচ্ছা হৈ। না চাইতেই যদি দেন তো তার স্বাদই আলাদা .

সেই ত শ্রেষ্ঠ ভিখারি, হাতপাতার অভ্যেস হয় নি যার।

আহা গালিব দিয়ে শুরু করলে! সব মাটি করে দিলে। বেশ একটা রাগ রাগ ভাব আসছিল। তোমাকেও ফায়ার করার ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমাকে? আমার অপরাধ?

তোমার অপরাধ? তোমার উপেক্ষা। এই ঝড়ের রাতে পারিবারিক হাঁড়ি খুলে পচাই বের করতে চাই না। আজ হল শ্যাম্পেন নাইট। তুমি স্রেফ তরে গেলে গালিবের জন্যে, তরে গেলে এই ভদ্রলোকের জন্যে।

ও হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দি। প্রতাপ রায়। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। অসাধারণ ভাল তবলা বাজায়।

প্রতাপ রায়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। প্রণামটি চট করে সেরে নিল। মাতুল সাধারণত কারুর কাছে মাথা নিচু করেন না। তবে ভগিনীপতির কাছে অহঙ্কার খাটো করার অভ্যাস বজায় রেখেছেন।

পিতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হঠাৎ এলে কেন? তুমি ত সহজে আস না। তোমার জগৎ ত আলাদা। এ কি তোমার মতিভ্রম!

মাতুল বললেন, ধরেছেন ঠিক। পৃথিবীকে আপনি যতটা চেনেন, আর কেউ ততটা চেনে না। আপনারই কথা, ধোঁয়া দেখলেই বুঝবে আগুন। আমরা এসেছি আপনাদের দু'জনকে ধরতে।

হঠাৎ। নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে।

অবশ্যই।

টাকা-পয়সার ব্যাপার?

অবশ্যই।

তাহলে পরিবেশ বিষিয়ে ওঠার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

প্রতাপ রায় ঠিক তালে ছিলেন। কনককে দেখেই বললেন, এক গেলাস জল খাওয়াবে ভাই। সুন্দরীরা বড় তৃষ্ণার্ত করে তোলে বুঝি!

রতনে রতন চেনে। ভালুক চেনে শাঁকালু॥

পাঁপরভাজা আমি খাই না। ও আপনি নিয়ে যান। চিরকালের নাক তোলা মাতুল, হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে ভয়ঙ্কর এক ভঙ্গি করলেন। ষোড়শীর বদলে বৃদ্ধা তেড়ে এলে মানুষ এমন ছিটকে যেতে পারে। বর্ষার রাতে মুচমুচে পাঁপরে এমন বিতৃষ্ণা বড়ই বেমানান। কনক হকচকিয়ে গেছে। মাতুল আবার আপনি বলে বয়েস আর ব্যবধান দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পিতা বললেন, ও হ্যাঁ, তুমি ত আবার চপ কাটলেট ছাড়া অন্য কোনও মধ্যবিত্ত খানা পছন্দ কর না। পোস্ত, বড়ি, মুড়ি, পাঁপর।

আজ্ঞে না, তা কেন? পোস্ত দিয়ে পরোটা আমি ভীষণ ভালবাসি। পাঁপর কেমন যেন বুড়োটে খাবার।

তাই না কি? তা হলে তুমি বিস্কুট খাও, কটেজ ক্রিম।

বিস্কুট ত রুগীরা খায়।

ও, রুগীরা খায়!

পিতা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন। শ্যালক একের পর এক ফ্যাকড়া বের করছে। সামান্য খাওয়া নিয়েও মানুষের সংসারে কত ফ্যাচাং। এ ব্যাপারে মাতামহ আমার সোনার চাঁদ ছেলে। কোনও বায়নাক্কা নেই। একেবারে কোণের দিকে একটা বেতের চেয়ারে বসে আপন মনে একা একা পাঁপর চিবোচ্ছেন। যেন এ জগতের মানুষই নন। মা ছোট্টছেলেকে ধামিতে মুড়িমুড়কি দিয়ে বসিয়ে দিয়ে

গেছেন যেন ! শিশু ভোলানাথ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, পাখি দেখছে, হাত নাড়ছে। চোখে কেবল মোটা করে কাজল আঁকা নেই, কপালে ধেবড়ান টিপ নেই। কনকও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে ?

পিতা বললেন, তা হলে তুমি কেক খাও।

না না, কেক দাঁতে বড় জড়িয়ে যায়, জিবে বিচ্ছিরি একটা কোটিং পড়ে যায়।

তাই নাকি ? তুমি টুথব্রাশ দিয়ে খাও। আমি তোমাকে নতুন টুথব্রাশ দিচ্ছি। এক কামড় করে খাও আর ব্রাশ দিয়ে ঘষে দাও।

সেটা একটা পাগলামো হবে।

পাগল ত পাগলামি করবেই। সেইটাই ত তার স্বভাব ! বেশ, তুমি তা হলে ওমলেট খাও। কনক, তুমি ওমলেট করে নিয়ে এস ত !

মাতুল বললেন, হ্যাঁ ওমলেট চলতে পারে, তবে পেঁয়াজ ছাড়া। আর মাখন দিয়ে নরম করে ভাজা।

কনক পাঁপর নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, প্রতাপ রায় বললেন, আমাকে দিয়ে যাও। আমার খোলটা অনেক বড়।

কনক পাঁপরের ডিশটা প্রতাপ রায়ের সামনে কোনরকমে নামিয়ে রেখে পালিয়ে বাঁচল। মেয়েরা মানুষ পড়তে পারে। চোখের ভাষা, মুখেব মুচকি হাসি। বহু যুগের অ্যানিম্যাল ইন্সটিংক্ট। প্রতাপ রায় যেন রেডিও ট্রান্সমিটার। যখন যেখানেই থাকুন না কেন, লাগাতার বিপ্‌ বিপ্‌ করার জন্যেই জন্মেছেন। আমাদের ভোমলা পাগলা। ডাকলেই বলবে, কি করতে হবে ? ওই মেয়েটাকে চুমু খেতে হবে। সন্ধ্যা শিশি হাতে কেরোসিন তেল আনতে যাচ্ছে, ভোমলা দৌড়োল পেছন পেছন। ভোমলার পেছন পেছন দৌড়লুম আমরা, ওবে, না-বে, না-রে, তোকে রুটি খাবার জন্যে ডেকেছিলুম। তিনদিন উপোস করে আছিস।

পিতা বললেন, তোমার স্বভাবের সাত খুন মাপ হয়ে যায়, তোমার একটি মাত্র গুণের জন্যে। সে হল তোমার সঙ্গীত। তোমার বড়লোকি চালের জন্যে যখনই ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে তখনই কানে ভেসে আসে তোমার সুর, কৈসে গুজার গই হায় জওয়ানি। সেই ছেলে, সেই এতটুকু ছেলে, স্কুলে আমার কোলে বসে গান গেয়েছিলে বাগেশ্রীতে, কোলে তুলে নে মা কালী। তাবড়, তাবড় গুণী সেদিন কাত হয়ে গিয়েছিল। সময়, সময় ! সময় কিভাবে চলে যায়। ব্রিজের ওপর দিয়ে যেন মেল ট্রেন ছুটছে !

মেসোমশাই ও-ঘরে বাঘের মত চিৎকার করে উঠলেন, মূর্খ ! সেই সকাল থেকে চেষ্টা করছি, কিছুতেই তোমার মাথায় ঢুকছে না, শি অ্যাস, শি গোট ! কোঁতের পজিটিভিজমের সার কথা কি ? চিন্তাধারা পর পর তিনটি ক্রম পার হয়ে এগিয়েছে। কি, কি ? আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক। বলো, বার বার বলো। মুকু ঘুম জড়ান গলায় বলতে লাগল, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক।

মাতুল এতক্ষণে জিগ্যেস করলেন, এঁরা কারা ?

এঁরা হলেন, মেজদার ভায়রা ভাই, আর তাঁর দুই মেয়ে।

ও, এঁরাই ত সেই রেঙ্গুনে ছিলেন। ইভ্যাকুয়েসানের সময় আরাকানের জঙ্গলে স্ত্রী মারা গেলেন ? আচ্ছা সব বড় বড় হয়ে গেছে। উনি আর বিবাহ করেননি ?

কোনও সেন্‌সিবল মানুষ দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করে ? তোমার বাবা, আমি, ওই ভদ্রোলোক। ইচ্ছে করলে আমরা আবার সংসারে ঢুকতে পারতুম। স্রেফ তোমাদের মুখ চেয়ে আমাদের এই স্যাক্রিফাইস। তোমরা এর দাম দিতে পারবে ?

কেন পারব না ?

ওই ত তার প্রমাণ। তোমার বৃদ্ধ পিতা গত তিনদিন অনাহারে ছিলেন। তুমি জানতে ? তোমার স্ত্রী জানত ?

অনাহারে থাকাটা ওনার একটা বিলাসিতা। কৃচ্ছ্রসাধন।

হোয়্যার ইগনোরেন্‌স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ। মনে রেখো, তোমাদেরও দিন

আসবে। সব, সব শোধ করে দিয়ে যেতে হবে।

কনক ওমলেট নিয়ে এল। বেশ একটা খিদে খিদে গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রতাপ রায় হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিতে নিতে বললেন, উমার ভূমিকায় সুন্দর মানাবে। পর্দায় একেবারে নিউ ফেস। ফেটে যাবে বুঝলে? একেবারে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

কনক অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আবার কি রে বাবা! প্রতাপ রায় নতুন এক চাল ছেড়েছেন। ভেতরে বেগ এসেছে। মনের চাতালে শৃগালের হাহাকার। কনক, কনক। কোন্ মানুষ যে কখন কিভাবে পাগল হয়ে যাবে, কেউ জানে না। নিজেরও জানা নেই। ঘোড়ার মত নাক ছেঁদা করে লাগাম পরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। চার পা তুলে কখন যে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠবে!

মাতুল বললেন, তোর চোখ আছে প্রতাপ। বাঙলা স্ক্রিনে নতুন নায়িকার বড় অভাব। এই সময় বাজারে ছাড়তে পারলে একেবারে ক্যান্টার হয়ে যাবে।

পিতা বললেন, তোমাদের আলোচনা কোন্ পথে চলেছে? পর্দা-ফর্দা কি বলছ? সিনেমা না কি?

ধরেছেন ঠিক।

মাতামহ অন্ধকার কোণে স্প্রিংয়ের মানুষের মত মোড়া থেকে ছিটকে উঠলেন, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করব। তোমরা বায়োস্কোপ করা আমি ঘুচিয়ে দোব। এই কাপ্তেনটি কে? হাতী ছাড়া বিশ্বকর্মা! মুখ দেখলে মনে হয় রামবাগানের আড়কাঠি।

মাতামহ বাঘের মত এগিয়ে এসেছেন। পাঁপরের তেলহাত মাথার চুলে বুলিয়েছেন। আলো পড়ে পাকা চুল জরির মত চিক চিক করছে। মেসোমশাই মুকুকে চড়া গলায় দর্শন বোঝাচ্ছেন, 'যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার। বাপ্‌স, বাঙলা বটে। মুকু পরীক্ষার আগেই শুকিয়ে মরে যাবে। এরই মধ্যে কেমন যেন বাসী ফুলের মত চেহারা হয়ে গেছে। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে 'মিল', 'মিল', 'বেনথাম', 'বেনথাম' বলে কোঁত পাড়ে।

মাতামহের আক্রমণে, প্রতাপ রায়ের মুখের সেই অদ্ভুত হাসি মিলিয়ে গেল না। ওমলেট চিবোতে চিবোতে নির্বিকার মুখে বললেন, জ্যাঠামশাই, কেন যে আপনি আমাকে দেখতে পারেন না! সেদিন আপনি আমাকে খড়ম তুলে তাড়া করলেন। আপনার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে।

ওহে ছোকরা, ভুল আমার হচ্ছে না। তুমি সর্পই, মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। ঘাটের মড়া।

মাতুল বেশ চড়া গলায় বললেন, বাবা! বয়েসের চেয়ে আপনি বেশি বাতুল হয়ে পড়েছেন। আনকালচার্ড ফুল।

ঘরে যেন গ্রেনেড ফাটল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। দেয়ালে ঘড়ি চলছে ঠকাস ঠকাস শব্দে। মুকুদের পরীক্ষার পড়াও থেমে গেছে। হাত স্থির। হাঁটু স্থির। মুহূর্ত প্রস্তরীভূত। বসাকদের বাগান বাড়িতে দেখেছিলুম, পেছন দিকের বাগানে, জঙ্গলের মধ্যে একগাদা স্ট্যাচু। নগ্ন রমণী, স্নানরতা রমণী। দাড়িঅলা নগ্ন এক বৃদ্ধ ডিসকাস ছোঁড়ার ভঙ্গিতে স্থির। বছরের পর বছর রোদে আর জলে পড়ে থেকে মৃতের মত বিবর্ণ। ভূতের মত ভীতিপ্রদ। ঘরটাকেও এই মুহূর্তে বসাকদের পেছনের বাগানের মত মনে হচ্ছে।

পিতৃদেব ধীরে ধীরে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। এত ধীরে যে সামান্যতম শব্দও হল না। নৈঃশব্দের মহড়া চলেছে। মাথা পিঠের দিকে সামান্য হেলে আছে। ফলে চিবুক সামনের দিকে সমকোণের চেয়ে একটু উঁচু। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। ঝাউয়ের শাখায় এক ঝলক সমুদ্রের বাতাসের মত। এতটুকু শব্দ না করে চেয়ারটাকে দু'হাতে পেছনে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাতুলের থেকে বেশ সম্মানজনক দূরত্বে সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরে যেন চিতাবাঘ ঘুরছে।

চালচলনে এইবার সামান্য গতি লক্ষ করা গেল। বুকের কাছে হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা, তোমরা তা হলে এবার এসো।

মাতুল সাহস করে বললেন, তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

অফকোর্স। আমাদের সামনে বসার তোমার কোনও অধিকার নেই। তুমি হলে বড়লোকের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। এ বাড়িতে তুমি আর কখনও না এলে আমি যারপরনাই সুখী হব।

হঠাৎ আপনার এই ভাবান্তর ?

আমার আচরণের জবাবদিহি আপনার কাছে করতে আমি বাধ্য নই। আপনারা আসতে পারেন।

আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন ?

হঠাৎ ! সেই বেদের যুগ হলে তোমার মত ইয়ার এতক্ষণে ভস্ম হয়ে যেত। গুরুজনদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাই তো তুমি শেখনি। উনি আনকালচার্ড ফুল, তুমি কি ? তুমি হলে কালচারড মান্‌কি। ক্লিয়ার আউট। ইমিজিয়েটেলি ক্লিয়ার আউট।

উনি কেমন মানুষ আপনি কিছুই জানেন না। না জেনে নিজের অপরাধের বোঝা বাড়াচ্ছেন। হি ইজ ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। কঞ্জুষ দি গ্রেট, মাছির পিছন টিপে গুড় বের করেন।

শোনো, শোনো, সক্রেটিস সি গ্রেট, উনি কেমন মানুষ আমাকে চেনাতে এসো না।

মাতামহ এক-চাকলা হাসি ছাড়লেন। সরতে সরতে কখন পিতার পাশে সরে এসেছেন। মুখ দেখলে মনে হবে ফোর্টের র‍্যামপার্টে বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশেই বীর গোলন্দাজ।

মেসোমশাই এতক্ষণে পাঠশালা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন। বোধহয় মনে হয়েছে 'হোয়েন রোম বার্নস, নিরো ফিডল্‌স' গোছের ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। মানুষটি একটু একবগ্গা হলেও গোষ্ঠীপতি হবার গুণ আছে। সেই বিধুজ্যাঠাকে কেমন তেড়ে গেলেন ! আইনের রাজা। কিছুই ত তেমন জানা ছিল না। এইমাত্র পিতার কাছে আরও কিছু অতিরিক্ত পরিচয় পাওয়া গেল। জীবন একেবারে বেড অফ রোজেস ছিল না। রেঙ্গুন থেকে ভারতের হাঁটা পথে আরাকানের জঙ্গলে স্ত্রীকে হারিয়েছেন। এতক্ষণে বুঝেছি কেন একটু একবগ্গা। কাপড় দুভাঁজ করে লুঙ্গির মত পরছেন। ভুঁড়ি বেড়েছে, সেই মাপে গেঞ্জি ছোট হয়েছে। কষির ওপর পেটের অংশ টুকি করছে। মাঝখানে সিঁথি করে কুঁচি কুঁচি চুল পেতে আঁচড়ান। দুপুরে ছোটমেয়ে পিতাকে আদর করে সাজিয়ে দিয়েছে। অকৃতজ্ঞ পিতারা সেসব কথা লেখাপড়ার সময় বেমালুম ভুলে যান। মুকু বেচারার সেই সন্ধে থেকে আড়ং ধোলাই হচ্ছে।

মেসোমশাই রঙ্গমঞ্চে এবার নতুন ধরনের খেলা দেখালেন। কোনও কথা নেই। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে, ফোলা ফোলা মুখে, থপথপ করতে করতে সেই রণাঙ্গন ভেদ করে উত্তরে বারান্দার দিকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বেশ তেড়ে গলা ঝাড়লেন। টিনের চাল ঝনঝন করে উঠল। এবার রিটার্ন জার্নি। উলটো রথ। সেই ভাবেই তাকাতে তাকাতে ফিরে চললেন। ঘরের মাঝখান থেকেই উচ্চ কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, যতক্ষণ তোমার আয়ত্ত না হচ্ছে আজ ততক্ষণ চালাতে হবে। সে রাত একটা হোক, দুটো হোক, ভোর হোক। লাল মেঝের কালো বর্ডার বরাবর এসে বললেন, বেদান্ত বলছেন, স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে, স্বপ্নে যেমন দেখা যায়, গন্ধর্ব নগরং যথা, মায়ায় দেখা দেয় গন্ধর্ব নগর। চৌকাঠে পা রেখে টাল খেতে খেতে বললেন, তথা বিশ্ব ইদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণেঃ। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে বিশ্ব ও তদ্রূপ। তদ্রূপ শব্দটা ইচ্ছে করেই মনে হয় অত জোরে বললেন। অনেকটা বিদ্রূপের মত শোনাল।

মেসোমশাইয়ের আসা আর যাওয়াটা এত সুন্দর হল, লেডি ম্যাকবেথের ঘুমের ঘোরে হাঁটার মত। আমাদের অধ্যাপক প্ল্যাটফর্মে চোখ বুজিয়ে সুব্লাড, সুব্লাড করে হাঁটতে হাঁটতে একদিন হিসাবের ভুলে দমাস করে পড়ে গিয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। পড়ে গিয়ে ব্লাডি বলেছিলেন দাঁত কিড়মিড় করে। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মেসোমশাই বললেন, প্রয়োজন হলে ডাকবেন হরিদা।

প্রতাপ রায় বললেন, যাঃ বাবা।

মাতুল উঠে দাঁড়ালেন, কোলের ওপর থেকে কোঁচা পাটে পাটে, ধাপে ধাপে মেঝেতে নেমে এল। ভীষণ অপমানিত হয়েছেন। দুর্দান্ত রাগী মানুষ। এমন বেকায়দায় পড়েছেন রাগতেও পারছেন না। ফর্সা মুখ জবা ফুলের মত টকটকে লাল। কোঁচা ঝেড়ে হাতে ধরে বললেন, বেশ আমি চলে যাচ্ছি। আপনার নির্দেশ মনে থাকবে।

প্রতাপ রায় বললেন, বাড়ি মর্টগেজের ব্যাপারটা তা হলে কি হবে ? মিনিমাম দু'লাখ নিয়ে ফ্লোরে নামতে হবে।

সে হবে। এখন জামাইয়ের তোয়াজে আছেন। বাড়িতে ত ফিরতেই হবে। মর্টগেজ ডিড তৈরিই আছে, ধরে সই করিয়ে নোব। বাড়ি বাঁধা রেখে ত আর দু লাখ হবে না। সীমার গয়না বেচে কয়েকদিন কাজ চালাই।

মাতামহ আর্তনাদ করে উঠলেন, ওকে তোমরা ধরো। ওকে বাঁচাও। ফতুর হয়ে যাবে। সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

পিতা বললেন, উতলা হবেন না। ভাগ্যকে ধরে রাখা যায় না। It is all a chequer-board of nights and days/ where destiny with men for pieces plays. উতলা হবেন না। শুধু দেখে যান।

মাতুল রাগরাগ গলায় বললেন, ফিলমের কিছুই যখন বোঝেন না, তখন মন্তব্য না করাই ভাল। আমি পুডোভকিন হব, আমি গদার হব, আমি আইজেনস্টাইন হব। হয়ে দেখাব।

মাতামহ বললেন, এসব কি বলছে গো ? আমরা ছেলেদের ত বলতুম, বিদ্যাসাগর হও, বিবেকানন্দ হও, রবীন্দ্রনাথ হও। এরা আবার কারা ?

পিতা বললেন, জানো যখন কিছুই বুঝি না, তখন দয়া করে বোঝাতে এলে কেন ? তুমি হয়ত আবদুল করিম হতে পারতে, গোলাম আলি হতে পারতে। একেবারে দ্বিতীয় হতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারতে। তোমার ভাগ্য। ভাগ্যের ঘোড়া ছুটল বেরাস্তায়। বয়েস হয়েছে, যা ভাল বোঝো তাই কর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করবো। শুধু নাম নয় অর্থও। সাতদিন হাউসফুল হলে সব টাকা উঠে আসবে। চোদ্দ দিনে টাকা ডবল, আটাশ দিনে চার ডবল।

ব্যাস, ব্যাস, তাই করো। সেই চটে শুয়ে মুটে রাজার গল্প। সেই ফেরিঅলার গল্প। মনে নেই দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে সব ভেঙে চুরমার করেছিল। আমি তোমার কথা নয়, কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওল্ড জেনারেশন আর নিউ জেনারেশানে এই হল তফাৎ। টাকা সিন্দুকে রাখলে বাড়ে না। ছাতা পড়ে যায়। টাকা বাড়ে ব্যবসায়ে খাটালে। কোনও নন-বেঙ্গলি ব্যবসার নামে এমন আঁতকে ওঠে না।

বাঙালীর ব্যবসা আমার জানা আছে। তোমার এটা ব্যবসা নয়, ফাটকা।

রাজকাপুরের নাম শুনেছেন ? জেমিনী গণেশনের নাম শুনেছেন ?

প্রতাপ রায় বললেন, উত্তেজনায় তুই নাম গোলমাল করে ফেলেছিস। শিবাজী গণেশন। জেমিনী স্টুডিওর নাম। চন্দ্রলেখা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিল।

চন্দ্রলেখা ? তুমি চন্দ্রলেখা করবে ? চন্দ্রলেখা ?

কথায় কথায় পিতা কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করছিলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ফেটে পড়লেন বলে ! ভিসুভিয়াসের মুখ দিয়ে লাভা বেরোয়। পিতার মুখ দিয়ে লাভার বদলে চন্দ্রলেখা বেরোচ্ছে ছিটকে ছিটকে। কেউ না জানুক, আমি জানি কারণটা। এক ঢিলে দু'পাখি মারা হচ্ছে। চারদিকে তখন চন্দ্রলেখার খুব প্রচার। সাংঘাতিক, ফ্যাবুলাস, সার্কাস, সোর্ডফাইট। কে জানত ওর মধ্যে আরও সব উঁচু উঁচু ব্যাপার আছে। আমার কথাতেই পিতা সপুত্র সেই ছবি দেখতে গেলেন। সবচেয়ে দামী আসনে দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি। অন্ধকার ঘরে পিতা কখনও হরীতকীর টুকরো, কখনও যোয়ান, কখনও পাতলা কাগজে মোড়া লজেন্স এগিয়ে দিচ্ছেন। জিভ নানা রসে একেবারে চুর হয়ে আছে আরকের মত। কষা থেকে মিষ্টি, মিষ্টি থেকে ঝাল, ঝাল থেকে মিষ্টি। পিতার ওপাশে একসার যুবতী। আমার পাশে মধ্যবয়সী একসার গোঁফামারা ভদ্রলোক। অবশেষে বই শুরু হল হাতির তোলা শুঁড়ের জল ছিটানো দিয়ে। প্রথমটায় অত বোঝা যায়নি। বেশ চলছিল রাজারাজড়ার ব্যাপার। হঠাৎ শুরু হল ঢাকের ওপর যুবতীর নৃত্য। দক্ষিণী শরীর। যেমন নিতম্ব, তেমনি বক্ষ। চোখ ঠিকরে কোটর ছেড়ে

পর্দায় গিয়ে ঠোক্কর মারছে। নিচে সামনের সারির দর্শকরা নেচে নেচে উঠছে। দু-একজন চেয়ার ভেঙে পড়েও গেল। পিতা বললেন, হরিবল্। পেছনের দর্শকরা বললেন, চপ্। নর্তকীরা হঠাৎ পেছন দিকে চেত্তা খেয়ে পড়তে লাগলেন। জীবনে অমন 'কুচ যুগ' দেখিনি। কাঁচুলি ফেটে ফ্যাটাস করে বেরিয়ে না পড়ে। পিতা বললেন, হরেণ্ডাস। পেছনের দর্শক বললেন, চোপ্। এরপর মেয়েদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ছেলেরা, ছেলেদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে মেয়েরা চলে যেতে লাগল। মত্তপ্রমত্ত অবস্থা। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া। চন্দ্রলেখার কেরামতি দেখে রাজা কামার্ত হয়ে, হাউমাউ করে তেড়ে এলেন। পিতা বললেন, গেট আপ। হাত ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্যাসেজ পার করে হলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্রেফ দুটি কথা, আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তোমার এই টেস্ট হয়েছে। মাই গড ঠিক সেই সময় পাশ দিয়ে বোকা বোকা চেহারার এক ভদ্রলোক কাছাকোঁচা সামলাতে সামলাতে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি করেচে, নাক খুঁটেচে। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে ঝাঁকুনি মেরে পিতা বললেন, বাক আপ। ধড়ফড় করে সামনে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন, বাবারে। পিতা হেসে উঠলেন। শেষ লজেন্সটি হাতে দিয়ে বললেন, তোমার দোষ নেই। যেমন শুনেছ তেমনি করেছ। এসব ছবি কক্ষনো দেখব না। এসব হল নেগেটিভ পিকচার্স। ব্রেনওয়াশের জন্যে তৈরি। ক্যাপিটালিস্টদের চাল। নৈতিক ব্যাকবোন ভেঙে দিয়ে কল্পজগতের সরীসৃপ করে রাখার ষড়যন্ত্র। আর ইউ এ হিউম্যান ফডার ফর দেয়ার ক্যাননস্ ? পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। নাকে চাপা, নাকে চাপা বলে পিতা পকেটে রুমাল খুঁজতে লাগলেন। আঁধি উঠেছে আঁধি। সেই চন্দ্রলেখার নাম শুনে পিতা ত লাফাবেনই।

প্রতাপ রায় বললেন, চন্দ্রলেখা ভেরি সাকসেসফুল ছবি। বক্স অফিস স্ম্যাশ করে দিয়েছে। ভেরি সিম্পল ফর্মুলা। একটু বীররস, একটু রোমান্স, আর একটু সেক্স। (শেষ কথা দুটি বলার সময় ঠোঁট দুটো ছুঁচোর মত সামনে উল্টে এল, বাঁ চোখ ছোট হয়ে শর্টসার্কিট বাতির মত তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল।) সব একসঙ্গে তাল করে চিটে গুড় দিয়ে মেখে ফুরফুরে অম্বরী তামাক

পিতা বললেন, তোমার ভূমিকাটা কি ? তখন থেকে ফড়ফড় করছ ! তোমার মুখ দেখলে এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সেই চেশায়ার ক্যাটের কথা মনে পড়ছে, এ গ্রিন উইদাউট এ ফেস। কোনও কোনও প্রাণী শাঁকালু দেখলে ওই ভাবে হাসে। তোমার এই বোকা সেন্টিমেন্টাল বন্ধুর টাকাকে শাঁকালু ভেবে হাসিটা মুখে পার্মানেন্ট হয়ে গেল নাকি ?

পিতার কাঁধের পাশ থেকে মাতামহ বললেন, ওটা হল ফেউয়ের হাসি

প্রতাপ রায়ের অসম্ভব সহ্য শক্তি। এতটুকু না রেগে বললেন, বড় বড় গাইয়েদের সঙ্গে তাল মেরে ফিরি তাই হাসিটা মুখে লেগেই থাকে। এই ছবি করার ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন ভূমিকাই নেই পিতৃদেব কিছু টাকা, একটা বাড়ি, বিলিতি একটা গাড়ি রেখে গেছেন, বিয়েথা করিনি, ওস্তাদ মেরে বেড়াই, সেই টাকারই কিছু শ্রাদ্ধ হবে। শাঁকালু আমি দেখিনি, শাঁকালু দেখেছে আপনার শ্যালক।

পিতা এবং মাতামহ দু'জনেই একেবারে থ হয়ে গেলেন। এও সম্ভব। জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে। মাতুল বললেন, প্রতাপ, তুই শেষে আমাকে ভাল্লুক ভাবলি ?

ওঁরা যে আমাকে ভাল্লুক ভেবেছিলেন ?

পিতা বললেন, এমন একটা প্রতিভা ভুলপথে চলে নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বারণ করতে পারছ না ?

করেছিলুম। শুনবে না। ব্যাপারটা জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে। হতে চেয়েছিল মিউজিক ডিরেকটার। ল্যাং মেরে দিয়েছে। সেই থেকে গোঁ চেপেছে, নিজে ছবি করবে, সেই ছবির মিউজিক ডিরেক্টর হবে। নৌশাদ-ফৌশাদ সব তলিয়ে যাবে।

পিতা হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে চেয়ারে বসলেন। আরে, বোসো বোসো। আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে হে।

মাতুল ইতস্তত করছেন। উঠে যখন পড়েছেন তখন বসা কি আর উচিত হবে। হাসি শুনে দর্শন ছেড়ে মেসোমশাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে ?

আপাতত। বিনয়দা আসুন। অনেকক্ষণ কচলাকচলি করেছেন। মেয়েটাকে এবার একটু রেস্ট দিন। মাতুলের দিকে তাকিয়ে সামান্য বিরক্তির গলায় বললেন, কি হল তোমার ? বসতে বললুম না ?

বসার সাহস পাচ্ছি না।

সে কি ? তুমি চন্দ্রলেখা করে ঢাকের ওপর মেয়েছেলে নাচাবে, তোমার সাহস নেই ?

মেসোমশাই চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ঢাকের ওপর কেন ? লাল মেঝেতে কিংবা কার্পেটের ওপর নাচালে ক্ষতি কি ? ঢাকের ওপর থেকে দুম করে পড়ে গেলে কি হবে ?

আরে মশাই, এ ঢাক সে ঢাক নয়, জয়ঢাক। শ্রাদ্ধের সঙ্গে তিলকাঞ্চন।

মাতুল বসে পড়লেন। আমতা আমতা করে বললেন, কই আমি ত চন্দ্রলেখার কথা বলিনি। আমি এমন একটা ছবি করব, যে ছবি মানুষের চোখের জল টেনে বের করে আনবে। শিল্পীর বঞ্চিত জীবন। প্রতিভা আছে সুযোগ নেই। গোটা আঠারো গান থাকবে। সব রাগরাগিণীর ওপর। দরবারী, বাগেশ্রী, মালকোষ, দেশ। সব কম্পোজ করা হয়ে গেছে।

শেষ দৃশ্যে নায়কের টি বি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক। দরবারীর ওপর বেস করে গান। তেমনি বাণী!

হৃদয়বিদারক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। 'এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই।' এক এক লাইন গাইছে, আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাশছে, এক ঝলক রক্ত উঠছে আর দরবারীতে এ জীবন, এ জীবন করছে। তাই ত ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে অবিকল।

মাথায় আর কিছু এল না ?

কেন ?

দুঃখ, মৃত্যু, প্রেম, এছাড়া কিছু ভাবা যায় না ? কেন, টকি অফ টকিজ কি মানময়ী গার্লস স্কুলের মত একটা বই করা যায় না!

ওসব এখন চলবে না। মানুষের মনের ভেতর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে হবে। মানুষ এখন কাঁদতে চায়। বেদনায় জন্ম নেবে যন্ত্রণার শতদল, জীবনের ইতিহাস লেখা হবে রক্তের অক্ষরে, জীবনের মূল্য শুধু অশ্রুজল, তৃণ শীর্ষে শিশিরের ক্ষণস্থায়ী বিন্দু।

ও, তোমার ত আর্টস ছিল। সবেতেই তাই এলিয়ে পড়। জীবনে চোখের জল ত আর ফেলতে হল না। তাই চোখের জল নিয়ে কাব্য করতে পারছ। তবে হ্যাঁ, যে লাইনে নাক গলাতে চলেছ তার শেষটা অবশ্য অশ্রুজলেরই কাব্য। তুমি ত সাহিত্যের ছাত্র ছিলে, পড়ছ কিনা জানি না, ভার্জিল থেকে দুটো লাইন বলি, Human deeds have their tears and morality touches the heart.

আমি তা হলে কি করব ?

প্রথমে তুমি তোমার পিতার কাছে ক্ষমা চাইবে। তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, আমাকে শুভবুদ্ধি দাও।

আমার অপরাধ ?

সে কি ? তোমার অপরাধ, তুমি জান না ? প্রথম অপরাধ, পিতাকে অপমান।

মাতামহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনারা দেখছি এজলাস বসিয়ে ফেলেছেন।

তা বলতে পার। পাশে জজসাহেবও বসে আছেন, বিনয়দা। তোমার দ্বিতীয় অপরাধের বিচার এখন হবে না, হবে পরে। সেটা হল বুদ্ধিবৈকল্য।

মাতামহ বললেন, ক্ষমা চাইতে হবে না। ও ত ছেলেবেলা থেকেই এইভাবে কথা বলে। মা-মরা ছেলে।

পিতা বললেন, জানি, জানি, ও ত আমার কাছেই মানুষ। আজই না হয় আতর মাখা ওস্তাদ হয়েছে। অতীত সহজে ভুলতে পারে বলেই বর্তমানে মানুষের তুড়িলাফ। অতীতের সব ছবি আমার চোখের

সামনে জ্বলজ্বল করছে। হয়ত বয়েস বাড়ছে বলেই। বর্ষার রাত। ওর দিদি ডিম দিয়ে খিচুড়ি রেঁধেছে অনেক রাত হয়ে গেছে। ওই টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। চাদর মুড়ি দিয়ে এই বাবু তখন ঘুমে কাদা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি। বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে আসনে বসিয়েছি। মাথা ঢুলে পড়ছে। আমি ধরে আছি, ওর দিদি একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছে। এক এক চামচে তুলছে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে পাখির ঠোঁটে পুরে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। এমন কি ওর দিদির নাকের নাকছাবির হীরের ঝিলিকটি পর্যন্ত চোখের সামনে খেলে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত মিল দু'জনের মুখের। ওকে দেখছি, ওর দিদির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা তিনজন একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছি। ভোরে আমার এস্রাজের সঙ্গে গলা সেধেছে। সে-মিলন আর সে-বিচ্ছেদ কোথায়? সেই রাত, সেই দিন, মাস, বৎসর কোথায়? বোহ্ ফিরাক অওর বোহ্ বিসাল কহাঁ॥

বোহ্ শব ও রোজ ও মাহ্ ও সাল কহাঁ॥

মাতুল চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, আমি ক্ষমা চাইছি।

মাথা নিচু করে প্রণাম করতেই পিতা পিঠে হাত রেখে বললেন, বড় রোগা হয়ে গেছ। সে যত্ন আর কোথায় পাবে?

আমিও একটু কাব্য করে বলি, যার ছিল তারা আর নেই, যারা পড়ে আছে, তারাও ত থাকবে না চিরদিন, কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে পারি, তারপর তুমি একা। তোমার শান্তি, আমাদের গান শোনাও। আজ হল গজলের রাত। কি বিনয়দা, অসুবিধে হবে না ত?

কিছুমাত্র না। সেই সকাল থেকে পড়িয়ে পড়িয়ে নিজেকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে টিয়াপাখি।

হ্যাঁ, ওই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কিছুক্ষণ জিরেন পাক।

প্রতাপ রায় বললেন, কিন্তু সেই গল্পটা?

ও, সেই গল্প! তুমি ঠিক মনে রেখেছ দেখছি! সেই ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের গল্প।

পিতা হাসতে লাগলেন। আমি ফরাস বিছোতে শুরু করলুম। আসর বসবে।

প্রেমের তিন পর্ব

পারস্যের গালিচা। কে কিনেছিলেন জানি না। তবে রবিবার রবিবার এই বস্তু জীবন বের করে ছেড়ে দেয়। মানুষের চেয়েও যত্নে থাকে। নরম বুরুশ দিয়ে বুনোন বরাবর ঝাড় আর গোল করে গুটিয়ে রাখ। ব্রাশ অ্যাণ্ড রোল, রোল অ্যাণ্ড ব্রাশ। আবার খোলা মুখ দিয়ে ইঁদুর না ঢোকে। দুটো মাথায় কাপড় জড়াও।

ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ সেই গালচে পড়েছে। বুকে লতাপাতার কারুকার্য। পাড় বসান। নরম দূর্বো ঘাসের মত জমি। কনক খুব সাহায্য করেছে। টানা হ্যাঁচড়ায় খোপা ভেঙে গেছে। পিঠের ওপর দুলছে সাপের কুণ্ডলীর মত। আমার ওসব দেখা উচিত নয়। তবু নজর চলে যাচ্ছে। বয়েসের দোষ। বগলের কাছে ব্লাউজ টাকার মত গোল হয়ে ঘামে ভিজে উঠেছে। হালকা নীল ওই জায়গাটা গাঢ় নীল হয়েছে। আবহাওয়া যত শীতলই হোক ওই জায়গাটা ঘামবেই। কাঁধ আর ওপর বাহুর সন্ধিস্থল পায়রার বুকের মত গরম। তোমার তাতে কি? কার্পেট পাতছ পাত, অন্যদিকে নজর যাচ্ছে কেন? মিটমিটে শয়তান।

হামা দিয়ে বসেছিলুম। কনক সামনে ঝুঁকে কার্পেট সমান করতে করতে পিছু হটছিল, ঘাড়ে এসে উলটে পড়ল। রেগে গেছে। আচমকা এমন ঘটনা ঘটলে সবাই রাগবে। আমিও রেগে যেতুম। আমার পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পেছনে চিৎপাত। পা জোড়া এখনও আমার পিঠে। মোমের মত মসৃণ গোড়ালি দু'চোখের কোণে ঝিলিক মারছে। নিতম্বের ঘর্ষণে পিঠ গরম হয়ে উঠেছে। চোখে শাড়ির

নিম্নাংশের ঝাপ্‌টায় জল এসে গেছে। ব্যাপারটা বিশ্রী হলেও মধুর। মানুষের মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ার ঘটনা খুব কম কোষ্ঠীতেই লেখা থাকে। কনক যদি মাতুলের ছবিতে নায়িকা হয় আমি নির্ঘাত আত্মহত্যা করব।

পিঠ থেকে পা তুলে নিয়ে কনক বললে, কি যে তখন থেকে বেড়ালের মত পায়ে পায়ে ঘুরছ। পইতেতে পা লেগেছে?

কি জানি? খেয়াল করিনি।

ইস্‌ পাপ হয়ে গেল। দাঁড়াও একটা প্রণাম করি।

প্রণাম? পাগল নাকি?

ওপাশের ঘরে চেয়ার সরাবার শব্দ হল। চট করে উঠে দাঁড়ালুম। দু'জনকে কার্পেটে এইভাবে গড়াতে দেখলে, এ বাড়িতে আমার দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। এলোমেলো শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে কনকও উঠে দাঁড়াল। কনকের পাপ হবে কেন? পাপে আমি নিজেই মজে গেছি। ক'দিন থেকেই নিজেকে লক্ষ্য করছি, পুণ্যের চেয়ে পাপের আকর্ষণ হাজার গুণ বেশি। দেবতা হবার বাসনা তলিয়ে গেছে। অসুর হতে চাই। আমায় দাও মা অসুর করে, কাজ নেই আমার দেবতা হয়ে। স্বর্গপুরীর হর্ম্যে না কি দেদার হুরি বসত করে/সেথায় না কি অঢেল সুরার ঊর্মিমুখর ঝর্না ঝরে/পুণ্যবানের কাম্যভূমির মর্ম যদি /দোষ কি তবে বরণ করার আগেই এদের মর্ত পরে? এসো খৈয়াম এসো। তোমাকে নিয়ে ও মরূদ্যানে পালাই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংসার বড় একঘেঁয়ে। Those who have gone before us; O Cupbearer, are sleeping in the dust of Self-pride. অহংকারের অট্টালিকায় নির্বাসিতের হাহাকার। বেশ বলেছিস ব্যাটা।

দেয়ালে আমার মাতৃদেবীর ছবি সন্ধের ঝোড়ো বাতাসে একটু হেলে গিয়েছিল। পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে শরীর উঁচু করে কনক ছবিটাকে সোজা করছিল, এমন সময় মাতুলের প্রবেশ। আমার চেয়ে অন্তত হাতখানেক বেশি লম্বা। পদক্ষেপের আগে আগে কোঁচা চলেছে লাথি খেতে খেতে। কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কনক?

কনকের গোড়ালি মাটি স্পর্শ করল। ছবি নিয়ে বেচারা তন্ময় ছিল। আমি সাহায্য করলে ব্যাপারটা নিমেষে হয়ে যেত। ইচ্ছে করেই করিনি। স্বার্থ ছিল। বেশ লাগছিল দেখতে। কেমন ডিঙি মেরে মেরে হুকের নাগাল পেতে চাইছিল। দীর্ঘকাল এ বাড়িতে শুধু পুরুষেরই রাজত্ব ছিল। সকাল সন্ধে মিলিটারি মার্চ করছে। আদেশ ছিটকোচ্ছে ছিটে গুলির মত। অ্যাটেনশান। অ্যাবাউট টার্ন। ফরোয়ার্ড মার্চ। সেই কঠোরে কোমলের স্পর্শ লেগেছে। ফুটিফাটা জমিতে বৃষ্টি নেমেছে।

কনক হাসিহাসি মুখে ফিরে তাকাল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম কনক।

তুমি গান জান? মাতুল কার্পেটে প্রমথেশ বড়ুয়ার মত পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন। গুনগুন করে গানের সুরও ভাঁজছেন। মেজাজ আসছে। আসতেই হবে। এ ঘরে কম গান হয়েছে? বড় বড় আসর বসেছে, রাতের পর রাত। এ ঘরের দেয়ালও গান গাইতে পারে।

কনক হাসিহাসি মুখেই বললে, অল্পস্বল্প।

সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মাতুলের প্রশ্ন, নাচ আসে?

আজ্ঞে না।

আসা উচিত ছিল। তোমার বিউটিফুল নাচের ফিগার।

আমার দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন, কি রে! তোর রেওয়াজ-টেওয়াজ হচ্ছে?

একেবারেই না।

তুই আমার নাম ডোবাবি ব্যাটা। আজ আমার সঙ্গে বোস। গানে গলা দিবি।

কোঁচায় লাথি মারতে মারতে, কার্পেটের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মায়ের ছবির সামনে গিয়ে হয়ে দাঁড়ালেন। চিত্রার্পিত পুত্তলিবৎ। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে কাচ মুছলেন।

মৃতের সঙ্গে জীবিতের ভাষাহীন আলাপন চলেছে। কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, আজ তোমাকে গ শোনাব।

আমাদের দিকে যখন ফিরে তাকালেন, তখন অন্যভাব। মুখে বিষণ্ণতার প্রলেপ। রিমলেস চশম আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। একটু যেন জল চিকচিক করছে।

যন্ত্র বের করো, যন্ত্র বের করো বলে পিতা সদলে কুচকাওয়াজ করে ঘরে ঢুকলেন। হাতে দুফা কাপড়। নিশানের মত পতপত উড়ছে। একই সঙ্গে চামেলী আর বকুলের সুবাস। আতর ঢেলেছেন বাতাস এখনও ভিজে ভিজে। পাতা নড়লে এখনও জলের ফোঁটা ঝরছে। সেই বাতাস ফুলের গ কতদূর যে পৌঁছিয়ে গেল। কালিদাসের কালে। ওয়াজেদ আলির লক্ষ্ণৌতে। সাজাহানের দিল্লিতে ওমর খৈয়ামের পারস্যে। কাল কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। চরিত্রে চেহারাও যেন পালটে গেছে। মাতামহকে মনে হচ্ছে পুত্রের হাতে বন্দী সাজাহান পেছন পেছন মু আসছে জাহানারার মত। মাতামহর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সব ভুলে গেছেন। সিনেমা, বাড়ি বন্ধ গয়না বিক্রি, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও আর মনে লেগে নেই। এখনই হয়ত অহীন্দ্র চৌধুরীর ম কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকবেন, না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনি এসেছে। এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র। এ মণিমুক্তো মুকুট তোমার ! আর মার্জনা ? ঔরংজী ঔরংজীব। না সেসব মনে করব না। ঔরংজীব ! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

জাহানারার সকাল থেকেই সর্দি হয়েছে। ফুঁচুত করে হাঁচি হল। মুকু ঘাড় হেঁট করে হাঁচে। হাঁচ পর আরও কিছুক্ষণ নিচু হয়ে থেকে মুখ তুলে অপাঙ্গে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বড় লজ্জার কাজ ক ফেলেছে। হেঁচে ফেলেছে। নবাব ওয়াজেদ আলির মত পিতা মধ্যমণি হয়ে বসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তি বলে উঠলেন, অ্যাকোনাইট থার্টি। মাতামহ বললেন, মাঝরাতে এক ডোজ ডালকামেরা। প্রতাপ র কোঁচা সামলে বসতে বসতে বললেন, কিস্যু না, স্রেফ গরম জলে একটা পাতিলেবু কষকষে করে নিঙ একটু নুন দিয়ে খেয়ে নাও। মাতুল বললেন, কষা মাংস আর ফুলকো লুচি। মাতামহ বললেন, অ দিয়ে গরম চা। মেসোমশাই বললেন, ভোরবেলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। মুকু ধীরে ধীরে দরজার দিকে সর আরম্ভ করেছিল। টুক্ করে চৌকাঠ টপকে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে ফুচুত করে ত একটি হাঁচির শব্দ ভেসে এল।

কনক আর আমি যন্ত্রপাতি বের করছিলুম। হারমোনিয়াম, বাঁয়াতবলা। পিতা বললেন, এস্রাজট নামাও। অনেকদিন বাজান হয়নি। ছড়টড় কি অবস্থায় আছে, কে জানে ?

হারমোনিয়ামটা বেজায় ভারি। দু'জনে ধরাধরি করে এনে কার্পেটের মাঝখানে ধপাস ফেললুম। প্রতাপ রায় উঠব উঠব করছিলেন। কোঁচায় কাছায় জড়াজড়ি হয়ে গেছে বলে রক্ষা গেল কনক। নয়ত তেড়ে এসে সরো সরো বলে আমাকে একপাশে চিৎপাত করে দিয়ে কনকের স একটু দহরম-মহরম করার চেষ্টা করতেন।

পিতা খোল থেকে এস্রাজ বের করে নরম এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ধুলো পরিষ্কার লাগলেন। আমাকে বললেন, ওহে রজনটা বের কর।

মাতুল হারমোনিয়ামের রিডের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে এপাশ থেকে ওপাশে বার কতক আ চালালেন। অনামিকায় আঙটির পাথর ঝিলিক মেরে গেল। সুরের গমকে ঘরের বাতাস চমকে উঠল। এস্রাজে ছড় টেনে অষ্টকুটি একটা শব্দ বের করে পিতা বললেন, বহুত্ আচ্ছা। তোমার এসে গেছে।

প্রতাপ রায় তবলায় তড়াং করে একটা চাঁটি মারলেন। মেরেই বললেন, অ্যাঃ, ট্যাপ্ ট্যাপ্ করছে কতদিন হাত পড়েনি ? হাতুড়ি কই, হাতুড়ি ?

এই রে, তবলা ঠোকার সেই ছোট্ট হাতুড়ি যে প্রায়ই হারিয়ে যায়। খুঁজে পাওয়াই যে মুশকি পিতা অধৈর্য হয়ে বললেন, কি হল, পেলে না ? পাবে না জানি। এ বাড়িতে কোনও একটা নেই। না পাও কয়লা ভাঙা হাতুড়িটাই আনো।

যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে সেই সুদৃশ্য হাতুড়ি অবশেষে বেরলো। এস্রাজের ছড়ে রজন ঘষতে ঘষতে পিতা বললেন, কোথায় ছিল?

আজ্ঞে, আপনারই যন্ত্রপাতির বাক্সে।

প্রতাপ রায় তবলা ঠুকতে ঠুকতে বললেন, পাউডার আছে?

এ বাড়িতে পাউডারের পাট নেই। তবে ফ্রেঞ্চচক আছে। সে বস্তু যে জায়গায় আছে তার নাগাল পেতে হলে চেয়ার চাই। কনক বললে, পাউডার? আমি এনে দিচ্ছি। খুব বাঁচিয়েছে। টঙে চড়ে আলমারির মাথা থেকে চক নামাতে হলে আসর মাথায় উঠত।

প্রচুর ঠোকাঠুকি করে তবলা সুরে বাঁধা হল। মাতুল বলতে লাগলেন, গাঁট্টায় মারো,গাঁট্টায় মারো। উঁহুঁ ডানদিকটা এক পর্দা নেমে আছে।

মাতুলের সাংঘাতিক কান। তার চেয়েও সাংঘাতিক কান পিতার। হাতে পাউডার ঢেলে তবলার গাবে প্রতাপ রায় ভাল করে মাখলেন। ওপর দিকে দু'হাত তুলে জয় নিতাইয়ের ভঙ্গিতে নিজের তালুতে বেশ করে ঘষলেন। মাতুল হারমোনিয়ামে একটা সাপটা তাল বাজিয়ে সুরের মুখটি সবে ধরতে যাচ্ছেন, পিতা উঁহুঁ, উঁহুঁ করে উঠলেন। মাতুলের ভুরু কোঁচকাল।

সুরটা দাও, সুর, যন্ত্রটা বেঁধে নি।

তিন সপ্তক এস্রাজ বাঁধার কাণ্ডকারখানা আমার দেখা আছে। এর চেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার আর কিছু নেই। শ্রোতাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। তারে টুসকি মেরে মেরে, কানে মোচড় দিয়ে দিয়ে প্রতিটি পর্দাকে সুরে ভেড়াতে হবে। মাতুল উসখুস করছেন। আঙুল মাঝেমাঝে টেঁপা সুরের বাইরে গিয়ে খেলে আসছে। গানের মুখ লিক করে বেরিয়ে পড়ছে। পিতা অমনি উঁহুঁ করে ছটফটে মাতুলকে বশে আনছেন।

এইভাবে চললে রাত দুটোর আগে গানে আসা যাবে না। তরফের কান সহজে ঘুরতে চাইছে না। মটমট শব্দ করে সুরে পা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। পিতা ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, গেল গেল।

মাতুল শেষকালে সাহস করে বললেন, আমার ভীষণ গান পেয়েছে। আর চেপে রাখতে পারছি না।

পিতা বললেন, আর একটু ধৈর্য ধরো, আর একটু, প্লিজ। এক মেটে বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছি।

এস্রাজ কাঁধে উঠল। মাতুল ইমনে আলাপ ধরলেন। নিখাদ থেকে কোমল ঋষভ হয়ে যখন সুরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন অচেনা রাস্তা খুলে যাচ্ছে। কড়ি মধ্যম ছুঁয়ে যখন ওপরে উঠছেন সুর যেন আকাশের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করছে। রাগিণীর বিরহী রূপ সুরের দু'চার চলনেই স্পষ্ট। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নীল শাড়ি পরা কনক। বাকি সব অবলুপ্ত। রাজকাপুরের ছবির ধোঁয়া ভেদ করে নার্গিস যেন বেরিয়ে আসছে। মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহংপ্রাপয়।

মাতুলকে পিতার এস্রাজ জবরদস্ত অনুসরণ করেছে। দু'জনেই দু'জনকে বাহবা দিচ্ছেন। প্রতাপ রায়ের আঙুল তবলার ওপর ছটফট করছে। এখনও গানের মুখ আসেনি। বোল ফোটাতে পারছেন না। ঝট করে গানের মুখ এসে গেল। একেবারে সাঁচ্চা গজল,

সব কহাঁ কুছ লালা বগুল মেঁ নুমায়াঁ হো গয়ী।
খাক মেঁ ক্যা সুরতেঁ হোগী কি পিনহাঁ হো গয়ী॥

সব তো পাওয়া হল না। কিছু ফুল, কিছু পুষ্পবল্লরী, এতে আর কতটুকু প্রকাশ। মাটির যে আসল সৌন্দর্য সে ত সব লুকিয়েই রইল। সব কহাঁ কুছ লালা বগুল মেঁ।

মাতুল-গর্বে বুক দশহাত হয়ে উঠছে। কি গাওয়াই গাইছেন। দুমড়ে মুচড়ে নিঙড়ে হৃদয়ের আবেগ উজাড় করে দিচ্ছেন। এসব মানুষের কি দরকার কাউকে পরোয়া করে চলার? দুই বোন পাশাপাশি বসেছে। কনকের রাতের রান্না মাথায় উঠেছে। মেসোমশাই মাঝেমাঝে আহা আহা করে উঠছেন। মেসোর আহা শুনে মাতামহ হুঁহুঁ করে এক ধরনের হাসি হাসছেন, যার অর্থ দ্যাখো, ছেলে আমার কোন্ কোটির মানুষ! ঈশ্বরকোটির জীব।

হো গয়ী বলে মাতুল দুরূহ একটা কাজ সবে শেষ করেছেন এমন সময় সিঁড়িতে হুড়মুড় করে একটা

শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে গলা শোনা গেল, সিলিপ করে পড়ে গেলুম যে রে বাপ। গাইয়ে, বাজিয়ে, তবলচি কেউ না শুনতে পান, আমার কানে এসেছে। অচেনা গলা। আসর ছেড়ে ওঠার আগেই তিনি দরজার সামনে চলে এসেছেন জবা এসেছে ? জবা ?

আরে, এ যে সেই জবাদের বাড়ির ধেড়ে বাবুটি। মনে হয় জবার স্টেপ ফাদার। আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ, যার হেড সুখেন, এখনও পরিচয় বের করতে পারেনি। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জবা এসেছে ? জবা ?

মাতুল গান বন্ধ করলেন, হারমোনিয়ামে সুরের শেষ টানটি মেলায়নি। তবলার শেষ চাঁটি মাঝ বাতাসে পাখির মত উড়ছে। এস্রাজ নিখাদে এসে ন্যাজ গুটিয়েছে। পিতা এস্রাজটিকে কোলের ছেলের মত সাবধানে কার্পেটে শুইয়ে রেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই অসুর ? কি চাইছেন ?

মুখে সেই কদাকার কাঁঠাল-কোয়া-হাসি। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, জবা আছে ? জবা ?

মাতামহ পালটা প্রশ্ন করলেন, কেন ? রক্ষেকালী পুজো আছে নাকি আজ ? এই রাতে জবাফুল পাবেন কোথায় ? পিতা এস্রাজ তুলে নিতে নিতে বললেন, চোখের জলে পুজো করুন, চোখের জলে পুজো, বেস্ট পুজো। ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে না পেরে আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, সেই দুপুর থেকে জবাকে পাওয়া যাচ্ছে না; এত রাত হল, সেকি এখানে এসেছে ?

পিতার এস্রাজ আবার স্কন্ধচ্যুত হল। শূন্যে ছড়ি ঘুরিয়ে অর্কেস্ট্রার কনডাকটারের মত ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলেন, ইনি কি চাইছেন বল ত ?

প্রতাপ রায় বাঁয়ায় গফা গফা আওয়াজ করে প্রশ্ন করলেন, কে জবা ?

ভদ্রলোক বললেন, সেই জবা যাকে ওই ছেলেটি মাঝে মাঝে ছাত থেকে ফুল ছুঁড়ে দেয়।

অ্যায় মরেছে। ব্যাটা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে। এইবার কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দ্যাখো। কপালে আজ এই লেখা ছিল ঈশ্বর। পিতার হাত থেকে ছড়ি খসে পড়ল, কি বললেন ? আমার ছেলে জবাকে চন্দ্রমল্লিকা ছুঁড়ে মারে ? আপনি এতদিন আমাকে বলেননি কেন ? ঘুমোচ্ছিলেন, থানায় ডায়েরি করেননি কেন ?

মেসোমশাই বললেন, উঁহুঁ, ডায়েরির স্টেজে এখনও আসেনি। যতক্ষণ না শ্লীলতাহানি হচ্ছে, ইনডিসেণ্ট জেসচার হচ্ছে ততক্ষণ পানিশেবল অফেন্স হচ্ছে না। এ কেস ফেল করবে। যত বড় বাঘা ব্যারিস্টারই হোক না কেন আসামী খালাস পেয়ে যাবে। তারপর দেখতে হবে যাকে ফুল ছুঁড়ে মেরেছে সে সাবালিকা না নাবালিকা ? সাবালিকা হলে তার কনসেণ্ট ছিল কিনা ? যদি প্রতিবাদ করে থাকে তাহলে সে প্রতিবাদের সাক্ষী কে ? তাছাড়া ফুল যে ছুঁড়ে মেরেছেন বলছেন তার কোনও সাক্ষী আছে ? প্রমাণ কি ফুল ছুঁড়ে মেরেছে ? কেস ডিসমিসড। আসামী বেকসুর খালাস। আসামী এখন অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। হাজার দশেক টাকা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

মাতুল বললেন, মামলা যখন খারিজ হয়ে গেছে তখন আবার গান ধরা যেতে পারে ?

পিতা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফলস্ অ্যালিগেশান। নাও ধরো।

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, আমি মামলা করতে আসিনি। আপনার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই। তবে আজকাল ভাবভালবাসার যুগ পড়েছে ত, তাই ভাবলুম জবা যদি এখানে এসে থাকে। এত বড় বাড়ি, শুনেছিলুম একটিও মেয়েমানুষ নেই, উঠতি বয়েসের মেয়ে, উঠতি বয়েসের ছেলে, ঝড় বাদল হচ্ছে। বলা ত যায় না, কি থেকে কি হয়ে যায়। যদি একবার হয়ে যায় !

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়ে যায় ?

আজ্ঞে এই জোড়কলম আর কি।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর অশ্লীল কথা বলছে, অনুমতি দাও। জুতোজোড়া এখনও প্রায় নতুন আছে। পিতা বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, অ্যাকশান ত আমিও নিতে পারি ; তার আগে অভিযোক্তাকে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শপথ করো, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না, যাহা সত্য তাহাই বলিব।

প্রশ্ন : জবা কে ?
একটি মেয়ে।
কোথায় থাকে ?
যেদিকে চন্দ্রমল্লিকার টব, সেই ছাদের দিকের লাগোয়া বাড়িতে।
আই সি, যে বাড়ির মেয়েরা অন্তর্বাস পরে পুরুষদের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। আপনি সেই ড়ির নিন-কম-পুপ। আজ্ঞে, আপনি আসতে পারেন। ফুল ছুঁড়েছে ? সে ত নরম জিনিস। ইট ছোঁড়া চিত ছিল। থান ইট, আধলা ইট।
ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি, আপনি রাগী মানুষ। রাগী হলেও পরোপকারী, দয়ালু, শিক্ষিত, াদর্শবান। বিপদে পড়ে এসেছিলুম আপনার কাছে। আমার দাদা পাঞ্জাবে বড় চাকরি করতেন, উদিরা সেখানেই ছিলেন, তাই বাঙালীর হালচালের সঙ্গে মেলে না।
প্রতাপ রায় প্রশ্ন করলেন, বউদিরা মানে ?
আজ্ঞে দুই বিবাহ।
অ্যাঁ বলেন কি, দু দুটো বউ।
বলেন কেন আর সামলাতে পারছি না।
প্রতাপ রায় কাবাবের গন্ধ পেয়েছেন। সাগ্রহে বললেন, বসুন, বসুন।
ভদ্রলোক এতক্ষণ কদমতলায় কেষ্টঠাকুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। কার্পেটের কপাশে বসলেন। সাবান আর পাউডারের বোদা গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে। মাথার চুলে ফুলেল তল। প্রতাপ রায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে সামলাতে হচ্ছে কেন ?
আজ বছর পাঁচেক হল, দাদা নিরুদ্দেশ। মনে হয় বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছেন।
মেসোমশাই টাস টাস করে টুসকি মেরে কনক আর মুকুকে দরজার সামনে থেকে ওপাশে সরে যেতে লেন। খারাপ খারাপ কথা হচ্ছে, মেয়ে বকে যাবে। মাতামহ বলে উঠলেন, বলেন কি, এক ঢিলে 'পাখি। দু-দুটো বউ বিধবা !
বউদিরা অবশ্য বিধবার সাজপোশাক পরেন না। মাছ, মাংস, ডিম সবই চলে। দাদা মারা গেছেন সে মাণ ত নেই। যা হবে সেই বারো বছর পরে।
পিতা প্রশ্ন করলেন, আপনার কি করা হয় ?
পোস্তার বাজারে মশলার পাইকার।
মাতামহ অমনি বলে উঠলেন, ও ব্যাটা গন্ধবেনে।
মাতুল ক্ষমা চাইলেন, কিছু মনে করবেন না, ব্যাটা বলাটা ওনার মুদ্রাদোষ।
প্রতাপ রায় বললেন, আপনার কি মনে হচ্ছে জবা পালিয়েছে ?
মাতামহ বললেন, অমন বাপের মেয়ে পালাবেই। দ্রৌপদীর মত পঞ্চস্বামী গ্রহণ না করে থামবে না। ারপর বস্ত্রহরণ। পিতা বললেন, বড় অসংলগ্ন কথা হচ্ছে। জবা পালাক ক্ষতি নেই। প্রেমের তন পর্ব। প্রথম পর্বে বুদ্ধিবৈকল্য। কাচে কাঞ্চন ভ্রম। দ্বিতীয় পর্বে দ্বিত্ব। তৃতীয় পর্বে যথাস্থানে দ্বরাগমন ও খেল খতম। সবই হল অপসৃষ্টির উত্তাপ। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ততই ভাল। আপনি তার খোঁজে এখানে এলেন কেন ?
আপনার ছেলের সঙ্গে ছাতে ছাতে একটু কথা চালাচালি হত ত। তাছাড়া এই চিঠিটা হঠাৎ হাতে গেল।
চিঠি ? সভাসদরা সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।
আজ্ঞে হ্যাঁ চিঠি। মনে হয় আপনার ছেলের লেখা।
মেসোমশাই বললেন, মনে থাকে যেন হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট কল করা হবে।
আমি ত মামলা করতে আসিনি। জবার সন্ধানে এসেছি।
পিতা বললেন, ঠিক আছে, আগে হস্তাক্ষর মেলান হোক, তারপর কি লিখেছে দেখা যাবে। কনক !

পিতার ডাকে কনক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

এর যে কোনও একটা হাতের লেখা নিয়ে এস তো।

কনক একটু ইতস্তত করে সরে গেল। আমি যেন বন্দী আসামী। সাক্ষ্য, প্রমাণ সব একে একে হাজির করা হবে। আমার তাতে কোনও হাত থাকবে না। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জবাকে এক-আধটা ফুল এ ছাত থেকে ও-ছাতে পাচার করেছি ঠিকই কিন্তু চিঠি ত আমি লিখিনি। চিঠি লিখব কেন? আমি ত জানি যত দানাই ছড়াই জবা ত তেমন পায়রা নয় যে উড়ে আসবে। ওর দানা আলাদা। মটরদানা, কাঁকনি দানা, কোনও দানাতেই ও পাখি বশ মানবে না। মাতুল কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, কি কাণ্ড বাঁধিয়েছিস। ব্যাটা ওমব খৈয়ামের চেলা।

বেশ লজ্জা লজ্জা করছে। ভয় তেমন লাগছে না। কি আর হবে? পিতা যদি বাড়ি থেকে লাথি মেরে বের করে দেন, লোটাকম্বল নিয়ে সরে পড়ব। কোথায় সরব জানি না। তবে এত বড় পৃথিবী কোথাও কি একটা ডেরা জুটবে না।

কনক খুঁজে খুঁজে আমার ডায়েরিটা নিয়ে এসেছে। মরেছে। ওতে যেসব মনের কথা লেখা আছে, সেসব পড়লে সশ্রম কারাদণ্ডের পরিবর্তে জজসাহেব ফাঁসির হুকুম দেবেন। অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তাও আছে। বরাতে কোন পাতাটা বেরিয়ে পড়বে কে জানে! জয় ঠাকুর।

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে পিতা মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলেন। নীরব নিথর, নিস্পন্দ প্রদীপ শিখা। কোন পাতাটা খুলেছেন। হে ভগবান, যে পাতায় মায়া আছে, যে পাতায় কনক আছে, সেইসব পাতা যেন দুম করে বের করে দিও না। কি কুক্ষণেই যে ডায়েরি লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ভেবেছিলুম মহাপুরুষরা ডায়েরি লেখেন, তাহলে ডায়েরি লিখলে মহাপুরুষ হয়। লজিক

পিতা মুখ তুলে বললেন, বাপস, কিসব লিখেছে?

প্রতাপ রায় বললেন, খারাপ কথা?

না, না, অতি উচ্চমার্গের কথা। লিখছে, জীবনে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াটাই বড়। পেলে হারাবার ভয় থাকে, যা পাইনি তা তো কোনওদিন হারাবে না। সোজা চলে যাও, কিছু ধরার চেষ্টা করো না, কিছু তুলে নেবার চেষ্টা করো না। রিক্ত হবার সাধনা ক'জন করে। সকলেই তো দেহি, দেহি করছে। সত্য একটাই, সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে।

জবার কাকা উসখুস করে বললেন, হাতের লেখা কি মিলছে?

চিঠিটাই পেলুম না, তো হাতের লেখা মেলান!

এই যে স্যার।

এতক্ষণে কাগজটা নজরে এল। এ সেই চিঠি। সুখেন ব্যাটা সেদিন দুপুরে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। দেখেছ কাণ্ড! একটু বেশ জমিয়ে লেখ তো পিণ্টু। বেশ একটু আবেগ দিয়ে মারাত্মক করে লেখ তো। বড় ফসকে ফসকে পালাচ্ছে। প্রথম লাইনেই মেরে দে, লেখ, আর কতকাল থাকব বসে, পরান খুলে বঁধু আমার! রাসকেল একবারও আমাকে বললে না মেয়েটা কে? বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে আজ অবস্থা দেখ। অপরাধ স্বীকার করে নিলে সাজা কমে যায়। সেই পথেই এগিয়ে দেখি!

মেলাতে হবে না, ওটা আমারই হাতের লেখা। তবে অন্যের হয়ে লেখা। হাতের লেখা আমার হলেও লেখক অন্য।

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, হাইকোর্ট দেখাতে চাইছে? একটু চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে জবা কোথায়।

মেসোমশাই ধমকের গলায় বললেন, চুপ করুন, চিঠির শেষে কার নাম আছে দেখুন তো হরিদা?

পিতা পাতা উলটে বললেন, ইতি তোমার সুখাদ্য।

প্রতাপ রায় বললেন, বাবা, একেবারে খাদ্যখাদক সম্পর্ক।

মেসোমশাই বললেন, কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?

পিতা ভাল করে দেখে বললেন, আমার শ্যামা মায়ের চরণতল।

প্রতাপ রায় বললেন, একেবারে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম। বহুত্ আচ্ছা।

মেসোমশাই বললেন, এ চিঠি কিছু প্রমাণ করে না। ইট মে বি এনিথিং। কয়েক লাইন পড়ুন তো হরিদা। পিতা চিঠিটা মাতুলের হাতে দিয়ে বললেন, আমি পারব না, তুমি পড়।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ পাকা পাকা কথা লেখা আছে। ইচ্ছে করলে আমি চেপে ধরে জবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। দুঃখু নেই। পাত্র হিসেবে ছেলেটি তো খারাপ নয়।

কথা শুনে সকলেই নির্বাক। বলে কিরে! পোস্তার কারবারি। সেই ছড়া নাকি, শুনতে পেলুম পোস্তায় গিয়ে তোমার নাকি ছেলের বিয়ে। মাতুল চিঠিটা শুরু করার আগেই প্রতাপ রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বের করে দপ্ করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চিঠি পুড়ছে, মাতুল চিৎকার করছেন, আগুন লেগে যাবে, ওরে আগুন লেগে যাবে।

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, আমার চিঠি, আমার চিঠি।

প্রতাপ রায় জ্বলন্ত চিঠিটা কার্পেটের পাশের মেঝেতে ফেলে দিয়ে খুব সহজ গলায় বললেন, এবার আপনি আসতে পারেন। জবা এখানে নেই। ভোরবেলা গাছে খোঁজ করবেন।

মাতামহ বললেন, আর একটা কথা বলেছ কি চ্যাঙদোলা করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসব।

মাতুল বললেন, উনি যা বলেন তাই করেন। তন্ত্রসাধক।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। মাতামহের দিকে ভক্তি গদ্‌গদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, বাবা, একটু আশীর্বাদ করুন। মাতামহ হাত তুলে বললেন, করলুম।

আশীর্বাদ করুন যেন এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারি।

অ্যাঁ সেকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের ছেলে ছাত টপকে ফুল ফেলবে, চিঠি ফেলবে, আইবুড়ো মেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, দেশে আইন বলে ত একটা কিছু আছে! মেয়ে যদি না ফেরে আমি থানায় যাব। তখন যা হয় টানা-হ্যাঁচড়া হবে। মেসোমশাই বললেন, আমি আছি।

পিতা খুব গম্ভীব গলায় বললেন, আপনারা একে ডিফেণ্ড করবেন না। আমার ছেলে অপরাধী। শুধু অপরাধী নয়। চরিত্রহীন, লম্পট। হি ইজ এ সাফারার। বয়েসের অসুখে ভুগছে। শেম! শেম!

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়

সব স্থির। সমস্ত মুখ গম্ভীর। এমন কি প্রতাপ রায়ের মুখ থেকেও সেই বিচিত্র হাসি অদৃশ্য হয়েছে! মাতামহ মাথা নিচু করে হাতের আঙুল নিয়ে পুর-মুঠ খেলছেন। এস্রাজ একপাশে অভিমানী স্ত্রীর মত পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হারমোনিয়াম বেলো খোলা, সুর হারা। বাঁয়া আর তবলা মাথা ঠোকাঠুকি করে ফাটকের দুই রাতজাগা আসামীর মত নিজেদের ভাগ্য নিয়ে যেন বড়ই বিব্রত। দুই উরুতে হাত রেখে পিতা এত সোজা হয়ে বসেছেন, মনে হচ্ছে অমরনাথের তুষারলিঙ্গ। মাতুল ওপর ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে বসে আছেন। বোঝাই যায় সুর বেরিয়ে আসতে চাইছে, কোনরকমে চেপে রেখেছেন। নিজেকে মনে হচ্ছে ইঁদুরকলে পড়ে গেছি। কেউ না কেউ এইবার তুলে নিয়ে বাইরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। এক ঝাঁক কালো কালো কাক, ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপটাতে তেড়ে আসবে। প্রাণ ভয়ে ন্যাজ তুলে শুরু হবে আমাব দৌড়দৌড়ি।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে এস্রাজের ছড়ির ছড় আলগা করতে করতে পিতা বললেন, আর কি রইল? কিছুই রইল না।

মাতামহ মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

মানে অতি সহজ। চরিত্র গেল ত আর কি রইল? কিছুই রইল না।

ছড়িটা শূন্যে তুলে দেখাতে লাগলেন, এই হল মাথা, লম্বালম্বা চুল, দুটো লিকলিকে হাত, কঞ্চির মত

বাকা বাঁকা দুটো পা, এই ধনুকের মত পিঠ। এই দুর্বল শরীর কিসের জোরে জগতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত ?

ছাত্রের মত সমস্বরে সকলের জবাব, চরিত্র, চরিত্র।

উত্তেজনায় পিতা উঠে দাঁড়ালেন, রাইট ইউ আর। সেই চরিত্রটাই যার প্রেডবেয়ার হয়ে গেল, তার আর রইল কি ! প্রবৃত্তির ড্যাণ্ডোস মাথায় পড়বে। ঘা খেতে খেতে, ঘা খেতে খেতে ও ত কেঁচো হয়ে যাবে। হি ইজ মাই লস্ট সান। আমি এখন পৃথিবীর শেষ সীমায় এসে অন্ধকারে পথ খুঁজছি। ইস, ইস, এই ছেলে যখন পিতার নাম বলবে লেট হরিশঙ্কর, আমি ত তখন কবরেও ঘৃণায়, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠব।

মাতামহ উদাস গলায় প্রশ্ন করলেন, লেট বলছ কেন ? তুমি ত প্রেজেন্ট।

আমি সিদ্ধান্ত করেছি, আই উইল কমিট স্যুসাইড।

সভাসদরা সমস্বরে বললেন, সে কি ? আত্মহত্যা

ইয়েস আত্মহত্যা ! দুষ্ট গরুর চেয়ে, শূন্য গোয়াল ভাল।

মাতামহ বললেন, দুষ্ট গরু ত ও, তুমি কেন গোয়াল শূন্য করে চলে যাবে ? এ আবার কেমন বিচার ? অঙ্ক আর ইংরিজীতে তুমি মাস্টার, আইনে তুমি একেবারে গবেট।

প্রতাপ রায় বললেন, একে বলে ট্র্যানসফারড এপিথেট।

পিতা চড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক বলেছ। যে চড় ওর গালে মারা উচিত ছিল, সেই চড় আমি নিজের গালে মারব। সেলফ্ ইমমলেশান। ওই উঠোনে কাঠের পিড়েতে বসব। গায়ে ঢালব একটিন কেরসিন, তারপর একটি দেশলাই কাঠি। যতক্ষণ গলা দিয়ে স্বর বেরোবে, ততক্ষণ বলতে থাকব, তোমার লেলিহান কামনায় আমি পুড়ছি, তোমার লেলিহান কামনায় তোমার পিতা পুড়ছে।

মাতামহ বললেন, আমরা তখন কোথায় থাকব ?

কাছাকাছিই থাকবেন।

তুমি পুড়বে আমরা দেখব ! কি তোমার বুদ্ধি হরিশঙ্কর। হিন্দুস্থানীরা তোমাকে বুদ্ধু বলবে। এ কি সতীদাহ নাকি ! আমরা চট, কম্বল, বালি এনে তার ওপর, তার ওপর চাপাব। দমকল ডেকে আনব। তারপর হরিশঙ্কর পুলিস এসে তোমাকে ধরবে। কোমরে কাছি বেঁধে টানতে টানতে হাজতে। তোমার হাইপার অ্যাটিচিউড বেরিয়ে যাবে।

প্রতাপ রায় বললেন, হাইপার অ্যাটিচিউড নয়, ট্রনসফারড এপিথেট।

পিতা বললেন, আপনারা কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন ? অ্যাম আই এ লাফিং ষ্টক। ভুলে যাবেন না সেই প্রবাদ, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। তমসা এগিয়ে আসছে, তামাশা বেরিয়ে যাবে।

যতবারই আমি কিছু বলতে চাইছি মাতুল আমাকে চেপে চেপে ধরছেন। ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, একটাও কথা নয়, উত্তাপ বেরিয়ে যাক। গ্রহ আগে শান্ত হোক।

মেসোমশাই বললেন, পেশেন্স হরিদা, পেশেন্স। অপরাধীকে ডিফেন্ড করার সুযোগ দিন। এটা একটা ফাঁদ হতে পারে।

প্রতাপ রায় বললেন, ভাগ্নে, চিঠির রহস্যটা কি ।

মাতামহ বললেন, তোমার পিতৃদেবকে সত্যি কথা বলে শান্ত কর। আমি জানি, তুমি আমাদের সে ছেলে নও।

আমার বন্ধু সুখেন।

মেসোমশাই বললেন, সে তোমার বন্ধু নয়, শত্রু।

মাতুল বললেন, নো ইনটারাপসান। হি ইজ কামিং আউট।

মাতামহ বললেন, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে।

আমার বন্ধু সুখেন আমাকে বলেছিল একটা চিঠি লিখে দে। তোর বাঙলাটা ভাল আসে। লেখাটা আমি চিঠি হিসেবে লিখিনি, লিখেছিলুম সাহিত্য হিসেবে।

মাতুল বললেন, বেলেলেটারস আর কি !

মাতামহ বললেন, তার মানে এলেবেলে।

সুখেন বলেছিল একটা মেয়েকে লেখার কথা। আমি লিখেছি প্রকৃতিকে। সত্তাকে ভেঙে দুখণ্ড করেছি, পুরুষ আর প্রকৃতি। বৈষ্ণবের মধুরভাব আর কি ? প্রকৃতিভাবে উপাসনা। আমিই কৃষ্ণ, আমিই রাধা। নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ। রূপ দেখি আপনার/ কৃষ্ণের হয় চমৎকার/আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ॥ এ চিঠিতে যে নায়ক সেই নায়িকা। সেই বেদনা, যার লাগি কান্দে প্রাণ তারে পাব কিসে।

পিতা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

আজ্ঞে না, দুরাত্মা নই, আসল আত্মা। আত্মাকে দুটুকরো করেছি ভেঙে। একটা পুরুষ আর একটা প্রকৃতি। দু'জানালা দিয়ে দু'জনে উঁকি মারছে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

মাতুল বললেন, অ্যাঁ, বলিস কি ? খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। প্রতাপ ধর, ধর।

পাখি নয়, প্রতাপ রায় তবলা ধরলেন। মাতুল ধরলেন,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
ক্যামনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনো বেড়ি...

নে ধর, ধর। গলা দে না ব্যাটা,

ধরতে পারলে মনো বেড়ি
দিতাম তাহার পায়।

মাতামহ উঠে দাঁড়িয়ে বাউলের মত নাচতে আরম্ভ করেছেন। বারেবারে বলছেন, আহা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। পিতা বসে পড়েছেন। ছড়ির ছড় টান করতে করতে বলছেন, থেমো না, থেমো না, চালিয়ে যাও। এস্রাজ সুরে ককিয়ে উঠল,

ধরতে পারলে মনো বেড়ি
দিতাম তাহার পায়ে।
আট কুঠারি নয় দরজা আঁটা
মধ্যেমধ্যে ঝলকা কাটা
উপরে আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, বলে মাতুল যখন সুরে উঠছেন, ভেতর কেঁপে যাচ্ছে। মাতামহ নৃত্য করছেন, হাসি পাচ্ছে না। চোখে তাঁর ভাবাশ্রু। গানের ফাঁকে ফাঁকে মন বলে উঠছে, বেরিয়ে পড পিন্টু। চার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড। অচিন পাখি ধরতে। কামিনী কাঞ্চনের দাসত্ব, অস্থিমজ্জার দাবি, সব পাশ কাটিয়ে, সেই অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়া।

গান থামল, মেসোমশাই বললেন, ছেলে আপনার ব্যারিস্টার হবে। পরিস্থিতি কেমন বদলে দিলে দেখলেন ? ভেতরটা কেমন তুলতুলে হয়ে গেল দেখছো হরিদা ? কেমন যেন আনচান করছে।

মাতুল বললেন, কার ভাগনে দেখতে হবে ত।

পিতা বললেন, সেই জন্যেই ত ভয় পাই। জালালুদ্দিন রুমির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ?

হ্যাঁ শুনেছি।

তাহলে তার একটা গল্প শোন। গল্প নয়, রূপক। রাজার বাজপাখি একদিন এক ভাঙা আস্তানায় উড়ে এসে বসল। সেখানে গোটাকতক প্যাঁচা বাস করত। বাজ বললে, তোমরা কি এই জায়গাটাকে খুব উন্নত বলে মনে কর ? আমার স্থান কোথায় জান কি ? রাজার হাতের কবজির ওপরে। বুদ্ধিমান প্যাঁচারা চিৎকার করে অন্য প্যাঁচাদের সতর্ক করে দিলে, সাবধান। ওকে বিশ্বাস কোরো না। ওর ছলে ভুলো না। আমাদের আস্তানা দখলের তালে এসেছে। তুমি হলে সেই রাজকীয় বাজ। আমার এই প্যাঁচাটিকে

কোটর ছাড়া কোরো না।

মাতুল বললেন, আমার নাকটা সামনের দিকে সামান্য বাঁকা বলে বাজ বলছেন ? তা বলুন। কিন্তু ওকে প্যাঁচা বলছেন ?

আপত্তি কিসের ? রুমি কি বলছেন শোন, only Sweet-voiced birds are imprisoned/owls are not kept in cages. যারা মেয়েছেলের সোনার খাঁচায় ঝোঁটন পাখি হয়ে বারান্দায় দোল খায়, তাদের গায়ে মুতো কাঁথার গন্ধ। তাদের মন শ্যাওলা ধরা উঠনের মত। মানুষ যদি পুঁটলির মত সংসারের চাতালে পড়ে থাকে তাহলে তার কি হবে ? নৌকোর পাটাতনে নিদ্রিত মানুষের মত অবস্থা হবে। এক দুলুনিতেই ছিটকে পড়বে অগাধ জলে। Seek a Pearl/brother/within a shell/ And seek skill from among the men of words.

মাতুল বললেন, আমি কি তাহলে কিছুই না ?

তুমি তোমার ক্ষেত্রে বিরাট। তবে কি জান, তোমার লাইনে কিছু পাপ সহজাত। সুর, সুরা আর সুন্দরী। তুমি ধরবে। তোমার লিভার শুকোবে। তোমার কণ্ঠ হারাবে। শেষে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরবে তোমার ভাগনের হাতে গার্ডল অফ ভেনাস আছে। জান কি ?

প্রতাপ রায় বললেন, গার্ডল অফ ভেনাস ? ভাগনে আমাদের শিল্পী হবে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে অভিনয়ের লাইনে যাবে। দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, প্রমথেশ। দানিবাবু, কি গিরীশ ঘোষ বলছি না, তাঁদের কাঠামোই আলাদা ছিল। এর একটা কি রকম প্রেমিক প্রেমিক, গার্ডল অফ ভেনাস ভেনাস চেহারা ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকায় ফাটিয়ে ছেড়ে দেবে। মেকআপ পর্যন্ত লাগবে না। আমাদের ছবিতে এক জোড়া নতুন হিরো হিরোইন লাগালে মন্দ হয় না। বই ত এমনিই ফ্লপ করবে, তবু লাখ খানেক টাকা বাঁচবে।

অক্ষয় ওর হাত দেখে আমার কানে কানে বলেছিল, হরিদা, খুব সাবধান, শুক্রবন্ধনী ছিঁড়ে ঝলঝলে হয়ে ঝুলছে, সরু সরু, লম্বা লম্বা গাইনোকোলজিস্টদের মত হাতের আঙুল, শুক্রের ক্ষেত্র ঢিবির মত উঁচু, তাতে আবার জাল চিহ্ন, এ ছেলে ডন জোয়ান হবে। প্রমোদ আর প্রমদা, এই হবে ওর জীবনের পারস্যুট। চুলের কেয়ারি, সাজপোশাকের বাহার আর চাঁদনী রাতের বেড়ালের স্বভাব।

মাতামহ বললেন, সে আবার কি ?

ফাল্গুন আসুক বুঝতে পারবেন। মাঝরাতে চাঁদের আলোয় পাঁচিলে বসে হুলো ডাকছে বুকফাটা গলায় মিঞাও, মিঞাও।

কাকে ডাকবে হরিশঙ্কর ? সুখে ডালে বসি, ডাকিছ পাখিরে, ডাকিছ কি সেই পরমপিতারে ?

আজ্ঞে না, হুলোর জীবনে পিতা নেই, মাতা নেই, পরমপিতা নেই, আছে শুধু প্রমদা বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।

মাতামহ বললেন, কি যে বল তুমি ? এ হুলো সে হুলো নয়। আজ এর সমাধি হয়েছিল, সে খবর রাখ কি ?

পিতা বললেন, সমাধি আর লো প্রেসারের একই লক্ষণ। ওকে নিয়ে আমি চেঞ্জে যাব।

যাক, তাহলে তোমার রাগ পড়েছে।

হ্যাঁ, একে বলে সেকেণ্ড থট। কোনও কিছু করার আগে দুবার চিন্তা করা উচিত। আমি সরে গেলে ও আরও চিঠি লিখবে। প্রেমের বন্যা বইয়ে দেবে। প্রেমের ডিসেনট্রি ডায়েরিয়ায় জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

তা যা বলেছ। ব্যাটা যেন ডিসপেপটিক শ্রীকৃষ্ণ। ফুঁ-এর তেমন জোর নেই তাই বাঁশি ছেড়ে কলম ধরেছে। তুমি হবে ওর বেলপোড়া।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বেলপোড়াই হব। বাঁশি তবু বাজে, হুলোরা ডাকে, কলম বড় সাংঘাতিক জিনিস নিঃশব্দ প্রাণঘাতিকা। বাঁশি শুনে গোপীরা বলত, কেষ্ট মুখপোড়া ছটফট করছে, কলমের খোঁচায় তেড়ে আসে মশলার কারবারীরা। চিঠিটা পুড়ে গেল, তা না হলে ভাষাটা ভাল করে অ্যানালিসিস করা যেত

াঝা যেত কতদূর এগিয়েছে আর কতদূর এগোবে।

প্রতাপ রায় বললেন, কি লিখেছিলে ভাগনে ?

মেসোমশাই বললেন, সে কি আর মনে আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে। ও ত চোরাই মাল।

মাতুল বললেন, সে কি ? প্রেমেও প্লেজিয়ারিজম। কোথা থেকে ঝেড়েছ ?

আজ্ঞে খালিল জিব্রান থেকে। আমার সুখে তুমিই অসুখ। কেন ? সে প্রশ্নের জবাব শুনে তোমার দয় কি টলবে ? যাকে ভালবাসি, যাকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই, যার জন্যে আমার দিবসের ম, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, রাতের অনিদ্রা, সে যদি হৃদয়টি অন্যকে দান করে দিয়ে বসে থাকে তাহলে খের আর কিছু থাকে কি ? আমি ধীরে ধীরে বাতির মত গলে যাচ্ছি। বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছি আতরের বাসের মত। কি আর অবশিষ্ট রইল আমার ? এদিন কবে শেষ হবে ! এ রাত কখন ভোর হবে !

মাতুল বললেন, দারুণ লিখেছিস ত। আমার আবার একটু গাইতে ইচ্ছে করছে।

হারমোনিয়ামে ভাঙা কাচের মত সুরে চুরমার চুরমার বেজে উঠল। একেবারে চড়া পর্দায় গান বলেন।

থী বো ইক শখসকে তসব্বুর সে।

অব বো রানাঈ এ খয়াল কহাঁ॥

চার পাক গেয়ে বাংলা করলেন, একজনের রূপের কল্পনায় আমি মশগুল ছিলাম। মনে এখন আর সে নশা খুঁজে পাই না কেন ?

তেরী ফুরসত কে মুকাবিল ঐ উমর।

বর্ককো পাব হিনা বাঁধতে হেঁ॥

য়রে জীবন, বিদ্যুতের পায়ে মেহেদী আঁকার মোকাবেলাতেই তো ফুরিয়ে যাবি !

বাইরে আবার উতলা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মনে হয় আবার বৃষ্টি হবে। প্রতাপ রায় বললেন, এবার ওঠ। অনেক দূর যেতে হবে।

হারমোনিয়ামের বেলো আঁটতে আঁটতে মাতুল বললেন, কতদূরে আর যাবি, মৃত্যুর চেয়ে দূরে ত যেতে পারবে না ভাই। নজর মেঁ হেঁ হমারী জাদএ রাহে ফনা গালিব। কি য়ে শীরোজা হৈ আলমকে অজজাএ পরিশাঁকা। আমার দৃষ্টিতে মৃত্যুর পথই ধরা পড়ে, গালিব। নিয়মহারা সংসারে ত একমাত্র শৃঙ্খলা, প্রতাপ।

এস্রাজে শেমিজ পরিয়ে পিতা নিজেই হুকে ঝোলাতে গেলেন। আমাকে আর কোনও আদেশ হল া। খুব রেগে আছেন। মেসোমশাই বেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরামে বসে আছেন। প্রতাপ হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললেন, আপনি আইনজ্ঞ ?

মাতামহ উত্তর দিলেন, আরে বাপ্‌রে বিরাট ব্যারিস্টার। ইনি উঠে দাঁড়ালে জজসাহেবেরা ভয়ে পেন। মেসোমশাই ওজন বাড়াবার জন্যে মুখটাকে আরও গম্ভীর করলেন। মাতুল কানে কানে া, তুই একটা কবজ ধারণ কর। সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে।

প্রতাপ রায় বললেন, ওঃ ভগবান আপনাকে পাইয়ে দিলেন। এখানে ক'দিন আছেন ?

মেসোমশাই অকারণে কেশে, ব্যক্তিত্বের কুচকাওয়াজ তুলে বললেন, কিছুদিন আছি। ছোট মেয়ের া, বড় মেয়েটাকে একবার বড় ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাব।

কি হয়েছে ?

মনে হয় সেপ্‌টিক টনসিল ? প্রায়ই ভোগে।

তাই নাকি ? কাকে দেখাবেন ঠিক করেছেন ?

নাঃ।

আমার এক বন্ধু বড় ডাক্তার, এফ আর সি এস। বলেন ত ঠিক করে দিতে পারি। এক পয়সা

লাগবে না। আমার বাড়ির নিচেই চেম্বার।

মেসোমশাই সোজা হয়ে বসে বললেন, তাহলে ত খুবই ভাল হয়। আপনাকে ঈশ্বরই মনে পাইয়ে দিলেন।

দু'জনে কোরাসে বললেন, ভগবানের অসীম কৃপা।

মাতামহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভগবান কখন কি যে করেন?

এস্রাজকে ফাঁসিতে লটকাতে লটকাতে পিতা বললেন, হি ইজ দি রিয়েল কালপ্রিট।

প্রতাপ রায় বললেন, আমি আপনার কাছে কিছু আইনের পরামর্শ নিতে চাই।

অবশ্য, অবশ্য।

কলকাতায় আপনি কেস করতে পারবেন না?

কেন পারব না। তেমন জটিল কিছু হলে অবশ্যই করব। সহজ হলে জুনিয়ার দিয়ে করানই ভাল। খরচ কম হয়।

প্রতাপ রায় বললেন, ফি ইজ নো প্রবলেম।

দ্যাট আই নো, দ্যাট আই নো!

কাল দুপুরের দিকে একবার আসব? আপনাদের দু'জনকেই একবার নিয়ে যাব। লিগ্যাল এগজামিনেশান, মেডিক্যাল চেক-আপ একসঙ্গে হয়ে যাবে।

পিতা এস্রাজ ঝুলিয়ে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন, মেসোমশাই ডাকলেন, হরিদা, আপনি বলেন?

অতি উত্তম প্রস্তাব। তাছাড়া গাড়ি আছে, যাওয়া-আসার অসুবিধে হবে না।

মেসোমশাই প্রতাপ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেন সেটলড?

মাতুল উঠে দাঁড়িয়ে কাছা কোঁচা ঝেড়েঝুড়ে পাট পাট করে নিলেন। সিনেমা-টিনেমার কথা হয় ভুলেই গেছেন। মুখে একটা অদ্ভুত প্রেমিক ভাব। কোথায়, কইবে তোরা, বলে ভেতর বাড়ির পা বাড়ালেন।

কাদের খুঁজছেন? সময় ত সব নিয়ে চলে গেছে? কাল ভুল হয়ে গেছে? দিদিকে খুঁজছেন না কি? তিনি ত মৃত্যুপারের জগতে? একটি ছবি কেবল দেয়ালে ঝুলছে। মুকু ফোলাফোলা মুখে দাঁড়িয়ে বেশ আয়েস করে একটি হাই তুলছিল। ছোট্ট, এতটুকু এতটুকু এক সার দাঁত। লাল জিভ হাইয়ের আকর্ষণে ভেতর দিকে এলিয়ে পড়ছে। মাতুল টুস টুস করে দু'বার টুসকি বাজিয়ে নিজেই একটি বিশাল আকারের হাই তুললেন ইমন কল্যাণে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কত রকম রাগিণীতে হাই তুলতে পারিস?

চেষ্টা করে দেখিনি ত?

কনক আলু ভাজছিল। থালায় গোল গোল আলুভাজা। তেলে মরছে পিটির পিটির শব্দে। টুক করে দু' খণ্ড মুখে ফেলেই হা হা করতে লাগলেন। ভীষণ গরম। কোনও রকমে সামলে নিয়ে বললেন, এটা রাগিণী নয়, রাগ, রাগভৈরব।

কনক তাড়াতাড়ি বললে, ডিশে করে দোব? খাবেন আলু ভাজা?

কনকের নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার গান আজ আর শোনা হল না। আর একদিন হবে। এর সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে এসো না?

পাঞ্জাবির পকেটে হাত পুরে এতটুকু একটা সেন্টের শিশি বের করে কনকের হাতে দিয়ে বললেন, বিলিতি। জুনো। তোমার সৌরভ বাড়ুক।

কনক ভ্যাবাচ্যাকা। লাল একটা লঙ্কা হাতে তুলে নিয়ে, গোলাপ ফুলের মত নাকের কাছে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে মাতুল ফিরে চললেন। সাজাহান যেন তাজমহল দেখে গোলাপ ফুল শুঁকতে শুঁকতে খাসমহলে ফিরে চলেছেন। বারমহলে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, বুড়ো দেখেছিস?

কি রকম বুড়ো?

একেবারে থুথুড়ে বুড়ো। বিছানায় কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে পড়ে আছে।

আজ্ঞে না।

জীবনের কোনও কিছু তেমন করে গায়ে মাখবি না। মাখামাখি কবে, কাপড়ে-চোপড়ে, গু-গোবরে হয়ে পড়ে থাকবি না। লাইফ ইজ এ গেম। হারজিত দুই-ই আছে। দুঃখ আছে : সুখ ছ,. আমাদের দুটো পা, একটা সুখের, একটা দুঃখের। দুটো চোখ, এক চোখে হাসি, এক চোখে । গলা কিন্তু একটাই, কখনও ফুলের মালা, কখনও জুতোর মালা। কাঁটা আর ফুল, ফুল আব । গো অন মেরিলি ভাগনে। ইউ গো ইওর ওয়ে, আই গো মাই ওন। শিমুলেব বীজ ফাটা দেখেছিস ?

আজ্ঞে না।

কি দেখেছিস ? কুনো ব্যাঙ ? সরু সরু তুলোর পাখায় ভর করে ছোট ছোট বীজ উড়ে আসছে। কর্মফল। ফুঁ দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দে, উড়িয়ে দে। ব্রাশ অ্যাসাইড, লাভ অ্যাণ্ড হেট/মি মি/ লাফটার আফটার/ হলটার, ফলটার/ রাইজ টু দি অলটার/ নান টু লুক আফটার দিই ॥ ভরাট গলায় ইংরেজি গান শুনিয়ে মাথায় গোটা কতক টুসকি মেরে মাতুল নেমে গেলেন নিচে। স্টার্ট নেবার শব্দ হল। শব্দ মিলিয়ে গেল দূব থেকে দূরে। বেশ বাত হয়েছে। চারপাশ কেমন সিমসিম করছে। অশরীরীরা নেমে আসছে বাতের জলসায়। মানুষের নাচঘর ঝিমিয়ে এল ? বিরাট কার্পেটে মাতামহ মাথা নিচু করে মাঝখানে একা বসে আছেন। মাথা মৃদু মৃদু দুলছে। ঠোঁটে ই. বাঁকা হাসি। যে হাসির অর্থ, দেখেছি অনেক, দেখছি অনেক, দেখব অনেক। পক্ষহীন শোন এ যে নহে পথ পালাবার।

মৃদু স্বরে বললেন, তোমাব সেই সাবমনের খাতায় লিখে নাও, নাচালে নাচব না। হুঁস নিয়ে হব। আরো লিখে নাও, প্রেমের ডিসেন্ট্রিতে পিতার বেলপোড়া। কিন্তু আমি এখন যাই কোথা ? মাতামহকে আর তেমন সাহস কবে বলতে পারছি না, কেন এখানেই থাকবেন ? আমার নিজেব টলে গেছে। কনক এসে হাঁটু গেড়ে বসল। মাতামহের মুখেব দিকে নিচু হযে তাকিয়ে বলল, খাওয়া-দাওয়া হবে ? রাত ত অনেক হল ?

মাতামহ সেইভাবেই দুলতে দুলতে বললেন, কে কি অবস্থায় আছে ?

কনককে আর উত্তর দিতে হল না। মেসোমশাই মেঘ গর্জনের গলায় ডাকলেন, কনক, তুমি এদিকে এস। কনক করুণ মুখে আমাব দিকে তাকিয়ে উঠে গেল। মেসোমশাইয়ের এই ডাকের অর্থ আমি ঘৃণা মেশান ডাক। মেয়েকে বলছেন চলে এস। সন্দেহজনক চরিত্রের ছেলেব কাছাকাছি থেক দাগ লেগে যাবে। যৌবন বড় ছোঁয়াচে। বসন্তের টিকে হয়, যৌবন ব্যাধির যে কোনও প্রতিষেধক ।

মাতামহ মুখ তুলে তাকালেন। সর্ববোদ্ধাব সেই হাসিটি আরও জোরদার হয়েছে। মাথা নড়ছে। বুঝলে, কি বুঝলে না ? পাথরের মত মুখ করে খাওয়া শেষ হল। রাত জানে না, কি হবে, কি না। দিনের আলোয় বোঝা যাবে, আমি প্যাঁচা না অন্য কোনো পাখি। আবার বৃষ্টি শুরু। ছাড়া ছাড়া, টুপটাপ। গাছপালার গন্ধ ভেসে আসছে। অন্ধকার বাগানেব দিকে মনে হচ্ছে, দূর কোণে আমি দাঁড়িয়ে আছি, নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছি। মাটি তোলার শব্দ ঝুপঝাপ। সতীমার চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। চোখ দুটো যেন পেতলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে কনক পাশে এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে। এত দুঃখেও হাসি পেল। এ যেন শাব অভিসার। চরিত্রহীন কেষ্ট বারান্দাব কোণে দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশীর বদলে ব্রাশ। তার ওপর ইঞ্চি টুথপেস্ট।

বুকের কাছে ব্লাউজেব ভেতব থেকে খানচারেক ডায়েরির পাতা বের করে কনক আমার বাঁ হাতে জে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। একটাও কথা বললে না। বোঝাই গেল পিতাব নিষেধ। ছেলে বখে ছে। পাশের বাড়িব আইবুড়ো মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে। খলিফাদের দেশ হলে ব্যাটাকে শূলে

চাপান হত। শুধু শূল নয়, গরম শূল।

উত্তর মহল অন্ধকারে ডুবে গেছে। সংসার নিস্তব্ধ। যে ঘরে আসর বসেছিল, সেই ঘরেই মাতামহর বিছানা পড়েছে। পদ্মাসনে খাড়া বসে আছেন। বাত বাড়ছে। এইবার বেটির সঙ্গে যত মনের কথা, প্রাণের কথা হবে। মশারিতে ঢোকার সময় আমার মাথায় হাত রেখে মন্ত্র জপ করে দিয়ে বলেছেন, কোনও ভয় নেই। মেঘ আসে মেঘ কেটে যায়। সূর্য চাপা পড়ে গেছে দেখে ভেব না যেন সূর্য আর উঠবে না। রাত আসে দিন হবে বলে।

পিতা ঘরের দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়চারি শুরু করলেন। মশারির ভেতর মটকা মেরে পড়ে আছি। ডায়েরির যে পাতায় মায়া আর কনক সম্পর্কে আমার জ্ঞানগর্ভ কথা লেখা ছিল কনক বুদ্ধি করে সেই কখানির পাতা ছিঁড়ে রেখেছিল। নইলে কি যে হত! সেসব যা কথা, যে কোন পিতা পড়লেই পুত্রকে দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে পা থেকে জুতো খুলে প্রহার। ব্যাটার ডস্টয়েভস্কি হবার শখ হয়েছে। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট।

সবচেয়ে অপমানের মেসোমশাইয়ের ব্যবহার। আমার যেন লেপ্রসি হয়েছে। মেয়ের ছোঁয়াচ লাগলে গলে গলে অঙ্গ খসে যাবে। প্রেম কি লেপ্রসি! বয়স্ক মানুষরা বিবাহ বোঝেন, প্রেম বোঝেন না কেন? এই মাঝরাতে একবার গলা ছেড়ে ধরব না কি? বেশ একটু খেপু খেপু ভাব আসছে, ভাঙ ভাঙ, কান্নার মত।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং
বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী ॥

মশারির ভিতর গ্যাঁট হয়ে বসে কীর্তনীয়া পেরমদাস বাবাজীর মত ধরব না কি, তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং!

পিতা মশারির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মশারির পাশ তুলে প্রথমে টেনে নিলেন পাশবালিশ। মাথার বালিশ ধরে টানছেন, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কি হল, শোবেন না?

একসকিউজ মি। তোমার পাশে শুতে আমার গা ঘি-ঘি করছে, ভেতরটা ছি-ছি করছে। দেহের খবর জানি না, তোমার মন অপবিত্র হয়ে গেছে। তুমি শুধু অপবিত্র নও, তুমি ভণ্ড। তোমার পঞ্চেন্দ্রিয় নৃত্য করছে থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।

বালিশ ধরে একটান মারলেন। তলায় ছিল দু সেলের ছোট্ট একটা টর্চলাইট। ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। পিতা বললেন, যাঃ ফিনিশ।

Inside my brain a dull tom-tom begins.

কোয়ারেনটাইন চলেছে। পুত্র ইনফেকসাস ডিজিজে আক্রান্ত। আমগাছে মুকুল ধরেছে। প্রেমের মুকুল। গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। ভ্রমর উড়ছে ভ্যান ভ্যান করে। কোণের ঘরে আশ্রয় মিলেছে। বড় ঘরের, পিতার বাঘথাবা পালঙ্ক থেকে বিতাড়িত। এ ঘরটা মন্দ নয়, তবে একটু একপেশে। মাঝরাতে ভয় ভয় করে। এ বাড়িতে শরীরীর চেয়ে অশরীরী বেশি। রাত-বিরেতে তাদের আনাগোনার প্রমাণ মেলে নানাভাবে। ছাতে পদশব্দে, জনপ্রাণীহীন একতলার অন্ধকার সাম্রাজ্যে ফিস ফিস শলাপরামর্শে মাঝরাতে বাড়িটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়। আর তখনই মনে হয় পৃথিবীতে আমি বড় একা

তখনই মনে হয় পৃথিবীর কিই বা জানি। পৃথিবীর বাইরেটা ত সম্পূর্ণ অজানা! ভাবতে বেশ ভাল লাগে। জ্ঞানীরা বলেন, ভেবে কি হবে, কাজ করে যাও। কিরকম কাজ! যে কাজে কর্মফল নেই। He, to whom the eternal world speaketh, is relieved of much questioning.

অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। আকাশ আমার মনের মতই ঘোলাটে। ঘরের বাইরে একবার বেরিয়েছিলুম। হাওয়া তেমন সুবিধের মনে হল না। কনক আড়চোখে তাকিয়ে সরে গেল। মুকু ত তেমন কথাই বলে না। মুখ খুললে বিদ্যে লিক করে বেরিয়ে যেতে পারে। মেসোমশাই ব্রাশ ছেড়ে নিম দাঁতন ধরেছেন। বারান্দায় মুখ ঝুলিয়ে চিবোচ্ছিলেন, আর থুথু করে নিচের বাগানে ছিটোচ্ছিলেন। পিতা অসম্ভব রকমের গম্ভীর মুখে হাতে একটা হাতুড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। বেশ কঠিন কোনও কাজ শুরু করার মতলব। আমি জানি, আগেও দেখেছি, মন যখন তোলপাড় করে তখন বিচিত্র কোনও কাজ নিয়ে ভীষণ মেতে ওঠেন। একে বলে, কাজের বাঁধন দিয়ে মন-তুরঙ্গকে বশে রাখা।

এক কাপ চা জুটেছে। অন্য কোনও কাজেব ফরমাশ এদিকে আসছে না। অন্যদিন এতক্ষণে হরেক রকম কর্তব্যকর্ম ঘাড়ে চেপে বসত। আজ একেবারে স্বামী মুক্তানন্দ হয়ে চৌকিতে পা তুলে বসে থাকার সুযোগ মিলে গেছে। জানি না, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। মন বলছে, খেলা বেশ ভালই জমবে। কেমন উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে এসে গেল। নাও এখন ম্যাও সামলাও। সুখেনের সঙ্গে একবার দেখা হোক, ব্যাটার পিণ্ডি চটকাব।

মাতামহ ভোর না হতেই চলে গেছেন। যাবার সময় বলে গেছেন, তেমন ঝামেলা দেখলে চলে আসিস। আমার খুপরিতে দু'জনে মজা করে থাকব। একটা খাবার যা আবিষ্কার করেছি! একেবারে পাহাড়ীবাবার ফর্মুলা। একদিন খেলে তিনদিন আর হাঁ কবতে হবে না। লাউ সেদ্ধ কবে, গুড় আর একটু গাওয়া ঘি দিয়ে চটকে, এক ড্যালা মেরে দাও। কে কার পরোয়া করে না বলে বললেন, কে কার পরোটা ভাজে! পেট নিয়েই ত মানুষ নাকাল। পেটটাকে ম্যাকাডামাইজ করতে পারলে কার দাসত্ব! হু কেয়ারস হুম। তোমার চোখ তুমি রাঙিয়েই রাখ, আমি শিস দিয়ে যাই ডালে বসে। পাখি হয়ে ডাক দিতে থাকি পরমপিতাকে। মনে হচ্ছে একেবারে একা লডতে হবে না। পক্ষে মাতামহ আর মাতুলকে পাব।

হাতুডিব শব্দ হচ্ছে। কিছু একটা ভাঙা হচ্ছে। তুলো ধোনার যন্ত্র পড়ে বইল তুলোব অভাবে, তাই কি পিতা দেয়াল ভাঙাব দিকে চলে গেলেন সব ছেড়ে। ভাঙাব মত দেয়াল এ বাড়িতে অনেক। আমার ওপর বেগে গিয়ে বাড়িটাকে অংশে অংশে ভেঙে মাঠময়দান করে তাঁবুর ব্যবস্থা হবে নাকি? বলা যায় না, কোন্ পরিকল্পনায় কি কাজ শুরু হল! কার ক্রোধ কখন কিভাবে কিসের ওপর যে গিয়ে পড়বে! আমাদের বিখ্যাত মেনিদা একবার মেয়েব ওপব বেগে হাঁটাপথে হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন। মাসখানেক বেপাত্তা। ফিবে এলেন ন্যাড়া হযে। গয়ায নিজের নামে নিজেই পিণ্ড উৎসর্গ করে। বললেন, আমি আর বেঁচে নেই, আমাকে কারুর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যার যা খুশি করে যাও। পাডায পেছনে লাগাব মানুষের ত অভাব নেই? তাঁরা সস্ত্রীক মেনিদাকে বাস্তায় দেখলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দাদা ইনি কি আপনার বিধবা স্ত্রী! বিয়েটা কি বিদ্যাসাগব মশাই দিয়ে গিয়েছিলেন?

মেসোমশাইয়ের গলা ভেসে এল, হবিদা আজ বেবোবেন না? ছুটি নাকি?

না, ছুটি হবে কেন?

তা হলে সাত-সকালে বাথরুমের দেয়াল ভাঙতে বসলেন?

কাজটা অনেকদিন পড়ে আছে। করব কবব করে করা হচ্ছে না। খানিকটা এগিযে রাখি। ববিবাব এসে গেল।

কি করতে চাইছেন?

পুবনো প্লাস্টার ঝরিয়ে ফেলব। শিলে গুঁড়ো করে অ্যাগ্রিগেট বেব কবব।

সে আবার কি?

আপনারা যাকে বালি বলেন, কনস্ট্রাকসানের ভাষায় তার নাম অ্যাগ্রিগেট।

সে কি মশাই ! পুরনো প্ল্যাস্টার গুঁড়ো করে আবার প্ল্যাস্টার করবেন ? ধরবে ? ঝরে পড়ে যাবে। আমার লাইফে শুনিনি। পণ্ডশ্রম হবে।

ওর বাপ্ ধরবে। ধরাতে জানলেই ধরবে।

কিছু বালি কিনলেই ত হয়।

সে তো সবাই করে। তাতে আর নতুনত্ব কি আছে ! সব সময় নতুন কিছুর অন্বেষণ করুন। সামথিং নিউ। সামথিং নিউ।

ঠাঁই, ঠ্যাস, ধাঁই, ধাঁস। হাতুড়ির শব্দ উঠল। ঝড়াস ঝড়াস প্ল্যাস্টার খসছে। বাথরুমের বারোটা বেজে গেল । আর ত একপাশে বসে থাকা যায় না। এসব অদ্ভুত কাজের একমাত্র দোসর আমি। এগোতেই হয়। এগিয়ে গিয়ে বলতে হয়, কি করতে হবে বলুন ?

দরজার কাছে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, কোনও সাহায্যে লাগতে পারি ?

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, ও, নো নো। গো, অ্যাণ্ড রাইট ইওর লেটার্স। লাভ লেটার্স। সংসারে যুবতীর অভাব নেই। যুবকের কর্তব্য করে যাও। বোতল বোতল কালি আছে। দিস্তে দিস্তে কাগজ আছে। কোকিলের ডাকে সাড়া দাও। কাননে বসন্ত এসেছে, বসন্ত।

ধাঁই ধাস, ঠাঁই ঠাস। হাতুড়ির শব্দ শুরু হল। আবার কোণের ঘরে প্রত্যাবর্তন। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেলে, নিকট দূর হয়ে গেলে বড় দুঃখ হয়। বেশ জোরে মনের মত কয়েক চরণ কবিতা আবৃত্তি করলে কি হয়। বেশ জুতসই কয়েক লাইন :

> Among the windings
>   of the violins
> And the ariettes
> of cracked cornets
> Inside my brain a
>   dull tom-tom begins
> Absurdly hammering
>   a prelude of its own
> Capricious monotone
> That is at least one
>   definite false note.

রাস্তায় হই হই উঠেছে। ভাল্লুক-টাল্লুক বেরলে এরকম হতে পারে। সাত সকালে ভাল্লুক আসবে কোথা থেকে। চিৎকার, চেঁচামেচি। বারান্দার দিকে কনক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সরে গেল। বয়েই গেল। তুমি আজ আছ কাল নেই। তোমার ভালবাসা, ঘৃণা কোনও কিছুরই পরোয়া করি না।

রাস্তায় প্রবল উত্তেজনা। সবাই একমুখো দৌড়চ্ছে আর বলছে, ধরেচে, ধরেচে। কি ধরেছে রে বাবা ! চোর না ডাকাত ? বারান্দায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীনু ডাকলে, শিগগির নেমে আয়।

নিচে নামতেই ষাঁড়ের গলায় চিৎকার করে উঠল, শালা চিকের আড়াল থেকে বেনারসী বাঈজীদের মত মুখ বের করে রাস্তা দেখছিস, এদিকে কি হয়েছে জানিস ?

আস্তে বল, আস্তে, কি হয়েছে ?

আস্তে ! শালা, সুখেনকে ধরে ধোলাই দিচ্ছে।

কি করেছিল ?

জবাকে নিয়ে মাসীর বাড়ি লুকিয়ে বসেছিল। সকালে দুর্গাপুর পালাবে বলে যেই বেরিয়েছে, ক্যাচ, কট, কট।

তা/ আমরা কি করব ? আমাদের কি করার আছে ?

তার মানে ? প্রেমের যূপকাষ্ঠে একটা ছেলেকে বলি দেওয়া হচ্ছে, একজন রিয়েল প্রেমিক, আমাদের কিছু করার নেই ! দুনিয়ার প্রেমিক এক হও। আমরা শুধু প্রেমের কথা বলি। ও করে দেখিয়ে দিলে।

আমরা থিয়োরিটিক্যাল, ও প্র্যাক্টিক্যাল। কাল কালীঘাটে গিয়ে জবাকে বিয়ে করে এসেছে। কপালে পাঁঠার রক্তের মত এখনও এতটা সিঁদুর লেগে আছে। সেই প্রেমিককে পাঁঠাবলি দেবে, আর আমরা প্রেমের সাপোর্টার হয়ে চুপ করে বসে থাকব ! চলবে না, চলবে না।

ভাগ্য ভাল, ওপরে হাতুড়ি চলছে, নয়ত দীনুর এই গলা ওপরের কানে গিয়ে আর এক নতুন ঝামেলা তৈরি করত। দীনু ত জানে না সুখেনের কলকাঠি কে নেড়েছিল। সুখেনের আগেই ত আমি বলি হয়ে গেছি। দীনুপাঁঠা সে খবর রাখে ! সারা জীবন চেঁচিয়েই মোলো।

আমি গেলে আর এক কাণ্ড হবে।

তুই ভীষণ স্বার্থপর। তোদের ফ্যামিলিটাই স্বার্থপরের ফ্যামিলি।

হ্যাঁরে, তাই ত বলবি। জানিস আমার কি হয়েছে ?

দীনুকে অল্প কথায় ঘটনার আভাস দিতেই দীনু লাফিয়ে উঠল, শালা, কামাল করে দিয়েছিস। সাধে বলে, পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। এক কলমের খোঁচায় টসকে দিয়েছিস। কি লিখেছিলিস মাইরি। জবা তো তাহলে তোরই বউ রে। মেয়েটা মাইরি ।

দীনু একটা চোখ অ্যায়সা বোজাল, মনে হল সারা জীবনের মত দেড় চোখো হয়ে গেছে। দীনু চোখ খুলে বললে, এ অপমান, আমাদের সকলের অপমান। কেমন করে পকেটে পুরি, একটা কিছু ত করতেই হয়।

কি করতে চায় ওরা সুখেনকে নিয়ে ?

আরে জবার সেই কাকাটা, জানিস ত কি জিনিস ! সেই মাল, আর সুখেনের দাদা, দুটো পয়মালে মিলে প্রথমে সুখেনের মাথার অর্ধেকটা কামাবে, তারপর এক গালে চুন আর এক গালে কালি মাখাবে, মাখিয়ে ইজের পরিয়ে পেছনে ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাবে। আর হ্যাঁ, একগাদা ছেঁড়া জুতো যোগাড় করেছে ; মালা করে গলায় ঝোলাবে। দেশে ব্যর্থ প্রেমিকের ত অভাব নেই। প্রেমে সাকসেস দেখলে জ্বলে পুড়ে মরে। সেই মালেরা জুটেছে। তারাই মদত দিচ্ছে।

কি করা যায় বল ত ? রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।

আর একটা সিক্রেট খবর আছে। সুখেনের দাদা। মালকে চিনিস ?

দেখেছি, তবে তুই কোন্ চেনার কথা বলছিস কে জানে !

দীনু আবার দেড়চোখো হয়ে বললে, মেয়েছেলে আছে।

তার মানে ? মেয়েছেলে ত থাকবেই। বিয়ে ত লোকে মেয়েছেলেকেই করে।

তোর মাথা। এ মেয়েছেলে সে মেয়েছেলে নয়। যে মেয়েছেলে বাজারে থাকে। বুঝলে চাঁদু। যারা নিজেরা পাপ করে তারাই সবচেয়ে বড় মর‍্যাল গার্জেন হবার চেষ্টা করে। সব গেল, সব গেল বলে তারাই সবচেয়ে বেশি চেল্লাচিল্লি করে। আমার কি মনে হয় জানিস, ব্যাটা জবাকে হাতাবার তালে আছে।

কি করে ?

খুব সোজা। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে বসবে। ইতিহাস পড়ে দেখ, প্রেমিকরা চিরকাল ফ্যা ফ্যা করে বেড়ায়। কিন্তু লম্পটদের কখনও মেয়ের অভাব হয় না। মেয়েরা মাইরি লম্পটদেরই ভালবাসে।

তুই বড় শালা আর মাইরি বলিস। ভদ্রসমাজে মিশবি কি করে ?

রাখ তোর ভদ্রসমাজ। ওই ত ভদ্রসমাজের ব্যাপার। সুখেনের চে খারাপ ছেলের সঙ্গে জবার বিয়ে দেবে সেও ভি আচ্ছা, তবু একটা ছেলে যেচে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে গাধার পিঠে চড়াবে। এই তোর ভদ্রসমাজ। এর চেয়ে বিলাসপুরের আদিবাসীরা ঢের ভাল। সুখেনটাকে কি করে তাহলে বাঁচানো যায় ?

ব্যাটা পালাল যখন আরো দূরে পালাতে পারল না ?

মনে হয় ঝড়বৃষ্টির জন্যে আটকে গিয়েছিল।

আমাদের দলে কাকে কাকে পাবি ?

বুঝতে পারছি না। সুখেনেরও ত রাইভ্যাল ছিল অনেক। জবার পেছনে কটা ঘুরছিল কে জানে? তবে শিবুদাকে আমাদের দলে পাবই।

কি করে বুঝলি?

এ পাড়ায় শিবুদাই একমাত্র সাকসেসফুল প্রেমিক। থিয়েটারের মেয়েকে বিয়ে করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এলেবেলে বিয়ে নয়, একটা ফলও হয়েছে। তাছাড়া লড়িয়ে মানুষ। একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সব শালা ঠাণ্ডা।

আবার শালা?

শালাদের শালা বলব না তো কি ভগিনীপতি বলব! তুই শালা আচ্ছা এক নীতিবাগীশ হয়েছিস। এরপর বলবি, গরু গলিতে বাথরুম করে গেছে।

ওপরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল। মেসোমশাই আর কনক দু'জনেরই গলা একসঙ্গে পাওয়া গেল, কি হল, কি হল?

দীনু বললে, তোদের কিছু একটা ড্যামেজ হয়ে গেল। ভূত ছেড়ে যাবার সময় এই রকম শব্দ হয়।

মেসোমশাই বলছেন, লেগেছে আপনার? খুব লেগেছে! কেন যে সাতসকালে ওটার পেছনে লাগতে গেলেন। বেশ ত ছিলো।

দীনু বললে, তোদের বোধহয় ছাদ ভেঙে পড়ল।

দাঁড়া আমি দেখে আসি।

হাতুড়িহীন পিতা কুঠারহীন পরশুরামের মত উত্তরের বারান্দায় ছোট একটা মোড়ায় ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। চুন আর বালির প্রলেপ ভেদ করে কুঁচফলের মত অনবরতই নতুন নতুন রক্তের দানা ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার কোনও রেখা নেই। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার মত পায়ে রক্ত ফুটে ওঠার শোভা দেখছেন।

মেসোমশাই উদ্বেগ মাখান গলায় বলছেন, কিছু ত একটা করতে হয় হরিদা। বালিতে, চুনেতে রক্তে মাখামাখি।

হ্যাঁ, কিছু ত একটা করবই। তবে যতটা বেরোবার, আগে বেরিয়ে যাক। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এ রকম দুর্ঘটনা আমার প্রায়ই হয়। একে বলে প্রোফেস্যানাল হ্যাজার্ড।

দীনু আমার পেছন পেছন ওপরে উঠে এসেছে। এক মাথা কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল। ফর্সা টকটকে রঙ। বুক খোলা টি শার্ট। এতখানি চওড়া বুক। এ পাড়ার সবচেয়ে শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। কিছুকাল পিতার কাছে অঙ্ক বুঝে নিতে আসত। লেটার-ফেটার নিয়ে পাশ করেছে। এখন সি-এ পড়ছে। পাশ করেই নিজেদের ফার্মে বসে পড়বে।

দীনু পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, পিন্টু শিগগির গরম জল আর বোরিক তুলো নিয়ে আয়।

পিতা হাসি হাসি মুখে বললেন, আরে, দীনু যে, কেমন আছ?

আমি ত ভাল আছি কাকাবাবু, আপনি একি কাণ্ড করেছেন?

তোমার বাবা কেমন আছেন?

চিঠি দিয়েছেন। ভালই আছেন।

তিনি এখন কোথায়?

লণ্ডনে।

আই সি।

আমি ডক্টর সেনকে ডেকে আনি।

প্রয়োজন হবে না। মাইনর ব্যাপার। লেট মি ব্লিড। সব কিছুরই একটা শেষ আছে। অত বড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও এক সময় শেষ হয়েছিল।

তা হয়েছিল, কিন্তু আহতদের এখনও ফেলে রাখা হয়নি। পিন্টু, তুই ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি ড্রেসিংটা করে রাখি।

তুই পারবি ?

পারব না মানে ? বেডক্রসের ট্রেনিং নিয়ে রেখেছি কি জন্যে ! তুই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ধরে নিয়ে আয়। বলবি এ টি এস নিয়ে আসতে।

পিতা বললেন, ডাক্তাব, এ টি এস কিছুই লাগবে না। এমন একটা মারাত্মক কিছু হয়নি। সামান্য একটু ব্রুইজ, একটু ব্লিডিং।

এখন আপনি আমাদের হাতে। আমাদের মতে চলতে হবে। পিণ্টু তুই চলে যা।

সিঁড়িব দিকে এগোতে এগোতে শুনলাম দীনু কনককে বলছে, দিদি গরম জল বসিয়েছেন ?

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, পাড়া আজ বিশেষভাবে জেগে উঠেছে। পাড়ায় সাড়া পড়ে গেছে। মোহনদার সেলুনের সামনে বিশাল ভিড। সুখেনের মাথা কামান হচ্ছে। সমাজের চোখ লাল হয়েছে, পেট গরম হয়েছে। কোথা থেকে একদল দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ নীতির হাতিয়ার নিয়ে নিরস্ত্র একটি ছেলেকে চেপে ধবেছে। বাধা দেবাব কেউ নেই। সুখেন কি এমন অন্যায় করেছে ! এমনি সব নাকে কেঁদে অস্থির, মেয়ে বড় হয়েছে, পাত্র জুটছে না, জুটলেও কাঁড়ি টাকা চাইছে, আর পাত্র যখন নিজে যেচে এসে মাথা মুড়োতে চাইছে, তখন সব বেঁকে বসছেন। মানুষ এক আজব চিজ।

দু-চারজন রুগী বসে আছেন চেম্বারে। ডাক্তারবাবু এক অল্পবয়সী মহিলার বুকে স্টেথিস্কোপ চেপে ধবে বলছেন, জোবে জোবে নিঃশ্বাস নাও, আবো জোরে, হাঁ করে। হাঁ করে নিয়ে ভস করে ছাড। টেবিলেব ওপব ঝুঁকে পড়ে এক তিরিক্ষি চেহাবাব ভদ্রলোক ক্রমাগত বলে চলেছেন, ছ'টা ক্যাপসুল পড়ে গেল ডাক্তারবাবু, এখনও ভসভসে ভাবটা যে গেল না।

ডাক্তাববাবু নির্বিকাব। বুক থেকে পিঠে চলে গেছেন। মহিলা হাপবের মত ভস্ ভস্ করে চলেছেন। পিঠ পবীক্ষা কবতে কবতেই চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। মুচকি হাসি খেলে গেল মুখে। স্টেথিস্কোপ তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, কি সংবাদ বিদুর ?

তিবিক্ষি ভদ্রলোক মবিযা হযে বললেন, ভসভসে ডাক্তারবাবু।

আবে দূব মশাই। আপনাব ভ্রসভসের নিকুচি করেছে। রোজ মাংসব স্টু খাওযাচ্ছেন ?

আপনি ত বলেই খালাস। অত পযসা কোথায় ?

তাহলে ভসভসেই হবে। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই জিয়ার্ডিয়ার রুগীকে হাই প্রোটিন ছাড়া ভাল করে।

ভদ্রলোক বললেন, ডাক্তারবাবুদের এই এক দোষ, বড়লোক, গবিবলোক আলাদা করতে পারেন না। সব যেন সমান। মুড়ি মিছরিব এক দর।

বড়লোকেব অসুখ বাঁধিয়ে গবিব গরিব করে চেল্লালে আমি কি করব ? ভগবানেব দববাবে নালিশ পেশ করুন। ওই হলদে ট্যাবলেট তিরিশটা খাওয়ান। শাকপাতা একদম চলবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি খবর ?

একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু। বাবার পায়ে প্ল্যাস্টার ভেঙে পড়েছে।

প্ল্যাস্টার করতে হবে ?

আজ্ঞে না, কেটেকুটে গেছে। এ টি এস দিতে হবে।

তোমাব বাবাব চিকিৎসা কবতে সাহস হয না। আমাব জ্ঞান বেবিয়ে পডবে। উনি হলেন ডাক্তারের ডাক্তার। চলো, দেখি কি করা যায় !

কোঁত পেড়ে চেয়ার থেকে নিজেকে ঠেলে তুললেন। বয়েসের ভার, মেদের ভাব। মেযেরা মিউ মিউ করে বললেন, বেরিয়ে যাচ্ছেন ! আমবা অনেকক্ষণ বসে আছি।

আবও একটু বসুন। সবুরে ম্যাওয়া ফলে। ওষুধের গন্ধে অসুখ অর্ধেক ভাল হয়ে যাবে।

রিকশার তিনের চার ভাগে ডাক্তারবাবু। একের চার ভাগে আমি। ঈশ্বরের কি সুন্দর ব্যালেন্স। মানুষের শবীবেও জোয়ার ভাঁটা। এদিক ফোলে ত ওদিক চোপসায়। রিকশাঅলা টানতে পারছে না। লোড ত কম নয়। ডাক্তাববাবু নস্যি নিতে নিতে বললেন, তোমার বাবাব একটা বিয়ে দাও। বেশ

বণচণ্ডী মার্কা একটা মেয়ের সঙ্গে। মা ছাড়া এ মানুষকে সামলাবে কে ? এই নিয়ে কবার হল ? এই হাত উড়ে যাচ্ছে, এই পা উড়ে যাচ্ছে। সেই বেলকাঁটাটা বেরিয়েছে ?

আজ্ঞে না মনে হয়।

বুঝবে ঠ্যালা পবে। ওই কাঁটা এখন ব্লাডস্ট্রিমে ঘুবছে। সোজা যেদিন হার্টে গিয়ে ঢুকবে সেদিন ফিনিশ।

উনি বলেন, সে হজম হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, হজমা হজম। তবে বলা যায় না, ওঁর বক্ত ত সব সময় ফুটছে। কাঁটা হযত ভেপার হয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওদিকে মনে হয় সুখেনকে নিয়ে প্রসেসান বেরিয়ে পড়েছে। মোহনদার সেলুনেব সামনে ক্যানেস্তারা বাজছে মহরমের বোলে। এ সব কাজে লোকের অভাব হয় না। কারুর সর্বনাশ করার চেয়ে উৎসাহের কাজ আর কি আছে!

ওদিককার জটলার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস কবলেন, কি হচ্ছে বল ত ? আজ কি কোন পুজোপার্বণ আছে ? ছট পুজোটুজো ?

আজ্ঞে না। সুখেনের মাথা ন্যাড়া করা হচ্ছে।

ও, মানসিক ছিল ?

মানসিক নয়। কাল রাতে জবা বলে একটা মেয়েকে বিযে কবেছে।

ও, ট্রাইব্যাল ম্যারেজ।

না, রাক্ষস বিবাহ।

খেযে ফেলেছে।

খাবে কেন ? সুখেন আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে। জবাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে কাল রাতে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করেছিল, আজ সকালে ধবা পড়েছে। এখন মেয়ের কাকা আর ছেলেব দাদা দু'জনে মিলে ধরে ন্যাড়া করে, মুখে চুন কালি মাখিয়ে পাডায পাড়ায় ঘোবাবে।

জবা কোন বাডির মেয়ে বল ত ?

ওই ত যার বাবার দু'বার বিয়ে, অনেক দিন হল নিরুদ্দেশ।

ও, বিশুবাবুব মেযে। আরে সে মেয়েটার ত খুব একটা খারাপ অসুখ আছে গো ! ছেলেটা রামছাগল।

পায়ের ধপাস ধপাস শব্দ করে ডাক্তারবাবু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন। দীনু পাকা ডাক্তারের মত কাজ করেছে। ওই কডকডে বালি আর চুন একটু, একটু করে ক্ষতস্থান থেকে ছাড়িয়েছে। পায়ের অবস্থা দেখে গা সিরসিব করে ওঠে। নুনছাল গুটিয়ে পাকিয়ে গেছে। সাদা দগদগে। ঘামের মত বিন্দু বিন্দু বক্ত বেরোচ্ছে। কনক পাকা নার্সের মত দীনু ডাক্তারের হুকুম তামিল করছে। আমি কোথায় প্রভু ! এই একসপার্টদেব জগতে আমি এক কুষ্মাণ্ড। কিছুই পারি না, কিছুই জানি না। তফাৎ যাও যাও বলে সবাই হড হড করে এগিয়ে চলেছে। দীনুতে কনকেতে যে রকম মাখামাখি, 'ব্রেড অ্যাণ্ড বাটা'র অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে শুভযোগ মেসোমশাইযেব দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। কনকের বাবাও বিলেত ফেরত, দীনুর বাবাও বিলেত মারা মানুষ। দুই বেযাইয়ে জমবে ভাল। মিথ্যে বলে লাভ নেই। দু'জনকে পাশাপাশি দারুণ মানিয়েছে। দীনু একটা জামাইয়ের মত জামাই। কনক একটা বউয়েব মত বউ। গন্ধব আর কিন্নরী। চোখেব সামনে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। না, আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। আমি নিজে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি, কনকের যেন দীনুর সঙ্গেই বিয়ে হয। আজ হোক, কাল হোক, ছ'মাস পরে হোক, যেন হয়। মেসোমশাই কাঁচা ছেলে নন। দু'মেযের বাপ। জামাই চেনেন।

ডাক্তারবাবু দীনুকে ভালই চেনেন। বললেন, বাঃ তুমি ত আমার কাজ অনেকটা এগিয়েই রেখেছ। সি-এ না হয়ে ডাক্তার হলেই ত পারতে।

মেসোমশাই বললেন, তুমি বুঝি সি-এ পডছ ? খুব ভাল লাইন। যেমন রেসপেকটেবল তেমনি

রিওয়ার্ডিং।

এই ত, এই ত মাছে টোপ গিলেছে। ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন। ডাক্তারবাবু পিতার পায়ের সামনে মোড়ায় বসলেন। বসে বললেন, বাঃ, এই তো বেশ জট পাকিয়েছেন। বালিতে চুনেতে, চামড়াতে, রক্ততে একেবারে ক্যাডাভাবাস কাণ্ড।

ডাক্তারী ব্যাগটা বেশ প্রাচীন হয়েছে। চামড়ায় কোঁচ ধরেছে। যৌবনের বাঁধুনি নেই। মেঝের ওপব পড়ে আছে থেসকে। নিচু হয়ে একটা সার্জিক্যাল কাঁচি বের কবতে কবতে ডাক্তাববাবু বললেন, হবিবাবু আপনি হলেন আমাদের পরীক্ষা। অঙ্কে যেমন কম্পাউণ্ড ইনটারেস্ট, রুগীদের মধ্যে সেই রকম আপনি। একেবারে জটিল জলতরঙ্গ। কি কায়দায় এমন করলেন ? পা দিয়ে পিলাব ভাঙছিলেন, নৃসিংহ অবতারেব খোঁজে ?

পিতা মৃদু মৃদু হাসছেন। মুখে একটু গর্বের ভাব। হেঁ হেঁ ব্বাবা করেছি একটা কাণ্ড। আমার কি। আমি ত পা ছড়িয়ে বসে আছি। ম্যাও সামলান আপনি। কাঁচি দিয়ে কুট-কুট করে চামড়া কাটছেন। গা সিব সির করছে। দীনুব কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। পাশেই হেলেন কেলার। তিনিও নির্বিকার।

ক্যানেস্তারা-বাদ্য বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। ইস সুখেন চলেছে। একগালে চুন, একগালে কালি। ডাক্তাববাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কলির কেষ্ট চলেছে হে। শ্রীরাধিকা কি সঙ্গেই আছেন ?

পিতা মুখ তুলে তাকালেন। নীরব প্রশ্নে জানতে চান, কি হচ্ছে বাস্তায়। রাধা-কৃষ্ণ আবাব কোথা থেকে এলেন। দীনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমি এক্ষুনি আসছি বলে, তীরবেগে দৌড়ল সিঁড়িব দিকে।

ইঞ্জেকসানের অ্যামপুলে ছোট্ট করাত ঘষতে ঘষতে ডাক্তাববাবু বললেন, আজকালকাব ছেলেপুলে যা হযেছে, শান্তিতে আর সংসাব করা যাবে না হবিবাবু। ছেলে থাকলেও মুশকিল, মেয়ে থাকলেও মুশকিল।

উত্তরে পিতা একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। রাস্তায় ঘুষোঘুষির শব্দ হচ্ছে। কে কাকে ধবে প্রচণ্ড পেটাচ্ছে।

সিবিঞ্জের নিডলটি হাতে ঢোকাতে ঢোকাতে ডাক্তারবাবু বললেন, দীনুকে বিশ্বাস নেই। গিয়েই মনে হয় মারামাবি শুরু করেছে।

পিতা লাফিযে উঠলেন, অ্যাঁ, বলেন কি ! দীনু মারামাবি করছে !

ডাক্তারবাবু বলছেন, করেন কি, করেন কি ! নিড্‌ল ভেঙে যাবে।

দীনু ধরাধ্‌ধড় ঘুষি চালাচ্ছে। যে ব্যাটা নেচে নেচে টিন পেটাচ্ছিল সে টিন ফেলে দৌড় মেরেছে। সুখেনের দাদাটা একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িযে আছে। জবার কাকা, সেই পালের গোদাটা হাতের আস্তিন গুটিয়ে দূর থেকে একবার কবে ঘুষি তুলছে আর বলছে, হু আব ইউ ? হু আব ইউ ?

দীনুর শুধু হাত নয়, পাও চলছে সমানে। পিতার ওপর বাহুতে এ টি এস সামান্যই ঢুকেছে। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি নিডলটা বের করে নিয়েছেন। নইলে ভেঙে ঢুকে যেত। রক্তের স্রোতে বেলকাঁটা ঘুরছে, সঙ্গে দোসর জুটেত ভাঙা ছুঁচ। রাস্তার দিকে জানলায় দাঁড়িযে উত্তেজনায পিতা পা ঠুকছেন, আর এক সময়ের কৃতী ছাত্র দীনুকে উৎসাহ দিচ্ছেন, সাবাশ ! সাবাশ ! চালিযে যাও। মেরে ফ্ল্যাট করে দাও। সব বাড়ির জানালাতেই সারি সারি মুখ।

পিতৃদেবের একপাশে মেসোমশাই আর একপাশে ডাক্তারবাবু হাতে ইঞ্জেকসানের সিবিঞ্জ। দুই বোন আর এক জানালায় পাশাপাশি ! আমি ফাঁকে ফোকরে চোখ রেখেছি। দীনুব বীরত্ব যত বাড়ছে আমাব ভেতরটা তত হুহু করে জ্বলছে। শামুকের মত বীরত্বেব ডাণ্ডা বেয়ে দীনু ওপরে উঠছে। হিরো, সুপাব

হিবো, সুপ্রিম হিবো, ক্রমশই ঝাণ্ডা উঁচু হচ্ছে আব আমি ক্রমশই ঠাণ্ডা হয়ে আসছি। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছি কনকেব মুখের দিকে। চোখ ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কনকের মনেব দেযালে দীনুব বীরত্বের গজাল পেবেক এক এক ঘুষিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। সাধে বলে বীবভোগ্যা বসুন্ধরা।

বৃত্তাকার একটা জাযগায় চুনকালি মাখা, আধমাথা কামান, ছেঁড়া প্যাণ্ট পরা সুখেন আমাদের 'ফক্স সাহেবে'র মত দাঁড়িযে আছে। মাঝে মধ্যে ফক্স সাহেব এখনও এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায। বেঁটে খাটো মানুষ। মাথায় শোলার টুপি। পরনে ঢোলা কোট প্যাণ্ট। প্যাণ্টের তলা ছিঁড়ে খুঁড়ে ঝুলঝুলে। পায়ে গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া তালিমাবা বুট জুতো। মুখে চুন আব কালি। প্রেমের নয় জীবিকাব। পেছনে এক হাফ প্যাণ্ট পরা কিশোবের মাথায বিশাল কাঠেব সিন্দুক। সাহেব চলেছে হুপ হাপ শব্দ করতে কবতে। ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখায়। কোনও দিন দেখা হয়নি।

দীনু তাল ঠুকে বললে, 'আর কে আছিস চলে আয়।'

পিতৃদেব বললেন, 'আমাবও ইচ্ছে করছে গোটা কতক ঘুষি হাঁকড়ে আসি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কি তা জানা আছে?'

অনুমান করতে পারি, এ ফর্ম অফ সোস্যাল র‍্যাগিং।

কেন? সে খবর বাখেন? পুলিস কেসে পড়ে যাবেন যে!

কেন?

ওই ছেলেটা কাল একটা মেয়েকে নিযে পালিয়েছিল। আজ ধবা পড়েছে। সেই অপবাধেব উচিত শাস্তি চলেছে। এর মধ্যে দীনুর নাক গলাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আই সি! আমাদের পাশেব বাড়ির সেই মেয়েটি। বেশ, ছেলেটাকে ধবে পুলিসে দিক। দেশে আইন আছে, আদালত আছে। কতকগুলো অর্বাচীন ইডিয়টস হাতে আইন তুলে নেবে, আর আমবা দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে গাধার মত দেখব। সে ত হতে পারে না। সভ্য মানুষ সভ্য উপাযে বিচার কববে। আমরা জঙ্গলে বাস করছি না। আমবা একদল হনুমান নই? কিল হিম। কিল দ্যাট বাস্টার্ড।

জবাব কাকা আধলা একটা ইট তুলে দীনুর দিকে এগিযে আসছিল। আহত পা নিযে পিতা দুদ্দাড় করে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। মেসোমশাই চেপে ধবলেন, কবছেন কি? আপনার সে বয়েস আছে?

পিতা রুখে দাঁড়ালেন, অন্যায়ের প্রতিবাদে বযেস আবার কিসের বাধা?

অন্যায বলছেন কেন? ওবা যা করছে ঠিকই করছে, এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট।

একে এগজাম্পল বলে না। এ হল চরম অসভ্যতা। মনুষ্যত্বেব অবমাননা। আই মাস্ট রেজিস্টাব মাই প্রোটেস্ট উইথ এ ব্লো।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনার পায়েব অবস্থা খুব ভাল নয় হবিবাবু। তাছাড়া এই উটকো ঝামেলায় আপনাব মত মানুষের জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।

এসকেপিস্ট। ইউ আর অল এসকেপিস্ট। মধ্যবিত্তের মিন মেণ্টালিটিতে ভুগছেন।

দীনু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, পালাচ্ছিস কেন শালারা? পালাচ্ছিস কেন?

পিতা বললেন, ইশ, ইশ, শালাটা না বললেই পাবত।

উত্তেজনাব ছোঁযা কনকের মনেও লেগেছে। জানালার ধার থেকে রিলে করলে, সব ব্যাটা পালাচ্ছে। মেসোমশাই বললেন, দিজ জানালাজ, অফুল উইনডোজ, ভদ্রবাড়িতে জানালা থাকা উচিত নয়। ভেতরে যাও। তোমরা ভেতরে যাও।

ডাক্তারবাবু বললেন, চেম্বারে রুগী বসিয়ে এসেছি। বি সেনসিবল্। আমাকে আমার কাজটা সেরে নিতে দিন।

পিতা হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ফুঁড়ে দিন।

বসুন। মাথা ঘুরে যেতে পারে।

আমার সে মাথা নয় ডাক্তাব। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই আমার তিন তিনটে দাঁত তুলিয়েছি। নিচে

থেকে দীনু বীরের মত হাঁক ছাড়ল, পিণ্টু নেমে আয়।

সুখেন আমাদের গলিতে এসে বসেছে। সারা শরীর থির থির করে কাঁপছে। দু'চোখে দু'রঙের জল গড়াচ্ছে। চুন মাখান গালে মুক্তোর দানা, আলকাতরা মাখান গালে কয়লার রস। দীনু এক ধমক লাগিয়ে বললে, তুই আমাদের একবারও বললি না কেন ইডিয়েট ? আমরা দলবল নিয়ে বেডি থাকতুম। এবার তুই পাড়ায় মুখ দেখাবি কি করে ?

পিতৃদেব নিচে নেমে এলেন। প্রথমে ডাক্তারবাবু সবশেষে মেসোমশাই। ডাক্তারবাবু যেন পালিয়ে বাঁচলেন। পিতা সুখেনকে ভাল করে দেখে বললেন, তুমি ত চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে ?

উত্তব দিল দীনু, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমিই ত ট্র্যাপিজের খেলা দেখাও ব্যায়াম সমিতিতে ?

দীনু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার এই দুর্মতি হল কেন ? দেশে কি মেয়ের অভাব !

সুখেন ধবা ধরা গলায় বললে, কাকাবাবু, আমার একলাব দোষ নয়। জবা বললে, কলিতেও আর একবার অহল্যা উদ্ধার হোক। দুটো মা আর একটা কাকাতে মিলে আমার জীবন শেষ করে দিলে।

এই বাজারে একটি বাঙালী মেয়েকে উদ্ধার কবাব চেষ্টা অহল্যা উদ্ধারের চেয়েও মহৎ কাজ। জজেও মানবে। কি বলেন বিনয়দা ?

মেসোমশাই হিসেবীর হাসি হাসলেন। স্বাভাবিক। মাথায় মাথায় যাঁর দুই মেয়ে তাঁকে এই ব্যাপাবে রায় দিতে হলে অবশ্যই অনেক ভাবতে হবে। বলা যায় না, আবার কোনও রামচন্দ্র যদি এদিকে হঠাৎ পা বাড়ান, তা হলে জয়রাম না বলে ছিছি রামই বলতে হবে।

পিতা সুখেনকে বললেন, তোমাব দাদা হঠাৎ ঘবের শত্রু বিভীষণ হয়ে তোমাকে নিয়ে বাঁদর নাচ করল কেন ?

সে কাকাবাবু এক নোংবা ব্যাপার। দাদাকে ত আপনি চেনেন না। অতি নোংবা মানুষ। বউদিকে ত প্রায় ত্যাগই করেছে। নিত্য কিল, চড়, ঘুষি, লাথি। বাইবে আসা যাওয়া আছে। রেস আছে। নেশা আছে। আর আছে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি একা গ্রাস করার ইচ্ছে। জবাব কাকার হাতে কালোবাজারীর পযসা। বাড়িটা তাকে বেচতে পাবলে, দু' তরফেরই লাভ। এর ফুর্তি, ওর সম্পত্তি। রতনে রতন চিনেছে।

আই সি। জবাব বয়েস কত ? সাবালিকা ?

কুড়ি-একুশ ত হবেই।

বহত্ আচ্ছা ! তবে ত কোনও ভযই নেই। কি বলেন বিনযদা ?

হ্যাঁ, আইন বলে, সাবালিকা স্বেচ্ছায তার পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে কবতে পাবে।

তা হলে, আমরা লড়ে যাই। গেট রেডি ফর এ লিগ্যাল ফাইট। দীনুর অ্যাগেনস্টে ওরা ফৌজদারী করবেই। পয়সা আছে, ছেড়ে কথা বলবে না। সুখেনকেও ফাঁসাবার চেষ্টা করবে।

মেসোমশাই হুঁ হুঁ করে হেসে বললেন, আপনি একটা লিগ্যাল এড সোসাইটি খুলুন হরিদা। যেভাবে হুড় হুড় করে কেস আসছে, আমি এখানেই পার্মানেণ্টলি থেকে যাই।

কথার মধ্যে ব্যঙ্গেব ছোঁযাটুকু পিতা ধরতে পাবলেন না। উত্তেজনায় মেতে আছেন। আমাকে বললেন, টারপেনটাইনের বোতল আর এক ফালি ন্যাকড়া নিয়ে এস। আর হ্যাঁ, আমার বাটলাবের ক্ষুরটাও নিয়ে এস। মাথাটা পুবো চেঁচে দি।

মেসোমশাই ওপরে উঠতে উঠতে বললেন, কখন কি নিয়ে যে মেতে ওঠেন আপনি ! নিজের পাটা আগে সামলান। নিজের ছেলেটাকে আগে মানুষ করুন।

তার মানে ? পিতা ফোঁস করে উঠলেন, ও কি অমানুষ হয়ে আছে ?

মানুষ বলতে যা বোঝায় তা কি হযেছে ? যদি মনে করেন হয়েছে, আমার কিছু বলাব নেই।

মানুষ বলতে আপনি কি বোঝেন ?

এডুকেশান। এম. এ করুক। পি. আর. এস., পি-এইচ ডি করুক। বড় ডাক্তার, কি ইঞ্জিনিয়ার হোক। সারাদিন বাড়ি বসে আছে, ফস্টিনস্টি করছে। বড় বড় কথা বলছে। এটা কি মানুষ হবার লক্ষণ!

বিনয়দা, মানুষ বলতে আপনি বোঝেন তোতাপাখি, আমি বুঝি মানুষ। চরিত্রে, আচারে, আচরণে সংস্কৃতিতে, সহবতে একটা পরিপূর্ণ মানুষ ইউনিভার্সিটির দরজা গলে বেরোয় না, বেরোয় পরিবারেব ফার্নেস থেকে। একদিন ইংরিজি নিয়ে ওর মুখোমুখি বসবেন নাকি? বসবেন সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে? ধর্ম নিয়ে একদিন একটু আলোচনা হোক না। পরীক্ষা করুন না ওর ধৈর্য, সংযম, লোভ, সহিষ্ণুতা

ওতে জাগতিক কিছু হয় না হরিদা। ছাপ চাই, ছাপ। নামের পেছনে এত বড় একটা ন্যাজ চাই, ন্যাজ। আপনার ছেলে আপনার কাছে হীরের টুকরো হতে পারে, জগতের বিচারে কয়লা।

মেসোমশাই দুমদুম করে ওপরে উঠে গেলেন, সিনেমার ব্যারিস্টারের ভঙ্গিতে। হঠাৎ আমার বয়েস যেন বিশ বছর বেড়ে গেল। এত সব গুণের কোনো ঘনঘটাই আমার নেই। আমি মহাপুরুষ? কাপুরুষ বললে শোভা পায়। ধৈর্য? ছুঁচে সুতো পরাবার সময়েই ধৈর্য বোঝা যায়। সহিষ্ণুতা? একটার বেশি দুটো কাজের কথায় যাব মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, সে হল সহিষ্ণু? সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় যে বেতো ঘোড়াব মত আর্তনাদ করে সে হল সহিষ্ণু? আমার লজ্জা বাড়াবার জন্যে কেন এসব বললেন? মেসোমশাই ঠিকই বলেছেন আমার দ্বিভুজে এমন কোনও হাতিয়ার নেই যা দিয়ে জগতেব সঙ্গে লড়তে পারি। ময়লা পইতেতে চাবি বেঁধে, হাতে শালগ্রাম নিয়ে বাড়ি বাড়ি পুরুতগিবি করে যাকে দূর ভবিষ্যতে পেট চালাতে হবে, তাব জন্যে পিতার এত গর্ব মানায় না। লোকে বলবে, লাভ ইজ ব্লাইণ্ড। অহঙ্কাবী মানুষটি বড় অপমান করে গেলেন। ন্যাজ নেই বলে এত অসম্মান?

তারপিন দিয়ে সুখেনেব মুখেব আলকাতরা তোলা হল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে। মাথা তেল চুকচুকে করে কামান। বেশ সাধু সাধু দেখাচ্ছে। ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। দীনু এক সেট প্যাণ্ট, জামা আব টুপি এনে দিয়েছে। বাথরুমে ঢুকে সুখেন চান করে নিয়েছে। রাস্তায় বেরোতে লজ্জা পাচ্ছে। মানুষেব ভুলতে সময় ত লাগবেই। রাত ছাড়া এ প্যাঁচার আর রাস্তায় বেরোবার উপায় নেই। কাকে ঠোকরাবে।

সুখেন বললে, আমি আজই দুর্গাপুর চলে যাব।

দীনু বললে, মামার বাড়ি। তোর বউয়ের কি হবে?

এক রাতের বউ ভাই। তাকে আর পাব কোথায়? চিরাগ কাঁহা, রোশনী কাঁহা। তাকে বোধহয় উলঙ্গ করে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে।

সে কি রে!

আরে ওটা একটা পাপের বাড়ি।

সুযোগ পেলেই তাল বুঝে পাখি দেখবি উড়ে আসবে তোর খাঁচায়। সবুরে মেওয়া ফলে রাজা।

কোনো পবিখাই খুব প্রশস্ত নয় এবং কোনো দেয়ালই খুব উঁচু নয়, ভালবাসা যদি থাকে, দুজনে এসে মিলবেই। কোনো ঝড়ই খুব ভয়ঙ্কর নয় এবং কোনো রাত্রিই খুব অন্ধকার নয়। ভালবাসা যদি থাকে, দুজনে পবস্পরকে দেখবেই। যেমন ভাবেই হোক জ্যোৎস্না আসবে, তারার আলো ঝরবে, যেমন ভাবেই হোক মোমবাতি, আলো বা একটি লণ্ঠন জ্বলবেই।

কার কবিতা রে? পরে আমাকে লিখে দিস তো। বাঁধিয়ে রেখে দোব। আমার জন্যেই লেখা মনে হয়।

যে গাড্ডায় পড়েছিস, সেই গাড্ডা থেকে আগে ঠেলে ওঠ। মাথায় সেই কোঁকড়ান চুল আবার ফিরে আসুক, তারপব আবার প্রেমের গর্তে পা দিবি। ব্যাটা ন্যাজ কাটা শেয়াল।

প্রেম হল বসন্ত গাছেব ফুলের মত। গাছ যতদিন না মরছে ততদিন ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফুটবেই।

এখনও তোর কাব্য আসছে রে দামড়া! নাঃ তুই রিয়েল প্রেমের ধাতুতে তৈরি। বোস মোটরবাইকটা বের করে আনি। তোকে এ পাড়া থেকে পগার-পার করে দিয়ে আসি।

দীনু বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। সুখেন প্রেমের ধাতুতে তৈরি হলে, দীনু বীরের ধাতুতে। সুখেন ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ইস, কি করে দিয়েছে মাইরি। সুযোগ পেলে এর বদলা একদিন আমি নেবোই।

একা ভাল কাজ করা যায় সুখেন, অন্যায় কাজে দল চাই। একা তুই মঠ, মন্দির, মিশন করতে পারিস, পরনের কাপড় খুলে দান করে দিতে পারিস, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার কবতে পারবি না। রোজ কত অন্যায়ই ত মানুষ করছে, কোথায় তার প্রতিকার! সৎ কাজের চেয়ে পৃথিবী জুড়ে অসৎ কাজেব পরিমাণ হাজাব গুণ বেশি।

যা যা, বুড়োদের মত ভিজে ভিজে কথা আব বলিস নি ত! তুই ব্যাটা একেবারে বুড়ো হয়ে গেছিস। কাকাবাবু এখনও তোর চেয়ে ইযং আছেন।

দীনুব মোটর-সাইকেল বাড়ির সামনে এসে থামল। এবই মধ্যে পোশাক পালটে এসেছে। ছোকবাব শরীরে রাজপুত্তুরের বক্ত বইছে। তা না হলে এমন 'লেডি-কিলারের' মত চেহারা হয়? পুলিস কি পাড়ার লোক দীনুর টিকিও ছুঁতে পারবে না। দীনুব বাবার যা **ইনফ্লুয়েন্স**! মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওঠাবসা করেন। আমাদেব অনেক ক্ষতি অনেকে কবতে পাবে। বাঁচাবার কেউ নেই।

সুখেনকে পেছনে বসিয়ে দীনু সশব্দে, পাড়া কাঁপিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ন্যাড়াকে বেল তলায় ছেড়ে দিয়ে আসি।

সুখেনেব ছেঁড়া ঝলঝলে প্যান্ট, কালিঝুলি মাখা জামা ফেলে যাওয়া উৎকণ্ঠাব মত গলিতে পড়ে বইল। ওই সাজ এবার তোমাকে না পবিয়ে ছাড়ে। প্রেমের কাঁঠাল কোথায় পাকছে মানিক। শীতলাতলাব আটচালায়। মাযাব সঙ্গে আর বেশি মাখামাখি কবতে যেও না। ওখানে ভোঁদাব নজর পড়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বড প্রবল হে।

সিঁড়িব মাথায় পিতৃদেব। প্রশ্ন কবালেন, ওরা কোথায় গেল?

কিছু বলে গেল না ত।

একবাব জিজ্ঞেস কবলে না! তোমাব কি মনে হয চ্যাপ্টাব ক্লোজড হয়ে গেল?

আজ্ঞে না। এই ত সবে শুরু।

দ্যাটস বাইট। এই ত বুদ্ধি পাকছে। কে বলে, তুমি আমাব পুঁযে পাওয়া ছেলে? আশঙ্কা নিযে বাঁচতে শেখ। বিপদেব ঢেউ কেটে কেটে চালাও তোমাব জীবনেব জাহাজ। ছেঁড়া-খোঁড়া ওগুলো কি?

সুখেনের জামা-প্যান্ট।

ফেল না, ছাতে নিযে চল।

কি করবেন?

কাকতাড়ুযা তৈবি কবব। প্রেমের কাকতাড়ুয়া। ওপাশেব ছাতে, যে পাশে গাছেব টব, হতচ্ছাড়াদেব বাড়ি, সেই ছাতে থাকবে কাকতাড়ুযা। একে কি বলে জান?

আজ্ঞে স্কেযাব ক্রো।

তোমার মাথা। একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। ওরা ঘুরবে ফিরবে আর দেখবে। ক্রমশই মেণ্টালি সিক হয়ে পড়বে। ম্যাকবেথের ভোজসভায় ব্যাঙ্কোব ভূত। রাজাব আসন দখল করে বসে আছে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, পাচ্ছে খুনী ম্যাকবেথ। চিৎকার কবে বলছে, তুমি মাথা নাড়তে পার না, তুমি কথা বলতে পার না, তোমাকে আবাব ভয কিসেব! পবমুহূর্তেই আর্তনাদ, ঈশ্বব, মর্গ থেকে যদি মৃতদেহ বেরিয়ে আসে, যাদের কববে রেখে এসেছি, তাবা যদি কফিনের ডালা খুলে একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে, old mouments, shall be the maws of kites তোমাব কেমন লেগেছিল কাল?

কি লাগার কথা বলছেন?

যখন বালিশ-টালিশ বেব কবতে করতে বললুম, তোমাব সঙ্গে এক বিছানায শুতে আমাব ঘেন্না কবছে।

খুব খারাপ।

মনটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়নি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেহ ঠিক রইল, মনটা কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। কি ভীষণ যন্ত্রণা, তাই না? একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। মানুষকে সংযত রাখার জন্যে মনের মধ্যে ভূত ঢোকাতে হয়। তা না হলে শয়তান বাড়তে বাড়তে দেবতাকে গ্রাস করে ফেলে। রান্না মনে আছে, না ক'দিনের সুখে ভুলে বসে আছ!

না, মনে আছে।

তা হলে চলে এস ওপরে। পুরনো অভ্যাস আজ আবার ঝালাই হবে।

উত্তরের বারান্দার একপাশে কনক উদাস মুখে বাগানের গাছপালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিসের যেন প্রত্যাশা! গ্রহান্তরের কোনো জীব এসে নামবে বাগানের কোণে। বড় ঘরে মেসোমশাই পায়চারি করছেন। পিতৃদেবের হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হচ্ছে। সামান্য খোঁড়াতে হচ্ছে।

মেসোমশাই বললেন, হরিদা, আপনার হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের কোনও কারণ খুঁজে পেলুম না।

কারণ দেখিয়ে কোনও কাজ করার অভ্যাস আমার কোনো কালে ছিল না, আজও নেই! আমাদের রান্না আমরাই করে নেব, যেমন করে আসছি এতকাল।

কেন, বলবেন ত!

আবার কেন? কোন কেন নেই। সিদ্ধান্ত ইজ সিদ্ধান্ত।

তার মানে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলছেন।

তা ত বলি নি।

কনক কথা কাটাকাটি শুনে ঘরে এসেছে। ছলছলে চোখে বললে, আপনি কেন এত রেগে গেলেন মেসোমশাই। এই ত কালই বললেন, তোমার মত মেয়ে পাশে থাকলে সংসারে ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিতুম।

হ্যাঁ বলেছিলুম। যে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা সূর্যের প্রত্যাশা করি, সে আকাশেও হঠাৎ মেঘ আসে, সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, দিনে ছ্যাতলা ধরে। আশা আর প্রত্যাশার মাঝখানে অনিশ্চয়তার বিশাল ব্যবধান। অনেক বাধা। দিতে চাইলেও দেওয়া যায় না, নিতে চাইলেও নেওয়া যায় না। সাইকোলজিক্যাল ম্যানের এই হল ট্র্যাজেডি। মনের বিশুদ্ধ নীল আকাশে অহঙ্কারের মিশকালো মেঘ।

মেসোমশাই বললেন, আপনি ভয়ঙ্কর ইমোশানাল। সামান্যকে অসামান্য করে তুলে নাটক করতে চান।

কি বললেন, ইমোশান! এই চেয়ারের ইমোশান নেই, ওই টেবিলের নেই, দেয়ালের নেই। ইমোশান আছে বলেই আমরা মানুষ। ইমোশানই আমাদের মোশান। আবেগই আমাদের প্রাণ। বিশাল এই রঙ্গমঞ্চে সারা জীবন আমি নাটক করে যাব।

তা হলে তাই করুন। আপনার ছেলে সম্পর্কে এমন কিছু অন্যায় বলিনি। যা দেখছি হিতৈষী হিসেবে তাই বলেছি। পুত্রস্নেহে আপনি অন্ধ হয়ে আছেন। আপনি ওর মঙ্গল চান, না অমঙ্গল চান?

আপনি যেভাবে চান, আমি সেভাবে চাই না। আমি কৃতদাস তৈরি করতে চাই না। আমি চাই মানুষ। পরিপূর্ণ একটি মানুষ। তর্ক করে লাভ নেই। তর্কে বিবেকানন্দ আসবেন, রবীন্দ্রনাথ আসবেন। আপনাদের শিক্ষার মূল নড়ে যাবে। চুপ করে থাকাই ভাল। কাল পর্যন্ত আপনি আমার আত্মীয় ছিলেন, আজ আপনি একজন শিক্ষাগর্বী, মদগর্বী ব্যারিস্টার। অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা, অনেক উচ্চাশা। আমরা রিক্ত ফকির। আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টাই আমার যৎসামান্য বিলাসিতা।

কি আপনার আদর্শ? গাছ তৈরিটা আদর্শ, না আগাছা গজিয়ে তোলা আদর্শ?

কনক এগিয়ে এসে বললে, আপনাদের এই কথা কাটাকাটি আমার একদম ভাল লাগছে না। বাবা, আপনি চুপ করুন না। মুকুকে পড়াতে বসুন। বই খুলে বসে আছে অনেকক্ষণ।

মেয়ের কথায় মেসোমশাই সরে গেলেন। কনক শান্ত নরম গলায় জিজ্ঞেস করলে, একটু চা খাবেন মেসোমশাই ?

চা ? হ্যাঁ, তা খেলে হয়। না থাক।

কনক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। চোখ ছলছল করে উঠছে। একটা ধরা ধরা গলায় বললে, আপনারা বড় নিষ্ঠুর।

নিষ্ঠুর কেন ? নিষ্ঠুরতার কি দেখলে ?

আমরা কি সুন্দর ছিলুম, কি বিচ্ছিরি হয়ে গেলুম। বাইরে কি একটা ঝামেলা হল, আমাদের ভেতরটা সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

পিতা শব্দ করে হাসলেন, জীবন মানেই ঝড়ো হাওয়া কনক , জীবন মানেই ঝড়। কবার কিছু নেই।

সকাল থেকেই সংসারের চাতালে চড়া নাটক চলেছে। হাত নড়ছে, মাথা দুলছে, চোখ ছলছল হচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ করে, অদৃশ্য কোনও শ্রোতাকে পিতা বললেন,

When the wind works, against us in the dark
come out, come out
It costs no inward struggle not to go.

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে পিতা বললেন, পুলিস এল। গেট রেডি। শোনো তোমাকে বলে যাই, জেলখানার খাবার আমার গলা দিয়ে গলবে না, তুমি আমাকে রোজ একটু দুধ আর পাঁউরুটি দিয়ে আসবে। পারবে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন পারব না ? কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়ে আনাব কি হবে ?

তোমার মাতামহের সাহায্য নিও। তিনিই আমার রিয়েল ফ্রেণ্ড। দু'জনেই আমরা ঘরপোড়া গরু।

গাড়ির দরজা বন্ধ হল। এইবার জোড়া জোড়া বুটের শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে পুলিসের দল উঠে আসবে। আমাদের অপরাধটা কি ? পুলিস আসবে কেন ?

সিঁড়িতে খুড়ুস খুড়ুস করে জুতোর শব্দ হচ্ছে। পুলিস ত এমন ভদ্রভাবে আসে না। এ যেন পাঁচির ছাগল ছাড়া পেয়ে ওপরে উঠে আসছে। খোলা দরজার সামনে প্রতাপ রায়। আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, নাটকের মহড়া চলছে নাকি ?

পিতা বললেন, কি ব্যাপার তুমি ?

চলে এলুম। ওই কিছু লিগ্যাল পরামর্শ, তাছাড়া মেডিকেল চেক-আপ। বিষয় বিষ ! বিষয় বিষ ! প্রতাপ রায়ের গলা শুনে মেসোমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাল ভাঙা নাবিক যেন তীর দেখতে পেয়েছেন। কোস্ট অ্যাহয়, কোস্ট অ্যাহয় বলে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রতাপ রায় উদ্ভাসিত মুখে বললেন, কিছু আগেই এসে পড়লুম দু'টো কারণে। কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ কোনটা কি লাগে জানা নেই, আমার ওখানে বসেই যদি দেখেন বড় বাধিত হই। তাছাড়া কোনও কাজের দায়িত্ব নিলে, যতক্ষণ সেটা করতে না পারছি, ততক্ষণ ভেতরটা এত ছটফট করে, খেয়ে, নেয়ে, শুয়ে স্বস্তি পাই না। ওই মেডিকেল চেক-আপ ! আমার বন্ধু বললে, বেলাবেলি পেশেণ্টকে নিয়ে আয়।

মেসোমশাই এক মুখ হেসে বললেন, কর্তব্যপরায়ণ মানুষের লক্ষণ। এ এক দুর্লভ লক্ষণ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আমি আপনার ছেলের বয়সী। চেহারাটাই যা একটু মোটাসোটা হয়ে গেছে।

মোটাসোটাই ত ভাল ; বেশ ম্যানলি। পুরুষের চেহারা ফিনফিনে হলে মানায় না। মানুষ হবে হেলদি, ওয়েলদি অ্যাণ্ড ওয়াইজ।

ঘুঁঘুক ঘুঁঘুক করে হেসে প্রতাপ রায় বললেন, তা হলে চলুন।

কিন্তু বাবা খাওয়া-দাওয়া যে হয়নি এখনও !

খাওয়া-দাওয়া ! ওটা একটা কথা হল ! আপনারা যাচ্ছেন কলকাতার বিখ্যাত রায়-বাড়িতে। যে পরিবার অতিথি সৎকারে ইতিহাস তৈরি করে রেখে গেছে। যার পিতাকে জনৈক নিমন্ত্রিত, তবে রে শালা বলে, পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে, খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

কেন গো !

এত খাইয়েছেন যে আর হাঁ করতে পারছেন না, সেই অবস্থায় জোর করে, পাতে গোটা কতক একেবারে গাছপাকা ল্যাংড়া আম ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আপনি মেসোমশাই সেই বাড়িতে যাচ্ছেন।

পিতৃদেব এতক্ষণ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ প্রতাপ ?

প্রতাপ রায় আমতা আমতা করে বললেন, স্কটিশে পড়তুম। ফোর্থ ইয়ারে বাবা মারা গেলেন। বিষয়-সম্পত্তির চাপ এসে গেল। তাই ছেড়ে দিতে হল।

এমনভাবে, 'ছেড়ে দিতে হল', বললেন যেন খাঁচা খুলে পাখি ছাড়লেন।

পিতা বললেন, এটা তুমি আজ কি পরে এসেছ ?

কেন ? চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি।

মেয়েদের অন্তর্বাসে এই ধরনের কাজ দেখা যায় বটে।

তা যা বলেন।

এতে কিন্তু তোমাকে তেমন ম্যানলি ম্যানলি দেখাচ্ছে না। কি রকম যেন লোফার লোফার দেখাচ্ছে।

মেসোমশাই বললেন, রহিস আদমিরা এই রকম পাঞ্জাবিই পরেন। চমৎকার মানিয়েছে।

ওঃ, তা হবে।

পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেম। মেসোমশাই বললেন, হরিদা, আমি তাহলে মেয়েদের নিয়ে একবার ঘুরে আসি। রথ দেখা, কলা বেচা দুই-ই হবে।

অ্যাজ ইউ লাইক।

কনক চাপা সুরে বললে, এঁদের খাওয়া-দাওয়ার কোনও ব্যবস্থা না করেই চলে যাব ?

আমরা যখন আসিনি তখন এঁরা কি করতেন ? এদের রেঁধে খাওয়াবার জন্যে ত আমরা আসিনি।

পিতার কথায় কনক কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বড়দের জগৎ স্বার্থের চাকায় ঘোরে। বাধে, তুমি কি তা জানতে না !

সেজেগুজে তৈরি হয়ে, কনক পিতৃদেবের সামনে ছলছলে চোখে এসে দাঁড়াল, মেসোমশাই, কি করব বলুন, আমি তাহলে আসছি।

পিতা মাথায় হাত রেখে বললেন, হ্যাঁ মা, সেরে এস।

মুকুকে নিয়ে মেসোমশাই এসে দাঁড়ালেন, হরিদা, ঘুরে আসছি।

হ্যাঁ, আসুন।

প্রতাপ রায় দূর থেকে হেঁকে বললেন, আমরা আসছি।

অতি ক্ষীণগলায় পিতা বললেন, এসো।

শুনতে পেল কি পেল না, কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করল না। গাড়ির দরজা বন্ধ হল। ইঞ্জিনের শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। বারান্দার রেলিঙে ভর রেখে, রোদ ঝলমলে গাছপালার দিকে তাকিয়ে পিতা বললেন, কি বুঝলে ?

আজ্ঞে ?

কি বুঝলে ? আপনার জন সতত আপন/পর কি কখনও আপন হয়।

আপনার সেই গান !

ইয়েস। আমার সেই ইটারন্যাল মিউজিক। একলা চল রে !

দখিনা বাতাস হু-হু করে বয়ে এল। এলোপাতা খসে পড়ল গাছ থেকে। তারে কনকের নীল শাড়ি আমার অভিমানে ফুলে উঠল।

সিন্নি দেখে এগোই, কোঁতকা দেখে পেছুই

খাঁখাঁ দুপুর। খাঁখাঁ বাড়ি। বাগানের গাছে আবার ঘুঘু ডাকছে। নির্জন দুপুরের কারিগর। মনে হয় যেন স্যাকরার হাতুড়ি পিটছে! কনক চাল, ডাল, তরিতরকারি সবই বের করেছিল। রান্নার সময় পায়নি। প্রতাপ রায় তুলে নিয়ে গেছে। বড়লোকের সাতমহলা বাড়ি। জলসাঘর, ঝাড়লণ্ঠন, দাসদাসী। আস্তাবল, ওয়েলার ঘোড়া। তেলরঙে আঁকা পূর্বপুরুষদের ছবি। কার্পেটের ওপর আলতাপায়ে কনক ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ভেতরটা কেমন যেন করছে। একেই বলে হিংসে।

পিতৃদেবের বেশ জ্বর এসে গেছে পায়ের তাড়সে। ইজিচেয়ারে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। কোলের ওপর গণিতের বই। পাশের টেবিলে খাতা আর পেনসিল। গল্পের বই পড়তে চান না। তাতে মন নাকি এলিয়ে পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তি উপন্যাসের খোঁটা বেয়ে লতিয়ে উঠতে থাকে। মন হবে বটবৃক্ষের মত। শিকড় নেমে যাবে বিজ্ঞানে, দর্শনে, তর্কশাস্ত্রে, চিকিৎসাবিদ্যায়। শাখাপ্রশাখায় বিশাল মহীরুহ। আসুক বাতাস, আসুক ঝড়, অচল অটল, ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ। তলায় শীতল ছায়া। পার তো একটুখানি উদারতার বেদি বাঁধিয়ে দাও। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের খুব আত্মহত্যার ইচ্ছে হত। গণিতে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছিলেন। যখনই মনে হত এইবার ঝুলে পড়ি তখনই বসে যেতেন অঙ্ক নিয়ে। গণিত থেকে চলে গেলেন দর্শনে। পিতৃদেব গণিত নিয়ে পড়েছেন, মাঝে মাঝে দর্শনের দিকে ঝুঁকেছেন, মৃত্যু সম্পর্কে অসীম কৌতুকের ভাব। কারুর মৃত্যুতে কখনও আহা, আহা করতে শুনিনি। আহার, নিদ্রার মতই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। পেয়াদা এসে খাজনা নিয়ে গেল। মেনিদার মা মারা গেলেন। বুড়ির জন্যে ছেলে ফোঁসোর ফোঁসোর করে অস্থির। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ার মত অবস্থা। পিতা বললেন, সদ্য বিধবার মত অমন হাপুস হুপুস করছেন কেন? বয়েসে মানুষ ত মরবেই! আপনার ইনটেলেক্ট ত তেমন খোলেনি। তেরাত্তির কাঁদবেন, চতুর্থ রাতেই ত হেসে হেসে জর্দাপান খাবেন! পৃথিবীতে সে মৃত্যু কোথায়, যার শোকে মানুষ সারাজীবন মুহ্যমান থাকবে! Death borders upon our birth, and our cradle stands in the grave.

জ্বর মনে হয় বেশ তেড়েই আসছে। মাঝে মাঝে আড়ামোড়া ভাঙছেন। চোখ বেশ জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠছে। মুখের চেহারা শুকনো শুকনো। ফটিফাইভ। এ-পরিবারের অ্যাভারেজ পরমায়ু নাকি পঁয়তাল্লিশ। সেই বয়েস যেই পেরোবে জল ঝেড়ে বইঠা তুলে পাটাতনে তুলে রাখ। মনকে বল, যা আছে সব চটপট তাড়াতাড়ি সেরে নাও। এখন আমার সময় হল, যাবার দুয়ার খোল। সেপটিক ফিভার। সেরকম কিছু হবে না ত! আমার মনের অত জোর নেই। মচকাব না, একেবারে মট করে ভেঙে যাব।

শোন!

ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

জ্বর বেশ জাঁকিয়ে আসছে। বুঝলে!

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

পাটাও বেশ টাটিয়ে উঠেছে।

সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।

কোনও প্রয়োজন নেই। ডোণ্ট বি নার্ভাস। বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন? হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বয়েস বাড়ছে, বুঝেছ?

আজ্ঞে না।

আঁ সে কি, বয়েস বাড়ছে, তুমি বুঝতে পারছ না! তুমি কি ভাব, সময় স্ট্যাটিক। তোমার মা কত বছর হল মারা গেছেন জান? চোদ্দ বছর হয়ে গেল। লং ফোর্টিন ইয়ারস। তখন আমার বয়েস ধরো পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে। নাউ আই অ্যাম ফিফটি। পঞ্চাশ বছর! হাফ এ সেঞ্চুরি মাই সান। পঞ্চাশটা বছর দুঃখেসুখে পার করে দিলুম। কি বলছ তুমি! অ্যাণ্ড লাস্ট ফোর্টিন ইয়ার্স আই অ্যাম অ্যালোন। এ লোন ফাইটার। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আই কেযার এ ফিগ ফর দেম। পৃথিবীকেও আমি থোড়াই কেয়াব করি। জন্মের দরজা দিয়ে স্টেজে ঢুকেছি মৃত্যুর দরজা দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাব। যতদিন শক্তি আছে ততদিন অভিনয়।

Wavering between the
profit and the loss
In this brief transit
where the dreams
cross
The dream crossed
twilight between birth
and dying.

না হে বয়েস বাড়লেও স্মৃতিটা এখনও আছে। তোমার মনে পড়ে?

আজ্ঞে কি মনে পড়ে? পড়া?

না না পড়া নয়, তোমাব মায়েব কথা?

খুব অল্প। অস্পষ্ট। একটা দুটো ঘটনা।

তুমি 'লাকি'। ভেবি, ভেবি 'লাকি'।

আজ্ঞে মায়ের মৃত্যু ত ছেলেব পক্ষে দুর্ভাগ্যের ঘটনা। আপনি আমাকে 'লাকি' বলছেন?

অফকোর্স। যে বযেসে তোমাব মা মাবা গেছেন, সে বয়েসে তোমাব স্মৃতি তৈরি হয়নি, অজ্ঞান শিশু। কিন্তু আমি! আমাব কথাটা একবার ভাবো। হাজার হাজাব, টুকরো, টুকরো স্মৃতি বহুবর্ণ পাথরেব মত মজা নদীব বুকে বিছিয়ে পড়ে আছে। দিন নেই, বাত নেই, আমি একবার এটা তুলি তো ওটা ফেলি, ওটা ফেলি তো এটা তুলি। নো, আই শুড নট বি উইক, আই শুড নট বি এ সেন্টিমেন্টাল ফুল। The dream crossed twilight between birth and dying

আপনাব জ্বব খুব বেড়েছে। বিছানা করে দি শুয়ে পড়ুন একটু।

ছেলেমানুষ! আমি একশো তিন জ্বরে অফিস কবেছি। জ্বব একটা বার্নিং প্রসেস। ভেতরেব সমস্ত বিষ পুড়িয়ে দিচ্ছে। অত সহজে শুয়ে পড়লে চলে।

The hurt is not enough :
I long for weight
and strength
To feel the earth
as rough
To all my length.

তুমি ভাবছ আমি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছি! তা হলে এসো, চেয়ারটা আমার কাছে নিয়ে এসো, বসে বসে দেখো আমি স্টেপ বাই স্টেপ কি কঠিন একটা অঙ্ক করছি।

না না, আমি ভুল বকাব কথা বলিনি।

দেন ইট ইজ অলরাইট। তা হলে জেনে রাখ, শরীরকে কখনো বেশি প্রশ্রয় দেবে না। শরীর হল কুকুর। নাই দিয়েছ কি মাথায় উঠে বসবে। সব সময় পায়ের তলায় রাখবে। বেচাল দেখলেই লাথি। এ টাইমলি কিক। একটু চা করতে পারবে?

কেন পারব না?

কটা বাজল?

তিনটে, সাড়ে তিনটে হবে।

তাহলে চারটে নাগাদ বসিও। কেন জানি না, আজ সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। জানবে, অতীত যখন মনে এসে ভিড় করে, তখন বুঝতে হবে বয়েস বাড়ছে। দেয়ালে ওই বড় আয়নাটা দেখেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সুন্দর। বেলজিয়ান গ্লাস।

শুধু সুন্দর নয়। ওটা তোমার মায়ের। ওই কাচে তোমার মায়ের মুখ লেগে আছে। আমরা দু'জনেই প্রায় মাথায় মাথায় ছিলুম। সেম হাইট। আচ্ছা, তুমি তোমার মায়ের মুখটা পেলে, স্বভাবও পেলে, রঙটা কেন পেলে না বল তো!

আজ্ঞে, তা ত জানি না।

আমি জানি। আমি তোমার রঙ কালচে করে দিয়েছি। শুধু মা সুন্দরী হলে হয় না, পিতাকেও সুন্দর হতে হবে। আগেকার দিনের জমিদারদের সন্তান কন্দর্পকান্তি কেন হত জান? অনেক খুঁজে খুঁজে, দেখে দেখে সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে ছেলেদের বিয়ে দিতেন। বংশ দেখতেন। ফুটফুটে ছেলে, ফুটফুটে মেয়ে হত। নিষ্ঠা চাই। বুঝলে? হিউম্যান ব্রিডিংও একটা আর্ট। গ্রিক আর রোমানদের দিকে তাকিয়ে দেখ। ইজিপসিয়ানদের কথা ভাব। ক্লিওপেট্রার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে? তবে কেন অত ছটফট কর!

আজ্ঞে করি না ত।

না কখনো করবে না। কোনও টিয়া কি কাককে বিয়ে করে! বউ কথা কও কি হাঁড়িচাচার জন্যে পাগল হয়? ময়ূর কি বকের পেছনে দৌড়োয়? ঘুঘু কি গোলাপায়রাকে লাভ লেটার্স লেখে?

আজ্ঞে না।

মেনটেন ইওর ব্রিড। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি। শি ওয়াজ এ প্যারাগন অফ বিউটি। আর আমি? এ লিটল বিট অফ এ সিমপ্যাঞ্জি। আমার সব কিছু কোর্স। স্কিন, হেয়ার, কমপ্লেকসান।

আজ্ঞে না। ইউ আর সো ম্যাসকুলাইন!

ও, ডোণ্ট ফ্ল্যাটার মি। ম্যাসকুলাইন! দ্যাট ইজ মাই সাধনা। যৌবনে পিটে পিটে শরীরটাকে তৈরি করেছিলুম। তোমার মায়ের সঙ্গে কোনও সুন্দর পুরুষের বিয়ে হলে, তুমি কত সুন্দর হতে পারতে! তুমি আমার দিকে অ্যাকিউজিং ফিঙ্গার তুলে বলতে পার, কেন আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, কেন আপনি আমাকে পৃথিবীতে আনলেন, আমি কন্দর্প হয়ে আসতে পারতুম!

আজ্ঞে, আমি তা কখনো বলব না।

তোমার বলা উচিত। তুমি বলতে পার। আই ওণ্ট মাইণ্ড। আই হ্যাভ ডেসট্রয়েড এ পসিবিলিটি। একটা ভাল পট কাঁচা হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তোমার জীবনী অন্যভাবে লেখা হতে পারত!

আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি।

হ্যাঁ করবেই ত! তুমি যে দুর্বল। তাইমুর কি চেঙ্গিজ ভাগ্যকে বিশ্বাস করতেন না। নেলসন কি নেপোলিয়ান ভাগ্যকে বিশ্বাস করতেন না। তোমার রক্তে হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল রেড ব্লাড সেলের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি অ্যানিমিক। ভাল করে খাওয়াদাওয়া কর, ভাগ্য পালাবে। জীবন সম্পর্কে একটা পজিটিভ অ্যাটিচিউড আসবে। নির্জীব থেকে সজীব হয়ে উঠবে। ক্লীব থেকে জীব। তোমার

বক্তে কিছু লোহার প্রয়োজন। ইউ নিড সাম মিনারেলস।

যাই এইবার চা করে আনি।

হ্যাঁ, যাও, নাও ইট ইজ টাইম ফর টি।

উত্তর মহল আজ অসম্ভব ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। নির্জন দেয়ালে মাঝে মাঝে টিকটিকি টকাস টকাস শব্দ করে দরজা খোলাতে চাইছে। লম্বা লম্বা শাড়ি ঝুলছে। শুকিয়ে গেছে। হাওয়া দিলেই প্রাণ পেয়ে নড়াচড়া করছে। ছাতে ওঠার সিঁড়ির একপাশে কনকের, মুকুর ছাড়া জামাকাপড় তালগোল পাকান পড়ে আছে। দু'জোড়া হাই হিল জুতো সিঁড়ি ভাঙার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে আছে। ওয়ান, টু, থ্রি বললেই টকাস টকাস করে এগোতে থাকবে। রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে এক টুকরো কাগজ বোল করা। কিসের ক্যাশমেমো? কনকের হাতের লেখা, 'পিণ্টু, তুমি কিছু মনে কোরো না। বাবার ভয়ে দূরে দূরে থাকছি। মেয়েদের একটু অভিনয় করে চলতে হয়, নইলে তলিয়ে যেতে হয়। মেয়ে হলে বুঝতে।' কখন লিখল! মনে আবার ভাঙন ধরাতে চাইছে।

চা নিয়ে এসে দেখলুম, পিতা জ্বরে হাঁসফাঁস করছেন। দেয়াল আয়নার দিকে দৃষ্টি স্থির। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। হাত বাড়িয়ে চা নিলেন।

কি, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার?

শরীরে নয়, মনে। জীবনে ছোটখাট দু'একটা ভুল করে ফেলেছি। My thoughtless youth was winged with vain desirers/My manhood, long misled by wandering fires. আর তো শৈশবে ফিরে যাওয়া যাবে না, আর তো যৌবনে ফিরে আসবে না। Where is the Life we have lost in living? /where is the wisdom we have lost in Knowledge?/where is the knowledge we have lost in information?

চায়ে চুমুক দিলেন। যা কোনও দিন হয় না, আজ হাত কাঁপছে। চোখ আবও রক্তবর্ণ। উচ্চ চাপ মনে হয় বেড়েছে। এত আবেগই বা কোথায় ছিল? বাঁধ ভাঙা নদীর প্রবল স্রোতধারায় বেরিয়ে আসছে।

ওই যে আয়নাটা দেখছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওই আয়নায় আমার যৌবন ধরা আছে, তোমার কৈশোর আছে, তোমার মায়ের ছায়া আছে; তাহলে শোনো একদিনের কথা বলি। তাড়া আছে?

আজ্ঞে না।

তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা ঠুকছ কেন? বোসো। তোমার বয়েস তখন তিন কি চার। ভীষণ জ্বর। তিন কি চার। উঠছে নামছে। সকালে এক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে অফিসে গেলুম। কাজে মন বসছে না। ছটফট করছি। ল্যাবরেটারিতে অ্যানালিসিসে একটা স্যাম্পল চড়িয়েছি। অন্যমনস্ক, ইথারের বোতলে আগুন ধরে গেল। পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেলুম। আমার অ্যাসিসটেণ্ট অন্নদা বললে, আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আমি বললুম, তুমি কিছুক্ষণ সামলাও, আমি একবার চট করে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। ছেলেটার খুব জ্বর দেখে এসেছি। ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। সাড়া শব্দ নেই। নিস্তব্ধ বাড়ি। ঘরে ঢুকে দেখি, তোমার মা ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সবে চান সেরেছে। ভিজে চুল কোমর ছাপিয়ে পায়ের কাছে চামরের মত দুলছে। চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরেছে। গালে গোলাপী আভা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরছে। আর তুমি খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছ। আয়নায় আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল, আঙুল কপালের টিপে, তুমি? হ্যাঁ আমি। খোকা কেমন আছে? হেসে বললে, জ্বর ছেড়ে গেছে। Time, you old gipsy man/Will you not stay/Put up your caravan/Just for one day /Just for one day?

আপনার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। টাটকা আর এক কাপ করে দি।

নাঃ, মুখে আর ভাল লাগছে না কিছু। বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওই কোটের পকেট থেকে আমাকে বড়

রুমালটা দাও। মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধি। যন্ত্রণায় ছিড়ে যাচ্ছে।

শুয়ে পড়ুন। একটু টিপে দি।

দূর পাগল। সেবা নিলে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। He who was living is now dead/We who were living are now dying/With a little patience. তুমি বরং ওই রেকর্ডটা একবার চাপাও ত।

কোন্‌টা বলুন ?

ওই যে, তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই বারে বারে।

কোণের দিকে ছোট্ট একটা টেবিলে আদ্দিকালের চোঙা লাগান গ্রামোফোন। হাতল ঘুরিয়ে দম দিয়ে রেকর্ড চাপাতে হয়। ঘুঘু আর ডাকছে না। বাইরের কার্নিসে গোটা কতক বুড়ো পায়রা বাতের ব্যথায় অনবরত কোঁত পেড়ে চলেছে। গান বেজে উঠল। পিনটা পাল্টান উচিত ছিল। পিতা চোখ বুজে গান শুনছেন। গান একসময় থেমে গেল। তবু চোখ খুলছেন না। মাথার কাছে এগিয়ে গেলুম। জ্বরে বেহুঁশ মত হয়ে গেছেন। এখান থেকে হলঘরে মায়ের ছবিটা স্পষ্ট দেখা যায়। পশ্চিমের এক চিলতে রোদ পড়েছে। জ্বলজ্বল করছে। আয়নাটাও কেমন যেন গভীর আকাশের চেহারা নিয়েছে। মেসোমশাইদের ঘরের খাটের চাদরের একটা অংশ আয়নায় ভেসে আছে। আয়নার জগৎ একেবারে নির্জন নয়। বাতাসে চাদর নড়লে ছায়াও নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে কেউ যেন আঁচল উড়িয়ে আসছে। ভারি অদ্ভুত লাগছে। বিরাট বড় একটা দায়িত্ব পেয়ে গেছি। বিশাল শক্তিশালী এই মানুষটি আজ কত অসহায় ! অদৃশ্য বন্ধনের কত আকর্ষণ। ফেলে যাব কোথায় ! সন্ন্যাস কি মুখের কথা ! সব ছাড়োয়ে বললেই কি সব ছাড়া যায় !

মাথার নিচে ছোট একটা বালিশ লাগাতে গেলুম। চমকে উঠলেন। কটা বাজল ?

প্রায় সাড়ে চারটে।

রোদ পড়ে এসেছে। ছাতের গাছে একটু করে জল দিতে হবে।

রোদের ঝাঁঝ কমুক, এখন দিলে শুকিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, সন্ধের মুখে দিও। আমার পাটা বেশ টাটিয়েছে। ওঁরা ফিরেছেন ?

আজ্ঞে না।

সকালে আমি একটু বেশি ইমোশানাল হয়ে পড়েছিলুম। তোমাকে কেউ আক্রমণ করলে আমার অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট প্রখর হয়ে ওঠে।

The world turns and the world changes
But one thing does not change
In all of my years, one thing does not change
However you disguise it, this thing does not change
The perpetual struggle of good and evil.

দেবতা আর অসুরের মাঝখানে পাতলা কাগজের ডায়াফ্রাম। একটু এদিকওদিক হলেই ফর্দাফাঁই। নাঃ, সংযত হতে হবে। কি করব ? তুমি যে আমার সন্তান। তোমার মধ্যে যে আমার বিশালের ছায়া আছে। আমাকে শেকসপীয়ারের কমপ্লিট ওয়ার্কসটা একবার দাও ত।

বই না পড়ে, একটু শুয়ে পড়ুন না। শরীর খারাপ হলে রেস্ট নিতে হয়।

তুমি আমাকে শুইয়ে দিতে চাইছ কেন ? তাতে তোমার কি লাভ ?

বাপ্‌রে ? সিন্নি দেখে এগিয়েছিলুম, কোঁতকা দেখে আবার পেছিয়ে এলুম। দুর্গ জয় করা কি অত সহজ কাজ। মনোদুর্গে বসবাস, আলোছায়া খেলে অধরাকে ধরা কি সহজ ? পিতার সঙ্গে আমার একদিন কবির লড়াই হলে বেশ হয়। দেখি কার স্টকে কত কবিতা আছে ?

রোদ মিলিয়ে গেল রাতের ছায়ায়। বেগুনী রঙের আলোয় পৃথিবী বড় বিষণ্ণ। ফুলগাছের টবে জল দিচ্ছি। দু'এক ফোঁটা ছাদে পড়লেই সোঁ সোঁ করে টেনে নিচ্ছে। মিট্টিকা আতরের মত গন্ধ বেরোচ্ছে

কাকের দল যেদিকে উড়ে গেল বাসায়, সেদিক থেকে বাদুড় উড়ে আসছে। পেছনে ধপ করে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ হল। বেশ ভারি। চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই চমকে উঠতে হল। খুনী, আততায়ীর মত এ কে ?

জটে বুড়ীর মত চেহারা। জট পাকান লাল লাল চুল চারপাশে উড়ছে। মুখ লাল টকটকে। চোখ দুটো ছাদের আবছা বেগুনী আলোয় পাথরের মত জ্বলছে। পোশাকও অদ্ভুত। লাল একটা ঘাগরা। ঘাগরা নয় সায়া। তার ওপর হলদে রঙের একটা ব্লাউজ। কোথা থেকে এল ? আকাশ থেকে পড়ল নাকি ? সতীমার ক্ষুদ্র সংস্করণ ? সামনের দিকে দৌড়ে পালাবার উপায় নেই। ছাদের বাইরে চলে যেতে হবে। মূর্তির গলায় শব্দ বেরলো,

পিণ্টুদা ?

কে, জবা ?

হ্যাঁ, চিনতে পারছ না ?

তুমি কোথা থেকে এলে ? কি ভাবে এলে ?

তোমাদের ছাদের আলসে টপকে।

আমাদের ছাত অবধি এলে কি করে ?

আমাদের বাড়ির কার্নিসে নেমে তোমাদের বাড়ির কার্ণিসে পা রাখলুম।

ভয়ে আমার চোখ বুজে এল। গা সিরসির করে উঠল। যদি একবার পড়ে যেত, নির্ঘাত মৃত্যু।

তুমি এ ভাবে আসতে গেলে কেন ?

আমার শাড়ি খুলে নিয়ে ঘরে শেকল বন্ধ করে রেখেছিল। এ সব হল আমার মাসীটার কাজ।

মাসী মানে ?

ওই হল, ছোট মা। তুমি আর কথা বাড়িও না। তোমার সামনে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার লজ্জা করছে। চট করে একটা শাড়ি এনে দাও।

শাড়ি পাব কোথায় ?

তোমাদের বাড়িতে দু'দুটো মেয়ে, শাড়ি পাব কোথায় ? যাও শিগগির নিয়ে এস। এখুনি খোঁজপাত শুরু হবে।

নিচের তারে কনকের শাড়ি ঝুলছিল। যা হয় হবে, এখন দিয়ে ত দিই। কনককে বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবে। জবার হাতে শাড়িটা দিতেই বলল, এত দামী কাপড় না আনলেই পারতে।

শাড়িটা পরতে পরতে বললে, তোমাদের পেছন দিকের দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব।

কোথায় যাবে ?

আমার জায়গায়।

সেটা আবার কোথায় ?

বিয়ের পর মেয়েদের জায়গা কোথায় জান না !

জবা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে চলল। জোরে চেঁচাতেও পারছি না। পেছন পেছন নামতে নামতে ফিসফিস করে বললুম, সুখেন নেই। দীনু তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেছে।

যাক, আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

তোমার চেহারাটা একটু ঠিক করে নিলে হত না।

সময় নেই, উপায়ও নেই। আমি চুপিচুপি নেমে বেরিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে আর আসতে হবে না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে আমি কিছু জানি না।

তোমাকে আবার ধরে ফেলবে।

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই।

জবা পায়ে পায়ে নিচে নেমে গেল। ভাগ্য ভাল, পিতৃদেব জ্বরে ইজিচেয়ারশায়ী। উঃ, সুখেনের বরাতটা ত খুব ভাল ! এত প্রেম ! দু'জনে এক সুরে বাঁধা ! এমন ত বড় একটা দেখা যায় না। জলের

ঝাবিটা আনতে গিয়ে কানে এল, জবাদেব বাড়িতে এক মহিলা খ্যানখ্যানে গলায চিৎকাব কবছে 'জবা, জবা'। পালাও জবা, পালাও।

কোলেব ওপর শেকসপীয়াব, চেয়াবে পিতা আচ্ছন্ন। মাথায় ফেট্টি, চোখ বন্ধ। বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে একটু সাহস পাওয়া যেত। ঘবে ঘটুব ঘটুব কবছি, চোখ না খুলেই পিতা বললেন, বাতে আমাব উপবাস। তুমি যা হয একটা কিছু নিজেব মত কবে নাও। ওঁবা ত এখনও ফিরলেন না!

না, বেশ দেবি হচ্ছে।

মুখ থেকে কথা সবতে না সবতেই বাড়িব সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। প্রতাপ বায় এলেন। দু'জনে কথা বলতে বলতে ওপবে উঠছেন। মেসোমশাইকে বেশ খুশিখুশি দেখাচ্ছে। ভোজনতৃপ্ত চেহাবা। ঘবে ঢুকে কিছু একটা বলতে গিয়ে পিতাব অবস্থা দেখে থেমে গেলেন। কি হল? শবীব খুব খাবাপ হয়েছে?

চোখ না খুলে পিতা বললেন, আপনাব কাজ হল?

প্রশ্ন প্রশ্নে চাপা পড়ে গেল। এ বেশ ভাল কৌশল। যে প্রশ্নের উত্তব দিতে চাই না পালটা প্রশ্ন কবে পাশ কাটিয়ে যাই। কনক আব মুক্ত কোথায় গেল? তাদেব দেখছি না ত!

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। প্রতাপেব মত ছেলে হয় না। হবিদা, আপনাব অনুমতি চাইছি।

অনুমতিব প্রয়োজন নেই। ম্যাটাব অফ কনভিনিয়েন্স। আপনি যেতে পাবেন।

যাবাব কথাই জিজ্ঞেস কবছি কি কবে বুঝলেন।

কমান সেনস বিনযদা, কমান সেনস।

প্রতাপেব বাড়িটা বিশাল, জনপ্রাণী নেই।

লেখাপড়াব সুবিধে হবে।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া

নিচেব তলাতেই ডাক্তারেব চেম্বাব।

ঠিক বলেছেন, তাছাড়া

প্রতাপেব বিষয় সম্পত্তিব মামলা এমন জড়ভট্টি হয়ে আছে, জট ছাড়াতে হলে কাছেই থাকা দবকার।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া

কলকাতায় থাকলে পরীক্ষা দেবার সুবিধে অনেক।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া প্রতাপেব এক কাকা দর্শনের অধ্যাপক। কাছাকাছি থাকলে আমাব চেয়ে ভাল কোচিং পাবে।

এই মুহূর্তে আপনি চলে যান। আর একটুও দেরি কববেন না।

আপনি চোখ খুলছেন না কেন?

কোনও কোনও সময় চোখ বুজিয়ে থাকলে পৃথিবীকে কম কর্কশ মনে হয়।

প্রতাপ রায় বললেন, আপনাকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে। চলুন না একবার স্পেশালিস্ট দেখিয়ে দি।

তেমন স্পেশাল কিছু হয় নি প্রতাপ। ধন্যবাদ।

মেসোমশাইয়ের চেয়ে প্রতাপ রায়ের উৎসাহ যেন বেশি। মেসোমশাই বিক্ষিপ্ত সমস্ত জিনিস গোছগাছ করে সুটকেসে ভরতে লাগলেন। মেয়েদের শাড়ির হিসেব রাখেন না, তাই জানতেও পারলেন না একখানা শাড়ি নেই। আশ্চর্য, মেয়ে দুটোকে কেন রেখে এলেন!

মেসোমশাইয়ের সেই প্রথম দিনের বেশ। হাতে শোলার টুপি।

হরিদা, আমি তা হলে আসছি। মেয়ে দুটো থিয়েটাব দেখতে গেছে। অনেকদিনের শখ কলকাতার থিয়েটার দেখবে। যাবার আগে দেখা করে যাব। দিনকতক আপনার অসুবিধে করে গেলুম।

অসুবিধে হলে যাবার আগেও আসতে পারেন।

নাঃ অসুবিধে আর কি? প্রাসাদতুল্য বাড়ি। দাসদাসী। আচ্ছা আসি।

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন, আগে পরে। প্রতাপ রায়ের এত উৎসাহ কিসের ! পিতা এতক্ষণে চোখ খুললেন।

কি বুঝলে ?

আমাকে আর বুঝতে হল না। মাতামহ আসছেন গাইতে গাইতে, রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেন না কি হবে পাছে।

আপনার চেয়ে পর ভাল
পরের চেয়ে বন ভাল

গান গাইতেন, আপনার জন সতত আপন, পর কি কখনও হয়রে আপন। কনকের বাবা যে ভাবে চলে গেছেন, নিতান্ত স্বার্থপর না হলে এ ভাবে কেউ যেতে পারে না। কুইক মার্চ অ্যাণ্ড এগজিট। জীবনে বড়সড় হতে গেলে নিজের কথাই ভাবতে হয়, অন্যের কথা ভাবতে গেলে চলে না। ভেবেছ কি মরেছ। কে কার ?

মাতামহ দরজার আড়াল থেকে ঘরে উঁকি মেরে বললেন, একি, এমন রাখাল রাজার বেশ কেন ? মাথায় ফেট্টি। তুমি কি রাখাল ভাবে সাধনা করছ নাকি ?

পিতা চোখ আধখোলা করে বললেন, ব্রেকডাউন। একশো তিন টিন হবে। ডান পাটা ড্যামেজ করে ফেলেছি।

মাতামহ পিতার সামনে চেয়ার টেনে এনে সোজা হয়ে বসে বললেন, তোমার মঙ্গল কিঞ্চিৎ কুপিত। প্রায়ই রক্তপাত হচ্ছে। ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধ করতে গেলেও ঘন ঘন এতবার আহত হতে হয় না। তোমার এই কাটা সৈনিকের অবস্থা দেখতে ভাল লাগে না। তুমি হলে আমাদের পুরুষসিংহ। সিংহ যদি গর্জন না করে বেড়ালের মত মিউ মিউ করে, বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

সংসারে চিরকালই আমি এক কাটা সৈনিক। মাঝে মধ্যে তেড়েফুড়ে উঠি. সঙ্গে সঙ্গে ড্যাঙোস খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ি।

তোমাকে ড্যাঙোস মারে এমন পুরুষ মাতৃগর্ভে জন্মায়নি।

আমি ত আছি। নিজেই নিজেকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি।

হরিদা আছেন ? হরিদা ?

অপরিচিত কণ্ঠস্বর। মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। খদ্দরের খাটো ধুতি। এক মাথা আধপাকা চুল চারপাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলছে। ধুলোমাখা দুটো খালি পা। অন্তত ফুট ছয়েক লম্বা। তেমনি বিশাল চেহারা। বুকের সব কটা বোতাম খোলা। ভেতরে আবার গেঞ্জি নেই। বুকে একটাও লোম নেই। মসৃণ, তেলা। কোমলে কঠোরে মেশান অদ্ভুত এক চেহারা।

হ্যাঁ, আছেন। আপনি আসুন।

কে, অক্ষয় নাকি ? পিতা ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, আমি অক্ষয়। কি ব্যাপার আজ অফিসে গেলেন না ?

এই যে পা খোঁড়া করে বসে আছি।

আমার মন বলছিল একটা কিছু হয়েছে। অকারণে বসে থাকার মানুষ আপনি নন।

তুমি ওই চেয়ারটায় বসে পড়। আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

না, আপনার মুখে ওঁর কথা আমি শুনেছি। আজ দর্শন হল। একটু পায়ের ধুলো নি। শুনেছি আপনি অনেক দূর এগিয়েছেন।

মাতামহ পদযুগল কাপড়ের আড়ালে লুকোতে লুকোতে বললেন, না, না, প্রণাম কেন ? আবার

প্রণাম কেন ?

তা বললে হয়, প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হবে। অক্ষয়বাবু সামনে ঝুঁকে পড়ে চিকের আড়াল থেকে পা খুঁজে বের করার কসরত দেখাতে লাগলেন। মাতামহ ইজ্জত যেতে বসা রমণীর মত মুখভঙ্গী করে বসেই রইলেন।

পিতা বললেন, ধুলো নেবার মত পা হল তোমার অক্ষয়। যেখান দিয়ে চলেছ সেইখানেই টন টন পদরেণু ঝরে ঝরে পড়ছে।

অক্ষয়বাবু খাড়া হয়ে বললেন, আমি ঝেড়ে দিচ্ছি হরিদা। একটা ঝাড়ুটাড়ু দিন।

আরে বোসো বোসো। আমি ধুলোর কথা বলেছি। ধুলো ঝাড়ার কথা বলিনি।

আপনার বাড়িতে লোকজন নেই, সারা শহরের ধুলো টেনে এনেছি, দিন না পরিষ্কার করে দি।

মাতামহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বাড়িতে এখন অনেক লোক। আমাদের সংসার ভরে উঠেছে।

পিতা বললেন, ভরে উঠেছিল, আবার খালি হয়ে গেছে।

সে কি ? সব হাওয়া !

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরা চলে গেছেন। আরও ভাল বাড়ি, আরও ভাল ব্যবস্থা। আরও সুখ সুবিধে।

যাক বাবা, বাঁচা গেছে। আর তা হলে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হবে না। আরে আমাদের পুরুষের সংসারে ওসব মানায় নাকি ? আমরা নিজেদের মত খাবোদাবো আর সানকি বাজাব। এ ক'দিন যেন আমাদের আক্কেল দাঁত উঠেছিল। তা হলে ঝেড়েই দাও।

না, না, কোনও প্রয়োজন নেই, তুমি বোসো, আরাম করো। নিশ্চয় হেঁটে হেঁটে এসেছ !

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার আছে চরণবাবুর জুড়িগাড়ি। তাহলে বাইরে গিয়ে একটু নেচে আসি। যা ঝরার ঝরে যাক।

কোন দরকার নেই, তুমি শান্ত হয়ে বোসো।

অক্ষয়বাবু বসলেন। বসে বললেন, আমি আরও এলুম, একটা সুখবর আছে। আপনার প্রোমোশনের সেই অর্ডারটা আজ এসে গেছে।

বলো কি ? ল্যাং তাহলে মারতে পারল না।

নাঃ। ফেল করল। আপনাকে আমি বলেছিলুম, অ্যাস্ট্রলজিক্যালি আপনার এই প্রোমোশান কারুর আটকাবার ক্ষমতা নেই। আপনার ব্যাড ডেজ চলে গেল। এইবার ভাগ্যের রথ গড়গড়িয়ে চলবে।

মাতামহের ঘুম ঘুম ভাব কেটে গেল। বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, ও, তুমি এনার কথাই বলেছিলে। বিরাট জ্যোতিষী। মর্গে গিয়ে মৃতদেহের হাত দেখে দেখে জ্যোতিষের সত্য অসত্য মেলান।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নেই, তবে অক্ষয়ের অধ্যাবসায়ে আমার গভীর বিশ্বাস। দেখা যাক ও এই বুজরুকিকে বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে যেতে পারে কি না। মর্গে তোমার সেই ভূত দর্শনের ঘটনাটা ভাব অক্ষয় ?

মাতামহ আরও সোজা হয়ে বসে বললেন, অ্যাঁ, ভূতের হাত ? ইনি ভূতের হাত দেখেছেন ?

ভূতের হাত নয়, ভূতের হাতে পড়েছিলেন।

আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

এসেছে যখন শুনবেন, তার আগে একটু জলযোগ করে নিক। খাইয়ে মানুষ। সারা মাসই ত ওকে নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হয়। ও হল কলকাতার এক নম্বর প্রোফেসনাল খাইয়ে। বড় বড় বাড়ির রেজিস্টারে ওর নাম আছে।

উঃ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমরা সারাবছর হাপিত্যেশ করে বসে থাকি, আর ইনি রোজ ভোজ মেরে বেড়ান। ভোজরাজ। কিন্তু ভূতের ব্যাপারটা সন্ধের মুখে সেরে নেওয়াই ভাল। বেশি রাতে ওসব আলোচনা না করাই উচিত। ছোটরা ভয় পেতে পারে।

আমরা ত সবাই বুড়ো দামড়া, ভয় পাবার মত ত কেউ নেই। এক আপনি যদি ভয় পান তাহলে আলাদা কথা।

আমি একটু ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি। তোমার মত অবিশ্বাসী নই। বাগানের একপাশে পড়ে থাকি। বুঝলে কি না ?

আপনি ত তন্ত্রসাধক ! আপনার আবার ভয় কিসের ?

তা-আ ঠিক। মাতামহ আবার মাথা নিচু করলেন।

পিতা বললেন, নাও, এঁদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা কর। আমি ত বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েছি। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।

থাক না হরিদা। জলযোগের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? পরে আর একদিন হবে। অক্ষয়বাবু খুঁত খুঁত করে উঠলেন।

আমার ডিকশনারিতে পরে বলে কোনো কথা নেই। আমি জানি, নাও অর নেভার। ওর ট্রেনিংও সেই ভাবেই হয়েছে। তুমি কিন্তু কিন্তু কোরো না।

মাতামহ বললেন, আমি সাহায্য করছি। আমরা সব অন্য জাতের মানুষ, কি বল হরিশঙ্কর ! আমরা হলুম গিয়ে অর্ধনারীশ্বর। বাড়িতে মেয়েরা নেই ত কি হয়েছে। আমরা হলুম গিয়ে মেয়েদের বাবা। গর্ভধারণ ছাড়া সবই পারি।

উঃ, আবার আপনার মুখ আলগা হয়েছে। সেদিন কি সারমন দিলুম ?

গর্ভধাবণ ত খাবাপ কথা নয়। একেবারে শুদ্ধ সংস্কৃত।

শব্দটা খারাপ নয়, ভাবটা ভালগার।

তাহহলে ওটা তুমি কেটে দাও।

বলা কথা আর ছোঁড়া পাথর আর ওলটান দুধ হাতের বাইরে চলে যায়।

পিতার মনে হয় জ্বরের দাপট একটু কমেছে। সেই ঝিমুনি ভাবটা আর নেই। অনর্গল কথা বলছেন।

মাতামহ উঠে এলেন। মুখে সেই অনাবিল হাসিটি লেগে আছে। শুভ্র একটি রাজহংস। জীবনের কোন কিছুই গায়ে মাখলেন না। একবার করে পালক ঝাড়েন আর সব ছিটকে পড়ে যায়। ফিস ফিস করে বললেন, আসার সময় দেখে এলুম ওই মোড়ের দোকানে গরম গরম হিঙের কচুরি ভাজছে। এই ফুলো ফুলো, লাল লাল।

আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। কচুরি, ঘুগনি, আর চা।

উঃ, তুই আমার নাতির মত নাতি। তুলসী তোকে রেখে গেছে আমার জন্যে আর ওই দুর্দান্ত ছেলেটার জন্যে। পাটাকে অমন ক্ষতবিক্ষত করল কি করে ?

বাথরুমের দেয়াল ঝরাচ্ছিলেন, পায়ে প্ল্যাসটারের চাঙড় ভেঙে পড়েছে।

নাঃ তুলসী ওকে ভুলতে পারে নি।

তার মানে ?

সে তুই বুঝতে পারবি না। এই পৃথিবীর চারপাশে আর একটা জগৎ ঘুরপাক খাচ্ছে। ডাক্তারখানায় যেমন রুগীরা মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে থাকে সেই রকম মৃত আত্মারা সেইখানে বসে আছে। ওখানের আলোটা কেমন জানিস ?

না।

বিদ্যুৎ চমকালে যেমন নীল আলো হয় সব সময় সেই রকম নীল আলো স্থির হয়ে আছে।

কি করে জানলেন ?

আমার মনে হয়। তাহলে কচুরি আর ঘুগনি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোড়ের মাথায় দীনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কি রে, সুখেন কোথায় ?

খুব নিরাপদ জায়গায়। আচ্ছা, চুল বেরোতে ক'মাস সময় লাগে রে ?
রাখ তোর চুল। জবা ছাত টপকে আমাদের বাড়ির খিড়কি দিয়ে সেই ন্যাড়ার সন্ধানে ছুটেছে।
অ্যাঁ, বলিস কি ? পৃথিবীটা হঠাৎ পালটে গেল না কি ! যাই জবাকে খুঁজে বের করি। কেউ জানে ?
না, কাউকে বলিনি।
দীনু আবার দৌড়ল। আমাদের গ্রেট দীনু।
কচুরি আর ঘুগনি খেয়ে অক্ষয়বাবু একটু ধাতস্থ হলেন। এতটা পথ হেঁটে এসেছেন, বেশ খিদে পেয়েছিল মনে হয়। চায়ের কাপটা সামনে রাখতেই পকেট থেকে খানিকটা তুলো বের করে চায়ে ভেজাতে লাগলেন।
মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, চায়ে ত বিস্কুট ভিজিয়ে খায়, তুলোও খাওয়া যায় না কি ?
আজ্ঞে না, আসার পথে হোঁচট খেয়ে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা কৌটোর ঢাকা খোলার মত হয়ে গেছে। চায়ে তুলো ভিজিয়ে একটু বেঁধে রাখি।
এটা কি ধরনের চিকিৎসা ?
আজ্ঞে আসুরিক। মানুষ যখন জঙ্গলে থাকত, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত, তখন তাদের অনেক দাওয়াই জানা ছিল।
তখন কি চা ছিল ?
না, চা চিকিৎসাটা আমার আবিষ্কার। চা খেলে পেট মরে যায়, লিভার শুকিয়ে যায়, তাহলে ঘা কেন শুকোবে না, জীবাণু কেন মরবে না ? কাটাছেঁড়ায় চা আমার দাওয়াই।
চাটা যে নোঙরা হয়ে গেল।
না, না, নোঙরা আবার কি ? নোঙরা, পরিষ্কার সবই আমাদের মনের বিকার।
ওঃ কত বড় সাধক আপনি ! ভূত দেখেছেন, ভৌতিক চিকিৎসায় উপকার পেয়েছেন, ভগবান দেখেছেন ?
আজ্ঞে না।
দেখবেন, দেখবেন। কেউ আটকাতে পারবে না। ঠাকুর বলেছিলেন, যখন গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক মনে হবে তখন বুঝবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। আপনার ত তাই হয়েছে। আপনি প্রকৃত ভাগ্যবান।
আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন ?
হ্যাঁ, তাও ত বটে। আমি ত বড় একটা কাউকে আপনি বলি না। আপনিটা তুমি নিজের গুণেই আদায় করে নিলে।
পিতা চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বললেন, অক্ষয়ের সাহস কত জানেন ? তোমার সেই ঘটনাটা বল না।
কোনটা হরিদা ?
সেই বালির ব্রিজে মুণ্ডু কাটা মানুষ।
উঃ, সে ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।
কি রকম, কি রকম ? মাতামহ উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়লেন।
অক্ষয়বাবু বেশ আয়েস করে বসে গল্প শুরু করলেন। আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকি। বউদির ভীষণ অসুখ। ডাক্তারবাবু এমন এক ওষুধ দিলেন যা কলকাতা ছাড়া পাওয়া যাবে না। রাত হয়ে গেছে। ওষুধ না পড়লে রুগীর রাত কাটবে কি না সন্দেহ। বেরিয়ে পড়লুম সাইকেল নিয়ে। কোথাও না পাই শ্যামবাজারের রাইমারে পাবই। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। অমাবস্যা তিথি। যাবার সময় দেখে গেলুম গঙ্গা থেকে হিল হিল করে কুয়াশা উঠছে। ওষুধ পেয়ে গেলুম। ফেরার পথে টালার কাছে টায়ার পাংচার হয়ে গেল। সারাতে সারাতে বেজে গেল রাত দশটা। ফের যখন ব্রিজে উঠলুম তখন মাঝ রাত। গঙ্গা অদৃশ্য। ব্রিজ পড়ে আছে নরকে যাবার এক ফালি রাস্তার মতন। কুয়াশায় ভেসে আছে। মনে হচ্ছে কুরে কুরে রাস্তা বের করতে হবে। সে দৃশ্য ভাবা যায় না। দু হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না।

ব্রিজের মাঝামাঝি এসেছি। বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখি লোহার গার্ডারে ঠেসান দিয়ে কে যেন বসে আছে। কে রে বাবা! এই শীতের রাত। থিক থিকে কুয়াশা। আত্মহত্যা করতে চায় না কি! ব্রিজ হল আত্মহত্যার জায়গা। সাইকেল থেকে নেমে পড়লুম। ফুটপাথে ঠেসিয়ে রেখে কাছে গিয়ে ডাকছি, ও মশাই শুনছেন, ও মশাই শুনছেন? কোনও উত্তর নেই? কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, ও মশাই! যেই না নাড়া দিয়েছি, কাঁধ থেকে মুণ্ডুটা খুলে ঠকাস করে গড়িয়ে পড়ল। কি সর্বনাশ! আমার ত খালি পা। এতক্ষণ পায়ে নরম নরম রবারের মত কি লাগছিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি আলকাতরার মত জমাট রক্ত। আর ঠিক সেই সময় একটা স্টিমার গম্ভীর সুরে ভোঁ দিয়ে উঠল। কুয়াশার সাদা চাদর কেঁপে গেল। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে চট করে রাস্তা থেকে মুণ্ডুটা তুলে নিয়ে আবার কাঁধে ফিট করে দিলুম। চেহারা দেখে মনে হল বেশ মানিড ম্যান। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনে হল পিঠে কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠেছি। পুলিস নাকি! কেউ কোথাও নেই। অথচ পিঠে হাত রেখেছিল কেউ! ফিস ফিস করে কানের কাছে কে বললে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালালুম। পড়ি কি মরি। বাড়ি ঢুকছি, ভাইপো, ভাইঝিরা কেঁদে উঠল। বউদি মারা গেলেন।

পিতা মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন শুনলেন? আপনি হলে কি করতেন?

মাতামহ ভয়ে জমে পাথর হয়ে গেছেন। নিচের ঠোঁট থির থির করে কাঁপছে। চোখ দুটো প্রায় উলটে গেছে।

পিতা বললেন, একটা ঠোঙা ফুলিয়ে কানের কাছে ফট করে ফাটাও। শক ট্রিটমেন্ট।

অক্ষয়বাবু বললেন, শকে শাক্যং সমাচরেৎ। ভীষণ ভীতু মানুষ।

না না, অন্য ব্যাপারে তেমন ভয় নেই। আগে খুব বাঘের ভয় ছিল। আমাদের সঙ্গে একবার জামতাড়া বেড়াতে গিয়ে রাতে বাঘের স্বপ্ন দেখে মশারি-ফশারি ছিঁড়ে এমন কাণ্ড করেছিলেন! সে আর এক কাহিনী। পরে তারাপীঠে শ্মশান জাগাতে গিয়ে ভূতের ভয় ধরিয়ে এসেছেন। ভ্রষ্ট তান্ত্রিক। মাঝরাতে ভূতে নাকি আঁচড়ে দিয়েছিল। আঁচড় দেখেই বুঝেছিলেন, খ্যাঁকশেয়ালের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুরে নিয়ে গিয়ে তলপেটে চব্বিশটা।

ফ্যাট্ করে ঠোঙা ফাটার শব্দ হতেই মাতামহ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, তাহলে মর্গের গল্পটা না বলাই ভাল। কি বলেন হরিদা!

হ্যাঁ, না বলাই ভাল। সে ত আরও সাংঘাতিক।

মাতামহ বললেন, আমি কিন্তু ভয় পাইনি হরিশঙ্কর। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি একটা অন্য জগতে চলে গিয়েছিলুম। তুমি যার কাঁধে মুণ্ডু ফিট করেছিলে, সে আমার শ্যালক প্রতীপ।

অ্যাঁ, বলেন কি! একই সঙ্গে দু'জনের বিস্ময় প্রকাশ।

হ্যাঁ গো, তোমাদের মনে নেই, সেই 'পদ্মিনী মামলার কথা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পদ্মিনী মামলা! মনে পড়েছে। বছরের পর বছর চলেছিল। এত দিন আপনি চেপেছিলেন কেন?

সে যে বড় লজ্জার কথা ছিল।

হ্যাঁ, তা ছিল, লাস্ট, গ্রিড।

হ্যাঁ, একেবারে চটকা চটকি ব্যাপার। অক্ষয়বাবু ফোড়ন কাটলেন।

মাতামহ বললেন, প্রতীপ আজ বেঁচে থাকলে কত বড় গাইয়ে হত জান? ওর মতন অমন ঠুংরি খুব কম গাইয়েই গাইতে পারত। একেবারে আবদুল করীম কেটে বসান। আমি তোমার ভয়ে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলুম।

আমার ভয়ে? অক্ষয়বাবু ভুরু কোঁচকাল।

হ্যাঁ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। মনে আছে, মৃতের পাশে একটা ইঞ্জেকসানের অ্যামপুলস্ পড়েছিল? সেটা ত তাহলে তোমার পকেট থেকেই পড়েছিল।

পিতা বললেন, যদ্দুর মনে পড়ছে, সেটা ত ছিল মরফিয়া। তুমি কি রাইমার থেকে মরফিয়া

কিনেছিলে ?

কতদিন আগের কথা, আর কি মনে আছে ! হতে পারে মরফিয়া। বউদির মাথায় হেমারেজ হচ্ছিল, এইটুকু মনে আছে।

মাতামহ বললেন, সেই সময় আমি পর পর চোদ্দ দিন টানা সাক্ষী দিয়েছিলুম। আসামীরা সব ওই অ্যামপুলসের জোরে একে একে খালাস পেয়ে গেল। প্রতীপ মরফিয়া নিত না। আসামীরাও নয়। তাহলে মরফিয়া এল কোথা থেকে ? খুনীর পকেট থেকে। আর তুমিই সেই খুনী। তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি ! আজ পাওয়া গেল।

অক্ষয়বাবু শুকনো মুখে বললেন, আপনি কি আমাকে এতদিন পরে সেই খুনী ভাবলেন না কি ?

মাতামহ হেসে বললেন, কি, ভয় পেয়েছ ত !

তা একটু পেয়েছি।

দেখলে ত, ভূতের ভয় ছাড়াও, অন্য ভয় আছে। প্রতীপও নেই, পদ্মিনীও নেই। যে খুন করেছিল, সে এখনও বেঁচে আছে চন্দননগরে। সারা গায়ে শ্বেতী। প্রতীপের প্রেতাত্মা গায়ে হাত বুলিয়ে সাদা করে দিয়েছে। পদ্মিনী পুড়ে মারা গেছে।

পরের খবর কাগজে আর বেরোয়নি। পৃথিবীর আদালত থেকে মামলা গিয়ে উঠেছিল ভগবানের আদালতে। একেই বলে, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট।

মাতামহ বললেন, জীবনে আমি বহু পাপী দেখেছি। মানুষের আদালতে পার পেয়ে গেলেও ঈশ্বরের আদালতে অন্যভাবে সাজা পেয়েছে। আশু রেল কোম্পানির ক্যাশ ভেঙেছিল। অনেক টাকা। জেলে গেল তার অ্যাসিসটেন্ট প্রভাত। বউটা গলায় দড়ি দিলে। দিন যায়। আশুর এক মাত্র ছেলে। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিলে। ছ'মাসের মাথায় বাস অ্যাকসিডেন্টে ছেলেটা মারা গেল। দিন যায়। আশুর চোখ দুটো গেল। চুরি টাকার বাড়ি নিলাম হয়ে গেল। তাই বলি, পাপ করার আগে ঈশ্বরের কথা একবার ভেবো। সে চোখকে ত ফাঁকি দিতে পারবে না।

পিতা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পাটা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখুন আমার ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট।

অক্ষগবাবু বললেন, কি ক্রইম করেছিলেন ?

সামান্য অহঙ্কার, একছিটে প্রত্যাশা ভঙ্গের ক্রোধ, একটু ঘোলাটে বুদ্ধি, সব মিলে ঘণ্টা কয়েকের পশু। খুব লপচপানি, ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে পানিশমেন্ট। হাতে হাতে গীতার ফল প্রাপ্তি।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

মাতামহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হেহেঃ ব্বাবা, পথে এসো ম্যান। খুব তো পুরুষকার পুরুষকার করতে, আমি কতদিন বলেছি, কারুর কাছে কিছু আশা করো না। না পেলেই মন খারাপ, মনখারাপ থেকে অভিমান, অভিমান থেকে রাগ। রাগ হল লাল লোহা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পশুকে জাগিয়ে তোলে। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

থাক থাক আর গীতা নয়। ও অনেক শুনেছি। মুখে আওড়ে কাঁচকলা হয়। মনকে বশে আনতে হবে।

এই তো, এই তো। তুমি ঘুরে গেছ। এইবার সাধনা। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি।

রত্নাকর বাল্মীকি হয়। মিটমিটে মধ্যবিত্ত বাঙালী বাঙালীই থেকে যায়।

অক্ষয়বাবু বললেন, সবই হল গ্রহের প্রভাব। যে যা হবে, সে তা হবে। আগে থেকেই ঠিক করা আছে। সাধু সাধু হবে। চোর চোর হবে।

ওটা আবার তোমার লাইন। আমি বিশ্বাস করি না। ম্যান ইজ এ ক্রিচার অফ সারকামস্ট্যানসেস। তবে কালকের একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।

কি রকম, কি রকম ? মাতামহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখলুম। আমি যেন মাঝরাতে খোলা ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশটা খুব কাছে নেমে এসেছে।

আহা, কি ভাল স্বপ্ন। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

দাঁড়ান দাঁড়ান। সবটা আগে শুনুন। আকাশটা খুব কাছে নেমে এসেছে। ধক ধক করে তারা জ্বলছে। আমি বলছি, আরে ওই তো কালপুরুষ। যেই বলেছি কালপুরুষ, আমনি কালপুরুষ ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অবাক হয়ে ভাবছি, এ আবার কি! কালপুরুষ অমনি হু হু করে নিচের দিকে নামতে লাগল। আলো, আলো। চারপাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে। নেমে এল ছাতে। সঙ্গে সেই কুকুরটাও আছে। লোমে হিল হিল করছে আগুন। আমি ভয়ে বলছি, একি একি, আকাশ ছেড়ো না। কালপুরুষ ধনুকে তীর জুড়ল। মারবে নাকি! বলতে না বলতেই তীর ছেড়ে দিল। এত আলো, মনে হল সারা পৃথিবী জ্বলে উঠেছে। পেট্রলে আগুন লাগার মত আমি দপ করে জ্বলে উঠে এক খণ্ড পোড়া কাঠের মত হয়ে গেলুম। সব দেখতে পাচ্ছি, সব বুঝতে পারছি। নিজেই নিজের সৎকার দেখছি। কালপুরুষ রকেটের মত আকাশে উঠে গেল। আকাশ সরে গেল। চারপাশে থকথকে অন্ধকার। ছাদে সেই পোড়া কাঠ। হাওয়া লেগে ছাই হচ্ছে, আর পিট পিট শব্দ করছে।

মাতামহ পিতার পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমার হয়ে গেছে। তুমি পেয়ে গেছ। তোমার আর দেরি নেই। দীক্ষাটা নিয়ে ফেল। এখন গেরুয়া পরার দরকার নেই। সব সময় সঙ্গে একটা গেরুয়া রুমাল রাখ। সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার নাম হোক, স্বামী হরিহরানন্দ।এই বাড়িটাকে আমরা আশ্রম বানাব: পাঁজিতে তোমার নাম তুলে দেব।

আহা উত্তেজিত হবেন না। কি স্বপ্নের কি ব্যাখ্যা! কাল রাতে ওই স্বপ্ন, আজ সকালে আহত, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। দুটোর মধ্যে কেমন যেন যোগসাজস খুঁজে পাচ্ছি। অক্ষয় তুমি এর কি মানে করবে?

আজ্ঞে, আমি ত তেমন স্বপ্নতত্ত্ব জানি না। তবে, মনে হয়, আপনার এই প্রোমোশানের সঙ্গে ওর কোনও যোগ আছে।

মাতামহ মানতে পারলেন না। আরে, না হে না, একেবারে আধ্যাত্মিক স্বপ্ন। নক্ষত্র জ্যোতিতে পুড়ে ছাই হয়ে হরিশঙ্কর নবীন জন্ম লাভ করে ঊর্ধ্বে আরোহণ করছে। এ সব স্বপ্নের অর্থ তোমরা কি বুঝবে! আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? হয়ত বলতে পারবে, জ্যোতিষ-ট্যোতিষ কর ত।

অক্ষয়বাবু বললেন, বলুন, জ্ঞান থাকলে বলব।

এই বাড়িটা, বুঝলে অক্ষয়, এই বাড়িটায় একটা কিছু আছে। সংসারটা একেবারে ছারখার হয়ে গেল। এই দুটো সলতে কেবল টিমটিম করে জ্বলছে। নাতিটা ত একটা বদ্ধ পাগল। এই বয়েসের ছেলে, একটা সিগারেট খায় না, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশে না। যাত্রা, থিয়েটার দেখে না, আবার বেদবেদান্ত পড়ে। ব্যাটা, মহাপুরুষ না কাপুরুষ বোঝা দায়। আমার কি মনে হয় জান?

কি মনে হয়?

মাতামহ পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, কুলকুচো করে এস। কতদিন বলেছি, চা খাবার পর মুখ ধোবে। দাঁত ভাল থাকবে। শেষ বয়েসেও দোলের দিন মঠ আর ফুটকড়াই খেতে পারবে।

আপনিও ত চা খেলেন?

আমি? এই দেখো! মাতামহ পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্ত দু'পাটি দাঁত বের করে দেখালেন। মাতামহ যেন নিজের হাতের তালুতেই পড়ে পড়ে খিল খিল করে হাসছেন।

এই যদি আপনার অবস্থা হয় তাহলে আমার আর নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। পা নিয়ে নড়তে পারছি না। আতুরে নিয়ম নাস্তি।

মাতামহ আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, আমার কি মনে হয় জান, এই বাড়ির উত্তরের ওই বাগানে কোথাও একটা হাড় পোঁতা আছে।

শ্রোতারা সমস্বরে বললেন, হাড়?

হ্যাঁ, হাড়। সেই হাড়টা মাটি খুঁড়ে তুললে দেখা যাবে, সরু সরু কালো কালো লোম বেরিয়েছে।

শ্রোতারা বললেন, সে আবার কি ?

মাতামহ বড় বড় চোখ করে বললেন, তোমরা এ সবের কতটুকু জান। দু'কলম ইংরেজী পড়ে সব পণ্ডিত হয়ে গেছ। নিশির ডাক শুনেছ ?

ডাক শুনিনি, তবে আছে শুনেছি।

আমাদের শশাঙ্ক সাড়া দিয়ে চোখের সামনে মারা গেল। আড়াই প্রহর রাতে গুণিন এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, হাতে একটা মুখ খোলা ডাব। শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, তিনবার ডাকল, শশাঙ্ক আছ ! শশাঙ্ক ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল, কে, যাই। ব্যাস কপ্ করে ডাবের মুখে চাপা পড়ে গেল। শশাঙ্কর প্রাণবায়ু চলে এল ডাবের জলে। সেই জল খেয়ে বেঁচে উঠল মণি চাটুজ্জে। আজও বুড়ো বেঁচে আছে। তেজপক্ষের বউটা সংসার ছারখার করে দিলে। প্রথম পক্ষের বড় ছেলেটার সঙ্গে, সে আমি বলতে পারব না, তুমি আবার বকাবকি করবে।

বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। সব সময় সব কথা বলার দরকার করে না। কবিদের মত ব্যঞ্জনায় মেরে দিতে হয়।

তা হলে দেখো, তোমার ট্রেনিং-এ কি রকম তৈরি হয়েছি। রেলের মালবাবু থেকে কবি কালিদাস। যাক যে কথা বলছিলুম, তুমিই ত শিখিয়েছ, বেশি লাইন চেঞ্জ করা খুব খারাপ। মেন লাইন ধরে থাকতে হয়। মাঝরাতে পৃথিবীর চেহারা কি রকম দাঁড়ায় জান ? তোমার স্বপ্নের মত। মাপার উপায় নেই, তাহলে সত্যি সত্যিই দেখতে পেতে, আকাশ অনেকটা নিচে নেমে আসে। তারাদের চোখ ড্যাবাড্যাবা হয়ে ওঠে। গাছ চুল এলো করে দেয়। গর্তে আগুন জ্বলে, নদীর জল রক্তগোলা হয়ে যায়, কবরে কবরে মৃতদেহ উঠে বসে। এ সব আমার দেখা। তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসে দেখেছি।

আপনি দেখছি, আর এক মিলটন।

ও, সেই অন্ধ মহাকবি। অন্ধ না হলে মনের চোখ খোলে না। আচ্ছা, তোমার সেই হ্যামিলটন সায়েবকে মনে আছে ! রোজ কলকাতা থেকে প্লেনে চেপে দীঘার সমুদ্রে চান করতে যেতেন।

আবার লাইন চেঞ্জ করছেন।

মিলটনের নাম শুনে হঠাৎ মনে পড়ল, তাই জিজ্ঞেস করলুম। এই যে তুলসী, তুলসী আমার মেয়ে, তুলসী কেন মারা গেল ?

পিতা বললেন, ও সব অসুখের এখনও কোনও চিকিৎসা বেরোয়নি।

ও তোমাদের কথা। আমি জানি, তুলসী কেন মারা গেল। মনে আছে, ওর তারে মেলা শাড়ির আঁচলের খানিকটা কেটে নিয়ে গেল। তোমরা সন্দেহ করলে হাবুর মাকে। তুলসী আর ভাল হল না। হাবুর বউ কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। দশ দশটা ছেলেমেয়ে, এই গতর। মাছের ভেড়ি করে হাবু এখন ধনকুবের। লোকে বলে বেড়াচ্ছে, বিধান রায় মন্ত্রী হবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। হাবুকে ডেকে পাঠাবেন। বাঙলাদেশে যেন মানুষের অভাব !

লৌকিক জগৎটাকে আগে ভাল করে জানি, তারপর সময় থাকলে অলৌকিক নিয়ে মাথা ঘামান যাবে।

পিতার কথায় মাতামহ কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। অক্ষয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার নাতির হাতটা একবার দেখ না। বেশ বড়টড় একটা কিছু হতে পারবে কি না ?

ওর হাত আমি দেখেছি। হরিদা অ্যালাউ করবেন না, তা না হলে ও খুব ভাল নাচিয়ে হতে পারত। ড্যানসার।

মাতামহ বড় আনন্দ পেলেন, অ্যাঁ, বলো কি ? উদয়শঙ্কর ! কালই তাহলে নিয়ে যাই।

পিতা বললেন, কোথায় ?

কেন ? উদয়শঙ্করের আখড়ায়।

থাক, নাচিয়ে করে আর কাজ নেই। ছেলেরা হিল হিল করে মেয়েদের মত পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচবে ভাবলেও কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে।

এ তুমি কি বলছ ? উদয়শঙ্করের নটরাজ নৃত্য দেখেছ !

উদয়শঙ্কর একটাই হয়, একশোটা হয় না। প্রতিভার ডুপ্লিকেট নেই।

অক্ষয়বাবু বললেন, আমাদের অফিসে একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি একবার বললেই ওর একটা চাকরি হয়ে যায়। ভাল ফিউচার।

একই অফিসে বাপ-ছেলে। মাপ করো রাজা। ওকে আমি সম্বলপুর পাঠাব।

সম্বলপুর ? সেখানে কি করবে ? হাতিখেদা ? মাতামহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

সেখানে আমার বন্ধু অমল আছে। বিড়ির পাতার ব্যবসা করবে। একেবারে নিউ লাইন। অমলের মেয়েটি পরমাসুন্দরী।

মাতামহ বললেন, আঃ তাহলে ত কোনও কথাই নেই। আহার ঔষধ দুইই হয়ে গেল।

অক্ষয়বাবু বললেন, ব্যবসা ওর হবে না হরিদা। ভাবুক টাইপের চরিত্র। ব্যবসার দিকে যদি পাঠাতেই চান তাহলে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কিংবা গন্ধ দ্রব্যের লাইনে দিন।

বাদ্যযন্ত্র। সেতার, তানপুরা, হারমোনিয়াম, ফ্লুট বাঁশি। বলেছ ভাল। আবার আতর। কানে তুলো, হাতে কাঠি, চামড়ার বাকসে ছোট ছোট শিশি। আতরওয়ালা। বলেছ ভাল।

আমি বলছি না, বলছি ওর হাত যা বলছে।

মাতামহ বললেন, আমার মতে ওকে ইনসিওরেন্সের লাইনে দাও। বেশ পাকা পাকা কথা বলতে পারে। ঝপঝপ ক্লায়েন্ট ধরবে আর ফেঁপে ফুলে উঠবে।

বলেছেন ভাল, মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে। ইনসিওরেন্স একটা লাইন হল ?

কেন ? আমাদের ভবেশকে দেখো। কি থেকে কি হয়েছে !

অক্ষয়বাবু বললেন, আমার অ্যাস্ট্রলজি যদি ঠিক হয়, তাহলে এ ছেলে ফাইন আর্টসের লাইনে যাবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। অভাব হবে না, তবে চোট খাবে।

চোট খাবে মানে ?

সে আমি পরে আপনাকে বলব। সাদা কাগজে এক ফোঁটা কালি।

আই সি, আই সি, তুমি কি মিন করছ বুঝতে পেরেছি।

আমি আজ উঠি হরিদা। অক্ষয়বাবু উঠে পড়লেন।

কবে পা সামলে অফিসে বেরোতে পারব জানি না। পারলে একবার এসো।

অক্ষয়বাবু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, হরিদা, গোটা কয়েক টাকা দিতে পারবেন ! পকেট একেবারে খালি।

একেবারে খালি ! মাতামহ যেন বেশ আনন্দ পেলেন।

পিতা চশমার খাপ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমাকে বললেন, এই নাও দিয়ে দাও। এতে হবে ত ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হবে। আমি আপনাকে মাস কাবারে শোধ করে দোব।

সে দেখা যাবে। তুমি আপাতত কাজ চালাও।

অক্ষয়বাবু সিঁড়ির কাছাকাছি গেছেন, হঠাৎ বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে একজন জড়ান জড়ান গলায় চিৎকার করে উঠল, শালা হরিশঙ্কর, তুমি বড় বাড় বেড়েছ। তোমার বাপের নাম আমি ভুলিয়ে দোব।

পিতা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, টাল সামলাতে না পেরে আবার চেয়ারেই বসে পড়ে বললেন, এ ব্লাডিবাগারটা আবার কে ?

আমরা তিনজনে জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। অক্ষয়বাবু বললেন, লোকটা কে ? চেন ?

হ্যাঁ, জবার কাকা। জবা বলে একটা মেয়ে, তারই কাকা।

মাতামহ বললেন, ব্যাটা মদ খেয়েছে।

অক্ষয়বাবু বললেন, হরিদাকে গালাগাল দিচ্ছে।

জানলায় তিনটে মুখ দেখে বীরত্ব খুব বেড়ে গেল। পা টলছে, হাত ছুঁড়ে বললে, নেমে আয় শালা। মাতামহ হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, ব্যাটাচ্ছেলে, নামলে যে তোর পুঁটকি প্যাঁক হয়ে যাবে। জবার কাকা বেসামাল পায়ে নাচতে নাচতে বললে, নেমে আয় শালা পেঁড়িদারের দল। মাতামহ অসহায় মুখে পিতার দিকে তাকালেন, কি করব হরিশঙ্কর ? ঝেড়ে আসব এক লাথি ? অক্ষয়বাবু বললেন, আপনাকেই ত বলছে মনে হয়, একটা ধোপার আছাড় মেরে আসব ? তথাগতের মত হাত তুলে পিতা বললেন, ভায়োলেনস্ বিগেটস্ ভায়োলেনস্, খিস্তি বিগেটস্ খিস্তি। তুমি শুধু যাবার সময় একটা টুসকি মেরে খানায় শুইয়ে দাও। মাতালস্য কর্দম গতি।

My good blade carves the casques of men.

সারা রাত জ্বরের ঘোরে পিতা বলতে লাগলেন, তুমি এসেছ ? তুমি এসেছ ?

আমি তো পাশেই বসে আছি। কি করব কিছুই জানি না। ডাক্তারবাবুকেও ডাকা হল না। গল্পে গল্পে রাত বেড়ে বসে রইল। রাত অনেকটা সরীসৃপের মত। ক্রমশ বড় হতে হতে বড় হতে হতে, ভোরের দিকে অন্ধকারের ন্যাজটি টেনে নেয়।

তুমি এসেছ বলায় প্রথমে ভেবেছিলুম, আমাকেই বলছেন বোধ হয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এসেছি। পিতা বললেন, একটু দাঁড়াও, আমিও আসছি।

তখনই বুঝলুম, এ তুমি আমি নই, অন্য কেউ। জ্বর বাড়লে জলপটি লাগায়। সে চেষ্টাও করে দেখলুম। এমন হাতের ঝাপটা মারলেন, জলের বাটি উলটে বিছানার চাদর ভিজে গেল। চাদরের তলায় পাট পাট খবরের কাগজ ঢুকিয়েছি।

শব্দহীন মধ্যরাত। ঘড়ির পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সময়ের সান্ত্রী যেন কয়েদের বাইরে পায়চারি করছে। ফাঁসির আসামী শেষ রাত জাগছে। পরমায়ু থেকে একটি দিন না নিয়ে সে যাবে না। ভোরের শমীবৃক্ষে দিনের প্রাণদণ্ড। সায়েব হলে ইংরেজীতে কবিতা লিখতুম, এভরি মর্নিং এ ডে ইজ হ্যাঙগড়। মিনিট গলে যাচ্ছে ঘণ্টায়, ঘণ্টা চুঁইয়ে পড়ছে দিনে। দিন যায়, আর আসে না।

ভোরের আকাশ কতদিন দেখিনি ! কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। রুগী এখন শান্ত। পৃথিবীর যত কিছু বাড়াবাড়ি সবই যেন মধ্যরাতে। খুনীর খুন, চোরের চুরি, সাধকের ঈশ্বর দর্শন, রুগীর রোগ, সবই যেন তুঙ্গে আরোহণ করে বসে থাকে। শুনেছি আত্মহত্যার ইচ্ছেও প্রবল হয়ে ওঠে। পাগলের পাগলামিও বেড়ে যায়। রাতের কি মহিমা !

মানসবাবু খুবখুরে একটা কুকুরের বুকে চামড়ার ক্রস বেল্ট বেঁধে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি। চোখ জ্বালা করছে। রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। মুখেচোখে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বেশ লাগছিল। মানসবাবু হঠাৎ গোঁত করে আমাদের সদরে ঢুকে পড়ে কড়া নাড়তে শুরু করলেন। নাও বোঝো ঠ্যালা ! সাত সকালেও শান্তি নেই। কুকুরটা মেয়েলী গলায় খেঁউ খেঁউ করছে।

দরজার খিল খুলতেই মানসবাবু লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর !

বাবার খুব জ্বর, শেষ রাতে সবে একটু ঘুমিয়েছেন।

ধমকের সুরে মানসবাবু বললেন, ঘুমিয়েছেন বলে আমি একটু খোঁজ-খবর করব না ! তোমার আচ্ছা তো ! তুমি আগে জন্মেছ, না আমি আগে জন্মেছি হে ছোকরা !

মানসবাবু আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। উঠছেন আর বলছেন, ব্বাবাঃ ...ড়ি করেছ বটে ! কাশীর সিঁড়িকেও হার মানায় !

আমাকে পেছন পেছন উঠতে দেখে কুকুরটা খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছে। ফিরে ফিরে তাকায় আর ফিনফিনে ...লায় খেঁউ খেঁউ করে ওঠে। এই সময় মাতামহ থাকলে বুঝিয়ে দিতেন ঠ্যালা। বাড়িতে ডাকাত পড়ার

অবস্থা। পিতা মশারির ভেতর উঠে বসেছেন। না বসে উপায় কি!

মানসবাবু দরজার সামনে। কুকুর চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতরে। এই যে হরিশঙ্কর উঠেছ?

কুকুর সেই এক প্রশ্ন নিজের ভাষায় রিপিট করল। মশারিটা আঁচড়াবার খুব ইচ্ছে। বকলসে টান পড়ছে বলে তেমন সুবিধে করতে পারছে না।

পিতা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি কি রকম গুড স্যামারিটান দেখ, ভোর না হতেই তোমার খবর নিতে এসেছি। দু দিন মেয়ের বাড়িতে ছিলুম জামাই নতুন গাড়ি কিনেছে। বুড়োকে খুব ক দিন ঘোরালে। কাল রাতে তুমি গাড়ির শব্দ শোনোনি?

অতটা খেয়াল করিনি।

রাত ন'টার সময় জামাইয়ের গাড়িতেই ত ফিরলুম। আজ সকালের প্লেনে দিল্লী যাবে। ওই করে বেড়াচ্ছে বুঝলে। ক'দিন আর কলকাতায় থাকে? হিল্লি-দিল্লী করেই জীবন কাটালে। আর উপায় কি বল? অত বড় ইঞ্জিনিয়ার ভারতে ক'জন আর আছে! হাতে গোনা যায়। অ্যাঁ, কি বললে!

কুকুরের ডাকের পাংচুয়েশানে কথা চলেছে। কমা, ফুলস্টপের গোলমালে শ্রোতারা তেমন মর্মোদ্ধার করতে পারছেন না। পিতা ছোট্ট একটি হাই তুলেছিলেন।

কই না, কিছু বলিনি ত?

মানসবাবু আদুরে গলায় কুকুরকে ধমক লাগালেন, যেন বক্তার স্ত্রীকে থামাতে চাইছেন, আঃ, বিউটি চুপ করো না। ও ত আমাদের হরিশঙ্কর। ওকে অত ঘেউ ঘেউ করার কি আছে। ও, মাথায় মুড়ি দিয়ে বসে আছে বলে তোমার অপছন্দ হচ্ছে। কি কুকুরই হয়েসো তুমি? একেবারে সাহেব বাসসা! অ্যাঁ, কি বললে?

আজ্ঞে, না, কিছু বলিনি তো?

শুনলুম, তুমি নাকি নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ!

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

সে-এ-এ, কিই-ই? আমরা যে বলতুম, চরিত্র দেখতে চাও তো হরিশঙ্করের চরিত্র। সেই চরিত্রে তা হলে স্পট পড়ে গেল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। স্পটেড ডিয়ার।

অ্যাঁ, কি বললে?

ছিলুম বাঘ, এখন হয়েছি গুলবাঘ।

হ্যাঁ, চরিত্র ঠিক রাখা বড় কঠিন ব্যাপার! মুনি ঋষিদের জীবনটাই দেখ না। বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় থেকে সাধন ভজন করে উর্ধ্বরেতা হয়ে সমতলে নেমে এলেন। জেলেনী জাল ফেলছে জলে। ব্যাস হয়ে গেল। খেল খতম, পয়সা হজম। বউমা মারা যাবার পর তোমাকে আমি বলেছিলুম, বার বার বলেছিলুম, আমার একটি বয়স্কা শালী আছে। গুণে তার তুলনা নেই। রূপেই যা একটু গড়বড়ে। মুখে একটু পকসের দাগ। তুমি কিছুতেই দার পরিগ্রহে রাজী হলে না। বয়েস তোমার এখনও যায়নি হরিশঙ্কর। বল ত রাস্তা ওপেন আছে।

উচ্ছিষ্টে আমার রুচি নেই।

অ্যাঁ, কি বললে?

আজ্ঞে, উচ্ছিষ্টে অরুচি।

তার মানে?

আপনার স্ত্রীর আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা! সে ত স্টোভ ফেটে মারা গেল।

আপনি তাই বলেন, আপনার গুড স্যামারিটানরা তা বলে না। তারা একটু অন্য রসের গন্ধ পায়

ডিফ্যামেসান কেস করব।

সময় পেরিয়ে গেছে।

তুমি ছোটলোক, ইতর।

মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা মেলে না। ওপিনিয়ান ডিফারস।

আমি কিন্তু তোমার শত্রু হয়ে রইলুম। সুযোগ পেলেই এর শোধ নোব।

এই যে একটু আগে বললেন, আপনি আমার গুড স্যামারিটান।

আমি উইথড্র করছি।

দেন ইউ ক্যান সেফলি ক্লিয়ার আউট। ডোন্ট পোক ইওর আগলি নোজ ইন মাই অ্যাফেয়ারস্।

তোমার বাঁশ তৈরি হচ্ছে হরি।

বাঁশ আমি খুলতে জানি। বাঁশ ঝাড়ের দেশের মানুষ আমি। বাঁশ দিতেও জানি, বাঁশ খুলতেও জানি। দেখা যাক আপনার বংশ কোন্ জাতের।

মানসবাবু কুকুরটাকে কোলে তুলে নিলেন। ঘেউ ঘেউ কিছুতেই থামেনি। বাচ্চা কোলে সিনেমা দেখতে এসেছিলেন কোনও মা। কান্না যেন আর থামে না। আঁচল সরিয়ে অন্ধকারে স্তন্যপান করাও। তবে যদি শান্ত হয়। মানসবাবুর ত স্তন নেই। গোঁফ আছে বিরাট।

সিঁড়ির একটা ধাপ নেমে বললেন, মনে থাকে যেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকবে।

শুভানুধ্যায়ীকে শত্রু করলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্যামোফ্লেজ আর রইল না। যুদ্ধ সহজ হবে। আপনার সেই ভাইয়ের কি হল? মকর্দমা মিটেছে?

দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।

আমারও ওই একই উত্তর, তবে ইংরেজীতে নয়, বাঙলায়—নিজের চরকায় তেল দিন।

মানসবাবু সরে পড়লেন। পিতা মশারি ঠেলে বেরিয়ে এলেন। গতকাল দাড়ি কামান হয় নি। কদমফুল ক্ষীরে পড়ে গেলে যে রকম চেহারা হয়, মুখের চেহারা সেই রকম। আমাকে বললেন, কি বুঝলে?

খুব খারাপ।

খারাপ? খারাপ কেন?

ক্রমশই শত্রু বাড়ছে।

তুমি কি এতকাল সব বন্ধু ভাবতে? ইও আর এ ফুল। মানুষ কখনও বন্ধু হয়? বিশেষত প্রতিবেশী। ভাল হল, ভাল। খোঁচা মারলেই সরীসৃপের জাত বেরিয়ে পড়ে। জাত চেনা হয়ে গেলে নাড়াচাড়া করতে আর অসুবিধে হয় না। জেনে রাখ, তুমি এবং তুমিই। বুঝলে কিছু?

আজ্ঞে না।

এক দিকে তুমি, আর এক দিকে তোমার জগৎ। চালিয়ে যাও লড়াই। শক্তি থাকে জিতবে, নয় ত হেরে ভূত হয়ে যাবে।

মানুষকে শুধু শুধু চটিয়ে লাভ কি? মানুষ? মানুষ নামক জন্তুকে তুমি কতটুকু চেন? প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি ধরে আমি মানুষকে দেখছি। মানুষের মত নিষ্ঠুর, পরশ্রীকাতর, নীচ, স্কিমিং, ক্যালকুলেটিং প্রাণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় পাবে না। তুমি ত এখন যুবক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার সব গ্ল্যাণ্ডসই এখন ফুল সিক্রিসানে। হরমোন, থাইরয়েড, পিটুইটারি। তোমার জানা উচিত সাবকনসাস কিভাবে কনসাসে উঠে আসে। মানুষ কোন্ উৎস থেকে তার আচার আচরণের নির্দেশ পায়, মন কাকে বলে, তার কতটা সাব-মার্জড কতটা ফ্লোটিং, এ বিষয়ে তোমার কোনও পড়াশোনা আছে?

আজ্ঞে না।

ব্রাহ্মণের ছেলে। পইতে হয়েছে : ত্রিসন্ধ্যা কর। ভূতশুদ্ধি কাকে বলে জান ?

আজ্ঞে না।

সবেতেই তোমার না। কি জান হে তুমি ? পাপ পুরুষের ছবি দেখেছ ? দেখনি ? তান্ত্রিক সন্ধ্যোপাসনায় আছে। শিরে ব্রহ্মহত্যার চিন্তা, বাহুতে চৌর্যবৃত্তি, হাত নিসপিস করছে, কি করে মেরে নোব। আর কটিদ্বয় ! সবচেয়ে মারাত্মক স্থান। ব্যভিচারের উৎস। হোয়াট ইজ লিবিডো।

আজ্ঞে, আমি যে ওসব কিছুই জানি না।

তোমার মুখ দেখলে আমার মায়া হয়। দিস ওয়ার্লড ইজ নট ইওর প্লেস, মাইডিয়ার সার। তোমার জন্যে চাই কিং আর্থারের আইল্যাণ্ড ভ্যালি অফ অ্যাভালন। মৃত্যুর পর যে দ্বীপে গিয়ে তিনি আর ফেরেন নি।

Where falls not hail/ or rain/ or any snow/
nor ever blows wind loudly/ but it lies.
Deep meadowed/ fair with orchard lawns.

কোথায় পাবে তুমি সেই সুখের দ্বীপ। পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা। তাই ত জন্মের মুহূর্তে আমরা ককিয়ে কেঁদে উঠি। মাই প্যারাডাইস ইজ লস্ট : যদি মেয়ে হও পুরুষের লালসার জেলিতে আযৌবন বগ বগ করবে। যেই বার্ধক্য হল, চলে গেলে আস্তাকুঁড়ে। যদি ছেলে হও, তোমাকে কৃতদাস বানাবার জন্যে জগৎ চাবুক হাতে তেড়ে আসবে। ক্ষমতাশালী বলবে, নে ব্যাটা আমার পদলেহন কর। দুর্বলও তোমাকে ছাড়বে না। মাছির মত ভন ভন করবে চারপাশে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, উপহাসের ছিটে মেরে উত্যক্ত করবে। সো, হাউ টু লিভ ? তেড়ে ওঠ। বৈষ্ণব নয়, শাক্তের শক্ত হুঙ্কার,

My good blade carves the casques of men/
My tough lance thrusteth sure/
My strength is the strength of ten/
Because my heart is pure.

আপনি এই সব বলছেন ? প্রেম বলে কি কিছু নেই। আমাদের বন্ধু বলে কি কিছু নেই। এমন সাংঘাতিক নিষ্করুণ পৃথিবী আমার কল্পনায় আসে না।

পৃথিবীতে তুমি করুণা খুঁজতে এসেছ ? মাই ডিয়ার ফুল। ওই বইটা নিয়ে এসো। থার্ড ফ্রম দি লেফট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা। গিরীন্দ্রশেখর বসুর স্বপ্ন। দাও। হিয়ার ইট ইজ। নাও পড়ে দেখ। গল্পের বই, কবিতার বই না পড়ে মাঝে মাঝে এই সব বই পড়ে দেখতে পার। নিজেকে জানতে পারবে। মানুষকে জানতে পারবে।

বইটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। ভোব হতে না হতেই কি অশান্তি ! পেনসিলে সূক্ষ্ম দাগ দেওয়া অংশটা পড়ে দেখতেই হচ্ছে। এরপরেই যে প্রশ্ন হবে, উত্তর না দিতে পারলেই ত মাই ডিয়ার ইডিয়েট। 'পরকে মারিব, এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছা, নিজে মার খাওয়া।' পাশে মুক্তাক্ষরে নোট, পাতা ৮৩, চিহ্নিত অংশ। 'কামবৃত্তির বিকাশ কোনো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমও সেই আদি কামভাবেরই রূপান্তর নহে। সেই রূপ, সখিত্ব বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও কামগন্ধ রহিয়াছে।' পরের চিহ্নিত অংশ, 'দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি রুদ্ধ ইচ্ছারূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের নিপীড়নের ইচ্ছা, পুরুষের রূপ দেখাইবার ইচ্ছা ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার ইচ্ছা অজ্ঞাতভাবে মনের মধ্যে থাকে। পরের অধীনে চাকরি করিবার ইচ্ছা পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র।' পাশে ক্ষুদে অক্ষরে সংস্কৃত দু' ছত্র, কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥ বিশ্বজগৎ কামনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাথরুমে স্নানের শব্দ। সর্বনাশ, জ্বরের রুগী স্নান করছেন !

চান করছেন না কি ?

ঝরনা যেন উত্তর দিল, কেন, আপত্তি আছে ?

আপনার জ্বর, পা ক্ষতবিক্ষত, চান করছেন কি ?

একে বলে হাইড্রোথেরাপি । শরীরের গরম বের করে দিচ্ছি । ভয় পাবার কিছুই নেই । মটোর গাড়ি দেখেছ ?

দেখিছি ।

র‍্যাডিয়েটার কাকে বলে জান ?

জানি ।

জল ঢেলে ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখতে হয় । প্লিজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব ।

তোড়ে জল পড়তে শুরু করল । কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়িব সামনের রাস্তায় হুড়মুড় করে একগাদা টিনের কৌটো পড়ার শব্দ হল । তিরিক্ষি গলায় কে যেন বললেন, যাঃ শালা ।

পর মুহূর্তেই হুড়মুড করে আর একটা শব্দ হল । শব্দের পরেই নারীকণ্ঠ, লাথি মারছ কেন ?

পুরুষ কণ্ঠ, না লাথি মাববে না, নাত-জামাইকে আদর করবে !

কথা শেষ হতে না হতেই আবার শব্দ । একটা ঢোল গড়িয়ে পড়লে যে রকম শব্দ হতে পারে সেই রকম । পুরুষ কণ্ঠ গর্জন করে উঠল, মারেগা শালা এক ঝাপ্পড ।

হামাবা কেয়া কসুর ?

একটা চড মারার শব্দ । নারীকণ্ঠ, শুধু শুধু লোকটাকে মারছ কেন ?

না মারবে না, দাডি ধরে চুমু খাবে !

কি হচ্ছে কি ? জানালার ধারে গিয়ে দেখতে হচ্ছে । বাড়ির সামনে একটা টানা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে । চুল ওলটান খেঁকুড়ে চেহারার এক ভদ্রলোক । গায়ে লেসের কাজ করা পাঞ্জাবি । হাতায় মিহি গিলে । ভদ্রলোক খুব হম্বিতম্বি করছেন । বুড়োটে রিকশাঅলা গামছা নেড়ে নেড়ে বলছে, কাহে হাত উঠায়া, কাহে হাত উঠায়া ?

ভদ্রলোক তিড়বিড়, তিড়বিড় করতে করতে বলছেন, তুম হামারা সর্বনাশ কর দিয়া । রিকশায় এক ভদ্রমহিলা কোনরকমে বসে আছেন । বেশ স্বাস্থ্যবতী । তাজা টেঁপারির মত দেখতে । কোলের ওপর একগাদা জিনিসপত্র । রাস্তায় গোটাকতক টিনের কৌটো গুরুর সামনে ভক্তেব মত গড়াগড়ি যাচ্ছে । একটা বড কৌটো ভেতরেব মাল ছেড়েছে । একগাদা বড়ি ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে । একটা তবলা একপাশে ডিগবাজি খেয়েছে ।

ভদ্রমহিলা বলছেন, আর বসতে পারছি না । কতক্ষণ পায়ের ভরে বসে থাকা যায় ।

ভদ্রলোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, নেমে এসো না সুন্দরী । কেউ তো তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ঠ্যাং উঠে বসে থাকতে বলেনি ।

মহিলাও একই রকম খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন, কোলের জিনিসগুলি না ধরলে নামা যায় ?

এঁরা কারা ? কোথায় চলেছেন ? হঠাৎ এখানে থামলেন কেন ?

ভদ্রলোক হঠাৎ ওপর দিকে তাকাতেই আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল । তোবড়ান গালে এক মুখ হাসি । নিমেষে এমন ভাবান্তর ভাবা যায় না । চেঁচিয়ে বললেন, এই যে মাস্টার, ফাদার কোথায় ?

ভদ্রমহিলা সেই মুহূর্তে নামার চেষ্টা করায় কোল থেকে আবার একটা কৌটো সশব্দে গড়িয়ে পড়ল । রত্নগর্ভা শুনেছি, এমন কৌটোগর্ভা কদাচিৎ দেখা যায় ।

ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল । মহিলাকে দাবড়ে উঠলেন, তেরি নোলে খেলি । এ আবার ভাষা ! আবার ওপরের দিকে তাকালেন । সেই গাল ভাঙা হাসি । মেঘ ভাঙা রোদের মত । ফাদার মাস্টাব কোথায় !

যাঃ উত্তেজনায় সব গুলিয়ে ফেলেছেন ! ডেকে দোব ?

ইয়েস, ইয়েস। ডেকে দাও। উই কাম।

ভদ্রলোকেব চালচলন যেন দুমুখো ছুরির মত। একবার এদিকে কাটছেন, একবার ওদিকে কাটছেন। মহিলার দিকে ফিরে বললেন, নামতে পারছ না? তখনই বলেছিলুম ভীম ভবানীর মত গতর কোরো না।

পিতা সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। গায়ে তোয়ালে জড়ান। পায়ের ব্যাণ্ডেজ জায়গায় জায়গায় সামান্য ভিজেছে।

সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

আকৃতি?

চেহারার বর্ণনা শুনে বললেন, ও প্রফুল্ল এসেছে। কোনও নোটিস না দিয়েই চলে এল্ল! বিপদে ফেললে।

তোয়ালে জড়ান অবস্থায় জানালার সামনে গিয়ে বললেন, কি খবর প্রফুল্ল?

আমার আসার ঠিক ছিল না। হঠাৎ চলে আসতে হল।

বেশ করেছ, চলে এস ওপরে।

আর এক ক্ষেপ মাল আসবে। নিয়ে আসি তা হলে।

যাও নিয়ে এস।

এই স্ত্রীলোকটি রইল।

ওপরে পাঠিয়ে দাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটু তদারকি কর। নিচে অনেক ঘর পড়ে আছে, সেইখানেই থাকবে। অনেক আগে একবার বলেছিল। কথার কথা। আজ দেখছি এসেই পড়েছে। নিচেটা ভূতের বাসা হয়ে আছে, এতদিনে মানুষের হাত পড়বে।

মাহেশে রথ দেখতে গিয়ে মাতামহ এক মহিলাকে দেখে বলেছিলেন, আহা! মা যেন রাবণলক্ষ্মী।

রাবণলক্ষ্মী কি জিনিস দাদু!

মালক্ষ্মী একটু স্থূলাঙ্গী হলেই যক্ষপুরীর লক্ষ্মী হয়ে যান।

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীকে দেখে আমার সেইরকমই মনে হল। বেশ একটা জমজমাট অস্তিত্ব। এত চওড়া পাড় শাড়ি আমি আগে দেখিনি। ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এলে মানুষের এই রকম দুধে-আলতা চেহারা হয়। কি মানুষের কি স্ত্রী। প্রবীণা মহিলা হলে বলতেন বাঁদরের গলায় চাঁদমালা।

একগাদা জিনিসপত্রের মাঝে মহিলা অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনি ওপরে চলুন।

বড় বড় চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আমাকে যে এখানেই দাঁড়াতে বলে গেল।

তাতে কি হয়েছে!

এসে দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র করবে। আমি বরং এই রকটায় বসি।

একটা ছাগল এসে বড়ি খাচ্ছিল বেশ তারিয়ে তারিয়ে, চোখ বুজিয়ে। হুঁ হুঁ করে মাঝে মধ্যে শব্দ ছাড়ছিল। হঠাৎ তিড়বিড় করে লাফাতে শুরু করল।

মহিলা বললেন, ঝাল লেগেছে। এর নাম পাঞ্জাবী বড়ি। কত কষ্ট করে দিয়েছিলুম। সব রাস্তায় পড়ে গেল। সব ব্যাপারে এত হাঁকপাঁক করে!

রকে বসে পড়লেন। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। আমাদের নিচেটা যেন যক্ষপুরী। এখানে বসবাস করবেন কি করে! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে।

মহিলা বললেন, সারাটা দিন চলে যাবে এইসব পোস্কার-ঝোস্কার করতে। কি হয়ে আছে! মেয়েদের হাত না পড়লে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফেরে না।

ছাগলটা আবার বড়ি খেতে শুরু করেছে। ঘাসপাতা খাওয়া মুখে নতুন ধরনের স্বাদ। ছাগলের খনও পেট খারাপ হয় না। এমন লিভার, যাই খাক না কেন, সেই ছাগলনাদি।

বাকি মালপত্র নিয়ে প্রফুল্লবাবু এসে পড়লেন। তিন ভাগ পাকা, এক ভাগ কাঁচা চুল, টান টান করে পছনে ওলটান। মুখে একটা সিগারেট। কথা বললেই পিড়িক পিড়িক করে নাচছে।

পিতা চাবির গোছা নিয়ে নিচে নেমে এলেন, খুব সাবধানে, ধীরে ধরে ধরে। প্রফুল্লবাবু বললেন, জুতো মেরে চলে এলুম।

সে কি, মামাকে কেউ জুতো মারে ?

জুতো মারার কাজ করলে জুতোই মারতে হবে। ফুল গেঁদুয়া নয়। নাও, নাও, প্রণাম কর। ব্রাহ্মণ মানুষ। একি তোমার পায়ে আবার কি হল ?

চোট লেগেছে।

তা হলে নেমে এলে কেন ? ব্যাটাচ্ছেলে আমার তবলাটা দুম করে রাস্তায় ফেলে দিলে। দেখি একবার, ঘাটফাট সব ঠিক আছে কিনা !

বকে বিঁড়ে সমেত তবলা বসিয়ে টাঁই করে একটা চাঁটি মেরে কিছু কুঁচো বোল ছাড়লেন। যেন চকমকি খেলে গেল। দেখতে যেমনই হোক গুণী মানুষ।

পিতা বললেন, আহা, আহা, একটা হাত করেছ বটে প্রফুল্ল। ঘুরিয়ে এনে তেহাইয়ে ফেল।

প্রফুল্লবাবু তিনটে তেহাই মেরে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে দিলেন। শ্রীমতী প্রফুল্ল মাথায় ঘোমটা টেনে কলা বউয়ের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে।

মুখোমুখি দুটো ঘর খোলা হল। একটা বেশ বড়, আর একটা একটু ছোট। ছোট ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের বেলাতেই চোখ চলে না। প্রফুল্লবাবু ঘর দেখে বললেন, বাঃ বাঃ বেশ হবে, একটা শোবার, একটা রাঁধার। নাও হে লেগে পড়। পারবে ত সব গোছগাছ করতে !

পিতা বললেন, আমার পাটা ঠিক থাকলে তোমাদের সঙ্গে লেগে যেতুম।

না, না, ও একাই পারবে। আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে। মুরগীহাটায় কাজ আছে।

সে কি, একা সব সামলাবে কি করে, যেখানে এক রেজিমেণ্ট লোকের প্রয়োজন।

ওঃ, তুমি ওকে চেন না। একাই একশো।

ভদ্রমহিলা দেয়ালের দিকে মুখ করে বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, শরীর যখন খারাপ, আমি কি রেঁধে দোব। আমার ছোঁয়া খেতে ওনার যদি আপত্তি না থাকে !

ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। সত্যিই ত। শরীর যখন খারাপ তখন তোমারই সেবা করা উচিত। হরি, তোমার কি জাতের বিচার আছে ?

জাত ! তা হলে ত আমাকে বড় বিপদে ফেললে। যদি বলি আছে, তাহলে দুঃখ পাবে, যদি বলি নেই, তা হলে রাঁধতে বসবে। আমি আমার জন্যে কাউকে খাটাতে চাই না।

শ্রীমতী প্রফুল্ল নিচু হয়ে প্রণাম করে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। প্রফুল্লবাবু বললেন, মারো

মারকাটারি বগল চাপ কারবারে গুনচট

ডাকে একটা চিঠি এল। খামের বুকে পাতলা কাগজের জানালা বসান। সেখান থেকে উঁকি মারছে মার নাম। ভেতরে টাইপ করা চিঠি। বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠান ইণ্টারভিউতে ডেকেছেন। কাগজপত্র নিয়ে সাতদিন পরে সকাল দশটার সময় উপস্থিত হবার সংক্ষিপ্ত আদেশ। যাক্ তদিনে তবু একটা ডাক এল। জীবনের প্রথম ইণ্টারভিউ। খুবই আতঙ্কজনক ব্যাপার। কনে দেখার

মত। একটু হাঁচো ত মা। একটু কাশো ত মা। দু লাইন কবিতা বলো ত মা। সামনে দিয়ে দু'পা হেঁটে যাও ত মা। সাধারণ চাকরি। কি আর এমন জিজ্ঞেস করবে! বি সি এস কি আই সি এস হলে চিন্তার ছিল। চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তা হলে বেশ মজা হয়। গোঁফ বেরোলেই কি সাবালক হয়! বেড়াল ত গোঁফ নিয়েই জন্মায়। সাকার না হলে আকার আসে না।

টেবিলের ওপর গোল একটা আয়না বসিয়ে পিতা চিবুক উল্টে দাড়ি কামাচ্ছেন। হাতে কায়দা করে ধরা সেই বাটলার ক্ষুর। বেঁটে ঝকঝকে ফলা। বাঁটটা ভারি সুন্দর। ওটা নাকি হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। সোনালী পিন দিয়ে আঁটা। রূপসীর নাকছাবির গত ঝিলিক মারছে। সড়াক করে টান মারছেন। সাবানের ওপর দিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড তৈরি হচ্ছে। দাড়ি কামাতে বেশ সময় লাগে। সোজা টান, উলটো টান, মাঝে মাঝে হাত বুলোনো। কড় কড় করলেই উলটো টান।

প্রশ্ন করলেন, কার চিঠি? ইন্সিওরেন্সের?

আজ্ঞে না, ইণ্টারভিউ।

তাই না কি? তা হলে জীবিকার জগতে ঢুকলে? কোন্ প্রতিষ্ঠান?

সি এইচ লরেন্স।

প্রাইভেট ফার্ম। একজন ডিরেকটারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সত্যিই যদি চাকরিটা চাও তা হলে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।

নিজের জোরে কি হয় দেখি না।

বাঃ, এই তো চাই। পুরুষকার তৈরি হচ্ছে।

উত্তর দিক থেকে এক ঝলক ধোঁয়া এসে ঘরে ঢুকল। নিচে প্রফুল্লকাকার স্ত্রী তোলা উনুনে আগুন দিয়েছেন। পিতা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছি, সরাসরি তার মুখে। আমতা আমতা করে বললুম, আজ্ঞে, ধোঁয়া।

হ্যাঁ, ধোঁয়া। স্মোক নুইসেন্স। সহ্য করা শক্ত।

রাঁধতে গেলেই আগুন ত দিতেই হবে।

তুমি কি ও তরফের অ্যাডভোকেট?

যা বাব্বা! নিচের তলায় থাকার জন্যে আমি ওঁদের ডেকে এনেছি নাকি! পিতা সুর পালটে বললেন, মহিলা রাঁধেন ভাল। সেদিন ধোঁকা কেমন খেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অসম্ভব ভাল রেঁধেছিলেন।

প্রায় বছর দশক পরে আমি ধোঁকা খেলুম। তোমার মা রাঁধতেন ভাল। তবে জীবনটা ত বড় সংক্ষিপ্ত ছিল। খেলা না ফুরাতে, খেলাঘর ভেঙে সরে পড়ল। চলবে না।

আসা-যাওয়ায় ত মানুষের হাত নেই।

আরে দূর, উনুন না ধরালেই ধোঁয়া আসবে না। এর চেয়ে সহজ সমাধান আর কি আছে।

না, আমি ভেবেছিলুম, আপনি মানুষের আসা-যাওয়ার কথা বলছেন!

আরে না না, মানুষ তো আসবে যাবে। ইটারন্যাল প্রসেস।

এক ফালি চামড়ায় সটাসট বার কতক ক্ষুর সানিয়ে নিলেন। গালে আবার একবার সাবান চাপছে হাত থামিয়ে বললেন, ডেকে আনো।

কাকে? কাকীমাকে?

গবেট। কোনো পুরুষ পরস্ত্রীকে ডাকতে পারে? প্রফুল্লকে ডেকে আন।

প্রফুল্লকাকার স্ত্রীর নামে সাবেক কালের একটা গন্ধ আছে, আঙুরবালা। ভদ্রলোক আদুরে গলায় ডাকেন, আঙুর। ও আঙুর। মহিলার বরাতে স্বামীর আদরের চেয়ে অনাদরই বেশি জোটে। যে কদিন এসেছেন, তার মধ্যেই দু-এক পক্কড় চড়-চাপড়ও হয়ে গেছে। মহিলা সত্যিই অসম্ভব কাজের। নিচেটাকে কেমন তকতকে, ঝকঝকে করে ফেলেছেন। পাতকোতলা থেকে যে নর্দমাটা সোজা সদর রাস্তার নর্দমায় গিয়ে পড়েছে, সেটা এতকাল খোলাই থাকত। আঙুর কাকীমা লম্বা কাঠ পেতে নগ্নতা

ঢেকেছেন। বিচিত্র বোদা গন্ধটা আর নেই।

হুট করে নিচে নেমে বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। সকালের দিকেই যে প্রফুল্লকাকার এমন সোহাগ পেয়ে বসে আছে, কি করে জানব। কিছু একটা করছিলেন, আমার ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন। একটু অপ্রস্তুত ভাব।

এই যে মাস্টার পিণ্টু ?

আঙুর কাকীমা তাড়াতাড়ি ঘরের অন্ধকার অংশে সরে গেলেন।

আপনাকে বাবা একবার ডাকছেন।

অ্যাঁ, ডাকছে ! এ পোশাকে যাই কি করে ! হ্যাঁগা, এই ফুল ফুল শাড়ি পরে যাওয়া যাবে !

স্ত্রী সমর্থন করলেন না। উনি রাগী মানুষ। শাড়ি পরে যাবে কি করে ? ধুতি পরে যাও।

ভাঁজ করা শাড়ি ছেড়ে ধুতি পরতে হলেও যে বিড়ি ধরাতে হয় এই প্রথম দেখলুম। উনুন থেকে কাগজে করে আগুন তুলে নিলেন। মুখে এখনও দাঁত পরেন নি। বিড়ির টানে চোপসান গাল আরও চুপসে গেল। বাজপাখির ঠোঁটের মত নাক আর ছিটে গুলির মত দুটো চোখ ছাড়া মুখে আর কিছু আছে বলে মনে হল না। ঠোঁটের ফাঁকে বিড়ি, চামচের মত দুটো চোখের রসগোল্লা তুলছে আর নামাচ্ছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। সারা গায়ে গুলিব বাহার। ঠেলে ঠেলে আছে। যাঁরা উপযুক্ত আহার ছাড়া রিঙে ব্যায়াম করেন তাঁদের চেহারাই এই রকম পাকতেড়ে হয়।

কি বলছ হরি, কি বলছ হরি, করতে করতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। হাতকাটা গেঞ্জিটা ছাড়লে পাবতেন। স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরলে পিতা বড় অসন্তুষ্ট হন। হাত তুললেই বাহু কেশ উঁকি মারে।

দাড়ি কামান শেষ করে পিতা ক্ষুরের পরিচর্যায় ব্যস্ত। সামান্য ধোঁয়া তখনও ঘরে ইলিবিলি করছে। শোনো প্রফুল্ল, এ চলবে না।

প্রফুল্লকাকা কিছু না বুঝেই বললেন, ঠিক বলেছ এ আর চলে না।

তা হলে ব্যবস্থা কর।

দিয়ে দাও, আজই শান দিয়ে নিয়ে আসি।

শান ? পিতা অবাক হলেন। কিসের শান ?

ক্ষুর। ক্ষুরে ধার কমবেই। মাঝে মাঝে ধার দিতে হয়।

আমি ধোঁয়ার কথা বলছি। তোমার নিচের সমস্ত ধোঁয়া ওপরে আসছে। তার কি হবে ?

আমাদের ত দুটি খেতে হবে হরি !

তোমাকে আমি ধোঁয়ার কথা প্রথমেই বলেছি। তুমি বলেছিলে, আপনি আর কপনি, প্রাইমাস স্টোভেই মেরে দেবে। সে কথা তুমি রাখলে না।

বড্ড খরচ হরি। কয়লাতে একটু সাশ্রয় হবে। জানই ত আমি কি কাজ করি ! সামান্য মাইনে।

উটের নাক গলাবার গল্পটা তোমার মনে আছে ? গিভ দেম অ্যান ইঞ্চ, দে উইল আস্ক ফর অ্যান এল। এমনি থাক আমার আপত্তি নেই, ধূমায়িত অবস্থায় আমার আপত্তি আছে।

বেশ তাই হবে। প্রফুল্লকাকা করুণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাচ্ছিলেন। পিতা গম্ভীর গলায় বললেন, যাও জিজ্ঞেস করে এস।

কি জিজ্ঞেস করব হরি ? কাকে করব ?

তোমার স্ত্রীকে। আমাদের রান্নাঘরে রাঁধায় তাঁর আপত্তি হবে কি না ? ধোঁয়া বেরোবার চিমনি আছে। এক ঝাপটে সব হয়ে যাবে।

অ্যাঁ, বলো কি ? তুমি তাহলে আমাদের রান্না খাবে ?

না।

তা হলে ?

তা হলে, ভেরি সিম্পল। পালা করে রান্না হবে। সকাল নটার মধ্যে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের শুরু হবে। ইচ্ছে করলে বিকেল পর্যন্ত চালাও। রাত আটটায় আবার আমাদের পালা।

এখন আমরা কোন পালায় পড়ব ? এখন ত প্রায় এগারোটা বাজে।

আজ ত তোমরা আগুন দিয়েই ফেলেছ ! সকালটা সেরে নাও। বিকেলে যে পালা বেঁধে দিলুম, সেই পালা অনুসারেই চলবে।

ভেরি গুড, ভেরি গুড। প্রফুল্লকাকা নিচের দিকে পা বাড়ালেন।

হ্যাঁ শোনো। আবার বাধা। পিতা আপাদমস্তক তবলচি বন্ধুকে দেখে নিলেন একবার।

এই ধরনের অঙ্গসজ্জা আমি অপছন্দ করি। ভবিষ্যতে আমার সামনে যখন আসবে, হয় আদুড় গায়ে না হয় পুবো হাতা গেঞ্জি পরে। এই ধরনের গ্রহণ লাগা গেঞ্জি চলবে না।

ও, ইয়েস, ও ইয়েস। আই চেঞ্জ ক্লথ, নট চেঞ্জ গেঞ্জি। রিমেমবার। রিমেমবার।

এ কি ইংরিজীরে বাবা ! পিতার বন্ধু, অথচ শীলন, পরিশীলন, শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই তেমন নেই। এমন মানুষকে সহ্য করবেন কেমন করে ! উনি আবার ফুসুর ফুসুর করে বিড়ি খান। গোদের ওপর বিষফোড়া।

উর্ধ্বশ্বাসে একটি গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। আমাদেরই বাড়ির সামনে সশব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল। দরজা বন্ধের শব্দ হল। মনে হয় প্রতাপ রায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মাতুল এলেন। পিতা খাপে ক্ষুর ভরতে ভরতে বললেন, কি ব্যাপার হে, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়।

অঙ্গে চাঁপা ফুল রঙের পাঞ্জাবি। ফিনফিনে দিশি ধুতি। উঃ যা মানিয়েছে ! একেবারে প্রিন্স অব ওয়েলস্। মাতুলের হাসিটি ভারি চমৎকার। সোনার চশমার আড়ালে জ্বলজ্বলে টানা চোখ। চোখ হাসছে, মুখ হাসছে। সর্ব অঙ্গে হাসির হিল্লোল।

দুটো জিনিস চাইতে এলুম।

একটা নয়, একেবারে দুটো। বল, কি বস্তু ?

আপনার সেই মুগুর দুটো। আর আমার এই ভাগনেটিকে।

ফর গুড, না ফেরত দেবে !

না না, ফেরত দোব। ফার্স্ট আইটেম, রিটার্নেবল হোয়েনেবল, সেকেণ্ড আইটেম সন্ধের মুখেই ফিরিয়ে দোব।

হঠাৎ মুগুর নিয়ে কি করবে ? ভাঁজবে ?

চেয়ারে গুছিয়ে বসে মাতুল বললেন, আমার ছবি ফ্লোরে নেমে পড়েছে ! তিন দিন কাজ হয়ে গেল। আজ চতুর্থ দিন। আজ যে শটটা নেয়া হবে, সেই শটে একটু মুগুরটুগুর ভাঁজার ব্যাপার আছে।

স্টোরি কার ?

স্টোরি আমরা সবাই মিলে তৈরি করেছি।

সে আবার কি ? বারোয়ারী দুর্গাপুজো।

ফিলমে ওইটাই চলে। একটু অ্যাকটিং, একটু গান, পাবলে এক রাউণ্ড নাচ, আবার একটু অ্যাকটিং। ফুটবলের মত, পাশ দিতে দিতে, পাশ দিতে দিতে এগিয়ে চলা।

তা তোমার এ কাহিনী কি লাভ স্টোরি ?

না, না প্রেমফ্রেম খুব জোলো ব্যাপার। আমার হল দেশাত্মবোধ। ভারত জাগিল তবু কই ? দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি, চক্রান্ত, কালোবাজারী···

সব মিলিয়ে একটা ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড।

ক্যাডাভ্যারাস বলছেন কেন ?

দেশাত্মবোধে আবার নাচ আসে কোথা থেকে। তাছাড়া এ দেশে দেশাত্মবোধ ছিল স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত। আদর্শ ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, স্বাদেশিকতা ছিল। এখন ত আবার সেই নিচের দিকে স্রোত বইছে। মেরি করেপ্লিব ভারত, চিকেনারি, পারজারি, ফোরজারি, বাফুনারি।

অ্যা, ঠিক ধরেছেন। আমাদের গণেশ উদ্বাস্তুদের নামে করোগেটেড শিট বের করে ব্ল্যাকে ঝেড়ে ঝেড়ে আটচালা থেকে তিনতলা বাড়ি হাঁকালে। আমাদের মেধো হল ভারি নেতা। আগে বাড়ি বাড়ি

মাঝরাতে সিঁদ দিয়ে বেড়াত, এখন ওয়াগন ভাঙে। নেতা আবার ডাক্তারদের মত চেম্বার খুলে বসেছে। সকাল, বিকেল দরবার বসে। A film not only entertains but it also educates.এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। কোরাসে একটা গান রেখেছি, মুখোস খোলো, মুখোস খুলে মানুষ চেনো, মুখোস খোলো। মুখের কথায় ভুল বুঝো না, চিনতে শেখ, কোন্ কথাটা কথার, কোন্ কথাটা মনের। মুখোস খোলো। বাউলের সুরে নেচে নেচে ধরেছি একেবারে তেড়ে চড়া পর্দায়।-ফাটাফাটি ব্যাপার। মার কাটারি বগল চাপ।

এ আবার কি ল্যাঙ্গুয়েজ।

ভুল হয়ে গেছে। ককনি। দেশবিভাগের পর এই সব ল্যাঙ্গোয়েজ খুব চলছে। যেমন কারবারে গুনচট। মাপ করো রাজা। মানে মানে এখন কেটে পড়তে পারলেই ভাল হয়। একে বলে বাস্টার্ড কালচার।

আপনিও ওই ফাঁদে পড়ে গেছেন। না জেনেই। এই মাত্র দুটো শব্দ ব্যবহার করে ফেললেন, মাপ করো রাজা, আর, কেটে পড়া। আপনার পিতাঠাকুর এসব ভাষা ব্যবহার করতেন না।

করতেন না?

কখনই না।

তা হলে আমি কোথা থেকে শিখলুম। আমি তো কারুর সঙ্গে তেমন মিশি না।

ওই যে জানালা। ওই জানালা দিয়ে আলো আসে, বাতাস আসে, শব্দ আসে, ধুলো আসে, ধোঁয়া আসে।

ঠিক বলেছ। গবাক্ষ পথেই স্ল্যাংয়ের আনাগোনা। The dogs did bark, the children screamed/up flew the windows all/And every soul bowled out. কত দিন আগে পড়েছি! কি রকম মনে আছে দেখেছ?

আপনাব মেমারি একেবাবে ফোটোগ্রাফিক মেমারি।

তা, তোমার নায়ক না হয় মুগুর ভাজবে, তোমার ভাগনে কি করবে?

কোরাসে গান গাইবে। আজ গানের টেক আছে।

টেক মানে?

শর্ট ফর টেকিং।

ও গানের কি জানে?

যা জানে তাইতেই মার কাটারি। একবার শুধু রিহার্স করিয়ে নোব।

কি লাভ?

আহা, ওকে একটু মিশতে দিন, একেবারে ঘরকুনো করে রাখবেন না। এখন ডাকাবুকোর যুগ পড়েছে। যা তা গান নয়, ডি এল রায়। একবার গালভরা মা ডাকে। /মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক, মা ব'লে ডাক মাকে।

মাতুলের গলায় সুর এসে গেল। ভাবে বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন-

ডাক এমনি ক'রে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে,
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে থাক যেখানে যে থাকে।

প্রফুল্লকাকা গুটিগুটি ওপরে উঠে এসেছেন। এবারে একেবারে আদুড় গা। ফর্সা বুকে গুটিকতক লাজুক লোম। পিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, খুলে এসেছি। পুরো হাতা গেঞ্জি নেই। জামা কেচে দিয়েছে। মাতুল এদিকে উদাত্ত সুরে গাইছেন—

দুটি বাহু তুলে নৃত্য ক'রে
ডাকরে মা মা বলে,
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের
ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে

প্রফুল্লকাকা বললেন, আমাদের জয় এসেছে। একেবারে জমিয়ে দিয়েছে। তবলাটা নিয়ে আসি তাহলে, বউনি হয়ে যাক।

গান থেমে গেল। চোখ মুদেছিলেন। চোখ খুলে বললেন, কে প্রফুল্লদা! এখনও হাত ঠিক আছে ?

তা, তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে হাত এখনও ভালই চলে।

আপনি এখন আছেন কোথায় ?

হরি দয়া করে এই বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছে। খাবোদাবো আর দু'জনে বাজনা বাজাব।

না, আজ আমি উঠি। ওরে নে নে, চল, মুগুর দু'টো বের কর।

মাতুল উঠে পড়লেন। আমি এখন যাই কি করে ? রান্না খাওয়ার কি হবে। আমার দ্বিধা দেখে পিতা বললেন, ভাবনা নেই। তুমি ঘুরে এস। এক বেলা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

মাতুল বললেন, যাচ্ছিস সিনেমা পাড়ায়, আমি তোকে সাজিয়ে নিয়ে যাব। দেখি তোর জামাকাপড় কি আছে। পাঞ্জাবি আছে ?

আজ্ঞে না।

গোটা দু'যেক পাঞ্জাবি কবা না ! দাঁড়া, আমি তোকে করিয়ে দোব।

পিতা বললেন, উঁহু ভাইস ঢুকিও না। অ্যাভারিস বিগেটস সিন, সিন বিগেটস ডেথ।

পাঞ্জাবিতে ভাইস ?

না, তা নয়, তবে ফপিস টেনডেনসি এসে গেলে ও আর কিছু করতে পাববে না। তুমি ত সব পেয়ে গেছ। তোমার যা সাজে, ওর তা সাজে না। ওকে যে এখনও অনেক দূরে যেতে হবে, go thou forth weeping bearing precious seed, until the time comes.

কোন যাওয়াব কথা তিনি বললেন জানি না, তবে মাতুলের গাড়িতে প্রায় কেঁদে ফেলাব মতই পরিস্থিতি তৈরি হল। পেছনের আসনে বসে আছি। হাঁটুর দুপাশে দারোয়ানের মত খাড়া দুটো মুগুর। মাতুল বসেছেন সামনে, চালকেব পাশে।

গাড়িটা কিনে ফেললুম, বুঝলি ? যদিও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, তবু বাঘেব বাচ্চা। খায় কম।

কি খায় ?

তেল বে, তেল। কম তেলে বেশি বাস্তা খায়।

সিটটা এমন কেন ? পেছনে খোঁচা মাবছে।

গদিটা একটু তেবড়ে গেছে রে। ওসব পালটাতে হবে। দাঁড়া, ডিস্ট্রিবিউটরের টাকাটা হাতে এসে যাক, খোল নলচে সব বদলে রোলস রয়েস করে ফেলব। গাড়ি ছাড়া ফিলম হয় কি রকম যাচ্ছি বল ? রাজার মত !

তা যাচ্ছি। তবে আপনার গাড়ি বড় শব্দ করে। এটা বোধ হয় মিলিটারিতে ছিল।

না রে, গাড়িরও পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ আছে। এ হল পুরুষ গাড়ি। ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্ট। গলা দিয়ে ধ্রুপদ বেরোচ্ছে, সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গত।

আপনার সেই বন্ধু প্রতাপবাবুর কি হল ?

ও প্রতাপ ! আর বলিসনি, প্রতাপ ফেঁসে গেছে।

ঘুড়ি ফেসে যায় শুনেছি, মানুষও ফেঁসে যায় !

ফাঁসে না। প্রতাপ প্রেমে ফেঁসেছে।

প্রেম ?

হ্যাঁ রে ব্যাটা। সেই তোদের বাড়ির মেয়েটা, কি যেন নাম বড়টাব !

কনক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই কনক। কনকের সঙ্গে ওর বিয়ে লাগল বলে। তোর ওই মেসোমশাই ! উঃ একটা ঘোড়েল মাল !

আমি জানতুম।

জানবিই তো। ধোঁয়া দেখলেই বুঝবি আগুন আছে। প্রতাপ ছেলে ভাল, তবে কি জানিস, অঢেল পয়সা। পয়সাওলাদের চরিত্র বড় চঞ্চল হয়। আকাশে ভেসে থাকে, মাটিতে পা থাকে না।

আপনারও ত পয়সা আছে।

আমার পয়সা! গান ছাড়া আমার কিছু নেই। জানিস ত, ভাল একটা চাকরি করতুম, ইয়েস স্যার, নো স্যারের ভয়ে ছেড়ে চলে এলুম। আমার দুটো গ আছে, গান আর গোঁ। দুটো র আছে, রাগ আর রসনা। আমি খেতে বড় ভালবাসিরে। বেশি না, অল্প, অল্প। কিন্তু বেশ তরিবাদি করে। দুটো ল আছে, লোভ আর লোকভয়। দুটো ভ আছে, ভালবাসা আর ভাবনা। নিজেকে চিনতে শেখ ব্যাটা, জীবনে চলার রাস্তা খুঁজে পাবি। বাঁয়ে, বাঁয়ে।

মাতুল হাউমাউ করে পথ নির্দেশ দিলেন। চালক বেচারা রাস্তা ছেড়ে যাবার ভয়ে বাঁ দিক হেলে অ্যায়সা স্টিয়ারিং ঘোরালেন দু হাতে, কনুইয়ের কানকি লেগে মাতুলের সোনার চশমা নাক থেকে খুলে কোলে পড়ে গেল। এদিকে সাইকেলের পেছনে দুধের ক্যান চাপিয়ে এক হিন্দুস্থানী রাস্তায় বাঁক নিচ্ছিল, গাড়ির মাডগার্ডের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ল। মোহনবাগানের গোলকিপার যেন বল বাঁচাতে বডিথ্রো করেছে। দুধের ক্যান রাস্তায় আপন মনে গড়গড়িয়ে চলেছে, ভলকে ভলকে দুধ বেরোচ্ছে, মায়ের করুণাধাবার মত। সাইকেল ঘাড়মুখ গুঁজড়ে একপাশে পড়ে আছে শ্যামল মিত্রের সঙ্গীতের মত, আজ হৃদয়ের কামনা শান্ত, থাকে শুধু ব্যথা ভার।

এইসব শৃঙ্খলিত ঘটনাপ্রবাহের দিকে মাতুলের চোখ ছিল। স্বভাববিরুদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, স্টপ। গাড়ি থামব কি থামব না করছিল, থেমেই পড়ল। দরজা খুলে মাতুল ডান পা বাড়ালেন। চুনোট করা দিশি ধুতির কোঁচা, আসুন বাবু আসুনের ঢঙে ধবধবে সাদা, শৌখিন একটি পাকে রাস্তায় পদপাতে আহ্বান জানাল।

দেশপ্রেমীর মত চেহারার এক ভদ্রলোক ভূপাতিত মানুষটির ওকালতনামা নিয়ে তেরিয়া হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। মাতুলের চেহারা আর সাজপোশাক দেখে ঘাবড়ে গেলেন। চারপাশে জ্বলজ্বলে রোদ। সামনে ছ' ফুট লম্বা এক মানুষ। সারা গায়ে গোলাপী আভা। যেন কোন কাশ্মিরী ললনা লিঙ্গ পরিবর্তন করে জাফরানের মাঠ থেকে উঠে এলেন। ঘাড়ের কাছে উদয়শঙ্করের মত কোঁকড়ান চুলে হাত বুলোবার জন্যে একবার আঙুল তুলেছিলেন, অনামিকার হীরের আংটি চড়াক করে ঝিলিক মেরে উঠল। দুধঅলা গোল খাওয়া গোলরক্ষকের মত মুখ করে সামনে এসে দাঁড়াল, গরিব আদমি বড়াবাবু।

মাতুল বললেন, সমঝ গিয়া।

বুক পকেটে হাত দিয়ে চওড়া একটা একশো টাকার নোট বের করে হিন্দুস্থানীর হাতে দিতে যাচ্ছেন দেশপ্রেমী বাধা দিলেন, কে রে, তুই আমাদের জয় না! দাঁড়া।

মাতুল ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রবীর! তুই আমাদের 'প্রবীর না!

বাস, দুই বন্ধুর মিলন। প্রবীর বলছেন, কি চেহারা করেছিস? একেবারে লেডি কিলার!

মাতুল বলছেন, কি চেহারা করেছিস, কুস্তির পালোয়ান!

হিন্দুস্থানী বলছে, বাবুজি, গরিব আদমি।

মুগুর দুটো শুয়ে পড়েছিল। সিটের মাঝখানে তাড়াতাড়ি আটকে গেছে। কিছুতেই সোজা করতে পারছি না।

যেমন কর্ম তেমন ফল
মশা মারতে গালে চড়

একশো নয়,শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় হিন্দুস্থানী গোয়ালা সন্তুষ্ট হয়ে দুধের ক্যান আর সাইকেল তুলে নিয়ে সরে পড়ল্। আহা কি দৃশ্য ! যেন হরিহর ছত্রের মেলা। কুকুরে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। একটা হোঁতকা ষাঁড়ও এসে জুটেছে। সেই কবে কোন্ শৈশবে, যখন এত বড় পেল্লায় ষাঁড় হয়নি, তখন কোন এক গোমাতার দুধ খেয়েছিল ! এখন আর কোন্ গাভী এই ভয়ঙ্কর দামড়াকে দুধ খাওয়াবে। ষণ্ড ত আর চণ্ডী পাঠ করেনি যে গরুতে মাতৃদর্শন হবে। বলবে স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। সে এক দৃশ্য ! ষাঁড়ে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। মাতুলের কুড়ি টাকার সদ্গতি হচ্ছে।

এদিকে মুগুব অ্যায়সা আড়াই প্যাঁচ মেরে বসে আছে। কুমীরের গলায় বঁড়শি আটকেছে। বেশি টানাটানি করতে ভয় সাগছে। যদি হাতল ভেঙে যায় আমিও আর আস্ত থাকব না। এদিকে মাতুল প্রবীরবাবুকে পেছনের আসনে তুলতে চান। কথায় কথায় জানা গেছে, তিনি চিত্রকর, আবার গান লেখেন। আর রক্ষে আছে। সিনেমায় হরেকরকমের প্রচারের কাজ আছে। বাল্যবন্ধুকে হাতের কাছে পাওয়া গেছে। আর কি সহজে ছাড়া যায়।

প্রবীববাবু উঠবেন কি করে। পায়ের কাছে মুগুরদ্বয়ের ষড়যন্ত্র। মুগুর মনে হয় স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণী ! দু'জনে পাশাপাশি সদ্ভাব বজায় রেখে শান্তিতে অবস্থান করতে পারে না। চুলোচুলি করে বসে আছে। অনেক অঙ্ক কষে প্রবীরবাবু মুগুরকে স্বস্থ করে আমাব পাশে উঠে বসলেন। বেশ ভালই জায়গা নিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

মাতুল সামনের আসনেই বসে আছেন। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে, সাবধানে চশমার কাচ মুছতে মুছতে চালককে বললেন, হিসেব রেখ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনশো কুড়ি হল।

তাহলে দু'মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

আমার সংসার কি করে চলবে স্যাব ?

যে ভাবে গাড়ি চলছে, সেই ভাবেই চলবে। তুমি একের পর এক অ্যাকসিডেন্ট করে যাবে, আর আমি টাকা গুনে যাব ?

আপনি যে হঠাৎ হঠাৎ ডাইনে, বামে, পেছনে যেতে বলেন ?

কাল তুমি রিকশাওয়ালাকে মারলে কেন ?

আপনি এত সুন্দর সুব ভাঁজছিলেন, আমার খেয়ালই ছিল না যে আমি এক গরিব ড্রাইভার। মনে হচ্ছিল হায়দ্রাবাদের নিজাম।

মনে ত হবেই। কি সুর জান ?

আজ্ঞে না, তবে ভারি সুন্দর।

আহীর ভৈঁরো। প্রবীর,আহীর ভৈঁরোর ওপর কথা বসা ত। সুরের চলনটা এই রকম হবে, হুঁ হুঁ, হুঁহুঁ, না না, তুম, হুঁ, হুঁউঁ।

প্রবীববাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, দাঁড়া, দাঁডা, বড় ব্যথার সুর, বেদনার বাণী বসাতে হবে। ধরেছিস ঠিক। প্রেমিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শীতের ভোর। ফিনফিনে আঁচলের মত কোয়াশার কেশর উড়ছে। তেরছা হয়ে নেমে আসছে প্রথম সূর্যের কিরণ। ওদিকে বাঁধের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলেছে। প্রেমিক গাইছে আর কাশছে।

আবার কাশি ঢোকাচ্ছিস কেন ?

আহা অসুস্থ যে। এই রোককে, রোককে।

চালক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্রেক কষল। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থামতেই বললে, এই জন্যেই অ্যাকসিডেন্ট

হয়। মাতুল গ্রাহ্যই করলেন না। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা বোস্‌, আমার এক ছাত্রীকে তুলে আনি।

সামনেই সাবেক কালের এক বাড়ি। বেশ বড়। গাড়ি বারান্দা, থাম, লতানে গাছ, জানলায় লাল, নীল কাচ। সব মিলিয়ে বেশ একটা বনেদী চেহারা।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, প্রবীরবাবুর পকেট থেকে একটা নোট খাতা বেরিয়েছে। পাতা ওলটাচ্ছেন আর আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

আমার মামা।

দেখেই বুঝেছি। মুখটা একেবারে কেটে বসান। মামার গুণ কিছু কিছু পেয়েছ?

কি করে বলব?

গান জান?

ইচ্ছে করে।

ওইতেই হবে। দেখ ত এই গানটা। আচ্ছা এক দায়িত্ব দিয়ে গেল!

খাতাটা আমার হাতে দিলেন। তিন ছত্রের একটি গান,

এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই
ব্যাকুল বাতাস হৃদয়ে আমার
মরিয়া মরিয়া কাঁদে।

প্রবীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে তোমার আস্থায়ীটা?

দারুণ।

সুরটা শুনবে?

হুঁ হুঁ করে দু'বার সুর ভেজে প্রথম দুটো লাইন গেয়ে ফেললেন। ভীষণ আতঙ্কে ছিলুম। গলা দিয়ে কি বেরোয়, কে জানে। না, খুব একটা খারাপ কিছু বেরোল না। ভালই বলা চলে। গাড়ির চালকও বললে, বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে।

প্রশংসায় প্রবীরবাবু কাতর হয়ে পড়লেন, আমার গলায় ভাই একটা সপ্তকই খেলে। তোমার মামার মত তিন সপ্তকে গলা খেলে না। চড়ায় উঠলেই ক্র্যাক করে। অন্তরাটা গাইব দেখবে?

করুন না।

প্রবীরবাবু প্রথম লাইন দুটো আর এক পক্কড় গেয়ে তার-সপ্তকে ঠেলে উঠলেন,

তুমি যাবে চলে রজনী পোহালে
ঝরাপাতা ঝরে উতলা বাতাসে।

সাংঘাতিক শব্দ। মনে হল কে যেন গলা টিপে ধরেছে আর প্রাণবায়ু ঝারির জলের মত বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। প্রবীরবাবু নিজেকে সংযত করে নিলেন। সময়টা সকাল। রাস্তায় লোক চলাচল করছে। করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি বুঝলে? খুব খারাপ? আমি জানি চড়ার দিকে গলাটা আমার সেই রকম হয়ে যায়। না বাবা, বলব না। ভাগ্য একটু খুলব খুলব করছে। নাম করলেই সব কেঁচে যাবে।

বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।

পারবেই ত, পারবেই ত। কার ভাগনে দেখতে হবে ত! স্কুলের ফার্স্ট বয়, কলেজের সেরা ছাত্র, গানে ভারত বিখ্যাত। নুন জলের গার্গল করে করে ঘামাচির ধাত হয়ে গেল, গরমকালে কি কষ্টই পাই, নুনের পাহাড় শেষ করে ফেললুম, গলার কিছুই উন্নতি হল না।

গার্গল করলে ঘামাচি হয়?

আরে আমার কথা আর বলো কেন। নুন জল মুখে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে যেই ঘড়ড় করতে যাই, বাস, ঢকাস করে আদ্দেক চলে গেল পেটে, আদ্দেক বেরিয়ে এল নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে। যার খারাপ হয়, তার সবই খারাপ। গলার দুপাশে প্রহরীর মত দুটো টনসিল থাকা উচিত, আমার মনে

হয় সে মাল দুটো নেই। আলজিভটাও আছে কিনা কে জানে? হাঁ করেছ কি সুয়েজ ক্যানেল খুলে গেল। অত নুন শরীরে সয়! চামড়া যেন ডায়মণ্ডহারবারের নোনা মাটি। গ্রীষ্মের ফসল চাবড়া চাবড়া ঘামাচি।

আপনি আর একটা টোটকা করে দেখতে পারেন।

কি বল তো? কি বলো তো?

গোটা দুযেক গোলমরিচ দিয়ে এক চামচে গাওয়া ঘি। গলাটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

আর ভাগনে সে উপায় কি রেখেছি! লিভারের বারোটা বেজে গেছে। মুখ দিয়ে ঢুকবে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে...না বাবা বলব না, তুমি আমাকে অসভ্য ভাববে।

আপনি কি বলতে চান বুঝে গেছি।

বুঝতেই হবে। কার ভাগনে দেখতে হবে ত?

ওরও একটা দাওয়াই আছে।

শুনি, শুনি।

আগে একটা পিপুল খেয়ে নেবেন, তাহলে ঘি-মরিচ সহজেই সহ্য হবে।

পিপুল? সে আবার কি বস্তু। লোকের পিপুল পাকে শুনেছি।

ওটা অসভ্য পিপুল। আমি বলছি সভ্য পিপুলের কথা। গাছে হয়। কবিরাজরা ব্যবহার করেন।

মনে থাকবে না ভাগনে, দাঁড়াও লিখে নি।

নোট খাতায় লিখতে লাগলেন। ওদিকে মাতুল আসছেন। সঙ্গে উনি কে রে বাবা! রোদের কি চমক। ওঁর সাজসজ্জার রঙের চমকে, প্রকৃতিরও পা পিছলে যাচ্ছে। সঙ্গে আবার এক বৃদ্ধ। তাঁর সব সাদা, যেন শরতের মেঘ। মাথার দিকটা রুপোলি। সামনে সিঁথি। হাফ পাঞ্জাবি, হাতায় গিলে। দিশি ধুতি, একটু উঁচু করে পরা, পায়ে বার্নিস করা চটি, হাতে আবার একটি ছড়ি, চোখে রিমলেস চশমা। পুরো নম্বর দেবার মত মিহিবাবু। মহিলার দিকে তাকান যাচ্ছে না, মেজাজ খারাপ করে দেবার মত ধবনধারণ। শাস্ত্রীয় সংগীতের মত, শাস্ত্রীয় পরীক্ষা। দেখবে তবু টলবে না, হেলবে তবু টসকাবে না। হরি ওম তৎসৎ। বাগিচার বুলবুলি। গণ্ডদ্বয় এত গোলাপী হল কি করে? ওষ্ঠদ্বয় এমন করমচার মত লাল হল কি করে। চক্ষুদ্বয় কোণ ছেড়ে কর্ণ অবধি বিস্তৃত হল কোন্ মায়াবলে! ঘোর বেগুনী বর্ণের ফিনফিনে শাড়ি, ব্লাউজ বেগুনী। গাত্রবর্ণ এর চেয়ে ফর্সা হলে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠাতে হত।

আমার বিস্ময় প্রবীরবাবুর কণ্ঠে শব্দরূপ পেল। তিনি বললেন, বাপ্‌স, কি সেজেছে রে ভাই।

মাতুল এগিয়ে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরে আমাদের বললেন, তোমরা একটু সরে বোসো। এঁদের বসতে দাও।

আমাদের প্রাণ আছে। আমরা না হয় সরে বসলুম। দুটো মুগুরের ত প্রাণ নেই। দুটোকে নিয়ে মহা জ্বালাতনে পড়া গেছে। নিচের দিকটা ভারি, মাথার দিকটা হালকা। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। একটু এদিক ওদিক হলেই, সখি গো! বলে টাল খেয়ে উলটে পড়ছে। তেমনি ভারি। কোনক্রমে কোলে তুলে নিয়ে সরে বসতে গেলুম। একটা ডান পাশে হেলে ছোট্ট একটু হাত ছুঁড়ল। তাইতেই প্রবীরবাবু কাত। সেই বাল্যে, ছাত্রজীবনে গাঁট্টা খেয়েছিলেন, আজ এইমাত্র আর একবার খেলেন। স্মৃতি, তুমি বেদনা। পাপের বেতন পেলেন। মাতুলের চড়া পর্দায় বাঁধা রূপসী ছাত্রীকে দেখে মনে মনে বড় ছটফট করছিলেন। রগে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তখন থেকে এই বেয়াড়া জিনিস দুটোকে নিয়ে কি যে তুমি করতে চাইছ। দাও, দাও, একটা আমাকে দাও।

একটাকে তাঁর কোলে তুলে দিলুম। যমজ নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলুম। নিন, মোহ-মুদগর কোলে নিয়ে অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করুন।

রূপসী আমার পাশে ঘট স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ধনুক ভাঙা ভুরুতে আড়ে আড়ে দেখতে লাগলেন। মাতুল বললেন, আমার ভাগনে, তুমি আরাম করে বসতে পার। ওর পাশে আমার বন্ধু প্রবীরকুমার, গীতিকার, নাট্যকার, চিত্রকার।

সাহস পেয়ে তিনি এত আরামে বসলেন, পুচুত্ করে ক্ষীণ একটি আর্তনাদ কানে এল। বাঁপাশে জামার পকেটটা গেল। সিকি, আধুলির ভারে অভ্যস্ত পকেট, এমত রূপসীর দেহভারের ভগ্নাংশ বহনের ক্ষমতা রাখবে কি করে। দু বছরের পুরনো জামা। জায়গায় জায়গায় পিজে এসেছে।

রূপসীও একটু আর্তনাদ করে উঠলেন। আমার জন্যে নয়। আসনের স্প্রিং খোঁচা মেরেছে। সাবধান করার সুযোগ পেলুম কই। সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ দেহভার ছেড়ে দিলেন। গাছ থেকে তাল পড়ে, গাইয়ে তালে ঝাঁপিয়ে পড়েন, জামার আধখানা নিয়ে রূপসী পড়েন বরাতে। দিন কয়েক আগে কনক ঘাড়ে পড়েছিল। কনকের কথা আর চিন্তায় আনব না। সেই মহীয়সী ভাল বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে চলেছেন। অক্ষয়বাবু ঠিকই বলেছিলেন, হরিদা ; এর রাশিফল বলছে, সারা জীবন শুধু চোট খেয়ে যাবে, এমন কি ঘোড়াতেও চাঁট মারতে পারে।

সে কি হে, ঘোড়া আসবে কোথা থেকে ! অশ্বযুগ শেষ হয়ে, অশ্বশক্তির যুগ এসেছে।

বরাত হরিদা, বরাত। কোথা থেকে এসে, কাকে যে চাঁট মেরে যায়।

বৃদ্ধকে গাড়িতে তোলার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাদু আসুন, দাদু উঠুন, দাদু উঠুন। প্রথমে ভেতরে এল ছড়ি। আর একটু হলেই চোখটা যেত। মুগুর কোলে বসে আছি বলে রক্ষে পেয়ে গেল। তারপর ঢুকল বার্নিস করা চটি সমেত একটা পা। নাতনী হাঁ হাঁ করে উঠল, আমার শাড়িটা গেল, শাড়িটা গেল।

হ্যাঁ, তোর অমনি শাড়িটা গেল। এইটুকু গাড়িতে এত বড় শরীরটা ঢোকে ! কাস্টাম বিল্ট রোলস রয়েসে চেপে যৌবন কাটালুম, তোদের কালে এসে, এই বুড়ো বয়েসে ক্যানেস্তারা চাপতে হচ্ছে।

চুপ করে বোসো তো।

নাতনীর ধমক খেয়ে দাদু কাছা, কোঁচা, ছড়ি সামলে বসলেন। কানের পাতায় খাড়া খাড়া, লম্বা লম্বা চুল। কানে চুল থাকলে মানুষ পয়মন্ত হয়। পয়মন্ত না হলে রোলস রয়েস চাপতেন ! গাড়ি চলতে শুরু করল। মাতুল সোনার ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, চিত্রা, তুমি সাজতে গুজতে অনেক সময় নিয়েছ। দেরি হয়ে গেল।

নাতনীর দাদু বললেন, কেন যে এত রঙ মাখিস ! তোর নিজের রূপ নকলে চাপা পড়ে যায়। তোর মত মেমের বাচ্চা...

আঃ চুপ কর তো।

রূপসী কটাক্ষ হানলেন। আমার কোলের মুগুরে আর প্রবীরবাবুর মুগুরে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। চকমকি হলে আগুন ছুটত। কার গর্ভে যেন মুষল জন্মেছিল। সেই মুষলে কৃষ্ণ মরেছিলেন। পাশাপাশি আমাদের দু'জনের গর্ভে প্রমাণ মাপের দুটি মুগুর এসেছে যেন। সদ্যোজাত শাবকের মত জাপটে বসে আছি। প্রবীরবাবু ফিস ফিস করে বললেন, মায়ের কথা স্মরণ করো।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে নির্দেশটা ঠিক মত বুঝতে পারলুম কি না সন্দেহ হওয়ায় প্রশ্ন করলুম, কি বললেন ?

ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, কিছু না।

একই কথা দু'বার বলতে হলে অনেকেই ভীষণ রেগে যান। আমিও যাই। আমারই ভুল হয়েছে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা। ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। পাশেই মাতুলের ছাত্রী। স্বাস্থ্যবতী। পরনে আবার পিচ্ছিল সিল্কের শাড়ি। তার ওপর ছটফটে। মাঝপুকুরের মাছের মত মাঝে মাঝে ঘাই মারছেন। আমি ভাবছি বলে না বসেন, তোমার হাঁটু আমার হাঁটুতে ঠেকছে। তোমার ওপর বাহু আমার ওপর বাহুতে ঘষে যাচ্ছে।

মহিলা হঠাৎ আমার হাত মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, আমার ভীষণ ভয় করছে।

কিসের ভয়। এদিকে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। মহিলায় ধরলে ভূতে ধরার মতই অবস্থা হয়। মাঝরাতে ঘরে চোর ঢুকলে গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। গেরস্থ ক্ষীণ কণ্ঠে চোও, চোও করতে থাকেন।

আমি কোনওক্রমে প্রশ্ন করলুম, ভয় করছে কেন ?

মহিলা ডাইনে বাঁযে শরীর মুচড়ে বললেন, কি জানি বাবা ! কি হয় ! ভয়ে আমার বুক দুর দুর করছে।

ভীষণ সাহসে জিজ্ঞেস করলুম, কিসের ভয় ?

অত হ্যাণ্ডস-ফ্যাণ্ডস নিয়ে কোনওদিন ত গান রেকর্ড করিনি। তাছাড়া গুরুজীর গান গাওয়া খুব শক্ত। একটু এদিক ওদিক হলেই সুর ফসকে যায়, তাল হড়কে যায়। আর তখন উনি যে দৃষ্টিতে তাকান ! বাবা। না, বাবা, আমি পারব না।

গরম জলে হাত লেগে গেলে মানুষ যে ভাবে হাত ঝাড়ে, তিনি সেই ভাবে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চোখে চাপা দিলেন। তারপর দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। মরেছে ! মাথার গোলমাল নেই ত !

চোখ থেকে হাত সরিয়ে ফিক করে হাসলেন। হেসে বললেন, তোমাদের কোলে ও দুটো কি যন্ত্র ? একেই কি বলে গুপী যন্ত্র ?

মাতুল সামনের আসন থেকে বললেন, না রে বাবা, ও দুটো হল মুগুর। আমাদের শুটিং-এ লাগবে। যারা সিনেমার মাল সাপ্লাই করে, তারা এক গাদা টাকা ভাড়া চাইত, তাই আমার ভাগনের বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি। কিছু টাকা বাঁচবে।

দাদু বললেন, সিনেমায় রিয়েল জিনিস চলবে ? ওখানে ত সবই নকল মাল চলে।

প্রবীরবাবু বললেন, আসলে নকলে মিলিয়ে একটা কিছু দাঁড়ায়।

দাদু খুব আর্টের ঢঙে প্রশ্ন করলেন, হু আর ইউ ?

প্রবীরবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। মাতুল বললেন, আমার বাল্যবন্ধু, আর্টিস্ট, গীতিকার। আমার ছবির কিছু কিছু গানও লিখছে।

প্রবীরবাবুর উৎসাহ ফিরে এল। আমি অলরেডি তোমার আহীর ভৈরোতে বাণী বসিয়ে ফেলেছি জয়।

তাই না কি ? চিত্রাকে দেখাও।

প্রবীরবাবু আমার বুক ফুঁড়ে এপাশ থেকে ওপাশে হাত বাড়িয়ে সেই নোট বইটা মহিলাকে দিলেন।

মাতুল বললেন, চিত্রা, প্রথম লাইনটা সুরে ভেড়াও ত।

প্রবীরবাবু তাকিয়ে আছেন যেন গাছ থেকে পাকা ফল পড়বে। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। চিত্রাদেবী সহসা শুরু করলেন, এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই। সাবাশ, একেবারে সাধা গলা। মিছরির দানার মত খেলছে। বরফে জমান মধুর মত মিঠে গলা। ঝাউয়ের পাতায় বয়ে যাওয়া বাতাসের মত সনসনে।

এর নাকি গান গাইতে ভয় করছিল।

মাতুল বললেন, আমি আর একটু চড়া পর্দা থেকে ধরতে চাই। চড়ায় করুণ রস জমে ভাল। মাতুল ধরলেন,

এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই
ব্যাকুল বাতাস হৃদয়ে আমার
মরিয়া মরিয়া কাঁদে।

চিত্রাদেবী আমার হাতে প্রচণ্ড একটা চিমটি কেটে, একটা চোখ ছোট করে, বললেন, আহা, এই রকম যেদিন গাইতে পারব, আমি সেইদিন হব শান্ত। বলেই, মাতুলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিলেন।

মাতুলের চোখ ছিল রাস্তার দিকে। ব্যাকুল বাতাসে মীড়ের কাজ করতে গিয়ে হই হই করে উঠলেন, বাঁয়ে, বাঁয়ে।

চালক আবার দুহাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁয়ে হেলে পড়ল। ভাগ্য ভাল কোনও দুর্ঘটনা হল না। গাড়ি গোঁত করে এক রাস্তা ছেড়ে আর এক রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চিত্রা দেবীর দাদুর মাথা ঠুকে গেল। সোজা

হয়ে বসতে বসতে বললেন, রোলসে এই ঝাঁকুনিটা একদম লাগে না। এমন কায়দায় তৈরি, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছি।

রোককে।

গাড়ি থামাতে হলে বাঙালীরা হিন্দি বলবেনই। বাঙলায় গাড়ি থামিয়ে তেমন সুখ হয় না। হিন্দির মত ব্রেক নেই। গাড়ি থেমে পড়ল। মাতুল নামতে নামতে বললেন, আপনারা একটু বসুন। আরও কয়েকজন হ্যাণ্ডস উঠবে। অন্ধকার-অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন।

মাতুল চলে যেতেই প্রবীরবাবু বললেন, তুমি আমার জায়গাটায় একটু সরে বসবে। আমি তাহলে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে বাণীটানীগুলো একটু ঠিকঠাক করে নিতে পারি।

উত্তর দিলেন দাদু, ন্যাআ্যা। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। নাতনী আমার বড় হয়েছে। লাইনটা তেমন ভাল নয়। চোখে চোখে রাখার হুকুম নিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

চিত্রাদেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, তোমরা সব পাগল। তুমি পাগল, মা পাগল, বাবা পাগল। তুইই আমাদের পাগল করে ছেড়েছিস। জানিস না, শিল্পীদের একটু লুজ ক্যারেক্টার হয়।

প্রবীরবাবু করুণ মুখে, উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল, মশা মারতে গালে চড়। মাতুল আসছেন। সঙ্গে কুঁজো মত এক ভদ্রলোক। চলার ধরনটা বকের মত। প্রতি পদক্ষেপে মাথাটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বাতাসে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসছে। ছন্দটা অনেকটা এই রকম, কত ধানে কত চাল, কত ধানে কত চাল। সাজ পোশাক দেখলেই মনে হয় মুসলমান। মাথায় লেস তোলা সাদা টুপি, চোগা, গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতেও লেসের কাজ। পায়ে নাগরা জুতো। সঙ্গে আসছে একজন কিশোর। তার হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র। মনে হয় সারেঙ্গি।

মাতুল আর কজনকে তুলবেন! এটা ত রবারের গাড়ি নয়, যে চারপাশ ফুলে উঠে সকলকে জায়গা করে দেবে! মানদার মুখে পান জর্দার খিলির মত। যখনই দেখ ডান গালটা ফুলে আছে।

মাতুল গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নিলেন। কি ভাবে বসাবেন ভাবছেন। ঠিক হল, ছেলেটি চলে আসবে পেছনে। পেছনে এখনও একটু জায়গা আছে। ওস্তাদজী বসবেন সামনে। তাই হল। চিত্রাদেবী আমার দিকে আরও কিছুটা সরে এলেন। আমি প্রবীরবাবুকে দরজার দিকে আরও কিছুটা চেপে দিলুম। দাদু বললেন, তোমাদের কোলের ওই দুটোকে গাড়ির পেছনে রেখে দাও না। আরাম করে বসতে পারবে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মাতুল বললেন, পেছনে, ন স্থানং তিল ধারণং। যেমন আছে, বেশ আছে, আর ত মাত্র একজন উঠবে।

দাদু বললেন, আঁ বলো কি। এখনও আর একজন উঠবে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের গাড়ির মত অবস্থা হয়ে যাবে যে রে বাবা।

তা একটু হবে। কি আর করা যাবে বলুন।

ওস্তাদজী জানালার ধারে বসেছেন। সাজ পোশাকে যত বাহার, চেহারায় তত বাহার নেই। দারুশিল্পের মত আকৃতি। পকেট থেকে একটা রুপোর কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাচ্ছেন, আর বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুতুস ফুতুস করে জানালার বাইরে ভুক্তাবশেষ ছুঁড়ছেন।

যতবারই তিনি ফুতুস করেন ততবারই আমাদের দাদু আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলে, ডাঁয়ে হেলে পড়ে বলেন, মুশকিল করলে রে বাপু।

সামনে ফুতুস, পেছনে মুশকিল করলে রে বাপু। পর্যায়ক্রমে এই চলতে লাগল আর গাড়ি এগোতে লাগল টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার দিকে।

চিত্রাদেবী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাপ্‌স।

কি বাপ্‌স?

ছেলেটা মাথায় হেকিমী তেল মেখেছে। কি বিশ্রী গন্ধ।

আমার চোখের সামনে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের কপালে চাঁদ। চাঁদের নাকে হাকিমী

তেলের গন্ধ। আমাব নাকে গুলবাগিচার খুশবু।

চিত্রাদেবী ভেলভেটের হাতব্যাগ থেকে একটা রুপোর আয়না বের করে মুখ দেখতে লাগলেন। গরম, ধুলো উড়ছে। পাশাপাশি, ঠাসাঠাসি বসা। গালের গুলাল গলে গলে পড়ছে। মহিলারা সুন্দরী হলে বড় জ্বালা। সামাল, সামাল রব ওঠে। তরী করে টলমল পাশরাতে ওঠে জল। মাতুল হই হই করে উঠলেন, ডাঁয়ে, ডাঁয়ে।

তিন বাতসে লটপাট হেয় :
দামড়ি, চাম্ড়ি, পেট

মাতুলের গাড়ির অবস্থা গ্রামের ট্যাক্সির মত। এমন ঠাসা ঠেসেছেন সেই জজ সাহেবেও হেরে যাবেন। গ্রামের ট্যাক্সি ড্রাইভাবকে চৌকিদার ধরে এনেছে কোর্টে। গাড়িতে বাইশ জন লোক পুরেছিল হুজুর। ড্রাইভার অমায়িক হেসে বলেছিল, ওই তো আমাব ধধ্ধড়ে গাড়ি কোর্টেব বটতলায় পড়ে আছে, আপনি হুজুর বাইশ জন লোক পুরে দেখিয়ে দিন, কেমন করে তা সম্ভব!

টালিগঞ্জের স্টুডিওতে গাড়ি ঢুকল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। চিত্রাদেবীব চাপে নিম্নাঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পা দুটো ঝিনঝিন কবছে। নাবী-শরীর কোমল হলেও তাব একটা চাপ আছে। ভার আছে। অবশ্যই মধুব এবং সুখকর। এত দীর্ঘ সময় সুন্দরী কোনও মহিলার গাত্রলগ্ন হযে বসে থাকার অভিজ্ঞতা, এই আমার প্রথম। মন বিড বিড করে তখন থেকেই বলছে, সাহস করে বাডির বাইবে বেরোতে পেরেছিস, তাই না তোর এই অভিজ্ঞতা। আর্টেব জগতে কত রোমান্স আছে দেখেছিস? গার্ডল অফ ভেনাসেব খেলা।

একে একে আমরা খালাস পেলুম। চিত্রাদেবী নেমেই টলবল, বলবল হয়ে গেলেন। পায়ে ঝিনঝিনি ধরেছে। দাদু বলতে থাকলেন, অমন করে নাচিসনি, আমার ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়া। বেশি নাচানাচি কবলে গলাব মুড়কি খারাপ হয়ে যাবে।

মুড়কি আবাব কি বস্তু, কে জানে বাবা! ফুটকড়াই মুড়কি দোলের দিন খাওয়া হয। গলাব আবার মুড়কি কি! গানের লাইনে কত কি যে আছে! আমি আব প্রবীরবাবু মহাভারতেব চবিত্রেব মত মুগুর হাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

বিশাল চেহাবাব এক ভদ্রলোক, জয়দা, জযদা বলতে বলতে এগিযে এলেন। পাঞ্জাবিব খোলা বুকে বিশাল এক পদক ঝুলছে। ইনি যদি অভিনয়েব জগতেব কেউ হন, তা হলে এঁর একমাত্র উপযুক্ত ভূমিকা হওয়া উচিত আবগারি দাবোগার।

জয়দা, জয়দা করছেন বটে, চোখ দুটো খেলছে চিত্রাদেবীর শরীবে। মানুষের এই একটা বড় বদ অভ্যাস, মহিলারা যেন ময়রার দোকানের লাল ল্যাংচা। খাবো খাবো দৃষ্টিতে ওভাবে তাকানটা কি ঠিক হচ্ছে! লোকে যে লোভী বলবে! দৃষ্টিব ছ্যাঁকায় মহিলাদেব অস্বস্তি হয় না!

প্রবীরবাবুও চোবা চাহুনি মারছেন, তবে বেশ কায়দা করে রেখে ঢেকে। চারপাশে সবুজ গাছপালা, রোদ ঝলমল কবছে, কড়া ছায়া লুটোপুটি করছে, তাব মাঝে বেগুনী পোশাকে সুন্দরী এক মহিলা, পাশেই রূপোলী চুলেব এক বৃদ্ধ, যৌবনের ব্যঙ্গ, পাঞ্জাবি পরা দারুশিল্প, সারেঙ্গি বাদক। একটা দার্শনিক দল।

লোলুপ দৈত্যকে কেন জানি না আমার কেবলই বলতে ইচ্ছে করছিল, মা যেমন শিশুকে বলে, ওই দেখ্ পাখি! শিশু পাখি উচ্চারণ করতে পারে না, বলে পাপী। আদো আদো বুলি, এত্তা পাপী।

ভাবতে ভাবতে মুখ ফসকে ওই শব্দটিই বেরিয়ে পড়ল, এত্তা পাপী।

প্রবীরবাবু বললেন, কি বলছ? কিছু বললে?

একটা পাখি।

হ্যাঁ, এখানে অনেক পাখি। গাছপালা বেশি ত! গাছ থাকলেই বেশি পাখি আসবে।

দৈত্য চিত্রাদেবীর সামনে গিয়ে সালাম আলেকুমের ভঙ্গিতে বললেন, চলুন ম্যাডাম। আমাদের অফিসে চলুন।

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হু আর ইউ। অফিসে যাবে কেন?

দৈত্য একটু ঘাবড়ে গেলেন। বেশ হয়েছে ব্যাটা! মহিলা দেখলেই হল! যেন নাকের চুল! সুরসুর করলেই ফাঁচাত হাঁচি।

মাতুল খুব কড়া সুরে বললেন, দামু, তোমার কাজ কি?

কেন দাদা! ম্যানেজমেন্ট আর প্রোকিউরমেন্ট।

গাড়ির পেছনে যেসব মালপত্তর আছে, সাবধানে নামিয়ে নিয়ে যাও। তোমার অন্য আর কোনও কাজ নেই। ওদের হাত থেকে মুগুর দুটো নিয়ে যাও।

কোথায় সুন্দরী, আর কোথায় দুটো কেঠো মুগুর! আমাদের হাতের মুগুর দৈত্যের হাতে যেন ছাত পেটার দুটো কাঠ। সটাক, সটাক করে দুবার ভেজে নিয়ে বললেন, কোনও ওয়েট নেই। মুগুর দুটো পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে জিভের তলায় দুটো আঙুল পুরে, সিক করে একটা সিটি বাজালেন।

বোঝাই গেছে, পুরনো কলকাতার পায়রা ওড়ান বাবুদের শেষ বংশধর। মাতুলের স্কন্ধে ভর করেছেন। মাতামহ যদি একবার জানতে পারেন, পুত্র সিনেমা করতে এসে এই সঙ্গে মিশছেন, তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা। আর মাতুলানী যদি জানতে পারেন, ডানাকাটা পরীরা গুরুজী, গুরুজী বলে, চারপাশে লাট খেয়ে বেড়াচ্ছেন, রেগে হাফবয়েল হয়ে বসে থাকবেন।

সিটি শুনে, দূরের একটা ঘর থেকে খাঁকি হাফ প্যান্ট আর সাদা জামা পরা লোক, যাই ওস্তাদ বলে দৌড়ে আসতে থাকলেন। পা দুটো ধনুকের মত। বড় বড় লোম। কামিয়ে কম্বল করা চলে। মাতুল সিনেমা করছেন, না সার্কাস করছেন? মাতুলই জানেন।

দৈত্য দামুবাবু হাত, চোখ, মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, ওস্তাদ এ দুটোকে লিয়ে যাও। তুরন্ত লে যাও, তুরন্ত লৌটকে আ যাও সাগরেদ।

ওস্তাদের ওস্তাদ মুগুর দুটো দু কাঁধে ফেলে শিম্প্যাঞ্জির মত এগিয়ে চললেন। প্রবীরবাবু চাপা গলায় বললেন, দেখেছ?

কি বলুন ত?

ওই যে পুকুর পাড়ে, শান বাঁধান ঘাটে কারা বসে আছেন?

গেরুয়া রঙের কাপড় আর পাঞ্জাবি পরে সুঠাম চেহারার দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। সুন্দরী এক মহিলা এলোচুলে হাত পা নেড়ে কি যেন বলছেন। গাজন ত হয়ে গেছে, বাবা তারকনাথের এই সব সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে এলেন, কে জানে? প্রবীরবাবু হয় ত জানেন।

ওঁরা কি সন্ন্যাসী?

তোমার মাথা।

তা হলে?

ওঁরা হলেন এক নম্বর ফিলম্ স্টার। দেখে চক্ষু সার্থক কর। ডানদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী, পাশে পাহাড়ী সান্যাল। হাঁটুর ওপর একটা পা তুলে কেমন বসে আছেন দেখেছ?

আর ওই এলোকেশী?

আরে বাপরে, ওঁকে চেন না? কি চেন হে ছোকরা! উনি হলেন তোমার গিয়ে, তোমার গিয়ে, আহা, নামটা মনে আসছে না, পরে বলছি। তুমি দেখে রাখ, ও হ্যাঁ সুনন্দা দেবী।

ওঁরা সব গেরুয়া পরেছেন কেন?

মনে হয় আনন্দমঠ হচ্ছে।

দামুবাবু গাড়ির পেছন থেকে মালপত্র বের করছিলেন, শুনতে পেয়েছেন আমাদের কথা। বললেন,

আরে না মশাই, সিনেমায় গেরুয়া সাদা হয়ে যায়। এ লাইনে গেরুয়া বলে কিছু নেই, অল হোয়াইট। ক্যামেরার ব্যাপার মশাই। ওস্তাদ!

হাঁক মারলেন। পাহাড়ী সান্যাল চমকে উঠলেন।

দামুবাবু লক্ষ্য করে বললেন, পাহাড়ীদা, একটু জোরে হয়ে গেছে দাদা, মার্জনা করবেন।

পাহাড়ীদা গ্রাহ্যই করলেন না। আর একটা গাড়ি ঢুকল। দুচারজন হইহই করে এগিয়ে গেলেন। লম্বা চওড়া, ভীষণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ সামনের আসন থেকে নেমে এলেন। দু-চারজন কাটা কলাগাছের মত তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন। প্রবীরদা চাপা গলায় বললেন, দেখে রাখ, ইনি হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট, ছবি বিশ্বাস। দেখেছ এঁর অভিনয়?

মনে পড়ছে না।

আঃ তোমার জীবনটাই অসম্পূর্ণ। ছায়াছবির কিছুই জান না।

পুকুরপাড়ে আর একজন অভিনেত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন। সাজগোজ দেখলে মনে হবে এই মাত্র বাসর ছেড়ে উঠে এসেছেন। কি সব চেহারা! প্রবীরবাবু চাপা গলায় বললেন, কি দেখছ? অনুভা দেবী অভিনয় দেখলে তিন রাত্তির ঘুমোতে পারবে না।

মাতুল এতক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন, সেইখান থেকেই হেঁকে বললেন তোমরা চলে এস।

নীল জামা পরা এক ভদ্রলোককে মাতুল বেশ বাগ বাগ গলায় বলছেন, যতক্ষণ না আমি স্লিপে সই করে দিচ্ছি ততক্ষণ কাউকে এক কাপ চাও দেবেন না। ক্যান ইও ইম্যাজিন, একজন সারাদিনে চল্লিশটা হাফবয়েল ডিম খেয়েছে!

আজ্ঞে, হাফবয়েল নয়, অমলেট।

ওই হল।

আজ্ঞে বৃহৎযজ্ঞে ওরকম তো হবেই। ফিলম লাইনে আপনি নতুন, তাই অবাক হচ্ছেন, এ লাইনে সব কিছু ওড়ে, পাখির মত ওড়ে, টাকা ওড়ে, যৌবন ওড়ে, ডিম ওড়ে, চপ ওড়ে, লাল জল ওড়ে। এর নাম স্যার ছায়াবাজি, ভোজবাজি। কত কন্ট্রোল করবেন! এ কি র‍্যাশানের চাল!

আমার টাকা ত ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সবাই খেয়ে যাবে ভোগা দিয়ে।

আজ্ঞে তা নয়, তবে দুশো এক টাকা আপনি এখন আমাকে দেবেন, কালকের পাওনা।

মাতুল হাঁকলেন, দামু।

ইয়েস গুরুজী।

টাকা উড়ছে।

সে ত কথাতেই আছে, কলকাতায় টাকা ওড়ে, ধরতে পারলেই হয়। মাড়োয়ারীরা ধরছে তাহলে ধরে এনে, ক্যান্টিন ম্যানেজারকে দাও। দুশো একটাকা।

দামুবাবু একগাল হেসে বললেন, আপনি ওড়ান, আমি ধরি।

পকেট থেকে গোটা কতক একশো টাকার নোট বের করে দামুবাবুর হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন কাজের নামে অষ্টরম্ভা, রোজ দুশো টাকার খানা উড়ছে। চলে এসো।

শেষ নির্দেশ আমাদের জন্যে। আমরা গুটিগুটি এগিয়ে চললুম। প্যান্ট শার্ট পরা খড়খড়ে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়লেন। তীক্ষ্ণ নজরে চিত্রাদেবীকে দেখলেন ভদ্রলোকের গলায় সুতোয় বাঁধা কি একটা গোল মত ঝুলছে। রেফারির গলার বাঁশির মত। হঠাৎ থেমে পড়ে মাতুলকে ডাকলেন, জয়।

মাতুল ফিরে তাকালেন। মনে হয় এ জগতের বেশ সম্মানিত মানুষ। তা না হলে এত সম্ভ্রমে মাতুল উত্তর দিতেন না, বলুন, রাখালদা।

তোমার আর্টিস্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাইড রোল, না হিরোইন।

আজ্ঞে না, মিউজিক্যাল।

ভেরি ফোটোজেনিক ফেস। আমি একটা চান্স দিতে পারি। একেবারে লিডিং রোলে। আমি হিরোইন খুঁজছি।

আপনি ত ফ্লোরে নেমে গেছেন। কাস্টিং ত ঠিক হয়ে গেছে।

না, আমার নেকস্ট বইটার জন্যে। আগুনের ফুলকি। বাজারে আমি নতুন একটা জুটি ছাড়তে চাই। স্ক্রিপ্টটা বড় ভাল হে।

মিউজিক কে করছে ?

ঠিক করিনি। তুমি করবে ?

প্রবীরবাবু দুম করে বললেন, গান আমি লিখব।

রাখালবাবু বললেন, কেন ?

প্রবীরবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, জয়ের বইয়ে আমি লিখছি ত !

আগুনের ফুলকি রোমান্টিক বই, বিরহের গান আপনি লিখতে পারবেন ?

খুব পারব, আমি নিজে একজন ব্যর্থ প্রেমিক। আমার হিস্ট্রি জয় জানে।

হিস্ট্রি, জিওগ্রাফির প্রয়োজন নেই। পরে দেখা করবেন।

রাখালবাবু সরাসরি চিত্রাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, অভিনয় করবেন ?

চিত্রাদেবী ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, পারবো ? না, বাবা, লজ্জা করে।

দাদু বললেন, অভিনয় করবে ? কি বলছেন আপনি ? ভদ্রঘরের মেয়ে অভিনয় করবে কি ? নায়করা মদ খেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে, আপনি লাইনের মেয়ে খোঁজ করুন।

আপনি বুঝি খুব কনজারভেটিভ ! ফিলম লাইনে কত ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে এসেছে জানেন ?

জেনে কাজ নেই, জেনে কাজ নেই। দাদু সুর করে টেনে টেনে বললেন। আমাদের ভোলার মেয়ে আজ পাঁচ বছর হল নিরুদ্দেশ। নায়িকা হবে বলে গয়নাগাটি নিয়ে বোম্বে পালিয়েছিল। ব্যাস, একেবারে বেপাত্তা। ভোলার বউ রোজ রাতে মেয়েকে স্বপ্নে দেখে, কেঁদে কেঁদে বলছে, মা, মাগো, ওরা আমাকে সেলুলয়েডে ধরে রেখেছে, এই দেখ আমার ছায়া পড়ছে, কায়া নেই।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। চিত্রাদেবীর কান ঘেঁষে, কাঁধ বেয়ে এক ঝলক পক্ষীকৃত্য নেমে গেল। তিনি ধেইধেই করে নেচে বললেন, অ্যাম্মা, যাঁঃতেঁবিকা, ভাল্লাগেনা বাবা, কি হবে !

একসঙ্গে দুজনে বললেন, যদি অনুমতি করেন।

দুজনের একজন প্রবীরবাবু, অন্যজন দামুবাবু। যদি অনুমতি করেন ?

দাদু বললেন, না, অনুমতি করবে না, আমি আছি কি করতে ! অ্যায় এদিকে মাথা নিচু কর !

রাখালবাবু বললেন, খুব শুভ লক্ষণ, তুমি অভিনয়ে এলে, অনেক দূরে যাবে। টপ, টু দি টপ। তাড়া নেই ! ভেবেচিন্তে জবাব দিও। তোমার এই এক্সপ্রেসান এত ন্যাচারাল ! দেখো, যদি বেরিয়ে আসতে পারো ! কনজারভেটিভ ফ্যামিলি এইভাবে কত ট্যালেন্ট যে নষ্ট করছে ! আই পিটি দেম, আই পিটি।

রাখালদা।

গাছের আড়াল থেকে বেশ লম্বা চওড়া এক মহিলা ডাকলেন। রাখালবাবু বললেন, যাই অনুভা। প্রবীরবাবু খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, দেখেছো, অনুভা, আরে ব্বাপ। আজ রাতে আর ঘুমোতে পারব না। অনুভা আমার এত কাছে ! ফ্যানটাসটিক !

ঘুমের ঘোরে মানুষ যে ভাবে হেঁটে যায়, চিত্রাদেবী রাখালবাবুর পথে সেইভাবে দু'কদম হেঁটে গেলেন। দাদু খপ করে হাত চেপে ধরে বললেন, অ্যায়, যাচ্ছিস কোথা ! একে একেবারে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। ওরে, তুই গান গাইতে এসেছিস, নায়িকা হতে আসিসনি।

মাতুলের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। দুপাশে দুসার গাছেব মধ্যে তিনি এগোতে লাগলেন। দলবল চলল পেছন পেছন। সারেঙ্গী মিঞা বাতাসে মাথা কুটে কুটে চলেছেন, কি হয়, কি হয় ! চিত্রাদেবী এখন মাতুলের পাশাপাশি হাঁটছেন। প্রবীরবাবু আমার কাঁধে হাত বেখে হাঁটছেন। ধীবে ধীরে আমাদেব দুজনের বেশ একটা বন্ধুত্বেব সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠছে। মানুষটি বেশ সহজ সরল। আমাব কানে কানে আবার ফিসফিস কবে বললেন, নায়িকা কি ভাবে তৈরি হয় জান ?

আজ্ঞে না।

আমাকে অত আজ্ঞে, আজ্ঞে করো না। ও তোমার না জানাই ভাল।

কেন ?

সে অনেক ব্যাপাব। অনেক ঝামেলা সহ্য কবতে হয়। সেসব কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না। তাকিযে দেখ, জয় আব চিত্রাকে কেমন মানিয়েছে ! ওদেব দুজনকে নায়ক-নাযিকা কবে দিলে হয়।

হ্যাঁ।

তোমার মামা বিয়ে করেছে ?

হ্যাঁ।

কাকে ?

মামীমাকে।

উঃ, তোমাব মাথায কি গোবর ভবা আছে ! মামাব বউ ত মামী হবেই। মামীব নাম কি ?

সীমা।

জয়া নয়, ঠিক জান ?

উনি ত সীমাই বলেন।

ইস ! কাজটা খুব খারাপ করেছে।

কেন ?

সে তুমি বুঝবে না। আমার খুব খাবাপ লাগছে। কেমন যেন কান্না কান্না পাচ্ছে।

কেন ?

সে তুমি বুঝবে না। একজনের জন্যে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। কি বল ত ?

এমন কিছু, যা দেখলে মানুষের কান্না পায়।

ঠিক বলেছ। আমি একটা নদী দেখতে পাচ্ছি। মনে কব ঘাটশীলাব সুবর্ণবেখা। সেই নদীব ধাবে চাঁদিনী রাতে, একটা কালো পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে আছে একটি ছেলে আব মেয়ে। সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশ। মেয়েটি ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখেছে।

ছেলেটি হঠাৎ উঠে চলে গেল। মেয়েটি এখন একা বসে আছে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে বিধবার কান্নার মত।

স্টার্ট সাউণ্ড। স্টার্ট সাউণ্ড। টেক ওয়ান।

আমরা দুজনেই চমকে উঠেছি। একটা বিশাল গাড়িব ভেতব থেকে শব্দটা ভেসে এল। একগাদা যন্ত্রপাতির সামনে কানে হেডফোন লাগিযে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মাতুল চিত্রাদেবীকে হাতপা নেড়ে কি যেন বলছেন। সব কথা শোনা যাচ্ছে না। কেবল তুমি তুমি শুনছি। দুজনেই বেশ উত্তেজিত।

প্রবীরবাবু বললেন, মনে হচ্ছে, জয় খুব রেগে গেছে। স্বাভাবিক। নায়িকা হবার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছে। তুমি এলে জয়ের সঙ্গে, চললে রাখালবাবুর সঙ্গে। কোনও মানে হয় !

আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি না গুরু শিষ্যায় কি হচ্ছে। তবে গুরুতর একটা কিছু হচ্ছে। চিত্রাদেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাতুল এগিয়ে চললেন হনহন করে। পেছনে ফিরেও তাকালেন না। আমরা চিত্রাদেবীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। জিজ্ঞেস করতে যাব, হল কি ?

হঠাৎ তিনি সামনে দুহাত বাড়িয়ে হেরে রে রে করে মাতুলের দিকে ছুটে চললেন। সেই নদেব

নিমাইয়ে দেখেছিলুম, শচীদেবী এইভাবে ছুটছিলেন, নিমাই, নিমাই করে।

প্রবীরবাবু বললেন, যাঃ শালা, সিনেমা দেখছি এইখানেই শুরু হয়ে গেল। মেয়েছেলের কারবার।

এই অবসরে আমরা খুব কাছাকাছি এসে গেছি। মাতুল বললেন, যাও না যাও, আমার কাছে কেন? নায়িকা হও গে যাও।

দাদু সঙ্গে দোহার দিয়ে চলেছেন, সমানে এক সুরে, আত্মসংযম চাই, ভেসে যাবে, ভেসে যাবে।

সারেঙ্গি মিঞা মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, শোভানাল্লা, শোভানাল্লা।

ব্যাপারটা কতদূর গড়াত কে জানে! চিত্রাদেবীকে বাঁচিয়ে দিলেন লাটু ওস্তাদ। দামুবাবু ঘোষণা করলেন, ওস্তাদ এসে গেছে উইথ ফুল টিম।

প্রকৃতই ওস্তাদের মত ওস্তাদ। কাপড় পরেছেন ঠিক লাটুবাবুর মত, মালকোঁচা মেরে, দুপাশে পেখম উড়ছে। প্রবীরবাবুর সবেতেই একটা কিছু বলা চাই; নিজের মনেই হচ্ছে, বাবা, কি ডাঁসা, ডাঁসা চেহারার নাচনেওয়ালী।

সত্যিই তাই, নাচিয়ে মেয়েদের চলার ধরনই আলাদা। ডান হাত শরীরের ডানপাশে ছেতরে আছে; নড়ছে যেন নৌকোর বইঠা বাওয়া হচ্ছে। আর কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গ এমন কায়দায় দুলছে, তওবা, তওবা! সে কি ছন্দ! যাবো কি যাবো না। লটাকে চলানা। মুকুতা ঝুলানা। এতদিনে বুঝলুম, মা দেখেছি, মাইমা দেখেছি, মাসীমা দেখেছি, দিদি দেখেছি, রমণী দেখিনি। আজ দেখলুম; রমণীয় রমনাতং। মাতামহ একদিন সন্ধ্যাকালে নারকেল গাছের তলায় উবু হয়ে বসে বলেছিলেন, পাতুরানী, যখনই দেখবে মন বড় চঞ্চল হয়েছে, রিরংসার ইচ্ছে হচ্ছে, তখনই ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করবে,

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষমাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্ধি জঘনং
মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈর্গুরুকৃতম।

ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, আর আবৃত্তি করছি। করলে কি হবে! খোস একবার চুলকে উঠলে আর রক্ষে আছে! স্থানকালের বিচার থাকে না। খ্যাসোর খ্যাসোর চুলকোতে থাকে। তিন বাতসে লটপাট হেয়, দামড়ি চামড়ি পেট। একেই আমি সহজে কেতরে পড়ি, চোখের সামনে এই ভুবে যৌবনের ব্যালায় মনের মাচা মচমচ করছে। অক্ষয় কাকাবাবু বলেছিলেন, এ ছেলে আপনার নাচিয়ে হতে পারত! মা আমি নাচিয়ে হব। কলসি গেল ছলকে ছলকে। ভোলে বোম্বা উঠল দুলে।

লাটুবাবুকে দেখে মাতুল নেচে উঠলেন। এতক্ষণ চিত্রাদেবী চারপাশ আলো করে রেখেছিলেন এখন একেবারে চাঁদের হাটবাজার। কনক কলসের কলকাকলিতে টলমল। সারেঙ্গি মিঞার ডাক পড়ল। প্রবীরবাবু বললেন, বাবা, জয় দেখছি পুরো বাঈজী পাড়াটাকে উঠিয়ে এনেছে। সামলাবে কি করে! গাদাগাদা টাকার ব্যাপার।

এদের বাঈজী বলে প্রবীর মামা?

হ্যাঁ গো! কত বড়লোকের বাড়িতে এখন ঘুঘু চরছে। জান কি?

বিশাল একটা ঘরে আমরা ঢুকে পড়লুম। মাঝখানে আলো, চারপাশে অন্ধকার। শয়ে শয়ে ইলেকট্রিক তার এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে ছুটোছুটি করছে। উটমুখো হয়ে চললেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। লাটুবাবু, মাতুল, দলবল, আলোর বৃত্তে চলে গেছেন। বেশ ভারি চেহারার এক ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে নানা কথা বলছেন। প্রবীরবাবু বললেন, মনে হচ্ছে, ইনিই জয়ের ছবির ডিরেক্টার।

একপাশে মেক আপ নিয়ে এক ভদ্রলোক, ভুল বলা হল, অভিনেতা বসে আছেন। বসে আছেন রাজার মত। প্রবীরবাবু বললেন, চিনতে পারছ?

এ দেখি ভাল পরীক্ষায় পড়া গেছে। চিনতে পারছ? চিনতে পারছ?

জহব গাঙ্গুলী। প্রবীরবাবু হাত তুলে নমস্কাব করলেন। সাংঘাতিক তারকাভক্ত মানুষ।

অন্ধকাব থেকে চাপা গলায় কে যেন ডাকল, পিন্টু। খুব পবিচিত নাবীকণ্ঠ। চেয়াবে বসে আছে। অন্ধকাবে আবছা।

যে হও সে হও প্রভু
তুমি তো সোয়ামী
যত কাল দেহ তোমার
তত কাল আমি ॥

বুকে ছলাৎ করে একটা শব্দ হল। বুকেব শব্দ কানে আসে না। ধবা পড়ে ডাক্তাবেব বুক দেখা যন্ত্রে। বলতে হয তাই বললুম। উপন্যাসে পড়েছি, এইবকম পবিস্থিতিতে বুক ছলাৎ করে ওঠে। কনক বসে আছে আবছা অন্ধকাবে গালে হাত দিয়ে, পায়ের ওপব পা তুলে। সে এক দৃশ্য। কেন জানি না, রঘুবংশেব সেই স্বয়ংবব সভাব কথা মনে পড়ে গেল। কোথা থেকে এক চিলতে আলো এসে কনকেব আঙুলে পড়েছে। আমি মাথা ঘোবালেই আঙুলেব আঙটিব পাথব ঝিলিক মেরে উঠছে। এ আঙটি ত কনকেব আঙুলে আগে দেখিনি। নিশ্চয় প্রতাপ বায কোনও এক বাতে সোহাগ করে পরিয়ে দিয়েছে। পবাবেই। পবাবাব সুবোদ বাখে বায মহাশয। আমাব মত ফেকলু নয়। আবার আমাব কথা আসছে কেন? আমি কনকেব আঙুলে আঙটি পবাতে যাব কোন আনন্দে। আমাব আবাব অত মাতন কিসেব? পাগলা দাশু। তবে কনককে অসাধাবণ দেখাচ্ছে। রঘুবংশ ছাড়া অন্য কোথাও এব তুলনা নেই,

বজ্রাংশু-গর্ভাঙ্গুলি বন্ধমেকং ব্যাপাবযামাস করং কিবীটে॥

কালিদাস লিখেছেন, কোন রাজা আবাব, যথাস্থানে স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও যেন কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইযাছে,—এমনই ভাব দেখাইযা স্বহস্তে মস্তকেব রত্নময কিবীটটি তুলিয়া ঠিক কবিযা বসাইতে লাগিলেন। কিবীটখচিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডব প্রভায তাঁহাব অঙ্গুলিব বন্ধ্রসমূহ পবিপূর্ণ হইল।

প্রবীববাবু বললেন, তোমাকে ডাকছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাব্বা বলো কি! ভদ্রমহিলা কে?

আমাব মেসোমশাইযেব মেয়ে।

উঃ তোমাদেব কত কি যে আছে। আমাব শালা, আমি ছাড়া আব কেউ নেই। যাও যাও শুনে এসো।

কনকেব পাশে একটা চেযাব খালি পড়ে আছে। বসা উচিত হবে কিনা ভাবছি, কনক চাপাস্বরে বললে, বোসো না।

তুমি কি সিনেমা কবতে এসেছ কনক?

আমাব একটা হাত মুঠোয় ধরে কনক বললে, আমায় ভুলে গেছ?

ভুলে যাব কেন? ভোলা কি অত সহজ। মানুষ কোনও কিছুই ভুলতে পারে না। মনের অতলে স্মৃতি হয়ে তলিয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই ঠেলেঠুলে ওঠে।

আমাব হাতে কনকেব মুঠোব চাপ কখনও জোর হচ্ছে, কখনও আলগা হচ্ছে। মেয়েছেলেব ভালবাসায় আমাব আব বিশ্বাস নেই, ঘেন্না ধরে গেছে। এবার আমি ঈশ্বরকে ভালবাসব। এক তরফা ভালবাসা। দেনাপাওনাব ব্যাপাব নেই। প্রীত প্রীত সব কোই কহত, কঠিন তাসু কি রীত। আদি অন্ত নিব নাহি, বালকি সি ভীত॥ প্রেম, প্রেম! প্রেম ত বালির বাঁধ। আজ আছ, কাল নেই। সাচ্চা প্রেম

ঈশ্বরে। আমি ঈশ্বরকেই ভালবাসব। আমাব হাত খামচালে কি হবে কনক। আমি যে জেগে উঠেছি। মোহনিদ্রা ভেঙে গেছে। দুনিয়াব হালচাল এই বোকাটা বুঝে ফেলেছে।

হম যাকো চিন্তন কবে মোহি মানত নহি।
সো চাহভ জন অন্যাকো সো নহি মানত তাহি ॥
হমকো চিন্তত হয অরু নাবী।
ধিক হৈ কাম ধিকধিক নর-নাবী ॥

আমি যাব জন্য অধীব, তার মনে বাসা বেঁধে বসে আছে অন্য পাখি। সে পাখি আবাব এ ডালে বসে, উড়ে যায় অন্য বাগিচায। পবস্ত্রী আব পব পুরুষ, এ ওকে, ও তাকে, বিশ্বাসঘাতকেব দল। ধিক কামনা, ধিক বাসনা, নারীকে ধিক, আমাকে ধিক।

কানেব কাছে মুখ এনে কনক ফিসফিস কবে বলল, কি, তোমাব অভিমান হয়েছে?

কি জানি, কনকেব কথা বলার ধরনে কি ছিল, গলা যেন বুজে এল আবেগে। উত্তব দেবাব ক্ষমতাই নেই ত উত্তব দোব কি! আশেপাশে সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব লোক ঘোবাফেবা কবছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলব না কি, কেন, কেন তুমি চলে গেলে। হাতেব তাস অত সহজে দেখাতে নেই।

কনক বললে, বুঝেছি, তোমাব অভিমান হয়েছে।

আলোব বৃত্তে দাঁড়িয়ে বেঁটে মত কে একজন হেঁকে বললেন, সাইলেনস, সাইলেন্স। স্টার্ট ক্যামেবা, স্টার্ট সাউণ্ড।

কনকেব হাতের মুঠোয আমাব শির বেব করা শীর্ণ আঙুল ধবাই বইল। কথা বন্ধ হয়ে গেল। আলোব বৃত্তে তাকিযায ঠেসান দিয়ে বসেছেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা, ছবি বিশ্বাস। এবই মধ্যে কখন গেরুযা পবে ফেলেছেন। মেকআপে চেহাবা একেবাবে বদলে গেছে। ঘাড়ে নেমেছে কাঁচাপাকা চুলেব বাববি। ঠোঁটেব ওপব পাকান গোঁফ। এই জিনিসকেই ইংবেজীতে বলে, হ্যাণ্ডল বাব মুশট্যাশ। জমিদাববাবু বসেছেন ফবাশে। সামনে বোতল আব গ্লাস। পাশেই উঁচিয়ে আছে আলবোলা। নলটা সামনে পড়ে আছে বাঘেব ন্যাজেব মত। সেই বেঁটে মানুষটি ঘুড়ি ওড়াবাব কাযদায একপাশে দাঁড়িযে, দুটো হাত নিচে থেকে ওপব দিযে তুলে ছেড়ে দিলেন। সঙ্কেত জানালেন, শুরু। ঝলঝলে প্যান্ট পবা এক ভদ্রলোক ছবিবাবুব মুখেব সামনে দুটো কাঠেব টুকবো ধবলেন। কালো বঙ করা। খড়ি দিয়ে কি সব লেখা। চিৎকাব করে বললেন, শট থ্রি, টেক ওয়ান। কাঠ দুটো দু হাতে ফাঁক কবে ঠাস কবে ঠুকে দিযে, গুঁড়ি মেবে সবে এলেন।

শুরু হল ছবিবাবুব খেলা। নিমেষে তাঁব চেহাবা পালটে গেল। চোখ মুখ দেখলেই মনে হবে, কতক্ষণ যেন বসে বসে মদ্যপান কবে বেশ একটু নেশাগ্রস্ত হয়েছেন। একেই বলে বড় অভিনেতা। বাস্তব থেকে কল্পজগতে যেতে পাবেন চোখেব পলকে। শূন্য দৃষ্টিতে এধাব ওধাব তাকালেন। বোতল থেকে গেলাসে লাল জল ঢাললেন। অদ্ভুত কাযদায সুদৃশ্য গেলাসটি ঠোঁটেব ফাঁকে তুলে ধবে ছোট্ট একটি চুমুক মাবলেন। হাত সামান্য কাঁপছে। এইবাব গেলাসটিকে চোখেব সামনে তুলে ধবে বলতে লাগলেন,

জীবন, জীবন! মহাশূন্যে নক্ষত্রেব হাহাকাব! উল্কা, উল্কা! জ্বলে যাও, পুড়ে যাও। নীলাদ্রিশেখব মৃত্যুব আব কত দেবি। সবাই ত চলে গেল, একি, আমি একা! এই জলসাঘবে আমি একা! ডানদিকে ঘাড় ঘুরিযে বললেন, কোই হ্যায?

বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁকলেন, কোই হ্যায?

মহা উল্লাসে পাশ থেকে কে একজন চিৎকাব কবে উঠলে, ওকে, ওকে, স্টপ। ছবিবাবু গেলাসটি সহজ হাতে সামনে নামিয়ে বেখে তাকিয়ায় কাত হয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সেই বেঁটে ভদ্রলোক নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন, ছবিদা ফাটিয়ে দিয়েছেন। লা জবাব। লা জবাব।

কনকের ওপাশের চেযারে অন্ধকারে কে যেন এসে বসলেন। কনকেব মুঠো থেকে আমাব আঙুল খুলে এল। বন্ধনেব এই হল ধর্ম, কখন যে খুলে পড়ে! এই আকর্ষণ, এই বিকর্ষণ। কে এসে বসলেন,

দেখাব চেষ্টা করতে গিয়ে চমকে উঠলুম। প্রতাপ রায়। একেবারে সাহেবী পোশাক। চোখে ছাই ছাই রঙের গগল্‌স। ও, প্রতাপ রায় আসায় কনক আমার হাত ছেড়ে দিলে! বেশ ভাই বেশ, সাবাশ! লা জবাব। মেয়েরা বুঝি এই ভাবেই ক্ষমতাশালী পুরুষের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। 'যে হও সে হও প্রভু তুমি তো সোয়ামী/যত কাল দেহ তোমার তত কাল আমি।'

প্রতাপ রায় কনকের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বললেন। তেমন বোঝা গেল না, শুধু কানে এল, 'জয়টা হোপলেস, জয়টা হোপলেস।' কনক ফিস ফিস করে বললে, পিন্টু, পিন্টু।

আড়চোখে দেখছি, প্রতাপ রায় কনকের পাশ থেকে আমাকে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, কি ভাগনে, কেমন আছ?

ভাল আছি। আপনি? (দেখতেই পাচ্ছি বেশ মজায় আছেন, তবু আমড়াগাছি।)

চলছে একরকম, বড় ঝামেলায় আছি। (তাই নাকি? রসে হাবুডুবু রসগোল্লার একটাই ঝামেলা, রসিকে খেয়ে ফেলে।)

কি ঝামেলা?

সে তুমি বুঝবে না। তোমার বোঝার বয়স হয়নি। বিষয় সম্পত্তি। মামলা মোকর্দমা। তোমার বাবা কেমন আছেন?

ভাল।

ভাল থাকলেই ভাল।

কনকের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, জয়ের সঙ্গে আজ আমার এক চোট হয়ে যাবে।

কনক বললে, শুধু শুধু মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আপনার সব ভাল, একটাই খারাপ। বড় তাড়াতাড়ি রেগে যান। ওটা ঠিক নয়।

কি বলছ তুমি? পুরুষ মানুষের রাগই হল ভূষণ। জড়োয়ার গয়না।

সাইলেন্স, সাইলেন্স।

আবার সেই নির্দেশ ভেসে এল। আড়চোখে দেখছি, কনকের হাতের মুঠোয় এখন প্রতাপ রায়ের হীরকভূষিত আঙুল। ধাতু তেরিকা, মেয়েছেলের নিকুচি করেছে। আমার অবশ্য রাগ বা অভিমান করার কোনও মানে হয় না। কনক আমার কে। সম্পর্কে বোন। দূর সম্পর্কের বোন। এমন কিছু প্রেমের সম্পর্ক নয়। বাতাসে নিজেই অট্টালিকা তৈরি করছি, নিজেই ভেঙে ফেলছি। ওঃ মন কি জিনিস! চেয়ার ঠেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে গেলুম, পেছন থেকে কে একজন মাথায় গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দিলে। ও মনে ছিল না, সামনে ছায়াছবি তৈরি হচ্ছে। কায়াকে ছায়া করে সেল্যুলয়েড চ্যাপ্টা করে ধরা হচ্ছে। শব্দ করা চলবে না। গাঁট্টা খেয়ে গোটা কতক কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল, চলে মুসাফির গাহি/ এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু, ব্যথার দোসর নাহি!/ নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল কেহ নাই মুছাবার,/হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার।

শট ফোর, টেক ওয়ান। খটাস করে কাঠের শব্দ।

ছবিবাবু আবার অন্যরকম হয়ে গেছেন। সেই মাতাল জমিদার। কোই হ্যায়? কে আছে? শশী, শশী: ফতুয়া পরা একটা লোক, খাটো ধুতি পরে, কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়াল, হুজুর!

কাট, কাট। পরিচালক নৃত্য করতে করতে এগিয়ে এলেন।

এই আমার সুযোগ। চেয়ার ঠেলে উঠে, প্রবীরবাবু যেখানে ছিলেন সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। ধনী ব্যক্তিদের পাশাপাশি বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। বড় উত্তাপ, বড় অস্বস্তি। আমার প্রবীরবাবুই ভাল। মাতুলও কেমন যেন অস্বস্তিকর। বেশ একটু ধনগর্ব আছে।

আবছা অন্ধকারে প্রবীরবাবুকে প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। মাতুল দলবল সহ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছেন। কার ভেতর ঢুকে বসে আছেন, কে জানে? প্রবীরবাবুই ফিস ফিস করে ডেকে জানান দিলেন। ছোট একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর চুপ করে বসে আছেন। এত নিচু, মাটির প্রায় কাছাকাছি, তাই চোখে পড়েননি।

প্রবীরবাবু বললেন, চলো, বাইরে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি।

দু'জনে সেই কল্পজগৎ থেকে বাইরের জগতে মুক্তি পেয়ে যেন প্রাণে বাঁচলুম। রোদের আলোয় চোখ ঝাঁঝিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, মামা কোথায় বলুন তো ?

প্রবীরবাবু বললেন, অদ্ভুত ছেলে, আমাদের ফেলে কোথায় যে চলে গেল। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। চলো না, বাইরে গিয়ে দেখি, কোনও দোকান-টোকান পাওয়া যায় নাকি !

উনি যদি হঠাৎ আবার খোঁজ করেন ?

তাও তো বটে। তাহলে তুমি থাকো, আমি যাই।

আমি যাই মানে ?

আমি চলে যাই। এ জগৎটা আর আমার ভাল লাগছে না। এ যেন সব দাঁড়ে বসা টিয়া। রাধেকৃষ্ণ বলো পাখি, কৃষ্ণ কথা বলো। এখানে আমার কিছু করার নেই। বুঝলে ভাগনে। এ হল গিলটি সোনার জগৎ। আর জয় ! জয়কে আমি চিনি। কল্পলোকের মানুষ। ওর কথায় যে নাচবে তার ভরাডুবি হবে। যখন যা নিয়ে মাতবে তখন একেবারে চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেবে। তারপরে নেতিয়ে পড়বে। ভোরের ফুলের মত। ফুটল যখন, বাগান মাত, তারপরেই ন্যাতা। তুমি এখানে ঘুরে ফিরে বেড়াও। খেয়াল হলে ডেকে পাঠাবে। ঘুরে ঘুরে ভুঁই তারা দেখ।

আমারও আর ভাল লাগছে না। চলুন পালাই।

তাহলে ত কোনও কথাই নেই। তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। আমার বোন বড় সুন্দর গান গায়। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, আমরা বড়লোক নই। ভাঙাচোরা বাড়ি। অন্ধকার। তেমন বাতাস খেলে না।

প্রবীরমামা, আমরাও বড়লোক নই। যাবার আগে মামাকে কোনওভাবে জানিয়ে যেতে পারলে শান্তি পাওয়া যেত।

দাঁড়াও, ওই দেখ দামুবাবু আসছে।

দৈত্য দামু চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে, শিস দিতে দিতে আসছেন। প্রবীরবাবু বললেন, এই যে স্যার শুনছেন ?

দামুবাবু থেমে পড়ে, ভুরু কুঁচকে, টেরিয়ে তাকালেন। অটেব চাহুনি। বলুন।

আজ্ঞে, জয়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কেন ? আর কোনও এক্সট্রা নেওয়া হবে না।

আমরা এক্সট্রা নই। আমি জয়ের বন্ধু, আর এ হল ভাগনে।

সিনেমা লাইনে অনেক ভাগনে-ভাগনী ঘোরে। ও কায়দায় সুবিধে হবে না।

আরে কি আশ্চর্য, আচ্ছা বেহেড মানুষ, আমরা ত এক সঙ্গে জয়ের গাড়িতে এলুম, আপনি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। ব্রাহ্মী শাক খান।

আরে খুব লম্বা চওড়া বাত বলছ ছোকরা। গলা টিপে তোমার দুধ বের করে দোব।

প্রবীরবাবু বললেন, তা তুমি পার। তোমার যা চেহারা। আমি ত ছারপোকা।

তবে, শালা অত ফুটুনি কিসের ?

তোমার শ্যালক হবার ইচ্ছে নেই গো ভীম ভবানী। আমার ভগিনী ত তোমার কোলের শিশু।

টেম্পার যা চড়েছে থামাতে না পারলে প্রবীরমামা ছাতু। কিছু না, দামুদাদা একবার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলেই রোড রোলারের কাজ হবে। আমি খুব আদুরে গলায় বললুম : দামুমামা, আমার মামা, সত্যিই মামা। তাঁকে বলবেন, আমরা চলে গেছি।

কথাটায় বেশ কাজ হল। এতগুলো মামা এক সঙ্গে ছেড়েছি। অনেকটা 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ'-র মত। সবেতেই মা। মা দিয়ে মাত।

দামুবাবু নরম হয়ে বললেন, তোমাকে প্রথম থেকেই আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

আজ্ঞে তা ত হবেই। আমার আব মামার মুখ প্রায় একই রকম।

আই সি, আই সি। ত্য গুরুজী ত এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

প্রবীরবাবু আঁতকে উঠলেন, আঁা, কোথায় বেরলেন ?

টাকার খোঁজে। সিক্স পাওনাদার ঘুর ঘুর করে ঘুরছে, হ্যাণ্ডসরা সব বসে আছে, আগাম টাকা না দিলে কেউ প্যাঁ করবে না। যে বন্ধুর টাকা দেবাব কথা ছিল, সে বলছে, সিনেমা কববে না। এ সব ভেতরের কথা। বাইরে যেন লিক না কবে। মালুম !

হাঁ মালুম, কিন্তু গেল কোথায় ?

এক মহারাজের বাড়ি। টাকা না পান, কিছু মার্বেল পাথব ত পাবেন। একটা মেঝেতে ছবি দশ হাত এগোবে। লাঃ লা ট্রালা, ট্রালা। দামুবাবু গুরুজীর বেস্ত ফুবিয়ে যাবার আনন্দে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললেন।

প্রবীববাবু বললেন, তোমায় বলেছিলুম না, জয বড বিচিত্র চরিত্রেব ছেলে। শিল্পী তাই লোকে বলে আত্মভোলা, তা না হলে বলত স্বার্থপব। সময়ে ও সব কিছু ভুলে যেতে পারে, স্ত্রী, পুত্র,পরিবাব, এমন কি নিজের মঙ্গল অমঙ্গল।

প্রবীরমামা, আমরা তাহলে এখন কি করব ?

এ জগৎ থেকে পালিয়ে চল। এ আমাদেব জাযগা নয। নাম পাগলদের আখড়া। চলো তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমাব খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে।

আমার পকেটে পয়সা থাকলে তোমাকে দোকানে খাওয়াতুম। না না খাওয়াতুম না। দোকানে খাওয়া খুব খাবাপ। বাইরে খাওয়া উচিত নয। শবীব খাবাপ হয়। আমাদেব বাড়িতে চলো।

উনি যদি ফিরে এসে আমাদের খোঁজ কবেন ?

তুমিও যেমন ! তোমার মামাকে তোমার চেয়ে আমি ভাল চিনি। চলে এসো, চলে এসো।

ডান দিকে একটা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে কোমবে গামছা বাঁধা একদল লোক, আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে। নকল দাড়ি গোঁফ লাগান এক ভদ্রলোক নাচতে নাচতে বলছেন, সব জ্বলে যাক, পুড়ে যাক,শ্মশান হয়ে যাক। আহা তোমাব কি রূপ, আহা তোমার কি রূপ, লকলক করছে, লকলক করছে।

এ আবার কি ব্যাপার !

প্রবীরবাবু বললেন, শুটিং হচ্ছে, শুটিং।

আগুন লাগলে এই ভাবে কেউ নাচে ?

বাস্তবে না নাচলেও সিনেমায নাচতে হয়।

একটা ঠ্যালা গাড়ির ওপর ক্যামেরা। খড়খড করে ফিল্ম ঘোবার আওযাজ হচ্ছে। দু'জন মানুষ গাড়িটাকে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। আগুনের হলকায় উত্যক্ত হয়ে এক গাদা পাখি গাছের ডালে ডালে উড়ছে আর ডাকছে।

আমরা রাস্তায় এসে পড়লুম। চাবপাশে বড বড় গাছ। রাস্তাটা বেশ ছায়া ছায়া, নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ট্রাম ডিপোর কাছে চলে এলুম। প্রবীববাবু বীবের মত হাঁটছেন। গুন গুন গাইছেন, মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান।

আবাব আমরা সকালবেলাব সেই দুধ পড়ে যাবার জায়গায চলে এলুম। ইতিমধ্যে সময় সরে গেছে। দীর্ঘ ছায়া নেমেছে। চাবপাশেব জেল্লা অনেক কমে গেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা একটা ছোট রাস্তায় পড়েছি। হঠাৎ মনে হল, আমি কি কারণে বোকার মত প্রবীরবাবুর বাড়ি চলেছি ! চেনা নেই, জানা নেই। ভদ্রলোক শিল্পী, দু-একটা ছবি দেখা যাবে। এক সময় আমাব খুব শিল্পী হবার ইচ্ছে ছিল। আর্ট কলেজে ভর্তি হবাব জন্যে পাগল হয়েছিলুম। পিতা বলেছিলেন, তোমাকে বড়লোকী নেশায় পেয়েছে। গরিবের ঘোড়া রোগ। না খেয়ে মবার ফিকির।

প্রবীরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকালেন. কি হে পেছিয়ে পড়লে কেন ?

পা চালিয়ে পাশাপাশি আসতেই আমার কাঁধে হাত রাখলেন পরম বন্ধুর মত। রাস্তা ক্রমশই দু'পাশে চেপে আসছে। ক্রমশই যেন কলকাতার জঠরে প্রবেশ করছি। আলো-বাতাস কমে আসছে। এই শহরে মানুষ কি ভাবেই না বাস করে! প্রবীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন. কি.খুব কষ্ট হচ্ছে ?

আজ্ঞে না, আমার হাঁটা অভ্যাস আছে।

হ্যাঁ. পুরুষ মানুষ. সব রকম অভ্যাস রাখবে। জীবন তা হলে দেখবে. তোমার কাছে হেরে গেছে। যত ব্যথা পাই. তত গান গাই. গাঁথি যে সুরের মালা. ওগো সুন্দর নয়নে তোমার নীল কাজলের মায়া। শরীরটাকে একেবারে পাথরের মত লোহার মত করে ফেলবে। কোনও কিছুর প্রত্যাশা রাখবে না। দুঃখ পেলে হেসে উঠবে, সুখ দেখলে সরে আসবে। শূন্য সংখ্যাটার কিছু নেই. একেবারেই শূন্য, অথচ সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। শূন্য না হলে দশক হবে না. শতক হবে না, সহস্র হবে না, অযুত, নিযুত কিছুই হবে না। আমি সেই শূন্য রে ভাই। মহাশূন্যে ভাসছে জগৎ, ঘুরছে তারা, ঘুরছে চন্দ্র, শূন্য আছে সৃষ্টি আছে, গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নে।

এই গলির মধ্যেও ছোট্ট একটা মুদিখানা মত রয়েছে। প্রবীরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, দাঁড়াও দু' পাতা চা কিনে নি। বাড়িতে আছে কি না কে জানে? চা না খেলে আড্ডা ঠিক জমবে না।

প্রবীরবাবু যে চা কিনলেন, আমি জানি সে চা খাওয়া ভীষণ শক্ত। কেমন একটা বুনো বুনো গন্ধ বেরোয়। আবার আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটা শুরু হল। রাস্তা বর্শার ফলার মত ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। অবশেষে আমরা একটা ভাঙা ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। আমালাগা ইটের দোতলা হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় নেমে আসতে চাইছে। বাড়িটা এমনই বসে গেছে। ওপর দিকে তাকালেই দোতলার জানালা। ক্ষয়া ক্ষয়া কাঠের পিঞ্জর। সারা বাড়িটার যেন যক্ষ্মা হয়েছে। সারা দিন রাত নীরবে কেশে চলেছে।

দরজায় বিরাট বড় একটা কড়া। নিজের ভারে হেলে পড়েছে। কোনদিন উপড়ে চলে আসবে। প্রায় অসংলগ্ন সেই কড়া ধরে প্রবীরবাবু ঠকাস ঠকাস করে তিনবার শব্দ করলেন। এ কড়া তেমন মুখরা স্ত্রীর মত বাজে না, উদাসী বৃদ্ধার মত 'হরি দিন ত গেল'র সুরে জরাজীর্ণ বিদায়ী ব্যথায় বাজে থেমে থেমে।

প্রবীরবাবু ডাকলেন. উষা, উষা।

সেই ডাক চারপাশের নোনা লাগা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বহু উপরে এক টুকরো আকাশে আলোর পাখনা উড়ছে। হড়াস. একটা শব্দ হল। দরজার হুড়কো সরল। ইনিই কি উষা! প্রথম নজরেই প্রেমে পড়ে যাবার মত অবস্থা। কদর্য প্রেম নয়, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক প্রেম। উষা না হয়ে, আমার মায়ের তুলসী নামটা যদি একে দেওয়া যেত। অবশ্যই আমার পিতৃদেবের অনুমতি নিয়ে।

প্রবীরবাবু একগাল হেসে বললেন. দ্যাখ্ উষা. কাকে এনেছি ?

প্রবীরবাবু এখনও আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যেন দুই মানিক জোড় মাঝ রাতে মাল খেয়ে বাড়ি ফিরছি। কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার আমাদের পরিদর্শন করছেন। প্রবীরবাবুকে আমার আর মামা বলতে ইচ্ছে করছে না. দাদা বলতে ইচ্ছে করছে।

উষাদেবীর ঘাড়ের কাছে এলো খোঁপা। আয়তন দেখলেই বোঝা যায়, খুলে দিলেই পাহাড়ী নদীর মত কোমর ছাপিয়ে লাফিয়ে পড়বে। সাদা শাড়ি, চওড়া নীল পাড়। হালকা নীল ব্লাউজ। দেহ আর মুখের গড়ন দেখার মত। এ যেন নালন্দা আবিষ্কার। কনারকের মন্দির থেকে অপরাহ্ণ বেলায় নেমে এসেছেন অপরূপা। কলকাতা ঢুঁড়লে এমনি সব বিস্ময় কত যে পাওয়া যেতে পারে. কেউ জানে না।

প্রবীরবাবু কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বললেন. আমার একমাত্র বোন উষা। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আমি আর উষা। উষী. এ হল আমার বাল্যবন্ধু জয়নারায়ণের ভাগনে। ছেলেটা বড় ভাল. ঠিক তোর মত।

আগে তোমরা ভেতরে এসো তো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছ ?

প্রবীরবাবু ঢুকতে ঢুকতে বললেন, উষী, আমাদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে, জল তেষ্টা, চা তেষ্টা সব এক সঙ্গে পেয়েছে। এই নে চা।

এঃ দাদা, তুমি এই চা নিয়ে এলে। এ চা খেতে পারবে না তোমার—কি নাম ? নামটা ত জানা হল না।

প্রবীরবাবু বললেন, তোমার নাম ?

পিণ্টু।

বাঃ, ফাসক্লাশ নাম। খুব পাববে, খুব পারবে, ও তো আর বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতে আসেনি। আমরা যখন খেতে পারি, ও-ও পারবে।

বাড়ির নিচের তলাটা একেবারেই জখম হয়ে গেছে। আহত অন্ধকার, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত সৈনিকের মত তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ভাঙা উঠন থেকে একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। বারান্দায় ঝলঝল করছে কাঠের রেলিঙ। কিঁচ কিঁচ করে কোথায় একগাদা পাখি ডাকছে।

দোতলায় উঠতেই প্রাণটা ভরে গেল। দেবালয়ের মত পরিষ্কাব, পরিচ্ছন্ন। ভারি মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এল। ধূপ হতে পারে। বারান্দার শেষকোণে মাঝারি আকারের একটা তারের খাঁচা। খাঁচায় গোটা দশেক ছোট ছোট রঙীন পাখি, উড়ছে, দোল খাচ্ছে। এদেবই বোধহয় ক্যানাড়ি বলে। একটা ফুটফুটে সাদা খরগোস, থেবড়ে বসে আছে আপন মনে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে পাখি দেখছে।

উষা বললেন, তুমি জুতোটা এইখানে খুলে বাখ। দাদা, তোমরা ঘরে গিয়ে বোসো।

ঘরে খাটফাট কিছুই নেই। অনাবশ্যক কোনও ফার্নিচার নেই। একপাশে সুন্দর একটা মাদুর সমান করে পাতা। তার ওপর ঝকঝকে একটা জলচৌকি। পাশেই নকশা করা ফুলদানিতে ছোট বড় অসংখ্য তুলি। গোটাকতক পরিষ্কার প্যালেট। দেযালে সারি সারি ছবি ঝুলছে, জল রঙ, তেল রঙ। আর একপাশে, আর একটা ছোট মাদুর। তার ওপর একটা হাবমোনিযাম, পাশেই একটা তানপুরা ঝুলছে। ঘরেব আব এক কোণে বেশ বড় আকারেব ফুলদানিতে বজনীগন্ধার গুচ্ছ গোঁজা। ফুলেব গন্ধ সারা ঘরে প্রজাপতির মত ভাসছে।

প্রবীরবাবু প্রথমেই পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললেন। একটা দেখার মত স্বাস্থ্য। দু-চারবার হাতের গুলি ভেঁজে নিয়ে আমাকে বললেন, তুমি ব্যায়াম করো ?

আজ্ঞে না, আমার বাবা কবেন।

হা হা করে ঘব ফাটান হাসি হেসে বললেন, এ যে দেখি সতীব পুণ্যে পতির পুণ্য। ও সব চালাকি চলবে না, রোজ ব্যায়াম করবে।

আমার বাবাব ব্যায়ামে খুব বিশ্বাস। উনি বলেন, যখনই দেখবে শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে.মন ঝিমিয়ে পড়ছে, তখনই মারবে পঁচিশটা ডন, পঞ্চাশটা বৈঠক।

ঠিক বলেন, ঠিক বলেন। আমি ওঁকেই আমার গুরু করব। জীবনে গুরু চাই পিণ্টু, গুরু চাই। সাধন করনা চাহিরে মনুয়া, ভজন কবনা চাই। উষীই কোথায় গেলি রে !

প্রবীরবাবু নাচতে নাচতে ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখনও গান চলেছে, সাধন করনা চাহিরে মনুয়া। জলরঙে আঁকা একটা নিসর্গ দৃশ্য তখন থেকেই বড় টানছে। অমন একটা জায়গায় এখুনি যদি দৌড়ে চলে যাওয়া যেত।

প্রবীরবাবু ওপাশ থেকে ডাকলেন, পিণ্টু চলে আয়।

ডাকটা বড় ভাল লাগল। হঠাৎ যেন খুব কাছাকাছি করে নিলেন। উঁচু ডালে ফল ঝুলছে। কোনও রকমে সেই ফলের নাগাল পেয়ে গেলে যেমন আনন্দ হয়, সেই রকম একটা আনন্দের অনুভূতি হল।

গোদা রোটি খাও
হরিকে গুণ গাও ॥

পাখির খাঁচার সামনে প্রবীরবাবু থেবড়ে বসে পড়েছেন। আদুড় গা। কোলে একটা খরগোস, দুটো লেঙচে বেড়াচ্ছে পাশে। পাখিরা প্রভুকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে খুব নাচানাচি করছে। কিছু দূরেই একটা ঘুপচি মত জায়গায় রান্নাঘর। সেখানে স্টোভ জ্বেলে উষাদেবী লাল লাল করে আলু ভাজছেন। কনুই দিয়ে কপালের ওপর ঝরে পড়া চুল সরাতে সরাতে বললেন, পিণ্টু, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। দাদা, তুই ওকে বাথরুমে নিয়ে যা। তুই হাত-পা ধুয়েছিস!

দাঁড়া না ধুচ্ছি। তাড়া কিসের?

এই বললি নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে রে উষী।

আজকে পাখিরা খুব লাট খাচ্ছে রে!

প্রবীরমামা, ওগুলো কি পাখি?

তুমি আমাকে মামা না বলে, দাদা বললে কেমন হয়?

দারুণ হয়।

তাই বলিস। মামা-ভাগনে সম্পর্কটা তেমন ভাল নয়। উষা তোর দিদি। দিদিটা কেমন বল?

একেবারে দিদির মত।

ওঃ টেরিফিক বলেছিস। আমার যদি ওইরকম একটা দিদি থাকত রে!

দিদি নেই বলে তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে রে দাদা?

একটাই অসুবিধে, দিদিরে বলে ডাকতে পারছি না।

আমি দিদি হলে, তোর মত দাদা পেতুম কোথায়!

প্রবীরদা, কি পাখি?

এ হল মনপাখিরে ভাই, ছটফটানি দেখে বুঝতে পারছিস না। সব যেন ফিল্মস্টার হবার জন্যে লাফালাফি করছে।

উষাদি বললেন, ওগুলো হল বদরি পাখি। দুটো থেকে অতগুলো হয়েছে। আরো হবে, তুমি নেবে?

ইচ্ছে থাকলেও নেওয়া যাবে না। বাবা রাগ করবেন।

কেন?

বনের পাখি বনে থাকবে। খাঁচায় থাকবে কেন? একবার একটা না জিজ্ঞেস করে টিয়া পাখি কিনেছিলুম। আমাকে বললেন, এখুনি উড়িয়ে দাও। আমি একটু বায়নামত করেছিলুম, না ছাড়ব না। আমাকে একটা ঘরে ছঘণ্টা বন্ধ করে রেখেছিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান আর জিজ্ঞেস করেন, কি, কেমন লাগছে? প্রথম ঘণ্টা দুয়েক জেদের বসে বলেছিলুম, বাঃ, বেশ লাগছে! তোফা লাগছে। তাহলে সারাজীবন থেকে যাও। এই নাও খান দুয়েক বিস্কুট। কিছু পরে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন কাগজে মোড়া দুটো লজেন্স। হঠাৎ ছোট বাইরে পেয়ে গেল। চিৎকার করে জানান দিলুম। বললেন, ঘরের কোণে নর্দমা আছে করে ফেল, কিংবা যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই কর। বন্দী-পাখিব আবার বাথরুম কিসের! খাঁচার দেড়হাত জায়গাতেই তার ওঠা-বসা, আহার-নিদ্রা, প্রকৃতির কর্ম। তোমাকে ত তোমার মাপ অনুযায়ী বেশি জায়গাই দেওয়া হয়েছে। বড় বাইরে, ছোট বাইরে সব ওইখানেই সার। সকালে একবার পরিষ্কার করা হবে।

শেষে কি হল? তোমার মা এসে মুক্তি দিলেন!

মা কোথায়? মা ত তার অনেক আগেই স্বর্গে চলে গেছেন।

তা হলে?

তা হলে আর কি, বেলা তিনটের সময় কুঁই কুঁই করে জানালুম, আমি আর পারছি না। বেলা তিনটে

পনের মিনিটের সময় মুক্ত পাখি উড়ে চলে গেল উদার আকাশে।

সাবাশ, তোর বাবা তো একটা সাংঘাতিক ক্যারেকটার। নমস্য মানুষ! কবে যাই বল তো, একবার প্রণাম করে আসি। ঊষী যাবি তুই!

আমি গেলে রাগ করবেন। এসব মানুষ মেয়েদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না।

হ্যাঃ, তুই একেবারে সবজান্তা বাবা। চ না একদিন যাই।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই বোধহয় ভুলে গেছিস দাদা, আজ সাড়ে ছ'টার সময় আশ্রমে গান আছে।

হ্যাঁ রে, তাইত! সেরেছিস! নে নে তাড়াতাড়ি হাত চালা।

প্রবীরদাদা উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, এতক্ষণ পেছন দিকে গা ঘেঁষে যে খরগোসটি বসে ছিল, সেটি বিনা কাজে বসে ছিল না। চিবিয়ে চিবিয়ে কাপড়ের কাছাটি শেষ করে দিয়েছে।

এই দেখ ঊষী, তোর বিক্রম কি করেছে! কি বলতে ইচ্ছে করে বল! বাড়ির একটা জিনিসও আর আস্ত থাকবে না।

তোকে সকাল থেকে বলছি, ওদের ঘাস ফুরিয়েছে।

তা বলে, ও ব্যাটা আমার কাছাটা ঘাস ভেবে চিবোবে!

ওর সে বিচার থাকলে খরগোস হবে কেন বল! রেখে দে, আমি কেটে বাদ দিয়ে সেলাই করে দেব।

হ্যাঁ, ওই ত তুই শিখেছিস। কেটে বাদ দোব! আমার সমস্ত ধুতি এই ভাবে, দশ থেকে আট, আট থেকে সাত, শেষে কৌপীন হয়ে যাবে।

ভালই তো, তুই না বলিস সন্ন্যাসী হয়ে যাবি! লুচিগুলো বেশ গোল করে বেলে দে ত।

ঊষাদি, আমি দোব?

প্রবীরদা বললেন, তুই পারবি না পিণ্টু। বড় শক্ত কাজ। জ্যামিতির জ্ঞান থাকা চাই।

চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ।

তা হলে হয়ে যাক।

বেশ মজা! যেন চড়ুইভাতি হচ্ছে, নদীরধারের পোড়ো বাড়িতে! লুচি বেশ গোলাকারই হতে লাগল।

প্রবীরদা বললেন, শিখলি কোথা থেকে?

এই ত আমার কাজ।

কেন, তোর বাড়িতে কেউ নেই?

আমি আর আমার পিতা, আর সাবেক কালের বিশাল এক বাড়ি!

বলিস কি? তুই ত মহাভাগ্যবান রে! যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। আর সংসার-ফংসারে ঢুকে ন্যাজে গোবরে হয়ো না। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়। শালা, সংসারের নিকুচি করেছে।

সন্ন্যাসী হবার আগে তোরা দু'জনে হালুইকর হয়ে যা। দু'পয়সা রোজগার হবে, হরিদ্বার যাবার গাড়ি ভাড়াটা উঠে যাবে।

সন্ন্যাসীর আবার গাড়ি-ভাড়া কি রে! সবই ত ফ্রি।

লুচি, লাল লাল আলু ভাজা, চা। পেটটা ঠাণ্ডা হল। প্রবীরদা বললেন, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। খুব ভাল লাগবে। দেখবে ঊষী কেমন গান গায়!

ফিরতে দেরি হলে বাবা বকবেন।

আঃ এক ছেলে হওয়ার এই বিপদ। আমি তোমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। যদি বকেন, আমাকে বকবেন।

যেতে ত খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভয় লাগছে।

আরে দূর, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। আজ একজন সাধিকা দেখবে। তোমার মাথায় একবার শুধু হাত রাখবেন, সারা শরীর জুড়িয়ে যাবে। কি সংসারে পড়ে আছ ? গোদা রোটি খাও, হরি কা গুণ গাও। দুটো কাঠ খন্তাল হাতে তুলে নিয়ে প্রবীরদা বাজাতে লাগলেন, আর সারা ঘরময় নেচে নেচে গাইতে লাগলেন, গোদা রোটি খাও, হরিকে গুণ গাও। আমাকে বললেন ধর, ধর। নেচে নেচে গা। দেখবি তোর ভেতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে আসছে।

আমি যে নাচতে পারি না প্রবীরদা। লজ্জা করে।

আরে ধ্যার ব্যাটা, ছাগলেও নাচতে পারে। তুই মানুষ হয়ে নাচতে পারবি না ?

উষাদি এসে পড়ায় বেঁচে গেলুম। ঘরের বাইরে আমরা দু'জনেই নির্বাসিত। উষাদি একটু সাজগোজ করবেন।

দাদা, ধেই ধেই করে না নেচে, জামা কাপড় পরে নে। দুটো রিকশা ডাক।

ঘরের পরদা ভেজিয়ে দিলেন। প্রবীরদার দু' জোড়া খরগোস। সব কটাকে কান ধরে ধরে বাক্সে পুরে দিলেন। চারজন চারটে ফুটো দিয়ে মুখ বের করে সংসারের বিচিত্র হালচাল দেখছে। প্রবীরদা গায়ে সেই সকালের জামাটা চাপিয়ে, চুলে দু'বার আঙুল চালিয়ে বললেন, পিণ্টু তুই বোস, আমি মোড়ের মাথা থেকে দুটো রিকশা ধরে আনি।

রান্নাঘরের সামনে ছোট্ট একফালি ছাদ। ছাদে একটি নিখুঁত তুলসীমঞ্চ। নিকোনো তকতকে। এঁরা মনে হয় বৈষ্ণব। আমরা শাক্ত। চারপাশেই খাড়া-খাড়া প্রাচীন বাড়ি। ভাঙা ভাঙা বারান্দা। হেলে পড়া জানালা। একেবারে লাগোয়া একটি বাড়ি বেশ নতুন। হালে রঙ পড়েছে। ভেতরে কোথাও রেডিও বাজছে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গাইছেন, বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি। জানালায়, জানালায় পর্দা ঝুলছে।

হঠাৎ পায়ের কাছে ছোট্ট একটা ইটের টুকরো পড়ল। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। আবার একটা ইটের টুকরো এসে কপালে লাগল। বেশ চমকে দেবার মত লাগা। এবার ওপর দিকে তাকালুম। তিনতলার ছাদের আলসেতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়েস মনে হল ষোল সতের হবে। একমাথা চুল হাওয়ায় উড়ছে। তাকাতেই, মেয়েটি হেসে বললে, প্রিয়তম।

সামান্য একটা শব্দ মানুষকে কি রকম গতিবেগ দিতে পারে। দৌড়ে একেবারে ভেতরে চলে এলুম। আর ঠিক তখনই উষাদি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

কি হয়েছে পিণ্টু ! তোমার কপালটা কাটল কি করে !

তিনতলার ছাদে মেয়েটি হা হা করে হাসছে প্রেতিনীর মত।

সেই হাসি শুনে উষাদি বললেন, তুমি বুঝি ওই ছোট ছাদটায় গিয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেয়েটি পাগলী। কখনও ভাল থাকে, কখনও উন্মাদ হয়ে যায়। এখন উন্মাদ অবস্থা। এসো দেখি। ইট মেরেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমাকে আমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল। দোষটা আমারই। এসো ওষুধ লাগিয়ে দি। অত বড়লোক মেয়েটাকে কেন যে উন্মাদ আশ্রমে পাঠাচ্ছে না।

সামান্য একটু কেটে গেছে, ও আর ওষুধ লাগাতে হবে না।

দ্যাখো পিণ্টু, আমার অবাধ্য হবে না। অবাধ্য ছেলেদের আমি পছন্দ করি না।

উষাদির দৃপ্ত শাসনের ভঙ্গিতে বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। ছিপছিপে বেতের মত লম্বা চেহারা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ধারাল মুখ, চোখ, নাক। জোড়া ভুরু। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। হাত দুটো কি লম্বা, যেন শালুক ফুলের ডাঁটা। হাত তুলে খপ করে যখন আমার একটা হাত ধরলেন, মনে হল সাপে ছোবল মারতে আসছে।

এদিকে আয়, আমার হাত ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কারুর নেই। বৃথা চেষ্টা করিস নি।

সত্যিই তাই। মেয়েদের আঙুলে এত জোর হয় আমার জানা ছিল না। যেন লোহার বেড়িতে হাত বাঁধা পড়েছে। আমি অবাক হয়ে উষাদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। ধনুকের মত বাঁকা ভুরু। কপালে ছোট্ট একটা সাদা টিপ। শুদ্ধ আত্মার জ্যোতির মত দুই ভুরুর মাঝখানে ভাসছে। চূর্ণ চুল কপালের প্রান্তরেখায় সামান্য অবাধ্য। পৃথিবী এত সুন্দর ? ঈশ্বর তোমার আয়োজন এত পূর্ণ ? আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। একই নারীর কত বিচিত্র, বিভিন্ন রূপ। ওদিকে একজন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢিল ছুঁড়ে কপাল ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। এদিকে একজন পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে শাসন করছে।

বকেছি বলে তুই কাঁদছিস ! পাগল ছেলে। ঠিক ধরেছি, তুই এখনও শিশু। চিরকালই তুই শিশু থেকে যাবি। তোকে না চালালে চলতে পারবি না।

উষাদি আমার মুখটা বুকে চেপে ধরলেন। আবেগ এমন একটা জিনিস, যখন হঠাৎ আসে তখন মত্ত হাতির মত ভেতরটা একেবারে তছনছ করে দিয়ে যায়। বোঝা যায় না। আমার ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলুম, তোর হলটা কি ! কেন এমন করছিস ! মানুষ কেন যে কি করে মানুষ যদি জানত। বুকের ওপর উষাদি মুখটা চেপে ধরে আছেন। আমার মনে হচ্ছে :

সে বহুদিন আগের এক অভিজ্ঞতা। সাত দিন নাগাড়ে বৃষ্টি হবার পর খুব রোদ উঠেছে। খাল বিল সব ভেসে মাঠ ময়দান একাকার। আমাদের বাড়ির পাশের ঘাসে ঢাকা একটা মাঠ ভেসে গেছে। চারপাশে পায়ের পাতা ডোবা জল। মাগুর আর সিঙি ভেসে ভেসে চলেছে। সেই জলে পা ডুবিয়ে খপাৎ খপাৎ করে চলেছি। জলের ওপরটা গরম, নরম ঘাসে পা পড়লেই ঠাণ্ডা জল কি এত নাতিশীতোষ্ণ স্নেহে পা জড়িয়ে ধরছে।

এখন এই অবস্থায় আমার মনে হচ্ছে আমি সেই নরম, সিক্ত ঘাসে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। উষাদির ভরাট বুক থেকে একটা শীতল স্পর্শ উঠে আসছে, একটা পূর্ণতার অনুভূতি। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। এই মহিলার নিশ্চয়ই কোনও ঐশী শক্তি আছে।

উষাদি আমার মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বললেন, তোর মুখটা কি মিষ্টিরে ! এই বয়সের ছেলেদের মুখ কেমন যেন চোয়াড়ে হয়।

কপালের কাটা জায়গাটা মুছিয়ে দিয়ে এক ফোঁটা আইডিন লাগিয়ে দিলেন। হাতে একটা চিরুনি দিয়ে বললেন, নে চুলটা আঁচড়ে নে।

হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল একটা প্রশ্ন, আপনি কে ?

আমি ? আমি উষা। পৃথিবীর প্রথম আলো।

হেঁট হয়ে ঝপ করে একটা প্রণাম করে নিলুম।

করিস কি, করিস কি ?

আর করিস কি ! আমার মন বলছে, তুই এঁকে ধরে থাক। কি পেতে কি পেয়ে যাস, তার ঠিক নেই। পরশপাথর ছুঁইয়ে নে সোনা হয়ে যাবি।

প্রবীরদা নিচে থেকে হাঁক মারলেন, ওরে নেমে আয়।

রিকশা চলেছে ঠনঠন করে। একটায় আমি আর উষাদি। আর একটায় প্রবীরদা আর হারমোনিয়াম। আজ কি বাতাস ছেড়েছে ! সন্ধের কলকাতা যেন পাগল হয়ে গেছে। চারপাশ ভিজে ভিজে। কোথা থেকে নীলচে আলো নেমে এসেছে। দোকানের হলদে বাতি সব সবুজ বর্ণ। লোকজন, পথঘাট সব যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চলেছে।

উষাদির মুখ অসম্ভব গম্ভীর। একটাও কথা বলছেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, গান জানিস ?

আমরা কোথায় যে চলেছি, কিছুই জানি না। শুধু চলেছি। ছায়া ছায়া পৃথিবীর পথ দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছি। সামনে একটা বলিষ্ঠ পিঠ, ডাইনে বাঁয়ে ছন্দে দুলছে। দুটো পা একই লয়ে নেচে

চলেছে। মাঝে মাঝে ঠুং ঠুং শব্দে বাতাস যেন ঝিমিয়ে পড়ছে।

গোটা তিনেক বাঁক নিয়ে রিকশা একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তায় ঢুকে পড়ল। দু'পাশের বাড়িতে বেশ একটা শ্রী আছে। নিয়মমত রঙ পড়ে। তেমন ভাঙাচোরা নয়। একটা গেরুয়া রঙের বাড়ির সামনে আমরা নেমে পড়লুম। বিশাল গেট। গেটের মাথায় কেয়ারী করা বাগান বিলাস উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে। ভেতরে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগান। বাড়িটা ভেতর দিকে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কোনও আড়ম্বর নেই। পরিচ্ছন্নতায় মন ভরে যায়'।

ভেতরের হল ঘরে বেশ বড় রকমের আয়োজন। একেবারে শেষ মাথায় মার্বেল পাথরে বাঁধান একটি বেদী। তার ওপর বিশাল একটা চিত্রপট। কোনও সাধিকার। আসন করে বসে আছেন। একটি পায়ের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা আর একটি পা। একেই বলে সিদ্ধাসন। বজ্রের মত চেহারা। মাথায় নটরাজের মত চুল একপাশে চুড়ো করে বাঁধা। গেরুয়া রঙের শাড়ি। বসে আছেন বাঘছালে। চারপাশে মোমবাতির মত উঁচু উঁচু চারটে বিজলী বাতি জ্বলছে। বড় বড় পদ্মফুল পায়ের কাছে ছড়ান। ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ঘরে আলোর ব্যবস্থা এমন ভাবে করা, যেন সবে ভোর হল। বড় বড় কার্পেট টানটান করে পাতা। এরই মধ্যে বেশ ভাল জমায়েত হয়েছে। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশি। তরুণ, তরুণী এমনকি বালক বালিকাও রয়েছে। কেউ এতটুকু শব্দ করছেন না, একেবারে ধ্যানস্থ। কে যেন বলছেন চুপ, সব নীরব হয়ে গেছেন। সমুদ্রে ঢেউ উঠেছিল, যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সেই মুহূর্তে স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

কে সেই যাদুকর!

সেই চিত্রপটের একপাশে বসে আছেন এক সন্ন্যাসিনী। এঁকেই বলা যায় যৌবনে যোগিনী। সিল্কের গেরুয়া। রুক্ষ, এলোচুল। কপালে এত বড় একটা লাল টিপ। ঘষা লেগে ছড়িয়ে পড়েছে, নিমীলিত চোখ। কোথায় কোন্ জগতে আছেন? দেহ যেখানে রয়েছে, মন সেখানে নেই। দেখলেই বোঝা যায়।

উষাদি ফিসফিস করে বললেন, পা টিপে টিপে, এক পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে চল। পায়ের গাঁট ভাঙার শব্দ যেন না হয়।

প্রবীরদার হাতে ধরা হারমোনিয়ামের আঙটায় খটাস করে বিশ্রী শব্দ হল। নিস্তব্ধতায় যেন ঢিল পড়ল।

উষাদি হাঁটু মুড়ে প্রণাম করলেন।

তিনি নিমীলিত দৃষ্টি মেলে দেখলেন। খুব রোদের দিনে জানালার পাখি একটু ফাঁক করলে যেমন এক ঝলক রোদে আসে, চোখের ফাঁক দিয়ে সেই রকম এক ঝলক তেজ বেরিয়ে এল। সাধন-ভজন করলে মানুষের কি যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়।

প্রবীরদার প্রণাম শেষ হতেই আমি নিচু হলুম। আমার মনে হল অনন্তের সামনে মাথা নিচু করছি। নাকে দেবালয়ের গন্ধ। গায়ে কেমন যেন কাঁটা দিচ্ছে। শক্তিশালী চুম্বকের সামনে লোহার টুকরো পড়লে যেমন কাঁপতে থাকে, আমার শরীর সেই রকম কাঁপতে থাকল। মনে হল, আমি যেন বরফের মত গলতে শুরু করেছি। তিনি একটি আঙুল তুললেন। আমার সমস্ত শরীর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। কেন জানি না, তাঁর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ চমকের মত এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

পিঠে আঙুলের স্পর্শ পড়ল। উষাদি ইশারায় বলছেন, উঠে এস।

যে কার্পেটটিতে এতক্ষণ কেউ বসেন নি, আমরা সেই আসনে সাবধানে বসে পড়লুম। ডানপাশে চিত্রপট। কোনাকুনি বসে আছেন ধ্যানস্থ সাধিকা। সামনে ভক্তমণ্ডলী। করুণাধারার মত আলো নেমে । বাইরে উতলা বাতাসে, জানালায় জানালায় ফুলন্ত যুঁই কেঁপে কেঁপে গন্ধ ছড়াচ্ছে। ধূপের ধোঁয়া মৃতের আত্মার মত ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে।

সাধিকা একটি হাত তুলে ইশারায় জানালেন, শুরু কর। এ বেশ ভাল ব্যবস্থা! অনর্থক কোনও আড়ম্বর নেই। ঈশ্বর এই, ঈশ্বর ওই। ধর্ম, ধর্ম। নীরব ধ্যানে তোমরা যে পার তাঁকে খুঁজে নাও।

হারমোনিয়ামে সুর খেলতে লাগল। তবলা নেই। তাই তেঁএটে তালের টক্করে সুর হোঁচট খাচ্ছে না। উষাদি ধরলেন,

ন তাতো, ন মাতা ন বন্ধুর্ণ নপ্তা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি॥

শ্রোতারা শেষ লাইনটি কণ্ঠে তুলে নিলেন, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি।

আশ্চর্য এই স্তোত্রটি আমি পুরো জানি, হে ভবানি! আমার পিতা নেই, মাতা নেই, বন্ধু, পৌত্র, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, ভর্তা, জায়া কেউ নেই, আমার বিদ্যা নেই, জীবিকা নেই, তুমি গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি।

উষাদির গলা এত সুন্দর! এত সুন্দর! এত স্পষ্ট উচ্চারণ। আমি নেহাতই একটা মেড়া। কিছুই নেই আমার। বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, স্বাস্থ্য নেই, পুরুষকার নেই। কে কোথায় কতদূর এগিয়ে বসে আছে, কিছুই জানি না।

উষাদি এবার গাইলেন·

ওহে রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও,
করুণা-ভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও॥
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥

বেহাগে এমন একটা গান ধরেছেন, কারুর আর নড়বার চড়বার উপায় নেই। বাইরেটা যত অন্ধকার হচ্ছে ভেতরটা তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চিত্রপটে দেবী হাসছেন। চোখের ভুল কিনা জানি না, সাধিকাকে দেখাচ্ছে, আগুনের পুতুল যেন।

তুমি নাহি দিলে দেখা কে তোমারে দেখিতে পায়

চারপাশ কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। পুঁতির জালির মধ্যে দিয়ে তাকালে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছে। কিংবা তারের জালির ওপর বৃষ্টি পড়লে যেমন হয়। এপাশে আমি ওপাশে দৃশ্য। সুর ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমে গেছে। ঝিলঝিল করে ঝুলছে, দুলছে বাতাসে।

গান থেমে গেছে। আর একটি গানের সুর খেলছে হারমোনিয়ামে।

স্থির সাধিকা ধীরে ধীরে একটা আঙুল তুললেন। নিমীলিত দৃষ্টি। সুর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তিনি খুব মৃদু অথচ ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বললেন, একেবারে শেষের সারিতে বসে যিনি পাপ চিন্তা করছেন, তিনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন।

আমি ছাড়া আর কেউ ফিরে তাকালেন না। আমার এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। অহেতুক কৌতূহল মনের মাঝে বসে আছে ফুলঝাড়ু হাতে নিয়ে। থেকে থেকেই খোঁচা মারে, দেখ কি হচ্ছে, আশেপাশে তুচ্ছ তুচ্ছ কি হচ্ছে গোল্লা গোল্লা চোখ বের করে তাকিয়ে দেখ। পড়েছিলুম, বৌদ্ধভিক্ষুরা পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ হাঁটেন। দিনকতক সেই চেষ্টা করতে গিয়ে একদিন কেলে মত, ভুঁসকো একটা ষাঁড়ের পিঠে উঠে পড়েছিলুম। ষাঁড়টা পথের পাশে শুয়েছিল। বুদ্ধদেবের কৃপায় রক্ষে গিয়েছিলুম। সাধনার যুগ কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে!

শেষ সারি থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক মাথা নিচু করে উঠে গেলেন। আশ্চর্য, আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর হল না। সাধিকাই বা কিভাবে তাঁর মনের কথা পড়ে ফেললেন

সাধন জগতের রহস্য সাধক ছাড়া বুঝবে কে !

পদ্মফুলে এতক্ষণ কোনও সুবাস ছিল না। সাধারণত থাকেও না। হঠাৎ প্রচণ্ড সুবাস ছড়াতে লাগল। সাধিকা আপনমনে মৃদু হাসলেন।

ঊষাদি হারমোনিয়ামে সুর তুলতেই, তিনি আবার আঙুল তুললেন। সুর বন্ধ হল। তিনি মৃদু সুরে বললেন, ওই ছেলেটিকে একটা গান গাইতে বল।

আমি গান গাইব ! গলা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

তিনি বললেন, কোনও ভয় নেই। হারমোনিয়াম টেনে নাও।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, মনের ওপর আমার আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মন্ত্রে না হোক অন্য কিছুতে বশীভূত। মাতামহের কাছে শেখা সেই গানটি চোখ কান বুজিয়ে ধরে ফেললুম,

বিফল জনম, বিফল জীবন
জীবনের জীবনে না হেরে।
আমি খুঁজি সব ঠাঁই
কোথা তাবে পাই,
কে হরে নিল মম মন চোরে ॥

একেবারে পুরো টপ্পা, ভৈববীতে বসান। কে বলেছে ভৈরবী সকাল ছাড়া গাওয়া যায় না। রাতেও ত দেখছি বেশ জমে। চোখ বুজিয়েই গাইছি। চাইলেই লজ্জা এসে যাবে। হারমোনিয়ামে হাত ফসকাবে আব বেসুরে গলা খেলবে। একবাব ন্যাজে-গোবরে হলে, সে ন্যাজ আর নাড়ান যাবে না। মাঝে মাঝে চোখ পিট পিট কবে শ্রোতাদেব মুখ দেখে নিচ্ছি। না, কারুর মুখে ব্যঙ্গের রেখা পড়েনি। জয় ঠাকুর, উতবে দাও। বিশ্বাসে কি না হয় ! মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

গান শেষ করে ভয়ে ভযে চোখ মেলে তাকালুম। সাধিকা স্থির, অচঞ্চল। ধ্যানস্থ। সারা ঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ তিনি তাকালেন। এমন চোখ আমি কখনও দেখি নি। এই দৃষ্টিতে হিংস্র বাঘকেও বশীভূত করে ফেলা যায়। এক লক্ষ মানুষকে স্থির করে রাখা যায়। আমি যদি অমন দৃষ্টি পেতুম !

সাধিকা আমাব দিকে তাকিয়ে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

দূরত্ব বেশি না, কার্পেটের ওপর দিয়ে হামা টেনে বেড়ালের মত সামনে গিয়ে থাবা গেড়ে বসলুম। গোলাপেব গন্ধ বেরোচ্ছে। যে আঙুল তুলে তিনি নির্দেশ দেন, সেই আঙুলটি দুই ভুরুর মাঝে কপালে রেখে বললেন, এইখানে, এইখানে, এইখানে।

আমাব মনে হল, একটা বরফের ছুরি আমাব কপাল ভেদ করে চলে গেল। একটা শীতল অনুভূতিতে মস্তিষ্ক ধীবে ধীবে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। স্থান, কাল, পাত্র সব হারিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে আছি তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এতক্ষণ যা দেখছিলুম তা নয়, অন্য কিছু, অনা এক জগৎ। জ্যোৎস্নার মত নীল আলো, গাছেব পাতা যেন রুপোর তবক। অগাধ জলাশয় যেন তরল কাচ।

তিনি ধীবে ধীরে বলতে লাগলেন, মা বল, মা বল, মা বল।

আমি মা বলছি, আর যতবার বলছি, চোখের সামনে একটি করে সোনার কদম ফুল ফুটে উঠছে।

জোবে নিঃশ্বাস নে, খুব জোরে। মনে কর, প্রাণবায়ু মেরুদণ্ড দিয়ে পিঠ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে মাথার দিকে। সেখানে একটি সোনাব কমল ফুটে আছে। নিঃশ্বাস জোরে ফেল। মনে কর এক ঝলক কালো বাতাস বেবিয়ে যাচ্ছে।

মা বল, মা বল, মা বল।

সাধিকা নিজেই গাইতে লাগলেন। তেমন সুব, তেমন উচ্চারণ সহসা শোনা যায় না।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।

হৃদয়ং মধুবং গমনং মধুরং মধুবাধিপতেরখিলং মধুবম ॥

প্রবীরদার হাতে কাঠখত্তাল, ভক্তদের হাতে খঞ্জনি। প্রত্যেক চরণের শেষ লাইনটি সকলে সমস্বরে গেয়ে গেয়ে উঠছেন : চলিতং মধুবং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

সুরে আর ছন্দে আমাদের শরীর দুলে দুলে উঠছে। কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসছেন।

গীতং মধুবং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্

ক্রমে সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন, দক্ষিণে বামে দুলতে দুলতে গাইতে লাগলেন, সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

এক একটি চরণ ঘুরে ঘুবে আসছে, করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।

আমি কিন্তু থেবড়েই বসে আছি। ভক্তেরা যখন গাইছেন, সাধিকা তখন কানের কাছে মুখ এনে বলছেন, মা বল, মা বল। আমার ভুরুর মাঝখানে বৃত্তকারে আলোর ঢেউ খেলছে। ছোট, ক্রমশ বড় হতে হতে অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক একটি বৃত্তের এক এক রঙ। রামধনুর মত পর পর সাজান।

ঢং ঢং করে আটটা বাজল। চিত্রপটের দু'পাশে মোমবাতির মত আলো দুটি ছাড়া ঘরের সব আলো একে একে নিবে গেল। সংগীত থেমে গেল। চারপাশে অখণ্ড নীরবতা। অগাধ জলে ডুবে বসে থাকার মত অনুভূতি।

উষাদি ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন, চলো, এবার বাড়ি চল।

সাধিকা বললেন, দাঁড়াও। বুকের কাছে জামার বোতাম খোল।

নেশাচ্ছন্নের মত বোতাম খুললুম। তিনি কড়ে আঙুল দিয়ে একটি ব এঁকে, তিনবার ফুঁ দিলেন।

যাও, তোমার হবে। উষা!

মা!

তুমি আজ এত চঞ্চল কেন?

কই না তো!

আমি যে দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমরা প্রসাদ নাও।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, তোর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে ছ'বছর পরে, তার আগে নয়, একটা বীজ ফেলে রাখলুম। অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে মহীরুহ। তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলুম।

নষ্ট করে দিলেন?

হ্যাঁ বাবা। সংসার-টংসার তোমার দ্বারা হবে না। চেষ্টাও কোর না। বড় চাকরি, গোলদারি ব্যবসা, ধন, ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই পড়ে থাকবে তোমার এলাকার বাইরে। তবে আনন্দে থাকবে, বড আনন্দে। ভরপুর আনন্দ। কেন এমন করলুম?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যে মাটিতে যা হবে তাই তো করতে হবে। এখানে এলি কেন?

তা তো জানি না মা!

আসতে হবে বলে।

তা হলে ছ'বছর পরে কেন দেখা হবে? কেন তার আগে হবে না?

একটু ঘুরে ফিরে আয়, জগৎটাকে একটু দেখেশুনে বাজিয়ে নে। ডাব ঝুনো না হলে তার আঁশ ছাড়ান যায় না। দেয়ালে মাথা না ঠুকলে মাথা শক্ত হয় না, খালি পায়ে না হাঁটলে পায়ের তলা শক্ত হয় না। আঙুলে কড়া না পড়লে সেতার বাজান যায় না। আয়, আয়, জয়ী হয়ে ফিরে আয়।

আমি কি যুদ্ধে চলেছি মা?

তুই সাঁতরে একটা নদী পার হবি। জলে হাঙর আর কামট। ওপার থেকে এপারে আয় অক্ষত শরীরে। ছ'বছর সময়।

তখন আপনি থাকবেন?

তিনি জানেন!

তিনি কে?

যিনি নিজে ধরা না দিলে ধরা যায় না, যিনি নিজে দেখা না দিলে দেখা যায় না। তাই যোগী ধ্যান

ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি। যে জানে সে জানে, যে দেখে সে দেখে।

রিকশা করে আবার আমরা ফিরে এলুম প্রবীরদার বাড়িতে। এইবার বেশ ভয় ভয় করছে। রাত ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আজ বরাতে নির্ঘাত তিরস্কার।

প্রবীরদা, আর রাত করিয়ে দেবেন না।

উষাদি বললেন, আবার আসবি তো?

খুব ইচ্ছে করবে।

তা হলে আসবি। তোকে আমি গান শেখাব।

প্রবীরদা বললেন, আমরা একটা গানের দল করব।

উষাদি বললেন, দাঁড়া, তোকে এক শিশি আমের মোরব্বা দি। দুপুরে খাবি।

ট্রাম চলেছে ঠ্যাং ঠ্যাং করে, ঘণ্টা বাজিয়ে। আমি জানলার ধারে, প্রবীরদা আমার পাশে। কলকাতার রাতের নেশা বেশ জমে উঠেছে। একটি মেয়ে বসে আছে, খোঁপায় গোড়ের মালা। বেলফুলের সুবাসে ট্রামের মন কেমন করছে।

সামনের সিটে দু'হাঁটুর ঠেকনা দিয়ে, শরীরটাকে পেছনে ঠেলে প্রবীরদা বেশ আরামে বসে ছিলেন। ট্রাম একবার থেমে যেই চলতে শুরু করেছে, হাঁটু খুলে প্রবীরদার পা দুটো ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। চটিটা ব্যাংগুলির মত ছিটকে লাফিয়ে উঠে ডিগবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে গেল।

প্রবীরদা সামনে টাল খেয়ে ঝুঁকে পড়লেন। সামনের আসনে কপাল ঠুকে গেল। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, বাপস, পৃথিবীর কোনও কিছুই কি সহজ নয়?

সামনের আসনের ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কি করছেন মশাই, কুস্তি নাকি?

ফুলেল মহিলা কুক কুক করে হেসে উঠলেন।

প্রবীরদা ফিস ফিস করে বললেন, কান মলে দিতে ইচ্ছে করছে।

কার? ওই মহিলার?

নারে বাবা, আমার নিজের। নিজের দোষেই বেইজ্জত। কপালটা দ্যাখ ত?

একটু লাল হয়েছে।

এ কপাল খেঁতো হবার জন্যেই জন্মেছে। যাক, তোর শরীর কেমন লাগছে? ঘোর কেটেছে?

তা কেটেছে, তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে। বড়কে ছোট দেখছি, ছোটকে বড়।

সে আবার কি? চোখ খারাপ হয়ে গেল নাকি?

না না, চোখের ব্যাপার নয়। এ হল ভেতরের ব্যাপার। যেমন ধরুন, একেবারে সামনের আসনে ওই যে ভদ্রলোক বসে আছেন, বিশাল চেহারা, আসলে উনি খুব ক্ষুদ্র। জোরে একটা ধমক দিলে ঘাবড়ে যাবেন।

পরীক্ষা করে আসব?

যাঃ, লোকে আপনাকে পাগল ভাববে। আবার ওই যে মেয়েটি, কুঁক কুঁক করল, ও একেবারে শিশু।

তোর এ রকম কেন হচ্ছে বল ত?

তা জানি না। আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে।

সেটা আবার কি?

সকলের ভেতর দেখতে পাচ্ছি।

মানে সকলকে উলঙ্গ দেখছিস?

না গো, মন দেখতে পাচ্ছি। যেমন আমাদের সামনের আসনের ভদ্রলোক একটা অন্যায় কাজে চলেছেন।

কি হবে?

কিছুই হবে না। কাজটা করে আসবেন।

আমাব মন দেখতে পাচ্ছিস ?

হ্যাঁ, আপনি ওই মেয়েটিব কথা ভাবছেন।

ওঃ ঠিক বলেছিস। তোব সামনে দাঁড়াতে ভয় করছে রে।

আর ওই মেয়েটিও আপনাব কথা ভাবছে।

মরেছে, চল, তা হলে নেমে পড়ি।

দবকার নেই। হরেক রকম মনেব মানুষ চারপাশে ঘুবছে, ঘুরবে

হ্যাঁরে, আমার ভেতর পাপ আছে ?

না, হুজুগ আছে।

যাক বাবা খুব বাঁচান বাঁচিয়েছিস। তোব এই শক্তিটা কবে কাটবে ?

ওই মা জানেন।

আমাদেব পাড়ায় যখন ঢুকলুম, তখন ন'টা বেজে গেছে। চার পাশ কেমন যেন থমথমে। কিছু একটা হয়েছে। দোকানে দোকানে জটলা। দীনুর নামটা কানে আসছে। দীনু আবাব কিছু করল না কি ?

পিতৃদেব গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসে আছেন। পাশে একটি চেয়াবে প্রফুল্লকাকা। সিঁড়িব মুখে দাঁড়িয়ে প্রবীরদা ফিস ফিস কবে বলছেন, তুমি আগে।

আমি বলছি, আপনি আগে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কাকীমা ডালে লঙ্কা ফোড়ন দিলেন, ছ্যাঁ কবে। সমস্ত ঝাঁঝ আমাদেব নাকে। কোবাসে দুটি সশব্দ হাঁচি। প্রফুল্লকাকা লাফিয়ে উঠলেন, কে, কে ? কে ওখানে ?

লেতা হুঁ মকতব-এ গম-এ দিল-মেঁ সবক হুনূজ্
লেকিন য়েহী কেহ্ 'রফ্‌ৎ' গয়া অওর 'বুদ' থা ॥

আত্মপ্রকাশ বলে একটা কথা আছে। হাঁচিতে আমাদেব আত্মপ্রকাশ হল। দু'জনে সিঁড়ি দিযে উঠতে উঠতে বললুম, আমবা।

আমার ভয় পাবার কাবণ আছে। প্রবীবদা কেন যে ভয় পাচ্ছেন এত ?

প্রবীরদা সোজা টর্পেডোব মত পিতৃদেবেব পায়েব ওপব পড়লেন। প্রফুল্লকাকা পিতাব হযে বলতে লাগলেন, এসো বাবা, এসো, দীর্ঘজীবী হও, শতায়ু হও। চটাস করে নিজেব পায়ে একটা চাঁটা মেরে বললেন, বড় মশা হয়েছে হে। ম্যালেবিয়া না হয়।

পিতৃদেব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কে ?

আজ্ঞে, আমি আপনার শিষ্য।

কবে থেকে এ অবস্থা হল ?

প্রবীরদা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আজ্ঞে কি অবস্থা।

এই মস্তিষ্ক বিকৃতি, এই উন্মাদ অবস্থা।

আজ্ঞে, আমি তো উন্মাদ নই। আমাদেব পাশের বাড়িতে এক পাগলী আছে। ওই যে ওর কপালে ইট মেরেছে।

তার মানে ?

পিতা গর্জন করে উঠলেন। প্রবীরদার কি কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। দুম করে এই কথাটা বলা কি উচিত হল !

তুমি তাহলে তোমাব মামার সঙ্গে সিনেমাপাড়ায় যাওনি !

আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

তা হলে ?

মামা অদৃশ্য হলেন।

কেন ? সে কি পি সি সরকারের মত ম্যাজিসিয়ান হয়েছে নাকি ? দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল !

আজ্ঞে না, তিনি আমাদের ফেলে রেখে কোন এক বড়লোকের বাড়ি মার্বেল পাথর খুলতে চলে গেলেন।

সে আবার কি ? সকালে ছিল মিউজিক ডিরেকটার, বিকেলে রাজমিস্ত্রী।

প্রফুল্লকাকা ফোড়ন কাটলেন, কত রঙ্গ জানো যাদু, কত রঙ্গ জানো, সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়। প্রবীরদা আবার বেফাঁস বলে ফেললেন, আজ্ঞে না, তা নয়, ওই মার্বেল পাথর বেচে বাঈজীদের পাওনা মেটাবে।

সে কি ? এত অধঃপতন। বলে গেল সিনেমা করছি, চলে গেল বাঈজী বাড়ি ?

প্রফুল্লকাকা বললেন, বয়েসের দোষ।

প্রবীরদা বললেন, আমাদের বলাটা ঠিক হচ্ছে না, তাই আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

তুমি কে বল তো। তোমার পরিচয়টা আগে জানা দরকার।

আমি জয়ের ছাত্রজীবনের বন্ধু।

প্রফুল্লকাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তার মানে তবলচি।

আজ্ঞে না, তবলচি নই। চিত্রশিল্পী। গান লিখি। তেমন গাইতে পারি না।

প্রফুল্লকাকা বললেন, রোজ সকালে ভাল করে গলা সাধো। গান কি মুখের কথা। বিখ্যাত গাইয়ে ওমপ্রকাশ শর্মা কি করতেন জানো ? রোজ ভোরবেলা কৃষ্ণা নদীর একগলা জলে···

পিতা বললেন, ভূগোলে তুই বড় কাঁচা প্রফুল্ল, উত্তরভারতে কৃষ্ণা আসবে কি করে ! গঙ্গা নদী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, গঙ্গানদীতে আরলি মর্নিং-এ, একগলা জলে দাঁড়িয়ে রেগুলার গলা সাধতেন, এ তানা যোবানা পবমানানা।

পিতা হাত তুলে বললেন, থামো, বড় বেলাইনে চলে যাচ্ছ। তুমি তাহলে জয়ের বন্ধু।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার ছেলেকে কোথায় পেলে ?

ওই যে, বিডন স্ট্রিটের মুখে জয়ের গাড়ি একজনকে চাপা দেবার জোগাড় করেছিল।

বহুত আচ্ছা।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন তোমাকে যেখানে সেখানে যেতে দিই না দেখেছ ?

প্রবীরদা বললেন, আজ্ঞে হুলো বেড়াল আর উঠতি বয়েসের ছেলেকে ক'দিন ধরে রাখবেন ?

থামো, তোমাকে আর মোড়লি করতে হবে না। তোমার ছেলে আছে ?

আজ্ঞে না, আমিই তো ছেলে।

ছেলে কি করে মানুষ করতে হয় আমাকে নাই বা শেখাতে এলে।

আজ্ঞে, অন্যায় হয়ে গেছে।

সেই চাপা পড়া লোকটি আছে না গেছে ?

আছে। চাপা পড়েনি। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়েছিল। খুব গোলমাল হতে পারত। আমার পাড়া ত, সব ঠাণ্ডা করে দিলুম, তারপর আমিও গেলুম ওদের সঙ্গে স্টুডিও পাড়াতে। আপনার ছেলের আজ দিব্যজ্ঞান হয়েছে।

কোথায় ? বাঈজী পাড়ায় ?

প্রফুল্লকাকা বললেন, নাচ দেখলে ? কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ ? অখাদ্য ভক্ষণ করেছ ? যদি করে থাক, আগে স্নান করে নাও।

পিতা বললেন, প্রফুল্ল, আমার মনে হয়, তোমার এখন নিচে যাওয়াই ভাল।

কেন বলো তো, কেন বলো তো ? আমি তো আজ আর কাদকাটা গোঁপ্ত পরে আসিনি। এই দ্যাখো ফতুয়া পরে এসেছি।

এলে কি হবে ? তোমার অতীত দুধের মত উতলে উঠছে। তুমি না কোন বাঈজীর সঙ্গে তবলা বাজাতে ?

বাজাতে মানে ? এখনও বাজাই, বিখ্যাত কমলী বাঈ।

তা হলে তুমি অবশ্যই নিচে যাবে।

এখানে তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মত বসে আছি। কেমন ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে !

নাই বা কথা বাড়ালে। জানই তো আমার মেজাজ বিশেষ সুবিধার নয়।

প্রফুল্লকাকা উঠে পড়লেন। ফতুয়ার পকেটে দেশলাই আর বিড়ির কৌটো শব্দ করে উঠল।

প্রবীরদা বললেন, আজ্ঞে বাঈজী স্তান নয়, দিব্য স্তান। আমরা আজ দু'জনে জয়ামাতার কাছে গিয়েছিলুম। আমার বোন উষাও গিয়েছিল। সে খুব ভালো গান গায় তো !

তিনি কার শিষ্যা ?

আমার ঠিক জানা নেই। তবে সাংঘাতিক শক্তি। পিণ্টুকে আজ চৈতন্য দিয়েছেন। একদিনেই অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। বড় ভাগ্যবান ছেলে। সামান্য বিভূতিও পেয়েছে। মানুষের ভেতর দেখতে পাচ্ছে।

তাই নাকি ? নিজের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ? কি হে পাচ্ছ ?

প্রবীরদার মত বোকা মানুষ দেখা যায় না। কার কাছে কি কথা বলছেন ! নিজের ভেতর যেদিন দেখতে পাব সেদিন কি আর সংসারে থাকব। ছার এ সংসার বলে বেরিয়ে পড়ব। আজ সেই অনন্তের সিংহদুয়ারের চৌকাঠ থেকে ফিরে এসেছি। এক ঝলক দেখেছি, এপারের ওপারে কি আছে। সন্তমা আমাকে ভবিষ্যৎ দেখিয়েছিলেন, ইনি আমাকে অনন্ত দেখিয়ে দুয়ারটি বন্ধ করে দিলেন। চাবি আমার কাছে নেই।

পিতা প্রবীরদাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি কি জন্যে এসেছ ?

ঈশ্বরের সন্ধানে।

ঈশ্বর ! তিনি কে ? কোথায় তাঁকে পাওয়া যায় ?

অসহায়ের মত, পড়া না পারা ছাত্রের মত প্রবীরদা বললেন, আমি তো জানি না।

কেউ কি জানেন ?

অনেকে যে বলেন !

বিকারের রোগীও তো অনেক কিছু বলে ! তোমার কি ভোগ শেষ হয়েছে ?

কি ভোগ ?

দুর্ভোগ।

আজ্ঞে সে তো সেই তিন বছর বয়েস থেকে ভুগেই চলেছি।

আসক্তি গেছে ?

কিসের আসক্তি ?

কামিনী কাঞ্চন।

আমার নেই

মিথ্যেবাদী, তুমি মিথ্যেবাদী, ড্যাম লায়ার। জগৎ যাতে লাট খাচ্ছে, তুমি তার বাইরে ? তা হলে তুমি কেন বাপু ঈশ্বর খুঁজছ ! তুমিই তো ঈশ্বর।

আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। আমার ভেতরটা ভীষণ ছটফট করে।

সেটা তোমার কামনা। তোমার ভেতরটা পুড়ছে। অঙ্ক জানো ?

সামান্য।

তা হলে আমার কাছে আসা-যাওয়া করো। ঈশ্বর হলেন গণিত, ঈশ্বর বিজ্ঞান। কীর্তন নয়, নাক

টেপা নয়, উপবাস নয়, সন্ন্যাস নয়, সাধক নয়, সাধিকা নয়, ঈশ্বর হলেন কর্ম, ঈশ্বর হলেন পারফেকসান।

আমি আপনার বড় ছেলে।

কেন ?

আপনি আদর্শ পিতা, তাই।

হা হা করে পিতৃদেব হেসেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।আমি হাসছি, এ কি আমি হাসছি ! জানো আজ আমার কি হয়েছে, আমার পুত্রোপম ছাত্র মারা গেছে। তুমি জানো আজ কি সর্বনাশ হয়েছে।

কি হয়েছে ?

পিতার গলা আবেগে রুদ্ধ, দীনু মারা গেছে।

সে কি ?

হ্যাঁ, কে বলেছে ঈশ্বর আছে। ড্যাম লায়ার, চিট, এই কি ঈশ্বরের পৃথিবী, আই স্ট্যাম্প অন ইট, আই কিক দিস আর্থ, দিস ডাস্ট, ইটস লজ অ্যাণ্ড বাইলজ, এ ক্রুয়েল, আননোন ক্রিয়েটার, ফিযারড অ্যাণ্ড রেসপেকটেড উইদাওট অ্যানি রিজন।

দীনু মারা গেছে। এই তো সেদিন দীনু বেঁচে ছিল। সুস্থ, সবল, প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগে। বিশ্বাস করা যায় সে মারা গেছে ! মৃত্যু এত সহজ।

কি ভাবে মারা গেল ?

নিয়তি। মানুষের নিয়তি। এর মাঝে কবে ও যেন মোটর সাইকেলে দুর্গাপুর গিয়েছিল। ওর সেই বন্ধু সুখেনের কাছে। ফেরার পথে বর্ধমানের কাছে জিটি রোডে দুর্ঘটনা। ছিটকে পথের পাশে মাঠে গিয়ে পড়েছিল। মাথাটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। বর্ধমান পুলিস ফোন করে জানিয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। দীনুর বাবা এখন বিলেতে। বাড়িতে এখন কেউ নেই। কে নিয়ে আসবে মৃতদেহ।

আমি একবার যাই।

আপনি এখনও ভাল করে হাঁটতে পারছেন না, আপনি কোথায় যাবেন? আমি যাচ্ছি।

তুমি ! তুমি কি কিছু করতে পারবে ! তুমি তো নিজেকেই সামলাতে পারো না।

চেষ্টা করে দেখি। হয়তো পারবো।

প্রবাবদা বললেন, ছেলেটি কে ?

আমার বন্ধু, বাবার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র।

চলো, চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

দীনুদের বাড়িটাকে বাগানবাড়িই বলা চলে। সিংহ দরজার দুপাশে থাবা গেড়ে বসে আছে দুটো সিংহ। সারা বাড়ি এই সেদিন রঙ করা হয়েছে। সাদা সিংহ আলো-অন্ধকারে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতায় হাসছে। যেন এইমাত্র দীনুকে মেরে এসে বিশ্রামে বসেছে। দুপাশে বাগান। দু একটা স্ট্যাচু আছে। সামনেই গাড়ি বারান্দা। মৃদু আলোয় স্বপ্ন মায়া খেলছে।

বিশাল বৈঠকখানা। বার্মা কাঠের ঝকঝকে দরজার দুটো পাল্লা দুপাশে হাটখোলা। কিছু নেই, বাধা দেবার কোনও ক্ষমতা কারুরই নেই। সব কিছু এ সংসারে বড়ই অবারিত। দরজা যত বড়ই হোক, যে যাবে, সে যাবে।

ঘরের সব ক'টা ঝাড় জ্বলছে। বিশাল বিশাল সোফায় এ পাড়ার অনেক গণ্যমান্য মানুষ বসে আছেন। গাড়িবারান্দার একপাশে কালো রঙের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। পেট্রোলের মৃদু গন্ধ। গাড়িটা মনে হয় দীনুর মেসোর। কলকাতা পুলিসের দুটো গাড়ি আমি চিনি। একটা নীল আর একটার রঙ চকোলেট।

ভেতরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের দেখলেই মনে হতে পারে এ বাড়ির কোনও উৎসবে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছেন। একটা ব্যাচ বসেছে। উঠলেই এঁদের ডাক পড়বে। অনেকে আবার সিগারেট ধরিয়েছেন। মৃদু মৃদু টান মারছেন। অনেকের চোখ বেশ ঘুম ঘুম। বহুক্ষণ বসে থাকার ক্লান্তি।

প্রবীরদা বললেন, এঁরা যে খুব বড়লোক গো। এখানে আমরা কি করব ?

সত্যিই তাই। পিতৃদেব দূর থেকে বুঝতে পারেননি। তিনি এলে বড় অস্বস্তি পেতেন। দীনুর মাকে আমি দু' একবার সামনাসামনি দেখেছি। বেশ অহঙ্কারী। দুই দাদা বাইরে থাকেন। কাল তাঁরা নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। আজও এসে পড়তে পারেন। দিল্লি আর বম্বে প্লেনে বর্ধমানের চেয়েও কাছে।

প্রবীরদা বললেন, চলো, সরে পড়ি।

হ্যাঁ, তাই চলুন। বড়লোককে বড়লোকরাই সাহায্য করতে পারেন। এখানে আমাদের বোকাবোকা লাগছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি। ঝাউগাছের অন্ধকার থেকে ভারি গলায় কে যেন প্রশ্ন করলেন, কি চাই ?

সিগারেটের আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে বললুম, কিছু চাই না।

মজা দেখতে এসেছো ?

আজ্ঞে না, দীনু আমার বন্ধু ছিল।

অ, বন্ধু ছিল, যত র‍্যাজাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। যাও, সরে পড়।

গেটের কাছে এসে প্রবীরদা জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে বল ত ?

মনে হয় এ পরিবারের কোনও হিতৈষী।

বাব্বা, বিপদেও মানুষের অহঙ্কার যায় না।

রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। মন ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। দীনু আর দীনুর পিতা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। দীনুর মা বিরাট বড়লোকের মেয়ে। তাঁর কাছাকাছি একবার যেতে পারলে হত। কিন্তু কি করে যাই।

প্রবীরদা বললেন, আমি তা হলে যাই। আর একদিন আসব। তোমার বাবা আজ খুবই চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। পারো তো তুমি একবার কাল এসো না। অনেক কথা আছে। কাজের কথা।

চেষ্টা করব, যদি ছাড়া পাই।

ধুলো উড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। পেছনের আসনে কে বসে ? প্রবীরদা ঠিক দেখেছেন, বললেন, জয় না, মরেছে, আমাদের খুঁজতে এসেছে।

গাড়ির ন্যাজ তখনও দেখা যাচ্ছে। রাস্তার বাঁক ঘুরছে। প্রবীরদা, জয় জয় বলে ছুটতে আরম্ভ করলেন। রাস্তার পাশে একটা নেড়ি নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ছিল। প্রবীরদার দৌড় দেখে তারও খুব ছুটতে ইচ্ছে করল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পেছন পেছন ছুটলো, ঘেউ ঘেউ করে।

গাড়ির পেছনে কেউ ওভাবে ছুটে পারে ? সামনের বাঁক ঘুরে গাড়ি তো সোজা চলে যাবে। পরিষ্কার ফাঁকা রাস্তা। মাঝখান থেকে কুকুরের কামড় না খান।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। মাতুল ওপরে উঠেছেন। প্রবীরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন বিষণ্ণ বদনে। প্রফুল্লকাকা নিচের তলায় দড়ি পাকাচ্ছেন। কাকীমা একটা দিক ধরে আছেন। পাক যত পেকে উঠছে কাকা কেবলই সাবধান করছেন, দেখো ছেড়ে দিও না যেন, ছেড়ে দিও না সুন্দরী।

প্রবীরদা বললেন, ধরতে পারলুম না, ওপরে উঠে গেল।

গেছেন, যান না, তাতে আমাদের কি ?

আরে বুঝছ না কেন ? ধরতে পারলে তোমার বকুনিটা একটু কম হত।

আমি বকুনি প্রুফ। আমার জন্যে ভাববেন না। চলুন ওপরে চলুন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পাকের টানে কাকীমা দড়ি ফসকেছেন। কাকা লাফাচ্ছেন, আরে মাগী, সবই কি তোর ফসকা গেরো ! মারবো মুখে জুতোর বাড়ি। খাচ্ছে-দাচ্ছে গতর বাগাচ্ছে, কুচবিহারের মহারানী।

কাকীমা বলছেন, তুমি টানলে কেন, না বলে ?

ওরে আমার কুইন ভিক্টোরিয়ারে, বলে টানতে হবে, বলে টানতে হবে। তখন থেকে আমি জপে যাচ্ছি, ওরে ছাড়িস নি, ওরে ছাড়িস নি।

স্বামী-স্ত্রীর সোহাগ দেখে প্রবীরদা হাঁ হয়ে গেছেন। দাম্পত্য জীবনের এক চাকলা দড়ির পাকে পাকে ক্রমশই রসস্থ হচ্ছে। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, এঁরা কারা?

পরে বলব, এখন ওপরে চলুন।

পিতার সামনে একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে মাতুল বসে আছেন। আমরা দুজনে চোরের মত, ন্যাজ গুটোনো দুটো কুকুরের মত পায়ে পায়ে পাশে সরছি। জানালার পাশে দাঁড়াতে পারলে, রাস্তা দেখা যাবে। জীবনের মিছিল চলেছে যেখানে। বকুনি খেলেও তেমন দুঃসহ লাগবে না। বাইরে কিছু উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

মাতুল কিন্তু বকলেন না, শান্তগলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখে এলে? ডেড বডি আনার ব্যবস্থা হয়েছে?

ঠিক বোঝা গেল না।

কেন?

বহু বড় বড় লোক এসেছেন। দীনুর মেসোমশাই এসেছেন, যিনি লালবাজারে আছেন।

যাক, তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই।

পিতা হাসলেন শব্দ করে। মুখে আলোর ছায়া পড়েছে। মাতুলের কথার উত্তরে বললেন, বেশ বলেছ, আর কোনও চিন্তা নেই। মৃত এবার ফিরে আসবে মায়ের কোলে।

মাতুল বললেন, তোমরা খুব অন্যায় করেছো। আমাকে না বলে চলে এলে কেন?

প্রবীরদা বললেন, তুমি ছিলে না, তাই ওকে নিয়ে চলে এলুম আমাদের বাড়িতে, সেখান থেকে আমরা গেলুম জয়মাতার কাছে। এটা তুমি স্বীকার করবে জয়, তোমার ওই সিনেমা পাড়ার চেয়ে মহাগিরি আশ্রম ঢের ভাল। ওখানে গেলে মানুষের দিব্যজ্ঞান হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। তবে তোমাদের না দেখে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলুম, আমার একটা দায়িত্ব আছে তো।

তোমার আজকের কাজ সব ঠিক মত হয়েছে তো?

প্রতাপ আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কোন প্রতাপ?

ওই যে আমাদের হাটখোলার প্রতাপ।

আমাদের সেই গড়পারের প্রতাপের কি খবর জয়?

সে এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছে। বাড়িগাড়ি করে ফেলেছে। প্রতাপ আমাকে যা প্যাঁচে ফেলেছে।

পিতা বললেন, সে তো তোমার প্রাণের বন্ধু ছিল হে।

ওই যে, ওই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক এখন কলকাঠি নাড়ছেন। বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ফাইন্যালাইজড। এই সব বিষয়ী মানুষ যেখানে গিয়ে ঢুকবেন সেখান একেবারে জ্বলে পুড়ে যাবে। টানতে টানতে কাছা কোঁচা খুলে ছেড়ে দেবে। প্রতাপ এমন বদলে গেছে, ভাবা যায় না। এক দিকে বাঘা শ্বশুর, আর এক দিকে সুন্দরী স্ত্রী। বেচারার মাথা ঘুরে গেছে। আমার নাম জয়নারায়ণ, আমি যা ধরি তা করে ছাড়ি। বড়লোক হবার জন্যে পৃথিবীতে আসিনি। আলুওয়ালাও বড়লোক হতে পারে। কয়লার গোলা করে আমাদের পাড়ার নন্তুবাবু তিনতলা বাড়ি করেছে। আমি কীটসের ভক্ত। আমার কাছে, আর্ট ফর আর্টস সেক।

নিচে খুব ধুমধাম শব্দ শুরু হয়ে গেছে। মাতুলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ প্রশ্নবোধক। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিচে কি হচ্ছে বলত? মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য?

একসঙ্গে গোটাকতক কাপডিশ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। প্রফুল্লকাকার গলা, বেশ কষকষে করে

ন, মারবো মুখে জুতোর বাড়ি, মারবো মুখে জুতোর বাড়ি। ওরে আমার কুচবিহারের মহারানী।

Death dances like a fire-fly, Life coughs its last laugh in burning pyres.

দশটা বাজতে এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। পাছে দেরি হয়ে যায় সেই ভয়ে অনেক আগে এসে পড়েছি। বেশ ভয় ভয় করছে। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। প্রথম যেদিন দাড়ি গোঁফ কামিয়েছিলুম সেদিন এক রকম মনের অবস্থা হয়েছিল, অদ্ভুত এক বিষণ্ণ অনুভূতি, যাঃ বড় হয়ে গেলুম,

বিদায় শৈশব, বিদায় কৈশোর

স্বপ্ন দেখাব নিশ্চিন্ত দিন শেষ হয়ে গেল'

আব কেউ খোকা বলবে না। বাস বা ট্রামের নারী আসন থেকে ঠেলে তুলে দেবে। কোনও মহিলা বলবেন না, খোকা তুমি আমার কোলে বোস। মলিমাসী বলবেন, পিণ্টু তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোস, আমি একটু সাজগোজ করেনি।

আর আজ মনে হচ্ছে, আমি আমার বহু মূল্যবান স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে এসেছি। আমাব দিন গেল, বাত গেল। পিতার চেয়ে বড হয়ে উঠবে এই বিশাল বাড়ির কর্মদাতা প্রভুরা। প্রভু 'আমি' থেকে হয়ে যাব দাস 'আমি'। মাস গেলে পাঁচশো টাকা। পাঁচশো টাকাও কি এঁরা দেবেন ! এখন মনে হচ্ছে, ইয়ার্কি না কবে, আর একটু ভাল কবে লেখাপডা করলে হত। যদি আই· সি· এস· হতে পারতুম, তাহলে ওরই মধ্যে একটু বড দাস হতে পারতুম। গ্রেজ ইন থেকে যদি ব্যারিস্টাব হয়ে আসতে পাবতুম, কিংবা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার। পিতা বহুবার বলেছিলেন। বললে কি হবে, মানুষ যে ভাগ্য নিয়ে আসে। কেউ রাজা হয়, কেউ খাজা।

স্যুটেড বুটেড, টাই পরা এক ভদ্রলোক বাড়িটার দিকে আমার মতই সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছেন। পায়েব জুতো কালির বিজ্ঞাপনের মতই জেল্লা ছাডছে। ইনি যদি চাকরির উমেদার হন, আমার আশা ভবসা খুবই কম। এমন একটা স্মার্ট গাইকে ছেড়ে কে আর এই দিশী গাইকে বেছে নেবে ! এ তো আব খাটাল নয় ! বড় ঘাবড়ে গেলুম। ভদ্রলোক আমার প্রতিযোগী নাও হতে পাবেন। মশা মারার জন্য কেউ এমন কামান দাগতে আসবে না। ভদ্রলোক সিগারেট টানছিলেন। টুকরোটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট গট কবে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাংঘাতিক ডাঁট। চরিত্রে এমন একটা প্রভু প্রভু ভাব কি ভাবে আনা যায় ! খুব মাংস খেলে মনে হয় হতে পারে। বাঘ যেমন বাঘ, ছাগল যেমন ছাগল ;

দেউড়িতে চাপরাস পরা প্রহরী। ভদ্রলোককে দেখে সট্ করে টুল ছেড়ে উঠে সেলাম বাজাল। যাক বাবা ইনি তাহলে আমার প্রতিযোগী নন। অন্য কেউ। বিগ বস্ গোছের কিছু একটা ব্যাপার ! নীল জামা পরা আমার মতই আর এক ন্যালাখ্যাবলা এসেছেন। এঁরা যা মাইনে দেবেন তাতে আমাদের মত এইরকম ঝলঝলে, খলখলে মালই জুটবে। নীল জামা কপালের দু'পাশে পাটিসাপটার মত পেতে চুল আঁচড়েছেন। বেশ গুড বয়, গুড বয় চেহারা হয়েছে। চোখ দুটো বড় বড়। চশমাটা বেশ ভাবিত্তি মানুষের মত। বেশ কাশি হয়েছে। শব্দটাও বিদঘুটে। শুনলে মনে হবে ভেতরে আর কেউ ঢুকে কাশছে।

কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন ?

হ্যাঁ, আপনি ?

আমিও খ্যাঁখ্। কি রকম তৈরি হল, খ্যাঁক্।

কি তৈরী ?

আরে, প্রেপারেশান, ঘ্যাক্ ঘ্যাঁ। ইন্টারভিউয়ের ভ্যাঁচ্ প্রেপারেশান। উঃ মরে গেলুম। দাঁড়ান একটু যষ্টিমধু খাই, ফ্যাঁচাত্, খাবেন নাকি !

না, আমার কিছু হয়নি।

না হলেই খ্যাঁক্ ভাল।

উঃ সর্দি আর কাশিতে ভদ্রলোক নাস্তানাবুদ। ভালই হয়েছে, অনেক মাইনাস পয়েণ্ট। প্রতি ক'

একটা করে হাঁচি বা কাশির পাংচুয়েশানে ইণ্টারভিউয়ে খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না। যাঁরা নেবেন তাঁরা বলবেন, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

দেউড়ির সেই গোঁপদাদা বললে, সামনেই সিঁড়ি, দোতলায় চলে যান।

দোতলায় একটা ঘরের বাইরে লেখা রয়েছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টার। দরজাটা বেশ বাহারি। অর্ধেকটা কাঠ, অর্ধেকটা কাচ। কাচে মিছরির দানার মত আলো আটকে আছে, যেন একটু আগে আলোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘরের বাইরে টানা বারান্দা, এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেছে। গোটা কতক চকচকে বেঞ্চ পাতা। দু'চারজন বসে আছেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখছেন। কটা পদ খালি জানা নেই, প্রার্থী অনেক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বিধাতাই জানেন।

কম্পানির এক কর্মচারী এসে আমাদের হাত থেকে ছোঁ মেরে মেরে ইণ্টারভিউয়ের চিঠিগুলো নিয়ে গেলেন। এইবার নম্বর মিলিয়ে একে একে ডাক আসবে। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে ?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ? স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কি হবে ?

প্রশ্ন করবেন না। যদি জানা থাকে বলুন।

আজ্ঞে জানা নেই। প্রধানমন্ত্রী জানা আছে। স্বাস্থ্য এমন কিছু ইম্পর্ট্যাণ্ট পোর্টফোলিও নয়।

বুঝবেন ঠ্যালা, যখন জিজ্ঞেস করবে। এঁরা ওষুধ-বিষুধ তৈরি করেন, স্বাস্থ্যটাই আগে ধরবেন।

ধরলে বলব জানি না।

আপনি জানেন, তবু বলবেন না। মুখ দেখেই বুঝেছি ভীষণ স্বার্থপর। কাল মাসীর ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল তাই জেনারেল নলেজটা ভাল করে আর একবার দেখা হল না। চাকরিটা পেয়ে গেলে বড় ভাল হত। বাবা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে আজ দেড় বছর পড়ে আছেন।

আমার এ পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি ব্যাকিং আছে ?

আজ্ঞে না।

আমি এত চেষ্টা করলুম একটাও শালা ব্যাকিং যোগাড় করতে পারলুম না। ব্যাকিং ছাড়া চাকরি হয়!

কম্পানির কর্মচারী হাঁকলেন, শেখর সামন্ত।

সেই নীল জামা পরা, কেশো ছেলেটি বলির পাঁঠার মত দরজা ঠেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। এত ভয়ের কি আছে কে জানে। আমরা তো আর সত্যিই পাঁঠা নই যে কাবাব করে খেয়ে নেবে! এখানে না হয় অন্য কোথাও হবে।

সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার এক ফ্যাচাং বের করলেন, আচ্ছা কোন্ পাখি আকাশে ডিম পাড়ে ?

আকাশে ডিম পাড়ে ? লাইফে শুনিনি।

তা শুনবেন কেন ? শুনলে যে আমার একটু সুবিধে হত। তিন তিনটে বোন মাথায় মাথায়, বিয়ে দিতে হবে। আপনার বোন আছে ?

না।

আপনার বাবাকে ধন্যবাদ। ভাই আছে ?

না।

এমন মানুষের পায়ের ধুলো রোজ সকালে উঠে নিতে হয়। মা আছেন ?

না।

তাই বলুন। আমাদের এ বেলা সাতটা পাত, ও বেলা সাতটা পাত। ছাত্র ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে লাইফ হেল হয়ে গেল। আপনার কে কে আছে ?

আমি আর আমার পিতা।

আপনি কেন দাদা চাকরির খোঁজে এসেছেন ?

এ পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন আপনার ব্যাকিং আছে ?

একটু আগেই যে বললুম, নেই।

ও, বলেছিলেন, যাক, তাহলে ফেয়ার কম্পিটিশান হবে।

নীলরতন হালদার, হাঁক পড়ল। শেষ মাথা থেকে বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। জিভ দিয়ে টুকটুক করে ওপর আর নিচের ঠোঁট চেটে নিলেন। নীল জামা পরা ভদ্রলোক একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে আর ঘেঁষলেন না। সোজা চলে গেলেন সিঁড়ির দিকে। এদিকে এলে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করা যেত। যাকগে আমার অত দুশ্চিন্তা নেই। হলে হবে, না হলে হবে না।

হোমা পাখি। যিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি এমন আচমকা চিৎকার করে উঠলেন।

কি হোমা পাখি?

আরে মশাই যে পাখি আকাশে ডিম পাড়ে। কিছুতেই মনে পড়ছিল না। তখন থেকে মনে মনে অ এ অজগর, আ এ আম করতে করতে হএ এসে হদিশ মিলল। হাতি হাতি করতে করতে, হোম হোম সুইট হোম, হাতি, হোম, হোম, হোম, হাতি, পেয়ে গেলুম হোমা। স্মৃতি এমনই জিনিস, না চালালে চলে না।

এসব প্রশ্ন কি ওঁরা করবেন?

করলেই হল। ইন্টারভিউ মানে জামাই ঠকান প্রশ্ন। দাঁড়ান ওই কায়দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীটা বের করে ফেলি। ভদ্রলোক চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

গৌর মল্লিক। আবার পেয়াদার হাঁক। ভদ্রলোকের ধ্যান ভঙ্গ হল। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন।

কি মশাই পেলেন?

না, যা হয় হবে, ভগবানই ভরসা।

ভদ্রলোক বাঘের খাঁচার দিকে গুটি গুটি এগিয়ে গেলেন।

পর পর সাতজন চলে গেলেন। আমার ডাক আর আসেই না। বোঝাই গেছে সব শেষে যাকে ডাকা হয় তার সম্ভাবনা খুবই কম। বেঞ্চ প্রায় ফাঁকা। আমরা আর মাত্র তিনজন, চুপসে বসে আছি। পারের ডাক কখন আসে!

যিনি হাঁকডাক করছিলেন, তিনি জানালেন, এখন লাঞ্চের সময়। আবার এক ঘণ্টা পরে বুলফাইট শুরু হবে। ইচ্ছে করলে আমরাও ঘুরে আসতে পারি। যো হুকুম। জাঁহাপনা।

বেপাড়ার অফিস। অফিস আর কারখানা এক সঙ্গে। বেশ নামী প্রতিষ্ঠান। ওষুধ, সাবান, পেস্ট নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কারখানা পেছন দিকে। বিশাল একটা চিমনি আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। চারপাশের বাতাসে রকম রকম গন্ধ ভাসছে। আশেপাশে তেমন দোকানপাট নেই। বসতবাড়িই বেশি। উচ্চ মধ্যবিত্তের পাড়া। রাস্তায় বেরিয়ে এলে মনেই হবে না চাকরি করতে এসেছি। মনে হবে পাড়া বেড়াতে এসেছি। দোতলা, তিনতলার বারান্দায় মেয়েরা দুপুরের মত গা এলিয়ে দিয়ে গল্প করছেন। দুপুরের গান বাজছে রেডিওতে। এ পাড়ার ডাকসাইটে পুরুষরা এখন এসপ্ল্যানেড, ড্যালহাউসিতে, বড়বাজারে। এখানে মেয়েদের আধিপত্য চলেছে। বারান্দায় বারান্দায় কথা ছোঁড়াছুঁড়ি চলছে। কোনো কোনো বারান্দায় শাড়ির বদলে চুল ঝুলছে। বৃদ্ধরা পুরুষের দলে পড়েন না। মানুষ বৃদ্ধ হইলেই বিড়াল হইয়া যান। এ পাড়ার বৃদ্ধদের সম্বল দেখছি তিনটি। একটি ইজিচেয়ার, একখানি খবরের কাগজ, আর হয় একটি পুতুল-পুতুল নাতি না হয় নাতনী। বাইরের ঘরেই তাঁদের আস্তানা।

মোড়ের মাথায় একটি ঘুম ঘুম মিষ্টির দোকান। নীল কাপড় ঢাকা শো-কেসের আড়ালে সেই থোড়বড়ি খাড়া মিষ্টি। চায়ের দোকান চোখেই পড়ল না। পড়লে এক কাপ চা খাওয়া যেত। ট্যাঁকে তেমন পয়সার জোর নেই যে গোটা কতক রসগোল্লা চালিয়ে দোব। হাঁটতে হাঁটতে একটা নির্জন পার্কে এসে পৌঁছলুম। ভবঘুরে চেহারার দু-একজন চেত্তা খেয়ে এখানে ওখানে পড়ে আছেন। বেশ মজা, কোন কাজকর্ম নেই। আকাঙ্ক্ষা নেই। যা হল, হল। যা হল না হল না। টকটকে গেরুয়া পরে এক

সন্ন্যাসী চলছেন রাজার মত। মাথায় মহারাজদের মত করে বাঁধা গেরুয়া পাগড়ি। দশাসই চেহারা, খাড়া নাক, টানা চোখ, গৌর বর্ণ। রাস্তা কাঁপিয়ে হেঁটে চলেছেন। পোশাকের ধরন দেখে মনে হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে, মৃদু হেসে ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন।

কি দেখছ?

আপনাকে।

প্রণাম করার জন্যে নিচু হতেই হাত ধরে সোজা করে দিলেন, আমি কারুর প্রণাম গ্রহণ করি না।

কেন মহারাজ?

অনেক দেরি আছে রে ভাই। আগে বিশুদ্ধির শেষ ধাপে পৌঁছই তারপর প্রণাম। তুমি কে?

আমি, আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। শুরু হতে দেরি আছে দেখে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি।

অমন অবাক হয়ে কি দেখছিলে?

আমার ভীষণ সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে। হিমালয়ের কোনও এক গুহায়, নির্জনে একা একা।

হিমালয়ে গেছ?

আজ্ঞে না, হরিদ্বারে গেছি, আর একটু এগোতে পারলেই হিমালয়।

দেহে না মনে?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙালে যোগী, গানটা শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি এখন কোথায় ঘুরছি?

এইখানে।

কেন ঘুরছি? কর্ম, কর্ম। ধ্যানের স্বাধীনতা কোথায়! যত দিন শ্বাস প্রশ্বাস তত দিন কর্ম। মনে বৈরাগ্যের বাতিটি জ্বালিয়ে রাখ, হিমালয়কে কলকাতায় নামিয়ে আন। সাধুসঙ্গ করো?

তেমন ভাবে নয়।

শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড়?

মাঝে মধ্যে।

তাহলে শোন, দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দৈবানুগ্রহ হেতুকম। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশ্রয়॥

কিছু বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয় প্রাপ্তি এই তিনটেই সংসারের দুর্লভ। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া হয় না।

বাঃ, খুব সুন্দর। যে কাজে এসেছ জয়ী হও। জীবন, সন্ন্যাস, কোনো কিছু সম্পর্কেই রেডি আইডিয়া রেখো না। পোড়াতে জান?

একটু বুঝিয়ে বলুন।

রসায়নে একটা শব্দ আছে, দহন, কম্বাসন। ধিকি ধিকি একটা আগুন জ্বালাও ভেতরে, বাইরে নয়, ভেতরে হোম। একদিন আশ্রমে এসো, তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখবো।

এইবার একবার প্রণাম করি!

না, প্রণাম নেবার অধিকার আমার জন্মায় নি। যদি কোনও দিন আস, সন্ন্যাসাশ্রমে আমার নামটা মনে রাখো—ধীরানন্দ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মহারাজ পথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন। মনে বেশ একটা বল এসে গেল। ইন্টারভিউ! কিসের ইন্টারভিউ! আমার কে আছে যে চাকরির পরোয়া করব! ইন্টারভিউ না দিলেই বা কি হয়! না, দোবো, একবার পরীক্ষা করে নেব 'আপ সাচ্চা তো জগৎ সাচ্চা' কত সত্য। সৎ, যাকে বলে মজ্জায় মজ্জায় সৎ, সাহসী। হাসি পাচ্ছে, নারকেলের ছোট্ট খোলে সমুদ্রের আলোড়ন। কি কি আছে আমার, কি কি

নেই ? যেতে যেতে হিসেব করি। হিংসে আছে ? হয়তো আছে। ভাই বোন থাকলে বোঝা যেত। উচ্চাকাঙক্ষা আছে ? হয়তো আছে। ক্ষমতা নেই তাই 'দ্রাক্ষা ফল টক' বলে পালিয়ে আসি। ভোগের ইচ্ছে ? কে না ভোগ করতে চায় ? ভোগ না হলে ত্যাগের গর্ব থাকে ! গর্ব ? হয়তো আছে ! নিজেকে বিশ্লেষণ করা কি অতই সহজ !

পলাশ চট্টোপাধ্যায়। নকিব ফুকারে।

যাক, দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমেই আমার নাম ডাকা হল। বুক সামান্য কাঁপল। স্বামী ধীরানন্দের মত ধীর পায়ে আধা কাচের দরজা ঠেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকে পড়লুম। অর্ধচন্দ্রাকার টেবিলে চারজন বসে আছেন দরজার দিকে মুখ করে অর্ধচন্দ্র দেবার জন্যে। ঘরটি বেশ মনোরম। সব অনুষঙ্গই আছে। কার্পেট। ঝকঝকে ফার্নিচার। পেলমেট থেকে ঝোলা ভারি পর্দা। ফুলও আছে। দুর্বল বুকে চেপে বসার মত আবহাওয়া। ঘর বলছে, দাস হবি আয়, দাস হবি আয়। মাঝের আসনে সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ। মাঝখানে সিঁথি। সোনার ফ্রেমের চশমা। দুগ্ধশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবি। কবজিতে সোনার ঘড়ি। সেই স্যুটেড বুটেড ভদ্রলোকও বসে আছেন। মুখ অসম্ভব গম্ভীর। মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছেন। হয়তো আমাকে দেখে। ছাগলের যেমন ভয় থাকে, বাঘেরও তো সেই রকম ভয় থাকতে পারে। টেবিলের এদিক আর ওদিক। ওদিকের ভয়ে এদিক তটস্থ। কারণ ওঁরা দেবেন। ওঁরা না দিলে এদিক পাবে না। কিন্তু এদিক যদি কিছুই না চায়। ছাগল যদি বাঘ হয়ে যায়। বাঘে বাঘে লড়াই। দেখা যাক কি হয়।

ইওর নেম প্লিজ ? স্যুটেডের প্রশ্ন।

তা প্রথম রাতেই বেড়াল কাটা যাক। দু'জনেই বাঙালী, তাহলে কেন এই ইংরিজীতে কেরদানি আমার পালটা প্রশ্ন, ইওর নেম প্লিজ ?

চারজন ভদ্রলোকের মধ্যে তিনজনের মুখ যেন কেমন হয়ে গেল। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে বসে থাকা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখেই কেবল একটু হাসি খেলে গেল। উপভোগের হাসি। টেবিলের কোণে আঙুলের ট্যাপ ট্যাপ শব্দ করলেন।

হরিদাস ব্যানার্জি। ভদ্রলোক কোনও রকমে বললেন।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ ব্যানার্জি, মে আই টেক মাই সিট ?

ইয়েস।

নাও, লেট আস গেট আওয়ারসেলভস ইনট্রোডিউসড। আই অ্যাম পলাশ চ্যাটার্জি, ইওর নেম প্লিজ, দি জেন্টলম্যান সিটিং বাই ইওর সাইড, চিউইং বিটল লিফ।

থলথলে কালো মোটা ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন, আমার নাম, মাই নেম ?

ইয়েস ইওর নেম ?

মি ? মাই নেম ইজ রমেশ সেন।

হোয়াট ইউ আর প্লিজ ?

হোয়াট ?

ইয়েস, হোয়াট ইউ আর প্লিজ ?

আই অ্যাম এ জেন্টলম্যান।

এইবার আমার হাসার পালা। একটু বিলিতি কায়দায় ওয়ারেন হেস্টিংসের মত হাসি। তাড়িয়ে দেবে নিশ্চয়ই। পাগল ছাড়া এরকম বিদঘুটে সাহস কার হবে, ইয়েস, ইও আর এ জেন্টলম্যান, বাট আই আসকড অ্যাবাউট ইওর প্রফেসান, ইওর পজিসান ইন দিস কম্পানি। আমরা সবাই যখন বাঙালী তখন বাঙলা বলতে আপত্তি কিসের ? দেশ তো অনেকদিন হল স্বাধীন হয়েছে। আপনারা করবেটে 'মাই ইণ্ডিয়া' পড়েছেন ?

সেই স্যুটেড ভদ্রলোক বললেন, হি ইজ কোয়াইট হোসটাইল, প্রবেবলি ইনসেন, উই ক্যান টার্ন হিম আউট।

ইয়েস ইউ ক্যান, কিন্তু তার আগে করবেট সাহেবের মন্তব্যটা শুনে নিন, তাহলে আর সায়েব হতে ইচ্ছে করবে না, মাইকেলের মত বাঙালী হয়ে যাবেন। করবেট লিখছেন, ভারতীয়দের ইংরেজী শুনে সায়েবরা ভয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালালেন। ভাবলেন, আর বেশি দিন থাকলে কুইনস ইংলিশের বারোটা বেজে যাবে। কুইট ইণ্ডিয়া টু সেভ আওয়ার ল্যাঙ্গোয়েজ। আচ্ছা, আমি তাহলে আসি, নমস্কার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে তাকালেন, বোসো বোসো। তোমাকে আমি তুমি বলতে পারি ? পারি তো। আমার অনেক বয়স হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি বলতে পারেন।

ইংরিজীর ওপর তোমার এত ছেলেমানুষী রাগ কেন ?

কই, না তো। ইংরিজীর ওপর রাগ নয়, রাগ ইংরেজীয়ানার ওপর।

বাঃ, ছোকরা ভাল বলেছে, তোমরা শুনলে ?

শুনেছি, ওঙ্গ অ্যাটিচিউড বড় ইনসালটিং।

এবার আমার প্রতিবাদের পালা, বাঙলায়, সর্বনামে একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ না করলে অভদ্রতা হয়। আমি তো এখনও চাকরিতে বহাল হইনি, এখনও অপরিচিত, খাস ইংরেজ হলে সেই শব্দই ব্যবহার করতেন, যাতে 'ওঁর' বোঝায়।

তুমি আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট।

বয়েসে ছোট হলেই সম্মানে ছোট হয়ে যায় না, অতএব তুমি নয় আপনি।

স্যুটেড ভদ্রলোক বললেন, এই ভেরি রেসপেক্টেব্‌ল পার্সনটিকে আমি শূন্য দিলুম।

বাকি দু'জন বললেন, আমরাও শূন্য দিলুম।

সৌম্য বৃদ্ধ বললেন, কিসের ভিত্তিতে দিলে ? কোনও প্রশ্নই তো ওকে করা হল না।

প্রশ্নের প্রয়োজন নেই, ওই এঁড়ে স্বভাবের ছেলে কোথাও চাকরি করতে পারবে না। হি ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ মিস ফিট। এ রেবেলিযাস স্পিরিট।

সৌম্য বৃদ্ধ বললেন, তাহলে ওকে আমি পুরো নম্বর দিলুম। মিনমিনে বাঙালী আমি চাই না।

স্যুটেড বললেন, হি ইজ ইনসেন, আনকালচার্ড।

আমি পাগলদের ভীষণ ভালবাসি, নিজে পাগল তো, আর কালচার ? ঈশ্বর ওকে বাঁচিয়েছেন, তোমাদের কালচার ভাগ্যিস রপ্ত করে বসেনি ! তাহলে এঁড়েব সঙ্গে ইংরিজী মিশিয়ে কেলেঙ্কারি করে বসে থাকত। তোমাদের কালচার হল সেরিকালচার। চকচকে রেশমের গুটি ভেতরে কিলবিল পোকা। গরম জলে সেদ্ধ না করলে সিল্ক বেরোবে না।

হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক বললেন, বেশ, এই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে আমাদের আর অপমান করবেন না। আপনিই বাজিয়ে নিন।

হ্যাঁ, আমিই একটু বাজাই, তবে তোমাদের অফিসের কেরানীগিরির জন্যে নয়, আমার ল্যাবরেটরির জন্যে। ছেলেটি যখন সায়েন্স গ্রাজুয়েট তখন একটু তালিম দিলেই কেমিস্ট হতে পারবে। প্রদ্যোতের হাতে ফেলে দিলেই মানুষ করে দেবে। তোমার অ্যানালিসিসের হাতটি কেমন বাবা ?

আজ্ঞে, খুব একটা খারাপ নয়।

শোনো, পিপেট আর ব্যুরেট হল অ্যানালিস্টের দুই সহধর্মিণী, ওই দুটিকে যে কন্ট্রোল করতে পারে তার আর মার নেই, হ্যাঁ তার সঙ্গে চোখও থাকা চাই, সদা জাগ্রত দুটি আঁখি। এই অ্যাপ্লিকেশানটা কি তোমার হাতে লেখা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ, ভারি পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা হে তোমার। দু'পাশে সমান মার্জিন, সমান্তরাল অক্ষরের সারি। ও হে তোমরা দ্যাখো, ছেলেটি কত অরগ্যানাইজড তার প্রমাণ এই দরখাস্ত। তোমরা অমন অভিমানী স্ত্রীলোকের মত মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন ?

আপনার ব্যাপার আপনি বুঝুন।

তা না হয় বুঝলুম, পরে আবার শত্রুতা করবে না তো ? আমার সঙ্গে নয়। আমাকে তোমরা পারবে না। এর সঙ্গে ?

সেই স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক বললেন, শত্রুতা করব কেন ?

কেনর কি কোন জবাব আছে হে। আমরা যে বাঙালী। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। তোমার পরিচয় আমার এই ফাইলে আছে, সেইটাই যথেষ্ট। হরিশঙ্কর কেমন আছে ?

চমকে উঠলুম। মরেছে! ইনিই বোধহয় সেই পিতৃবন্ধু। আজ্ঞে, ভাল আছেন।

বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে। তোমার রক্তে হরিশঙ্কর আছে। ওর কেমিস্ট্রি কেমন চলছে ?

খুব জোর চলছে।

বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে। বাপকো বেটা, সিপাহী কো ঘোড়া, কুছ নেহি হায় তো থোড়া থোড়া।

বিদায়ের সময় সায়েবরা বলেন, গুডবাই, স্যাটেড ভদ্রলোক ছোট্ট একটি চাঁট ছুঁড়লেন, এ আমাদের আর এক দাদাঠাকুর। ডেঁপো দি গ্রেট।

সাংঘাতিক কিছু একটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, মেজাজ খিঁচিয়ে গেছে। এইটুকুই বলতে পারলুম, আশীর্বাদ করুন তাই যেন হতে পারি।

অফিসের বাইরে রাস্তায় পা রেখে মনে হল, বুদ্ধিসুদ্ধি এখনও তেমন পরিপক্ব হয়নি। অকারণে বাহাদুরি দেখাবার লোভ স্বভাবে প্রবল। কোনও প্রয়োজন ছিল না ছেলেমানুষের মত পাকাপাকা কথা বলার। চাকরিটা যদি হয় নিজের কৃতিত্বে হবে না, হবে পিতার পরিচয়ে।

শরীরকে এবার একটু কষ্ট দেওয়া যাক। দক্ষিণ থেকে উত্তরে হেঁটে হেঁটে যত দূর যাওয়া যায় যাওয়া যাক। যখন আর পারব না তখন একটা কিছুতে উঠে পড়ব। বেলা বেশ পড়ে আসছে। লিণ্ডসে স্ট্রিটের কাছে ট্রাফিক সিগন্যালে একটা গাড়ি থেমেছিল, কাছাকাছি আসার আগেই, সবুজ পেয়ে ঝাঁকি মেরে এগিয়ে গেল। মনে হল প্রতাপ রায় চালাচ্ছেন। পেছনে বসে আছেন, দু'জন মহিলা একজন পুরুষ। ঠিকই দেখেছি। মেসোমশাই হবু জামাইকে নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরিয়েছিলেন।

ধুঁকতে ধুঁকতে পাড়ায় ঢুকলুম। শহর পড়ে আছে বহুদূরে। কালীবাড়িতে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। শীতলাতলায় মায়ার পিসী ঠুংঠুং ঘণ্টা নাড়ছে। মায়ার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। কোথাও একটা কিছু হয়েছে। লোক চলেছে নেচে নেচে। কে বললে, দীনু এসেছে।

দীনু আসবে কী করে ? দীনু তো আর আসবে না। দীনুর শরীর এসেছে। ধবধবে সাদা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের দরজা খোলা। বরফের চাঙড়ার ওপর সাদা চাদর ঢাকা মৃতদেহ। ফিন ফিনে নীল কুয়াশায় মৃত্যুর প্রেয়সী-আলিঙ্গন।

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না

ভীষণ মেঘ করেছে। দুপুরে রাত নেমেছে। প্রকৃতি থমকে আছে। বৃষ্টি এলো বলে। ঝাঁক ঝাঁক চিল উড়ছে মন্দিরের মাথায়। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। দিগন্তের এক হাত ওপরে কালো মেঘের পুরু কাঁটি ভাসছে। বছরের প্রথম বড় ধরনের বৃষ্টি আসছে খুব তোড়জোড় করে। একটা চাতক করুণ সুরে ডাকছে—জল দাও, জল দাও।

এমন দিনে একটা কাজই করা চলে, বেশ আয়েস করে শুয়ে শুয়ে বই পড়া। সুখেন নেই যে জ্বালাতে আসবে। দীনু চিরকালের জন্য চলে গেছে। দীনুর পিতা বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। দীনুর সেই খুনী মটোর সাইকেলটার কিচ্ছু হয় নি। আরোহীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে যন্ত্রদানব এখন বেশ বহাল তবিয়তে গ্যারেজের একপাশে দু'পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ কত কি যে রটাতে পারে ! আজকাল মাঝরাতে একটা মটোর সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া যায়। হয় ত থানার অফিসার ইনচার্জ রোঁদে বেরোন। বেরোতেই পারেন। সেইটাই স্বাভাবিক। বিশে পাগলা মুদীর দোকানের রকে শুয়ে থাকে। পাগলাদের কল্পনা শক্তি মনে হয় প্রবল। কেমন রটিয়ে দিয়েছে ! লাল আগুনের মত মটোর সাইকেল চেপে, জ্বলন্ত দীনু ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। সোনার চামরের মত মাথার চুল উড়ছে। টকটকে পেতলের মত গায়ের রঙ। সে তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আওয়াজ শুনে একদিন তাড়াতাড়ি উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখেছিলুম, তবে মটোর সাইকেল আরোহী দীনুকে নয়, এক ঝলক বাতাস চলে গেল, ছেঁড়া কাগজ আর শালপাতা টানতে টানতে।

সকালে যা হয় একটা কিছু বাধলেই চলে। নিচে থেকে প্রফুল্ল কাকীমা একটা না একটা কিছু দিয়ে যান। পিতৃদেব স্পর্শ করেন না। বলেন স্বপাকই বেস্ট পাক। সবটা, একলা আমাকেই সাবড়াতে হয়। রাঁধেন ভাল তবে ঝালের হাতটা একটু বেশি। আজ করেছিলেন নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট। ছোলাটোলা ছিল। বেশ তরিবাদি ব্যাপার। ঝালের চোটে পেট এখনও জ্বলছে।

মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কথাই মনে আসছে। মাতামহ অনেকদিন আসেননি। আজ বিকেলের দিকে একবার খবর নিতে পারলে ভাল হত। আকাশের যা ঘনঘটা আয়োজন, বিকেলের দিকে মেঘমল্লার জলসা শুরু হবেই। মেঘের পাখোয়াজ শুরু হয়ে গেছে।

কনকটা আচ্ছা ছোটলোক। না, কনকের আর দোষ কি ! মেসোমশাই যেমন চালাবেন, তেমনই ত চলবে। মেয়েরা হল গাড়ির মত। চালক যেভাবে চালাবে, সেই ভাবে, সেই দিকেই চলতে হবে। প্রতাপ রায় একজন মালদার লোক। ফকিরে কি আর সংসার করতে পারে ! উপন্যাসেই প্রেমের জয়জয়কার। জীবনে শুধু লাভ-ক্ষতি, দেনাপাওনা।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতে পারলে ভাল হয়। পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে এবার দিবানিদ্রা। সামনের বাড়ির টিনের চালে বৃষ্টি নাচছে। দরজার বাইরে ক্ষীণ চুড়ির শব্দ হল। কনক এল না কি ! কাকীমা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বাঃ বেশ মজা করে শুয়ে আছ। লেখাপড়া নেই।

থাকলেও করা যাবে না। বর্ষায় ঘুম।

কাকীমা ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিছানার একপাশে বসে বললেন, আমার সব গুল ভিজে গেল।

তুলে ফেলুন।

তোলার উপায় নেই, একেবারে ভিজে।

বেশ বড় করে একটা হাই তুললেন। একে দুপুর, তায় বর্ষা। আলসে লেগেছে। বর্ষায় আমাদের নিচেটা যক্ষপুরীর মত হয়ে ওঠে। অন্ধকার, ড্যাম্প, নোনা ধরা দেয়াল। ওপরে এসেছেন, বেশ করেছেন, তবে খাটে না বসলেই পারতেন ! বিছানায় বসা উচিত নয়। চেয়ার রয়েছে, সোফা রয়েছে। চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতেও পারছি না।

পিন্টু, তোমার বাবার কাছে তো অনেক ওষুধ থাকে !

কি ওষুধ বলুন ? হোমিওপ্যাথিক !

এই ধরো কেটেকুটে গেলে লাগাবার মত কিছু।

হ্যাঁ আছে। দিচ্ছি দাঁড়ান। হাত কেটেছে বুঝি !

সেই উঠতে হল। শোবার উপায় কি ভগবান রেখেছেন ! আয়োডিনের শিশিটা নিয়ে এলুম। বলুন, কোথায় লাগাতে হবে ?

কাকীমার ঠোঁটে লাজুক হাসি, তুমি একটু লাগিয়ে দেবে !

কেন দোব না ?

কিছু মনে করবে না ?

মনে করব কেন ?

ধীরে ধীরে পিঠের আঁচল সরালেন। গায়ে যে জামা ছিল না, এতক্ষণ লক্ষ করি নি। মেয়েদের পিঠ, ফর্সা ধবধবে। তেলা টান টান চামড়ার ওপর এপাশ থেকে ওপাশে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা লাল দাগ। দেখলেই গা শিউরে ওঠে। চামড়া ফেটে দু ফাঁক হয়ে গেছে।

ভয়ে, আতঙ্কে আর একটু হলেই হাত থেকে আয়োডিনের শিশি পড়ে যাচ্ছিল। কাকীমা সামনে ঝুঁকে বসে আছেন। এই ক্ষতের ওপর আয়োডিন পড়লে অসম্ভব জ্বলবে। সে জ্বালা আমি সহ্য করতে পারব না। কে এমন করলে! মানুষে না জানোয়ারে!

কাকীমা বললেন, কি হল, লাগিয়ে দাও।

এ আমি পারব না কাকীমা। অসম্ভব জ্বলবে।

এমনিই ত জ্বলছে, ওষুধে না হয় আর একটু জ্বলবে। তুমি নির্ভয়ে লাগিয়ে যাও।

কি করে এমন হল?

ও আমার মাঝেমাঝেই হয়। বরাতে হয়। কেন হয়, সে আর তোমাকে আমি বলতে পারব না।

সুখেনকে হেডমাস্টার মশাই একবার সপাসপ বেত মেরেছিলেন। সারা পিঠ এই ভাবে ফেটে ফেটে, দাগড়া দাগড়া হয়ে গিয়েছিল। রেড়ির তেল লাগিয়ে সুখেন সেরেছিল। আয়োডিনের বদলে রেড়ির তেল লাগাতে পারলে, হয়ত আরাম পেতেন। পাবো কোথায়!

যা থাকে বরাতে, আয়োডিনই লাগাই। কাঠিতে বেশ মোটা করে তুলো জড়িয়ে একটু একটু করে আয়োডিন লাগাচ্ছি। পিঠটা থির থির করে কাঁপছে। চারপাশে শিশিরে দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। কাকীমার কি হচ্ছে জানি না, আমার কিন্তু চোখ ফেটে জল আসছে। এ ওই গোঁয়ার গোবিন্দ তবলচি ব্যাটার কাজ। জানোয়ার। কেন ব্লাউজ পরেননি এখন বুঝতে পারছি।

পিঠের দিকটা খুলে রাখলে তুমি কিছু মনে কববে পিণ্টু?

না না, মনে করব কেন?

খাটে বসেছিলেন বলে, একটু আগে আমার খারাপ লেগেছিল। এখন আব লাগছে না। একটু বাতাস করে দিলে, মনে হয় আরাম পাবেন। পাখাটা নিয়ে আসতেই খপ করে হাত চেপে ধরলেন। মুখ দেখলে বোঝা যায়, খুব জ্বালা করছে। অন্য কেউ হলে চিৎকার করতেন। এ মহিলার অসম্ভব সহ্য শক্তি।

ছাড়ুন, একটু বাতাস করে দি। জ্বালা কমবে।

দূর পাগল। জ্বালা কি কমে? সহ্য করতে হয়। নাও, তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু বসে চলে যাই। কাজ পড়ে আছে।

অসম্ভব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এই রকম জোরে ঘণ্টাখানেক পড়লেই জল জমে যাবে। বিখ্যাত ঠনঠনেতে এক বুক জল হবে। পিতৃদেবের বাড়ি ফিরে আসতে আজ জীবন বেরিয়ে যাবে। চাদর চাপা দিয়ে আবার জানালার ধারে গিয়ে বসলুম। গুড়িগুড়ি জলকণা উড়ে আসছে।

সারা আকাশ ফাটিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ভয়ে কানে আঙুল দিলুম বিকট শব্দ হল বলে। না, তেমন শব্দ হল না। বহু দূরে আকাশের হুমকি বাজল গুমগুম করে।

কাকীমা বললেন, আওযাজকে বড ভয় করে। বৃষ্টি হয় হোক। তুমি বাজ পড়া দেখেছ?

না। শুনেছি বাজ পড়লে গোবর চাপা দিতে হয়, তা হলে না কি নীল মত একটা বল পাওয়া যায়।

ধুস্, ও সব গল্পকথা। আমি কত সাপ দেখেছি, একটারও মাথায় মণি দেখিনি। আমার ভীষণ হীরের নাকছাবি পরার শখ। একটা মণি পেলে কাটিয়ে আংটি আর নাকছাবি করিয়ে নিতুম। গল্পের সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল বলো তো, সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাজপুত্র, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি।

দিন হারায়নি কাকীমা, গল্প হারিয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, পৃথিবী তত সেয়ানা হয়ে উঠছে।

নাঃ, কাকীমাকে এক ডোজ আর্নিকা খাইয়ে দি, ব্যথা অনেক কমে যাবে। চাদর ফেলে আমাকে উঠতে দেখে কাকীমা বললেন, কি হল আবার?

কিছু না, আপনাকে এক পুরিয়া ওষুধ খাইয়ে দি। ব্যথা কমে যাবে।

মনে হচ্ছে, জ্বর আসছে পিণ্টু। শীত শীত করছে।

আর্নিকার শিশি হাতে কাকীমার সামনে এসে দাঁড়ালুম। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন।

নিন, জিভটা বের করুন, গোটাকতক গুলি ঢেলে দি।

শিশির পেছনে টুসটুস করে গোটা কতক টুসকি মেবে সাতআট দানা ওষুধ জিভের ওপর সবে ছেড়েছি, বিদ্যুতের আলোয় আকাশে ঢেউ খেলে গেল। কানে আঙুল দেবার সময় নেই। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাকীমা, ওমা, বলে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বসে, আমি দাঁড়িয়ে। টাল সামলানো গেল না। হুমড়ি খেয়ে সামনে মহিলার ঘাড়ে। দু'জনেই বিছানায় চিৎপাত। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়েছে। খুব কাছে। বাতাস গরম। নাকে পোড়া পোড়া গন্ধ।

আকাশ আবার চমকাল। আবার বজ্রপাতের শব্দ। মহিলাব ভীত আলিঙ্গন আরও দৃঢ়। এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছেন ! এ ভাবে না জড়ালেই ভাল হত। শরীবেরও ত চৌম্বক শক্তি আছে। এই মুহূর্তে নিজেকে আর পিণ্টু বলে ভাবা যায় না। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি। ঘন ঘোর আকাশে, ঝোড়ো বাতাসে, মেঘ ছিঁড়ছে, মেঘ জুড়ছে, গাছের মাথা দুলছে উন্মত্ত আনন্দে, বিদ্যুৎ শিউবে শিউরে উঠছে, আকাশ কখনও চাপা, কখনও মুক্ত গর্জনে প্রকৃতিকে শাসন করছে।

সারা চাদরে ভিজে ভিজে আর্নিকার গুলি। শিশি ছিটকে চলে গেছে বালিশেব পাশে। বাত না দুপুর ! পিণ্টুর পিণ্টুত্ব লুপ্ত। শরীরে বড কষ্ট। কষ্টে আনন্দ, আনন্দে কষ্ট। চোখে আকাশ অদৃশ্য। মাতাল বর্ষায় বড় বমণীয় স্থানে আশ্রয় পেযেছি। ছেড়ে যেতে চাই. মুক্তি নেই। মনে সে জোর নেই। নিজেকে এবার চিনতে পেরেছি। ভণ্ড তপস্বীকে।

যেমন হঠাৎ জড়িযে ধরেছিলেন, তেমনি হঠাৎ ছেডে দিযে কাকীমা জানালার ধারে চলে গেলেন। বিছানায় পড়ে আছি চিৎপাত। মনে একটু পাপের ফেঁসো এখনও লেগে আছে, তা না হলে এমন হতভম্ব হয়ে যাব কেন ? মা কি সন্তানকে জড়িযে ধবতে পারেন না, খুব পাবেন, একশোবার পাবেন ; ওই কথামৃত পড়াব ফলে, আমার এইরকম কলা খাইনি গোছেব অবস্থা হয়েছে। কিন্তু ঠাকুব রামকৃষ্ণ যে বলেছেন. মেয়েদেব সঙ্গে বসা কি বেশিক্ষণ আলাপ, সেও একপ্রকার রমণ। বমণ আট প্রকাব.

স্মরণং কীর্তনম্ কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং।
সংকল্পোহধ্যাবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং ॥

মেযেদের কথা শুনছি ; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে, ও এক বকম বমণ। মেযেদের কথা বলছি [কীর্তনম], ও এক রকম রমণ ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কচ্ছি, ও এক বকম। মেয়েদের কোন জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও একরকম। স্পর্শ করা, আর এক রকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নেই।

অবশ্য, এ বিধিনিষেধ সবই হল সন্ন্যাসীদের জন্য। 'সংসারীদেব আলাদা কথা ; দু-একটি ছেলে হলে ভাই-ভগ্নীর মত থাকবে ; তাদের অন্য সাতবকম বমণে তত দোষ নেই।' কিন্তু, আমি তো সংসাবীও নই, সন্ন্যাসীও নই। যখন সন্ন্যাসী হয়ে ছিটকে বেবিয়ে যাব, তখন আব মহিলাটহিলা কোথায় ! ববফ ঢাকা হিমালয়। ছোট্ট একটা গুহা। যা হয়ে গেল, তাতে কি আমার আনন্দ হল ' না, হযনি। মনে হচ্ছে একটু হয়েছে। মরেছে। কাকীমা ত একটা পাতান সম্পর্ক। আসলে ত বমণী। মধ্যবয়স্ক তরুণী ভার্যা।

জানালার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখি। দাঁড়িয়ে আছেন সেই একভাবে। উদাস চোখ। চোখের দু কোলে জলের ধারা। কাঁদছেন কেন ? আমি তো কিছু করিনি। চড়াক করে আবাব একটা বাজ পড়ল। কাকীমা চমকে জানালার ধার থেকে সরে এলেন। আবার হালুম করে বুকে এসে পড়াব ভয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

কাকীমা খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালেন।

কাঁদছেন কেন আপনি ?

এই একটি কথায় নীরব অশ্রু সরবে বইতে শুরু কবল। মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে

লাগলেন।

কেউ কাঁদলে মন এমনিই দুর্বল হয়ে পড়ে, মহিলারা কাঁদলে তো কথাই নেই।

আমাদেব দু'জনের দূরত্ব খুব বেশী নয়। ইঞ্চি দুয়েক কাঠের ব্যবধান। কান্নার আবেগে বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

আপনি কাঁদছেন কেন?

আমাকে একটু বিষ জোগাড় কবে দিতে পাব?

বিষ?

হ্যাঁ বিষ।

আপনাব কিসের দুঃখ।

দুঃখ? বলো, কিসের সুখ!

আপনি এদিকে এসে বসুন। জীবন মানেই দুঃখ। তা হলে সব মানুষকেই তো আত্মহত্যা কবতে হয়। কাকীমার হাত ধবে টেনে এনে খাটের পাশে বসিয়ে দিলুম। বেশ আপনজনের মত বসেছেন। কি জানি কেন, মনে এখন আর তেমন কোনো ব্যবধান নেই। একটু আগে লজ্জা করছিল, এখন মায়া এসেছে। মমতা মাখান সবল মুখ, অপরূপ একটি শরীব! মাতুলের স্টুডিওতে সেদিন যে বাঈজীর দল এসেছিল তাঁদের থেকে এঁব চেহারায় কিসেব কমতি! গৃহবধূ হয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন। বেঁচে থাকাব ধবনটা সাহস কবে পালটে ফেলতে পাবলে, বানী মহেশ্বরী। সংস্কাবে আটকে আছেন।

আপনার বাপের বাড়িতে কে কে আছেন?

কেউ নেই। সব খেয়ে বসে আছি। আব থাকলেই বা কি হত। বিয়ের পর মেয়েদেব বাপের বাড়ি থাকে না।

এই রকম একটা মানুষকে বিয়ে করলেন কেন?

আমি করব কেন? আমাব মামা কবিয়ে দিলে। আমার মামা আর এর মামায় খুব আলাপ ছিল।

আপনার মামা কোথায়?

ওপারে।

এখানে আসাব আগে কোথায় ছিলেন?

এব মামাব বাড়িতে। এব মামাব অবস্থা বেশ ভাল। একলা মানুষ। ব্যবসা-ট্যবসা আছে। ব্যায়লা বাজায়, একটু মদটদ খায়। মানুষটা খুব উদাব। বড় বাড়ি।

চলে এলেন কেন?

আমি আসব কেন? উনিই চলে এলেন। বুড়োকে মাবধোর করে।

মাবধোব কবে কেন?

সে অনেক ব্যাপাব। নোংরা ব্যাপাব। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করবে। এতদিন পরে ওনার মনে হল, বুড়োর চরিত্র খারাপ। আব প্রথম থেকে আমাকে বলে এল, মামাকে একটু তোয়াজ করো, বুড়োর কেউ নেই, মরলে সব আমাদের। তুমিই বলো, বুড়ো মানুষের কি চরিত্র খারাপ হবে! বুড়োরা তো এমনিই বুড়ো।

সে আপনি বলতে পাববেন।

আমি তো বলছি, মামাশ্বশুর দেবতার মত মানুষ। বয়েস হয়েছে তাই বাতের রোগে ভোগেন। গা, হাত পা বেশ কিছুক্ষণ টিপে না দিলে রাতে ঘুম আসত না। অ্যায় শুরু হল অশান্তি। মুখের তো কোনও বাঁধন নেই। রাগলে নালা নর্দমা। কেবলই বলে, তুমি টেপো না তোমাকে টেপে।

থাক থাক, আর শুনতে চাই না।

না, শুনে কাজ নেই। আমিও বলতুম না, যখন মারধোর করে, তখন মনে হয় সত্যিই খারাপ হয়ে যাই। ওই মামাশ্বশুব আমাকে সাত ভরি সোনার গয়না করিয়ে দিয়েছিলেন, বাবু সব উড়িয়েছেন। মামার ভালোটা পায় নি, মামাব কাপ্তেনিটা পেয়েছে। তার অনেক আছে, তোমার কি আছে?

যাক গে, ছেড়ে দিন ও সব কথা।

ছাড়বো কেন ? ছাড়বো কেন ? তুমি করতে পারো, আমি বলতে পারি না। পেটে একটা বাচ্চা এলো। বলে কি না, এ কার ? কে এর বাবা ! কি রকম নোঙরা মানুষ। সেই বাচ্চাটাকে আমার নষ্ট করিয়ে দিলে। মানুষ, না জানোয়ার !

আবার কান্না এসে গেল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, জানো, আমি আর মা হতে পারব না ! কেউ আর আসবে না, আমাকে মা বলতে। দোষ আমার না, দোষ তোমার ! এদিকে উঠতে বসতে গালাগাল দেবে, আঁটকুড়ো। জানে তো, এর কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাই ধামসে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু আপনাদের ভালবাসাও দেখেছি। সোহাগ যে করে তার শাসন করাও সাজে।

তুমি দেখেছ, তুমি বোঝনি ! স্বার্থ ছাড়া ও একপাও চলে না। তুমি জানবে, ভালবাসা হীরের চেয়েও দামী। যে ভালবাসে তার চাবুকও হজম করা যায়। আমাকে কেউ কোনদিন ভালবাসেনি, ভালবাসবেও না, আমি এক ক্রীতদাসী।

পাতকো তলায় দুম্ করে একটা শব্দ হল। কাকীমার মুখটা ছাইয়ের মত হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সর্বনাশ ! সদর খোলা ছিল না কি ? আমি তো বন্ধ করে এসেছিলুম, তা হলে !

তা হলে কি ?

কখন এসে বসে আছে ! হয়তো সব দেখেছে, সব শুনেছে। আজ আমায় খুন করে ফেলবে।

খুন করলেই হল ! আমরা আছি না !

আমি যাই।

পায়ে পায়ে ভয়ে ভয়ে কাকীমা চলে গেলেন। বৃষ্টি সামান্য কমেছে। আকাশ ঘুলিয়ে উঠেছে। এ সেই বৃষ্টি, যা চলবে সমানে তিন দিন। মহিলা মনটা বড় বিষণ্ণ করে দিয়ে গেলেন। পৃথিবীতে জানোয়ারের সংখ্যা এত বাড়ছে কেন ! কিছু হাণ্টারওয়ালী জন্মালে বেশ হয়। চাবকে সব ঠাণ্ডা করে দেবে।

কাকীমার গলা শোনা গেল, পিণ্টু, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে কাকীমা চিৎকার করছেন, আর জলে ভিজছেন। দোতলার বারান্দা থেকে মুখ বের করে বললুম, কি হয়েছে !

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে অবিরাম বেজে চলেছে জলতরঙ্গ। নল বেয়ে জল বইছে দুধের ধারায়। প্রকৃতির অঝোর শব্দে মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি ভেজা মুখ তুলে কাকীমা বললেন, নেমে এসো না। দেখে যাও আকাশ ভেঙে কি পড়েছে !

উঠনে চিৎ হয়ে কি একটা পড়ে আছে। পাথর নয়। সরার মত কি এক প্রাণী। মাছ বৃষ্টি হয়, আগুন বৃষ্টি হয়, এ আবার কি বস্তু রে বাবা ! নড়েও না, চড়েও না অথচ ঠাসা মাল।

আমার পাশে, হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে কাকীমা বললেন, কি বল তো !

ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করো। এ মহিলার লজ্জা শরম বড় কম। বেহুঁস উদাসী। শরীর ভিজে জাব। চুল ভেঙে পড়েছে পিঠে। দেহভঙ্গি তেমন ভাল নয়। আমি বস্তু দেখব, না মানবী দেখব ! তুমিই আমাকে বলে দাও। আমি এক যুবক। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে। দেহে রক্তস্রোত বইছে। কোনও রকমে বললুম, কি বলুন তো ! ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেকটা কচ্ছপের মতো।

ঠিক ধরেছ। কচ্ছপই। উলটে পড়ে আছে। শরীরটা ভিতরে ঢুকে আছে। কোত্থেকে এলো বলো তো !

আকাশ থেকে কচ্ছপ পড়বে কি করে ?

তাই তো অবাক হচ্ছি।

আমার মনে হয় পাতকো থেকে এসেছে।

কুয়োয় কচ্ছপ আসবে কি করে ?

আমাদের কুয়োর সঙ্গে গঙ্গার যোগ আছে।

হ্যাঃ!

হ্যাঃ নয়। সত্যিই আছে। দেখবেন চলুন।

সাঁওতাল রমণীদের মত হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কাকীমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। আদুড় পিঠে ভিজে এলো চুল, এপাশে ওপাশে লাল সোঁটা দাগ। তবলচী কাকার সোহাগের তেহাই।

কই, কোথায় তোমার গঙ্গা?

ওই দেখুন, পাতকোর মাঝখানে সুড়ঙ্গের মুখ। হু হু করে জল আসছে।

বাঃ, কি মজা, কি মজা! এখুনি বড় বড় মাছ আসবে

কাকীমা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ভিজে নার্গিসের মত দেখাচ্ছে।

তুমি আচ্ছা বোকা! জামা কাপড় পরে ভিজছ। সব খুলে ফেল।

না, না, সব খুলবো কি?

আরে দূর, আণ্ডারওয়্যার আর গামছা পরে এসো। বিকেলের গা ধোয়া বৃষ্টির জলেই হয়ে যাক। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না!

বাঃবেশ সুরেলা গলা। বৃষ্টিতে সংসারের মলিনতা ধুয়ে গেছে। দুঃখ ভেসে গেছে। আসল মানুষটি ক্ষণিকের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে বৃষ্টি ভেজা উঠনে। চারপাশে তোড়ে জল পড়ছে ছাদের নল থেকে। কলকল শব্দে জল খেলছে চারপাশে।

দাঁড়াও কচ্ছপটাকে বালতিতে তুলি।

তুলে কি করবেন?

পুষবো।

যদি কামড়ায়, মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

মেঘ তো অনবরতই ডাকছে।

বালতি এসে গেল। মহিলার অসম্ভব সাহস। দু'পাশ থেকে দু'হাত ধরে কচ্ছপটাকে ঝপাং করে বালতিতে ফেলে দিলেন। তোলা মাত্রই কচ্ছপটার লম্বা গলা, আর চারটে পা বেরিয়ে পড়ল। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। শব্দ শুনে আবার চোখ খুললুম।

কাকীমা খিলখিল করে হাসছেন আর বলছেন, তুমি কি ভীতু, তুমি কি ভীতু!

তুই নেই বলে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ

কোনওকালে আমাদের বাড়িতে গরু ছিল না; কিন্তু জাবনা দেবার একটা কাঠের পাত্র ছিল। আমাদের এই রকম অনেক কিছুই আছে। মাল আছে মালিক নেই। ভাব আছে ভাবী নেই? শাড়ি আছে, গহনা আছে, রমণী নেই। রান্নাঘর আছে রাঁধুনী নেই।

সেই কেঠোটি এখন শোবার ঘরে খাটের পাশে চলে এসেছে। ভেতরে গরম জল গোলাপী ধোঁয়া ছাড়ছে। পাশে একটা বালতিতে ঠাণ্ডা জল, মগ ভাসছে দুলে দুলে। আধ হাত ওপরে পিতার চরণদ্বয় ঝুলছে। ফুটবাথের প্রস্তুতি। মাথায় দু পুরু ভিজে তোয়ালে। ঘড়ির শেষ শব্দ এইমাত্র বাতাসে মিলিয়েছে। এগারোটা বাজল। মেঘলা আকাশের তলায়, বৃষ্টি ভেজা পথে রাত এগিয়ে চলেছে মধ্যযামের দিকে। বৃষ্টির বিরাম নেই। ঝোড়ো বাতাসে বন্ধ জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পায়ের পাতা গরম জল স্পর্শ করেই ছোঁ মারা চিলের মত ওপরে উঠে গেল। পিতা বললেন, মাই গড, ঢালো এক মগ ঠাণ্ডা জল।

আগেও কয়েক মগ ঢেলেছি। জল কিছুতেই সহনীয় উত্তাপে নামতে চাইছে না। পাদস্পর্শ সম্ভব

হলেও পদকেলির সুযোগ মিলছে না। ছোবলমারা উত্তাপ। চাদরের ঝোলা অংশটা হঠাৎ তুলে ধরে বললেন, এ কি, কোথা থেকে রক্ত এলো? হাত কেটেছে বুঝি? বঁটিতে পেয়ারা কাটতে গিয়েছিলে?

পা দুটো ওপরে তোলা ছিল। কথা বলতে বলতে খেয়াল নেই। জলে পা পড়ে গেল। উহু, উহু করে পা তুলে নিলেন। বললেন, জল একবার গরম হলে আর ঠাণ্ডা হতে চায় না। কতটা কেটেছে?

ওটা রক্তের দাগ নয়, আয়োডিন।

হাত কাটেনি তো আইডিন নিয়ে কি করছিলে? এমব্রয়ডারি! চাদরটা দাগরাজি করে দিলে।

পা আবার ধীরে ধীরে জলের দিকে নামছে। এখুনি ছ্যাঁকা লেগে যাবে। সাবধান, সাবধান বলে একটু জোরে চিৎকার করে ফেলেছি।

ষাঁড়ের মত চেল্লাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে না।

আরো দু মগ জল ঢালো। হটবাথের চেয়ে কোলড বাথই ভাল। ধৈর্য থাকে না।

আজ মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। জল ভেঙে, হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন। দু মগ জল ঢাললুম। পা এবার ডুবেছে। কিছুক্ষণ পরেই খলবল, খলবল করে শব্দ হবে। জলে এক তোলার মত নুন পড়েছে। এবার একটু সুস্থ হয়ে বসতে পেরেছেন। দু পাশে দুটি হাত। মাথায় ভিজে তোয়ালে। ব্যাঙ ডাকছে। বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শব্দ। প্রকৃতির জলসাঘরে বসে আছি। চাদরে আবার একটা কি খুঁজে পেয়েছেন। দু আঙুলে ধরে ওপর দিকে টেনে তুলছেন। উঠছে, উঠছে। কি রে বাবা! লম্বা চুল। আলো আর চোখের মাঝখানে চুলটাকে দু আঙুলে ঝুলিয়ে বললেন, এ কি? চাদরে মেয়েদের চুল। আশ্চর্য? সামথিং ফানি।

এ যেন ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া হচ্ছে। ওই রকম গোটাকতক চুল পেলেও আশ্চর্য হব না। পিতা বললেন, আইডিন, এলোচুল, মানুষ খুন করেছ নাকি?

আজ্ঞে না! কাকাবাবু কাকীমাকে চাবুক মেরেছেন।

চাবুক মেরেছে? কেন, লটারি পেয়েছে নাকি।

আজ্ঞে?

লটারি পেয়ে জমিদার বাচ্চা হয়েছে?

না, সে রকম তো কিছু দেখলুম না। তা ছাড়া লটারি পেলে মানুষ তো হাসতে হাসতে মরে যায় শুনেছি।

তা হলে চাবুক মারার জমিদারী শখ হল কেন?

তা তো জানি না। তবে কাকীমা এসেছিলেন, পিঠ দু ফাঁক, ডায়াগোনালি মেরেছেন।

তুমি সেই পিঠে আইডিন লাগালে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ বেশ। তিনি এই বিছানায় বসলেন, তুমি লাগালে, তিনি শুয়ে পড়লেন, সারা চাদরে আইডিন আর লম্বা লম্বা চুল। জানো, এটা ব্যাচেলারদের বিছানা। বিছানা কত পবিত্র জানো? জানো বিছানা হল সাধনার পীঠস্থান! তান্ত্রিকের পঞ্চমুণ্ডী আসনের মত।

আজ্ঞে হ্যাঁ জানি। তবে আপনি যদি দেখতেন, আপনিও কাতর হতেন। সে এক পাশবিক ব্যাপার।

পৃথিবীটাই তো পাশবিক। মানুষ এখানে আসে শাস্তি পেতে, সাফার করতে। নারী নির্যাতন এ দেশে কোনও নতুন ঘটনা নয়।

আপনার কিছু বলা উচিত।

আমি বলব অন্যভাবে। আমার নীতি হল, টিট ফর ট্যাট। ওকে ঘুম থেকে টেনে তুলে স্কেল দিয়ে মেপে, সমান মাপের একটি ক্ষত তৈরি করে দোব।

সেটা কি ঠিক হবে?

তুমি কি করতে বল?

আমার সেই ঘটনাটা মনে পড়ছে। সেই ভুজাওয়ালা!

ওঃ হোঃ আমাদের বাড়ির সামনের সেই উৎপাত!

আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত বারোটার সময় স্ত্রীকে ধরে পেটাচ্ছিল, আপনি যেই স্বামীটাকে তেড়ে গেলেন পেটবার জন্যে স্ত্রী অমনি ঝ্যাঁটা নিয়ে আপনাকে তেড়ে এল। মনে পড়ছে!

হুঁ, পড়ছে। মার যে সোহাগ বুঝতে পারিনি। তোমার কি মনে হয় এটাও সেম কেস।

তা বলতে পারব না, তবে কাকীমা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, একটু বিষ পেলে জীবন-যন্ত্রণা জুড়োতেন।

হ্যাঃ, তুমিও যেমন, জীবনযন্ত্রণা জুড়োতেন। এদেশের মেয়েরা প্রতি মুহূর্তে আত্মহত্যার চিন্তা করে। সেই চিন্তা নিয়েই সুখে শেষ জীবন পর্যন্ত সংসারের জোয়াল ঠ্যালে। মৃত্যুর কথা ভাবা যায়, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া যায় না।

তা হলে এ নিয়ে আর রাগারাগি না করাই ভাল।

তুমি কিন্তু ডেঞ্জার জোনে চলে গেছ।

ডেঞ্জার জোন?

তোমার তো ষোল হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বহুদিন আগে।

তা হলে খোলাখুলি বলা চলে, কি বলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুত্র মিত্র, কি যেন বলে?

পা দুটো জলে খলবল করে উঠল। কোন্ দিকে মোড় নেবেন বুঝতে পারছি না। গভীর প্রদেশে চলে যাবেন নাকি। যেখানে জীব জগতেব প্লাস আর মাইনাস ফ্যাক্টার অনবরত দাঁড়কাকের মত শুকনো ডালে বসে খাখা করছে। নীরবতা ভঙ্গ হল। পদকেলি শান্ত।

বুঝলে, মানুষের একটা বয়েস আসে, যে বয়েসটাকে বলে পিউবারটি। তোমার গলার স্বর কত পাল্টে গেছে লক্ষ করেছ। তোমার ভেতরেই, তোমার অজান্তেই একজন পুরুষ বাসা বেঁধেছে। সেই পুরুষের অনেক চাহিদা আছে। বুঝতে পারো কিছু?

আজ্ঞে না, তেমন তো কিছু বুঝি না।

হয় তুমি অসুস্থ, না হয় তুমি মিথ্যেবাদী।

মিথ্যেবাদী শব্দটা সহ্য করতে পারি না। মাথায় আগুন জ্বলে যায়। আমি মিথ্যে কথা বলছি!! পুরুষের ভেতব তো পুরুষই থাকবে। মেয়েছেলে থাকতে যাবে কোন আক্কেলে। মেয়েলী পুরুষকে তো লোকে গালাগালিই দেয়। বলে এফিমিনেট লৌণ্ডা। তা হলে প্রতিবাদ করা উচিত।

মিথ্যেবাদী বলছেন কেন? আমি তো কোনও মিথ্যে বলিনি। আমার গলা যখন সরু থেকে মোটা হল, তখন আপনি বয়সা লেগেছে বয়সা লেগেছে বলে, দিন কতক এমন কাণ্ড করলেন, মনে হল আমাব চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। মুখে একটা ব্রণ বেরিয়েছিল, সেই দেখে সাতদিন ভাল করে কথা বলেন নি। প্রায় ত্যাজ্য পুত্র করে দেবার মত অবস্থা। আজ বলছেন মিথ্যেবাদী। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

শোনো, শোনো, মাই ডিয়ার সান, বাক্য দিয়ে, আবেগ দিয়ে সত্য চাপা যায় না। তোমার এই বয়েসটা আমিও পেরিয়ে এসেছি। কাম বলে একটা জিনিস আছে, জানো কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

শোননি, অনুভব করেছ। তুমি তো মানবপুত্র। যে কোনো সুস্থ মানুষ জীবনের অসংখ্য মুহূর্তে ওই আবেগে বিচলিত হয়। দেবতারাও মুক্ত ছিলেন না। আমাদের শাস্ত্রকাররা বড় প্র্যাক্টিক্যাল ছিলেন। যৌবনেই তাঁরা বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন। আমাদের অর্থনীতি পারমিট করে না বলেই, সাকার হয়ে সংসারী হতে হয়। অনেকে প্রৌঢ় বয়েসে বিবাহ করে, যখন বিবাহের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Early marriage late orphan, late marriage early orphan. আমি তোমাকে একটা স্বাভাবিক চ্যানেলে ফেলে দিতে চাই। পজেটিভ লাইফ।

তার মানে ? এখন কি আমার নেগেটিভ লাইফ !

দ্যাখো বাপু, আমার মুখটা বড় আলগা। অবশ্য ভালগার নই। জীবন আমার কাছে জীবন। কোদাল আমার কাছে কোদাল। চাঁদ আমার কাছে চাঁদ, পৃথিবীর মৃত উপগ্রহ, প্রেয়সীর মুখ নয়। কিছুদিন আগে, তোমার মনে আছে নিশ্চয়, এ পাড়ার মানুষ এক হুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। মাঝরাতে পাঁচিলে পাঁচিলে, ওঁআউ ওঁআউ করে ডাকত। আমি চাই না, তুমি চাঁদনীরাতের কামতাড়িত হুলো হয়ে যাও।

নাঃ, আর বসে থাকা যায় না। অসহ্য আক্রমণ। একেই বলে হিটিং বিলো দি বেল্ট। সামনে থেকে সরে যাই। মুখে মুখে তর্ক করে ভাল নেই। ব্যাপারটা থিতিয়ে যাক।

চললে কোথায় ? আমার সামনে থেকে পালালে, নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবে ? পারবে না। ধৈর্য ধরে বোসো। আমার চেয়ে ভালো বন্ধু পাবে না, আমার চেয়ে ভালো উপদেষ্টা পাবে না। তোমার শুরু আমার শেষ। যাবার আগে তোমার মা বলেছিলেন, খোকা রইল, তুমি দেখো। তোমাকে আমি তুলোয় রাখা আঙুরের মত মানুষ করেছি। অস্বীকার করতে পারো ?

আজ্ঞে না।

তোমার চেয়ে জীবনকে আমি অনেক বেশি চিনি। অস্বীকার করতে পারো ?

আজ্ঞে না।

আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি পোড় খাওয়া মানুষ। কোনও সন্দেহ আছে ?

আজ্ঞে না।

তা হলে শোনো, যুদ্ধ দুর্গে বসেই করা ভাল।

কিসের যুদ্ধ ?

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনবরতই মানুষের যে যুদ্ধ চলেছে, হারছে, জিতছে, উঠছে, পড়ছে, সেই অদৃশ্য যুদ্ধ সংসার দুর্গে বসে করাটাই হল গৃহীর ধর্ম। শক্তির আঁচলে বেশ করে নিজেকে বাঁধো, বেঁধে তাল ঠুকে বলো, কে আসবি আয়।

আপনি ধ্যান, জপ, দীক্ষা, এই সবের কথা বলছেন ?

মনে হয় না। আধার ঠিক না হলে, ও-সব হল ফাঁকি। মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি। মন্দিরে যার মাধব আছে তারই শাঁক ফোঁকা চলে। তোমাকে আমি সংসারী করব।

তার মানে ?

চাকরিটা তোমার হচ্ছে, জানো বোধহয়।

আজ্ঞে না, হচ্ছে ? আপনি কি ভাবে জানলেন ?

যে ভাবেই জানি, তোমার হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই চিঠি পাচ্ছ। সামনের ফাল্গুনেই তোমার আমি বিয়ে দেব। পাত্রী ঠিক করে ফেলেছি।

ইমপসিবল্। হতেই পারে না।

ইমপসিবল্ কেন ? তুমি নিজে কি কোথাও ঠিক করে বসে আছ ?

নিজে ঠিক করব কেন ? আমি কি বিয়ে-পাগলা !

বলা যায় না, এখন তো প্রেম আর আত্মহত্যার একটা হিড়িক পড়েছে। সেই বাতাসে তুমিও উতলা !

আজ্ঞে না। বিয়ে একটা থার্ড ক্লাস নোঙরা ব্যাপার।

তাই নাকি ! তা হলে আমরা খুব অন্যায় করে ফেলেছিলুম বলো ! তোমার মায়ের সঙ্গে একটা থার্ড ক্লাস অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়ে, তোমার মত একজন ফাস ক্লাস মহামানব লাভ করেছি !

আমি সে কথা বলি নি। আমার মত আলাদা, পথ আলাদা। সংসারে একজন সন্ন্যাসী হলে চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। আমি সংসারের পাঁকে ডুবতে চাই না।

সন্ন্যাসী তুমি হতে পারবে না।

আলবাত পারব।

আমি লিখে দিচ্ছি তুমি পারবে না। সে গাছ আলাদা, সে ফল আলাদা, সে মাটি আলাদা। তুমি তো এই গাছের ফল। আমার ভেতরটা দেখো। সাংসারিক বুদ্ধিতে জবজবে, বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। এখনও ভাদুয়া ঘিয়ে ভাজা, ফুলকো ফুলকো লুচির লোভ গেল না। শীতের প্রথম বেগুন ভাজার জন্যে প্রাণ আঁকুপাঁকু করে। ঈশ্বরে ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস নেই। আমি বুঝি কর্ম। কর্মেই মুক্তি, কর্মেই সিদ্ধি। তুমি তো খুব কথামৃত পড়, ঠাকুরের সেই কথাটা মনে পড়ে?

কোন্ কথা?

সেই যে সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সব চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্যে। সাধুরা গাঁজা খায় কি না তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়।

আপনি যাই বলুন, বিয়ে আমি করব না। নারী নরকস্য দ্বার।

বাঃ, তোতা পাখির মত বেশ কপচাতে শিখেছ তো! নারী যে শক্তি তা কি জানো। তোমার অস্ত্রেই তোমাকে কাত করে দি। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। আমি যার হাতে তোমাকে তুলে দিচ্ছি, তিনি হলেন বিদ্যারূপিণী। তার পাশে তুমি এক মর্কট।

তা হলে, জেনেশুনে আপনি বিদ্যার গলায় একটি মর্কট ঝোলাতে চাইছেন কেন?

যদি তুমি একটু মানুষ হও। তোমার এই উড়ু উড়ু, পাখি পাখি ভাবটা কেটে গিয়ে, যদি একটু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হতে পার।

মানুষ হবার জন্যে, মানুষ গুরুর কাছে যায়, সুন্দরী স্ত্রীর কাছে যায় না।

টেবিলের ওপর থেকে ওই খামটা নিয়ে এসো।

খাম থেকে সেই বর্ষণসিক্ত মধ্যরাতে অর্ধমাপের একটি ছবি বেরিয়ে পড়ল। ফুটবাথের জল শীতল হয়ে গেছে। তবু পা ডুবে আছে। এই মানুষটি দিনরাতের হিসেব তেমন গ্রাহ্য করেন না। কত রাত জেগে কাটিয়েছেন! কত রাতে এস্রাজ বেজে গেছে, দরবারীর কোমল মোচড়ে।

এদিকে এগিয়ে এসো। অবাধ্য হয়ো না। বসন্ত আসছে। এ সংসারে আমরা বড় রুক্ষ হয়ে আছি। আমাদের চিন্তা ভাবনা বড় বামুণ্ডুলে হয়ে গেছে। একটু সবুজ হতে হবে। জীবনের কথা কেউ বলতে পারে! আজ আমি আছি, কাল হয়তো থাকব না। কে বলতে পারে, ঘরের ওই কোণে মৃত্যু হয়তো এসে বসে আছে। ঘড়ি দেখছে, ক্যালেণ্ডার দেখছে। তুমিও জান না, আমিও জানি না। ছবিটা একবার দেখে যাও। আমার বন্ধুর মেয়ে। ঈশ্বর কত বড় স্রষ্টা একবার দেখে যাও! আমি অবশ্য ঈশ্বর মানি না।

পিতার ভাবাবেগ অঝোর বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। পুত্রের সঙ্গে কোন্ পিতা এমন খোলাখুলি কথা বলতে পারেন। মিথ্যে বলব না, বন্ধুকন্যা অপরূপা। কুমোরটুলিতে অর্ডার দিয়ে তৈরি। রবিবর্মার পৌরাণিক ছবির নারীমূর্তির মত। তেমনভাবে তাকাতে পারছি না। ফিচিক্ ফিচিক্ করে চোরাচাহনিতে যতটুকু দেখা যায়।

পিতা বললেন, তুমি হেরে গেলে। তোমার বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

কেন?

তুমি সোজাসুজি তাকাতে পারছ না। তুমি সঙ্কুচিত। তোমার মধ্যে প্রেমও নেই ভক্তিও নেই। ও দুটো না থাকলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন-দুঃখ যায়। শঙ্করের মাথা চৈতন্যের হৃদয় চাই। জানি এখুনি তুমি প্রতিবাদ করবে। তোমার মধ্যে শিশুর সরলতা থাকলে এদিকে তাকাতে অমন ইতস্তত করতে না। হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি/ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি

হবে রাধাসতী, মুক্তিকামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারী/ দেহ হবে নন্দেরপুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥

প্রায় সংগীতের মত করে পিতা চরণকটি উচ্চারণ করলেন। পা দুটো জল থেকে উঠে এসে আপাতত তোয়ালের আশ্রয়ে। ছবিটা বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পিতার পাশে কন্যার মত। চোখ পড়লেই মনে হচ্ছে সেই অন্তরালবর্তিনী হেসে উঠছে। নাকে মনে হয় ছোট্ট একটি হীরের ফুল। সাদাকালো ছবিতেও চিকিরমিকির করছে। বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আগামী জীবনের সুন্দর একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছি, এখন তুমি যদি না বানচাল করে দাও। এই জরাজীর্ণ বাড়িটা আমি এবার বেচে দোব। এর দেয়ালে দেয়ালে জীবনের বিষণ্ণ স্মৃতি। আর একটু নিরিবিলি দিকে সরে গিয়ে বিঘেখানেক জমি কিনবো। সেই জমিতে ছোট্ট একটা কটেজ টাইপ বাড়ি কবব। চারপাশে বাগান কবব নিজেব হাতে। স্থলপদ্ম, টিকোমা জেসমিন, সব রকমের করবী, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গুলমোহর, জবা, টগর, গোলাপের ফোয়াবা ছোটাব। চটিটা একটু এগিয়ে দাও তো, উঠে দাঁড়াই।

চটি জোড়া খাটেব পাশে এগিয়ে দিতে গিয়ে মেঝে থেকে আর একটি মেয়েলী জিনিস আবিষ্কার করলুম, মুখ খোলা সেফটিপিন। সর্বনাশ ! পায়ে ফুটলে হয়েছিল আর কি ! সাধে কি মেয়েরা কাছা-খোলা।

ঘবে পায়চাবি করতে করতে পিতা বলতে লাগলেন, বাথরুমটা করব বেশ বড়। দেয়াল, মেঝে সব মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধাব। বিরাট একটা বাথটব বসাব। শাওয়ার থাকবে। তোমার মা খুব চান করতে ভালবাসত। খুব শখ ছিল এই রকম একটা বাথরুমের। এই বাথরুম আমি উৎসর্গ করব আমার পুত্রবধূকে। একে বলে হামাম। দুটো হলঘর হবে। একটায় বসবে জলসা, আর একটা হবে লাইব্রেরি। বাগানে থাকবে গার্ডেন লাইট আর ফোয়ারা। যুদ্ধে আমাব জীবন হয়ে গেছে পোড়ামাটি। তোমার জীবন আমি ভবে দোব। ফুলেব মত একটি নাতি আব একটি নাতনী। নাতিকে আমি নিজে হাতে তৈরি কবব। বিবাট ম্যাথেমেটিসিয়ান, এ গ্রেট র‍্যাংলার। নাতনীকে করব ডাক্তার, এ লেডি উইথ দি ল্যাম্প। তোমার মনে নেই, আমাদেব একটা কুকুর ছিল। তার নাম ছিল জিম। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ডগ। মেজদা মাবা গেল, সাত দিনেব দিন মারা গেল জিম। ওই বকম একটা কুকুর পুষবো। যারা চলে গেছে তাদের আব ফেবাতে পাবব না। তা না পাবি, নতুন হাট তো বসাতে পারি। এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকুলে সাজায়। লেট আস হ্যাভ সাম মিউজিক।

ঘবের কোণে টেবিলের ওপর পরিপাটি করে রাখা দম দেওয়া গ্রামাফোন, এত বড় তার চোঙা। দম দেবাব হাতলটা ভাবি সুন্দব। কুকুর মার্কা ছোট্ট কৌটো থেকে পিন বেরলো। ঘরঘর করে দম দিলেন বারকতক। বাইবে বৃষ্টি ভেতবে সংগীত। শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।

পেছনে হাত জোড় করে ঘরে পায়চারি করছেন। ঘড়ির পেণ্ডুলাম ঠকাস ঠকাস করছে। জ্ঞান গোস্বামীর গলায় গানের সুর তীরের ফলার মত বিঁধছে—তুই নেই বলে ওরে উন্মাদ, পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ।

ঘরের মাঝখানে থেমে পড়ে পিতা বললেন, মেয়েটির নাম অপর্ণা। আমি তাকে এই এতটুকু দেখেছি। তোমার মায়ের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। শুধু সুন্দরী নয়, সুশিক্ষিতা। লেটার নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট করেছে। সামনের বার ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি এ দেবে। বি এ-র আগেই বিয়ে, তারপর এম এ করাব। তোমরা সুখী হও।

গানের শেষ চরণ বাজছে, শূন্য ও বুকে পাখি মোর, আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়। খটাস করে আওয়াজ করে রেকর্ডের ওপর থেকে হাতলটা সরে গেল একপাশে। এবার শুধু বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার ওঠাপড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতা দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। বুক কেঁপে উঠল। এ বাড়িতে অল্পবিস্তর অশরীরীদের আনাগোনা আছে। এই ঝড়ের রাতে কেউ অভিসারে এলেন না কি ! চৌকাট টপকে সরার মত কি একটা বস্তু মেঝেতে ঠকাস করে উলটে পড়ল।

ইনি আবার কে এলেন, এই মাঝরাতে ?

আজ্ঞে ওটা একটা কচ্ছপ।

কচ্ছপ ? কচ্ছপ কোথা থেকে এল ? দেখো দেখো, এরপর হয়তো একটা গজ এসে ঢুকবে।

আজ্ঞে না, গজ মনে হয় আসবে না। কচ্ছপ আজ দুপুরে পাতকো থেকে উঠেছে।

সে কি ?

মনে হয় সুড়ঙ্গ পথে গঙ্গা থেকে এসেছে। নিচে ছিল বালতিতে চোবানো, ওপরে উঠে এসেছে।

বলো কি ? অত্যন্ত শুভলক্ষণ। ভবিষ্যতের চিন্তা করতে না করতেই প্রাপ্তিযোগ। ইনি পুরুষ না মহিলা ?

তা তো জানি না।

এর একটা নাম রাখতে হয়। কি নাম রাখা যায়!

বলাই।

বলাই। নট ব্যাড। বলাইবাবু। ওটাকে আমি পুষবো। আপাতত আজ রাতের মত এই বালতিতে থাক। আপ মাই বয়, আপ।

দেখবেন, কামড়ে না দেয় !

কামড়াবে কেন ?

দু হাতে তুলে বালতিতে বলাইবাবুকে ফেলা হল। সলিল শয্যায় বলাই ভাসতে লাগল। পিতা একটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড চাপালেন। পঙ্কজ মল্লিক। কেন বাজাও কাঁকন কনকন। বড় ডেকচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বললেন, পাঁজিটা একবার দাও। ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারো।

সিঁড়িতে এবার স্পষ্ট পায়ের শব্দ। পিতা শুনতে পাননি। পাঁজি নিয়ে ব্যস্ত। শব্দটা খুবই চেনা। দরজার মুখে প্রফুল্লকাকা, ভাই হরি!

পিতা মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, গেট আউট।

সেভ মি হরি। ওয়াইফ ফিভার। স্পিকিং ডিলিরিয়াম।

পিতা মুখ তুললেন, আর একটু ধরে পেটাও না রাশকেল।

রাগের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি ভাই। এই আমি কান ধরে ওঠবোস করছি।

কান ধরে সত্যিই ওঠবোস শুরু করলেন ভদ্রলোক। আর ঠিক সেই সময় বলাইবাবু মেঝেতে উলটে পড়লেন।

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি

বলাইবাবু খুব পোষ মেনে গেছে। পিতা তার পিঠ পালিশ করে দিয়েছেন। এমন পরিচ্ছন্ন কচ্ছপ জীব-জগতে আর দুটি নেই। সারা বাড়িতে ইচ্ছেমত পায়চারি করে বেড়ায়। খাদ্য পুঁইশাক, কুটনোর খোসা, আলু, কলা। চুকচুক করে দুধ খেতে শিখেছে। আগের মত আব কথায় কথায় খোলে ঢুকে পড়ে না। গলা বের করে পৃথিবী দেখে। তবলার শব্দে চঞ্চল হয়।

রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় বলাই ঘুরছে। পিতা ডাকছেন, বলাই আয়, একটু চা খেয়ে যা। নিচে প্রফুল্লকাকা কাপড় থোবার তালে তালে গাইছেন, লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

সামনের রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দ হল। মনে হয় মাতুল এলেন। এতদিনে সিনেমা নিশ্চয় অনেকটা এগিয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় ডাক শোনা গেল, হরিদা আছেন, হরিদা।

দীর্ঘকাল পরে মেসোমশাই এলেন। নিশ্চয় মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এলেন ! এ-মাসে কি বিয়ের দিন আছে ! যে জানে সে জানে। আসুন, আসুন বলে পিতা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বলাইবাবু প্লেট থেকে চেটে চেটে চা খাচ্ছে।

মেসোমশাইকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভেবেছিলুম পেছন পেছন প্রতাপ রায় উঠে আসবেন। না, মেসোমশাই একা। গাড়িটা অবশ্য প্রতাপ রায়ের। ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে। বসার ঘরের চেয়ারে বসে মেসোমশাই চারপাশ একবার ভালো করে দেখে নিয়ে, কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগেই বললেন, বড় দুঃসংবাদ।

পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন, কি হয়েছে? মেয়েরা ভাল আছে তো!

মেয়েদেব মধ্যে ছোট মেয়ে ভালই আছে, পরীক্ষাও ভালো দিয়েছে, তবে বড় মেয়েটা নেই।

নেই মানে? পিতা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। আমার বুকের মধ্যে কেমন কবছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কনক মারা গেছে! সে কি করে হয়।

হবিদা, কনক নিরুদ্দেশ, কনককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না! তা কি কবে হয! ছেলেরা হিরো হবার জন্যে, বাপের পকেট কেটে বোম্বে পালায়। মেযে পালায়, আমি বিশ্বাস করি না। কনক সেরকম মেয়েই নয়। আপনারা ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?

কোথাও বাকি নেই। নো স্টোন লেফট আনটার্নড। সব জায়গা দেখেছি। হাসপাতালে, মর্গে, শ্মশানে। থানায় ডায়েরী করা হয়েছে। কোনো খবর নেই। কনক এখানে আসে নি তো!

এখানে? এখানে এলে তো আপনাকে আগেই বলতুম।

সেইটাই তো উচিত! তবে মানুষ তো অনেক সময় অনেক কিছু চেপে যায়!

আঃ বাঃ, বেশ বললেন যা হোক। চেপে রাখার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চযই। এখানে আমাব উদ্দেশ্যটা কি!

আপনাদের দিকে কনকেব একটা টান দিন দিন বাড়ছিল। তার ওপর আমি প্রায় জোর করেই তাব ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতাপের সঙ্গে ম্যারেজ ফাইন্যালাইজ কবে ফেলেছি। এই অবস্থায় সে কোথায় যেতে পাবে! লজিক বলে, এখানেই আসা উচিত।

আপনাব লজিকের নিকুচি করেছে? এমন ফাদাব আমি জীবনে দেখিনি। পুরো ঘটনাটা বলুন।

আপনার ছেলে এখানে আছে ত?

দবজা দিয়ে উঁকি মেরে একটু আগে কে দেখে গেল?

হ্যাঁ, মনে হল তাই; কিন্তু সাহস কবে ঘরে আসছে না কেন? ও মহলে কেউ নেই তো!

পুলিসের কাছ থেকে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে তা হলে বাড়ি সার্চ করান।

না, সেটা তো হয়ে গেল শেষ কথা, তার আগে দেখতে হবে, একটা অ্যামিকেবল সেট্‌লমেণ্টে আসা যায় কিনা!

না আসা যায় না, আপনার মত একটা ক্রুকেড লোকের সঙ্গে কোনও সেট্‌লমেণ্ট চলে না।

হ্যাঁ, তা তো বলবেন। মেয়ের বাপ হলে বুঝতেন কি জ্বালা!

মেসোমশাই হাঁক পাড়লেন, কনক, কনক, আমি এসেছি, কাল থেকে প্রতাপ তোর জন্যে না খেয়ে আছে মা।

আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যান সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখে আসুন।

মেসোমশাই লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, ওটা কি?

সামনেই আমি দাঁড়িয়েছিলুম। মেয়ে হারিয়ে গেল তবু জীবনের ভয় গেল না। অতবড় একটা মানুষ, সামান্য একটা কচ্ছপ দেখে আঁতকে উঠলেন। বললুম, চলে আসুন, ভয় নেই, ওটা একটা কচ্ছপ!

কচ্ছপ! ছি ছি, অযাত্রা। তোমরা কচ্ছপ খাও নাকি!

ওটা খাবার নয়, আমরা পুষেছি।

কচ্ছপ আবার কেউ পোষে না কি? যাক তোমাদের ব্যাপার, আমার নাক গলিয়ে দরকার কি! তা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কনক কি সত্যিই এই বাড়িতে নেই!

আপনি নিজে দেখুন না। সব ঘুরে দেখে আসুন।

মেসোমশাই আবার লাফিয়ে উঠলেন, ওই তো কনকের গলা। নিচে লুকিয়ে আছে।

সিঁড়ির দিকে দৌড়লেন। কাকীমার গলা, আর নিজের মেয়ের গলা চেনেন না। বাধা না পেলে এখুনি হুড়মুড় করে নিচে ছুটতেন, ও কনকের গলা নয়। বারান্দা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

ও, বাবা, ইনি আবার কে ?

বাবার বন্ধুর স্ত্রী।

হরিদার স্বভাবই হল যত উড়ো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। তা পড়ুন। আমার তাতে কি ! কনক নিচে নেই তো !

আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। কনক এখানে আসে নি।

চুপ করো ডেঁপো ছেলে, আমার মেয়ের মাথাটি তুমিই খেয়েসো। প্রেম কাকে বলে সে জানতো ! প্রেম আবার কি ? প্রেম ! রাধাকেষ্ট পালা।

ঘর থেকে পিতা সাবধান করলেন, তুমি চলে এসো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ। কোনো উত্তর দিও না। চলে এসো।

মেসোমশাই হতাশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারপর ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। চোখে জল। পিতা বললেন, শান্ত হয়ে বসুন বিনয়দা। বিপদের সময় উতলা হতে নেই।

মেসোমশাই রুদ্ধ কান্নায় ফুলেফুলে উঠতে লাগলেন, হরিদা, আমি কোন মুখে বাড়ি ফিরবো। বাড়ি গিয়ে আমি কি বলব ? এই এত বড় শহর, কোথায় আমি খুঁজবো !

আপনি কোনও চিঠি পেয়েছেন ?

কি চিঠি ? কনকের স্যুসাইড নোট !

না, র‍্যানসাম চেয়ে কোনও চিঠি। যেমন বিলেতে হয়। প্রথমে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, তারপর বিরাট টাকা চেয়ে চিঠি ছাড়ে। না দিলে খুন করে।

না, কোনোরকম চিঠিই আমি পাইনি।

ঘটনাটা খুলে বলুন তো আপনি।

কাল সকালে প্রতাপের বউদির সঙ্গে···

প্রতাপের তো কেউ নেই শুনেছিলাম।

না না, সবাই আছে, মিল নেই, আলাদা আলাদা থাকে। মামলা, মকর্দমা চলছে।

বেশ বলুন তারপর। বউদির সঙ্গে ?

বউদির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাবে বলে বেরলো। বেলা একটার সময় বউদি ফিরে এলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন, কনক ফিরেছে ! আমরা অবাক। কনক একা ফিরবে কি করে ! সে তো গেল আপনার সঙ্গে। খোঁজ খোঁজ, তোলপাড়, এখনও তার সন্ধান নেই।

জল-পুলিসে খবর নিয়েছেন ?

জল-পুলিসে কেন ?

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাটা মশাই তেমন সুবিধের নয়। এ সময়টা আবার বান আসার কাল। হয়তো জলে নেমেছিল, টেনে নিয়ে চলে গেছে।

সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি বলছেন, গঙ্গার ঘাটে সে নামেনি। পঞ্চবটীর কাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

সেই মহিলার কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ! আপনি খুব ভুল করেছেন। শুনেছেন নিশ্চয়, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

কার লোভ, কিসের লোভ !

বড়লোক জামাইয়ের লোভ। অগাধ বিষয় সম্পত্তি। মামলার জট ছাড়াতে পারলেই, অভিভাবক হয়ে নিজে লাঠি ঘোরাবেন। এখন ম্যাও সামলান। ওরা কায়দা করে আপনার মেয়েকে মেরেও

ফেলতে পারে।

মারবে কেন ? মেরে ফেলে কার কি লাভ হবে !

খুব হবে। প্রতাপের উত্তরাধিকারী আসার পথ বন্ধ হবে। আপনি আইন বোঝেন, এই সামান্য জিনিস বোঝেন না ? জমিদারি মানেই খুন, জখম, রাহাজানি, হত্যা, ব্লাডবাথ। অর্থকণিকা আর রক্তকণিকা এক জিনিস। আমাদের এখানে এক জমিদারকে বিষ খাইয়ে মেরেই দিলে। কে মারলে জানেন, ভাগনে। সমস্ত সম্পত্তি পড়ে রইল কোর্ট অফ ওয়ার্ডে। নাবালক ছেলে কবে সাবালক হবে, তারপর সব ছাড়ান পাবে ! এর মধ্যে তাকে যদি সরিয়ে ফেলতে পারে তো হয়ে গেল ! বেশ ছিলেন এখানে, লোভে লোভে পা দিলেন গিয়ে জতুগৃহে।

হরিদা, আমি তো এত সব ভাবিনি। আমি এখন নিমজ্জমান ব্যক্তি। আমাকে তিরস্কার না করে উদ্ধার করুন।

পিতা আপনমনে বলতে লাগলেন, কোথায় যেতে পারে। আচ্ছা, প্রতাপকে কি ওর পছন্দ হয়নি ?

মেয়েদের আবার পছন্দ অপছন্দ কি। আমরা যা পছন্দ করে দোব সেইটাই তো হবে তাদের পছন্দ।

তা বললে চলে ! যুগ পাল্টাচ্ছে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার একটা পছন্দ অপছন্দ থাকবে না ! প্রতাপকে স্বামী হিসেবে আমার খুব একটা রিলায়েবল মনে হয় নি।

ছেলেটার সব ভালো, তবে একটু খেয়ালী। জীবনটাকে হিসেব করে খরচ করতে শেখেনি। আর অসম্ভব স্ফূর্তিবাজ। অত ফূর্তি আবার ভাল নয়।

মানুষকে একটা দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বিনয়দা। তা না হলে চরিত্র তৈরি হয় না। আপনারা ভাবেন টাকায় সুখ। একেবারে ভুল ধারণা। জীবনকে যত সিম্পল করবেন তত সুখ বাড়বে। সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে। স্বভাব একবার এলে গেলে বড় বিপদ। তাকে খাড়া করা খুব শক্ত।'

গানের সুরে কথা চাপা পড়ে গেল। 'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি। আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।' এ আমার মাতামহের গলা। দুলে দুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। 'কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি। আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥'

গানের শেষ চরণটি নিচু হয়ে ঘরে ছাড়লেন, যেন কোল থেকে বেড়াল নামালেন। আজ একেবারে বাজবেশ। ফর্সা ধবধবে ধুতি। কোয়ার্টার হাতা সাদা পাঞ্জাবি। পায়ে বার্নিশ করা জুতো।

এলুম গো। কে কেমন আছো তোমরা ! কেন বসে বিরস বদনে। কি হল কি তোমাদের ?

পিতা বললেন, আপনার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে যান।

উঃ, সে তোমাকে কি বলবো হরিশঙ্কর। জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হল। সাধনার জোরে মানুষ যে কোথায় যেতে পারে ! এক মহাপুরুষ দেখে এলুম হরিশঙ্কর।

চেয়ারে বসতে বসতে মাতামহ বলছেন, আর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হঠাৎ মেসোমশাইয়ের দিকে চোখ পড়ল। এতক্ষণ নিজের খেয়ালে ছিলেন।

কি খবর ? আপনি আবার বৃন্দাবন থেকে মথুরায় ফিরে এলেন ?

আমার বড় বিপদ।

চাবি হারিয়ে ফেলেছেন ?

হারিয়েছি, তবে চাবি নয়, মেয়ে। আমার বড়মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কোথায় রেখেছিলেন ?

কোথায় আবার রাখবো। ঘরে রেখেছিলুম।

ওই জন্যেই হারিয়েছে। রিংয়ে না রাখলেই হারাবে।

পিতা বললেন, আপনি কোন জগতে আছেন ! উনি চাবি হারান নি !! মেয়ে হারিয়েছেন। বড় মেয়ে কনককে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ। বলো কি ! কি সর্বনাশ ! কনক সেই মেয়েটি ! যার সঙ্গে মনে মনে আমার নাতির বিয়ের ঠিক করেছিলুম ! চলো, তাহলে।

কোথায় যাবেন ?

খুঁজতে বেরোই। আমার মনে হয় সে জিটি রোড ধরে হাঁটছে। এতক্ষণে তারকেশ্বরে পৌঁছে গেছে।

মেসোমশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, কি করে বুঝলেন ? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল !

না দেখা হয় নি। আমি নখদর্পণে যেন দেখতে পেলুম।

নখদর্পণ কি জিনিস !

সে আছে। অবিশ্বাসীদের জন্যে নয়। একটু অলৌকিক ধবনেব ব্যাপার।

ওসবে আমার খুব বিশ্বাস। পারেন তো বলুন না আমার মেয়েটাকে কোথায় পেতে পাবি।

আমার ক্ষমতায় হবে না, তবে আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। ঘুরঘুরে বাবার কাছে।

তিনি বলে দিতে পারবেন ?

খুব পারবেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। মৃত্যুর পর কে কোন লোকে আছে একেবারে সঠিক বলে দেন।

কনকের মৃত্যু হয়েছে !

না না, মৃত্যুর কথা আমি ভাবছি না। মৃত্যু হবে কেন ? আমি বলছি পরলোকেব কথা যিনি বলতে পারেন, এলোক তো তাঁর কাছে ছেলেখেলা।

ঘুরঘুরে বাবা দমদম বিমান বন্দরের কাছে কোনও এক গ্রামে থাকেন। মেসোমশাই গাড়ি এনেছেন। যেতে আধঘণ্টাও লাগবে না। পিতার তেমন মত ছিল না, তবু আমরা বেবিয়ে পড়লুম। যেতে যেতে মেসোমশাই শুধু একটি কথাই বললেন, কনককে যদি খুঁজে না পাই, তা হলে আমি আত্মহত্যা করব। মাতামহ বললেন, আত্মহত্যাব কোনও প্রয়োজন হবে না। বেনাবসে আমাব স্ত্রী একবাব হাবিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিচ্ছু করি নি। চুপচাপ বসে রইলুম আর বগলা স্তোত্র আওডাতে লাগলুম। সন্ধ্যেব দিকে সুড়সুড় করে সৌদামিনী এসে হাজির। তখন আমি শ্রী রামচন্দ্রের মত বললুম, এবার তোমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। তিনি বললেন, ঝ্যাঁটার বাড়ি দোব। ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে শিবঠাকুব আমার বউ ফেলে পালালেন ! তা দেখুন, সেই স্ত্রীর কল্যাণে স্বামী জগদানন্দেব সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। জ্বলন্ত মহাপুরুষ। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। দুজনেরই দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্র যেন ডাঁশা ভোমরার মত ভোঁ ভোঁ করছে। তবে একটা কথা স্ত্রী ফিবে আসবেই। সে যে জন্মজন্মেব বন্ধন। এই সামনের বার আবার আমার সৌদামিনীর সঙ্গে বিয়ে হবে। আপনার স্ত্রী হারিয়ে গেলে ভাবনাব কিছু ছিল না। মেয়ে তো ? কেউ যদি পেয়ে থাকে সে কি আর ফেরৎ দেবে ! অমন সুন্দরী মেয়ে। একটা টাকা ফেরৎ দেয় না যে দেশের মানুষ, সে দেশের মানুষের ওপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যাক যা কবেন কালী সেই সে জানে।

বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে। রোদে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্লেন চকচক কবছে। মাতামহ নানা কথা বলছেন, আমার মনটা কিন্তু তেমন সুবিধের নেই। মনে হচ্ছে আমিই হারিয়ে গেছি। এই বিশাল শহরে কনক সত্যিই হারিয়ে গেল। কার খপ্পবে গিয়ে পড়ল কে জানে। কনক তো কচি মেয়ে নয় যে গোলাপ ফুল শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে দেবে ! কি লজেন্‌সেব লোভ দেখিয়ে থলেতে ভরে ফেলবে ! এই হোঁতকা বাপটার জন্যে মেয়েটার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। যে ধরেছে সে নিশ্চযই আরবদের দেশে চালান করে দেবে।

মাতামহ বললেন, এই যে আমরা এসে গেছি। ঘুরঘুরে বাবার আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ঘুরঘুরে বাবা নাম হল কেন ? খুব ঘুরে ঘুরে বেড়ান ?

গেলেই বুঝবেন, কেন ওঁর নাম ঘুরঘুরে বাবা।

ছিটে বেড়া দেওয়া বিশাল একটা জাযগা। মাঠে এক কণাও ঘাস নেই। পরিষ্কার তকতকে। কি করে এমন হল ! মাথায় টাক পড়ে, মাঠে কেমন করে পড়ে কে জানে ? চারপাশ সাদা খনখনে। দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে ধুলো উডছে। একপাশে একটা ছোট মাপের মন্দিব। তাব মাথায় লাল পতাকা উড়ছে। ভেতর দিকে আটচালা ধরনের কয়েকটা বাড়ি। উঁচু উঁচু দাওযা। দেখলেই মনে হয় ভেতরটা

বেশ শীতল হবে। লাল রঙের পাঞ্জাবি, ধুতি, কৌপীন ঝুলছে। দাওয়ার এক পাশে বিশাল একটা ত্রিশূল পোঁতা। ফলায় ঝুলছে জবার মালা। দিনের উত্তাপ শুকিয়ে এসেছে। তলায় একটি নির্বাপিত হোমকুণ্ড। কিছু কাঠে তখনও আগুনের স্পর্শ লেগে আছে। ফুরফুরে ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাসের গায়ে অদৃশ্য কোনও লোকের লিপি লিখে চলেছে।

ঘরের ভেতর থেকে বিরাট এক হুঙ্কার ভেসে এল, মা, মা, একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ মা।

মাতামহ ততোধিক জোরে হাঁক পাড়লেন, বাবা, বাবা, আমি আ গিয়া।

খটাস্, খটাস্ করে খড়মের আওয়াজ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। উঃ ঘুরঘুরে বাবার কি সাংঘাতিক চেহারা! দারা সিং, কিংকং, রান্‌ধোয়া, সব একসঙ্গে এক ছাঁচে ফেলে ভগবান বাবাকে তৈরি করেছেন। এ রকম বিশাল ভুঁড়ি খুব কমই দেখেছি। ভয় হতে লাগল, এখুনি না ফটাস করে ফেটে যায়। বেলকুঁড়ির মত নাইকুণ্ডল, ভোমরার মত সেঁটে আছে, ভোঁ করে উড়ে এসে কামড়ে না দেয়। নিম্নাঙ্গে একটুকরো লাল কাপড় কোনও রকমে জড়ান। টেনিস বলের মত লাল দুটো চোখ। কপালে গোল এতবড় একটা লাল টিপ। মাথায় জটা। মহাপুরুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। যখন দূরে ছিলেন মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম, যখন কাছে এলেন, তখন জালার মত ভুঁড়ি আর থামের মত দুটো পা ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। তিনি ঈশ্বরের মত বিশাল, আমি কীটের মত ক্ষুদ্র।

মাতামহ দমাস করে পায়ের ওপর পড়লেন।

বাবা বললেন, রাক্কুসী তোর মঙ্গল করুক।

আমরাও পালা করে প্রণাম সারলুম। মহাপুরুষ কর্কশ গলায় ডাকলেন, পঞ্চা, পঞ্চা।

গুড়গুড় করে বামনাকৃতির একটি মানুষ যাই বাবা বলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সার্কাসের ক্লাউনের মত ভাবভঙ্গী।

মহাপুরুষ হুকুম করলেন, মাদুর বিছাও। ছিলিম লে আও।

যো হুকুম বলে চ্যালা নাচতে নাচতে চলে গেলেন। দাওয়ায় মাদুর পড়ল। আমরা একে একে বসে পড়লুম। মহাপুরুষ বসলেন পদ্মাসনে। যোগের শরীর। পায়ের ওই বিচিত্র মুদ্রায় আসতে এতটুকু কষ্ট হল না। ভুঁড়িটি সামনে লটকে পড়ল। ত্রৈলঙ্গস্বামী কি ভাবে উলঙ্গ থাকতেন আজ বুঝতে পারলুম। ছোটো একটি কলকে এসে গেল। দমভোর টানে ব্রপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। এর নাম গাঁজা। ব্যারিস্টার মেসোমশাইয়ের চোখমুখের অবস্থা তেমন ভাল নয়। মহাপুরুষকে পছন্দ হয়নি।

কলকেটি চ্যালার হাতে দিয়ে বাবা বললেন, শিক্ষিত লোকেদের বড় অবিশ্বাস, আর অবিশ্বাসী লোক দেখলে আমার খুব দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে। তোমরা মজা দেখবে? তা হলে দ্যাখো।

মহাপুরুষ মৃদু হাসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মেসোমশাই আর্তনাদ করে উঠলেন, এ কি হল, আমি কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

মহাপুরুষ বললেন, হবেই তো, হবেই তো। তুমি যে বাবা অহঙ্কারে অন্ধ। পূর্বজন্মে তুমি ছিলে একজন রূপবান অভিনেতা, আগামী জন্মে তুমি হবে একজন শবর। এ জন্মে তুমি সব হারাবে। নদীর তীরে একলা বাস করবে। বেঁচে থাকবে এক নীচ জাতীয় মহিলার অন্নে। মৃত্যু হবে অমাবস্যায়, শেষ রাতে, **শ্বাসকষ্টে**। মৃতদেহ সৎকার করবে নীচ জাতির লোকেরা।

মেসোমশাই বাবা বলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বাবা একটি তালি বাজালেন। স্পষ্ট দেখলুম হাত দিয়ে ধোঁয়া বেরলো। মেসোমশাই উল্লাসে চিৎকার করলেন, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি ক্ষমা করার কে রে ব্যাটা! নিজের কাছে ক্ষমা চা। নিজের আত্মপুরুষের কাছে। প্রতিদিন তুই যাকে খাটো করছিস। তোর দীনতা দেখে প্রতিদিন যে অশ্রু বিসর্জন করছে।

বাবা, আমি আমার বড়মেয়েকে কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি দয়া করে তাকে পাইয়ে দিন। বলে দিন সে কোথায় আছে!

মহাপুরুষ আবার হাঁক পাড়লেন, পঞ্চা পঞ্চা। কৌটো লে আও।

সেই ক্ষুদ্র চ্যালা নাচতে নাচতে একটি রুপোর কৌটো নিয়ে এলেন। নদীর জলে চাঁদের আলোর মত চকচক করছে।

কৌটোটাকে মাদুরের পাশে মেঝেতে রেখে গেলেন। মনে হয় কোনও মশলাটশলা আছে। মহাপুরুষের জীবনে ভোগ আর ত্যাগ দুটোই হাতধরা।

তোমার মেয়ে পালিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে। তবু একবার দেখি, কোথায় সে আছে ? পঞ্চা !

হাঁক শুনে সেই পঞ্চু মহারাজ আবার নেচে নেচে এলেন। বাবার এবারের হুকুম, স্লেট পেনসিল আর এক সানকি জল। স্লেট পেনসিলটা মেসোমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তিনটে সংখ্যা লেখো।

মেসোমশাই লিখলেন, দুই সাত দুই। মহাপুরুষ সংখ্যা তিনটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার মেয়ের নাম ক দিয়ে, বোধহয় কনক। চন্দ্রের জাতক সুন্দরী, কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, নাতিদীর্ঘাঙ্গী, মৃদুস্বভাব, ভাবপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী। পিতা এবং মাতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মহাপুরুষ হোমকুণ্ড থেকে আঙুলের ডগায় ছাই নিয়ে মেঝেতে একটা চক্র আঁকলেন। চক্রের মাঝখানে একটা ব লিখলেন। উর্ধ্ব নেত্র হয়ে তিনটি বীজমন্ত্র ছুঁড়লেন, শব্দে বাতাস কেঁপে উঠল পাতলা ধাতব চাদরের মত। সেই কম্পন যেন আর থামতেই চায় না। সানকির জলে তরঙ্গ খেলছে। এক ধরনের চিন চিন শব্দ হচ্ছে।

কি যে হচ্ছে ঈশ্বরই জানেন। পৃথিবীর প্রগতি অনেকটা লম্বা বেলুনের চেহারা নিয়েছে। এক প্রান্ত যেমন ছিল তেমনি আছে, অন্য প্রান্তে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। মহাপুরুষ রুপোর কৌটটি হাতে তুলে নিয়ে ঢাকা খুলে সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে উপুড় করে দিলেন, যেন পাশার দান ফেললেন। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে ঝপ্ করে কৌটোটা তুলে নিলেন। অদ্ভুত চেহারার একটা পোকা, কেন্দ্রেস্থির থেকে হঠাৎ সড়সড় করে দক্ষিণে চলতে শুরু করল।

দক্ষিণ দিকেই আমরা বসেছিলুম। মেসোমশাই ঘুরঘুরে, ঘুরঘুরে বলে এক ডিগবাজি খেয়ে দাওয়া থেকে নিচে পড়ে গেলেন। মাতামহ পড়লেন না, তবে ভয়ে সিঁটিয়ে রইলেন। ঠোঁট বিড়বিড় করছে। মন্ত্র জপছেন। আর আমি, দ্বিতীয় কোনো কথা নয়। ঘুরঘুরে শুনেছি সাংঘাতিক প্রাণী। তীর বেগে দৌড়ে একেবারে চৌহদ্দির বাইরে।

বাবার চ্যালা পঞ্চা মেসোমশাইকে ঠেলেঠুলে আবার দাওয়ায় তুলে দিল। মাতামহর গলার স্বর ফিরে এসেছে। আমাকে ডাকছেন, চলে আয়। তার মানে ঘুরঘুরে আবার কৌটোয় ঢুকে পড়েছে। কি কায়দায় ঢোকালেন, কে জানে ! মহাপুরুষরা সব পারেন।

মেসোমশাইয়ের মাথার পেছন দিকে এক তাপ্পি ধুলো। মহাপুরুষ বললেন, তোমাদের এত ভয় ! বেঁচে আছ কি করে ! মনটাকে বড় চঞ্চল করে দিলে। পঞ্চা, ছিলিম আন।

একটানে কলকের মাথা ব্লপ্ করে জ্বলে উঠল। চোখে এসে গেল তুরীয় দৃষ্টি।

মেসোমশাই একটু সামলেছেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি বুঝলেন বাবা ?

বাবা হুম্ করে একটি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, মেয়ে তোমার দক্ষিণ দিকে গেছে।

দক্ষিণ মানে দক্ষিণ কলকাতা ?

না রে বোকা, দক্ষিণ ভারতের দিকে গেছে।

সে কি, সেখানে কে আছে !

বাবা খুব চটে গিয়ে বললেন, কে আছে, তার আমি কি জানি, সে জানবে তুমি। আচ্ছা দাঁড়াও জল দর্পণে একবার দেখি।

বাবা একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেই জল-টলটলে সানকির ওপর ধরলেন। আগুনের শিখায় জলের রঙ সোনার বর্ণ হল। কি আশ্চর্য ! রঙ ক্রমেই ফিকে থেকে গাঢ় হচ্ছে। জল যেন টলটলে কাঁচা সোনা। বাবা তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। উত্তেজনায় আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

বাবা হঠাৎ নড়ে উঠলেন, নাঃ এখনও সে কোথাও পৌঁছয়নি। মনে হয় ট্রেনেই আছে।

মেসোমশাই বললেন, ট্রেনের ভেতরেই একবার দেখুন না।

তা তো হবে না রে। ট্রেন যে গতিশীল। সে স্থিত না হলে আমার দর্পণে ত আসবে না।

আমি তা হলে এখন কি করব বাবা ?

কি আর করবে, অপেক্ষা কর। ধৈর্য ধরো। সংসারে এমন ঘটনা কত হচ্ছে !

বাবা, ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি !

অবশ্যই আছে।

কে সে ? সে কে ?

অত সহজে বলতে পারব না। অমবস্যার দিন আসনে বসব। সেই দিন তোমার জন্যে আমি সারা ভারত চষে আসব। প্রতিপদে বলতে পারব, মেয়ে তোমার কোথায় আছে, কেমন আছে !

মেসোমশাই একটি দশ টাকার নোট বাবার সামনে মাটিতে রাখলেন। প্রণাম করার জন্য সবে মাথাটি নিচু করতে যাবেন, বাবা অমনি থামের মত পা বের করে নোটে মারলেন লাথি। রাগে লাল চোখ ঘোর রক্তবর্ণ, তুই আমাকে টাকা দিতে এসেছিস। দশ টাকায় আমার সাধনা কিনতে এসেছিস ? এটা কি মুদির দোকান ? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।

মাতামহ বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, শান্ত হোন বাবা ! শান্ত হোন। না জেনে অন্যায় করে ফেলেছে। অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করে দিন। শিব, শিব। শিব, শিব।

বাঙলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা

স্বপ্ন বেশিক্ষণ মনে থাকে না। অনেক সময় জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন মনে রাখতে হলে ঘুম ভেঙে গেলেও ধড়মড় করে উঠতে নেই। চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। তাহলে স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য, কথা, শব্দ ছবির মত মনে থাকে।

স্বপ্ন দেখছিলুম বিশাল এক বাগানে, চাঁদের আলোয় আমি আর ছবিতে দেখা সেই অপর্ণা নামক মেয়েটি বসে আছি পাশাপাশি, গাছতলায়। চাঁদমাখা রাত চারপাশে ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে মসলিনের মধ্যে দিয়ে, কিম্বা মসলিনের মশারির ভেতর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। মাঝে মাঝে চুমকি জ্বলছে। পাশে ওই মেয়েটি বসে থাকায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। এরই মাঝে, কোন্ ঝোপে বসে পাখি ডাকছে। স্বপ্নে অবাস্তব একটা কিছু থাকবেই। তা না হলে, মাতুলের সেই ছাত্রী, সুন্দরী, চিত্রাদেবী, ঘাড় ঢগঢগে সারেঙিঅলাকে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবেন কেন। তিনি চলেছেন আগে আগে, নায়িকার মত, বৃদ্ধ চলেছেন পেছন পেছন জিজ্ঞাসার চিহ্ন ধরে। চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নেই ভাবছি, আহা এ যেন স্বপ্ন ? অপর্ণার দিকে তাকালেই, সে মৃদু হেসে বলছে, কিছু বলো। হঠাৎ দূরে কোথাও গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। চাঁদিনী রাতে মেঘ গর্জন ! এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস। সিনেমা হলে যে ভাবে ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে, সেইভাবে চাঁদের আলো মৃদু হয়ে আসছে। ঢালু জায়গা দিয়ে যেভাবে জল গড়িয়ে পড়ে, সেইভাবে চারপাশ থেকে আঁধার গড়িয়ে আসছে। অপর্ণা ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, এ কি হল পলাশ ? আমার ভীষণ ভয় করছে। কোথা থেকে হঠাৎ একটা পাহাড় গজিয়ে উঠল চোখের সামনে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসছে কুলকুল করে জোয়ারের জলের মত। স্বপ্নে কি যে সব হতে লাগল ! ভয় ছাড়া যেন স্বপ্ন হয় না। ষোড়শী সুন্দরী গাত্রলগ্না। শ্বাসপ্রশ্বাসে তার শরীর ওঠা-নামা করছে। দূরে একটা সাদা মূর্তি দেখা গেল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। কে ? কনক ! সেই মূর্তি যেন মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। সারা মুখে চন্দনের আলপনা। অপর্ণাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি ছুটতে লাগলুম। কনক যেন সাদা মেঘখণ্ডের মত ভেসে চলেছে। আমি তার আঁচল ধরতে না পেরে ক্রমাগত

চিৎকার করে চলেছি, কনক, কনক!

এর পরের দৃশ্য স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

বিছানায় বসে আছি হাঁদা গঙ্গারামের মত। বালিশে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন পিতা। চোখ দুটো খোলা। আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে। পিতার মুখে এক ধরনের শান্ত হাসি, যেন আকাশে চিড় ধরছে। তিনি বললেন, কি হল হে ' যে ভাবে হাত তুলে, কনক, কনক করছিলে, মনে হচ্ছিল ভুস করে আকাশে উড়ে না যাও। তোমার পেট গরম হয়েছে, জোড়া ডাব খেও। আজ পয়সা দিয়ে যাব। উঠে পড়েছ যখন আর শুয়ে কাজ নেই। বাইরে গিয়ে ফাঁকা বাতাসে একটু পায়চারি কর।

আজ প্রায় সাতদিন হয়ে গেল কনকের কোনও খবর নেই। মেয়েটা একেবারে উবে গেল! পুলিস নাকি বলেছেন, আমরা সারা ভারতবর্ষে ছবি ছড়িয়ে দিয়েছি। খোঁজ পাত চলছে। না পেলে আমরা কি করতে পারি। যারা হারিয়ে যায়, তাদের সকলকেই কি আর পাওয়া যায়!

ভাগ্যিস বলেন নি, মারা গেলে কি করতেন?

প্রতাপ রায়ের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আর তেমন ভাল ব্যবহার করছেন না। মেয়ে নেই, তা ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে অত খাতির কিসের! মেসোমশাই এতদিনে বুঝেছেন, মানুষ কান ধরে টানে, মাথাটা কাছে আনার জন্যে। শুধু কানের কোনও কদর নেই। মেসোমশাই আজ আবার ফিরে আসছেন এ বাড়িতে। ব্যাক টু মেথুসেলা! এখন তাঁর মনে হয়েছে, হরিদার মত মানুষ হয় না। যতই হোক একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক রয়েছে।

কোথা থেকে কনক এলো, এসে একটা দাগা দিয়ে চলে গেল। যখনই মনে হচ্ছে, কনক আর বেঁচে নেই, তখনই ভেতরটা হুহু করে উঠছে। কনকের মত মেয়ে, একা পরিব্রাজিকা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। অসম্ভব। সে ত সিস্টার নিবেদিতা নয়, কিম্বা সেই ভৈরবীও নয়, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধনা করাবার জন্য হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

কনকের খোঁজে তিন জন তিনভাবে এগোচ্ছেন।

পিতা চলেছেন বিজ্ঞানের রাস্তায়। তিনি রাতের পর রাত অঙ্ক কষে চলছেন। একটি মেয়েকে যদি জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়, আর সে মেয়ে যদি স্বাধীনচেতা এবং শিক্ষিতা হয়, এবং যুগটা যদি আধুনিক, নারী স্বাধীনতার যুগ হয়, তাহলে মেয়েটি কি করবে? রুল অফ থ্রি লাগাও। নানা রকম কেস হিসট্রি ঘেঁটে দেখো। অনুরূপ অবস্থায় কোন মেয়ে কি করেছে অনুসন্ধান করো, খোঁজ নাও। নিজের মনেই থেকে থেকে বলছেন, ইনভেসটিগেশান, ইনভেসটিগেশান। এখন তাঁর অবস্থা প্রায় শার্লক হোমসের মত।

আমি একটা কেসই জানি, সেইটাই বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এসেছি। সে হল আমাদের পাশের বাড়ির জবা। যাকে নিয়ে সুখেন দুর্গাপুরে পালিয়েছিল। যার জন্যে দীনু আজ পরলোকে। পিতা বললেন, ওটা হল সিমপল রুল অফ থ্রি। চেয়েছি পেয়েছি। ও হল, মিঞা বিবি রাজি তো কেয়া করে কাজি। ওটা কোন কেস নয়, ও হল কেলেঙ্কারি। এক ফুটোঅলা চৌবাচ্চার অঙ্কে হবে না। চাই ডবল ফুটো। একটা খোলা, একটা বন্ধ। আমার তো তেমন কোনও কেস জানা নেই।

মাতামহ কখনও চলেছেন আধ্যাত্মিক রাস্তায়, কখনও চলেছেন ভৌতিক রাস্তায়। মেসোমশাই ভাবছেন আইনের কথা। প্রতাপ রায়ের নামে একটা কেস ঠুকে দেবেন। হয় মেয়েকে খুঁজে দাও, নয় জেলে যাও। এদিকে কনক কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। আগামীকাল অমাবস্যা। সেই ঘুরঘুরে বাবা পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে ভূত নামাবেন।

সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে পিতা বললেন, একটা মেয়ে পেতুম!

কি করতেন?

শুধু মেয়ে পেলেই হবে না, তার স্বভাবটি হওয়া চাই কনকের মত। তা হলে কেসটা আমি রি-কনস্ট্রাক্ট করতুম। প্রতাপের মত একটা থার্ডক্লাসের সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়তুম, তারপর সব সময় চোখে চোখে রেখে দেখতুম, সে কি করে! এর মধ্যে আমি তিন ভল্যুম অপরাধ বিজ্ঞান পড়ে ফেলেছি।

জানো কি, একটা খুনের কিনারা করতে আর একটা খুন করতে হয় !

আজকের কাগজে কনকের ছবি দিয়ে আবার একটা বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। 'কনক, ফিরে এস। তুমি যা চাও তাই হবে। বাবা।' ছবিটা দেখছি, আর রাতের স্বপ্ন মনে পড়ছে। জানি, স্বপ্নের কোনও অর্থ হয় না, তবু ভয় হচ্ছে, কনক হয় তো বেঁচে নেই।

আমার কেবলই মনে হচ্ছে নৌকোয় দেখা সেই সতীমার কাছে একবার যাওয়া যেত, তাহলে হয় তো সঠিক খবর পাওয়া যেত। মাতামহ কেন যে হঠাৎ ঘুরঘুরে বাবাকে নিয়ে মেতে উঠলেন ! আগামীকাল হয়তো আবার ঘুরঘুরে বাবার আশ্রমে যাওয়া হবে। এবার রাতের দিকে, থাকতে হবে সারারাত। যেতে হবে বাসে। মেসোমশাই আজই যদি এখানে চলে আসেন, তা হলে প্রতাপ রায়ের গাড়ি কি আর পাওয়া যাবে

আজ আমার জীবনের সাংঘাতিক একটি দিন। আজ থেকে শুরু হবে দাসত্ব। চাকরিতে বহাল হবার চিঠি এসে গেছে। মাইনেটা খুব একটা খারাপ নয়। আপাতত শ ছয়েক। ফ্রী লাঞ্চ। তিন মাস শিক্ষানবিশীর পর চাকরি পাকা হবে। তখন শ আটেক মিলবে। পিতা অবশ্য খুশি নন। তাঁর মতে চাকরি যদি করতেই হয়, চার অঙ্কের কমে করা উচিত নয়। সে যোগ্যতা আমার নেই। অ্যাডমিনসট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষায় বসলে গোল্লা পাব। যা হয়েছে, আমার মত বুদ্ধুর পক্ষে ভালই হয়েছে।

লেবরেটরি মানেই কারখানা। কারখানার নিয়মেই চলতে হবে। আট ঘণ্টা ডিউটি, শুরু সকাল সাড়ে আটটায়। তানা নানা করার মত সময় নেই বললেই চলে। নিচে প্রফুল্লকাকারা এসে একদিকে ভালই হয়েছে। আমরা সবাই বেরিয়ে গেলে, নিচে বাড়ি আগলাবার জন্যে একটি প্রাণী অন্তত থাকবেন।

সংসারের কাজে আজ আমার ছুটি। প্রথম দিন, ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে হবে। যেতে, বাসটাস বদলে কতক্ষণ লাগবে জানা নেই। পিতা বললেন, দেখো, আমার নামটা যেন ডুবিও না। বেরোবার আগে গুরুজনদের ছবিতে প্রণাম করবে। আশীর্বাদ চাইবে। আজ তোমার জীবনের একটি পরিবর্তনের দিন।

বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদরের দরজার কাছে এসেছি, দেখি কাকীমা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাতে একটা লাল টকটকে জবা। ফুলটি কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন, পকেটে রেখে দাও, মায়ের পায়ের ফুল। দুর্গা, দুর্গা। ছুটি হলেই চলে আসবে। এখানে ওখানে আড্ডা মারবে না। মনে থাকে যেন, আমি একলা থাকব। এত বড় বাড়ি, সন্ধ্যের দিকে ভীষণ ভয় ভয় করে।

মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। কোন সুদূরের এক মহিলা, মাতৃস্নেহে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার পাশে, হাতে একটি ফুল নিয়ে। এ দেশের ছেলে সহজে কি সন্ন্যাসী হতে পারে ! প্রতি পদে পিছু টান।

সেদিনের সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘর। ঢুকতে আজ আর বুক কেঁপে গেল না। স্নিগ্ধ বৃদ্ধ, পরিচ্ছন্ন মটকার পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। সামনে একটি বিশাল টেবিল। পেছনে কাচ ঢাকা বুক-কেসে মোটামোটা কেমিস্ট্রির বই। পিতার মুখে এই মানুষটির পরিচয় সামান্য জেনেছি। এক সময়কার সেরা ছাত্র, সেরা বিপ্লবী। নামে ইংরেজ সরকার সিংহাসনে বসে কাঁপত। বিদেশ থেকে বোমার ফর্মুলা এনে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের হাত শক্ত করেছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দের প্রিয় শিষ্য। এখন গৃহী সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন কাটাচ্ছেন। যদিও অকৃতদার, প্রতিপাল্যের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একটি অনাথ আশ্রম করেছেন। উপার্জনের অর্ধেক টাকা সেই আশ্রমেই ঢেলে দেন।

এত বড় একজন মানুষ অথচ শিশুর মত সরল। ব্যক্তিত্বের কোথাও এতটুকু অহংকারের আঁশ নেই। চোখ দুটি স্নিগ্ধ। স্নেহ মাখা। চশমার আড়ালে ঢুলঢুল করছে, যেন ঘোর লেগেছে। আমাকে দেখেই বললেন, বোসো, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলুম। খুব সকালে বেরিয়েছ, নিশ্চয় খাওয়া হয় নি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি।

কি জলখাবার খেয়েছ ?

আজ্ঞে পাঁউরুটি আর চা।

ডিম নয়, দুধ নয়, শুধু চা আর পাঁউরুটি!

ওইটাই যে বেশ সহজে হয়।

তা হয়, তবে তোমার বয়েসের ছেলের আর একটু পুষ্টির দরকার। একটা করে মুরগীর ডিম খেলে কেমন হয়! কোনো বাধা আছে?

আজ্ঞে না, তা নেই।

তা হলে কাল থেকে তাই খাবে। এখানে তোমাকে খুব খাটতে হবে। লাঞ্চ পাবে ত সেই একটার সময়। দাঁড়াও, দেখি, তোমাকে কি খাওয়ান যায়।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার পেট বেশ জয়ঢাক হয়ে আছে।

লেবরেটারিতে একবার গিয়ে ঢুকলে, তোমার ঢাক চুপসে যাবে। বুঝতে পেরেছি, তোমার লজ্জা হচ্ছে। সংকোচ হচ্ছে। হতেই পারে। যে হেতু আমি তোমার এমপ্লয়ার। ভুলে যাও, তফাৎটা ভুলে যাও।

তিনি কথা বলতে বলতে ঘরের কোণের দিকে চলে গেলেন। সাদা রঙের একটি ফ্রিজ সেই কোণে গুন গুন করছে। দরজাটা টেনে খুলতেই হা করে একটা শব্দ বেরলো, যেন কোনও সাধক প্রাণায়ামে বসে 'রেচক' করলেন। যতক্ষণ দরজাটা খোলা রইল ততক্ষণ জলতরঙ্গ বাজতে লাগল মৃদু সুরে।

সাদা একটা প্ল্যাস্টিকের বাটিতে জমাটমত কি একটা বস্তু এনে আমার সামনে রেখে বললেন, নাও, খেয়ে নাও। এর নাম 'ইয়োগহার্ট'। যেমন উপকারী, তেমনি সুস্বাদু।

বাবা, এমন বস্তুর নাম জীবনে শুনিনি। হার্ট যুক্ত শব্দ, সঙ্গে আবার ইয়োগ। অর্থাৎ যোগ। বাংলা করলে দাঁড়াবে যোগহৃদয়। সঙ্গে একটি সুদৃশ্য কাঠের চামচ। লজ্জা করলে চলবে না। খেতেই হবে। ঠিক আইসক্রিম নয়, অনেকটা দইয়ের মতই স্বাদ, তবে ভেতরে প্রচুর কিসমিস, খেজুর, কুমড়োর বরফি, আমসত্ত্ব ঠাসা। বেড়ে তরিবাদি ব্যাপার।

প্রবীণ ম্যানেজিং ডিরেকটার সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যত খাচ্ছি, তাঁর তত তৃপ্তি হচ্ছে। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ কি ভাবে এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন! বইয়ে পড়েছি, শোষণ আর শাসনই হল ধনতন্ত্রের মূল কথা। কই মিলছে না ত?

পাত্র যখন প্রায় সাফ করে ফেলেছি, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, জিনিসটা কেমন?

আজ্ঞে অসাধারণ। একেবারে অমৃতোপম।

তোমার খুব খিদে পেয়েছিল। বুঝতে পার নি?

খিদের সময় কমদিনই খেতে পেয়েছি, তাই খিদে কাকে বলে তেমন বুঝতে পারি না।

জানি, জানি, আমার ফ্রেণ্ড হরিকে আমি চিনি। অতিমানব হবার সব গুণ নিয়ে মানব হয়ে বসে আছে। জানো, ওর স্বপ্ন ছিল, এই ধরনের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। সে প্রতিভাও ছিল। আমার চেয়ে একশোগুণ ভাল ছাত্র। আর আমি চেয়েছিলুম দেশ সেবক, মানব সেবক হতে। দু'জনেই আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। পয়সা করেছি, কিন্তু মানুষ হতে পারি নি। যাও, হাত ধুয়ে এসো। ওই দরজাটা খোলো। ওটা বাথরুম। কাপটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দাও।

হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এলুম। ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিচু হয়ে বুক কেসের তলা থেকে ঘড়ির মত কি একটা বস্তু টেনে বের করলেন। কাঁটা বসানো।

এসো, এর ওপর দাঁড়াও, তোমার ওজনটা নিয়ে রাখি।

ওজন?

হ্যাঁ, ওজন। তুমি কতটা আণ্ডারওয়েট, আমার দেখা দরকার। এক মাসের মধ্যে তোমাকে আমি মোটা করে দোব। শরীরম্ আদ্যম, খলু ধর্ম সাধনম্।

যন্ত্রে উঠে দাঁড়ালুম। ঝুঁকে পড়ে কাঁটাটা দেখে বললেন, অনেকটা বাড়াতে হবে। শুধু দইয়ে হবে না, মধু চাই, মুরগী চাই, চিজ চাই, ছোলা চাই, ভিটামিন চাই, মিনারেলস চাই। আমাদের লাঞ্চ খুব ভাল,

ব্রেকফাস্ট আর ডিনারটাকে যদি সামলাতে পারো, একমাসে তোমার উন্নতি হতে বাধ্য। আচ্ছা, এবার তাহলে চলো।

দুটো বাড়ির মাঝখানে সেতুর মত ঝুল বারান্দা। বারান্দা শেষ হয়েছে জাহাজের ডেকের মত একটা জায়গায়। মোটা মোটা লোহার চাদর। নিচের দিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে বিশাল কারখানা। বিরাট একটা ভ্যাটে সাবান ফুটছে। ক্ষার ক্ষার ধোঁয়া উঠছে। এক দিকে একটা বয়লার। মাঝে মাঝে রেল ইঞ্জিনের মত বাষ্প ছাড়ছে। নানা রকম কেমিকেলসের গন্ধ ভেসে আসছে। সব গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে ন্যাপথলিনের গন্ধ। ছোট ছোট ট্রলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট সিঁড়ি ভেঙে আমরা একটা নতুন ব্লকে চলে এলুম। এবার নাকে আসছে অন্য গন্ধ। এ গন্ধ আমার ভীষণ চেনা। কলেজ ল্যাবরেটারিতে শুঁকে এসেছি। অ্যাসিড, ইথার। ল্যাবরেটারিটি বেশ আধুনিক। নেহাৎ ছোট নয়। জনা দশেক কেমিস্ট এরই মধ্যে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খাড়া খাড়া ব্যুরেট। র‍্যাকে র‍্যাকে সাজান রি-এজেন্টের বোতল। ত্রিপদে গলা উঁচিয়ে আছে ডিসটিলেশান জার। বুনশেন বারনার জ্বলছে। প্রতিটি টেবিলের শেষে বেসিন আর কল।

বই ঠাসা কাচের ঘরে বসে আছেন ডিসপেপটিক চেহারার এক ভদ্রলোক। অ্যাপ্রন পরা অবস্থায় তাঁকে ফাদারের মত দেখাচ্ছে। ল্যাবরেটারিতে ম্যানেজিং ডিরেকটার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যিনি কিছুই করছিলেন না, তিনি হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে একটা খালি টেস্টটিউব চোখের সামনে তুলে ধরে গভীর মনোযোগে ভেতরের বাতাস দেখতে লাগলেন।

এম ডি ডাকলেন, প্রদ্যোত উঠে এসো।

ইনিই সেই প্রদ্যোতবাবু, যাঁর হাতে আমাকে ফেলে দিলে একমাসেই মানুষ করে দেবেন। প্রদ্যোতবাবুর চোখে যে চশমাটা ছিল, সেটা খুলে, দ্বিতীয় আর একটা চশমা পরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সামনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কোমরের পেছন দিকে দু'হাত রেখে শরীরটাকে সোজা করতেই ঢেউ করে একটা ঢেকুর উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, সরি। বুড়ো আঙুল ছাড়া সব আঙুলেই একটা করে আঙটি। ভাগ্যকে পাথরের চেন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন।

এম· ডি বললেন, পেটে মনে হচ্ছে, শুম্ভনিশুম্ভের লড়াই চলেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল পেট। এইবার একটু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাই। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের টেবিলের এক ভদ্রলোককে বললেন, সুধীর, অ্যানালার এইচ সি এল কয়েক ফোঁটা জলে গুলে দাও তো ?

সুধীরের চেহারাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বার্নারের ওপর বিশাল একটি কেটলি বসিয়ে নল দিয়ে বাষ্প বেরনো দেখছিলেন। তিনি বললেন, চা খাবেন না স্যার ?

চাও খাবো, অ্যাসিডও খাবো। এবার থেকে আমি সব খাবো।

এম· ডি বললেন, এ ভেরি গুড ডিসিসান। না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরা ভাল। আচ্ছা, এই নাও, এই ছেলেটিকে তৈরি কর। পলাশ চট্টোপাধ্যায়। নাড়াচড়া করলেই বুঝতে পারবে কি জিনিস ! ভেতরে একটু আগুনটাগুন আছে ! শোনো পলাশ।

বলুন।

প্রদ্যোত বেসিকেলি বড় ভাল ছেলে। তবে একটা দপ্তর চালায় তো, চিফ কেমিস্ট, তার ওপর পেটরোগা, তাই মেজাজটা তেমন সুবিধের নয়। মাঝে মাঝে আমাকেও দাঁতমুখ খিচোয়। তা নিয়মটা হল, ও খিচোলে তুমি খিচোবে না। চুপ করে থাকবে। মনে মনে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর, তুমি এঁর ক্রনিক ডিসপেপসিয়া ভাল করে দাও। আচ্ছা প্রদ্যোত ?

আজ্ঞে বলুন !

আমি তোমাকে কি বলেছিলুম ?

আজ্ঞে যোগাসন।

হচ্ছে ?

মাঝেমাঝে।

কই দেখি, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসনটা করে দেখাও তো ?

এখানে ?

বেশ, আমার ঘরে চলো। কার্পেটের ওপর করবে।

ওটা বড় কঠিন। আমার পক্ষে শবাসনটাই বেস্ট।

সুধীরবাবু আধ গেলাস জল প্রদ্যোৎবাবুর হাতে দিলেন। ঢক ঢক করে খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিলেন। এম ডি বললেন, বাঁচতে যদি চাও আসন করো প্রদ্যোত, আসন করো।

আসন করো, সাধন করো, বলতে বলতে এম ডি ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, পলাশ, মন খারাপ লাগলে আমার কাছে চলে এসো। আর হ্যাঁ, রোজ সকালে, আমার সঙ্গে দেখা করে, তবে এখানে আসবে। জানো তো, সব পুজোর আগে গণেশ পুজো ?

চিফ কেমিস্ট ভদ্রলোক বললেন, সুধীর, এক গেলাস চা বেশি হবে ?

হ্যাঁ স্যার, জল ঢেলে দিয়েছি।

নতুন একটা অ্যাপ্রন বের করে দিও, একটা তোয়ালে।

দিচ্ছি স্যার।

রবিবাবু ?

বলুন।

দীর্ঘ চেহারার, মিষ্টি একজন মানুষ এগিয়ে এলেন। পোশাকপরিচ্ছদে একেবারে টিপটপ। মুখে চোখে সুস্বাস্থ্যের ঝিলিক। হাসি হাসি মুখ।

পলাশকে আপনার হাতে তুলে দিলুম। তৈরি করে নিন।

রবিবাবু আমার কাঁধে একটি হাত রাখলেন। আমার দাদা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, দাদা যেন কাঁধে হাত রেখেছেন। সেই জয়মাতা আমাকে একটি দৃষ্টিদান করেছিলেন, চোখের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্দরমহল দেখার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা এখনও হারায় নি। রবিবাবুর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। ঊষার আকাশের মত বর্ণময়, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। আমার ভেতরে যেন আনন্দের হিল্লোল বইছে। এত ভাল লোক একজায়গায় এসে মিললেন কি করে ?

বাতাসের মত মৃদু স্বরে রবিবাবু বললেন, এসো। এসো বললুম বলে রাগ করলে না তো !

আজ্ঞে না।

আজকে আমি সারাদিন কাজ করব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখবে। তুমি হবে তন্ত্রধারক। গোটাকতক জিনিস তোমাকে অবশ্য শিখতে হবে। তার মধ্যে প্রথম হল সেফটি। কোন জিনিস কার সঙ্গে কি ভাবে মেশাবে ! কি ভাবে তাতাবে। কেউ স্বভাবে রাগী, কেউ ঠাণ্ডা। অ্যাসিড, অ্যালকালি আর নিউট্রাল, এই নিয়েই আমাদের কারবার। আচ্ছা, এসো, এখন আমাদের টি ব্রেক।

গেলাসে, গেলাসে চা নিয়ে শুরু হল আমাদের চা পর্ব। কেউ বসেছেন চেয়ারে, কেউ উঁচু টুলে। সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় জমে গেল। রবিবাবু হলেন কেমিস্ট-ইন-চার্জ। আর একজন ইনচার্জের নাম সমীরবাবু। গোলগাল, বেঁটেখাটো মানুষ। আপেলের মত গায়ের রঙ। কুচকুচে কালো চুল। ইনিও খুব আস্তে কথা বলেন। জমিদার ফ্যামিলির ছেলে। এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করছেন।

চারদিকে বুনসেন বার্নার জ্বলছে। বাইরে গরম, ভেতর আরও গরম। তার ওপর গরম চা ? রবিবাবু বললেন, প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। পরে সবই সহ্য হয়ে যাবে। মানুষ কি না পারে ! নাও, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া কোডেক্সটা খোল। আমরা এখন টেষ্ট করব, সোডিয়াম স্যালিসিলেট। তুমি পড়ে পড়ে বল, আমি তোমার সামনে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে থাকি।

বেলা এগারোটার সময় ল্যাবরেটরি কাঁপিয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। দৈত্যের মত বিশাল চেহারা। শালপ্রাংশু মহাভুজ। এই প্রথম একজনকে পেলুম, যিনি গলা ছেড়ে কথা বলেন, ঘর ফাটিয়ে হাসেন। এনার নাম জিমূতবাবু। ইনি মাল তৈরি করার কেমিস্ট। নিচের বিশাল কারখানায় এনার সাম্রাজ্য।

সেখানে সারাদিন জলদস্যুর মত হাঁকডাক করে ঘুরে বেড়ান।

জিমৃতবাবু করমর্দনের জন্যে আমার সামনে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বাঘের থাবায় আমার বেড়ালের থাবা তিনবার নেচে উঠতেই মনে হল কাঁধের কাছ থেকে আমার হাত খুলে বেরিয়ে যাবে। হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আজ মাংস, আজ মাংস।

জিমৃতবাবু আমাদের লাঞ্চ ইনচার্জ। যেদিন মাংস হয়, জিমৃতবাবু সেদিন নিজে মাংস রাঁধেন। সে রান্না হয় নিচের কারখানায়, ষ্টিমে।

জিমৃতবাবু বললেন, আজ তা হলে পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। খেয়ে বলবেন, কেমন হয়েছে। সুবীর, তুমি তা হলে পৌনে একটার সময় নিচে যাবে।

জিমৃতবাবু চলে গেলেন। ল্যাবরেটারি নিস্তব্ধ। বিকারে ফোঁটা ফোঁটা রি-এজেন্ট পড়ার শব্দ। ফ্লাস্কে জল ফোটার শব্দ। ফিলটার পেপার লাগান ফানেল থেকে টিপ টিপ করে নেমে চলেছে তরল পদার্থ। সার সার বোতলে টলটল করছে নানা রঙের রিএজেন্ট। বাতাসে উত্তাপ কাঁপছে, ইথার আর ক্লোরোফর্মের গন্ধ ভাসছে।

রবিবাবু বললেন, চলো, সেনসিটিভ ব্যালানসে কি ভাবে ওজন করতে হয় তোমাকে শেখাই।

ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল, ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে বসার উপায় নেই। পা দুটো ইতিমধ্যেই বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। ফুলোফুলো লাগছে। আলাদা একটা ঘরে, কাচের আধারে সারি সারি ওজন যন্ত্র। এর মধ্যে একটা দুটো এত সূক্ষ্ম যে হাওয়া ওজন করা যায়। এই একটি মাত্র জায়গা, যেখানে একটু বসা চলে।

সাড়ে চারটের সময় রাস্তায় নেমে মনে হল, আর এক পা-ও হাঁটতে পারব না। পা দুটো থামের মত ভারি হয়ে উঠেছে। জুতো দুপাটি কাপ হয়ে বসে গেছে। মাথা টলছে। একটা জিনিসই মুখে লেগে আছে, জিমৃতবাবুর রান্না করা বাষ্পপক্ক মাংস। বেশ বড় মাপের মাটির ভাঁড়ে সেই মাংস যখন ঘরে এসে ঢুকলো, গন্ধেই আমি কুপোকাত। যেমন তার বর্ণ, তেমনি তার স্বাদ। পাঁঠার মত একটা জিনিস যে এইভাবে রূপান্তরিত হতে পারে আমার জানা ছিল না। আজ এই খেয়ে বুঝলুম। নাঃ, প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই সর্বাঙ্গসুন্দর। জয় বাঙালী। ভাগ্য এতদিনে মুচকি হেসেছে। শেষ রক্ষে হলে হয়।

সামনেই সেদিনের সেই পার্কটা। একটু বসে যাই। অনেকটা গেলে, তবে বাস কি ট্রাম মিলবে। আয়ারা প্যারামবুলেটারে চাপিয়ে ফুটফুটে সব বাচ্চা নিয়ে এসেছে। আগামী পৃথিবী মনে হয় খুব সুন্দর হবে। আজকের মত সূর্য বিদায় নিচ্ছে। বাতাসে রাতের শীতল ওড়না উড়ছে। সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে কনকের কথা মনে পড়ে গেল। কনক এখন কোথায়!

জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়।

একে অমাবস্যা। তায় শনিবার। তার ওপর রটন্তি কালীপূজা। রাত একেবারে গমগম করছে। পিচকালো আকাশে তারার খই ফুটছে। শুকনো বাতাস বইছে। ঘুরঘুরে বাবার আশ্রম কেমন যেন থমথম করছে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। রাত যে এত রহস্যময়ী এখানে না এলে বোঝা যেত না।

মেসোমশাই রেগে মেয়েকে নিয়ে প্রতাপ রায়ের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন। ভদ্রলোকের সে দাপট আর নেই। বেশ ভেঙে পড়েছেন। এত ভেঙেছেন যে আজ আর আমাদের সঙ্গে আসেননি। মাতামহ যা ধরেন, তার শেষ দেখে ছাড়েন। আমরা দু'জন বার কতক বাস পালটে, সন্ধ্যের মুখে এখানে এসে

হাজির হয়েছি। একে একে আমাদের মত আরও সব বিশ্বাসী মানুষ এসে পড়েছেন। মহিলারাও আছেন। এক এক জনের এক এক সমস্যা। কারুর ছেলের অসুখ। কারুর স্বামী মরণাপন্ন। কারুর চাকরি নেই। সমস্যার ভারে সবাই নেতিয়ে পড়ে, এখানে ওখানে বসে আছেন চুপচাপ। অন্ধকারে বসে বসে কবিতার সেই লাইন কটা মনে পড়ছে : মুখ দিল যে, ভুখ দিল সে, মৃত্যু দিল লেলিয়ে পাছে পাছে।

মাতামহ মাঝে মাঝে চটাস করে মশা মারছেন। সামান্য শব্দ, তাই কত জোর মনে হচ্ছে! নির্জনতা এমন জিনিস! মাতামহ গুনগুন করে গান ধরলেন, শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি/ শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি। ক্রমশই ভাব আসছে। হঠাৎ গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে না ওঠেন! গান থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে আনা দরকার।

দাদু!

বল।

ঘুরঘুরে বাবা কখন আসনে বসবেন?

আর একবার শেয়াল ডাকুক।

কখন আবাব ডাকবে?

সে ওদের ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ির নিয়মে ওরা ডাকে। তুই কি ভাবিস মানুষই একমাত্র জীব। পৃথিবীতে কত আধ্যাত্মিক প্রাণী আছে জানিস? এই যে কচ্ছপ, কচ্ছপ কত বড় যোগী! শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপব কি কনট্রোল! কুম্ভক করে বসে রইল সারাদিন। এক একটা কচ্ছপ তিনশো, চারশো বছর বাঁচতে পাবে। ঐরাবতের স্বভাব হল ঋষিদের মত। নিরামিষাশী। শরীরটা দেখেছিস! একেবারে পর্বতের মত। ধীর, স্থির। রেগে গেলে দুর্বাসা।

কিন্তু দাদু, শেয়াল তো শুনেছি, ভীষণ ধূর্ত। চোর। শেয়ালের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কি আছে?

শেয়াল হল তান্ত্রিক। শৃগাল ছাড়া তন্ত্রসাধনা হয় না। শেয়ালের ডাক শুনেছিস। এমন উদাত্ত গলায় আর কোনও প্রাণীকে ডাকতে শুনেছিস? শেয়ালের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণ জোরদার। শুভ, অশুভ দুটোই আগেভাগে জানতে পারে। যে সব প্রাণী রাতে জাগে তারা সবাই হল সাধক।

পাখি তাহলে সাধক নয়?

হ্যাঁ, পাখিও সাধক। শেষ রাত্রে সে ঈশ্বরকে ডাকে। একটি ডালে দুটি পাখির অর্থ বুঝিস?

না।

জীবাত্মা আর পরমাত্মা। পাশাপাশি, দুটোই এক। কথামৃতে ছবি দেখেছিস তো। পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। চোখ দুটো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলছেন, যোগীর চোখ ওইরকম ফ্যালফ্যাল করে। তখন থেকে তুই অমন ছটফট করছিস কেন? শান্ত হয়ে বোস না!

ভীষণ মশা কামড়াচ্ছে যে!

সহ্য করতে শেখ। সাধন জগতে শরীরকে তৈরি করতে হবে লোহার মত করে। টললে চলবে না, টসকালে চলবে না। আমি লৌহ ভীম বলে শুরু করতে হবে। চাকরিটা কেমন লাগছে?

বেশ ভালই। তবে চাকরি তো। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, আট ঘণ্টা আটকে থাকা।

খাঁচার পাখি, তাই না! বড় দুঃখু রে! ভেবেছিলাম তোকে সংসারী করে দিয়ে কংখলে চলে যাব। যাঃ শালা, মেয়েটাই হারিয়ে গেল। তুই আমাকে একটা জিনিস কিনে দিবি?

কেন দোব না! বলুন কি চাই?

কলুটোলা থেকে আমাকে একটা আলবোলা কিনে এনে দিবি! বেশ লম্বা নলঅলা। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, বেশ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে, জমিদারদের মত ফরসিতে অম্বুরী তামাক খাই। শোন সংসারে যদ্দিন বাঁচবি, রাজার মত বাঁচবি।

অন্ধকারে ফোঁস্ ফোঁস্ করে মেয়েলি গলার কান্না শোনা গেল। কাঁদে কে? মাতামহ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অন্ধকার কোণ থেকে প্রবীণা কোনও মহিলার উত্তর ভেসে এল, আমার মেয়ে বাবা।

মাতামহ বললেন, কেন, খিদে পেয়েছে ?

আমার মাতামহের এই এক দোষ। কখন কি যে বলে বসেন ! আঃ , দাদু, খিদে পাবে কেন ? যিনি কাঁদছেন তিনি বয়েসে বড়, শিশু নয়।

ও, তাই নাকি ! তাহলে, মনে খুব দুঃখ হয়েছে। দ্যাখো, কি আবার হল !

প্রবীণা মহিলা বললেন, এক শয়তান ছেলে মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিয়ে পালিয়েছে। বাবা কথা দিয়েছেন, এর জীবনের একটা বিলি-ব্যবস্থা করে দেবেন।

মাতামহ গর্জন করে উঠলেন, ওর আর বিলি-ব্যবস্থা কি ? কোথায় সেই ছেলেটা আছে বল, জুতিয়ে লাশ করে দি।

সে আর এ দেশে নেই বাবা, জার্মানীতে গিয়ে বসে আছে। সেখানে এক মেমসায়েব জুটিয়েছে।

বসে আছে, বসে থাক। মেয়ের আবার বিয়ে দাও।

এ পোড়া দেশে বাবা, মেয়েদের একবারই বিয়ে হয় না, দ্বিতীয়বার কে বিয়ে করবে ? তেমন ছেলে কি আছে ? ঠোকরান ফল কি দেবতার পুজোয় লাগে !

তা হলে মেয়েকে বিন্ধ্যাচলের কোনও আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। আসল দেবতার সেবা করুক।

সকলে কি তা পারে বাবা ! সংসারের মায়ায় সব লাট্টুর মত ঘুরছে।

মাতামহ উঠে পড়লেন, চল, একটু ঘুরে ফিরে দেখি। দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। কেন যে মানুষ জন্মায় !

অন্ধকারে, অন্ধকারে অনেকেই এসেছেন। এক ভদ্রলোক মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। অন্ধকারে কে যেন জিজ্ঞেস করলেন, প্রবোধ, খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা !

মাতামহ থমকে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ?

উত্তর এল, আর কি হবে দাদা ! রাজরোগ। পেটে ক্যানসার।

আরও দু ধাপ এগোতেই দেখা গেল সামান্য একটু শ্বাস নেবার জন্যে এক মহিলা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছেন। এই বয়েসেই হাঁপানি ! এই অমবস্যার রাতে, ঘুরঘুরে বাবার আশ্রমে নামহীন মানুষের দল এমন কিছুর আশায় এসেছেন, যা অলৌকিক। বিজ্ঞান যা দিতে পারে না, বাবা তাই দেবেন।

বাবার গলা পেয়ে আমরা ফিরে তাকালুম।

বাবার বিশাল শরীর দাওয়ায় পিলারের মত খাড়া। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে মিটমিট আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে বাবাকে মনে হচ্ছে অন্ধকারের দেবতা। বাবা অদ্ভুত গলায় ডাকছেন, আয়, আয়, আয়। অতি সাধারণ একটি শব্দ, কিন্তু ডাকার ধরনে এই ছায়াময় পরিবেশ কেমন যেন ভৌতিক হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে সমস্ত অশুভ শক্তি চারপাশ থেকে হিলহিল করে ছুটে আসছে। চতুর্দিকে যেন বিচিত্র সব আকার আকৃতি প্রাণময় হয়ে উঠছে। বাবা ভৌতিক গলায় প্রেতাত্মাদের ডাকছেন, আয়, আয়। প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় ছায়া কাঁপছে। চোখের ভুল কি না জানি না, বাবা ক্রমশই একটি লাল আগুনের মত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সারা শরীর যেন জ্বলজ্বলে আগুনের রেখা। প্রতিবার আয় বলছেন, আর মুখ দিয়ে যেন ভলকে ভলকে নীল আগুন ছুটছে, বেশ মোটা বিদ্যুতের রেখার মত। ভয়ে মাতামহের গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। তিনি ফিসফিস করে বললেন, তোরা বিশ্বাস করিস না, শক্তিটা একবার দ্যাখ। আরে বোকা ! ভয়ে কাঁপছিস কেন ?

যা দেখছি, তা কি সত্যিই দেখছি ?

অন্ধকারে কারা যেন ছুটে আসছে। আকৃতি বিশিষ্ট তাল তাল অন্ধকার এ পাশ থেকে ওপাশ থেকে তেড়ে আসছে। মাতামহ ফিস ফিস করে বললেন, কি আসছে বুঝতে পারছিস ?

না দাদু, মনে হচ্ছে কুকুর।

কুকুর নয় রে বোকা। শেয়াল। কত শেয়াল দেখছিস !

বাবা বললেন, নে সেবা কর।

কি যেন সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। একটা দুটো নয়, অনেক শেয়াল, গোটা বারো তো হবেই, নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে, শান্ত হয়ে খেতে লাগল। কড়মড় শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, হাড় চিবোচ্ছে। এতক্ষণ যেখানে যত আর্তনাদ, আর চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সব থেমে গেছে। শুধু কানে আসছে শেয়ালদের নড়াচড়া, নিঃশ্বাস, আর হাড় ভাঙার শব্দ। মিটিমিটি প্রদীপের আলোয় বাবার বিশাল ছায়া কাঁপছে। নারকেল গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের শ্বাস ভাঙার শব্দ উঠছে।

বাবা হুঙ্কার ছাড়লেন, নে, এবার তোরা পাগলীর জয়ধ্বনি কর। ডাক ডাক, গলা ছেড়ে ডাক। একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ মা। একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ।

শেয়ালগুলো অমনি আকাশের দিকে মুখ তুলে সমস্বরে ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। আর বাবার সেই চ্যালা, বামন পঞ্চানন, কোণে দাঁড়িয়ে রামশিঙায় ফুঁ দিল। শেয়ালের ডাক আর ভোঁ ভোঁ শব্দে তলতলে অন্ধকার থলথল করে কাঁপতে লাগল। সারা গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। কি অদ্ভুত সাধনপদ্ধতি। এমনটি আমি কোথাও দেখিনি। আমি ধ্যান দেখেছি, জপ দেখেছি, ভাবে বিভোর হয়ে মানুষকে নাচতে দেখেছি, সাধন সংগীতে অশ্রু বিসর্জন দেখেছি, হোম দেখেছি। এ জিনিস দেখিনি।

বাবা পা ফাঁক করে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ খলখল করে হেসে উঠলেন। মনে হল বিশাল এক জলপ্রপাত উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে আসছে। মনে হচ্ছে, কোনও গুহার মধ্যে দিয়ে নদী ছুটে চলেছে। হাসি থামিয়ে, দু হাত ওপর দিকে ধুলো ছোঁড়ার মত করে ছুঁড়তে ছুঁড়তে, বাবা বলতে লাগলেন, যাঃ ব্যাটারা, যাঃ চলে যা, যাঃ যাঃ।

নিমেষে সমস্ত শেয়াল অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন। অদৃশ্য সেই মহাশক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আর কত খাবি, আর কত খাবি। এখনও তোর খিদে মিটল না। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং। এই নে, তোরা সব নে। লুটে নে, লুটেপুটে নে।

বাবা দু হাতে মহাশূন্য থেকে কি সব ধরে ধরে আমাদের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। মাতামহ মহাব্যস্ত হয়ে বললেন, তুলে নে, তুলে নে।

আমাদের এ পাশে ও পাশে কি সব পড়তে লাগল। হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। কে জানে কি পরমপদার্থ জিনিস। নিচু হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা সংগ্রহ করলুম। নরম তুলতুলে, অনেকটা লিচুর মত। মাতামহও একটা পেয়েছেন। আমাকে বললেন, শিগগির মুখে পুরে দে।

কি এটা ? মুখে পুরে মরব নাকি ? ধুলোবালি লেগে আছে।

খবরদার, মনে কোন অবিশ্বাস আনবি না। বিপদ হবে। ভক্তিভরে খেয়ে নে। অমর হয়ে যাবি। আমার ভেতর থেকেও কে যেন বলে উঠল, মূর্খ, যা পেয়েছিস খেয়ে নে। ভয়ে ভয়ে মুখে পুরে দিলুম। অদ্ভুত স্বাদ। পৃথিবীর কোনও বস্তুর স্বাদের সঙ্গে মেলে না। ফল, তবে কোনও বিচি নেই। জিভে পড়া মাত্রই বরফের টুকরোর মত গলতে শুরু করল। সুন্দর গন্ধ। সারা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। ফিনফিনে বৃষ্টি ধারার মত মনে চিনচিন করে উঠল সুখ। সব দরজা যেন একে একে খুলে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমার ভেতর দিয়ে একটা রাজপথ চলে গেছে, আর সেই পথে চলেছে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। কেউ বলছেন, হরি ওম তৎসৎ, কেউ বলছেন, জয় শিবশম্ভু, কেউ বলছেন রাম নাম সত্য, কেউ বলছেন, আল্লাহ আকবর। মনে হতে লাগল, ধীরে ধীরে আমি মহাশূন্যের দিকে ভেসে উঠছি। কানে আসছে, বাবার হাসির শব্দ। খলখল করে হাসছেন, আর বলছেন, জাগ শালারা, জাগ শুয়ের পোকা, কামিনীকাঞ্চনের দাস। জাগ শালারা শয়তানের ক্রীতদাস।

বাবার চ্যালা আবার শিঙা ধরেছে। শব্দে আকাশের চাঁদোয়া কাঁপছে। তারারা মিটিমিটি করছে। দূরে মড়মড় করে একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। বাবা চিৎকার করে বললেন, পালালি কেন শালা ! পালালি কেন ? এরা আমার কাছে এসেছে। এরা আমার আশ্রিত। ব্রহ্মশম্ভুজলৌঘে চ শবমধ্য-প্রসংস্থিতে। প্রেতকোটি-সমোযুক্তে কালিকায়ৈ নমোহস্তুতে॥ কৃপাময়ি হরে মাতঃ সর্বাশাপরিপূরিতে। বরদে ভোগদে মোক্ষে কালিকায়ৈ নমোহস্তুতে॥

বাবা ত্রিশূল হাতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। আর হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন, হুংহুংকারে শবারূঢ়ে নীলনীরজলোচনে। বাবার নৃত্য দেখে ভক্তরাও নাচতে লাগলেন, আর চিৎকার করতে লাগলেন, বাবা, বাবা। মাতামহ বললেন, আহা, যেন সাক্ষাৎ শিব। উঃ কত ভাগ্যে মানুষের এই সব দর্শন হয়? শালা, সংসারের নিকুচি করেছে। ডেকে নিয়ে আয়, তোর প্রাইমমিনিস্টার, তোর চিফ মিনিস্টারকে। সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ। ডাক তোর টাটা, বিড়লা, ডালমিয়াকে। সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ।'

বেশ বুঝতে পারছি, মাতামহের পা দুটো নেচে ওঠার জন্যে ছটফট করছে। চেপে ধরে না থাকলে ধেই ধেই করে নৃত্য শুরু করে দেবেন।

বাবা নাচতে নাচতে হাতের ত্রিশূলটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। বুকে দু হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকলেন, তোদের যার যা অসুখ আছে, এই ত্রিশূল ছুঁলেই সেরে যাবে। একে একে এগিয়ে আয় শালারা। সেই ক্যানসারের রুগী কোঁত পাড়তে পাড়তে এগিয়ে গিয়ে ত্রিশূল স্পর্শ করলেন। কি হল, তা বলতে পারব না। ভদ্রলোক ছিটকে হাত দুয়েক দূরে উল্টে পড়লেন। বাবা অট্টহাসি হেসে বললেন—যাঃ শালা, মরেই গেল বুঝি।

সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি আর্তচিৎকারে ডাকতে লাগলেন, বাবা, প্রবোধ, ওরে আমার প্রবোধ।

প্রবোধবাবু হাতপা চিতিয়ে পড়ে আছেন ঘাড় কাত করে। বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডান পায়ের আঙুলটা গায়ে ঠেকাতেই প্রবোধবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সঙ্গী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কেমন বুঝছো বাবা প্রবোধ।

তড়াক করে খাড়া লাফিয়ে উঠে প্রবোধ বললেন, পারফেক্টলি কিওরড মেসোমশাই।

মাতামহ ঝুঁকে পড়ে বললেন, একেবারে সেরে গেলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবার দয়া।

ভদ্রলোক বাবা বলে চিৎকার করে মহাপুরুষের পায়ে পড়লেন।

বাবা স্নেহের সুরে বললেন, ওঠ, ওঠ, ষোল আনা কি একদিনেই সারে! কর্কট ব্যাধি। অনেক নিয়ম মেনে চলতে হবে বাবা। স্ত্রী সঙ্গ চলবে না, পান, বিড়ি, সিগারেট খাবে না। ভোরে উঠে আসনে বসবে। জোরে জোরে শ্বাস নেবে। অনুভব করবে, শীতল বাতাস মেরুদণ্ডের দুপাশ বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তোমার মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। শ্বাস যখন ছাড়বে, তখন মনে করবে গরম, কালো বাতাস মেরুদণ্ড বেয়ে নিচের দিকে নেমে চলেছে। যা, পালা শালা।

মাতামহ একপাশে সরে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওভাবে ছিটকে পড়লেন কেন?

প্রবোধবাবু বললেন, উঃ, কি বলব মশাই, যেই না ত্রিশূলে হাত দিয়েছি, মনে হল হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল সারা শরীরে। অলৌকিক ব্যাপার মশাই। বাবা সাক্ষাৎ দেবতা। এ সব জিনিস বিশ্বাস না করলে সন্দেহই থেকে যায়।

প্রবোধের মেসোমশাই বললেন, আমিও তা হলে ছুঁয়ে আসি একবার। গত তিন বছর লামবেগোয় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।

কিন্তু ত্রিশূলের চারপাশে এখন তাণ্ডব চলছে। রোগের শেষ নেই, রুগীরও শেষ নেই। হাঁপানী, যক্ষ্মা, বাত, মৃগী, আলসার, প্যারালিসিস, সব লাইন দিয়ে চলেছে, আর ছিটকে ছিটকে পড়ছে। রোগ যেন ফুটবল। বাবার ত্রিশূলের লাথি খেয়ে ঠিকরে যাচ্ছে।

মাতামহ বললেন, যা না তুই একবার স্পর্শ করে আয়। তোর তো পেটের ব্যামো, দেখবি সেরে যাবে।

না, দাদু, আমার সাহস নেই।

তোর মত ভীতু আমি জীবনে দুটো দেখিনি।

বাবাকে এইবার মহিলারা ঘিরে ধরেছেন। কারুর মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা, কেউ অত্যাচারিতা, কারুর

মেয়ের মাথায় গোলমাল। সারা পৃথিবী যেন শিকড় সমেত উঠে এসেছে। বাবা বললেন, অপেক্ষা কর, এবার আমি আসনে বসব।

মাতামহকে জিজ্ঞেস করলুম, আমাদেরটা কখন হবে? রাত তো অনেক হল।

আজ আর রাতের হিসেব কবিসনি। বাবা আমাদেব অন্তর্যামী, সময় হলেই ডেকে পাঠাবেন। আয়, আবার আমরা একপাশে চুপ করে বসি।

একটা জারুল গাছের তলায় দু জনে চুপ করে বসলুম। কালো আকাশে আর গাছের পাতায় মাখামাখি। তারাদের ড্যাবা ড্যাবা চোখ জ্বলছে। জ্বোরো রুগীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মত বাতাস বইছে। হঠাৎ চ্যাঁ চ্যাঁ করে এক সঙ্গে অনেক প্যাঁচা দিগ্বিদিকে ডেকে উঠল। সত্যিই কি অদ্ভুত, গা ছমছম করান পরিবেশ। পৃথিবীব চেনা মুখ দিয়ে অচেনা সব বস্তু আর ঘটনা বেরিয়ে আসছে।

আশ্রম প্রায় খালি। কিছু মহিলা কেবল বসে আছেন। বাবা কখন ডাকবেন কে জানে! দূবে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীব আসনে বাবা খাড়া বসে আছেন। গাছের কোটরে নিবু নিবু প্রদীপ জ্বলছে। পিঙ্গল জটাব মত ধোঁযা উঠছে আকাশের দিকে। চাবপাশ নিস্তব্ধ। প্যাঁচাবা একবাব না দুবাব ডেকেই চুপ মেরে গেছে।

কোনও কথা না বলে, কতক্ষণ বসে থাকা যায়। বাবাব মতই সিদ্ধাসনে মাতামহ ক্রমশ ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছেন। দু'জনেই একপথেব পথিক। আমি এক দলছাড়া আসামী।

মৃদু স্বরে ডাকলুম, দাদু।

বেশ ভাবগম্ভীব উত্তব এল, বলে ফেল।

আপনাব কি মনে হয কনক খাবাপ পথে চলে গেছে!

দূব পাগল, তুই মেয়ে চিনিস না। যে সব মেয়ে খাবাপ হয়, তাদের চেহাবাই আলাদা। শাস্ত্রে তাদেব পরিষ্কাব বর্ণনা আছে। খনাব বচনে আছে। তোকে দোব পড়ে দেখিস। জানবি মেয়েদেব মধ্যেই স্বর্গ আছে নবক আছে। কনক আলাদা জাতের মেয়ে। কিছু পাখি আছে যাবা ডাকতে ডাকতে ক্রমশই আকাশেব ওপব দিকে উড়ে যায়। কনক হল সেই জাতের পাখি, যাব আবোহণ আছে অববোহণ নেই। সে গেছে. সে ভাল দিকেই গেছে।

মেয়েছেলেব এত সাহস হয কি কবে! একা একা বেরিয়ে চলে গেল।

সাহস! বলিস কি বে ব্যাটা! সাহস তো মেয়েদেরই হবে। তারা যে শক্তি। জানিস সন্তানধাবণ কত বড় সাহসেব কাজ! সন্তানেব জন্ম দিতে গিয়ে কত মায়ের মৃত্যু হয় জানিস! ব্যাপারটা যদি উলটে যায়, তাহলে কি হবে? কোনো পুরুষেব অত সাহস হবে, পারবে অত কষ্ট সহ্য করতে! আমাব মেয়ে যদি তোকে ধাবণ না করত, তাহলে তুই আসতে পারতিস এই পৃথিবীতে!

তাতে আমার কি লাভ হল। মা তো আমাকে ফেলে পালালেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক, ও কাজটা সে খুব ভাল করেনি। থাকলে আমাকেও একটু দেখতে পারত। কিন্তু শালা, তাব জন্যে তো তুমিই দায়ী। তুমি এলে, আর অমনি আমার মেয়েটিকেও নিয়ে গেল! না রে, এ আমি এমনি বললুম! পৃথিবীতে কে কিসের জন্যে দায়ী হতে পাবে! কোনও কিছুব ওপব মানুষের হাত নেই। মানুষ আসে, মানুষ যায, মানুষের সুদিন আসে দুর্দিন আসে। জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।

খুব চাপা গলায় মাতামহ গাইতে লাগলেন, ফিরে ফিবে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

আজ কিন্তু বেশ ভালই গাইছেন। বেশ মিঠে লাগছে। হয়তো পবিবেশের গুণে। মাতামহ অন্তরায় উঠলেন, কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন! এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোব, অধীবে অধীরে যেমতি সমীব, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!

বৃদ্ধ মানুষ, কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এতটা পথ এসেছেন, হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চাপা আবেগে বিশাল বুক ফুলে ফুলে উঠছে। মাতামহেব কান্না দেখে, মন বড় বিমর্ষ হয়ে

গেল। মানুষকে কিভাবে যে একটু আনন্দে রাখা যায়!

পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে বাবা হঠাৎ সাংঘাতিক এক শব্দ ছাড়লেন। বুম, বুম করে সেই ডাক যেন অনন্তের টাগবায় গিয়ে ঠেকলো। আমার তলপেট গুড়গুড় করে উঠল। মাতামহের চাপা কান্না বন্ধ হয়ে গেল। বাবা ওঁ স্বাহা ওঁ স্বাহা বলে আগুনে কি যেন আহুতি দিচ্ছেন, লেলিহান শিখা নটরাজের মত নেচে নেচে উঠছে। রাত্রি এখন নিদ্রামগ্ন, জেগে আছেন শুধু সাধক, জেগে আছেন রোগী, আব পুড়ে যাওয়া কিছু সংসারী মানুষ।

বাবা হাঁকলেন, আয় তোরা আয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা এগিয়ে গেলুম। বাবা বসেছেন ঠিক যেন মহাদেবের মত। ডান হাতে ধরে আছেন একটি চিমটে। কে একজন তাঁর সমস্যার কথা বলতে গেলেন, বাবা সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিলেন, চুপ্, চুপ্ কবে বোস্। তোবা বলবি কেন? আমি তো সব দেখতে পাচ্ছি বে শালা।

চিমটেটা মাটিতে ঠুকে বললেন, এই রুকে দিলুম। যেখানে আছিস সেইখানেই থাক।

হোমেব শিখায় এক সাব লাল লাল, উদ্বিগ্ন মুখ। কেউই কিছু বুঝলেন না, বাবা কি রুকে দিলেন, কাকে রুকে দিলেন।

মাতামহ সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে রুখলেন বাবা!

সবর্ণীব স্বামীকে। তোর স্বামীকে মা বেঁধে দিলুম। দিন কতক হাজত বাস করুক। নির্জনে থাকতে থাকতে তোব কথা মনে পড়বে। সামনের বছর পুজোর আগেই সে ফিরে আসবে। রোজ মাঝরাতে হাড়েব চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবি।

মহিলা বাবা বলে পা ছুঁতে গেলেন, মহাপুরুষ চিমটে ঠুকে বললেন, খবরদাব, আমাকে ছুঁবি না। ওপাশে গিয়ে বোস। ভোর হলে চলে যাবি। শ্যামা! শ্যামা কোথায়?

শ্যামা মৃদু গলায় বললেন, এই যে বাবা।

প্রস্তুত হ, প্রস্তুত। তোর বৈধব্যযোগ এসে গেছে।

শ্যামা ফুঁপিয়ে উঠলেন, বাবা বাঁচিয়ে দাও। বাবা, আমার যে আর কেউ নেই গো!

ভাগ্যের চাকা ঘুরছে মা, তাকে আমি থামাই কি করে? তোর প্রারব্ধ।

মেয়েটি এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। বাবা এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ্। গত জন্মে যা করে এসেছিস এ জন্মে তার ফল ভুগতে হবে না! তখন মনে ছিল না! এই দেখ।

বাবা একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিলেন। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এমনভাবে ধরে আছেন যেন আগুন নয়, আইসক্রিমের কাঠি। বাবা আগুন নাচাতে নাচাতে বললেন, এর নাম জীবন। সহ্য করতে শেখ। আগুন নিয়ে খেলতে শেখ। পুড়ে পুড়ে পোড়াকাঠ হয়ে যা। এই দ্যাখ।

বাবা সেই আগুন মুখে পুরে দিলেন। একেবারে রোমহর্ষক ব্যাপার। একবার করে হাঁ করছেন, মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অবাক কাণ্ড! কাঠের টুকরো হোমের আগুনে ফেলে দিয়ে বাবা বললেন, পৃথিবীতে বাঁচতে এসেছিস, ফুলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার জন্যে? মামার বাড়ি! সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। আগুন যা জলও তাই, দুঃখও যা সুখও তাই। সবই সেই অনন্ত শক্তির লীলা। ভগবানকে জব্দ কর।

সব শেষে বাবা মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে সরে আয়। তোর মনের দরজা খুলে গেছে। সামনের বার তোর কিছু হবে। এবারটা চোখকান বুজিয়ে কাটিয়ে যা।

মাতামহ এক হাতে আমার হাত চেপে ধরে আছেন। তাঁর সারা শবীর কাঁপছে। বাবা এইবাব আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখতে চাস?

থতমত খেয়ে বললুম, কি মহারাজ?

তোমার সেই মেয়েটিকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পেতে চাই।

পেতে চাস? না পেলে? শালা মানুষ, কি পেতে চায়, ঠিক কি পেতে যে তার মন চায় মানুষ

জানে ? আমার দিকে তাকা। বড় বড় চোখে তাকা।

বাবা ফটাস করে একটা তালি বাজালেন।

আমার সারা শরীর কেমন যেন এলিয়ে পড়ল। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল। আমি মারা যাচ্ছি। আমার শরীর স্থির। চিন্তাশূন্য অবস্থা। বিস্মৃতি নেমে আসছে, আঁধার নেমে আসছে। অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, বাবা বলছেন, বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়, পাখির মত উড়ে যা, খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ।

সারা শরীরে কেমন যেন একটা হ্যাঁচকা টান লাগল। আমার আর কিছু মনে রইল না। শুধু মনে হল আমার অন্দরমহল থেকে কে যেন বেরিয়ে চলে গেল।

এক সময় আমার চেতনা ফিরে এল। আমি মরিনি। তবে আমার আমি আমাতে ছিল না। সবে ভোর হচ্ছে। পুব আকাশ জবাফুলের মত লাল। আমি হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছি। শরীর যেন পাথরের মত ভারি। হাত নড়ছে না, পা নড়ছে না। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। মাথাটা মনে হচ্ছে আমার নয়, অন্য কারুর।

অনন্ত আকাশের পটভূমিতে ভাসছে আমার স্নেহময় মাতামহের মুখ।

বাবার গম্ভীর গলা কানে এল, ফিরে এসেছে!

মাতামহ বললেন, হ্যাঁ বাবা। কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে আছে।

বাবা ফট্ করে একটা তালি বাজাতেই খট্ করে আমার দাঁত খুলে গেল।

ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারি দিকে মালঞ্চের বেড়া

অবিশ্বাসী পিতা আমার সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চান না। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, যাক বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখে এলেন। আধ্যাত্মিক ম্যাজিক।

বিশ্বাসী মাতামহের মনে বড় লাগল। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি না হয় বোকা বুড়ো। গাধাতে আর আমাতে কোনও তফাৎ নেই; কিন্তু আমার এই বুদ্ধিমান নাতিটিকে তুমি জিজ্ঞেস করো। এক তুড়িতে সে প্রায় ঘণ্টা আড়াই মৃতের মত পড়ে রইল। দেহ রইল আশ্রমে, মন ছুটল ভুবন ভ্রমণে।

আরে মশাই, ওকে বলে **সম্মোহন**। ও বিদ্যে আমাদের পি সি সরকারও জানেন। তা হলে তো হুডিনিকে এনে গেরুয়া পরিয়ে আশ্রমে বসাতে হয়।

মাতামহ তর্কের হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি যখন বিশ্বাস করবে না তখন কার ক্ষমতা তোমাকে বিশ্বাস করায়! তুমি ভূত মানলেও ভগবানকে একেবারেই মানতে চাও না। ভগবানের কি যে খেলা!

বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না, আসলে আমার অত অবসর নেই। জীবন ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে, এখনও অনেক কাজ বাকি। যতটা পারা যায় ততটা সেরে যেতে হবে ত। কে জানে আর আসা হবে কি না! আমি দুটো ঘটনা বিশ্বাস করি, জনম আর মৃত্যু, আর বিশ্বাস করি সময়ের গতি। সময়ের নদীতে, বিভিন্ন দূরত্বে বাঁশের খোঁটার মত আমরা পোঁতা রয়েছি। হু হু করে জল ছুটছে উলটো দিকে। স্রোত কখনও প্রবল, কখনও মৃদু। টাইম টেকস অল।

তুমি প্রারব্ধ বিশ্বাস করো না? তুমি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করো না?

আমি যা দেখি তাই বিশ্বাস করি। অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চাই না। জন্ম দেখি, বিশ্বাস করি। সেটা পুনর্জন্ম কি না, অনর্থক সেই বিচারে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। মৃত্যু দেখি, বিশ্বাস করি। প্রকৃতিতে শক্তির খেলা দেখি, বিশ্বাস করি। ন্যাচারাল ফোর্সেস। বিশ্বাস করি নিজের শক্তিকে, মেধাকে। হু ইজ গড? ভগবান আবার কে?

মাতামহ ভীষণ আহত হয়ে বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই।

কি করে বলবেন ? ভগবানকে তো আপনি আর হাত ধরে আমার সামনে হাজির করতে পারবেন না। আমার মতই একজন মানুষকে ভগবান বলে চালাতে চাইবেন।

তুমি আগুন খেতে পারবে ?

চেষ্টা করলেই পারব। এত কিছু খেতে পারছি, অভ্যাস করলে আগুনও খেতে পারব।

অত সহজ নয় হরিশঙ্কর।

বেশ আপনি নাপ্পি খেতে পারবেন ?

সে আবার কি ?

বার্মীজদের প্রিয় খাদ্য। মাটির তলায় পুঁতে রাখা পোকা ধরা পচা মাংস।

অসম্ভব, ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে।

ওরা কিন্তু সব চেয়ে বড় উৎসবের দিনে সম্মানিত অতিথিকে নাপ্পি পরিবেশন করে থাকে। সবচেয়ে বড়াখানা, আমাদের বিরিয়ানীর মত। সবই হল অভ্যাস যোগ। উট কাঁটাগাছ খায়। আপনি পাবরেন ' আমাদের ফক্স সাহেবও আগুন খেয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে। গণপতি ম্যাজিসিয়ান, কাঁটা পেরেক, কাঁচ, অ্যাসিড মুড়িমুড়কি আর সরবতের মত খেতে পারেন। এর মধ্যে ধর্ম নেই, ঈশ্বরও নেই। কৌশল।

তোমার কোন কথাই আমি ঠিকমত ধরতে পারি না। আজ এক রকম বল, কাল একরকম বল। এই সেদিন বললে, ভূত আছে। ভূত থাকলে ভগবানও আছে। আজ বলছ কিছুই নেই। ঘুর ঘুরে বাবা যাদুকর হলেও, তোমার ছেলে ত ম্যাজিসিয়ান নয়। ও তাহলে কি ভাবে দেহমুক্ত হয়ে সারা ভারত ঘুরে এল। শেষে সেই হৃষীকেশের এক আশ্রমে কনককে খুঁজে পেল।

এই ঘরে বসে আমিও সারা ভারত এখুনি ঘুরে আসতে পারি। দেখবেন ? আমি এক্ষণি কন্যাকুমারী চলে যাব ! কল্পনাপ্রবণ মানুষ অনেকরকম ধাপ্পা দিতে পারে। কাঞ্চীপুর বর্ধমান ছয় দিনের পথ, একদিনে উত্তরিল অশ্বমনোরথ।

কি তুমি বলছ হরিশঙ্কর ! তোমার মত কালাপাহাড় কেউ দেখেছে ' আমার নাতি ধাপ্পা দেবে ?

ধাপ্পা দেবে কেন ? স্বভাবে দুর্বল শরীরে দুর্বল। সে পড়েছে বলিষ্ঠ মনের খপপরে। ওর কল্পনাটাকেই তিনি সত্যির মত করে দেখিয়েছেন। একে বলে সাজেশান। যেমন মায়ায় জগৎভ্রম। কোথাও কিছু নেই অথচ আমরা ঘর বাড়ি দেখছি, পাহাড়পর্বত দেখছি, গাছ দেখছি, ফুল দেখছি। স্বপ্নই কেমন সত্য হয়ে উঠছে। আজ থেকে ছ'বছর আগে ও আমার সঙ্গে হৃষীকেশে গিয়েছিল। বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, কানপুর কোথাও গেল না, ও গেল হৃষিকেশে। সেখানে সারদা ভবনের প্রেয়ার-হলে কনককে দেখে এল। এর চেয়ে সহজ রচনা আর কি আছে !

রচনা ?

হ্যাঁ রচনা। পরীক্ষায় দেয় না ? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, একটি দিন, ওই জাতীয় একটা কিছু। মেসোমশাই সর্দিতে ফোঁসর ফোঁসর করতে করতে ঘরে এলেন। ভদ্রলোকের মন আর শরীর দুটোই ভেঙে পড়েছে। মুকু এমনিই একটু অমিশুক ধরনের ছিল। দিদির অন্তর্ধানে আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়েই বারান্দায় বসে বসে উদাস চোখে আকাশ দেখে। কাছে গেলে সরে যায়।

মেসোমশাই চেয়ারে বসে বললেন, তা হলে আমরা কবে যাচ্ছি !

পিতা বললেন, কোথায় যাবেন ?

কেন হৃষিকেশে ? কনক যে আশ্রমে আছে।

কি করে বুঝলেন কনক হৃষীকেশেই আছে ?

এই যে ওঁরা বললেন !

ওঁরা কি দেখে এসেছেন ?

না তা নয়, তবে দৈবপ্রভাবে দেখেছেন।

পিতা বললেন, আমার আর কিছু বলাব নেই। তিনি উঠে চলে গেলেন। একেবারে ঘরের বাইরে। মাতামহ বললেন, এই একটা মানুষ ! কখন যে কি রকম ! বাঘকে বাগ মানান যায়। আমার এই জামাইটিকে যায় না। আমিও চলি। হাওয়া বড় এলোমেলো বইছে।

মেসোমশাই অসহায়েব মত বললেন, একটা সিদ্ধান্তে ত আসতে হবে !

তা হবে, তবে সিদ্ধান্তে আসার মালিক তো উঠে চলে গেল। সে দলে না ভিড়লে কিছুই তো করা যাবে না।

মেসোমশাই হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, উঃ কি ফাঁপরেই যে পড়া গেল !

মাতামহ সত্যিই চলে গেলেন। মেসোমশাই আমাব সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। অপরাধীদের তালিকায় আমি বোধহয় পয়লা নম্বরে আছি। আসামী নাম্বার ওয়ান।

কেউ কিছু না করুক, আমি করবই। প্রয়োজন হলে গৃহত্যাগেও প্রস্তুত। আমি কনককে স্বচক্ষে দেখেছি। চোখ কি চোখের ! চোখ তো মনের। পিতা যাই বলুন, ঘবঘবে বাবার অসীম শক্তি। আমি আমার থেকে বেরিয়েছি, আবার আমাতে এসে ঢুকেছি। এমন অভিজ্ঞতা কজনের হয় ! ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে ! জ্ঞান দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে কি সব কিছুব সমাধান হয় ! তাই যদি হবে তাহলে মাঝরাতে ঘরে সেই জোড়া চামচিকি ঢুকলে, পিতা কেন বহস্যময গলায বলেন, চুপ, চুপ, এসেছে। সে তাহলে কিসের ইঙ্গিত !

দুপুরে সবে চান করে উঠেছি, কাকীমা ফিস ফিস করে বললেন, তুমি আমার একটা উপকার করবে ?

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম, তবু বললুম, কি উপকার ?

কাপড় ছেড়ে এসে তুমি আমার পুজোটা করে দেবে ?

কি পুজো ?

এমন কিছু না, ঠাকুরকে একটু ফুল, বাতাসা আর জল দিয়ে দেবে, আব একটা ধূপ জ্বেলে দেবে।

রোজ তো আপনি দেন, আজ আমি কেন ?

মেয়েদের মাসে পাঁচ দিন ঠাকুর ছোঁবার উপায় থাকে না।

কেন ?

উঃ আচ্ছা বোকার পাল্লায় পড়েছি ! সব কেনর উত্তর দেওয়া যায় না। বুঝে নিতে হয়। পাঁচ দিন মেয়েদের শরীর খারাপ থাকে। এত বড় ছেলে হলে, কত কি যে জান না !

কাপড় ছেড়ে আবার নিচে নামতে হল। সেদিন অফিস থেকে একটা ফ্রীপ্যাকেট পেয়েছি। তাতে ছিল, গোটাকতক গায়ে মাখা সাবান, দুটো কাপড় কাচার বড় বার সাবান, মাথায় মাখার দু শিশি তেল, স্নো, সেন্ট, পাউডার। ঠিক করেছিলুম হাফ কাকীমাকে দোব, আর হাফ দোব মায়াকে। যতই হোক মায়া আমার প্রেমিকা। একটু পাগলী আছে। সেদিন একটা চিঠি লিখেছে। কি তার ভাষা ! মনে হয় কোনও বই থেকে টুকে দিয়েছে। প্রিয়তমো, জীবন বড় ছোট। একদিন ফুরিয়ে গেলে টের পাবে, তখন চোখের জল ফেললেও আমাকে আর পাবে না। তুমি বলেছিলে সাধু হবে, আমি হব তোমার ভৈরবী। তোমার একটা কথারও যদি ঠিক থাকত। শুনলুম চাকরি পেয়েছ ? চলো এবার তাহলে পালাই। চিঠিটা গোল করে ঢোলের মত একটা মাদুলির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। পিতৃদেবের হাতে পড়লেই হয়েছে আর কি !

তেল, সাবান, স্নো, পেয়ে কাকীমা কি খুশি। একবার এর ছিপি খোলেন, ওর ঢাকনা খোলেন, গন্ধ শোঁকেন আর বারে বারে বলেন, এই সব তুমি আমাকে দিলে ? তুমি আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে ? কখন মাখি বলো তো ! একদিন এইসব মেখেটেখে, বেশ সেজেগুজে কোথাও গেলে হয় ! যাবে একদিন ?

কাকাবাবু রাগ করবেন।

তাও তো বটে ! আমি এক কৃতদাসী, হেঁসেল ঠেলার জন্যেই জন্মেছি। জন্ম আঁতুর ঘরে, মৃত্যু

রান্নাঘরে। যাই বলো, তোমাকে আজ বেশ ঠাকুর ঠাকুর দেখাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বলুন, কি করতে হবে। এখুনি ওপরে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যাবে।

তুমি ওই কুলুঙ্গির পর্দাটা সরাও। ধূপ জ্বালো, বাসী ফুল ফেলে, নতুন ফুল দাও, কৌটোয় বাতাসা আছে, পুজোর থালায় গোটাকতক সাজিয়ে দাও, ছোট এক গেলাস গঙ্গাজল ধরে দাও। পর্দা টেনে চোখ বুজিয়ে আসনে বসে বলো, মা খাও, মা খাও।

কাকীমা বড় গোছানে। এই এঁদো ঘরেই কি সুন্দর আয়োজন! পর্দাটি একপাশে সরাতেই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতার বেশ কয়েকজনের দর্শন মিলে গেল। পরিচ্ছন্ন পটে হাসি হাসি মুখ মা কালী, দশভূজা দুর্গা, গণেশ, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, সুদর্শন চক্রধারী নারায়ণ, মাটির মহাদেব, পেতলের রাধাকৃষ্ণ।

চেয়ারের ওপর গোল করা ছিল কম্বলের আসন। মেঝেতে পেতে চোখ বুজিয়ে বসলুম। সবই মায়ের খেলা। কেমন ফাঁদে ফেলে দিলেন। কাকীমা না বললে, এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত আসনে বসতুম কি! কার পুজো কে করে! চোখ বুজোতেই, প্রথমে ভেসে উঠল কাকীমার মুখ। সেদিনের সেই ছবি, হাতে জবাফুল নিয়ে বেরোবার সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সে মুখ চোখের সামনে থেকে সরতেই চায় না। অতি কষ্টে যদিও বা সরান গেল, সামনে এসে দাঁড়ালেন ঘুরঘুরে বাবা। আমি বললুম, বাবা খাও। কি আর করব, দেবী যখন দর্শনে দুর্লভ, দেবতার প্রতিনিধিকেই নৈবেদ্য নিবেদন করি।

বাবা হাসলেন। বলতে চাইলেন, সামান্য ফুল বাতাসা কি খাব রে শালা! আমার ভোগ আলাদা। বাবা দুই চোখের মাঝখানের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। এসে দাঁড়ালেন ঊষাদি। বাঃ বেশ মজা! জয়ামাতার আসতে কি হয়েছিল! ঊষাদির হাত দুটো আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। এখুনি উঁচু করে তুলে ধরে ঠোঁটে ভিজে ভিজে চুমু এঁকে দেবেন। শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। মনে মনে বললুম, না না, আর না।

ঊষাদি সরলেন বটে, এসে গেলেন চিত্রা দেবী। ঘন ঘন রুমাল নাড়ছেন আর বলছেন, বাব্বা, কি গরম! ব্যর্থ চেষ্টা। কোনও দেবীই এই পোড়া চোখে আসবে না। দৃষ্টি দূষিত হয়ে গেছে। আসন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। কাকীমা বললেন, উঃ তোমার কি ভক্তি গো। খাড়া বসে আছ, তো বসেই আছ। তোমার মত ভক্তি পেলে আমি নির্ঘাৎ স্বর্গে যেতুম। নাও, প্রসাদ তুলে নাও। একটা বাতাসা মুখে ফেল, আমি জল এনে দিচ্ছি।

ঝকঝকে মাজা গেলাসে জল খাচ্ছি, কাকীমা বললেন, আহারে গরমে পিঠটা ঘেমে গেছে। মুক্তোর দানার মত ঘাম ফুটেছে, এসো মুছিয়ে দি।

শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার পিঠের ঘাম মোছাতে লাগলেন। এবার গায়ে কাঁটা দিল ভয়ে। পিতৃদেব একবার যদি দেখতে পান, বলবেন, যাও, চান করে এসো। আঁচলে অশুদ্ধ হয়েছে।

আমি তা হলে এবার আসি কাকীমা!

না, আর তোমাকে আটকাবো না। কাল সকালে তুমি আমার পুজোটা করে দেবে!

সময় পাবো! কাল তো আমার অফিস!

ওই তো চান করে ওপরে ওঠার আগে।

ঠিক আছে। কাকাবাবু কোথায় গেছেন?

কাকীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবলা বাজাতে।

কোথায়? দূরে?

মহিষাদল রাজবাড়িতে।

কবে ফিরবেন?

যবে সেই মেয়েমানুষটা ফিরবে।

মেয়েমানুষ?

সে তুমি বুঝবে না। তুমি এখনও বড় সরল। মানুষের বয়েস বাড়লে তার সব চলে যায়। তোমাকে

একটা জিনিস দেখাব, একটু দাঁড়াও।

কাকীমা নিচু হয়ে চৌকির তলা থেকে একটা টিনের বাকস বের করলেন। ডালা খোলার সময় কোঁচ করে একটা শব্দ হল। নাকে এসে লাগল অতি পরিচিত, সুখ, সুখ, সঞ্চয়, সঞ্চয়, সংসার, সংসার একটা গন্ধ। এ গন্ধে ত্যাগ নেই, সন্ন্যাস নেই, অনেকটা মেয়েদের অঙ্গের গোপন গন্ধের মত। বহু দূর থেকে ভেসে আসা, বহু দূরে চলে যাওয়া। কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যা আমার কাছে ভারি অদ্ভুত। গোলাপী রঙ, বাকসের ডালা খোলার শব্দ, ভেতরের ন্যাপথালিন আর সেন্ট মেশান গন্ধ, ঝুলনের পুতুল, কালীয়দমন, বকাসুর বধ, উত্তরা অভিমন্যু, রথের চাকা বসে যাওয়া বীর কর্ণ, সুভদ্রা হরণ, বর্ষাকাল, রথ, একই সঙ্গে পেঁয়াজী আর কাঁঠালের গন্ধ। মনের ভেতর মঞ্জিল তৈরি হয়।

কি গো তোমার ঘোর লেগে গেল না কি ? কোন জগতে চলে গেছো ? তখন থেকে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি ?

আপনার বাকস খোলার শব্দে ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলুম ?

ইস্, তুমি একেবারে ঠিক বলেছ। বাকসটা খুললে আমারও তোমার মতই মনে হয়। কোথায় যে চলে যাই। আর একবার মরে জন্মাতে ইচ্ছে করে।

আপনি এর মধ্যে কতবার মরেছেন কাকীমা ?

ওই হল রে বাবা। বলতে গিয়ে গুলিয়ে গেছে। মরে আর একবার জন্মাতে ইচ্ছে করে। নাও দ্যাখো। সিল্কের সুতো দিয়ে বোনা গেঞ্জির মত কি একটা জিনিস কাকীমা আমার হাতে তুলে দিলেন।

কি এটা ? গেঞ্জি ?

হ্যাঁ গো ? কার বলো তো ?

কার ? কাকাবাবুর ?

আজ্ঞে না মশাই। তোমার। কাউকে বলবে না। আর দু-এক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

এই সুতো পেলেন কোথায় ?

সে খবরে তোমার দরকার কি ? বড়া ভাজা খাবে ?

বড়া আমার বড় প্রিয়, না বলি কি করে ?

তাহলে এসো, পিঁড়ে পেতে দি, বোসো, গরম গরম ভাজি। বড়া ভাজতে ভাজতে কাকীমা বললেন, আমার বড় শখ ছিল।

কি শখ ?

ওই সেই মাথা খোলা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে সারা কলকাতাটা একবার ঘুরবো।

ঠিক আছে, ঘোরাব।

আরও একটা আছে।

কি, বলে ফেলুন ?

লাজুক লাজুক মুখ করে বললেন, কাপের আইসক্রিম খাব।

ঠিক আছে খাওয়াব।

আর একটা ভীষণ ইচ্ছে ছিল।

বলুন ?

নাঃ, সেটা আর তোমাকে বলব না। সে ভগবানকে বলার জিনিস।

বুঝেছি।

হাসতে হাসতে বললেন, বুঝেছ তো ? বড় একা লাগে। আমার তো কেউ নেই।

ঘুরঘুরেবাবার কাছে যাবেন ? তিনি সব পারেন।

একদিন নিয়ে চলো না গো !

ঠিক আছে, পরের অমাবস্যায় নিয়ে যাব। সারা রাত কিন্তু থাকতে হবে।

ও বাবা, তাহলেই তো বিপদ ?

খান কতক বড়া ভাজা খেয়ে ওপরে উঠে এলুম। শুনলুম কাকীমা গান গাইছেন, ওই দ্যাখা যায় বাড়ি আমার চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া। গলাটি বেশ সুন্দর। কোথা থেকে এই গানটি শিখলেন কে জানে! মুকু এসে গম্ভীর মুখে বললে, বাবা একবার ডাকছেন।

মেসোমশাই মেঝেতে মাদুরের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন, হালভাঙা, তলা ছ্যাঁদা নৌকোর মত। ঘরে ঢুকতেই নরম গলায় বললেন, বোসো।

ভদ্রলোকের ব্যারিস্টারি সুর পালটে গেছে। আহা, মাটিতে কেন, মাদুরে উঠে বোসো।

মেসোমশাই শয়ান থেকে অর্ধশয়ান হলেন। আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, একটা কথা বলব?

হ্যাঁ বলুন না?

আমার আপত্তি নেই। বুঝলে, আমার আর কোনো আপত্তি নেই। তা ছাড়া তুমি চাকরি-বাকরি করছ।

আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

খুব পারছ বাবা। তুমি কি কম ছেলে, ওই যে মিটমিট করে, কলসা নাড়ায়, সে বড় সাংঘাতিক।

দেখুন, আমাদের এখন বিপদের দিন, দাগা মারা কথা নাই বা বললেন।

আমার মাথার ঠিক নেই বাবা, তুমি বাপ হলে বুঝতে। কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। তুমি কনককে খুঁজে বের কর, আমি তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে দোব।

আমার সঙ্গে? বোনের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে?

আহা, তুমি তো সে রকম ভাই নও। রক্তের সম্পর্কে ভাই হলে কথা ছিল। তুমি তো ছেলে খারাপ নও। তা ছাড়া হরিদা, অমন মানুষ, তুমি আর দুটি পাবে না। একজন মানুষের মত মানুষ। অনেষ্ট, সেনসিবল, এ ম্যান অফ ক্যারেকটার। যা শুনছি, তা ঠিক?

কি শুনছেন?

হরিদা একেবারে গঙ্গার ধারে একটা জায়গা কিনেছেন?

বোধ হয়। আমি ঠিক জানি না।

চেপে যাচ্ছ?

সত্যিই জানি না। আমার সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা একেবারে হয় না।

আরে, তুমি বাপের এক ছেলে। সব খবর রাখবে। একটু একটু করে সব বুঝেসুঝে নেবে। মানুষের জীবন। কিছু বলা যায়, আজ আছে কাল নেই।

আর কিছু বলবেন?

কাছে সরে এসো, চুপি চুপি, বিটুইন ইউ অ্যাণ্ড মি, কনককে কোথায় রেখেছ? ওয়ার্ড অফ অনার কাউকে বলব না।

আশ্চর্য মানুষ আপনি? আমাকে কি করে আপনি কিডন্যাপার ভাবলেন?

না, তোমার সঙ্গে বেশ একটু ইনটিমেসি গড়ে উঠেছিল। আর আমি একটু অন্য রাস্তায় চলতে চাইলুম। যদি জান, বলে ফেল বাপু।

আমি জানি না। তবে জানার চেষ্টা করছি। আমি কনককে দেখেছি। সে আছে আশ্রমে। মনে হয় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে। এখনও অবশ্য গেরুয়া পরে নি।

মাথা ন্যাড়া করেছে?

না, এখনও করে নি।

কত রকমের গল্প যে তোমরা বানাতে পার?

আপনাকে ত আমি বিশ্বাস করতে বলি নি। আমার বিশ্বাস আমারই থাক।

তোমর স্বভাবটি বড উদ্ধত। আর হবে না কেন? বাবার এক ছেলে। আদরে আদরে খাস্তা হয়ে গেছ?

তা হবে।

পিতা সকাল থেকেই এক যান্ত্রিক উদ্ভাবন নিয়ে বড় ব্যস্ত। কয়েক টিন রঙ এসেছে। যত বাক্স প্যাঁটিরা আছে, সব নতুন অঙ্গ সজ্জায় ভোল পালটাবে। হলদে নীল হবে, নীল কমলা হবে, সবুজ লাল হবে। যে রঙ এসেছে, সে রঙ বুরুশে লাগান যাবে না। রঙ বড় তাড়াতাড়ি উড়ে যায়। টানা যায় না। স্প্রে-গান চাই। সেই স্প্রে-গানের উদ্ভাবনে সকাল গড়িয়ে গেছে। মনে হয় দুপুরও পার করে দেবেন। খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল। কাপ কাপ চা চলছে। গোটা ছয়েক কাপ পড়েছে। সব একবারে ধোয়া হবে।

রান্নাঘরের দিক থেকে তাঁব কণ্ঠ ভেসে এল, যাঃ, হয়ে গেল। খেল খতম।

পেট মোটা, গোলগলা একটা শিশির মুখে রবারের ছিপি। ছিপিতে দুটো গর্ত। একটা গর্তে সোজা একটি কাঁচের নল, অন্য গর্তে একটি বাঁকা নল। এই পর্যন্ত থিওরিতে কোনও গোলমাল ছিল না। সোজা নলে ফুঁ মারলেই বাঁকা নলে তরল পদার্থ তোড়ে বেরোবে। আধ শিশি রঙ ভরে পিতা যেই ফুঁ মেরেছেন, বাতাস ও তরল রঙের উর্ধ্ব চাপে ফটাস্ করে ছিপি ছিটকে চলে গেছে। চতুর্দিকে রঙের স্রোত বইছে। মাতামহ দেখলেই গান গেয়ে উঠতেন, হোরি খেলত নন্দকুমার। সুপক্ক সিঙ্গাপুরী কলার ভুরভুরে গন্ধ বাতাসে। এই রঙে এমন একটা কিছু আছে, যার গন্ধটাই পাকা কলার মত।

রঙের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে, পিতা নেপোলিয়ানের মত মুখ করে বসে আছেন। নাকের ডগা লাল টুকটুকে। দাড়িতেও রঙ লেগেছে। ছিপিটা পড়ে আছে চিৎপাত হয়ে। কলার গন্ধ পেয়ে বলাইবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কাকে সামলাই ! রঙে ভাসমান পিতাকে না কচ্ছপটাকে ! ওদিকে এই অবেলায় সিঁড়ি বেয়ে একটি কণ্ঠস্বর উঠে আসছে, হরি আছিস, হরি ! পিতা বললেন, রিসিভ দেম, রিসিভ দেম।

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি

সিঁড়ি ভেঙে যিনি উঠে আসছেন, তাঁকে আগে আমি কখনও দেখি নি। গোলগাল, আদুরে আদুরে চেহারা। টকটকে গায়ের রঙ। ডান গালে বেশ বড়, লাল একটি আঁচিল। কোঁকড়া চুল, এক মাথা, বাতাসে এলোমেলো। গিলে করা, মিহি পাঞ্জাবি। এত মিহি নয় যে গেঞ্জি দেখা যায়। দুধের মত ধবধবে সাদা। কালোপাড় ধুতি। পায়ে কালো ভেলভেটের চটি। গৌরবর্ণ পায়ে, কালো চটি বড় আচ্ছা মানিয়েছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখের লাল আভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আর পেছনে যিনি উঠছেন ? দেখেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। ইনিই সেই বর্ষারাতের ছবি। জীবন্ত হয়ে উঠে আসছেন ? সিল্কের শাড়িতে বসন্তের পুষ্পিত উদ্যান। পাখি নেই তবু পাখি ডাকছে। ঈশ্বর কি যে একটা জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন। নাকে আবার হীরের নাকছাবি। কানে ঝাড়লণ্ঠন। ননীর হাতে মিছরির ছিলেকাটা কয়েক সার চুড়ি। গলায় সোনার ইঁদুর-দাঁত, সৃষ্টিকর্তার তৃপ্তির হাসির মত হারে মূর্ছিত। সেই হারের গতি উপত্যকা বেয়ে পর্বত চূড়ার দিকে চলে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন যেন মোলায়েম একটি ছন্দ ? প্রতি পদক্ষেপে সিঁড়ির ধাপ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। দুপাশের দেয়াল যেন বলছে, দ্যাখ, দ্যাখ। মানুষের পা কেমন করে এমন নিটোল হয় ! নিতম্ব কেমন করে এমন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। মানুষের মুখে দেবতা কি ভাবে এমন করে হাসেন, শরীর কেমন করে এমন কবিতা হয়, হাত কেমন করে এমন মৃণালকাণ্ডের মত মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাকে আর রিসিভ করতে হল না। আমি হাঁ করা গঙ্গারামের মত সিঁড়ির মাথায় বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়েরইলুম। মন বলতে লাগল, পালা ব্যাটা, বড় সুন্দরী, মনে গেঁথে গেলে, বঁড়শি বেঁধা মাছের মত অবস্থা হবে। পায়ে পক্ষাঘাত। পালাব কি, পা জমে গেছে। দুটো পাথরের স্তম্ভ।

হাঁ-করা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই সুগৌর গিরিগোপাল, বালামচালের মত মিহি গলায় , মুখ থেকে বিবিয়ানীর আতরের সুবাস ছড়াতে ছড়াতে বললেন, বাবা কোথায় ?

প্রশ্ন শুনে, শরীরের সাময়িক পঙ্গু ভাব কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল অতিশয় চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বললুম, বাবার একসপেরিমেণ্ট ফেল করেছে ! রঙ মেখে হতাশ হয়ে বসে আছেন।

আঁা বলো কি ? হরি ঘাবড়াসনি, ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস ?

গলা যতটা তুলেছিলেন ঠিক ততটা নামিয়ে বললেন, রঙ নিয়ে কি করছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে আর দিতে হল না। পিতৃদেব এসে গেছেন। দেবতার মতই দেখাচ্ছে। একেবারে লালবাবা। হাতে সেই সব ভজঘট। ছিপি, কাচের টিউব, রবারের নল। বিশ্বকর্মা শেকড় সমভিব্যাহারে উঠে এলেন।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, একেবারে ফ্রেশ ফ্রম গার্ডেন, কাশ্মিরী আপেলের মত চেহারা। আঁা, তোকে ঠিক ড্যানি কে, বাস্টার কিটনের মত দেখাচ্ছে যে রে !

মেয়েটি টুক করে পিতার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। এসো মা, এসো মা বলে চিবুক ছুঁতেই ব্যাপারটি বেশ মনোরম হল। অধরের তাম্বুল যেন শ্রীরাধিকার বয়ানে লেগেছে। পিতার হাতের লাল রঙে চিবুক লাল, গালের একাংশ লাল।

ভদ্রলোক বললেন, গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বরে মেয়েকে নিয়ে। আঃ দর্শন করে মন ভরে গেল। আহা মায়ের কি রূপ। নে মা, প্রসাদটা কোথাও রাখ। তা বুঝলে হরি, হঠাৎ তুই যেন টানলি। মনে হল যাই একবার বিজ্ঞানীকে দেখে যাই। তা ভাই, তোমার হাতে এই জলকলমি, শাপলা, শালুকের মত বস্তুগুলি কি ?

আর বলিস কেন পঙ্কজ, কমপ্লিট ফেলিওর, টোটাল ডেসট্রাকসান, লস অফ মানি, মেটিরিয়েল, ম্যান পাওয়ার। খাওয়া দাওয়া ?

মন বলছে বলব ?

ইয়েস।

ভয়ে না নির্ভয়ে ?

নির্ভয়ে।

এইখানেই হয়ে যাক।

হয়ে যাক।

একটা প্রস্তাব। আমি রাঁধব। এবং মাংস রাঁধব।

পাবে কোথায় ?

এই যে আমার হাতে। হ্যা হ্যা, তুই কি আমায় এতই মূর্খ ভাবিস ?

ত্যাদোটা নয়।

নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই হই হই করে হেসে উঠলেন। মরা ডালে যেন ফুল ফুটছে। কড়িকাঠের ঘুলঘুলিতে চড়াইছানা চমকে জেগে চিঁচিঁ করছে।

তা হলে, পঙ্কজবাবু টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, লেগে পড়া যাক, বুড়ি ?

মেয়ে প্রসাদের ঠোঙা হাতে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সামনে এসে বললে, বলো বাবা ?

নাও মা, লেগে পড়। তোমার এই রাজবেশটি ছাড়। প্রসাদটা রাখ না মা।

রাখার জায়গাটা যে কেউ দেখিয়ে দিচ্ছেন না আমাকে।

আহা, তুমি নিজে দেখে নাও।

অলরাইট।

অপর্ণা আপনজনের মত, সহজ ভঙ্গীতে ভেতরে চলে গেল। পিতা বললেন, যাও, যাও, তুমি সাহায্য করো। কোথায় কি আছে দেখিয়ে দাও।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোর ছেলেটিকে বেশ দেখতে হয়েছে হরি। মায়ের মুখটি একেবারে কেটে

বসান। খালি, গায়ে সের দশেক মাংস লাগাতে পারলে একেবারে মাউন্টব্যাটেনের মত দেখতে হত।

কি আশ্চর্য মিল পঙ্কজ। একবার ভেবে দেখেছিস ?

ওই মুখের মিলের কথা বলছিস !

তোর মেয়ের মুখের সঙ্গে পিন্টুর মায়ের মুখ।

উঃ, একেবারে সেন্টপারসেন্ট। সেন্টপারসেন্ট মিল। পৃথিবী জুড়ে কি যে সব হতে থাকে। কোথা থেকে কি যে হয়ে যায়। আমার তো মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না। ভাবতে ভাবতেই রাত কেটে যায়। দ্যাখ হরি, সব মানুষই দার্শনিক। যার যার নিজের মত। একটু চা হবে না !

চা হবে না মানে ! চা-ই ত আমাদের জীবন। একশো ফোঁটা রক্তে পঞ্চাশ ফোঁটা চা।

পঙ্কজবাবু অট্টহাসি হেসে বললেন, রাক্ষসের প্রাণ যেমন ভোমরায়, তোর আর আমার জীবন তেমনি চায়ের পাতায়। বুঝলি হরি, বড় দুঃখ হয় রে !

কিসের দুঃখ বল ! তোর কিসের দুঃখ।

দ্যাখ, তোর বউ মারা গেল, মানে বউঠান মারা গেলেন, তুই সংসারে বড় একা, আমার কিন্তু সবাই আছে, একেবারে পরিপূর্ণ সংসার। আমার সব থাকবে, তোর কিছু থাকবে না এরকম কেন হবে ! খোদার এ কি বিচার। তোর কথা ভাবলেই আমার ভীষণ লজ্জা করে। তুই যোগী, আমি ভোগী। আমি কত ক্ষুদ্র, তুই কত বিশাল।

দ্যাখ পঙ্কজ, আমিও তোর কথা ভীষণ চিন্তা করি। আর যখনই চিন্তা করি, মনে ভীষণ বল পেয়ে যাই, ভাবি পঙ্কজ আমার পাশে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, তুই আমার ভায়ের মত।

শুধু ভাই নয়, বল যমজ ভাই। একটু চা হলে মন্দ হয় না, কি বল ?

অফ কোর্স। চা ছাড়া জীবন অচল।

বাট ওয়ান থিং, চা কে করবে ?

কেন আমি।

না, তুই নয়, করবে বুড়ি।

তোর মেয়ের কটা নাম ?

আমি বাপু বুড়ি বলেই ডাকি। তোর মেয়ে নেই বুঝবি না। মেয়েই হল বুড়ো বাপের একমাত্র ভরসা। কি শাসন ! সব সময় আগলে আগলে রাখে।

ভেতরের বারান্দায় অদ্ভুত এক দৃশ্য। দুটি মেয়ে দুজনের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মুকু আর অপর্ণা। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। বেড়াল যেন বেড়াল দেখেছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে দুজনকে মুক্তি দেবার জন্যে পরিচয়টা আমাকেই করাতে হল, ইনি আমার মেসোমশাইয়ের মেয়ে, নাম মুকুলিকা, আমরা ছোট্ট করে ডাকি মুকু। মুকু, এর নাম অপর্ণা, আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে।

দুজনেরই খুব সহবত। হাত তুলে নমস্কার বিনিময় হল।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে কাকীমা গুটিগুটি উঠে এসেছেন। পানের মত মুখ ঘামতেলে চকচক করছে। আমার পাশে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, কে গো ?

ফিসফিস উত্তর, বাবার বন্ধুর মেয়ে।

কি নাম ?

অপর্ণা।

একটা চোখ ছোট করে কাকীমা বললেন, খুব সাবধান, তোমার উপযুক্ত ফাঁদ।

অপর্ণা কাকীমার দিকে তাকাতেই, কাকীমা বললেন, বেশ মেয়েটি।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে কাকীমা চুলের বিনুনি নাড়তে নাড়তে বললেন, বাঃ, কি সুন্দর চুল ! নাকটা নেড়ে দিয়ে বললেন, টিকলো নাক। চোখ দুটো দেখে বললেন, প্রতিমার মত চোখ, ভুরু দেখে বললেন, ধনুকের মত ভুরু, সবশেষে বললেন, গড়নটি কি সুন্দর ! ভগবান তোমাকে একেবারে ঢেলে

দিয়েছেন।

কাকীমা যত প্রশংসা করছেন, অপর্ণা ততই কুঁচকে যাচ্ছে। কাকীমা বললেন, তুমি যার হাতে পড়বে তার রাজার ভাগ্য।

অপর্ণা অতি কষ্টে বললে, আপনি?

আমি পিণ্টুর কাকীমা।

অপর্ণা প্রণাম করতে গেল। কাকীমা দু'হাত ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, আমি ব্রাহ্মণ নই মা।

পিতা আর পঙ্কজবাবুর গলা পাওয়া গেল। কাকীমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নিচের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

পিতা বললেন, একি অপর্ণা, তুমি এখনও ডাঙ্গা পাওনি, জলেই পড়ে আছ? কই হে অবতার?

আজ্ঞে বলুন।

যাও দেরাজ খুলে দাও। পছন্দ করে একটা শাড়ি বেছে নাও। একেবারে নতুন শাড়িও আছে। এর মা পরার সময় পায়নি। জীবনটা ত খুব ছোট ছিল। লজ্জা কোরো না, লজ্জা কোরো না। এ তোমার নিজের বাড়ি।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুই জানিস না বুড়ি, আমরা দুজনে হরিহর আত্মা। কত রাত এ বাড়িতে কাটিয়ে গেছি। হরি, তোর মনে আছে, সেই মহিষাদল রাজস্টেটের গাইয়ে অগস্তিমশাইকে। আঃ, কি গানই গাইতেন। এ বাড়িতে বহুকাল কোনও আসর বসেনি। জীবনটা কি হয়ে গেল।

আর জীবন? এই তো জীবন। যেতে যেতে সবই চলে যায়। যে শেষে যায় তার বড় জ্বালা। সব দোরতাড়া দিয়ে চাবি বন্ধ করে, বারেবারে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে যাওয়া।

অগস্তিমশাই এখন কোথায়?

জানি না রে? আছেন না গেছেন তাও জানি না। শিল্পীরা বেশিদিন বাঁচেন না।

না না বেঁচে আছেন। বয়েস খুব বেশি নয়।

পঙ্কজবাবু হঠাৎ মুকুকে দেখলেন, মেয়েটি কে?

মেজদার ভায়েরা ভাইয়ের মেয়ে, এখানে এসেছিল পরীক্ষা দিতে। ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড।

স্যাড কেন?

এর বড় বোনটি নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে।

সে কি? তল্লাস্ চলছে?

কিছু বাকি নেই, তোলপাড় চলছে।

আঃ, এই জন্যই সংসার করতে নেই। একটা না একটা অশান্তি পেছনে ফেউয়ের মত লেগে থাকবেই। একটু চা হলে মন্দ হত না, কি বল হরি?

অফকোর্স!

কাকীমা সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললেন, আমি করে দোব ঠাকুরপো। আমার উনুনে আঁচ গনগন করছে।

পিতা চমকে ফিরে তাকালেন, অ্যা, তুমি, আচ্ছা করবে করো। সেই ডাল চাটা নিয়ে যাও।

পঙ্কজবাবু বললেন, ইনি?

আমার বাল্যবন্ধুর স্ত্রী। নিচেটা নোম্যানস ল্যাণ্ড হয়েছিল, তাই থাকতে দিয়েছি। স্বামীটি গুণী, সুন্দর তবলার হাত, তবে স্বভাবটি তেমন সুবিধের নয়। উড়োপাখি।

সংসার কি জিনিস হরি! দুটো পাখি কখনও এক ডালে বসতে পারে না। তোর বাগানের গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে। বয়েস কিভাবে বাড়ছে হরি?

শশিকলার মত।

পঙ্কজবাবু আবার হই হই করে হেসে উঠলেন, দারুণ বলেছিস। তার মানে অমাবস্যা আসছে। ওটা

কি গাছরে ? ওই যে কোণের দিকে। বিউটিফুল, হলদে হলদে পাতা।

ও, ওটা হল রিঠে গাছ। কি হল, তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে। যাও দেরাজটা খুলে দাও।

আজ্ঞে, ইনি গেলে তবেই ত খুলব ?

পঙ্কজবাবু আবার হোহো করে হাসলেন, বুড়ি, তোব কি রেসপেক্ট ? ইনি। দূর, বোকা ছেলে, ইনি, কি ইনি ? শাড়ি পরেছে বলে এত সম্মান ! তুমি বলো, তুমি।

দেরাজে থরেথরে সাজান মায়ের স্মৃতি। বেনারসী, সিল্ক, ব্লাউজ, সোয়েটার, সোনাবাঁধান পাশচিরুনি। ব্রহ্মদেশের বাঁশের তৈরি কারুকাজ করা গোল চৌকো বাকস। সবই ছিল মায়ের। আর এক মা, আমার পাশে দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে দেখছে। ঘরে একটা আলোআঁধারের খেলা চলেছে। দেরাজ থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরচ্ছে। স্মৃতির একটা সুন্দব মন-কেমন-করান গন্ধ আছে।

অপর্ণা দেখার জন্যে মাথা সামনে নোয়াল। ওর শরীর থেকে কেমন একটা উত্তাপ বেরচ্ছে, ফুলের গন্ধ। দেরাজের ভেতরটা ঠাণ্ডা। একগুচ্ছ চুল কপালের ওপব দুলছে। দু কানে ঝুলে থাকা দুটো দুল, আর পারি না, আর পারি না, ছন্দে দুলছে। নাকের নাকছাবি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। পরনের সিল্কের শাড়ি, নানা ষড়যন্ত্রে খিস খিস শব্দ করছে। আমার মন বলছে, চেয়ে দ্যাখ, তোর জীবনসঙ্গিনী হতেও পারে, শুধু তুমি ঘাড়টি একটু কাত কববে, মুখে একটু লাজুক লাজুক হাসি টেনে আনবে। ব্যবধান মাত্র এক হাত।

বুকেব ভেতর এমন ঢেঁকিপড়ার শব্দ হচ্ছে কেন ? কণ্ঠতালু কেন শুকিয়ে আসছে ?

তোর ঘোব লেগেছে। পৃথিবীতে এইবকমই হয়। এটা টপকাতে পারলেই মুক্তি। বড শক্ত কাজ হে। এ যে বিশালাক্ষীর দ।

কাকীমা তখন সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলেন, নাক, চোখ, মুখ, গডন, রঙ। আমি গড়ন দেখছি। মাথায় আমার মতই লম্বা। কিন্তু কি সুন্দব। মেয়েটিব খুব জীবন আছে। সেই বলে না, এ অনেক দূর যাবে, এই মেয়েটিও আরও অনেক বাডবে। সবে ত মুকুলিকা ! ফুল হয়ে ফুটবে যেদিন ! সিল্কের শাড়ি শবীর বেয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে। কোথাও ক্ষীণ হয়েছে, কোথাও গুরু। নদীর মত। স্থানে স্থানে শীর্ণ, স্ফীত। মানুয মারাব কল তৈবি করেছেন ঈশ্বর। ফাঁদ পেতেছেন বিশ্বজুড়ে।

এক একটা শাড়িতে আলতো আঙুল বুলোতে বুলোতে অপর্ণা বলছে, কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! এ সব আব দেখাই যায় না। সব আপনার মায়েব '

মেয়েটির গলাও কি সুন্দর। মৃদু বাতাসে যেন ঝাড় লণ্ঠনের কাচ দুলছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ছিল আমার মায়ের।

আমাকে আপনি বলছেন কেন ?

বোকার মত হাসলুম। চিরকালই আমি একটু বোকাবোকা। আমার পেটে খিদে, মুখে লাজ। বোকা বদমাশ।

আমাকে তুমিই বলবেন। ও মা ' এটা কি ?

ছোট ছোট ঘণ্টা লাগান, ভেলভেটেব সেই হাত পাখাটা অপর্ণা খুঁজে পেয়েছে। কোন দেশে তৈরি তা জানি না। তবে বড় সুন্দর জিনিস। নাড়লে বহু দব থেকে ভেসে আসা প্যাগোডার ঘণ্টার শব্দ ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়।

পাখা রেখে অপর্ণা বললে, উনি বললেন বটে, এসব শাড়ি আমি পরতে পারব না। সে যুগের দামী দামী শাড়ি। পরলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাব পরার অধিকার জন্মায় নি :

দাঁড়ান, আমি তলার ড্রয়ারটা খুলি। অনেক আটপৌরে আছে। একটু সরুন।

অপর্ণা একপাশে সরে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে নিচেব ড্রয়ারটা টেনে খুললুম। আমার ডানপাশ দিয়ে রমণীয় বৃক্ষের মত উঠে গেছে রমণী-শরীব। যেন বসে আছি গাছের ছায়ায়। মাথার কাছে ঝুলে আছে পাতার মত আঁচল। ব্রহ্মতালু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ফিকে গোলাপী রঙের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে অপর্ণাব হাতে দিয়ে বললুম, এইটা আপনি পরুন।

একেবারে নতুন।

শাড়িটা হাতে নিয়ে অপর্ণা বললে, আশ্চর্য সুতো ; কত বছরের পুরনো, এখনও ঠিক আছে। তবে পরে বসতে গেলে ফেঁসে না যায়।

ফেঁসে যাবার কথায় ঘাড় তুলে, আড় চোখে, অপর্ণাকে একবার দেখে নিলুম। সেদিন ঘর মোছার সময় বসতে গিয়ে আমার অন্তর্বাস ফেঁসেছিল। বসার সময় কোথায় চাপ পড়ে আমি জানি। একযুগ আগের শাড়ি, ফাঁসতেও পারে। অপর্ণার আয়তন আর ওজন দুটোই আমার চেয়ে বেশী।

দরজার ওপাশ থেকে মুকু বললে, আমার একটা শাড়ি পরবে ভাই ? কাচা পরিষ্কার।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

মায়ের গোলাপী শাড়ি, আবার স্মৃতির ভাণ্ডারে ফিরে এল। আমারও মন চাইছিল না। যাক, মেয়েতে মেয়েতে এবার বোঝাপড়া হোক।

পূবের বারান্দায় বসে, দুই বন্ধুর চা চলেছে। রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, এঁরা দু'জনেই ঘড়িটড়ির ধার ধারেন না। চা শেষ হবে। মাংস বাছা হবে, ধোয়া হবে। মশলা পেষা হবে। তারপর কষা হবে, সেদ্ধ হবে। ভাত চাপবে। আজ বরাতে লাঞ্চ নেই। একেবারে সেই ডিনার ?

ওপাশের ঘরে অপর্ণার চিৎকার শোনা গেল, ও মা গো, এটা কি রে বাবা ? পিতা বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, কি হল ?

মুকু মৃদু গলায় বলছে, কি হল ভাই, দরজাটা খোলো না ?

অপর্ণা তিড়বিড় করে বললে, মেঝেতে মালসার মত কি একটা চলে বেড়াচ্ছে ?

উত্তরের ঘরে দরজা দিয়ে অপর্ণা শাড়ি ছাড়ছিল। বুঝেছি, ভয়ের বস্তুটি কি। বলাইবাবু। বড় রসিক মানুষ। সাহস দেবার জন্যে বললুম, ভয় নেই আপনার, ওটা একটা কচ্ছপ। আমাদের পোষা।

ও মা, কচ্ছপ ? কচ্ছপ আবার কেউ পোষে ? কামড়াবে না ?

ও কামড়ায় না, ভারি ভাল ছেলে।

ঘরের ভেতর দুদ্দাড় করে একটা শব্দ হল। বলাইবাবু অপর্ণা দেবীকে নাচ শেখাচ্ছেন। খটাস করে খিল খুলে উত্তরের ঘর থেকে অপর্ণা প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল। মুকুর দেওয়া শাড়িটা কোনও রকমে গায়ে জড়িয়েছে। ছাড়া সিল্কের শাড়ি মেঝেতে ফুলে ফেঁপে পড়ে আছে। বলাইবাবু বেশ আরাম করে তার ওপরে চেপে বসেছেন। বলা যায় না, হঠাৎ যদি টেস্ট করে দেখার ইচ্ছে হয়। মুণ্ডুটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে।

শাড়িটাকে উদ্ধার করে এনে অপর্ণার হাতে দিলুম। এই সব মন চঞ্চল করা কাজই ত আমাকে করতে হবে। এর নাম পরীক্ষা।

শাড়িটা হাতে করে নিয়ে, অপর্ণা বললে, ইস, ছি ছি, আপনাকে তুলে আনতে হল ? কি লজ্জা ? কচ্ছপ পুষেছেন কেন ? কচ্ছপ কেউ পোষে ! কামড়ালে, মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

বাজে কথা। কচ্ছপ নিরীহ প্রাণী। কখনও কামড়ায় না।

শাড়ি পরার ধরনে অপর্ণাকে আশ্রমবালিকার মত দেখতে হয়েছে। বড় বড় চোখে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। না, আর এখানে থাকা উচিত নয়। মুকু যে ভাবে তাকাচ্ছে ! অপর্ণা একটু এলোমেলো হয়ে আছে। ঠিক ততটাই এলোমেলো, যতটায় যুবকের মতিভ্রম হতে পারে। আমাকে চরিত্রহীন ভাবছে। চরিত্র আবার কাঁচের গেলাসের মত। কখন যে ঠুন্ করে ভেঙে যায়, কোন আঘাতে !

মেসোমশাই গম্ভীর গলায় মেয়েকে ডাকলেন, মুকু।

আসি বাবা, বলে মুকু প্রায় দৌড়ে চলে গেল। অপর্ণা ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, কে, কে ?

মেসোমশাই। মুকুর বাবা।

মেশোমশাইয়ের গলা শোনা গেল। মেয়েকে বলছেন, বড় গোলমাল হচ্ছে। কিসের এই উৎসব ! তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দাও। আমার জ্বর আসছে। একটু শুয়ে পড়ি।

মেয়ে বললে, চলো বাবা, আমরা ফিরে যাই। এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। যা করার ওখানে বসেই করা যাবে।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। শুধু শুধু এঁদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

মুকু দরজাটা ভেজিয়ে দিল। অপর্ণা অপরাধীর মত মুখ করে বললে, আমি কি খুব জোরে চিৎকার করে ফেলেছি ?

না না। খুব আস্তে কথাও ওঁর এখন অসহ্য লাগে। বুঝতেই পারছেন, মনের অবস্থা খুব খারাপ।

আমরা খুব বাজে দিনে এসে পড়েছি। বাবা যখন কোনও কিছু নিয়ে মেতে ওঠেন, তখন যেন সামলানই দায়। যাই বলে আসি, অত হইচই করছ কেন ?

না না। অপর্ণার হাতটা প্রায় চেপেই ধরেছিলুম, খুব জোর সামলে নিয়েছি। একেই বলে সংযম !

অপর্ণা বললে, মেসোমশাইয়ের জ্বর আসছে বলছেন, ওঁকে কিছু খাইয়ে দিলে হত না ! এঁদের রান্না হতে ত সেই বিকেল পাঁচটা। যেমন আমার বাবা, তেমনি কাকাবাবু !

আমার বাবার জীবনে ত কোনও আনন্দ নেই। শুধুই কর্তব্য। আজ আপনার বাবাকে পেয়ে তবু একটু মেতে উঠেছেন। এ মাতন ত বেশিক্ষণ থাকবে না। ম্যালেরিয়ার মত, এই ছাড়ে, এই আসে। কি হবে বলে ! সব আয়োজন এখুনি থেমে যাবে !

মুকুকে তা হলে ডাকুন না। মেসোমশাইকে যা হোক কিছু খাইয়ে দিক।

মুকুকে আমি ডাকতে পারবনা, আপনি ডাকুন। আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কেন, ঝগড়া হয়েছে ?

না ঝগড়া নয়। বড়লোকের মেয়ে। বেশ একটু গরব আছে।

কই, আমি ত তেমন কিছু বুঝলুম না। আচ্ছা, দাঁড়ান দেখছি।

অপর্ণা ভেজান দরজা ঠেলে, খুলতে খুলতে ডাকল, মুকু, মুকু। ঘরে একটা পা রেখেছে। মেসোমশাই চিৎকার করে উঠলেন, কে, কনক এলি, কনক ? কনক ?

বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, মেসোমশাইয়ের বেশ জ্বর এসেছে। চোখ দুটো ঘোর লাল। কনক, কনক করে, দু হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। অপর্ণা এক পা, এক পা করে পিছু হটছে।

আরে সত্যঘাতী মন ! কেন হও বিচঞ্চল ?

অপর্ণা পায়ে পায়ে পিছু হটছে। মেসোমশাই পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন। মুকু বলছে, বাবা, বাবা, ও দিদি নয়, এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

মেসোমশাই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অপর্ণা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ফিস ফিস করে বললে, এমন জানলে, আমি সামনে যেতুম না। কনককে কি আমার মত দেখতে ছিল !

অনেকটা। তবে আপনি আরও সুন্দর।

মেয়েদের মুখের ওপর সুন্দর বললে, বড় লজ্জা পেয়ে যায়। খুব পরিচিত হলে, ধ্যাৎ বলে চড় মারতে আসে। ধরতে পারলে খামচে দেয়। অপর্ণা মুখ নিচু করল।

আমাদের দুই পিতাই ছুটে এসেছেন। আমার পিতা বলছেন, কি হল বিনয়দার ! বিনয়দার কি হল !

পঙ্কজবাবু বললেন, ভদ্রলোককে ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে।

মুকু মেসোমশাইকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, কি, হয়েছিল কি ?

উনি অপর্ণাকে কনক ভেবে ছুটে এসেছিলেন। তা ছাড়া খুব জ্বর এসেছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, জ্বর এসেছে ? তা হলে ত ডাক্তার ডাকতে হয় !

পিতা বললেন, উনি বড় বেশি ভেঙে পড়েছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুমি কি বুঝবে বলো ভাই ! তোমার মেয়ে থাকলে বুঝতে ! কি যে করা যায়, আমার মাথায় আসছে না। এত বড় একটা দেশে মেয়ে হারান মানে, খড়ের গাদায় ছুঁচ হারান। কি ভাবে হারাল হরি।

সে একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপাব। পুরো ঘটনা তোকে দুপুরে বলব।

অপর্ণা বললে, বাবা, এঁদের মন, মেজাজ, শরীর, কোনটাই যখন ভাল নেই, তখন তোমার ওই রান্না-টান্না আজ থাক। পরে আব একদিন হবে'খন।

ঠিক বলেছিস মা। চল্, আজ আমরা চলে যাই।

কাকীমা দবজার ওপাশ থেকে নিচু গলায় বললেন, আমি একটা কথা বলব ?

পঙ্কজবাবু ঘুরে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় বলবেন।

মাংসটা আমিই রেঁধে দিই। সহজে হয়ে যাবে। আপনাবা ততক্ষণ চানটান করে নিন। আমি খুব একটা খাবাপ রাঁধি না।

পিতা সার্টিফিকেট দিলেন, না, না, তুমি ভালই রাঁধ। বরং পঙ্কজ রাঁধলে কি হত, বলা শক্ত।

অপর্ণা বললে, না না, বাবা খুব ভালই রাঁধে। মা বলেন, আগের জন্মে তুমি ছিলে বাবুর্চি। আব মা ছিলেন মৃগী।

পঙ্কজবাবু বললেন, এঃ বেটি, আমার সব সিক্রেট আউট করে দিলে।

কাকীমা বললেন, আমি তা হলে লেগে যাই।

পিতা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, লেগে যাও। আমরা ততক্ষণ রুগীর সেবার ব্যবস্থা করি। দূর থেকেই মনে হচ্ছে, জ্ববটা বেশ ফুটেছে। মুখ দেখে বোঝা যায়—এ হল ব্রেন ফিভার। ভগবান করুন, খারাপ দিকে না চলে যায় !

পঙ্কজবাবু বললেন, ভূতের মুখে রাম নাম। তুমি ত বাবা নাস্তিক।

ও আমার কথার কথা। ভগবান কি আর কিছু করবেন ! করবে মানুষ। ভাল ডাক্তার চাই। তেমন বুঝলে, টেলিগ্রাম করে, স্ত্রীকে এখানে আনাতে হবে। সেবা চাই।

মেসোমশাই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ওই উপকারটি আর করবেন না হরি দা। তাকে আমি কিছুই জানাই নি। এই অবস্থায় জানাতেও চাই না। তার শরীর খুবই খারাপ। আপনাদের আমি খুব বেশি ভোগাব না। আজ বড় কাবু। কাল সোজা হয়ে যাব। সোজা হতে পারলেই আমি চলে যাব।

পিতা বললেন, আপনি বড অভিমানী। আমি ত সে ভেবে বলিনি। তুমি একবার থার্মোমিটারটা নিয়ে এস তো ! আঃ মনটা বড় ছটফট করছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, কেন, ছটফট করছে কেন ?

ওর দাদুকে একবার খবর দিতে পারলে বড় শান্তি পেতুম। শাক্ত মানুষ, মাংস হচ্ছে।

তা দিলেই হয় !

যাবে কে ? আমরা সবাই ত ব্যস্ত !

সিঁড়িতে ভরাট গলায় কে যেন তিনবার বললেন, জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম। সঙ্গে সঙ্গে মাতামহের গলা পাওয়া গেল, শঙ্কর, দ্যাখো দ্যাখো, কে এসেছেন ! কাঁকে এনেছি একবার দ্যাখো।

মাতামহ পাখির আনন্দে উড়ে এসেছেন। সন্ধে বেলা, ডালে বসে, পাখি বাসায় ফেরার এমনি আনন্দে কিচির মিচিব করতে থাকে। মাতামহের আগে আগে উঠে আসছেন এক সন্ন্যাসী। মুখে মৃদু ধ্বনি, জয় রাম, জয় রাম। বড় সুন্দর, সাত্ত্বিক চেহারা। নাতিদীর্ঘ শরীর। গৌরকান্তি। মুখে একটা জ্যোতি খেলছে। চোখে অদ্ভুত এক প্রেমিকের দৃষ্টি। তাকিয়ে আছেন, অথচ দৃষ্টি কাউকে স্পর্শ করছে না। খেলে যাচ্ছে সুদূরে। যেন দিগন্তের পারে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। বিষয়ীভূত নয়।

আমরা তিনজনেই ছুটে গেলুম। অপর্ণা সবার পেছনে। মুখ গোমড়া মুকু ধারে কাছে নেই। না থাকুক। ও এক আলাদা স্বভাবের মেয়ে। পিতার দিকে গেছে। সন্ন্যাসী দেখলে বড় আনন্দ হয়। কেন হয় তা জানি না। মন বলতে থাকে, ওরে, সংসারেই মুক্তি আছে। কায়দাটা ওঁদের কাছে শিখে নে।

পিতা বললেন, আসুন, আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিল, ভাবছিলুম, একে পাঠাবো ডাকতে।

সত্যি! মাতামহের গলায় কি রকম এক ধরনের আবেগ এসে গেল, আমাকে ভাবার মানুষ, আমাকে ডাকার মানুষ এখনও আছে! রাজা, আরও কয়েক বছর বাঁচা চাই। রাজা, এখনও সব ডাল শুকোয় নি।

উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল, বইঠিয়ে গুরুজী, ও হ্যাঁ, একটা আসন চাই, কম্বলের আসন।

আসন এল। সেই আসন পেতে, গুরুজী চেয়ারে বসলেন। বসার ধরনটি বড় সুন্দর। একেবারে খাড়া। আমার নজর তাঁর বুকের দিকে। ধীরে ধীরে, সমান তালে, বুক উঠছে আর নামছে। শ্বাস যতটা দীর্ঘ, প্রশ্বাসও ততটা দীর্ঘ। আমার দৃষ্টি তাঁর চোখের দিকে। সকলের মাঝে থেকেও, কি অদ্ভুত নিঃসঙ্গ। কিসের আনন্দে যেন মশগুল। যে আনন্দ এখানে নেই, অন্য কোথাও আছে, অন্যভাবে।

মাতামহ বললেন, শঙ্কর, ইনি আমার গুরুদেব, হৃষীকেশে থাকেন।

হঠাৎ পঙ্কজবাবুর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

পিতা বললেন, আমার একমাত্র বন্ধু, সহকর্মী পঙ্কজ।

মাতামহ পরিবেশ সচেতন হয়েছেন। চোখ বেড়াতে বেড়াতে অপর্ণাকে ধরে ফেলেছে। দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি, আন্ডারস্টান্ড, আন্ডারস্ট্যান্ড, ওই যে বঁড়শি বেটি দাঁড়িয়ে আছে। এক যায়, এক আসে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, হরি নামের মাস্তুলে। ব্যাটার আমার কপাল ভাল।

বয়েস বাড়লে, মানুষের রসের ভান্ডার যেন উপচে পড়ে। এমন করলেন অপর্ণা সরে পড়ল।

মাতামহ এইবার অপূর্ব হিন্দিতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়পর্ব শুরু করলেন, বাবা, এ মেরা জামাই, হরিশঙ্কর, বহুত চরিত্রবান, যৌবনমে দোনো এক সাথ ব্যায়াম কিয়া। ও দিন তো চলা গিয়া। অভি, আঁধার আ রাহা হই, সূরয অস্ত হো যায়ে গা। আশীর্বাদ কিজিয়ে, কি, সামনা জনমমে, ফির দোনো এক সাথ মিলে। লীলা এইসি চলে, জনম, জনম মে।

বাবার ঠোঁট কাঁপছে। তার মানে জপ চলছে।

পিতা কখনও কারোকে প্রণাম করেন না। আজ করলেন। করলেন বড় ভক্তিভরে।

সন্ন্যাসী পিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, শুধু বললেন, জয় রাম, হো যায়ে গা।

সামান্য ব্যাপার, সামান্য কথা, কি জানি, কি হয়ে গেল, আমার কঠোর পিতা ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। আর আমার মাতামহ উল্লাসে বলতে লাগলেন, ভাঙচে, ভাঙচে, নামচে, নামচে। বলতে বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন। কাঁদছেন আর বলছেন, আবার আমাদের দেখা হবে, লীলা, লীলা।

সন্ন্যাসী আবার বললেন, জয় রাম, জয় রাম। দৃষ্টি সুদূরে। পিতার মাথায় আবার স্নেহের হাত রেখে বললেন, দীক্ষা মিলা বেটা?

মাতামহ বললেন, নেহি হুয়া। উ সব মানতাই নেহি, আতাই নেহি, বিজ্ঞানী হো।

সন্ন্যাসীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি বললেন, জয় রাম, সব কুছ আ যায়েগা।

পিতা প্রণামের জন্যে অবনত হয়েছিলেন, এতক্ষণ সেই ভাবেই ছিলেন। সোজা উঠে দাঁড়ালেন। মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, এখনও ফিরে আসেন নি। চরিত্রে চরিত্র আসেনি। আমার অভিজ্ঞতায় জানি, মানুষ, কি ভাবে মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। কেমন করে অনন্তের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। যখন আবার ফিরে আসে তখন অন্য মানুষ। নাম যা ছিল তা রইল, কর্মও একই রইল, মানুষ কিছু জানল না, বুঝল না। আমি বদলে গেলুম। আমার বিষয়, ধ্যান-ধারণা সব বদলে গেল।

পিতা বললেন, আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন?

জয় রাম। হোগা, হো যায়েগা।

মাতামহ বললেন, কব হোগা গুরুজী ?

একদিন হোগা।

কোন দিন গুরুজী ?

বেটা, তুমহারা বোখাব হোগা। বহত ভাবি, ঘাবড়াও মাৎ আরোগ্য মিল যায়েগা। তুম তো বেটা বিজ্ঞানী হো। দেহ শুধ হো যায়েগা। কভি ঘুমতে ঘুমতে হাম আ সেকতা, তুম ভি হামারা পাশ আ সেকতা। বামজীকা মর্জি।

মাতামহ আকুল হয়ে প্রশ্ন কবলেন, বোখার কাহে হোগা ?

হোগা, ওইসাই হোগা।

সন্ন্যাসীকে আমাব ভীষণ ভাল লেগে গেল। অসম্ভব শান্ত। বড় কম কথা বলেন। কম কথা বলেন বলেই, সব কথার অসম্ভব ওজন। সুযোগ পেয়ে প্রণাম করলুম। মাতামহ পবিচয় কবালেন, হামারা নাতি, কন্যাকা লেড়কা।

সাধুজী প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু বললেন, জয় বাম।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, আমাকে দীক্ষা দেবেন ?

মাতামহ সার্টিফিকেট দিলেন, বহৎ শুদ্ধ আত্মা।

সাধুজী মৃদু হেসে বললেন, হো সেকতা। জয় বাম।

মাতামহ বললেন, দীক্ষা হোগা গুরুজী ?

হোগা বেটা, লেকিন হিয়াসে নেহি।

নিজেব শবীব আঙুল দিয়ে দেখালেন।

তব হোগা ক্যায়সে, হোগা ক্যাযসে ? মাতামহ ভীষণ উতলা হলেন।

হ্যায, হ্যায, ইসকা গুরু হ্যায়, সময় হোনেসে আ যাযগা, মিল যাযগা। জয বাম, জয বাম।

মুকু উদ্ভ্রান্তের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, একজন ডাক্তাব পাওয়া যাবে, ডাক্তাব ? জ্বরটা ভীষণ বেড়েছে। ভুল বকছেন।

মাতামহ জিজ্ঞেস কবলেন, কাব জ্বব ? কার আবাব জ্বব হোল শঙ্কর !

আজ মাতামহ পিতাকে সেই তখন থেকে শঙ্কর, শঙ্কর বলে ডাকছেন। আদরের ডাক ছোটই হয়।

পিতা বললেন, বিনযদাব ভীষণ জ্বব। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে—ব্রেনফিভার।

মেয়ের কোনও খবব নেই শঙ্কর ?

নাঃ, কোথায় খবব ?

আশ্চর্য, পুলিস কি ঘুমিয়ে পড়েছে ! গুরুজী আপনি একবার দেখবেন। বহত্ আফসোস কি বাত, লেড়কি খো গিযা। বেমার হো চুকা।

কাহা হায বেটা ! চলিযে।

সাধুজীকে নিয়ে সদলে আমরা মেসোমশাইযের ঘরে গেলুম। তিনি তখন জ্ববের ঘোরে অনেকটা গানের মত কবে বলছেন, জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো। পুরো লাইনটা একবারে বলা সম্ভব হচ্ছে না, ভেঙে ভেঙে, থেমে থেমে বলছেন।

সাধুজী মেসোমশাইয়ের মাথাব সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহাপুরুষদের শরীব থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয। ওঁরা নিশ্চয়ই সেন্ট মাখেন না। হোমের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে যে রকম গন্ধ বেরোয় ঠিক সেই রকম। ঠাকুর ঘরে ঢুকলে যে রকম গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেই রকম।

মেসোমশাই জ্বরের ঘোরে দুবার, মি লর্ড, মি লর্ড করলেন।

মেসোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সংসার মানুষকে কি ভাবে দগ্ধ করে দেয ! চেহারা কেমন যেন ঝামার মত কালো হয়ে গেছে। এক একবাব চোখ খুলছেন, বড় দেখলে চমকে যেতে হয়। ঘোব রক্তবর্ণ। বড ব্যাবিস্টাব, যথেষ্ট পসার, প্রচুব অর্থ, কিন্তু কেমন যেন হাত পা

বাঁধা কয়েদীর মত জীবন। অথচ মাথার কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কোনও ঐশ্বর্যই নেই, আপনি আর কপনি, তিনি যেন রাজা ! অসীম আকাশ যাঁর প্রজা। মুক্ত পুরুষ আব বদ্ধ পুরুষে এই হল তফাৎ ?

ঘরের বিভিন্ন জায়গায় আমবা সব থমকে থমকে দাঁড়িয়ে আছি। সাধুজী চোখ বুজিয়ে, হাত জোড় কবে মাথাব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেব-দূতের মত। ঠোঁট দুটো অনবরতই কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থিব থেকে তিনি মেসোমশাইয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। জয় রাম, জয় রাম বললেন বার তিনেক। শেষে বললেন, সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।

আমবা সদলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। সাধুজী কম্বলপাতা চেয়ারে আসন নিলেন। মাতামহ প্রশ্ন করলেন, বাবা, ডাক্তারের কি আর প্রয়োজন হবে ?

জরুর। বোলাইয়ে।

মাতামহ বললেন, মেয়ে কি ফিরে আসবে বাবা ?

মুঝে মালুম নেহি, বেটা। কেইসে বোলেগা ?

না, আপনি সাধক মানুষ, সাধকবা অনেক কিছু জানতে পারেন, দেখতে পান, বলতে পাবেন !

বিভূতি ? সাধুজী অনন্তের দিকে তাকালেন। বিভূতি ? মেরা কুছ নেহি হ্যায় বেটা। মেরা সিরিফ বামজী হায। চলতি চক্কি সব কোই দেখে, কীল না দেখে কোই। যো কীলকো পাকড়কে রহে, সাবেৎ রহা হেয় ওই॥ হামারা বিভূতি নেহি বেটে। হামারা কুছ নেহি।

সাধুজীর মুখ চোখ কেমন যেন করুণ হয়ে এল। উদাস চোখ দুটি যেন জলে ভরে আসছে। হায় বাম বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কি সুন্দব ভাব ! কোথায যেন নিয়ে চলেছেন আমাদেব !

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন আবার, বোখাব সাববে ত বাবা ?

সাধুজী বললেন, রামকৃপা নাশহি সব রোগা।

আমাব কানেব কাছে অপর্ণা ফিসফিস করে বললে, আপনাকে আপনাব কাকীমা ডাকছেন।

কোথা থেকে কোথায় ফিরে এলুম ! এই পতন এড়াবাব জন্যেই মানুষ সংসার ছেড়ে পালায়। চলতি চক্কি ছেড়ে, কীলকে জাপটে ধবে। কাকীমা, গরম মশলা খুঁজে পাচ্ছেন না। গরমমশলা না দিলে মাংস বেতার হয়ে যাবে।

কাকীমা বললেন, তোমবা এখনো কি করছ বলো তো ? বেলা কত হল জানো ? তোমাদের সবই অদ্ভুত ! মেয়েটার মুখটা শুকিয়ে গেছে।

অপর্ণা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সন্ন্যাসী দেখে কেমন যেন হয়ে গেছে। বসার ঘবে ভাবেব বন্যা বইছে।

আমি বললুম, আজ আবার খাওয়া দাওয়া কিসের ? জানেন কত বড় সাধু এসেছেন !

কাকীমা লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাঁ, সেই ঘুরঘুরে বাবা ?

না না, ইনি আমার দাদুর গুরুদেব। হিমালয়ে থাকেন।

আমি একবার যাই। বটঠাকুর রাগ করবেন ?

রাগ করবেন কেন ?

তা হলে আমি একবার যাই। আমি কেবল একটা জিনিস চাইব। পয়সা কড়ি নয়, সুখটুখ নয়, শুধু একটা জিনিস। বুঝতে পেরেছ ?

কাকীমা ফোঁসফোঁস করে চোখ মুছতে লাগলেন। আজ যেন দিকে দিকে কান্নার মহোৎসব পড়ে গেছে।

আপনি যেতে পারেন, তবে একঘর লোকের সামনে কেমন করে আপনি সেই জিনিস চাইবেন ! তবে হ্যাঁ, মহাপুরুষরা সব বুঝতে পারেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মনের কথা পড়ে ফেলবেন।

তুমি বলো আমি তাহলে কি করব ! একবার বলছ এগোতে, একবার বলছ পেছতে। ঠিক করে বলো, কি করব ?

যান, ঘুরে আসুন। সাধু দর্শনের পুণ্যটা ত হবে !

কিন্তু শুধু হাতে যাই কি করে ! তুমি আমাকে একটু মিষ্টি কিনে এনে দাও।

আপনি তা হলে নিচে যান, আমি আসছি। হয়তো আমাদেরও কিছু আনতে হবে।

অপর্ণা বললে,আমি যাব আপনার সঙ্গে নিচে ? একটা যা হয় কিছু আমাকেও করতে দিন।

চল না মা,তবে নিচেটা বড় অন্ধকার। তোমাকে এতক্ষণ ভয়ে বলিনি।

অপর্ণা বললে, অন্ধকার, তাতে কি হয়েছে ! সব জায়গায় কি আলো থাকে ?

দুই মহিলা নিচে নামতে লাগলেন। অপর্ণা না ভেবেই বড় ভাল কথা বলে ফেলেছে। বসার ঘরে পঙ্কজবাবু আর এক মহাপুরুষের মত বসে পড়েছেন। খালি গা, চাঁপাফুলের মত রঙ। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে মোটা পইতে। সবাই চুপচাপ, কেউ কোনও কথা বলছেন না। প্রকৃত সন্ন্যাসীব এই ঠিক লক্ষণ। মুখে বাক্য সরে না, ভাবেই বিভোর।

পঙ্কজবাবু হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে, ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, ধূমপান করা যায় ?

দাঁড়ান দাদুকে জিজ্ঞেস করে আসি।

ভাবস্থ অবস্থায় মাতামহ এক শুনতে আর এক শোনেন, না না,সন্ন্যাসীরা ধূমপান করেন না। তবে বাবার কিছু সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি সাধুজীর ধূমপানের কথা জিজ্ঞেস করিনি। পঙ্কজবাবু ধূমপান করতে পারেন কি না জিজ্ঞেস করছেন।

অ, উনি, না করলেই ভাল হয়। তুই একচামচে ভাল দই আর এক চামচে মধুর ব্যবস্থা কর। এই হল বাবার সারাদিনের আহার।

দই আমি দোকানে পাব, মধু কোথায় পাই ? নিচে বেশ জাঁকিয়ে মহিলা মহল বসেছে। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে কতকালের পবিচয়। অপর্ণা শিলে কি একটা বাটছে। কাকীমা বসেছেন পেঁয়াজ নিয়ে। দু চোখে হাপুস হুপুস জল। মাঝে মাঝে হয় এ হাতের ওপর বাহু, না হয় ও হাতের ওপর বাহু দিয়ে চোখের জল মোছার চেষ্টা করছেন। বেশ অন্তরঙ্গ কোনও আলোচনা চলেছে, নিচু গলায়। মানুষ ইচ্ছে করলে সংসারকে কত সুখে রাখতে পারে ; কিন্তু করবে না। এই কাকাবাবু এসে হাজির হবেন দু-একদিনের মধ্যে। কাকীমার মুখের হাসি শুষে নেবেন ব্লটিং পেপারের মত। উট যেমন কাঁটাগাছ খায়। মুখ রক্তারক্তি তবু খেয়ে চলেছে। কোনও কোনও মানুষের অশান্তিই পরম প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে। তাইতেই ধৃতি, তাইতেই পুষ্টি।

কাকীমা বললেন, দেখে নাও, অপর্ণা বউ হলে, কি রকম দেখাবে ! এমনি করে শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে থেঁতো করবে। বুঝেছ ছোকরা !

কাকীমার কথা শুনে অপর্ণা লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল। মেয়েদের জগতে বিয়ের চেয়ে বড় ঘটনা যেন আর কিছু নেই।

আপনার কাছে একটু মধু হবে কাকীমা ?

মধু ! বাবা, তুমি যে একেবারে ভবিষ্যতে চলে গেলে। আগে হোক তারপর তো মধু লাগবে। এখনই তোমার মধু কি হবে !

অপর্ণা নোড়াটাকে শিলের ওপর ঠকাস করে নামিয়ে রেখে, দ্রুত পায়ে, আমার পাশ দিয়ে ঘরেব বাইরে চলে গেল। যেতে যেতে বললে, ধ্যাত্, আপনি বড় অসভ্য।

কিসের যে কি অর্থ, কিছুই বোঝা গেল না। মধুর সঙ্গে ভবিষ্যতের কি সম্পর্ক ! অপর্ণাই বা অমন করে চলে গেল কেন। কাকীমা খিল খিল করে হাসছেন আর বলছেন, ভারি সুন্দর মেয়ে, বড় সুন্দব মেয়ে।

ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে।
তখনই তা মোছে ঠোঁটেরি হাসির ঘায়ে॥

এক চামচে দই, এক চামচে মধু, এই হল হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর সারা দিনের আহার ! কি করে শরীর থাকে ! আমরা এত খেয়েও বলছি, খাওয়া ঠিক হচ্ছে না, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রোটীন চাই, ভিটামিন চাই। পিতৃদেবের প্রশ্নে মাতামহ মৃদু হাসলেন।

বুঝলে শঙ্কর, এই হল সাধনা। ক্ষয় নিবারণের জন্যেই আহার। যাঁর ক্ষয় নেই তাঁর আর আহারের কি প্রয়োজন বলো।

বড় হল ঘরে কাকীমা ভেলভেটের আসন পেতে দিয়েছেন। চকচকে. ঝকঝকে গেলাসে গেলাসে জল। পঙ্কজবাবু স্নান করে আরও যেন ঝকঝকে হয়েছেন। গুরুজী চলে যাওয়ায় মাতামহ একটু শোকার্ত। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে। ছোড়ো এ সংসার। ঝুটি মায়া, ঝুটা কায়া। মাংসের গন্ধে বাড়ি মম করছে। কাকীমার রান্নার হাত সাংঘাতিক। কেবল একটাই যা দুঃখ, অতি বড় ঘরণী ঘর না পায়, অতি বড় যোগী দর্শন না পায়।

পিতা বললেন, বসার ঘরে এমন সুন্দর এক অতিপ্রাকৃত গন্ধ বেরচ্ছে ! জীবনে বহু সেন্ট নাড়াচাড়া করেছি, এমন গন্ধ কখনও নাকে আসেনি।

মাতামহ বললেন, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে এমনি গন্ধ বেরোয়। মৃগের যেমন কস্তুরী, সাধকের তেমনি কুণ্ডলিনী।

পিতা বললেন, আমি আর মাংস খাব না। আজ থেকে মাংস খাওয়া ছাড়লুম।

পঙ্কজবাবু বললেন. সে কি ! খাওয়াব সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই হরি। ধর্ম হল মনের জিনিস। ঠাকুর বলেছেন মনে, বনে আর কোণে।

দেখ্ পঙ্কজ, জীবনে যত পাঁঠা আর মাছ খেয়েছি, সব যদি লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, সেই ফোর্ট পর্যন্ত চলে যাবে।

তুই দেখছি বার্নার্ড শ'র মত কথা বলছিস। আর বাবা, বছর পাঁচেক অপেক্ষা কর, অটোমেটিক মাংস ছাড়তে হবে। দাঁতই বলবে, ছোড়ো মুসাফীর, মায়া নগরকো। যদ্দিন আছ তদ্দিন খেয়ে নাও। আপনি কি বলেন ?

প্রশ্নটা মাতামহকে।

মাতামহ কি এক ধরনের ভাবে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। এত সুন্দর দেখাচ্ছে ! সারা ঘরটাকেই বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। সব অমাত্যদের মত চেহারা। কাকীমা সবে একটি পাটভাঙা সাদা শাড়ি পরেছেন। কপালে সিঁদুরের টিপ আঁচলের আর হাতের ঘষায়, এপাশ ও পাশ হয়ে, এই মায়ার সংসারকে যেন আরও মায়াময় করে তুলেছে। আজ থেকে আমি কাকীমাকে মনে মনে মা বলব। কাকীটা খুব আস্তে, মাটা খুব জোরে। অপর্ণাও খুব খাটছে, নুন, লেবু, জল আসছে যাচ্ছে। শাড়ির শব্দ হচ্ছে। চুড়ি বেজে উঠছে। অবেলায় যে হাট ভেঙেছিল, অবেলাতেই সে হাট যেন জমে উঠেছে। সবই নিখুঁত। কেবল মুকু যদি যোগ দিত। মেসোমশাই যদি সুস্থ থাকতেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুকু বললে, বাবা ভীষণ ঘামছেন।

পিতা লাফিয়ে উঠলেন, জ্বর ছাড়ছে। জয় রাম। চলো দেখি।

কাকীমা হাতায় করে গরম ভাত তুলছিলেন। পিতাকে উঠতে দেখে বললেন, আপনি বসুন, আমরা দেখছি। ভাতটা দিয়ে নি।

না না, আগে দেখাই ভাল। ওনার জন্যে মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে আছে। যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে, জয় রাম, জয় রাম।

পিতার কি সুন্দর ভক্তি এসে গেছে। অপর্ণার হাতে হাতা ধরিয়ে দিয়ে কাকীমা উঠে গেলেন।

মেয়েটিও কম কাজের নয় ! পঙ্কজবাবু বলতে লাগলেন, বুড়ি, গাদাগাদা দিসনি। বেলা হয়ে গেছে। কম কম দে।

মাতামহ বললেন, আমাকে মা যা দেবার তাই দিও। খাওয়ার ব্যাপারে আমার বেলা-অবেলা নেই। পারলে একদিনেই দুদিনেরটা মজুত করে নোব। কাল কি জুটবে কালই জানে।

অপর্ণা বললে, আপনি বাবার কথায় লজ্জা করে কম খাবেন কেন। বাবা তো পাশেই রয়েছেন, শেষে দুজনে না কমপিটিশান লেগে যায় !

কাকীমা দরজার কাছে এসে বললেন, ঠাকুরপো, একবার আসবেন ?

পিতা উঠে গেলেন উদ্বিগ্ন মুখে। আমার পক্ষেও আর বসে থাকা সম্ভব হল না। মেসোমশাই মানে কনক। কনক সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। মেয়েটা গেল কোথায়। কনক সত্যিই কি আর পৃথিবীতে নেই। হঠাৎ একেবারে উবে না গিয়ে, সে তো স্পষ্ট বললেই পারত, না বাবা প্রতাপকে আমি বিয়ে করব না। মেসোমশাই কি জোর করে, নিজের কথায় মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন ! এর পেছনে গভীর কোনও রহস্য, গভীর কোনও পাপ আছে। আমি গোয়েন্দা হলে নিজেই লেগে পড়তুম।

মানুষ যে এমন করে ঘামতে পারে আমার দেখা ছিল না। জ্বর তো আমাদেরও হয়, ঘাম দিয়েই ছেড়ে যায়। এ যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার ! মেসোমশাইকে কে যেন বিছানায় ফেলে চান করিয়ে দিয়েছে। কাকীমা একটা পাখা দিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়েছেন। মুকু একেবারেই ছেলেমানুষ। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

পিতা বললেন, এখন একেবারেই হাওয়া করা চলবে না। কপালে একবার হাত দিয়ে দ্যাখো তো !

কাকীমা বললেন, বরফ।

পায়ের চেটো ?

বরফ।

তোয়ালে আনো, তোয়ালে আনো। শিগগির একটা হ্যারিকেন জ্বালার ব্যবস্থা কর।

তোয়ালে এনে পিতার হাতে দিতেই কাকীমা বললেন, আমার হাতে দিন, আমি জানি, কি করতে হবে। আপনি চট করে যা হয় দুটি খেয়ে আসুন। ওঁরা সব বসে আছেন।

তুমি পারবে সব ? গা মোছাতে হবে, পায়ে সেঁক দিতে হবে।

সব পারব। আমাতে, মুকুতে সব করতে পারব। অপর্ণাকে বলবেন, ও যেন পরিবেশন করে। আমি তো এদিকে আটকে গেলুম।

পিতা যেতে যেতে বললেন, সেই অতিপ্রাকৃত গন্ধে ঘর ভরে আছে। সেই স্বর্গীয় গন্ধ।

সত্যই তাই। সেই সন্ন্যাসী যে যে ঘরে ছিলেন, সেই সেই ঘরে, সেই সেই জিনিস যা তিনি স্পর্শ করেছিলেন, সবেতেই এমনি এক ঈশ্বরীয় গন্ধ। কেমন করে এসব হয়। বিজ্ঞান কি বলে। অবিশ্বাসী কি বলেন !

অপর্ণা পাকা গৃহিণী। ওদিকে অসুস্থ মানুষ, তবু ভেবে হাসি পাচ্ছে, বিয়ের আগে, অনেক মেয়েই অনেক ভাবে দেখা দেয়, এমন হাতে নাতে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে আসরে নামে ক'জন ! প্রতিটি ব্যাপারেই ফুলমার্ক পাচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না। যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানেই পড়ছে। জাপানী বিমান যেন পার্লহার্বারে বোমা ফেলছে ! বুঝেছি, এ মেয়ে, এ বাড়ির জন্যেই তৈরি।

মাতামহ বললেন, দ্যাখো তো মা, একটুকরো মেটে পাও কি না ! নিচের বউমা যা রেঁধেছে না, একেবারে মাতোয়ারা করে দিয়েছে। এমন হাতে পড়ার ভাগ্য হলে, পাঁঠা হয়ে জন্মেও সুখ !

পঙ্কজবাবু বললেন, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। সবাই আমার মাংসের তারিফ করে, এ রান্না খেলে তারা আমার রান্না ছোঁবে না। হরি।

বল ?

ভদ্রলোক সুস্থ, সবল হয়ে উঠুন, তারপর আবার একদিন সাংঘাতিক ভাবে হবে। কি বলিস্।

বেশ, তাই হবে। একেবারে ষোলকলা পূর্ণ করে হবে।

সেদিন কালীঘাট থেকে মাংস আনব।

মাতামহ আহার করেন চোখ বুজিয়ে। মাঝেমাঝেই একটি গান করেন, সেই গানের একটি লাইন হল, আহার করো মনে করো আহুতি দি শ্যামা মাকে। চোখ বুজিয়ে বললেন, সে ভার আমার। আমি এনে দোব।

চাটনি মুখে দিয়ে পঙ্কজবাবু, আহা, আহা করে উঠলেন। এমন চৌকস হাত খুব কম দেখা যায়। একেবারে আলাউদ্দিন খাঁ সায়েব, যেমন সেতারে, তেমনি সরোদে, তেমনি বেহালায়। এনার ট্রেনিংয়ে বুড়িকে কিছুদিন রাখতেই হবে। মেয়েছেলে যদি রাঁধতে না জানে, তাহলে শি ইজ অ্যান ইনকমপ্লিট ওম্যান।

ওদিকে কাকীমা একেবারে পাকা নার্সের মত কাজ করে বসে আছেন। মেসোমশাইয়ের গা মুছিয়ে দিয়েছেন। গেঞ্জি বদলে দিয়েছেন। বিছানার চাদর পালটে দিয়েছেন। তিন থাক বালিশে পিঠ দিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত, মেসোমশাই বসে আছেন সামনে পা ছড়িয়ে। হ্যারিকেন জ্বলছে। সেঁক চলছে। তার আগে পাউডার দিয়ে পা ঘষা হয়েছে।

পিতা স্নেহমাখান গলায় জিজ্ঞেস করলেন, বিনয়দা, কেমন বুঝছেন এখন ?

ক্ষীণ গলায় মেসোমশাই বললেন, এত ঝরঝরে মনে হচ্ছে, জীবনে কখনও এত সুস্থ বোধ করিনি। আর তেমনি খিদে। জ্বরের ঘোরে, বুঝলেন হরিদা, কত কি যে দেখলুম। দেখলুম মহাদেব এসে মাথার সামনে দাঁড়িয়েছেন। হাতে ইয়া বড় এক ত্রিশূল। ত্রিশূলটা কপালে ঠেকিয়ে কি যেন সব বললেন। কিছুই আর মনে নেই। সারা শরীর যেন চড়চড় করে পুড়ে যেতে লাগল। মনে হল আমি যেন আগুনে শুয়ে আছি। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে, যেন হোমের পোড়া কাঠ। হরিদা, সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। মনে হল শরীরে হাই ভোলটেজ ইলেকট্রিসিটি খেলে যাচ্ছে।

পিতা বললেন, জয় রাম, জয় রাম।

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন, যার অর্থ, জানতুম, জানতুম, এই রকমই হবে।

মেসোমশাই কাকীমাকে দেখিয়ে বললেন, আর করলেন বটে ইনি ! মাকেও হার মানিয়েছেন। আর কি সেঁকের দরকার হবে ?

চেটো গবম হয়েছে ?

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

বাস, তা হলে ছেড়ে দাও। তোমরা খাওয়া সেরে ন্যাও। বিনয়দাকে এখন একটু গরম দুধ খাওয়াতে হবে।

আমার কিন্তু বেশ ঝাল ঝাল একটা কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

না, আজ না, আজ আর অত্যাচারী কিছু চলবে না। আজ সব হালকা। সন্ধে হয়ে আসছে, তা না হলে ফলের রস দেওয়া যেত। আপনি খাবেন, পরেশের বিখ্যাত নরম পাক, থিন অ্যারারুট আর গরম দুধ। রাতে জ্বর না এলে, কাল সকালে, মাছের ঝোল আর ভাত।

মাতামহ বললেন, জীবনে আর জ্বর হবে না। শেষ জ্বর হয়ে গেল।

মুকু আর অপর্ণাকে খেতে বসিয়ে কাকীমা এক অদ্ভুত কথা বললেন, তোমরা বসে বসে খাও ভাই, ওদিকে আমার ভাত আর পুঁইডাঁটা কড়কড়িয়ে গেল।

অপর্ণা বললে, তার মানে ? আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না ? তা হলে আমরাও উঠে পড়লুম।

কাকীমা বিব্রত মুখে বললেন, আমি যে ভাই আগেই আমার মত রেঁধে ফেলেছি। না খেলে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

পিতার প্রবেশ হল। জিজ্ঞেস করলেন, কি, তোমাদের সমস্যা ! সব হাত গুটিয়ে বসে আছে এখনও।

অপর্ণা বললে, ইনি খেতে চাইছেন না।

কেন ? কেন বউঠান, তুমি খাবে না ! আমি তোমাকে বলিনি বলে ! যাও বসে পড়। তুমি আমাকে

দুঃখ দিতে চাও। তুমি আমাকে বিব্রত করতে চাও। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। উৎসবের দিন। বিনয়দা তিনঘণ্টায় সেরে উঠলেন। কত বড় একজন মহাপুরুষ পায়ের ধুলো দিয়ে গেলেন। তুমি জান না বউঠান, আজকের দিনটার কি অর্থ। এ এক, দিন ছাড়া দিন। আনন্দ করো আনন্দ করো। জীবন বড় ছোট, বড় দুঃখে ভরা। ওই যে মেয়েটি, ওর দিকে আমি তাকিয়ে আছি। জয় রাম, জয় রাম।

কাকীমার চোখে জল গড়াচ্ছে।

একি তুমি কাঁদছ? দুঃখে, না আনন্দে!

কাকীমা ফিস ফিস করে বললেন, আনন্দে। আমাকে কেউ কখনও এতটুকু স্নেহ করে নি। আপনি করলেন। আপনার কাছে কাছে সারা জীবন যদি থাকতে পারতুম।

পিতা চমকে উঠলেন, না, না, খবরদার ও কামনা কোরো না। আমাকে যে চায় তাকে চলে যেতে হয়। এই আমার ভাগ্য, এই আমার গ্রহ।

কাকীমা এবার বেশ জোরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মেয়ে দুটি হাত গুটিয়ে আসনে বসে আছে হাঁ করে। বড়দের আবেগ বোঝার বয়স ওদের হয়নি। দু'জনেই সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। দুঃখ কাকে বলে জানা হয়নি। পিতা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। আমার মনে পড়ছে নৌকোয় দেখা সেই সতীমার কথা। বলেছিলেন, কিছু মানুষ আসে যারা কিছু পায় না। আগুনের গোলার মত। তারা যে জায়গা দিয়ে যায়, সব কিছু পোড়াতে পোড়াতে যায়। তারা হল মানুষ উট। মরুভূমিতেই যার চলা ফেরা। এতটুকু ছায়া নেই। দগ্ধ, তাম্রবর্ণ, ধুধু বালির বিস্তার। যত দূরে তাকাও মৃত্তিকা নেই, জল নেই, বৃক্ষরাজি নেই।

মাতামহ একটি সোফায় বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে ঝিম মেরে বসে আছেন। পঙ্কজবাবু আর একটিতে বেশ আয়েস করে বসে, সেদিনের খবরের কাগজটি পড়ার চেষ্টা করছেন। পিতা বসেছেন হোমিওপ্যাথি গৃহচিকিৎসার বই খুলে। মেসোমশাই উষ্ণ দুগ্ধপান করে অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। কাকীমা উত্তরের বারান্দায় মুকুকে নিয়ে বসেছেন চুল বেঁধে দিতে। অপর্ণা বারান্দার রেলিং-এ কনুইয়ের ভর রেখে আকাশ, বাতাস, গাছ, পাখি দেখছে। যত বেলা বাড়ছে, রূপ যেন ততই খুলছে। মুখটা সিঁদুরপানা হয়ে উঠেছে।

আর আমি? দেয়ালে হিমালয়ের একটা ছবি ঝুলছে। সেই দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কাল আবার বেরোতে হবে। ঢুকতে না ঢুকতেই চাকরিতে অরুচি ধরে গেল। সামনে পড়ে আছে সারাটা জীবন! যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে বারান্দার একান্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। মুকু দু'হাত দিয়ে চেপে চেপে ঢাউস খোঁপা সঠিক স্থানে ঝোলাবার চেষ্টা করছে। কাকীমা চিরুনি থেকে চুল ছাড়াচ্ছেন। অপর্ণা একইভাবে স্বপ্ন দেখছে। মেয়েটি সুন্দরী, তবে স্বভাবটি কেমন বোঝা গেল না।

কাকীমা দরজার সামনে এসে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। অবেলায় খেয়ে শরীরটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে বারান্দায় যেতেই কাকীমা বললেন, বুড়োদের দলে বসে বসে কি করছ! তোমার ভীষণ বুড়োটে স্বভাব হয়ে যাচ্ছে। মাদুরটা নিয়ে চলো ছাতে যাই। একটু পরেই তো চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি মাদুর পাতগে যাও, আমি নিচে থেকে লুডোটা নিয়ে আসি। চারজন আছি, এক চাল খেলা যাক।

সেরেছে! তিনজন মেয়ে, একজন ছেলে। ভাবতেও আতঙ্ক হচ্ছে। এদিকে বলাইবাবু বিকেলের বারান্দায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কাকীমা ত লুডো খেলবেন বললেন, মুকু কি রাজী হবে!

অপর্ণা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আপনাদের ছাদে অনেক ফুল গাছ আছে তাই না?

হ্যাঁ, অনেক গাছ। বাবা একেবারে নাসরী বানিয়ে ফেলেছেন।

চলুন যাই, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

ভেতরটা কেমন যেন ছলাক করে উঠল। অপর্ণা এইভাবে যেচে ছাদে উঠতে চাইবে, ভাবাই যায় না। এ যেন সেই মেঘ না চাইতেই জল, না কি, জল না চাইতেই মেঘ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরীদের সাধারণতঃ বড় তোষামোদ করতে হয়।

যা ভেবেছিলুম তাই হল, অপর্ণা আগে আগে উঠতে লাগল। পেছনে মাদুর বগলে আমি এক মাধাই। এই রকম পরিস্থিতিতে অল্প বয়সী মানুষদের বড় কষ্ট হয়। ভেতরটা হাঁকপাঁক করতে থাকে। সিঁড়ি থেকে সিঁড়িতে পা তোলার সময় শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পায়ের গোছ প্রকাশিত হয়। মাথা খারাপ হয়ে যায়। ধর্ম, দেবতা, বেদ বেদান্ত সব ভেসে যায়। হাত পা ছুঁড়ে, দাঁত মুখ খিচিয়ে, বীরেনদার সেই গানের মত, ভেসে যায় ভাসিয়ে নে যায়।

সিঁড়ির বাঁকের বড় ধাপে, পিতৃদেবের সেই তুলোধোনা যন্ত্র প্রহরীর মত খাড়া। এটাকে দেখলেই আমার কনকের কথা মনে পড়ে যায়। যে রাতে এটা এল সে রাতে শিল পড়েছিল। কনক পাঁপর ভেজে মাতামহকে খাইয়েছিল। সেই রাতেই প্রথম আমার বুকে এসেছিল নারী নয়, নারীর পরিধেয় বস্ত্র। সেই রাতেই উচ্ছ্বসিত পিতা বলেছিলেন, তোমার মত একটা মেয়ে পেলে এই সংসারে আবার আমি ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিতুম। সুখের দিন যেন স্রোতের ভাসমান ফুলের মত। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাট হয়ে, ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যায়।

অপর্ণা সেই তুলোধোনা যন্ত্র দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, এটা কি? বাজনা? বাজিয়ে দেখব!

তাঁতে টুসকি মারতেই, বুং করে খুব বোকা বোকা, বোঁদা একটা শব্দ হল। তাঁতটা মনে হয় বোকাপাঁঠার ছিল।

অপর্ণার খুব আনন্দ হয়েছে, আর একবার বাজাব?

বাজাও! অ্যায় তুমি বলে ফেলেছি। খেয়াল করেনি। যন্ত্রে বিভোর। করলেও কিছু করার নেই। এত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আপনি বলতে পারছি না। সব কিছুর একটা সীমা আছে। আমি তেমন বকাটে ছেলে হলে, যাতা কিছু একটা করে ফেলতে পারতুম। যা ভাবা যায়, তা করা যায় না বলেই আমরা মানুষ। একে বলে চরিত্র। একে বলে সংযম।

আবার একবার বুং করে শব্দ হল। অপর্ণার খুব মজা। খিল খিল করে হেসে বললে, কেমন একটা শিং শিং আওয়াজ। এ যন্ত্র মনে হয়, সিঙ্গিমামার আসরে বাজে।

ধরেছ ঠিক। নাও চলো।

দাঁড়াও না।

বলেই অপর্ণা জিভ কাটল। আমার চোখে তার স্থির চোখ। মোটেই বিব্রত নয়। আদৌ লজ্জা পায়নি। শুধু মনে মনে একটু কাছাকাছি সরে আসার দুষ্টুমি। জিভ ঢুকিয়ে নিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মত বললে, কি বলে ফেললুম?

বেশ করেছ। এখন ওপরে চলো। ওরা আসছে?

এটা কি বলো না? চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

এ হল তুলোধোনা যন্ত্র। লেপ, তোশক তৈরির সময় লাগে। ধুনুরির কাঁধে কাঁধে ঘোরে। কাকীমা মুকুকে নিয়ে পেছনে এসে পড়েছেন।

বাবা কতক্ষণ ধরে তোমরা দুজনে এই ক'ধাপ মাত্র উঠেছ। সাবাশ, নও জোয়ান!

এই গানটা এখন খুব শোনা যায়। আমরা নও জওয়ান। কাকীমাও শুনে থাকবেন। অপর্ণা বুং করে একটা শব্দ তুলে, উদ্ভাসিত মুখে বললে, কি সুন্দর!

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ, তোমার বিয়েতে নবতের সঙ্গে ঠাকুরপোকে এস্রাজ ছেড়ে বাজাতে বলব। দুটিতে ত বেশ জোড়ে দাঁড়িয়েছে। কত্তাকে একবার ডেকে দেখাব।

অপর্ণা দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বলতে লাগল, না না লক্ষ্মীটি না।

কাকীমা বলতে লাগলেন, ওরে পাগলী, কাপড় জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবি? কি ডাকাত মেয়েরে বাবা! ছাতে উঠে অপর্ণা হাঁপাচ্ছে। ভারি বুক উঠছে আর নামছে। মেয়েটার তো খুব প্রাণ আছে। কনকের মধ্যে একটা বড়দি, বড়দি ভাব ছিল। এ একেবারে ভিন্ন জাতের টগবগে মেয়ে।

ন্যাড়া ছাদের আলসেতে, শাড়ি গুটিয়ে বসে, অপর্ণা বললে উঃ হাঁপিয়ে গেছি। এক গেলাস জল খেয়ে আসি।

কাকীমা বললেন, দয়া করে তুমি ওই আলসে থেকে নেমে বোসো। মাথা ঘুরে টাল খেয়ে ওপাশে পড়ে গেলে সর্বনাশ হবে মা।

হ্যাঁ পড়লেই হল। আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি। আঃ কি সুন্দর ছাদ .

হ্যাঁ, সুন্দর ছাদ, তুমি নেমে মাদুরে বোসো।

অপর্ণা আলসে থেকে নেমে মাদুরে পা ছড়িয়ে বসল রানীর মত। কাকীমা বললেন, এমন টুকটুকে পা, একটু আলতা পরো না কেন ?

অপর্ণা নিজের পা দুটো ভাল করে দেখতে দেখতে বললে, বড় ছটফটে, বড় অবাধ্য।

আপনারা বসুন, আমি এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে এসো, সেবা করতে শেখ।

অপর্ণা বললে, না না, আমি নিচে গিয়ে খেয়ে আসছি।

তুমি চুপ কবে বোসো তো । একদম ছটফট কববে না।

তা হলে আমি একটু শুয়েই পড়ি।

অপর্ণা মাদুরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। চাবপাশে কড়ার মত উপুড় হয়ে পড়েছে ঘন নীল আকাশ। কসমস গাছে অজস্র ফুল এসেছে, সাদা, বেগুনী। অপর্ণার হলদে শাড়িব জমিতে খয়েবী ডুবে। ওপব বাহুব তলাব দিক, কোমবের কিছু অংশ, আর দুটো পা, নতুন আবিষ্কারেব মত, মাদুবে সাজান বয়েছে। মেয়েরা জানে না, মেয়েদের কোন্ কোন্ জিনিস কতটা মারাত্মক ! বহু উঁচুতে আকাশেব চাঁদোয়ায চিল ঘুবপাক খাচ্ছে। রায়সায়েবদের বাড়ির এরিয়েলের তারে বসে দুটো দোয়েল খুব শিস দিচ্ছে, আব ন্যাজ নাচাচ্ছে। মুকু গোব্দা মুখে একপাশে দাঁড়িযে আছে।

কাকীমা বললেন, এসো, একপাশে বোসো। মহাবানী তিন কাঠা জাযগা নিযে শুয়েছেন। অবেলায় আলসে লেগেছে। ভাব এসে গেছে।

মুকুর মনে হয হিংসে হয়েছে। মেয়েদের হিংসে কি ছেলেদেব চেয়ে বেশি।

জল আনতেই অপর্ণা উঠে বসল। আলগোছে কলকল কবে জল খাচ্ছে। মুখেব হাঁ ছোট্ট এতটুকু। ভেতরটা লাল টকটকে। ইঁদুরেব মত ছোট্ট ছোট্ট সাজান দাঁত। জিভটা যেন সাপেব মত হিল হিল কবছে। এ সাপ অন্য সাপ, বড অমৃত, বড় অমৃত।

খুব ভাল কবে ভেবে দেখ তুমি, এখনো রয়েছে
ফিবিবার অবসব,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কাঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনম ভব।

কাকীমা বললেন, রানী এইবার এক এক খিলি পান। ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে হবে। টুকটুকে লাল ঠোঁট চুষে চুষে খাই।

যাঃ অসভ্য, বলে অপর্ণা কাকীমাকে ঠেলা মারল। আমি ভাল মানুষেব মত মুখ কবে, আকাশের চিল দেখতে লাগলুম, যেন আমি চিল-বিশারদ। মনে ভাবছি একটি লাইন, ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনই তা মোছে ঠোঁটেবি হাসির ঘাযে।

লুডোব ছক পড়েছে । চাবটে মাথা চারদিক থেকে সামনে ঝুঁকে আছে। ঘাড়ের কাছে খোঁপা লদলদ কবছে। ছক নাড়াব খুডখুড় শব্দ হচ্ছে। অপর্ণার এন্তার ছয় পড়ছে। সব ঘুঁটি বেরিয়ে ছকের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে চলেছে। অপর্ণার লাল। কাকীমার নীল। আমার সবুজ। মুকুর হলদে। । কাকীমার কেবল এক পড়ছে নয় তো তিন। আমার যেমন বরাত, বলে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছেন। আমাব তিনটে বেবিযেছিল। দুটোকে অপর্ণা পত্রপাঠ ফেবত পাঠিয়ে দিয়েছে। মুকুর দুটো বেরিয়েছে। বেবলে কি হবে। অপর্ণাব নাগালেব মধ্যে। ও তো বলে বলে কাটছে। ছককা যেন ওর হাত ধবা ! পড় পাঁচ তো পাঁচই পডল। আব কচাত্ কবে মুকু উডে গেল। অপর্ণাব গলায় গান গুন গুন করছে, মায়াবন বিহারিণী হবিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী।

কানের পাশ দিয়ে বাতাস ঢালছে ফুরফুরিয়ে। লম্বা লম্বা চুল উড়ছে দিশাহারা হয়ে। আমার একপাশে অপর্ণা, আর একপাশে কাকীমা। অপর্ণার দিক থেকেই বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে চুল উড়ে এসে আমার গাল গলা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

পড় তো তিন। বাস, আমার একটা ঘুঁটিই বাইরে ছিল, ঘরে ফিরে গেল। অপর্ণা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কি, মন খারাপ হয়ে গেল!

বলতে পারতুম, তোমার কাছে পরাজয়, সে তো আমার জয়। বড় বেশি নাটকীয় হয়ে যাবে। বীরের উক্তি, আবার আমি শুরু করছি, তোমায় নতুন করে পাবো বলে, হারাই বারে বারে।

অপর্ণা বললে, সে কি লুডোর ঘুঁটি, সে তো ভালবাসার ধন।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ রে বুড়ি, সে তো ভালবাসারই ধন।

মুকু দান ফেলছে, চাল দিচ্ছে, কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক! পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব পাটে নেমেছেন। আকাশ একেবারে কুমকুম লাল। তালচটকা পাখি উড়ছে নেচে নেচে। কাকীমা বললেন, চায়ের সময় হল। যাই ব্যবস্থা করি। ঠাকুরপো আবার চা-খোর মানুষ।

অপর্ণা বললে, আমার বাবাও তাই। মাঝে মাঝেই মায়ের সঙ্গে লেগে যায়। চা নিয়ে দক্ষ যজ্ঞ। ছক গুটিয়ে কাকীমা নিচে চললেন। মুকু আর অপর্ণা বসে রইল মুখোমুখি। মুকুর মনে হয় অপর্ণাকে খুব ভাল লেগে গেছে। দু জনেই ছাত্রী।

নিচেব ঘরে বিশেষ একটা কিছু নিয়ে তিনজনেই ভীষণ ব্যস্ত। টেবিলে ল্যাম্প জ্বলে উঠেছে। তার আলোয়, ছড়ান খবরের কাগজের পাতা। তিনটে মাথা তিন দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যা কথা হচ্ছে, সবই ফিস ফিস্ করে। তিন মেজরজেনারেল যেন, রাতের আক্রমণের পরিকল্পনায় মশগুল।

পায়ের শব্দে তিনজনেই চমকে ফিরে তাকালেন। আমাকে দেখে বললেন, অ, তুমি? তাও ফিস্ ফিস্ করে।

পিতা ফিস্ ফিস্ করে ডাকলেন, এদিকে এসো।

আলোর বৃত্তে কাগজের যে অংশ, সেই অংশে একটি ছবি।

দ্যাখো তো। ভাল করে দ্যাখো।

পুলিশের বিজ্ঞাপন, অসনাক্ত মৃতদেহ। থেবড়ে কালো হয়ে আছে। একটি মেয়ে।

পিতা খুব চাপা স্বরে বললেন, সেই নাক, সেই কপাল, অনেকটা সেই রকমেরই মুখ। কি, তাই না!

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো ॥

পুলিসের ছাপা ছবি থেকে কাউকে সনাক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। তবু কোথাও সামান্য মিল খুঁজে পেলে বুকটা কেমন যেন ছাঁত করে ওঠে। হাত পা অবশ হয়ে আসে। পিতা কাগজটা সরিয়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, খুব সাবধান, বিনয়দা বা মুকু কারুর কানে যেন না যায়।

খুব চপাস্বরে কথা হচ্ছে। পিতা মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, পুলিসের একজন ওপরঅলার সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। বলিস ত আজই যা হয় একটা কিছু করা যায়।

ডাক ভেসে এল, হরিদা আছেন, হরিদা!

সব আলোচনা থেমে গেল। গলাটা খুবই চেনা চেনা। আর একবার ডাক আসতেই পিতা বললেন, হ্যাঁ, আছি। এসো, এসো, অক্ষয় এসো, অক্ষয়।

পিতাব সেই সহকর্মী বন্ধু, অক্ষয় কাকা, যিনি ভীষণ ভাল হাত দেখেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, আরে, কি আশ্চর্য ! অক্ষয়, তুমি এই সময় ?

ভদ্রলোকের সেই এক পোশাক। খালি পা, বুক খোলা, হাফ হাতা মোটা পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় লাল চোখ।

পা দুটো পাপোসে ঝেড়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, কাছাকাছি একজনের হাত দেখতে এসেছিলুম, ভাবলুম একবার ঘুরে যাই।

পিতা বললেন, বোসো বোসো, তোমাকে ভগবান পাঠিয়েছেন।

কাকীমা আব অপর্ণা চা নিয়ে এসেছেন। পিতা বললেন, আর এক কাপ চাই। কিছু খাবার আছে '

অক্ষযবাবু বললেন, এখন শুধু চাতেই হবে। আছি তো, যাবার সময হবে।

পঙ্কজবাবু বললেন, এই আমাব মেয়ে অক্ষয। অপর্ণা।

অপর্ণা হাত তুলে নমস্কার কবল।

বাঃ একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা। চন্দ্র তুঙ্গী। বুধ প্রবল। আপনি অতি ভাগ্যবান। মনে আছে, এই মেয়ে হবাব পবই আপনার চড়চড় কবে উন্নতি হতে লাগল। বউদিও অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, আপনিও সুন্দব। তবে ইদানীং একটু মোটা হয়েছেন।

সে অক্ষয, তোমাব বউদির যত্নে। তা ছাড়া বয়েসও তো বাড়ছে।

সে তো হরিদাবও বাড়ছে। দেখুন তো কেমন পাথরকোঁদা শরীর। একছটাক মেদ নেই।

আহা, ও হল সাধক। ওর সঙ্গে তুলনা চলে না।

চা আসাব পব, পিতা নিজে উঠে গিয়ে দবজা ভেজিযে দিলেন। ভেতবের কথা যেন বাইরে না যায়।

শোনো অক্ষয়, ঈশ্বরই আজ তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

কেন, বলুন তো ? বেশ সশব্দে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে, অক্ষযবাবু সামলে নিলেন। মৃদু চুমুক মেবে বললেন, আজ আপনাব মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখছি। থেকে থেকেই ঈশ্বরের নাম কবছেন। যা আগে কখনও কবতেন না।

মাতামহ নীববে মাথা নাড়তে লাগলেন, মাদ্রাজী কায়দায়।

পিতা বললেন, আমাব মনোজগতে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে অক্ষয়। মানুষের মন ' কখন যে কি ভাবে ভেঙে চুরে যায়। মৃত্যু আমাকে নাস্তিক করেছিল, জীবন আমাকে আবার আস্তিক করে তুলেছে। যাক সে সব কথা এখন চাপা থাক। কাজেব কথায় আসা যাক। তোমাব তো মর্গে খুব আসা-যাওয়া আছে।

মর্গ ?

হ্যাঁ মর্গ, যেখানে অসনাক্ত মৃতদেহ থাকে।

হ্যাঁ তা আছে। প্রাযই যাই। টেনে টেনে হাত দেখি, কেস হিস্ট্রী তৈবি কবি তাবপর মেলাই।

তা হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। খুব সাবধানে, চুপিচুপি। তুমি এই কাগজটা দ্যাখো।

অক্ষয় কাকাবাবু সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

এই যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, এটা মনে হচ্ছে, আমাদের সন্দেহ বলতে পাব।

কি সন্দেহ ! এব সঙ্গে আপনাদেব কি সম্পর্ক !

আছে, আছে। আমাদেব বিনয়দাব বড় মেয়ে, কনক দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিল। সে আব ফিরে আসেনি। তার কোনও ট্রেস নেই। আজ এই ছবিটা বেরিয়েছে।

মিলছে ?

ছবিটা তো তেমন স্পষ্ট নয়। কালি ধ্যাবড়ান। তবু মনে হচ্ছে কেমন যেন মিল আছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, পুলিসে আমার এক মাসতুতো ভাই বড় অফিসাব, ভাবছিলুম আজই একবার তাকে গিয়ে ধরি। সামনাসামনি দেখলে সন্দেহটা আর থাকবে না।

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, এই অসময়ে কি আর দেখাতে চাইবে। ওদের অনেক বায়নাক্কা। ঘুষঘাযেব ব্যাপার আছে। সব ব্যবস্থা সারতেই তো বাত কাবার হয়ে যাবে। আজকে দেখতে হলে আমাদের অন্য রাস্তায় যেতে হবে।

কি রকম ?

চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল ডানহাত আমার খাতিবেব লোক। হাতটাত দেখি। মাঝে মধ্যে ওষুধ বিষুধও দি। কলকাতা তার নামে কাঁপে। তাকে একবাব ধরতে পাবলে এখুনি কাজ হয়ে যাবে।

কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে ?

সে ঘাঁটি আছে।

তাহলে চলো, এখুনি একবার বেরিয়ে পড়া যাক।

আপনাকে যেতে হবে না। আপনাব ছেলেকে নিয়ে যাই। দেখলেই চিনতে পাববে।

অক্ষয়কাকাবাবু আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, কি তোমাব ভয় কববে ?

না, ভয় কববে কেন ?

সত্যিই তো, ভয়েব কি আছে। দিনুর ডেডবডি দেখেছি। ববফের স্ল্যাবে শোযান। মাথাটা চুবমার।

তা হলে তুমি আমাব সঙ্গে চলো।

পঙ্কজবাবু বললেন, অক্ষয়, এক কাজ কবা যাক। প্রথমে আমাব বাড়িতে চলো। হুডখোলা আমাব সেই ছ্যাকড়া গাড়িটা বেব কবি। যেমনই হোক চাবটে চাকা তো আছে। ঘোবাঘুবিব সুবিধে হবে।

হ্যাঁ গাড়ি থাকলে ত খুব সুবিধেই হবে। চলুন তা হলে।

জাস্ট এ মিনিট। একটু তৈরি হয়ে নি।

পিতা বললেন, তোমবা যাবে, আব আমি আবাম করে বাড়ি বসে থাকব।

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, আমবা তো বয়েছি। এ বড ঝামেলাব কাজ। আপনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। বাড়ি সামলান, আমবা ঘুরে আসি।

মাতামহ বললেন, আমি তা হলে থেকেই যাই। কি হল জানতে না পাবলে, সাবা বাত বড উদ্বেগে কাটবে।

মিনিট পনেবর মধ্যে আমবা সদলে বাস্তায নেমে এলুম।

পঙ্কজবাবু বললেন, একটা ট্যাকসি ধরতে হবে। বাস ঠেঙাতে আর ভাল লাগছে না।

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, ওই মোড়ে গেলেই পেট্রলপাম্পেব কাছে অনেক গাড়ি পাওয়া যাবে।

একটু দূরত্ব বেখে পেছন পেছন হাঁটছি। পঙ্কজবাবুবা মনে হয ভীষণ বড়লোক। নিজেদেব গাড়ি। আত্মীয স্বজনরা বড় বড চাকবে। চেহাবায় সাংঘাতিক চেকনাই। অপর্ণা পঙ্কজবাবুব পাশাপাশি হাঁটছে। যুবকরা যুবতী দেখলেই তাকাবে। চায়ের দোকানের সামনে থেকে হারু এগিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস কবল, কে রে পিণ্টু ?

আমাদের আত্মীয়।

আগে তো কোনও দিন দেখিনি।

বিদেশে ছিলেন।

প্রশ্নের জবাব পেয়েও হারু আমার পাশে পাশে বোকার মত হাঁটতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, যাবি কোথায় ?

তুই কোথায় চল্লি ?

আমি কলকাতায় যাব।

চল তোকে স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দি। একলা একলা যাবি !

একলা কি রে ? আমার সঙ্গে এতজন রয়েছেন।

কতদিন তোর সঙ্গে দেখাটেখা হয় না। চাকরিবাকরি করছিস ! আড্ডামারার আর সময়ই নেই।

মেসোমশাই কেমন আছেন ?

ভাল আছেন।

তুই কোথায় বেরোচ্ছিস ?

একটা মার্চেন্ট অফিসে।

মেসোমশাইয়ের অফিসে ঢুকতে পারলি না ! সরকারী অফিসে একবার ঢুকতে পারলে, জীবনে আর কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না। বিয়ে-থা করে একেবারে জাঁকিয়ে বোসো।

হারু কথা বলছে আমার সঙ্গে, তাকিয়ে আছে অপর্ণার দিকে। আচ্ছা বিপদ তো ! হে ঈশ্বর, পাঁঠাটার হাত থেকে মুক্তি দাও। ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রার্থনার উত্তর দিলেন। হারু মোক্ষম একটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। সামলে নিল। চলতে গিয়ে বললে, যাঃ শালা, চটি ছিঁড়ে গেল।

তুই পারবি ত একা যেতে ?

মনে হয় পারব।

হারু চটি টানতে টানতে ফিরে চলল। ট্যাকসি তৈরিই ছিল। অক্ষয় কাকাবাবু ড্রাইভারের পাশে বসলেন। আমরা তিনজন পেছনে। আমি আর অপর্ণা দু'ধারে, মাঝখানে পঙ্কজবাবু। সারাদিন আমার সঙ্গে তেমন কথা হয় নি। এইবার আমাকে পাশে পেয়েছেন।

চাকরি কেমন লাগছে ?

বেশ ভালই।

আমার একটা কথা শুনে ভীষণ ভাল লাগল। ভেরি ভেরি প্রেজওয়ার্দি। তুমি নাকি বলেছিলে, বাবার অফিসে ঢুকবে না, নিজের জোরে চাকরি যোগাড় করবে, এবং করেছ ! ব্র্যাভো মাই সান। শেষ পর্যন্ত তোমার এই স্পিরিট যেন থাকে। বাঙালী প্রতিষ্ঠান হলেও, ভেরি গুড কনসার্ন। চুপ করে আছ কেন ? কথা বলো। তুমি ভীষণ শাই।

আজ্ঞে না, কি আর কথা বলব। আপনিই তো সব বলছেন।

তুমি কিছু বলছ না বলেই, আমাকে বকবক করতে হচ্ছে। তোমার বাবা বলছিলেন, তোমার নাকি উড়ু উড়ু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব।

অক্ষয়বাবু সামনের আসন থেকে বললেন, ওর হাত আমি দেখেছি পঙ্কজদা, সন্ন্যাস যোগ আছে। সংসার ছাড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অপর্ণা বললে, সন্ন্যাসী হতে হলে কি করতে হয় বাবা ?

উত্তর দিলেন অক্ষয়কাকাবাবু, সব ছেড়ে চলে যেতে হয় মা।

কোথায় ?

কোনও আশ্রমে, পাহাড়ের গুহায়।

পঙ্কজবাবু বললেন, গৃহী সন্ন্যাসীও হওয়া যায়। আমাদের গুরুদেব গৃহী সন্ন্যাসী।

হ্যাঁ, তাঁরা হলেন অবধূত।

অপর্ণা বললে, গৃহী সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল।

অক্ষয়কাকাবাবু শব্দ করে হাসলেন।

সেনট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা গিয়ে, গাড়ি বাঁয়ে বাঁক নিয়ে যে রাস্তায় ঢুকলো, সেটা হল বিডন স্ট্রিট। সাবেক আমলের বড় বড় থাম-অলা বিশাল বাড়ি। গেট আছে। গেটের বাইরে একটি প্রস্তর ফলক। সেই ফলকে ডকটর বি· ডি পর্যন্ত পড়া যায়, বাকি সব ধুয়ে মুছে গেছে।

বিশাল বাড়ি মানেই ভাঙা বাড়ি হওয়া উচিত। এ বাড়ি কিন্তু সেরকম নয়। বেশ ভালই আছে। দেখলে মনে হয় লক্ষ্মীছাড়া হয় নি। বাগান, গাড়িবারান্দা, বাগান ঘর, সাবুগাছ, ঝিলমিল লাগান গভীর বারান্দা, ঝাড় লণ্ঠন ! অতীত এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে, হিসেবী বৃদ্ধের মত।

গেটে চাকালাগান আছে। ঠেলতেই ঘড় ঘড় করে খুলে গেল। গম্ভীর গলায় কুকুরের ডাক। পুরুষ কণ্ঠের ধমক, অ্যাস্টার, অ্যাস্টার। মেয়েদের দমকা হাসি। রেডিও থেকে উপচে পড়া বেহাগে খেয়াল। সাবুগাছের পাতায় রাতের বাতাসের পাখা-নাড়া-শব্দ। সব যেন কেমন স্বপ্নের মত ! এই বুঝি নিয়ম।

এই বুঝি তাঁর খেলা। কোথাও স্বপ্ন, কোথাও বাস্তব।

বসার ঘরে, গোল একটা শ্বেতপাথরের টেবিল। কোণে কোণে ছোট ছোট টেবিল। কোনওটায় পাথরের মূর্তি, কোনওটায় পোর্সিলেন ভাস। এলাহি ব্যাপার। দেয়ালে বিশাল বিশাল ছবি। মনটা কেমন যেন করে ওঠে। ফিনফিনে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক জুতো মসমসিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, দাদা এলে ? তোমার দেরি দেখে বউদি ছটফট করছে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। বাতাসে একটা সুবাস ঘুরপাক খেতে লাগল।

ঘরে এইবার যে মহিলা এসে ঢুকলেন, তাঁর কাছে ঘরের বাতিও ম্লান হয়ে গেল। জীবনে অতবড় খোঁপা আমি দেখিনি। মহিলা ভীষণ আবেগে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের দেখে রাশ টানলেন। মাথায় এক চিলতে ঘোমটা টেনে দিয়ে বললেন, এত দেরি হল ?

পঙ্কজবাবু বললেন, কি এমন দেরি গো, এই তো সবে সন্ধে হল। ছোটবাবু ইভনিং ওয়াকে গেলেন। ছোটবাবুকে দেখে ঘড়ি মেলাতে যেও না।

অক্ষয়কাকাবাবু আগেও মনে হয় এ বাড়িতে এসেছেন। মহিলা বললেন, কি অক্ষয় ঠাকুরপো, পথ ভুলে।

অক্ষয়বাবু উত্তরে শুধু হাসলেন। হেসে বিশাল একটা সোফায় শরীরের ভার ফেলে দিলেন। স্প্রিং তাঁকে দোলাতে লাগল। যেন ঢেউয়ে ভাসছেন।

আমি পড়েছি মহা বিপদে। এত বড় ঘর, সুন্দর সুন্দর চেহারা। নিজেকে মনে হচ্ছে লেড়ি কুকুর। হঠাৎ তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়েছি।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই সেই বালক, মায়ের মৃত্যুর পর যাকে তুমি দত্তক নিতে চেয়েছিলে।

আঁ, এই সেই পিণ্টু! ও মা কত বড় হয়ে গেছিস রে তুই।

মহিলা আবেগে উচ্ছ্বাসে, আমাকে বুকে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের ওপর। যে চোখটা খোলা, সেই চোখের সামনে হারের লকেটে লাগান লাল একটা পাথর, আলো পড়ে ধকধক করছে।

মহিলার একটা হাত আমার মাথার চুলে খেলা করছে।

তুই আমার কাছে থাকলে এতদিনে আরো সুন্দর করে দিতুম।

পঙ্কজবাবু বললেন, সুধা ওকে ছাড। এখন আমাদের অনেক কাজ। তুমি চট করে গাড়ির চাবিটা এনে দাও।

এখন আবার বেরোবে ?

হ্যাঁ, আমাদের ভীষণ একটা কাজ পড়েছে। ফিরতে রাত হলে ভেবো না।

পিণ্টুও যাবে ?

হ্যাঁ, ওকে তো যেতেই হবে।

ও মা। ছেলেটাকে একটুও বসতে দেবে না!

ফিরে এসে বসবে। আগে কাজ।

টুক করে একটা প্রণাম সেরে নিলুম ফাঁক পেয়ে। ভাবাই যায় না, ইনি আমাকে মায়ের স্নেহে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মরুভূমি আর নদী একই পৃথিবীর দুটি দিক।

অপর্ণা কেমন টুক করে ভেতরে চলে গেছে। কি জানি কেমন মেয়ে। চালিয়াত বলে তো মনে হল না। তবে এঁরা বেশ বড়লোক। বড়লোকি চাল থাকলে কিছু বলার নেই।

পঙ্কজবাবুর গাড়িটা বেশ মজার। মাথাটা খোলা যায় আবার বন্ধ করা যায়। কি যেন একটা নাম বললেন, সান রিম। মাথার ওপর শহর ছুটে চলেছে হু হু করে। বাড়ি, ছাদ, বারান্দা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। আকাশও ছুটছে। পঙ্কজবাবুই গাড়ি চালাচ্ছেন। অক্ষয়বাবু পাশে বসে আছেন দৈত্যের মত। আমি এক লিলিপুট পেছনের আসনে।

পঙ্কজবাবুর কবজিতে সোনার চেনে বাঁধা সোনার হাতঘড়ি চিক চিক করছে।

আমরা প্রথমে তা হলে কোথায় যাবো ! লালবাজারে ?

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, অসময়ে লালবাজারে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

তা হলে ভবানীপুরে আমার সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাবো ?

আগে মলঙ্গা লেনে আমার সেই বন্ধুর ডেরায় যাওয়াই ভাল। এখন তাকে পাবই।

সরু গলি। গাড়ি ঢুকবে না। একটা তিনকোণা পার্কের পাশে গাড়ি রেখে, আমাদের পদ-যাত্রা শুরু হল। ভাঙা ভাঙা একটা বাড়ির দোতলা থেকে আর্ত চিৎকার উঠল, খুন খুন।

পঙ্কজবাবু আর আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। এরকম অন্ধকার অন্ধকার গলিতে যে কোনও সময়েই খুন হতে পারে। বক্তনদীর ধারাব খোকাগুণ্ডার গলি।

অক্ষয়বাবু হেসে বললেন, ভয় নেই, চলে আসুন। নাটকের মহলা হচ্ছে।

গলির মধ্যে সবচেয়ে যেটা চটকদার বাড়ি, সেই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অক্ষয়বাবু ডাকতে লাগলেন, সরোজ, সরোজ। দু ডাকে সাড়া না পেয়ে নাম বদলে ডাকতে লাগলেন, পটোল, পটোল।

মানুষের কি দুর্গতি ! যার ভাল নাম সরোজ, তার ডাক নাম পটোল।

দোতলার জানালায় একটা বিরাট মুখ ঘরের আলোয় কালো হয়ে দেখা দিল। হেঁড়ে গলায় উত্তর এল, কে ?

আমি অক্ষয়।

কে অক্ষয় ?

আরে আবলুস।

ও হোঃ অক্ষয়দা। দরজা ঠেলে ওপরে চলে আসুন।

ভেতরে মার্বেল পাথর বাঁধন একটা উঠোন। সামনেই ঠাকুরদালান। দালানে মা কালীর বিশাল মূর্তি। একটু আগেই পুজো হয়েছে। ধুনোর ধোঁয়ায় আলো এখনও ঝাপসা। সেই ঝাপসা পর্দায় মা কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

বাঁ পাশ দিয়ে বেশ একটা চওড়া সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। পালিশ করা কাঠের হাতল ঝকঝক করছে। সিঁড়ির ওপরের মাথায় অসম্ভব সাজগোজ করা এক মহিলা হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে বললেন, আসুন দাদা, আসুন।

মহিলার একটু স-এর দোষ আছে। বাঙালী বলে মনে হল না। ইরানী হতে পারেন, ভূপালী হতে পারেন।

লম্বা ঝকঝকে একটা দালান সোজা উত্তরে চলে গেছে। ডানপাশে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে স্টাফ করা বাঘ। জীবন্ত। মাঝরাতে ঘুম চোখে দেখলে, বাপ্ বলে দৌড় মারতে হবে। চোরেদের কি খোয়ার।

একপাশে জুতো খুলে, পালিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে প্রায় হড়কাতে হড়কাতে, আমরা যে ঘরে এলুম সেটাকে হলঘর বলা চলে। বিশেষ কোনও ফার্নিচার নেই। মাঝখানে একটা লাল কার্পেট। সেই কার্পেটে লাল লুঙ্গি, আর সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে সরোজবাবু বসে আছেন। দেয়ালে খাপ সমেত একটা রিভলভার ঝুলছে। আর এক দিকে ঝুলছে একটা রাইফেল।

আসুন দাদা, আসুন দাদা বলে আমাদের অভ্যর্থনা হল।

অক্ষয়বাবু বললেন, নাও আসন ছেড়ে উঠে পড়ো। পরোপকার করতে হবে। এঁরা আমার আত্মীয়ের মত। বড় বিপদে পড়েছেন।

কি হয়েছে ? কারুর অসুখ ? ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না ! না, পকেট মারা গেছে ?

ও সব তো তোমার কাছে সামান্য জিনিস।

আমরা তিনজনেই বসে পড়েছি।

একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা কি দাদা ! কলকাতায় কত মেয়ে যে বেপাত্তা, আপনাদের কোনও ধারণাই নেই। মিসিং

পার্সনস ডিপার্টমেন্টে মেয়ের বাপেদের দুবেলা হাহাকার। সব দেখবেন, বোম্বাই গিয়ে বসে আছে। সব ফিল্মস্টার হবে। আপনার মেয়ে?

প্রশ্নটা পঙ্কজবাবুকে। অক্ষয়বাবু বললেন, না, না, ওনার মেয়ে নয়। আমাব এক পরিচিত ভদ্রলোকের মেয়ে। আজকের কাগজে একটা আন-আইডেনটিফায়েড ডেড বডির ছবি বেরিয়েছে। ভালো বোঝা যাচ্ছে না। সেইটাই আমরা একবার দেখতে চাই।

সারা সকাল কি করছিলেন অক্ষয়দা? এই শেষরা'তে এসব ঝামেলা?

একটু উপকার করো ভাই। তোমার তো সবে সন্ধে। তুমি একবার গিয়ে দাঁড়ালে, কারুর বাপেব ক্ষমতা নেই না বলে।

বসুন তা হলে, তৈরি হয়ে আসি। কিছু খাবেন?

না, না, আমরা খেয়েই এসেছি।

কাগজটা সঙ্গে এনেছেন?

উত্তর আমিই দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ এনেছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সরোজবাবু বললেন, দেশে প্রেমেব বন্যা বইছে রে বাবা।

ভেতর থেকে অর্গানের সুর ভেসে এলো। রবীন্দ্রসংগীত বাজছে। পঙ্কজবাবু বললেন, কে বাজাচ্ছে অক্ষয়? বড় মার্ভেলাস হাত।

সরোজের স্ত্রী। মারাঠী মেয়ে। ভীষণ ভালো নাচে। লোকে টিকিট কেটে দেখতে যায়।

মারাঠী মেয়ে বাঙালীকে বিয়ে কবেছে? স্ট্রেঞ্জ!

স্বাধীনতাব পব, সবেতেই স্বাধীনতা এসেছে পঙ্কজদা।

দু'জনের বয়েসের অনেক ডিফারেন্স!

ও সব কিছু না। মনের মিল হলে বয়েস-ফয়েস কিছু না।

সরোজবাবু বেশ পালটে ঘরে এলেন। ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ান চুল। সাদা প্যাণ্ট, সাদা জামা। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। ক্রিকেট ক্যাপটেনেব মত দেখাচ্ছে। দেয়াল থেকে রিভলভারটা নিয়ে কোমবেব বেল্টে গুঁজছেন, অক্ষয়বাবু বললেন, তুমি কি যুদ্ধে যাচ্ছ? রিভলভাব কি হবে?

সবোজবাবু হাসলেন, অক্ষয়দা, কয়েক হাজার শত্রু এই শহরে ঘুরছে। মবাব আগে একটু বাঁচাব চেষ্টা করতে হবে।

অর্গানে বাজতে লাগল, খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।

লাখোঁ সুন্দার সপ্‌নোভিতে লাখোঁ সাঁঝ সবেরা

সরোজবাবু কাগজেব বিজ্ঞপ্তিটা দেখে বললেন, ইউনিভার্সিটির পেছনেব সেই মর্গেই আমাদের যেতে হবে। দেখি যদি সাধুকে পেয়ে যাই, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পঙ্কজবাবুব গাড়ি এখন বেশ ভাবি হয়েছে। তাই যেন গুডগুড করে চলেছে। দূব থেকে দেখলে মনে হয় দারুণ দেখাবে। জনতার মাথার ওপব দিয়ে হুড় হুড করে উড়ে চলেছে কিংকংয়েব মত এক দৈত্য। সঙ্গে তার ছানাপোনা। গাড়ি কলুটোলায এসে ডান দিকে বাঁক নিল। বাঁ পাশে বাস্তা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়াল। সরোজবাবু নামতেই গাড়ি আধ হাতটাক ওপরে উঠে গেল।

ফুটপাথের ধারে ভল ভল করে গঙ্গাব জল বেরোচ্ছে ফোয়ারাব মত। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। মনেই হয় না, এর উলটো দিকেব বিমর্ষ চেহারার, লম্বাটে ঘরে সারি সারি শুয়ে আছে প্রাণহীন দেহ। সবোজবাবু সাধুর খোঁজে গেছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, অনেক পাপ করলে, মানুষকে মর্গে আসতে হয় মৃতদেহের খোঁজে।

পঙ্কজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, দুর্গন্ধ আছে?

একটু পরেই দেখতে পারেন। নাকে বেশ করে রুমাল জড়িয়ে নেবেন। এখানে যে আমার কত অভিজ্ঞতা আছে, শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে।

কি রকম?

একদিন একটি মেয়ের হাত দেখব বলে হাতটা টেনেছি। আত্মহত্যার কেস। পোকামারার ওষুধ খেয়ে স্যুসাইড করেছে। তখনও কাটাই ছেঁড়াই হয় নি। হাতটা আমার হাতের তালুতে ফেলে, খাতায় সবে আঁকতে আরম্ভ করেছি। আঙুলগুলো অল্প অল্প নড়ে উঠল। মরার পর মানুষের শরীরে টান ধরে, আমি ভাবলুম সেই রকম কিছু। চাঁপার কলির মত আঙুল। একেবারে দুর্গা প্রতিমার মত চেহারা। হাতে আত্মহত্যার যোগ যেমন স্পষ্ট, তেমনি আবার দীর্ঘ জীবন, প্রচুর ঐশ্বর্যের যোগ আছে।

পঙ্কজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তা কি করে হয় অক্ষয়?

কেন হবে না? খুব হয়। একটা ট্রেন ধরুন, বেনারসের কাছে অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে গেল, তারপর সোজা চলে গেল হরিদ্বার। জীবনও সেই রকম, একটা ধাক্কা কাটাতে পারলেই, বয়ে গেল সত্তর কি আশি বছর। এ তো আপনার আর আমার জীবনের দেখা ঘটনা। মনে আছে! আমাদের সেই প্রিভেনটিভ অফিসার ঘোষের কথা। মোটোর সাইকেলে রেড রোডে অ্যাকসিডেন্ট করল। শরীর চুরমার। গেল গেল অবস্থা। সেই ঘোষ এখন ডেপুটি কালেকটার।

উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে সরোজবাবু ডাকলেন, চলে আসুন।

অক্ষয়কাকাবাবুর গল্পের শেষটা আর শোনা হল না। উলটো দিকের ফুটপাথে সরোজবাবুর পাশে, সরোজবাবুর হাফ সাইজের একটি মানুষ খাঁকি জামা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে বিড়ি।

সরোজবাবু বললেন, আয় সাধু?

সাধু যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে আছে। ফুক ফুক বিড়ি টানছে, আর ফুস্ ফুস্ ধোঁয়া ছাড়ছে। কোনও হুঁস আছে বলে মনে হচ্ছে না। এ আবার মানুষের কি ব্যামো!

আয় সাধু, বলে সরোজবাবু ঘাড় ধরে এক ঝাঁকুনি মারলেন।

সাধু বললে, বলুন। শুনতে পাচ্ছি।

ক' ছিলিম টেনেছিস?

কার বাপের কি?

সরোজবাবু সঙ্গে সঙ্গে সপাটে এক চড় কষালেন।

পঙ্কজবাবু আর অক্ষয়বাবু দু'জনেই হাহা করে উঠলেন, আহা, করো কি? করো কি?

সরোজবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, তোমার নেশা আমি ঘুচিয়ে দোব। কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?

সাধু সঙ্গে সঙ্গে হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠল, মারুন, মারুন। গরিব লোক তো বড়লোকের তবলা। ওইটাই সাধার জায়গা। এক চড় কেন? তিন চড় মারুন। এই তো গাল পেতে দিচ্ছি। মহাত্মাজীর চেলা।

সাধুবাবু যা করছেন সবই ঘুমের ঘোরে। অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, সরোজ,একে দিয়ে হবে না মনে হচ্ছে।

খুব হবে, দু-চার ঘা পড়লেই হবে।

না, না, মারধোরে দরকার নেই।

সাধুবাবু অমনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না না মারধোরে হবে না। প্রেম বিলাও, দিল দিলাও।

সরোজবাবু এবার সাধুর দু কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলেন। রোগা মানুষটার হাড় ক'খানা খুলে না পড়ে যায়। চুকচুকে মাথা কামান, ঘাড়ে গর্দানে একটি লোক এগিয়ে এসে বললেন, আরে এ সাধু, দেখা হামারা হাতমে কেয়া হ্যায়।

লোকটির হাতে একটা ইনজেকসানের সিরিঞ্জ। সাধুর চোখদুটো চকচক করে উঠল। চোখ বড় বড় করে সরোজবাবুকে বললেন, বলুন স্যার, কি করতে হবে?

এতক্ষণ আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছিল, রাসকেল? চল ঘর খুলবি চল।

মর্গের সামনে গোটা দুই ছোট লরি দাঁড়িয়ে। এক দল লোক। সবাই ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। সাধুব একজন ওপরওয়ালা সাধুকে দেখেই ফায়ার হয়ে গেলেন, ব্যাটা তোব চাকবি এবার আমি খাবো।

সাধু অম্লানবদনে বললে, সেই ঢোকার প্রথম দিন থেকেই শুনে আসছি। ছাড়ালে, নতুন লোক আর পাবে না। এ হল ভূতেব চাকরি।

যাঁবা ভিড় করে আছেন তাঁবা লাশ নিতে এসেছেন। একজন পুলিশের লোক দাঁড়িযে আছেন। ঠাণ্ডা ঘর থেকে হুকুম মিলিয়ে দেহ বের কবে দেবেন। লবির ওপর থেকে দুটো খাটিয়া, ফুল, ফুলের মালা নেমে এল। গোছা গোছা ধূপে আগুন পড়ল। দড়ি নামল। প্রিয়জনকে বাঁধা হবে।

খাঁকি জামা পরা আবো দুচারজন কর্মচাবী এপাশ ওপাশ থেকে এসে গেলেন। অন্ধকাবে ফিসফাস কথাবার্তা, টাকার লেনদেন চলতে লাগল। পুলিসের সেই লোকটি এক ফাঁকে এসে সবোজবাবুকে বলে গেল, কিছু মনে কববেন না স্যার! যেখানকার যা নিয়ম!

সরোজবাবু যেন দেখেও দেখছেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, তাডাতাড়ি ঝামেলা হাটান, আমি এসেছি একজনকে আইডেন্‌টিফাই কবতে।

এই তো স্যার, এক্ষুনি হযে যাবে।

এক ধরনের ধাতব শব্দ হতে লাগল। লোহার ট্রে নামছে বাক্স থেকে। মৃত্যু চলেছে ঝনঝনিযে, মল বাজিয়ে। আমি আব পঙ্কজবাবু তাকিযে আছি উলটো দিকে। এ দৃশ্য যত কম দেখা যায় ততই ভাল। জীবনের আতঙ্ক!

একবার আডচোখে তাকিয়েই ভয়ে, আতঙ্কে চমকে উঠলুম। একটি মহিলাব মৃতদেহ ট্রেতে সাজিযে নিয়ে চলেছেন। বেশ সম্পন্ন চেহারাব কয়েকজন ভদ্রলোক বয়েছেন সঙ্গে। মহিলা পুড়ে একেবারে কাঠকয়লার মত হয়ে গেছেন। কয়লার হাত, কয়লার পা, কযলা'ব মুখ। মাথার চুল পুড়ে গিয়ে, গুডিগুড়ি হয়ে আটকে আছে।

আতঙ্কে পঙ্কজবাবুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম। তিনি বললেন, ওদিকে তাকিও না। অক্ষযকাকাবাবুব কোনও কিছুতেই দৃকপাত নেই। সবোজবাবুরও তাই। দুজনেই গল্পে মশগুল। ডোমজুড়ে বাগান বাড়ি বিক্রি হবে। সবোজবাবু দবদস্তুব কবছেন। দু'হাত দূবে মৃত্যু স্তূপাকার, এঁবা জীবনেব আযোজনে ব্যস্ত।

মৃতদেহ নাডাচাডা কবে সাধুবাবুব নেশা ছুটে গেছে। তিনি প্রসন্ন মহাদেবেব মত এসে বললেন, কই আসুন। আপনাদেব মাল দেখে যান।

চলুন, চলুন, বলে সবোজবাবু আমাদেব তাডিয়ে নিয়ে, মৃত্যুব মত শীতল সেই ঘরে ঢুকলেন। মৃত্যু যে এত দুর্গন্ধময কে জানত। কোথায় মানুষের গৌবব ' জীবনেব সুগন্ধ ছডায কই! মৃত্যু এসে দুর্গন্ধ মাখিয়ে দিযে যায। সাধুবাবু একটা ট্রে টানলেন। একজন কিশোর। ভুল নম্বর টেনেছেন। ছিলিম এখনও ছাড়েনি। দ্বিতীয় ট্রে। একজন বৃদ্ধ। দাঁত খিঁচিয়ে আছেন। সাধু বললেন, অ্যাঃ, শালা সেই বুড়ো। কেউ নিতেই আসে না। থাক শালা, এখানে আজন্ম শুযে।

সরোজবাবু ধমক লাগালেন, আবার মার খাবি সাধু, মুখ সামলে।

মুখ আর কি সামলাব হুজুর, এখানে কিছু মাল আছে, যারা চিরকাল থাকবে, কোনদিনও নড়বে না। এই বুড়োকে গলা টিপে মেরেছে। মেরেছে মেরেছে·

সাধু এটা গল্প কবাব জাযগা নয। মাল টানো।

টানি হুজুর, আমি আদার বেপারি।

তৃতীয় ট্রেটা টেনেই সাধু বললে, অ্যায় যাঃ আবার ভুল হযে গেল।

ট্রেটা ভেতরে ঠেলতে যাচ্ছে, আমি চিৎকার করে উঠলুম। না করে পারলুম না, এ যে প্রফুল্লকাকা! সাধু বললেন, কি হল? আপনারা তো বললেন, মেয়েছেলে, পুরুষ দেখে চিল্লে উঠলেন। আরে এ যে আমাদের প্রফুল্লকাকা!

কে তোমার প্রফুল্লকাকা? তিনজনেবই এক প্রশ্ন।

ওই যে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, কাকীমাব স্বামী।

অ্যাঁ, সে কি ? পঙ্কজবাবু চিনেছেন, ওই যে মহিলা, যিনি আজ রাঁধলেন, পরিবেশন করে খাওয়ালেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার বুকের ভেতর কাঁপতে শুরু করেছে। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। আমি ঠিক দেখলুম তো ?

সরোজবাবু বললেন, তুমি ভাল করে একবার দ্যাখো। সাধু বের কর।

ট্রে টানার শব্দ হল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। সেই পরিচিত মুখ। ছুঁচলো গোঁফ। আমাদের প্রফুল্লকাকা। আর দাঁড়াতে পারছি না। সারা শরীর কাঁপছে। এ কি হল ! বেশ বুঝতে পারলুম, আমি ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছি।

সময়ই জানে সময়ের উজানে আমাকে কোথায় এনে ফেলেছে। তিনটি উদ্বিগ্ন মুখ তিন দিক থেকে ঝুঁকে আছে। মাথার ওপর বাড়ি ঘেরা কলকাতার আকাশ। পঙ্কজবাবুর হুডখোলা গাড়ির পেছনের আসনে পা দুমড়ে চিৎ হয়ে আছি। মাথাটা ভিজে ভিজে। সরোজবাবুর হাতে একটা তালপাতার পাখা। অল্প দূরেই একজন দেহাতী মহিলা। ফুটপাথের বাসিন্দা, আমাকে সুস্থ করার জন্যে পাখা এগিয়ে দিয়েছেন।

তিনজনেরই এক প্রশ্ন, কেমন বুঝছ বাবা !

দুঃস্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলুম, যা দেখলুম, তা কি সত্যি ?

পঙ্কজবাবু বললেন, সে তো তুমিই জানো বাবা।

সরোজবাবু বললেন, একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনো।

অন্ধকারে সাধুবাবুর গলা, মেয়েটাকে একবার দেখবেন না ?

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখতে তো হবেই, সেই জন্যেই তো আসা।

সরোজবাবু সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ওই লোকটিকে কোথায় পেলে ?

কে জানে ? কোথায় যেন মরে পড়েছিল। ওসব আমি জানি না। খাতায় আছে।

সরোজবাবু আমার কপালে একটা হাত রেখে বললেন, কি বুঝছো ? একটু শক্ত হও। বেঁচে থাকলে কত মৃত্যু দেখবে ? অত সহজে টাল খেলে চলে ?

দেহাতী মহিলা বললেন, পানি ?

তুমি জল খাবে ?

আজ্ঞে না। চলুন আমি ঠিক হয়ে গেছি।

ধীরে ধীরে আবার আমরা সেই লাশঘরে এলুম। সাধুবাবু এক টানে সেই ট্রেটা বের করে ফেললেন। যা দেখার জন্যে আমাদের ছুটে আসা। অক্ষয় কাকাবাবু কাঁধে হাত রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, পাছে পড়ে যাই বা মরে যাই। ধরে রাখলেই যদি ধরে রাখা যেত !

এতক্ষণ চোখ বুজিয়ে ছিলুম। শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ। চোখ খুললেই তো কনককে দেখতে পাব। প্রথমে পিটপিট করে তাকালুম। না দেখলেই যেন, ঘটনা অঘটনা হয়ে যাবে, সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে। সরোজবাবু বললেন, ভালো করে তাকাও।

ভাল করেই তাকালুম। আনন্দে বুক ছলাৎ করে উঠল। কনক নয়। অন্য কেউ। যৎসামান্য মিল। সে মিল মুখে। ইনি অনেকময়লা। বয়েসেও বেশি। মাথার চুল কনকের মত নয়। শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, একটু আগে শোকে, আতঙ্কে, জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম, এখন আনন্দে একেবারে ভোরের পাখি।

এ নয়, এ নয় বলে, প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলুম। পাখির মত ডানা ঝটপটিয়ে, গলা নামিয়ে নিলুম। মৃতের মাঙ্গলে উল্লাস অশোভন।

পঙ্কজবাবু বললেন, এ নয় ? আ গড সেভ দি কিং।

অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, এ নয়, আঃ, বাঁচালে।

সরোজবাবু বললেন, যার গেল, তার গেল। নাও সাধু তুলে রাখো।

এতক্ষণ যেন শাড়ির দোকানে কাপড় পছন্দ করা হচ্ছিল। পঙ্কজবাবু বললেন, কিন্তু !

আর কিছু বললেন না। আমাদের সকলের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল। ছায়া নামল মনে।

সরোজবাবু বললেন, তুমি আর একবার ভাল করে দ্যাখ তো। তোমার চিনতে ভুল হচ্ছে না তো !

আজ্ঞে না, ভুল হয়নি। খুব ভাল করেই দেখেছি।

কিন্তু কি করে তা হয়! ভদ্রলোক ছিলেন কোথায় ? আছেন কোথায় ? এখানে কি করে এলেন ?

সাধু বললেন, মরে গিয়ে এসেছেন স্যার ! এরা সবাই যমরাজের অতিথি।

সরোজবাবু থেমে থেমে, কেটে কেটে বললেন, তুউমি চুউপ কঅরো।

পকেট থেকে পাঁচটাকার একটা নোট বের করে সাধুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই আছিস কতক্ষণ ?

সারা রাত হুজুর।

আমরা হয় তো আবার আসবো, বুঝেছিস শয়তান। এসে যদি দেখি তুই সুঁই নিয়ে পড়ে আছিস, কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।

বেঁচে থাকলে তো বাঁচার কথা আসে হুজুর, আমরা তো মরেই আছি। মড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভূত হয়ে গেছি। মর্গের বাইরে এসে, চুপ করে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম মুক্ত আকাশের তলায়। সরোজবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এখন তা হলে কি করা যায় !

প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। কি করব আমি ! জীবনেও ভাবিনি, এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। একটা বাতি জ্বলছে, আমি গিয়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দোব ! এই তো সেদিন, দু'জনে হই হই করতে করতে এলেন। সংসার সাজিয়ে বসলেন। কত আশা, আকাঙ্ক্ষা। একটি সন্তানের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। দুপুরে হেসে খেলে রান্না। পাত পেড়ে খাওয়া। ছাদে লুডো খেলা। চোখের জল, হাসি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জীবন ধুয়ে সাদা ! সিঁদুর মুছে ফেল, শাঁখা ভেঙে ফেল। শাড়ি ছেড়ে, থান পরো।

না, এ আমি পারবো না।

সরোজবাবু উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কি পারবে না !

আমি গিয়ে বলতে পারব না, কাকাবাবু মারা গেছেন।

এ কি বোকার মত কথা, বলতে ত হবেই। ঘটনা ঘটিয়ে সময় চলে গেছে। সময়কে ত ফিরিয়ে আনা যাবে না ভাই। ঘড়ির কাঁটাকে ঘোরাবে কি করে ? তা হলে শোনো।

পঙ্কজবাবু বললেন, এখানে না দাঁড়িয়ে, কোথাও গেলে হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। চলুন তাহলে, গাড়িতে চলুন।

ওদের মনে কি হচ্ছে আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। নিজের মনের কথা বলতে পারি। অন্ধকার সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, পড়ছে, ভাঙছে, চুরছে। শ্যাম আকাশের তলায়, ফসফরাসের খলখল হাসি। ভয়ঙ্কর সুন্দর। ওই সাধু গাঁজা চড়িয়ে অসাড়, ঘটনার অ্যানেসথেসিয়ায় আমার চেতনা বিকল হয়ে আসছে।

পৃথিবীতে দুঃখ মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। জল যখন গড়ায় তখন একজনের চোখেই বয়। তা না হলে এই বিভ্রান্তির মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে কেন ? একটা কেলে, ভুঁসো কুকুর, পেছনের আসনের তলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। আরাম করার আর জায়গা জুটলো না। অক্ষয়কাকাবাবু যেই পা রেখেছেন কুকুরটা কেঁউ করে লাফিয়ে উঠে কাকাবাবুর কাছাকোঁচার সঙ্গে জড়িয়ে, ওই অল্প পরিসরে এমন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল ! সরোজবাবু আর পঙ্কজবাবু হেই হেই করছেন, আর বলছেন, খুব সামলে, খুব সামলে। কামড়ালেই জলাতঙ্ক। কে শুনবে ? কাকাবাবু সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে গেছেন। পা দুটো যথেষ্ট ফাঁক করতে পারলে কুকুরটা বেরিয়ে যেতে পারত।

যাই হোক সব কিছুরই একটা শেষ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়েছিল। রাস্তার কুচকটালে ট্র্যাফিক জ্যামও এক সময় খুলে যায়। শেষমেষ একটা রফা হল। কাকাবাবুর কোঁচা গলায় জড়িয়ে, খামচাখামচি করতে করতে কুকুর ফুটপাথে লাফিয়ে পড়ল। অর্ধেক বস্ত্র দান করে ভদ্রলোক রেহাই

গেলেন। কামড়ায়নি। কামড়াতে পারেনি ; কারণ নিজের মুখ নিজেই খুঁজে পায়নি। কাপড়ে জড়িয়েছিল। যা করে গেছে, সবই পায়ের কাজ ;

অক্ষয়কাকাবাবু রাস্তায় নেমে এলেন, কাছা গলায় দিয়ে কুকুর বসেছে গিয়ে যেখানে ভল ভল করে গঙ্গার জল বেরচ্ছে। কাপড়ের যতটুকু কুকুর দান করে গেছে, সেই অংশটুকু লুঙ্গির মত করে পরে নিলেন। সংসারে কিভাবে যে মানুষের কাছা খুলে যায় !

সরোজবাবু বললেন, হুড খোলা গাড়ি কলকাতায় চলে না। এ এক ভাগাড়ে শহর। অক্ষয়দা, কামড়ায়নি ত !

কামড়ায়নি, তবে আঁচড়েছে।

চলুন তা হলে, ডাক্তার ভববঞ্জনের কাছে যাই।

আরে দূর, এ অতি সামান্য ব্যাপার। এর চেয়ে কত বড় বড় চোট হয়ে গেছে তাই যাইনি।

গাড়ি চলতে শুরু করল। কুকুর, কুকুর গন্ধ বেরচ্ছে। সরোজবাবু আবার একটা সিগারেট ধরালেন। ভদ্রলোক মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এবার তা হলে কি হবে !

এবার ?

দু'জনে একই কথা বললেন, বলেই চুপ করে গেলেন। পৃথিবীতে এইরকম বহু এবার আছে, যে বারের পরে আর কিছু থাকে না। থাকে এক ধরনের ঘোলাটে শূন্যতা।

সরোজবাবু বললেন, কেসটা জানা দরকার। হঠাৎ একটা লোক মারা গেল, নিরীহ লোক !

পঙ্কজবাবু বললেন, এখন, এ সময় জানব বললেই কি আর জানা যাবে ?

যেতে পারে, যদি বিশুকে ধরা যায়।

এতক্ষণ আমরা কথায় কথায় কেউই লক্ষ্য করিনি। গোয়ালের গরুর মত গাড়ি ঘুরঘুর করে বিডন স্ট্রীটের দিকেই চলেছে। কোথাও তো একটা যেতে হবে ! যে যার ঘরের দিকেই চলে।

পঙ্কজবাবুর বাগানে ভুরভুর করে ফুলের গন্ধ ছাড়ছে। রাত রানীরা ফুটে বসে আছে। ঢোকার মুখের উঁচু রকে এক সার সুন্দরী বসে আছেন। একটা ফুটফুটে বাচ্চা, চোখে ঘুম নেই, সবে হাঁটতে শিখেছে। টলে টলে বেড়াচ্ছে। দুপা যায়, ধুপ করে বসে, আদো আদো গলায় বলে, এই দাঃ। আমাদের ঢুকতে দেখে, সকলেই একটু সংযত হলেন। অপর্ণা বাচ্চাটাকে কোলে টেনে নিতেই, মুক্তি পাবার জন্য ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে, চিল চিৎকার ছাড়তে লাগল।

অপর্ণার মা বললেন, ওরে ওকে ছেড়ে দেনা বাপু, কানের পোকা বের করে দিলে।

বাচ্চাটা ছাড়া পেয়েই অপর্ণাকে চড়, চাপড়, ঘুষি সব একসঙ্গে চালাতে লাগল। শেষে কচি কচি মুঠোয় চুল ধরে টান। সামনের দিকে মাথা নিচু করে, অপর্ণা বলছে, উ, উ, ছাড় ছাড় দস্যি ছেলে।

অপর্ণার মা উঠে এলেন। নতুন মানুষ দেখে অভ্যর্থনা জানালেন নতুনভাবে, আসুন, আসুন। পঙ্কজবাবুকে হাসি হাসি মুখে বললেন, কি, তোমাদের কাজ হল ? কি করে এলে, ডাকাতি !

আমাদের মনের অবস্থা জানবেন কি করে ! পঙ্কজবাবু যেন একটু বিরক্তই হলেন। সেইভাবেই বললেন, বড় বিপদ, বড় বিপদ।

কি বিপদ ? মহিলা যেন কেমন হয়ে গেলেন। বিপদের চেয়ে বিপদের ছায়া অনেক বেশী ভয়াবহ।

চলো, চলো, ভেতরে চলো, সব শুনতে পাবে।

শিশুটির দস্যিপনা থামাবার জন্য, এইবার কেউ একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, ওকে ঘুমপাড়া না বাপু। রাত তো অনেক হল।

সরোজবাবু বসতে বসতে বললেন, বাঃ বড় চমৎকার বসার ঘর।

পঙ্কজবাবু প্রশংসাটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিলেন, সব এরাই করে। আমাকে বিশেষ ভাবতে হয় না।

সৌভাগ্যবান আপনি। বউদি, জল খাবো, ভাল করে এক কাপ চা খাব, কিছু মনে করবেন না, আবদার করছি।

ওমা, সেকি। মনে করব কেন ? আমাদের বাড়ি অষ্টপ্রহরই চা হচ্ছে।

আমাদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, হ্যাঁগা, সত্যি করে বল তো, তোমরা কি শ্মশান থেকে এলে !

শ্মশান ? পঙ্কজবাবু ঢোক গিললেন, ঠিক শ্মশান নয়, বলতে পার মহাশ্মশান।

মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।

এই বাড়ির কোথাও একটা গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ি আছে। সময় চলে যাবার সময় বড় সুন্দর শব্দ করে যায়। রাত নটা বাজল। গ্রীষ্মকাল। শীতকাল হলে চারপাশ নিশুতি হয়ে যেত। সরোজবাবু বললেন, এ নিয়ে খুব একটা পরামর্শের দরকার আছে কি ! ভদ্রলোক আপনাদের কি রকম আত্মীয় !

আমি বললুম, আমার বাবার বন্ধু। খুব ভাল, মনে হয় নামকরা তবলচি। বাড়িব নিচেটা খালি পড়ে ছিল বলে, উনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে উঠে এসেছিলেন।

আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন ?

মনে হয় কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। একজন মামা বোধহয় আছেন।

বাস্, তা হলে তো কোনও সমস্যাই নেই। মামাকে খবর দিলেই হয়ে যাবে। তিনি এসে লাশ নিয়ে যান। আমি পুলিসকে বলে দিচ্ছি, যেন হ্যারাস না করে।

অক্ষযবাবু বললেন, খুব ভাল বলেছ। এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবা যায় না।

পঙ্কজবাবু বললেন, দি ওয়ে।

অপর্ণা এসে বাবাব কানে কানে কি যেন বলল। পঙ্কজবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয উঠে দাঁড়ালেন। অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, কোথায় চললেন ?

একবাব অন্দরমহল থেকে ঘুরে আসি, ডাক পড়েছে। তোমার জন্যে একটা ধুতি নিয়ে আসি।

না না, পঙ্কজদা ধুতির দরকার হবে না। এই বেশ আছি। আপনি তো আমাকে চেনেন। বউদি চা আনলে কুকুরের আঁচড় মাঁচড় একটু ওয়াশ করে দোব।

চা দিয়ে কেন ? আমি অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ড্রেস কবিযে দিচ্ছি। আমাব ছোট ভাই বাখাল এই সব ব্যাপারে ভীষণ একসপার্ট।

কথা বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো, ভেতর থেকে ঘুরে আসি। ভেতরে যেতে হবে শুনেই, নিজের আকার আকৃতি, সাজপোশাক সম্পর্কে মনে মনে ভীষণ সচেতন হয়ে পড়লুম। মনের অদৃশ্য আয়নায় বারে বাবে ভেসে উঠতে লাগল আমার অবিন্যস্ত চেহারা।

ঢাকা একটা বারান্দা এপাশ থেকে ওপাশ চলে গেছে। সুন্দর করে বাঁধান একটা উঠন। পাশে পাশে পাতাবাহার গাছের অপূর্ব শোভা। একপাশ দিয়ে একটা নারকেল গাছ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। পরিবেশটা এতই সুন্দর, দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। দূরে বাঁপাশ দিয়ে চওড়া একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে কোনও স্বপ্নলোকের দিকে। পঙ্কজবাবু আমাকে বলতে লাগলেন, এসো বাবা এসো। চলে এসো, লজ্জা কিসের। এ তো তোমারই বাড়ি। উঠনের শেষ প্রান্তে রান্নাঘর। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক, টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। দোতলার ছাদে কুকুর ডাকছে গম্ভীর গলায়।

পঙ্কজবাবু হাঁকলেন, কই গো, কোথায় গেলে তোমরা !

স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে, হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, পাশের একটা ঘর থেকে হাতের গুলি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে এলো। পঙ্কজবাবু বললেন, এই যে, জনি উইসমুলার, তোমার বডি বিলডিং ওয়ার্কশপ এত রাতেও খোলা?

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, জেঠু কাল আমরা রাঁচী যাচ্ছি।

হঠাৎ এই সময় রাঁচী?

কলেজ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সাত দিনের ক্যাম্প। তোমার জন্যে কিছু আনতে হবে?

রাঁচীর পেঁপে খুব ভাল। পারিস তো কিছু বীজ নিয়ে আসিস।

তোমার কিটব্যাগটা কিন্তু নিয়ে যাব। জ্যাঠাইমাকে বলেছি।

ওটাতে বোধ হয় একটা তাপ্পি লাগাতে হবে।

সে আমি ঠিকঠাক করে নোব।

দু'জনের কথার ফাঁকে ঘরটা দেখে নিলুম। মেঝেতে বারবেল, ডাম্বেল গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেয়ালে ব্যায়ামবীরদের বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি।

পঙ্কজবাবু বললেন, আমার বন্ধু অক্ষয়কে কুকুরে আঁচড়েছে, তুই একটু ড্রেস করে দিয়ে আসতে পারবি?

খুব পারব।

পঙ্কজবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো, সব ওপরে আছে মনে হচ্ছে।

দোতলাটা একতলার চেয়ে আরও সুন্দর। জাফরি বসান ঢাকা বারান্দা। ঝকঝকে মেঝেতে আলো ঠিকরচ্ছে। জায়গায় জায়গায় জোড়া জোড়া সোফা পাতা। যুঁই ঝাড় জানালার বাইরে ফুলে ফুলে সাদা, বাতাসে দুলছে। মোড়ায় সৌম্যচেহারার এক বৃদ্ধা বসে আছেন। যাঁর সব কিছুই শুভ্র। কেশ, অঙ্গবাস, দেহত্বক, এমন কি পায়ের চটি। পায়ের কাছে থেবড়ে বসে আছে, সাদা একটা বেড়াল। পশমের গোলার মত।

বৃদ্ধার হাতে একটি জপের মালা আপন মনে ঘুরছে। পঙ্কজবাবু বললেন, আমার মা। বয়েস অনেক। এমনি খুবই শক্ত সমর্থ। কেবল কানে একটু কম শোনেন।

পঙ্কজবাবু গলা দু'ধাপ তুলে বললেন, মা, এই আমার সেই বন্ধুপুত্র, পলাশ।

জপের মন্ত্রে ঠোঁট দুটি নড়ছে। মুখ ভেসে গেল উদ্ভাসিত হাসিতে। পবিত্র মুখে হাসি খেলে কোজাগরী রাতের চাঁদের আলোর মত চরাচর ব্যাপ্ত করে।

অদ্ভুত স্নেহজড়ান সুরে বললেন, আয়, আয়, কাছে আয়। তোকে একবার ভাল করে, প্রাণভরে দেখি।

কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই, দু হাতে মাথার চুল ধরে বেশ করে নেড়ে দিলেন; নাড়তে নাড়তে বললেন, চান করেছিস, ভাল করে মাথা মুছিস নি? সর্দি হবে যে রে ভাই! এত বড় বড় চুল করেছিস! ও খোকা, এর মাথাটা যে ভিজে সপসপ্ করছে। একটা কিছু দে আগে ভাল করে মুছুক।

পঙ্কজবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দিচ্ছি মা। কই গো কোথায় সব গেলে!

বারান্দা ধরে তিনি এগোতে লাগলেন। হঠাৎ বাড়িটা যেন জনশূন্য হয়ে গেছে। এই বারান্দা ওপাশে পাক মেরে কোথায় যে চলে গেছে। কোন্ স্বপ্নলোকে।

দূরে অপর্ণা আসছে। কি হল বাবা?

আরে তোরা কোথায় যে চলে যাস। এই আছিস এই নেই, যেন মরীচিকা!

অপর্ণা বললে, ওদিকে যে এক কাণ্ড হয়েছে। বাবলু নাকে ন্যাপথালিনের গুলি ঢুকিয়েছে, আর বেরচ্ছে না। মা, কাকীমারা সবাই সেই নিয়ে ব্যস্ত।

অ্যাঁ, সে কি রে?

দু'জনেই বারান্দার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সার, সার, সাদা সাদা আলোর ডোম বাতাসে দুলতে লাগল। যুঁই ফুলের ভিজে ভিজে গন্ধ।

বৃদ্ধা মোড়া থেকে মেঝেতে নেমে বসলেন. আয়, আমার পাশে বোস। সারাদিন ওরা কি যে এত হই হই করে! বড় সংসার তো? কত লোক দ্যাখ না? বাড়ি একেবারে গিজগিজ করছে।

ভেতরের হট্টগোলে ঢোকার চেয়ে এইখানে বসতে পেয়ে যেন প্রাণে বাঁচলুম। অনেক মহিলার মধ্যে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়।

বৃদ্ধা বললেন, কি করিস তুই?

এই তো সবে একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরিতে গেলি ভাই! ডাক্তার কি ইনজিনিয়ার হতে পারলি না।

আমার যে তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। বাবা বললেন. মানুষের খোলসে একটা গাধা পোরা।

বৃদ্ধা হাসলেন। বড় মাপা হাসি। অভিজাত মহিলারা এই ভাবেই হাসেন। অপর্ণা একটা পাটভাঙা তোয়ালে এনেছে।

ওমা. এ কি! আপনি মাটিতে বসে পড়েছেন?

নাক থেকে সেই জিনিসটা বেরিয়েছে।

চেষ্টা চলছে। কাকা বলছেন, ভয় পাবার কিছু নেই. ও ধীরে ধীরে উড়ে যাবে। নিন মাথাটা মুছে ফেলুন। ভেজালেন কি করে?

ভিজে গেল।

কি করে ভিজল?

উত্তরে, বোকার মত হাসলুম।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন. বুড়ী কি বলছে?

অপর্ণা চিৎকার করে বললে. মাথা কি করে ভিজল?

চান করলে মাথা ভিজবে না? চান করে এসেছে। মাথা মোছার সময় পায় নি।

অনেক দূরে সমবেত উল্লাস ধ্বনি উঠল। অপর্ণা বললে খুব বেরিয়ে গেছে মনে হয়। চলুন চলুন, এখানে দিদার কাছে বসে থাকলেই হবে।

মেঝে থেকে আমাকে ওঠাবার জন্যে অপর্ণা হাত ধরে টানতে লাগল। এই কাজটা মনে হয় সে ঠিক করছে না। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধা দেখছেন দেখুন. অন্য কেউ দেখলে ভাববেন, বাবা, এখনই এত!

বৃদ্ধা বললেন, যাও ভাই ঘুরে এসো। যাবার সময় একবার আমার কাছে হয়ে যেও। আমার ঠাকুরঘর দেখাব, একটু প্রসাদ খেয়ে যাবে।

অপর্ণার পেছন পেছন চলেছি। হাতে তোয়ালে। হঠাৎ মনে হল, ব্যাপারটা নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। কি করা উচিত. কি করা উচিত নয়। বারান্দার নির্জন অংশে এসে মৃদু গলায় ডাকলুম, অপর্ণা! বেশ লাগল ডাকতে।

অপর্ণা প্রশ্নের মুখ নিয়ে ঘুরে তাকাল, কি বলুন?

শোনো, একটা খুব বিপদ হয়েছে।

কি বিপদ? দেয়ালে পিঠ রেখে থেমে পড়ল। মুখে আলো পড়েছে। নাকছাবি, কানের দুল চিকচিক করছে। মনে হচ্ছে আমার ভীষণ কাছের মানুষ। আমার এই উতলা, উৎকণ্ঠিত মন সামনে মেলে ধরতে পারলে একটু শান্তি পাব।

আমরা এই মাত্র মর্গ থেকে আসছি।

মর্গ?

আর কিছু বলার সুযোগ হল না। পঙ্কজবাবু আর অপর্ণার মা মার্চ করে আসছেন।

অপর্ণার মা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, কি বিপদ বাবা! ছিছি, তোমাকে একলা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। চলো, চলো, ঘরে চলো।

পঙ্কজবাবু বললেন. আজ কিন্তু বেশিক্ষণ আটকান চলবে না। বেশ ঝামেলার একটা কাজ, এখনও

সারা হয় নি।

তোমাদের হঠাৎ এত কাজ কোথা থেকে এলো। কাজের যেন বন্যা বইছে! তুমি একবার দেখো, ওঁরা চা পেলেন কিনা?

সে কি, নিচে চা যায় নি!

পটাস পটাস চটির শব্দ তুলে তিনি চলে গেলেন। অপর্ণার মা বললেন, পিণ্টুকে ঘরে বসা। আমি আসছি এখুনি। তিনিও নিচের দিকে চললেন। অপর্ণা বললে, আসুন।

আমার কথাটা!

ঘরে হবে। বসে বসে বলবেন।

বারান্দা ডান দিকে বাঁক নিয়ে আর এক মহলে ঢুকে পড়েছে। এক জায়গায় তিনধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা একটা উঁচু চাতালে চলে এলুম। অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। অদ্ভুত রহস্যময় বাড়ি। চাতালের তিন পাশ ঘেরা। মৃদু একটা আলো জ্বলছে, মাথার ওপর, ঘেরাটোপের মধ্যে। সামনে একটা সুন্দর পালিশ করা দরজা। কোথা থেকে হুহু করে হাওয়া আসছে। এই বাড়িতে সারা জীবন আমি বন্দী হয়ে কাটাতে পারি।

অপর্ণা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। একটু আগেও ধূপের গন্ধ পাচ্ছিলুম, এখন গন্ধ আরও বেশি পাওয়া গেল। হলঘরের মত বিরাট একটা ঘর। ঐশ্বর্য দেখলে চোখ ঠিকরে যায়। মহিলাদের স্পর্শে এইভাবেই মনে হয় ইন্দ্রলোক তৈরি হয়? একেই বলে, ম্যাজিকটাচ। তা না হলে, সবই ছন্নছাড়া। সব থেকেও কিছু নেই।

ঘরের শেষ মাথায় একটি পালঙ্ক, যেন স্বপ্নে ভেসে আছে। ডানপাশে একটা অর্গান। সামনেই বাঁপাশে জানালা ঘেঁষে একটি চৌকো কার্পেট। ধারে ধারে সোফা। ছিমছাম বইয়ের আলমারি। দাঁড়িয়ে লেখার ডেসক। বসে লেখাপড়া করার কাঁচপাতা ঝকঝকে টেবিল। বুকস্ট্যাণ্ড। শেডলাগান টেবিল ল্যাম্প। এ যেন রাজার ঘর।

দু'জনে মুখোমুখি বসলুম।

অপর্ণা বললে, মর্গে গিয়েছিলেন বলে চান করেছেন? হঠাৎ মর্গে গেলেন?

ওই যে কনক। একটা ছবি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তবে সে কনক নয়; কিন্তু আর একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখে এলুম। কাকীমার স্বামীর মৃতদেহ।

যাঃ, তা কি করে হয়! তিনি ওখানে কি করতে যাবেন। তিনি তো কোথায় যেন বাজাতে গেছেন।

আমি স্বচক্ষে দেখলুম, তিনি ওখানে শুয়ে আছেন।

বলতে বলতে কাকীমার মত একজন সুন্দর মহিলার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে গলা ধরে এল। অপর্ণার দু'চোখে জল টলটল করছে।

ধরা ধরা গলায় বললুম, কি হবে অপর্ণা!

অপর্ণার চোখের জল গালে নেমে এসেছে। অতি কষ্টে বললে, আপনি দেখলেন কেন?

ইচ্ছে করে দেখি নি, হঠাৎ বেরিয়ে এল।

ইস! ছিছি। এই তো একটু আগে রাঁধলেন, খাওয়ালেন। আমরা লুডো খেললুম বসে বসে। কি হবে তা হলে?

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না অপর্ণা। আমার কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি কি ভুল দেখলুম অপর্ণা।

হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অনেক সময় একই রকম দেখতে দু'জন লোক থাকে। হয়ত যমজ নয়; কিন্তু চেহারায় অদ্ভুত মিল।

অপর্ণার মা এলেন। দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে মনে হয়, ছোট অপর্ণা, বড় অপর্ণা। তাঁর পেছনে আর একজন মহিলা, হাতে ট্রে, একটা সরবতের গেলাস বসান তার ওপর। যেন কুয়াশা তরল টলটল করছে গেলাসে। অপর্ণার মা অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কি

হয়েছে রে ? দু'জনে কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছিস ?

অপর্ণা আঁচলে চোখ মুছে বললে, কিছু হয় নি মা।

তোরা আমার চোখকে ফাঁকি দিবি ? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। প্রভা,ওটা আমার হাতে দিয়ে তুমি যাও।

প্রভা ট্রেটা সাইড টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। আমার স্বভাবটা আবার মেয়েদের মত। পেটে কথা রাখতে পারি না। বেরোবাব জন্যে দরজার কাছে মুখিয়ে বসে থাকে।

অপর্ণার মা আমার ডানপাশের সোফায় বসে বললেন, কি হয়েছে বাবা ! তোমার চেহারা দেখে প্রথম থেকেই কেমন যেন মনে হচ্ছে। গেলে একরকম, ফিরে এলে আর একরকম। চুল উসকো খুসকো, জামা ভিজে ভিজে। কি হয়েছে বলো, আমাকে লুকিও না। বুড়ী তুই ট্রেটা এনে সামনে ধর।

এই প্রশ্নটার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল আমার জমা-কথা। হুড় হুড় করে বেরতে লাগল। সব শুনে মা বললেন, কি সর্বনাশ ! তুমি দেখেছ ত !

অপর্ণা বললে, আমিও সেই কথাই বলছি, অনেক সময় দেখার ভুল হয়। দু'জন লোককে একইরকম দেখতে হয়। আর 'একবার ভাল করে দেখে এলে হয়।

না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই। ও যদি হঠাৎ ওখানে না যেত, তা হলে কি হত ?

কিছুই হত না।

ব্যাস্, সেইরকম কিছুই হবে না।

ওই কাকীমার কি হবে ? তিনি ত কিছুই জানতে পারবেন না।

আর তুমি জানাবার পর যদি দেখা যায়, তোমার দেখার ভুল, তা হলে কি হবে ? আজ রাতে আর হইচই করে দরকার নেই। ওঁদের ওপর ছেড়ে দাও। ধীরে সুস্থে সব খবর নিন।

অপর্ণা বললে, সেই ভাল। দুঃসংবাদ যত দেরিতে জানা যায়।

পঙ্কজবাবু ঘরে এলেন, বলতে বলতে আসছেন, রাত বাড়ছে, এখনও অনেক কাজ বাকি।

অপর্ণার মা বললেন, ছটফট কোরো না তো। এখানে স্থির হয়ে বোসো। আমি সব শুনেছি। শুনেছ ? পঙ্কজবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন খালি সোফায়।

বললেন, নিচে ওঁরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ব্যস্ত হলে তো চলবে না, ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। আজকের রাতটা চলে যেতে দাও। সরোজবাবু আর অক্ষয় ঠাকুরপোকে বলো সব খবর নিতে। পুলিসের খাতা দেখলেই বেরিয়ে পড়বে পরিচয়।

কিছুই বেরবে না। আননোন ডেডবডিই মর্গে পড়ে থাকে। শেষে চলে যায় লাশকাটা ঘরে। কঙ্কালটা বিক্রি হয়ে যায়।

আঃ রাখো তো ওসব কথা। মনে করো তোমরা কিছু জান না।

তোমার সেই ইংরিজি প্রোভার্ব, হোয়্যাব ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ।

ছেলেটার কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ ? গেলো একরকম, ফিরে এলো আর একরকম।

তুমি বলেছ ঠিক, আমরা না গেলে কি হত ! কিছুই জানতে পারতুম না। আচ্ছা পিণ্টু,তুমি কি সত্যিই তোমার প্রফুল্লকাকাকে দেখেছ ?

একবার মনে হচ্ছে হ্যাঁ, আবার মনে হচ্ছে না।

মনটাকে স্থির করে যে কোনও একটা কিছু বলো, পজিটিভ, নেগেটিভ এক সঙ্গে দুটো কি করে হয়।

তা ঠিক। তবে, এ তো মনের ব্যাপার নয়, চোখের ব্যাপার।

তা হলে আজকের মত চেপে যাও। বেশ রাত হয়েছে।

অপর্ণার মা বললেন, তুমি আজ থেকে যাও।

করুণ মুখে বললুম, উপায় নেই। বাবা, কনকের খবরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন।

তা হলে কথা দাও, তুমি শিগগিরি আর একদিন আসবে।

পঙ্কজবাবু বললেন, আরে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, সামনের রোববার আমি দু'জনকেই ধরে আনব।

অপর্ণা বললে, চলুন, দিদা ঠাকুরঘরে আপনার জন্যে বসে আছে। বাবা, তুমি নিচে নামো, আমরা এখুনি আসছি।

এবার আমরা বাড়িটার আরো রহস্যময় অংশে চলে এলুম। একেবারে বাগানের দিকে। ছাদ মন্দিরের চূড়ার মত ওপর দিকে উঠে গেছে। মার্বেল পাথরের মেঝে সোজা চলে গেছে ঠাকুরের সিংহাসনে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বৃদ্ধা আসনে বসে আছেন। শুভ্র কেশ মৃদু বাতাসে উড়ছে। সামনেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

আমরা দু'পাশ থেকে দু'জনে হাঁটু গেড়ে প্রণামের জন্যে মাথা হেঁট করতেই, মাথার পেছন দিকে একটি স্নেহের হাতের স্পর্শ পেলুম। হাত যেন কত কথাই বলতে চাইছে। সময় যেমন কথা বলে ঘড়ির শব্দে। দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে মাথা তুলেছি। বৃদ্ধার দুটি হাত আমাদের দু'জনের মাথায়। দুটি অনড় চোখে জলের ধারা। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল ভক্তই জানেন। তিনি যার কাছে আছেন, তার কাছে ষোল আনাই আছেন, যার কাছে নেই তার কাছেও আছেন, একজন দেখেন, আর একজন দেখেন না।

অপর্ণা বললে, দিদা, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও, অনেক রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরবেন।

বৃদ্ধা আসন ছেড়ে উঠলেন। প্রসাদের থালা থেকে ধবধবে সাদা সন্দেশ তুলে আমাদের হাতে দিলেন। মুখে কোনও কথা নেই। মৃদু হাসি লেগে আছে। দু চোখে জলের ধারা সমানে বইছে। বেশ বোঝাই গেল আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ।

ফিরে আসার পথে অপর্ণা বললে, আমাদের ঠাকুব বড জাগ্রত। দিদাব নানারকম দর্শন হয়। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমরা গভীর রাতে মাঝে মাঝে বাঁশীর শব্দ শুনি। এই দেখুন বলতে বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

অপর্ণা তার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। কি করব, প্রথমে আমার মাথায় এল না। হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো বলে ছেড়ে দিলে, লঘু কবা হয়। তাই কম্‌পাউণ্ডার যে ভাবে ইণ্টারভেনাস ইন্‌জেকসান দেয়, সেই কায়দায় দু হাতে সেই সুন্দর হাত ধরে, ত্বকে ভাবাবেগের কাঁটা দর্শন করলুম। একেই বলে ভাগ্য। কেউ ঈশ্বর দেখেন, কেউ অতীন্দ্রিয় ধ্বনি শোনেন। আর কেউ সুন্দরীর দেহত্বকে কাঁটা দর্শন করে, হায় হায় করে। ওপাশে মৃত্যু শুয়ে আছে মর্গে, এপাশে যুবতীর দেহবল্লরী।

অপর্ণার হাত সাবধানে ধীরে ধীরে তার দেহের পাশে নামিয়ে রাখলুম। ধপাস করে ছেড়ে দিতে সাহস হল না। এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম। পুতুলে মানুষে তফাৎ বুঝি না। শুনেছি বিখ্যাত এক বিদেশী শিল্পী সারা জীবন শুধু এঁকে গেছেন নানা ভঙ্গিমায়।

অপর্ণা বললে, এই দেখুন আমার গালেও কি রকম কাঁটা দিয়েছে।

একটা গাল আমার চোখের কাছাকাছি নিয়ে এল। মনে হল আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখি, সাহস হল না। নিজের ভেতরে ডামাডোলের শব্দ পেলুম। বুকে যেন ঢাক বাজছে।

নিচের ঘরে তিনজনে ঝিমিয়ে পড়েছেন। আরও পড়তেন, যদি না অপর্ণার মা কথায় কথায় বেশ মশগুল করে রাখতেন।

সরোজবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কি করবে তা হলে?

কিছুই ভেবে না পেয়ে বললুম, আজ থাক।

সেটা কি ঠিক হবে? তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? ওনার স্ত্রীকে একবার নিয়ে এলেই তো হয়।

না, না।

না, না আবার কি। স্বামী মারা যেতে পারে জেনেই ত মেয়েরা বিয়ে করে। প্লেন ভেঙে পড়তে পারে জেনেই ত মানুষ বিমানে চড়ে। স্টোভ ফাটতে পারে জেনেই ত মানুষ পাম্প করে।

তা হলেও যতটা দেরিতে জানা যায়।

যা ভাল বোঝো করো।

সরোজবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেই ভাবেই উঠে দাঁড়ালেন. আমি তা হলে চলি।

পঙ্কজবাবু বিনীত ভাবে বললেন, প্রয়োজন হলে যেন সাহায্য পাই।

সেই ঘড়ি. কোথায় আছে জানি না. গম্ভীর সুরে বাজতে লাগল। রাত এগারটা।

পঙ্কজবাবু বললেন. সর্বনাশ ! অনেক রাত হয়ে গেল। ইস্ হরি ভীষণ ছটফট করছে। এই তোমার জন্যেই দেরি হল।

অপর্ণার মা বললেন. কি এমন রাত ! গ্রীষ্মকাল. এই তো সবে সন্ধে।

পঙ্কজবাবু বললেন. চলো চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি বললুম. না. না. আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আবার এতটা পথ একা একা ফিরতে হবে।

অক্ষয়বাবু বললেন. কোনও প্রয়োজন নেই। ভাববেন না। ছেলেদের একটু সাহসী করুন। আমি ওই পথেই ফিরব. পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

বাগানের পথ দিয়ে. হেঁটে চলেছি। রাতকা রানী গন্ধে একেবারে পাগল করে দিচ্ছে। কোথাও কেউ ঠুমরি গাইছে।

রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস

শেষ বাস চলে গেছে। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন. হাঁটতে পারবে পিণ্টু ?

খুব পারবো কাকাবাবু।

সবে সাবালক হয়েছি. ধরা তো আমার কাছে এখন সরা বিশেষ। পারলে বিশ্বটাকে অ্যাটলাসের মত বুকে চেপে ধরে. তার ঘোরাটাও বন্ধ করে দিতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে পা চালাও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। হরিদা ভীষণ ছটফট করছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি. তিনি একবার করে ঘরে ঢুকছেন. একবার করে বারান্দায় বেরিয়ে আসছেন।

প্রায় নির্জন রাস্তায় দু'জনে হনহন করে হাঁটতে লাগলুম। কাকা ভাইপোতে যেন ওয়াকিং কমপিটিশান হচ্ছে। আমি হাঁটছি সামান্য সামনে ঝুঁকে, কাকাবাবু হাঁটছেন খাড়া সোজা হয়ে. অনেকটা নেচে নেচে। দম ফুরিয়ে যাবে বলে আমরা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছি না। সামনে পড়ে আছে ট্রামলাইন। লকলক করে চলে গেছে দূর থেকে দূরে। অনেকটা মানুষের লোভের মত. মানুষের আকাঙ্ক্ষার মত।

রাস্তা ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে। একটু আগে কারা বোধহয় শ্মশানের দিকে মৃতদেহ নিয়ে গেছে। কালো পিচের রাস্তায় সাদা সাদা খই ছড়িয়ে আছে। বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। চলে যাওয়া মানুষের ফেলে যাওয়া অসংখ্য দিনের মত। ওড়া খই দেখে আবার সেই মর্গের কথা মনে পড়ল। সাধুবাবু এক একটা ট্রে টানছেন, এক একটি মৃতদেহ বেরিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন বয়েস. বিভিন্ন আকৃতি। মুখে লেগে থাকা বিভিন্ন প্রকারের মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন। কেউ মরেছেন আতঙ্ক নিয়ে, কেউ গেছেন বিষণ্ণতা নিয়ে. কেউ যেন হাসিমুখে মায়ের কোলে উঠে গেছেন। আমি ঠিকই দেখেছি। ও মৃতদেহ প্রফুল্লকাকা ছাড়া আর কারুর নয়। আর কারুর হলে কাকীমার দুঃখের ষোলকলা পূর্ণ হবে কি করে ! সেই মারনেওলা ভগবান বসে আছেন কোন্ ওপরে। অসংখ্য তারার চোখে সৃষ্টিকে দেখছেন, ঝুলিয়ে দিচ্ছেন ফরমান. একে মারো, ওকে আধমরা করে রাখো। একে হাসাও ওকে কাঁদাও।

চলতে চলতে কি করতে চাই, পরিকল্পনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অভিশপ্ত বাড়ি। কোনও সন্দেহই

নেই। যে আসে সেই ভোগে। একটা না একটা কিছু তাকে দিতেই হবে। হয় নিজেকে, না হয় নিজের কোনও আপনজনকে। অদৃশ্য মহাকাল সিংহাসনে বসে আছেন। রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস। হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে, অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে, চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে, ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমণে, মৃগসম মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে। মহাকালী 'কালস্বরূপিণী, রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি, বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা, ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর। এই মহাকালকে ফাঁকি দিতে হবে। প্লটের যেমন কাউন্টার প্লট। এসপিয়নেজের যেমন কাউন্টার এসপিয়নেজ। কাকীমাকে কিছুই বলা চলবে না। ইচ্ছে করেই বলব না। একজন মানুষ যদি না ফেরেন, তা হলে তাঁর জন্যে চোদ্দ বছর অপেক্ষার বিধান আছে শাস্ত্রে। যা হবার হবে তারপর। চোদ্দ বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়টুকু কাকীমা অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটিয়ে দিন। বৈধব্য স্পর্শ করবে না। একটা উদ্বেগ থাকবে, ক্রমশই শূন্যতা সহনীয় হয়ে উঠবে। শোক আর কাবু করতে পারবে না। ভরনুপোষণ ? একজন মানুষের দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না ! খুব পারব। পিতা পুত্রের রোজগারে হেসেখেলে চলে যাবে।

আমি লক্ষ করিনি। অক্ষয় কাকাবাবুর নজরে পড়েছে। ল্যাম্পপোস্টের আলো নেমে এসেছে নিচে। রাতের দিকে পৃথিবীটা কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে ওঠে। মিলটনের নরকের মত। সেই আলোকিত ধোঁয়ার বৃত্তে, দুপাশে দু হাত ছড়িয়ে একজন মানুষ, ভূমিকম্পের জমিতে গোল হয়ে ঘুরছেন। মাঝে মাঝে উলটে পড়ে যাবার মত হচ্ছে।

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। দোসর আমি পেছনে। কাছে গিয়ে শুনতে পেলুম, লোকটি অস্পষ্ট জড়ান গলায় বলছেন, শালা কোন্ দিকে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে ? বল্, শালা কোন্ দিকে ?

কাকাবাবু লোকটিকে ধরে ফেললেন। চড়া গলায় বললেন, কি কোন্ দিকে ?

এই যে বাওয়া বিবেক, আমার বাড়িটা কোন্দিকে ? আমার সেই সাতমহলা মার্বেল প্যালেস !

কাকাবাবু পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দিকে।

লোকটি মেয়েলী গলায় বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ব্যাটা হনুমান।

ডাইনে বাঁয়ে, ফাঁক ফাঁক পা ফেলতে ফেলতে লোকটি কাঁচি সিগারেটের মত অন্ধকারে চলতে লাগলেন। অনিশ্চিত যাত্রা। জড়ান গলায় টপ্পার সুরে গান ধরেছেন, বিধুমুখী, তোমায় সাজাব যতনে, মাইরি বলছি, সাজাব যতনে।

উনি কোথায় চললেন কাকাবাবু ?

থানার দিকে। মুখটা সেইদিকেই ঘুরিয়ে দিলুম। তবু প্রাণে বাঁচুক। এরপর তো গুণ্ডার হাতে পড়বে। নয় তো মাতাল ড্রাইভারের চাকার তলায়। লোকটার হাতে গোটা তিনেক আঙটি রয়েছে। খুব টেনেছে, বুঝলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাত বড় মজার সময় পিন্টু। দিনের বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। নাও, নাও পা চালাও। কুইক মার্চ। তোমার তো এসে গেল, আমাকে এখনও কত দূর যেতে হবে জান ! বালির ব্রিজটা কি হয়ে আছে, একবার চিন্তা কর রাতের আতঙ্ক। পারবে তুমি এখন ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে একা একা যেতে ?

আজ্ঞে না।

কি তুমি পুরুষ মানুষ হয়েছ ? ভয়কে জয় করো। তা না হলে জীবনের কাছ থেকে কিছুই পাবে না। সে কি দৃশ্য, ভাবতে পারো ! বহু নিচে গঙ্গা বয়ে চলেছে। চারপাশ অন্ধকার। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। রেল কোয়ার্টারের বাড়ি। একের পর এক ব্রিজের আর্চ চলে গেছে এপার থেকে ওপারে। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে আছে এক জোড়া রেললাইন। পারবে না তুমি ?

আজ্ঞে না। আমি ভীষণ ভীতু। এমনিই আমি রাতকে ভীষণ ভয় পাই, তার ওপর আছে ভূতের ভয়,

বদমাইশ লোকের ভয়, এমন কি ভগবানকেও আমি ভয় পাই। জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরে সামনে এসে তিনি যদি দাঁড়ান আমার দাঁতে দাঁত লেগে যাবে।

নাঃ, তোমার যে কি হবে ?

আপনি তো আমার হাত দেখেছেন। অনেক কথাই বলেছেন, অনেক কথাই চেপে গেছেন।

চেপে গেছি, কি করে বুঝলে ?

আমি জানি। এমন কিছু বলার আছে, যা বাবার সামনে বলা যায় না।

ধরেছ ঠিক। তোমার হাতটা বড় অদ্ভুত। একদিকে প্রচণ্ড ভোগী, অন্যদিকে সাংঘাতিক ত্যাগী। একই সঙ্গে জ্ঞানী, আবার নির্বোধ। একই আধারে বসে আছে শিশু আর পণ্ডিত। কখনও জ্ঞানীর মত কথা বলবে, কখনও নির্বোধের মত। একই সঙ্গে লম্পট ও সন্ন্যাসী। অনেকটা চন্দ্রের মত। পনের দিন অন্ধকারে, পনের দিন আলোয় !

বাবা, এ তো দেখছি সাংঘাতিক হাত। বিপজ্জনক চরিত্র।

তোমার জীবন সম্পর্কে আমার নিজেরই ভীষণ কৌতূহল। দূর থেকে তোমাকে দেখে যাব। আমি আছি। প্রায় পঁচানব্বই বছর থাকব। তুমিও থাকবে, তোমার আয়ু নেহাৎ কম নয়। জোর করে কিছু করতে যেও না। দৈবশক্তির ওপর নিজেকে ছেড়ে দাও। দ্যাখো না কি হয়।

সেটা কি ঠিক হবে ?

আরে সেইটাই ত মজা ! এই সন্ন্যাসী, এই প্রেমিক। কখনও গুহায়, কখনও প্রমোদ কাননে। কখনও বুদ্ধ, কখনও কৃষ্ণ। একটা কথা আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি, মেয়েরা তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সব বয়েসের মেয়েরা।

বাঁচার উপায় ?

মৃত্যু।

রাত কাঁপিয়ে, রাস্তা কাঁপিয়ে অক্ষয় কাকাবাবু হেসে উঠলেন। পথের ধারের একটা দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে এক বৃদ্ধা আকুল গলায় বললেন, কে যায়, জীবন নাকি ?

অনেকটা ভেতর থেকে পুরুষালী গলায় ধমক ভেসে এল, আঃ, চুপ করে শুয়ে থাকো। ঘুমোতে পারছ না ?

বৃদ্ধা টেনে টেনে বললেন, আঃ, মধুসূদন !

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় সারি সারি অর্কিডের টব ঝুলছে। সাদা মত কি একটা রেলিঙের পাশে জবুথবু হয়ে রয়েছে ! অক্ষয় কাকাবাবু তাড়া লাগালেন, পা চালাও, পা চালাও।

মোড়ের মাথায় বেশ বড়সড় একটা পানবিড়ির দোকান রাতকে মাত করে রেখেছে। বিশাল আয়নায় আলো মুখ দেখছে। পেতলের পান-সিংহাসন ঝকঝক করছে। কোলে কুলো নিয়ে পাশাপাশি তিনটি লোক দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে। একটা হাণ্ডড়ায় রেডিওয় দূরের কোনও কেন্দ্র বাজছে। শব্দ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে চোঁচাঁ, কোঁকোঁ আওয়াজ হচ্ছে। দোকানের সামনের বেঞ্চে গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারার দু'জন লোক বসে আছে। মনে হয়, সাদা পোশাকের পুলিস। পাশেই অন্ধকার মত একটা বাড়ির দোরগোড়ায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে।

আরও কিছু দূর এসে একজন বৃদ্ধ পথিককে পাওয়া গেল। সামনে শরীর ভেঙে লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করে টুকটুক করে চলেছেন। হাঁটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, গন্তব্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। রাত চলেছে, মানুষ চলেছে। আমাদের দেখে বৃদ্ধ বললেন, বাবুমশায়, একটা বিড়ি হবে ?

কাকাবাবু বললেন, না।

নস্য।

না।

এক আনা পয়সা।

পকেট থেকে একটা আনি বের করে বৃদ্ধের হাতে ধরিয়ে দিলুম। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, যাবে

কোথায় ?

বৃদ্ধ বললেন, দেখি, কোথায় যাওয়া যায়।

বৃদ্ধ যেন ছদ্মবেশী ভগবান। পৃথিবীর হালচাল দেখতে বেরিয়েছেন।

বাঁপাশের অন্ধকার একটা গলিতে, গোটা তিনেক বিড়ির আগুন জ্বলছে আর নিবছে। অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, পা চালাও, পা চালাও।

উলঙ্গ এক পাগলী আঁস্তাকুড়ে ময়লা ঘাঁটছে। কিছু দূরে একটা কুকুর প্রতিবাদে গড়গড় করছে। উত্তর আকাশে পাঞ্জা মাপের একটা তারা ধকধক করছে।

আমাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হলেও, ভেতরে আলোর খেলা চলেছে। শুধু পিতা নয়, সকলেই মনে হয় আমাদের অপেক্ষায় জেগে বসে আছেন। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন কাকীমা। মাথায় ঘোমটা ছিল না। সন্ধের দিকে তেল দিয়ে চুল বেঁধেছেন। আলো পড়ে খোঁপা চকচক করছে। কপালে সিঁদুরের টিপের অরুণোদয়। কাকাবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানলেন। একপাশে সরে গিয়ে ফিস্‌ফিস করে বললেন, এত দেরি হল ?

আমার প্রথম প্রশ্নই হল, কাকাবাবু আসেন নি ?

কাকীমা বললেন, দাঁড়াও, কোথাও গেলে, অত সহজে কি আসবেন। সব শেষ করে, অরুচি ধরিয়ে আসবেন।

সিঁড়ির মাথা থেকে পিতার গলা ভেসে এল, কি ফিরেছ ?

আমরা তিনজনে একসঙ্গে উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

অক্ষয়কাকাবাবু ওপরে উঠতে লাগলেন।

কাকীমা আমার হাত টেনে ধরে বললেন, তোমার চলে যাবার পর, খুব বিপদ হয়েছে।

বুকটা ধক্ করে উঠল, কি বিপদ ?

মুকু পড়ে গেছে।

কোথায় ?

নিচের সিঁড়িতে। কপাল থেঁতো হয়ে গেছে।

সে কি ?

কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। যেন চাঁদের কপালে সূর্য উঠেছে।

ওপরে উঠে বোঝা গেল পিতৃদেব এতক্ষণে অশান্ত পায়ে পায়চারি করছিলেন। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা। সারা ঘরে একটা আওডিন আওডিন, বেন্‌জিন, বেন্‌জিন গন্ধ বেরচ্ছে। মুকু আমাদের বিছানাতেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কপালে একটা ব্যাণ্ডেজ।

পিতা ফিসফিস করে অক্ষয়কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, দেখলে ?

অক্ষয়কাকাবাবু চাপা গলায় বললেন, না।

থ্যাঙ্ক গড।

কি হল কি ? এ তো দেখছি বিপদের ওপর বিপদ।

আর বোলো না। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। একে মেয়েছেলে। কপালটা না দাগবাজি হয়ে যায়। বিয়ে দিতে হবে তো !

অনেকটা গেছে !

ভাগ্য ভাল। স্টিচ পড়ে নি। ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, তেমন কোনও ভয় নেই।

হরিদা, আমি তা হলে চলি।

পাগল না কি ! এই রাতে তুমি যাবে কোথায় ! তুমি আজ এইখানেই থাকবে। কাল সকালে আমার সঙ্গে অফিস যাবে।

আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু আপনাদের যদি কোনও অসুবিধে হয়।

আমাদের অসুবিধে ! তুমি হাসালে অক্ষয়।

কাকীমা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, আমি আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি।

পিতা বললেন, তুমি এত বড় একটা খবর আনলে, এই সব ছোটখাট দুর্ঘটনা না থাকলে, আজ তো আনন্দের দিন।

কি যে আনন্দেব দিন সে ত আমি জানি। যে দুঃসংবাদ আমি চেপে বেখেছি, তা যদি কোনওরকমে একবার প্রকাশ পায়, এই বাড়ি কেঁপে যাবে। কি যে হবে আমাব জানা নেই।

কাকীমা বললেন, আপনারা তৈবি হয়ে নিন, খাবাব যোগাড় কবি। এব পব খেলে শরীব খারাপ হবে।

পিতা বললেন, আমাব জন্যে খুব সামান্য। অনেক বেলায় খেয়েছি। এবেলা না খেলেই ভাল হয়।

কাকীমা বললেন, মশাবিটা ফেলে দি। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। ওকে আব না জাগানই ভাল। এখানেই ঘুমোক। আপনাদেব আমি আলাদা বিছানা কবে দি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভাল। বিনযদাকে আজ আব নতুন কোনও চিন্তায না ফেলাই ভাল। সন্ধেব থেকে ভদ্রলোক আরামে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমই ওনাব ওষুধ।

কাকীমা আমাব পিঠে টোকা মেবে আড়ালে ডাকলেন।

তোমাব কি হয়েচে গো!

কই কিছুই তো হয় নি।

তা হলে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

এতটা পথ হেঁটে এলুম না! বাস-ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গেছে না!

তুমি হাত-মুখ ধুযে জামাকাপড় ছেড়ে নাও।

এই তো নিচ্ছি।

অক্ষযকাকাবাবু বললেন, আমি চান করব।

এত বাতে তুমি চান করবে অক্ষয!

আপনি তো জানেন, সাবাদিন আমি বারে বাবে চান কবি। আমাব গবম একটু বেশি।

যাও তা হলে ঝট্ কবে সেরে নাও।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই সাবা বাড়ি গাওয়া ঘিযেব গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠল। গভীব বাতে এমন ভোজনেব আয়োজন একমাত্র এই ভুতুড়ে বাড়িতেই সম্ভব। এ বাড়িব প্রতিটি ইট ইতিহাসের সাক্ষী। কত ঘটনাই দেখেছে! আবও কত ঘটনা দেখবে।

রান্নাঘবে মধুব এক নাটক চলেছে। কাকীমার বাধা শোনেন নি পিতা। বসে গেছেন লুচি বেলতে। এক হাতে অনেক দেবি হয়ে যাবে, দু হাত চাই। এসব কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। বাতের আকাশ দেখে মনে হচ্ছে, একটু পরেই পাখি ডেকে উঠবে।

হলঘবে পর পর তিনটে বিছানা পড়েছে। অক্ষয়কাকাবাবু চিৎ হয়ে বুকের ওপব হাত জড়ো করে শুয়েছেন। পিতাপুত্রে জেগে শুয়ে আছি। সহজে কি ঘুম আসে।

পিতা বললেন, একেই বলে সাধকের ঘুম। শুলো আর ঘুমলো। তোমার কাকীমার আজ খুব ধকল গেল। ও ঘরে মুকুর মাথার কাছে হয়তো ঠায় জেগে বসে আছে। বিছানা বেশ বড় আছে, দু'জনের বিছানা। তুমি গিয়ে বলে এসো, পাশে শুয়ে পড়তে। না বললে হয়তো ওই মাটিতেই পড়ে থাকবে। শেষ রাতে মশা বাড়ে। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। মায়ের জাত, ওদের কথাও একটু ভাববে। স্বার্থপর হলে চলে না।

মুকুর মাথার কাছে একটা চেয়ারে কাকীমা বসে আছেন। মাথাটা পাশে হেলে পড়েছে। হাত দুটে দু'পাশে এলিয়ে আছে। সারা ঘরে বিন্‌বিন্ করছে মশা। এত ক্লান্তি, মশকদংশনেও সাড় নেই। এত অসহায়! প্রাণটা কেমন যেন করে ওঠে। এ দেশের মহিলাদের জীবনের যেন কোনও ছিরিছাঁদ নেই ভাগ্য নির্ভর। হাসালে হাসি, কাঁদালে কান্না।

কাকীমার গায়ে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে মুখে ঘুম জড়িয়ে আছে।

তুমি ঘুমোওনি পিণ্টু ?

আর ঘুমিয়ে কি হবে ? একটু পরেই ভোর। বাবা আপনাকে মুকুর পাশে শুতে বললেন।

ইস ছি ছি, উনি আমাকে এই অবস্থায় দেখে গেলেন।

উনি এ ঘরে আসেন নি। আমাকে পাঠালেন। নিন শুয়ে পড়ুন। মশা ছেঁকে ধরেছে।

ছি ছি, গুরুজনদের বিছানায় শোয়া যায় !

খুব যায়। গুরুজন অনুমতি দিলে সব করা যায়।

আমি বেশ আছি গো। এসব আমার অভ্যাস আছে। কত রাতে তোমার কাকা ঘাড় ধরে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে, দরজা দিয়ে দিয়েছে। দরজায় পিঠ রেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরবেলা দরজা খুলতেই উলটে পড়ে গেছি। কত দুঃখের রাত পার করেছি পিণ্টু, এ তো সুখের রাত !

মুকু কেমন একটা শব্দ করল। কাকীমা মশারিতে মাথা ঠেকিয়ে দেখলেন। মুকু আর কোনও শব্দ করল না। স্থির হয়ে গেল।

আচ্ছা কাকীমা, কাকাবাবু যদি হঠাৎ আপনাকে ছেড়ে চলে যান, আপনার খুব দুঃখ হবে ?

ছেড়ে যাবে কেন ? বিয়ে করা বউকে কেউ ছাড়তে পারে! পুরুষ মানুষ একটু এদিক সেদিক করে ; কিন্তু শেষে সেই বউ। বউ ছাড়া সেবা পাবে কোথায় ! ভালবাসবে কে ? ও চলে গেলে আমাকে তো গলায় দড়ি দিতে হবে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমি, কে দেখবে আমাকে ! তোমার কাকার সব ভাল, কেবল একটু গোঁয়ার। পেটে দু কলম থাকলে অমন স্বভাব হত কি ! হত না। তা আমারই বা কি ছিল, যে শিক্ষিত ছেলে বিয়ে করবে ! ও নিয়ে দুঃখু করলে চলে ! ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়।

নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন। সারাদিন অনেক খেটেছেন। আপনাকে শোয়াতে না পারলে, বাবা আমাকে বকবেন।

আমার কেমন লাগছে পিণ্টু।

ও সব লাগালাগি পরে হবে। আগে উঠুন তো।

হাত ধরে টেনে তুলে দিলুম। কাকীমা উঠে দাঁড়ালেন। শুধু শরীর নয়, বেশবাসেও ঘুম লেগেছে। কাকীমা বললেন, তোকে আমার এত ভাল লাগে কেন বল তো ! আর জন্মে তুই আমার কেউ ছিলিস, এ জন্মে আবার ফিরে পেয়েছি।

হাত দিয়ে আমার মাথার চুল সরিয়ে দিলেন। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বউ হলে পর করে দিবি না তো !

আমি বিয়েই করব না।

যে ফাঁদে পড়েছিস, বিয়ে না করে পারবি ! মেয়েটা ভারি সুন্দর রে, তেমনি স্বভাব। হবে না, কত বড় ঘরের মেয়ে। বঠ্ঠাকুরকে বলব, সামনের মাঘেই লাগিয়ে দিন।

নিন তো, মশারিতে ঢুকুন।

আমার সোনা ছেলে।

কাকীমা গাল ধরে নেড়ে দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে মশারিতে ঢুকে গেলেন।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

কয়েকদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে, আমি খুনী। লাশ চাপা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি। কাকীমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কাজটা খুব সহজ নয়। কাকীমা আর দূরের মানুষ নন। আমাদের পরিবারেরই একজন। প্রফুল্লকাকার অবর্তমানে এই কাছাকাছি সরে আসা সহজ হয়েছে। পিতাও আর আগের মত দেখলেই লাফিয়ে ওঠেন না। তফাৎ যাও ভাবটা সংযত করেছেন। কাকীমা এতদিনে বেশ উতলা হয়ে পড়েছেন। ঘুরতে ফিরতে প্রায়ই জিজ্ঞেস করছেন কি হল বলো তো ! কোনও বার, এতদিন তো বাইরে থাকে না। আমার রাতে ভালো করে ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখি, আর জেগে জেগে উঠি। তুমি একটু খোঁজখবর করো না পিণ্টু। কাকীমাকে এখন আর আমি আপনি বলি না। তুমির সম্পর্কে নেমে এসেছি। কোথায় খোঁজখবর করব, তুমিই বলে দাও। কোথায় গেছেন তুমিই তো জান না।

ওর যাবার একটা জায়গা আছে। ওই যে সব গাইয়ে মেয়েছেলে আছে না ?

গাইয়ে মেয়েছেলে অনেক আছে, নাম ঠিকানা না বললে হয় ?

তারা সব কলকাতার একটা জায়গায় থাকে। রাতের বেলা সেজেগুজে সব বাবুদের গান শোনায়।

তাও জানি। তুমি নাম বলতে পারবে ?

না।

তা হলে হয়ে গেল। ও সব জায়গায় ঘরে ঘরে ঘোরার ক্ষমতা কারুর নেই।

কাকীমা উদাস হয়ে কখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর আমার ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মনে হয় আমিই যেন জলজ্যান্ত একটা মানুষকে খুন করে চোরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুবিধে একটাই, খুব সকালে অফিস, একবার বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়তে পারলে, আমায় আর পায় কে ! মেসোমশাই মোটামুটি সুস্থ। তবে কনক যদি না ফেরে, ভদ্রলোকের হাসিখুশির দিন আর ফিরবে না। মুকুর কপালের ব্যাণ্ডেজ খোলা হয়েছে। সামান্য একটু সাদা দাগ আছে, পরে মিলিয়ে যাবে। মেসোমশাই ঠিক করেই ফেলেছেন, সামনের শনিবার, সকালের প্লেনে চলে যাবেন। আর এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

মানুষের জীবন নদীর মত হঠাৎ হঠাৎ কি রকম বাঁক নিয়ে ঘুরে যায় ! মুকু যেন হঠাৎ কি রকম বদলে গেছে। সেই গুমোরে ভাব আর নেই। সুযোগ পেলেই কথা বলে। সময় সময় জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়। এক গেলাস জল। রুমাল। চিরুনি। মাঝে মাঝে নিচে নেমে গিয়ে কাকীমার সঙ্গে গল্প করে আসে। এই পরিবর্তনটা যদি আগেই আসত। মুকু একটু রোগা হয়ে গেছে। চেহারায় কনকের আদল আসছে।

সেদিন সকালে অফিস বেরবার আগে মুকু বললে, আর তো আমরা মাত্র দু'দিন আছি, তুমি আমাকে দক্ষিণেশ্বরটা একবার দেখিয়ে আনবে ! আর কি আসা হবে ! হয়তো হবে না। দিদি যেখান থেকে চিরকালের মত চলে গেল, সেই জায়গাটা শেষবারের মত একবার দেখে যাই।

আমি নিয়ে যেতে পারি, তোমার বাবা যাবার অনুমতি দেবেন না।

অনুমতি আমি চেয়ে নেবো।

মনে হয় পাবে না। যে জায়গা থেকে একটি মেয়ে চলে গেছে, সেখানে আর একটি মেয়েকে যেতে দেন কখনো।

সে আমি বলে দেখব। কাকীমাকে দিয়ে বলাব। ওঁর কথা বাবা নিশ্চয়ই শুনবেন।

ওঁর কথা শুনবেন কেন ?

কি জানি কেন ?

তার মানে ?

আমার মনে হয় কাকীমার কথা ঠেলতে পারবেন না। অসুখের সময় সেবা করতেন, শাসনও করতেন। সেই থেকে কাকীমার সঙ্গে ওঁর অনেক সুখ দুঃখের কথা হয়।

তা হলে তো ভালই, তুমি কাকীমাকে দিয়ে বলাও। বলবে, কাকীমাও আমাদের সঙ্গে যাবেন। অফিসটা আমার বেশ জমে উঠেছে। পরিবেশটা এখন অফিস বলে মনেই হয় না। তেমন কোনও শাসন নেই। কেবল চিফ কেমিস্ট ভদ্রলোক মাঝে মধ্যে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সে ওই পেটের জন্যে। মুডির সঙ্গে ভুঁড়ির ভীষণ যোগ। দু' ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জলে গুলে সুধীর যেই খাইয়ে দেয়, অমনি মেজাজ শান্ত। তখন মুখে হাসিও ফোটে। রবিবাবুর শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই অ্যানালিসিসের হাত বেশ পেকে উঠেছে। ফোড়ার মত আরও কত কি যে পাকে ! চুল পাকে, ছেলে পাকে, সম্পর্ক পাকে। ম্যানেজিং ডিরেকটারেব সঙ্গে সম্পর্কও বেশ পেকেছে। অনেকটা ছেলেব মত হয়ে গেছি। আসলে চাওয়া আর পাওয়াব তুচ্ছ জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পারে। একেবারে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে চাকরিতে না এলে যেটা সম্ভব। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই দাস হয়ে ঘুরে বেড়ান।

আজ আকাশ একটু মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গাছপালা পাগলের মত দুলে দুলে উঠছে। বিকেলের দিকে জোর নামবে মনে হয়। আজ ক্যালকাটা ভেসে যাবে। ময়দানে দুই বড দলেব খেলা আছে। বিকেলে আজ জমবে ভাল।

লেবরেটারিতে ঢুকতেই সুধীরবাবু বললেন, শিগগির যান, এম ডি খুঁজছেন। লেবরেটাবিতে যখন কেউ থাকেন না, তখন বেশ দেখায়। রহস্য, রোমাঞ্চ, কল্পনা সব মিলে মিশে জগতের ভেতর একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। মানুষ যেমন তিনটে ! একই মানুষ তিন স্তরে বিভক্ত। এক হল তাব হাডেব খাঁচা, কঙ্কাল। মৃত একটা স্তর। তার ওপর, মেদ, মাংসের একটি অবয়ব। ধুঁধুলের খোসার মত শিবা, উপশিবার জালি। বুকের খাঁচায় দুটো যন্ত্র, হরতনের মত হৃদয়, বেলুনের মত ফুসফুস। গর্ভে লিভার, পিলে, অন্ত্র, বৃহদন্ত্র, প্রভৃতি পোঁটলাপুঁটলি। দুপায়ের ফাঁকে মানুষেব কদিচ্ছার কোষ। যার সামনে দাঁড়িয়ে আলিবাবা অষ্টপ্রহব হেঁকে চলেছে, চিচিংফাঁক, ঝিঙে ফাঁক, ঢ্যাঁড়স ফাঁক, উচ্ছে ফাঁক। এই সজীব কম্পন ঘিরে তৈবি হয়ে আছে একটি চেতন আধার, অবয়বহীন একটা ব্যাপার, যেখানে প্রেম আছে, অনুভূতি আছে, কল্পনা আছে, হিংসা আছে। মাতামহ সেই গাইছিলেন একদিন নেচে নেচে,

> এই মানুষে সেই মানুষ আছে
> কত মুনি ঋষি চারযুগ ধ'রে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
> জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
> ধবতে গেলে হাতে কে পায়,
> তেমনি সে থাকে সদায় আলোকে ব'সে ॥

এম ডি ঘরে পায়চারি করছেন ।টেবিলের ওপর একটা নকশা খোলা, পেপার ওয়েট চাপা। দূরে আর একটা টেবিলে রয়েছে একটি মডেল। মনে হয় কোনও কারখানার। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম, এম ডি তখন আমার দিকে পেছন ফিরে, জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জানালার বাইরে একটা কদমফুলের গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা ফুল এসেছে। দুটো হাত পেছন দিকে। মুখ সামনের দিকে তোলা। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মেঘলা আকাশের চাপা আলো পড়ে চিকচিক করছে। একমাথা সাদা চুলে তাঁর বৈজ্ঞানিক চেহারাকে বড় স্পষ্ট করে তুলেছে। মাঝে মাঝে এই মানুষটিকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। সব থেকেও যেন কিছু নেই। সবেতে থেকেও যেন সব কিছু থেকে অনুপস্থিত।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই আমাকে দেখতে পেলেন। এমন একটা হাসি খেলে গেল মুখে, যে হাসির সঙ্গে একঝাঁক উড়ন্ত শঙ্খচিলের তুলনা চলে।

খুব কাজের লোক হয়েছ না ?

না, তা নয়।

তা নয় মানে ? তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো নি।

ওই তিন দিনই অফিসে আসতে আমার একটু দেরি হয়েছিল। সোজা ল্যাবরেটারিতে উঠে গিয়েছিলুম।

এদিকে এসো, এই জানালার কাছে সরে এসো। প্রকৃতির খেলা দেখে যাও।

বিশাল জানালা পা থেকে মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে। কদম গাছের সবুজ পাতা সবুজ আলো ছড়াচ্ছে। এম ডি গাছটা দেখিয়ে বললেন, দেখেছ, সবুজের কি খেলা চলেছে ! গাছের ধর্ম দ্যাখো। আমাদের মতই বয়েস বাড়ে ; কিন্তু বৃদ্ধ হতে জানে না। প্রতি বছরই পাতা ঝরিয়ে, আবার নতুন পাতায় সেজে ওঠে। আমরা কেন পারি না পলাশ !

কি জানি ? আমরা কেবল বুড়ো হতেই শিখেছি।

দেখেছ, প্রকৃতিতে বার্ধক্য নেই।

সেভাবে দেখলে, মানুষেরও বার্ধক্য নেই, মৃত্যু নেই। ওপর থেকে চলে যাচ্ছে, তলা থেকে ভরে উঠছে।

তা উঠছে। তবে একই মানুষ গাছের মত বছরে বছরে নবীন হতে শেখেনি।

মানুষের তেমনি অভিজ্ঞতা বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে। গাছের মতই প্রতি মুহূর্তে নতুন, নতুন পাতা গজায়।

জ্ঞানপত্র ! বলেছ ঠিক, তবে সব মানুষের নয়। এই গাছটাকে আমি কত বছর ধরে দেখছি। এই কারখানার ফিউমসে এতদিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল। অসীম জীবনী শক্তি। প্রতি বছরই সবুজ পাতায় সেজে, ফুল ফুটিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করে, বৃদ্ধ, তুমি আরও বৃদ্ধ হও, আমি সবুজে সবুজ হয়ে তোমার মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের কথা বলি।

মৃত্যু বলে কিছু আছে কি ?

এম ডি গাছের দিক থেকে ঘুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এ তোমার বইয়ের কথা, না বিশ্বাসের কথা !

বিশ্বাস বলতে পারেন, যে বিশ্বাসের জন্ম অভিজ্ঞতা থেকে।

অভিজ্ঞতা থেকে ?

এম ডি চেয়ারে বসলেন। সোনার চশমা খুলে রাখলেন নকশার ওপর। মুখে একটা রক্তাভ দ্যুতি খেলছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। ইশারায় বললেন, বোসো।

অভিজ্ঞতা মানে ? মৃত্যু নেই এমন অভিজ্ঞতা কি করে হতে পারে ? না না, তুমি ঠিক বলছ না। এমন একটা বিশ্বাস কষ্টেসৃষ্টে গড়ে তোলা যায়। অভিজ্ঞতায় আসে কি করে ?

অভিজ্ঞতা একটা নিজস্ব ব্যাপার। আপনার জানালার কাছে এই গাছটা আছে, আমাদের জানালার কাছে নেই। টেবিলের তলায় আপনার পায়ের কাছে একটা পাদানি রয়েছে, সকলের পায়ের কাছে নেই।

এর সঙ্গে মৃত্যু নেই, এই অভিজ্ঞতার কি সম্পর্ক ?

আছে। আমি যদি বলি, আমাকে ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা প্রতি মুহূর্তেই আমার সঙ্গে আছেন, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কদমগাছের মত। আপনি বিশ্বাস করবেন না, কারণ আপনাকে দেখান যাবে না। জাগতিক স্তর থেকে তাঁরা অনুভূতির স্তরে উঠে গেছেন।-এ এমন একটা ব্যাপার, যা লেবরেটারিতে ডেমনস্ট্রেট করা যায় না। ঈশ্বরকে যেমন দেখান যায় না। কোনও দিন বিজ্ঞান হয়তো পারবে।

কি জানি তুমি কি বলতে চাইছ !

তা হলে, আর একভাবে বলি। এই মুহূর্তে এই ঘরে বহু শব্দ তরঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান, বাজনা, বক্তৃতা। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন দেশ থেকে ভেসে আসছে। লণ্ডন থেকে, রাশিয়া থেকে, চীন থেকে।

কোনওটাই আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা ভালো রেডিও দিন। আমি সব কটা ধরে ধরে শুনিয়ে দেব। শব্দের মত মানুষও এক তরঙ্গ থেকে আর এক তরঙ্গে চলে যেতে পারে। টেলিভিশান বিভিন্ন তরঙ্গের আলো ধরে এ তথ্য প্রমাণ করেছে।

তোমার অভিজ্ঞতা কি করে আমার অভিজ্ঞতা হতে পারে?

বিশ্বাসে। বিশ্বাসে অনুভূতি তৈরি হয়, অনুভূতিতে অভিজ্ঞতা আসে। কেউ যদি বলেন, এই ঘরে এখন বেগম আখতার গান গাইছেন, তাতে আমার অনুভূতি তৈরি হবে বিশ্বাসে। হ্যাঁ হয়তো গাইছেন। অনুভূতি তেমন প্রখর হলে শুনতেও পাব। তারপর কেউ হয়তো রেডিও খুলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রমাণ মিলিয়ে দেবেন।

নাঃ ব্যাপারটা বড় জটিল হে। আমার জমি এখনও তৈবি হয়নি। এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একদিন বসব। এপার তো দেখা হল, ওপারটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। অবশ্য এপার থেকে। ওপারে গেলে তো এপারে ফিরতে পারব না। মাথায় একটা লাইন এসে গেল:

> যখন নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে
> তখন ভবের খেলা ভেঙে যাবে—

কার লেখা?

ঠিক মনে পড়ছে না।

লালন কয়, দেখবি ফিরে কি গতি। লালন ফকিরের লেখা। তুমি এসব পড়? না হরিশঙ্কর কেবল অঙ্ক কষায়?

আজ্ঞে ওইটাই আমি ভাল পাবি না বলে, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তা না হলে এতদিনে ইন্‌জিনিয়ার হয়ে, কোথায় কোন্ দেশে চলে যেতুম!

তোমার কি মনে হয় জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে?

বাবার তাই ধারণা।

হরির কথা ছেড়ে দাও। ও একটা র‍্যাংলার। একটা পরীক্ষায় ও অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো এক পেয়েছিল।

সে কি সম্ভব?

সম্ভব হয়েছিল। একটা অঙ্ক ভুল ছিল। অঙ্কটাই ভুল। ও সেটা পয়েন্ট আউট করে, অঙ্কটা কি হওয়া উচিত, শুদ্ধ করে, একটা নোট সমেত খাতা জমা দিয়েছিল। হই হই ব্যাপার। পরীক্ষক যে বই থেকে অঙ্কটা নিয়েছিলেন, সে বই বাতিল হয়ে গেল। হরিশঙ্করের মাথার দাম অন্য দেশ হলে কত হাজার টাকা হত জানো? এ দেশে মুড়ি মিছরির এক দর।

আমার মাথাটা ভগবান কেন যে এমন করে দিলেন। দুই আব দুইয়ে চার ছাড়া কিছুই সহ্য করতে পারে না।

তোমার মাথায় কেমিস্ট্রিটা ভালই খেলে। রবিবাবু বলছিলেন, এই অল্পদিনেই হাত বেশ পেকেছে।

আজ্ঞে, ওতে তো মাথা নেই।

মাথা ছাড়া হাত হয়! সবই মাথার খেলা। আচ্ছা শোনো, আমার একটা পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলি। এই হল সেই পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট। এপাশে সরে এসো, আমার চেয়ারের পাশে। দেরাদুনে আমরা আর একটা কারখানা করছি। সেখানে তৈরি হবে শুধু ওষুধ। পাশেই হিমালয়, গাছ-গাছড়ার অভাব হবে না। ক্লাইমেটও খুব সুন্দর। কি, কেমন হবে?

আজ্ঞে, সাংঘাতিক হবে।

এই দ্যাখো মুসৌরী-চক্রাতা রোড। এর পাশে দু একর জমি। চমৎকার স্পট। ডানপাশে ঘাড় ঘোরালেই মুসৌরী হিল্‌স। ওই হল কারখানার মডেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছে।

বুঝলে, একেবারে আধুনিক ডিজাইনের ব্যাপার। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এসে, ডকে পড়ে আছে।

আমার একটা ভীষণ ইচ্ছে। বলবো ?

হ্যাঁ, বলুন।

তোমাকে আমি দেবাদুন পাঠাব। কেমন হবে ?

আজ্ঞে ভীষণ হবে।

আমি বেছে বেছে, এখানকার কয়েকজনকে ওখানে পাঠাব। তার মধ্যে, নাম্বার ওয়ান, তুমি। নাম্বার টু, রবিবাবু। নাম্বার থ্রি, জীমূতবাবু। কেমন হবে টিমটা !

খুব ভাল। আমিও থাকবো তোমাদের সঙ্গে। তবে আমাকে তো দুটো দিকই দেখতে হবে। আমি আসা যাওয়া করব। হ্যাঁ, এই কয়েকদিন আগে হরিশঙ্করকে ফোন করেছিলুম, মাই গুড ওলড ফ্রেণ্ড। ওব খুব ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি তোমাকে সংসারী করার। পারলে এই ফাল্গুনে। ফাল্গুন ওর প্রিয় মাস। শিল্পী মানুষ তো ? বসন্তের দূত। নিজেও বিয়ে করেছিল ফাল্গুনে। সেই স্মৃতিটাকেই আবার জাগিয়ে তুলতে চায়। জানো তো, নিজের জীবনের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষ সন্তানের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তুমি ওকে দুঃখ দিও না। অমন নীতিবাদী, আদর্শপরায়ণ মানুষ, তুমি আব দুটি পাবে না। একেবারে পারফেক্ট ম্যান। অমন কামনাশূন্য, নির্লোভ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। পঙ্কজকেও আমি চিনি ! কলেজে আমবা সব সহপাঠী ছিলুম। দিনগুলি মোব সোনার খাঁচায় বইল না। সেই যে আমাব নানা বঙের দিনগুলি।

টেলিফোনটা দ্'বাব কিডকিড কবে থেমে গেল। হাত বাড়াতে গিয়ে এম ডি হাত টেনে নিলেন। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তাবপব বললেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। পঙ্কজ একটা জেনুইন বনেদী ঘরের ছেলে। ওরা তিন পুরুষে ডাক্তার। পঙ্কজের বাবা ছিলেন নামকবা সার্জেন।

এইবাব কডকড করে ফোন বেজে উঠল। এম. ডি রিসিভার তুললেন।

ও প্রান্তে কে আছেন বোঝা গেল না, তবে এইটুকু বোঝা গেল, তারপথে উত্তেজক কিছু খবব আসছে। এম ডি বলছেন, না, চোবকে আমি কোনও মতে প্রশ্রয় দিতে পারব না। সে যত বড় লোকই হোক। থানাপুলিসেব দরকাব নেই। দেনাপাওনা মিটিয়ে বিদায় করে দাও। অমন পণ্ডিতে আমার কাজ নেই। তস্কব পণ্ডিতেব চেয়ে মূর্খ সাধু ঢের ভাল। না না, নো মার্সি। নো মার্সি। নো মার্সি। বলো রেজিগনেশান সাবমিট করতে। তা না হলে আমবা পুলিসে কেস হ্যাণ্ড-ওভার করব।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। মুখের লাল আভা সামান্য বেড়েছিল। দেখতে দেখতে স্বাভাবিক হয়ে এলো। নকশাটা কোলেব দিকে টেনে নিয়ে বললেন, তোমাকে দেরাদুন পাঠাব ইন-চার্জ করে। তোমাকে আমি পাবচেজ অফিসাব করব। খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদ। তোমার বয়েস আর অভিজ্ঞতার তুলনায় বেশি ভাবি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পের্ডিগ্রি, বিশ্বাস করি সততায়, সাধনায়, আন্তরিকতায়। তুমি ওই পদের অমর্যাদা করবে না, এ বিশ্বাস আমাব আছে।

কিন্তু ওই পদে তো কেমিস্ট্রি নেই।

আছে, আছে। পাবচেজ ডিপার্টমেন্টেব আণ্ডারে আলাদা একটা লেবরেটরি থাকবে। প্রতিটি জিনিস কেনার আগে আনালিসিস করতে হবে। স্পেসিফিকেসান ঠিক থাকলে, তবেই তুমি কিনবে। পঙ্কজের মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে, তোমার পজিশান সেইভাবে বাড়িয়ে দিতে না পারলে, সমানে সমান হবে কি করে ? ফাইভ ডেজ এ উইক। উইক-এণ্ডে দ্'জনেবেড়াতে চলে যাবে মুসৌরী। তোমাদের দ্'জনের সুখের জীবন আমার চোখের সামনে ভাসছে। বিদায় নেবার সময় এসে গেছে বাবা। মানুষ কেন আসে জানো ? যে আগে আসে, সে বন কেটে বসত বসায়, ফল ফুলের গাছ তৈরি করে। দীঘি কাটায়। রাস্তা তৈরি করে। সে জানে, পেছনে আসছে তার উত্তর পুরুষেরা। পূর্ব পুরুষ যদি তার কর্তব্য পালন না করে, উত্তরপুরুষ কেন তাকে মনে রাখবে। তুমি বলছিলে না, মৃত্যু বলে কিছু নেই। সত্যিই নেই। আমি যখন নেই, তুমি তখন আছ। আমার মৃত্যু আছে। মানুষের মৃত্যু নেই। তোমাদের বিবাহে এই আমার যৌতুক। যাও, তোমার অনেকটা সময় আমি নিয়ে নিলুম। বুড়ো হচ্ছি, কথা বলতে বড় ভাল

লাগে। একটা কথা, আমার এই পরিকল্পনার কথা তুমি কাউকে বলবে না।

দরজার কাছে চলে এসেছি, এম. ডি ডাকলেন, হ্যাঁ শোনো।

তুমি প্রবীর বলে কাউকে চেনো ? আর্টিস্ট।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মামার বন্ধু।

ওঁর বোন খুব ভালো গান করেন, ভক্তিমতী মহিলা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকেও আমি চিনি।

হ্যাঁ, ওঁরা তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। প্রবীরবাবুকে আমি আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে চাকরি দিচ্ছি। আর ওঁর বোন উষাকে দায়িত্ব দিচ্ছি, আমাদের সেই অরফ্যানেজের। কেমন হবে !

উঃ সাংঘাতিক হবে। এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবা যায় না।

তুমি আজ যাবে আমার সঙ্গে, সেই অনাথ আশ্রমে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন যাব না !

তা হলে তোমাকে আমি ঠিক সময়ে ডেকে পাঠাব।

লেবরেটারিতে চা-পর্ব চলেছে। জীমূতবাবু শিকারের গল্প বলছেন। সবাই চোখ বড় বড় করে শুনছেন। জীবনের প্রথম শিকার। চিফ কেমিস্ট দূরের একটা টেবিলে বার্ণারে কি একটা চাপিয়েছেন। বিকারে সেই নীল মত পদার্থটির মেজাজ তেমন শান্ত নয়। কাচের রড দিয়ে চমকে দিলেই ফ্যাঁস-ফোঁস করে উঠছে।

জীমূতবাবুর বাবা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। উত্তর ভারতের জঙ্গলে গিয়েছিলেন বাঘ শিকারে। মাঁচা বেঁধে পিতাপুত্রে বসেছেন। নিচে খোঁটায় বাঁধা কিল মাঝে মাঝে ব্ল্যা, ব্ল্যা করে ডাক ছাড়ছে। চাঁদের আলোর রাত। যথা সময়ে বাঘ এলেন।

এই পর্যন্ত বলে জীমূতবাবু গেলাসে বেশ লম্বা একটি চুমুক মারলেন। সবাই একসঙ্গে, তারপর তারপর, করে উঠলেন।

তারপর বাঘ এসে, আমাদের দিকে মুখ করে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল, ছাগলটা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর আমারও আর মনে নেই।

আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, মনে নেই কেন ? এমন একটা ঘটনা ভুলে গেলেন !

ভুলে যাব কেন ? আমিও অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, তখন শেষ রাত। চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে গাছের আড়ালে। ছাগলটা অজ্ঞান অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর বাঘটা ?

বাঘ ফিরে গেছে জঙ্গলে। বাঘ এসেছিল ভরা পেটে। ছাগল স্পর্শ করেনি। আর চাঁদের আলোয় বাঘের ওই সৌন্দর্য দেখে, বাবা আর গুলি করতে পারেন নি। সামনাসামনি বাঘ দেখলে মনুষ্য জন্মে ঘেন্না ধরে যাবে। এই হল আমার প্রথম ব্যাঘ্র দর্শন।

জীমূতবাবু উঁচু টুল ছেড়ে উঠে পড়লেন। মনে হল, দেরাদুনে আমাদের জমবে ভাল। একটু এগোলেই জিম করবেটের কুমায়ুন। সঙ্গে থাকবেন রবিবাবু।

রবিবাবু ব্যাগ থেকে পাতলা একটা ম্যাগাজিন বের করে আনলেন। পাতা উলটে আমার চোখের সামনে ধরে বললেন, তোমার লেখা ?

আশ্চর্য ! আমারই তো লেখা ! অনেক দিন আগে পাঠিয়েছিলুম। একটা ছোট গল্প। আমার কাছে এখনও কপি আসে নি। আমারই নাম, বড় বড় হরফে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি।

আমার পিঠে হাত রেখে, কানের কাছে মুখ এনে রবিবাবু ফিসফিস করে বললেন, বেশ লিখেছ। ছেড়ো না, চালিয়ে যাও। ওপাশে বুম্ করে একটা শব্দ হল। চিফ কেমিস্ট ভয়ে পিছু হটতে শুরু করেছেন। বিকারের সেই নীল পদার্থ উষ্ণ পীতাভ রং ধারণ করে ফুটতে শুরু করেছে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে
কাল হল তাঁতীর হেলে গরু কিনে

সন্ধে হয়েছে। মেঘ থমকান আকাশ। রাস্তার বাতি কেমন যেন মনমরা হয়ে জ্বলছে। দূর থেকে দেখছি বাড়ির সামনে বিদঘুটে চেহাবার একটি লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইনি আবার কিনি। গায়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবি। ফিন ফিন করছে। এমন কাপড়ের পাঞ্জাবি বিশেষ এক শ্রেণীর লোকেরাই পরেন। পাঞ্জাবিটার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে. তা না হলে এত কুঁচকে যেত না। তোবড়ান গালের দুপাশে গালপাট্টা নেমেছে। চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গেলেও, মণি দুটো সাপের মত জ্বলছে। পাকানো চেহারার অদ্ভুত একটি লোক, হেলে পড়া ল্যাম্প পোস্টের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাটা কেমন যেন ছম ছম করে উঠল। কিছু কিছু মানুষের শরীর থেকে অদৃশ্য একটা তরঙ্গ বেরতে থাকে, অনেকটা মৃত্যুবশ্মির মত, ক্লোরোফর্মের মত। শরীর অবশ করে দেয়।

লোকটিকে পাত্তা না দিয়ে সদরে এসে দাঁড়ালুম। কড়া নাড়তে যাচ্ছি, রাস্তার অপর পার থেকে লোকটি মিহি গলায় বললে, শুনছেন।

হাত যেন অবশ হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে, জিজ্ঞেস কবলুম, আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ সার আপনাকে। এই বাড়িতে থাকেন ?

এগিয়ে গিয়ে, লোকটিব সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, কেন বলুন তো ?

শরীর থেকে বাসী আতরের ঘিনঘিনে গন্ধ বেরচ্ছে। মুখে অস্পষ্ট পেঁয়াজ আর রসুনের বাস।

প্রফুল্লবাবু এই বাড়িতে থাকেন !

হ্যাঁ থাকেন, এখন নেই।

তাঁর স্ত্রী আছেন ?

কেন বলুন তো ?

খুক্ খুক্ করে কেশে, গলা পরিষ্কার করে, সেই সন্দেহজনক লোকটি বললে. আমার একটু দরকার ছিল।

আপনি কে ?

আমি একজন লোক।

একজন অপরিচিত মানুষ, হঠাৎ এই ভর সন্ধেবেলা কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারে ?

তেমন কোনও খবর থাকলে পারে বই কি স্যার !

আমি তাঁর ভাইপো, আমাকে বলতে পারেন।

তা স্যার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সে সব কথা হতে পারে না। অনেকক্ষণ এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে। দোতলার জানলায় একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন, বেশ সুন্দরী, একবার চোখাচোখি হতেই সরে গেলেন। ভাবলেন কোনও খচ্চর লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আঃ, কি যা-তা কথা বলছেন ?

ভুল হয়ে গেছে স্যার। লাইনের লোক তো ! ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। তা স্যার, একটু বসা দরকার। এক গেলাস জল, এক কাপ চা।

চলুন, আমরা কোনও দোকানে গিয়ে বসি।

কোন্ দিকে, বলে, যেদিকে দোকান, লোকটি তার উলটো দিকে তড়বড় করে হাঁটতে লাগল। ডেকে বললুম, ও দিকে নয়, এই দিকে।

সন্ধে বলে এখনও পর্যন্ত বাড়ির কারুর নজরে পড়িনি। মেয়েরা মনে হয়, গা ধুচ্ছে নয় তো সন্ধে দেখাচ্ছে।

বিষ্টুর চায়ের দোকানে এই সময়টায় তেমন খদ্দের থাকে না। দোকান জমবে রাত আটটার পর।

দশটা বাজবে এগারোটা বাজবে, গুলতানি চলতেই থাকবে। সখের অভিনেতা বিশুদা এসে বসবেন, এই এতখানি রাজপুত্রের মত চেহাবা নিয়ে। বড় মজার মানুষ।

লোকটি দোকানের বেঞ্চিতে বসেই, অর্ডার দিলেন, এক গেলাস জল দাও ভাই। জল শেষ করেই বললেন, বাঃ, ভালো কেক রয়েছে। দেখি ভাই একটা কেকের মাথা দাও, একটা ডবল হাফ চা।

হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল বোধ হয়, আপনি কিছু খাবেন না স্যাব?

চা খাবো। বিষ্টুদা, আমাকে শুধু চা।

বিষ্টুদা প্রথম থেকেই ভুরু কুঁচকে লোকটিকে দেখছে। কিছুতেই আমার সঙ্গে মেলাতে পারছে না। দোকানের একেবারে পেছন দিকে দুজনে মুখোমুখি বসেছি। কি গেবো! লোকটির গায়ের গন্ধ অসহ্য লাগছে। এক মশাবিতে এব সঙ্গে শোবে কে? কাকীমা সেদিন হঠাৎ একটা অসভ্য কথা বলে ফেলেছিলেন, সব হাঁড়িরই সরা জোটে পিণ্টু? মহিলাদের মাঝে মাঝে মুখ বড় আলগা হয়ে যায়। আব এটা সাধারণত হয় হু হু দুপুরে। লাল মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়ে, পান চিবোতে চিবোতে। মেঝে থেকে উঠে যাবার পর, পড়ে থাকে খোঁপাব তেলের দাগ, শবীবেব ঘামেব ছাপ। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষেব মন খাবাপেব কত আযোজন। মন আকর্ষণেব কত বকম ফাঁদ।

কেকেব মুণ্ডু থেকে একটা টুকবো ভেঙে নিয়ে মুখে পুবে ওস্তাদ বললে, কতদিন হল?

কি কতদিন হল?

প্রফুল্লবাবু কতদিন হল, ফেরেননি?

বেশ কিছু দিন হল। দিন পনেব কুড়ি তো হবেই।

এতদিন একটা লোক বাইবে, আপনারা কোনও খোঁজপাত কবলেন না।

উনি মাঝে মাঝেই তো এই রকম বাইরে চলে যান, বেশ কিছুদিন পবে, আবার ফিবে আসেন।

অ।

ওস্তাদ এবাব আধখানা কেক মুখে পুবে চিবোতে লাগলেন। আয়েসে চোখ বুজে এসেছে। বিষ্টুদা দু কাপ চা দিয়ে গেলেন। দেবার সময় লোকটির দিকে সেই সন্দেহেব দৃষ্টি। কাছ থেকে বেশ ভাল কবে মুখটা একবাব দেখে নিলেন। দেখাব মতই জিনিস, এ পাড়ায় এই প্রথম আবির্ভাব। অনেকটা লটবপটর খাঁযেব মত দেখতে। খয়ের খাঁও হতে পারে।

চায়ের কাপে ফড়ড় করে একটা চুমুক মেরে ওস্তাদ বললে, এবাবে কি আর ফিববেন?

কেন?

ওস্তাদ আব এক চুমুক চা সেবে বললেন, এ সব কথা ওঁব স্ত্রীর সঙ্গে হলেই ভাল হত।

আপনি কে বলুন তো?

লোকটি ভালো মানুষেব মত মুখ করে বললেন, মনে করুন, আমি স্যাব একজন দালাল।

দালাল? কিসেব? জমি জায়গাব, ওষুধেব?

না আ স্যাব'। ওসব বড বড় ব্যাপার। মেয়ে মানুষেব দালাল। যাত্রা, থিয়েটারে, বিয়ে বাড়ির নাচেটাচে অ্যাকট্রেস সাপ্লাই কবি স্যার।

নিজেকে শামুকের মত খোলে ঢুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মেযেমানুষ শব্দটাই কেমন যেন, তার আবার দালাল। তাঁর পাশে বসে চা খেতে হচ্ছে। কি বলবে, তারই অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে থাকা।

বিষ্টুদাকে তাক করে বললেন, চাটা বেশ ভালই বানিয়েছ ওস্তাদ।

বিষ্টুদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। চায়ের কারবার করলেও খুব ভদ্র মানুষ। যথেষ্ট লেখাপড়া করেন। থিয়েটারের ভীষণ ভক্ত। শরৎচন্দ্র সবচেয়ে প্রিয় লেখক। দোকানের দেয়ালে সার সার ছবি ঝুলছে, শরৎচন্দ্র, দুর্গাদাস, শিশির ভাদুড়ী, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস। একটা উটকো লোকের এই ধরনের আলটপকা কথা গায়ে ছুঁচের মত বিঁধেছে।

লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, ওস্তাদ আর নেই স্যার।

ওস্তাদ কে?

প্রফুল্লবাবুকে আমরা সবাই ওস্তাদ বলি স্যার ! অমন হাত কোথায় পাবেন ? তবলায় যেন খই ফুটিয়ে ছেড়ে দিতেন।

কি বলতে চান, একেবারে পরিষ্কার করে বলুন না।

আমি তো তাই বলতেই চাই। তবে দুবার করে না বলে, একবারে বলতে পারলেই ভালো হয়। চলুন না, ওস্তাদের স্ত্রীর কাছে একবার যাই।

সে উপায় নেই, যা বলার আমাকেই বলুন।

হ্যাঁ, তা হলে বলেই ফেলি। একটা জায়গা থেকে আমরা বাসে করে ফিরছিলুম, আমাদের দলবল নিয়ে। দলে ছিল লক্ষ্মীবাঈ, উমাবাঈ, আমি, হীরাচাঁদ, আরও অনেকে। হীরাচাঁদের সঙ্গে ওস্তাদের একটা খটাখটি চলছিল। দুটো ওস্তাদের মধ্যে একটা মেয়েছেলে পড়লে যা হয়। আপনি স্যার ছেলেমানুষ, এ সব যত কম শোনেন ততই ভালো। লক্ষ্মীবাঈ দু'জনকেই পুষছিল। দুটোরই যেন এঁড়ে লেগে গিয়েছিল। সে সব অনেক ব্যাপার। আপনি স্যার নাবালক, ও সব না জানাই ভালো। চন্দ্রকোণার কাছে বাস যখন এলো তখন মাঝ রাত। হীরাচাঁদ বললে গাড়ি থামাও। উমাবাঈ তামাক খাবে। রাস্তার পাশে বাস দাঁড়াল। তামাকচি তামাক সাজতে বসল। ওস্তাদজি আর ফটকে গেল জল ফেরাতে। গেল তো গেলই, তাদের আর আসার নাম নেই। বাস দাঁড়িয়ে রইল এক ঘন্টা। হীরাচাঁদ আর আমি ঘুরে এলুম। দুজনেই বেপাত্তা।

গল্পটা বেশ ভালই ফেঁদেছে অষ্টাবক্র : টেবিলে টক্‌টক্ আওয়াজ করে বললে, আর এক কাপ চা ছাড়ো ওস্তাদ।

বিষ্টুদা মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছেন। কি করব, সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। চা এসে গেল। চুমুক দিয়ে, জিভে আর দাঁতে এক ধরনের গ্রাম্য শব্দ করে, গল্পের খেঁই ধরলেন, হীরাচাঁদ বললে, দাও, গাড়ি ছেড়ে দাও, ও নিমকহারাম দুটো এখানেই পড়ে থাক। হীরাচাঁদ স্যার বেনারাসের গুণ্ডা, ও যা বলবে শুনতেই হবে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

গল্পের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঘটনা মেলাবার চেষ্টা করলুম। কোথায় চন্দ্রকোণা আর কোথায় কলকাতার মর্গ ! আমি পুলিস হলে, মারতুম ব্যাটার তলপেটে এক কোঁতকা, সত্যি কথা বেরিয়ে আসত হুড়হুড় করে।

সেই ফটককে সেদিন আমি গার্ডেন রীচে দেখলুম, বললুম, বল ব্যাটা, তুই আর ওস্তাদ সে রাতে কোথা বেপাত্তা হলি ? ফটকে আবোল তাবোল বকছে। কোনও কথার সঙ্গে কোনও কথার মিল নেই।

লোকটি চায়ে লম্বা এক চুমুক মেরে, কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। এই মুহূর্তে আমার সেই ভয়টা আবার চেপে এল। এ তো দেখছি পুলিস কেস। খুনের মামলা। ব্যাপারটা এই ভাবে চেপে রাখা যায় না। এরপর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরতে পারে।

আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন, এতদিন পরে ?

বাঃ, খবরটা জানাতে হবে না। এই তো আপনারা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন ! কিছুই জানেন না।

বেশ, যা জানার, তা তো জানা হল, ব্যবস্থা যা করার, তা আমরাই করব। আপনি এখন আসুন তা হলে। লোকটি চোখ মুখ কুঁচকে বললে, স্যার, এর মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাপার ছিল। ওস্তাদের কাছে আমি হাজার দুয়েক টাকা পেতুম। টাকাটা আমার ভীষণ দরকার স্যার। স্ত্রীর কাছে কিছু সোনাদানা থাকবেই। একটা হার, কি একটা বালা ! যা হয় একটা কিছু পেলে, আমি নাচতে নাচতে চলে যাই।

আপনি যে টাকা পেতেন, তার তো কোনও প্রমাণ নেই ভাই।

খুব আছে। বলেন তো ফুলেশ্বরীকে নিয়ে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বো। আপনার বাবার সঙ্গেও তখন দেখা হয়ে যাবে।

ফুলেশ্বরীটা কে ?

আজ্ঞে, সে এক ডাগব মেয়েছেলে। লাইনে সবে এসেছে।

শুনে, আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এ যেন নরকের দূত ! একের পর এক প্যাঁচ মেরে চলেছে। একে ছেড়ে দিলে, যা হবার তা তো হয়েইছে, এরপর ঘোলা জল আরও ঘোলা করে দিয়ে যাবে শয়তান ! নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালুম। এটা পেলে সন্তুষ্ট হবে কি।

শুনুন, এসব কথা ওঁর স্ত্রীকে এখন না বলাই ভাল। আপনি আমার এই ঘড়িটা বরং নিয়ে যান। এখনকার মত কাজ চালান, পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

লোকটি বেশ কায়দার গলায় বললে, কি ঘড়ি ?

ওমেগা গোল্ড।

নামটা তো বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, দামী ঘড়ি। যা তা নয়।

দিন, তা হলে। গোল্ড মানে তো সোনা, আসল সোনা ?

সামান্য একটু খাদ মেশান আছে, তা না হলে ঘড়ির কেস হবে না যে।

ঘড়িটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখেই পাশ পকেটে চালান করে দিলেন। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঘড়িটা পইতের সময় মামা আমাকে দিয়েছিলেন। মাতুলের স্মৃতি আজ হাত থেকে খুলে চলে গেল। মানুষ কি ভাবে উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে যায় ! কোথাকার কে প্রফুল্ল কাকা, হঠাৎ এলেন। এমন এক চরিত্রের মানুষ যাবার সময় জল ঘোলা করে দিয়ে সবে পড়লেন। কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে !

ওস্তাদ বললে, আমি তা হলে আবার কবে আসব স্যার !

আবার আসবেন কেন ?

বাঃ এইতেই হয়ে যাবে না কি ! এটা বেচলে. কটা টাকাই বা আমার হবে ! সাতদিন পরে আসি।

আপনাকে আসতে হবে না, ঠিকানাটা রেখে যান।

ঠিকানা ! লোকটি ইস্পাতের মত হেসে উঠলেন। আমার ঠিকানায় স্যার আপনি পৌঁছতে পারবেন না। সে জায়গায় যেতে হলে আলাদা চরিত্র চাই। আপনি অতি নাবালক। আমিই আসব। জায়গাটা তো চেনাই হয়ে গেল। আসতে কোনও অসুবিধে হবে না। আচ্ছা আজ আসি। রাত হয়ে গেল।

আমাকে কোনও কথা বলার অবসর না দিয়ে লোকটি দোকান থেকে নেমে পড়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল। হাঁটার ধরনটা অনেকটা শিম্প্যাঞ্জির মত। হাত দুটো সামনে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে।

লোকটি চলে যেতেই বিষ্টুদা বললে, আজকাল কি সব লোকের সঙ্গে মিশছ ! চেহারা দেখলেই মনে হয় মাগীর দালাল।

বিষ্টুদার মুখ ভীষণ গম্ভীর। মানুষটিকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। এ পাড়ার সেরা মানুষ। পরোপকারী। পরচর্চায় নেই। দোকানে বসে কেউ পরচর্চা করলে, সোজা হাত জোড় করে বলে দেয়, আপনি দয়া করে আসুন। এ পাড়ার সব ছেলে ভালো হোক, লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পাক, সব সময় এই প্রার্থনা। দীনু যেবার লেটার পেয়ে পাশ করল, বিষ্টুদা সবার আগে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে দেখা করতে ছুটল। ফিরে এলো, চোখের দু কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। যেন নিজের ছেলে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। দোকানসুদ্ধ লোককে বিনা পয়সায় চা আর লেড়ো বিস্কুট খাইয়ে দিল। পরোপকারের শেষ নেই। মেনীদার মেয়ে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে উলটে পড়ে গেল। দুপুর বেলা পাড়ায় কেউ নেই।বিষ্টুদা কোলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল। রক্তে সারা শরীর ভাসছে। বিভূতি মাস্টার মশাই ব্যাচেলার মানুষ। জগাদের বাইরের ঘরে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। বিষ্টুদা ছুটছে, একবার ডাক্তার নিয়ে, একবার ওষুধ নিয়ে, একবার সাবু নিয়ে। বয়স্ক মাননীয় মানুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, বিষ্টুদা ছুটে এসে পায়ের ধূলো নিচ্ছে। পিতা বলেন, এরা হল শাপভ্রষ্ট সাধক। বিষ্টুদা আর বিষ্টুদার স্ত্রীকে পাশাপাশি দেখলে আমার চোখে জল এসে যায়, যেন সাক্ষাৎ হর-পার্বতী ! দোকানের দেয়ালে ঝুলছে, হাসি হাসি মুখ একটি শিশুর ছবি। যার কথা বলতে বলতে বিষ্টুদার চোখ জলে ভেসে যায়। সাত বছরের ছেলে ম্যানেন্‌জাইটিসে মারা গেল। হয়ে গেল প্রায় বছর বারো। কেন

জানি না, সেই মুহূর্তে মনে হল, বিষ্টুদাকেই বলা যায় আমার চেপে রাখা গোপন কথা। হত্যাকারীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি দিনের পর দিন।

বিষ্টুদা বললে, এই সব লোকের সঙ্গে মেশো কেন? তুমি কত বড় বংশের ছেলে জান?

বিষ্টুদাকে হাত ধরে দোকানের পেছনে টেনে নিয়ে গেলুম। বুঝতে পারছেন না আমি কি করতে চাইছি। অবাক হয়ে গেছেন। দোকানে এখন একটিও খদ্দের নেই। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

এইখানে বসুন। ভীষণ জরুরী কথা আছে।

বিষ্টুদা বেশ ভয় পেয়ে গেছে, কি ব্যাপাব বলো তো!

খুব একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছি।

পুরো ব্যাপারটা বিষ্টুদাকে বললুম। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এমন কি এই লোকটির আসা, ঘড়ি খুলে দেওয়া সব বলতে পেরে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল।

সব শুনে বিষ্টুদা অ্যা হ্যাঃ হ্যাঃ, চুক চুক করে একটা আক্ষেপের শব্দ করলেন। তোমার মত বোকা ছেলে পৃথিবীতে আব দুটো নেই। ঝট্ করে ঘড়িটা খুলে দিয়ে দিলে! আমাকে বলবে তো। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

কি কববো? লোকটাকে থামাতে হবে তো। কাকীমাকে আমি জানতে দিতে চাই না।

শোনো, শোনো, খবরটা চেপে রাখা খুব অন্যায় হবে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে বিধবা হতে হয়। শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হয়।

অপঘাতে মারা গেলে শ্রাদ্ধ হয় না।

বিধবা তো হতে হয়।

যিনি মারা গেছেন তিনি কি মানুষ ছিলেন? তেমন মানুষ হলে একশোবার বিধবা হওয়া চলে।

বিষ্টুদা জিভ কেটে বললেন, ছি ছি, সব মানুষই ভাল। বিচার করার অধিকার তোমার নেই। স্ত্রীর কাছে যে কোনও স্বামীই দেবতা। তা যদি না হত, তোমার বউদি আমাকে লাথি মেরে চলে যেত। কত বড় ঘবের মেয়ে! গান শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। রূপও বড় কম ছিল না।

জহববাবুব কথা মনে আছে, আজ বছর সাতেক বেপাত্তা। আপনার ধারণা সে বেঁচে আছে!

ধরলুম বেঁচে নেই, তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি?

জহরবাবুর বউ বিধবা হয়েছেন? শাস্ত্রে আছে, কত বছর যেন অপেক্ষা করে তারপর শাঁখা সিঁদুর ছাড়তে হয়।

তুমি যখন জানই তখন শুধু শুধু পাপের ভাগী হবে কেন?

আপনি এই মহিলাকে দেখেন নি। দেখলে আমার মত আপনারও একই ইচ্ছে হত। যিনি প্রতি মুহূর্তে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখছেন, কি করে যমদূতের মত তাঁর সব স্বপ্ন চুরমার করে দেওয়া যায়, আপনিই বলুন। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায়। ষোল সতের বছর চলুক না এই ভাবে।

তোমার বুদ্ধি এখনও বহুত কাঁচা। তোমার কাকার কথা ভেবে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। একটা মানুষ এই ভাবে চলে যাবে, কেউ একটু চোখের জল ফেলবে না, কেউ তার জন্যে সাদা কাপড় পরবে না। পৃথিবী কি এতই অকৃতজ্ঞ। আমাকে ভার দাও, আমি মর্গ থেকে লাশ খালাস করে আনি।

সে কি আর আছে না কি!

ছি ছি, এ তুমি কি করলে পিন্টু। শেষ দেখা দেখতে দিলে না, শেষ কাজ করতে দিলে না। কেন বল তো!

আমি এতক্ষণ আপনাকে কি বললুম!

তুমি নিজেকে এখনও ধরতে পার নি পিন্টু। তুমি বিশ্রী একটা ঝামেলার ভয়ে এত দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে। থানা, পুলিস, মর্গ, শ্মশান, সৎকার, কান্নাকাটি এই সব এড়াবার জন্যে নিজের মত একটা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে ধাপ্পা দিলে। সংসারের সব কিছুকে কি ওই ভাবে এড়িয়ে যাওয়া

য়ায়। তুমি আমাদের সত্যেনের মত করলে। বাপের শ্রাদ্ধের পর ফিরে এল। এসে বললে, টেলিগ্রাম, চিঠি কিছুই পায় নি। আর দুম করে তুমি হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিয়ে দিলে। কি লোক, কোন লোক, কোথাকার লোক কিছুই দেখলে না! আমাকে একবার বলতেও তো পারতে!

ওর সামনে বলি কি করে?

যাক যা গেল তা গেল। খুব সাবধান! ও আবার আসবে, তোমার কাছেই আসবে। ও বুঝে গেছে, কোথাও একটা গোলমাল আছে। একে চাপ দিলেই মাল বেরবে। তুমি সোজা বাড়ি যাও। প্রথমে তোমার বাবাকে সব খুলে বলো। তোমার কাকীমাকে তিনিই বলবেন। প্রয়োজন হলে আমাকে ডেকো। জান তো চাপা জিনিস ফেটে বেরোয়।

বিষ্টুদা, আমি এখন বলতে গেলে, সবাই বলবেন, তুমি তখন বললে না কেন? একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। তার চেয়ে সাত দিন পরে ওই ব্যাটাই আসুক এসে বলুক।

অ্যাঃ তুমি একটা অসৎ লোকের খপ্পরে চলে গেলে!

গেলুম কই, সোজা এসে এবার কাকীমার সঙ্গে দেখা করুক।

খবরদার না। এ সব লোককে বাড়ির অন্দর মহলে একেবারে ঢুকতে দেবে না। এরা সব পারে। এরা ঘরের মেয়েকে বাইরে বের করে পেট চালায়। আমি যদি একবার টের পেতুম তোমাদের এই সব হচ্ছে, সোজা থানায় গিয়ে পুলিস ডেকে আনতুম।

নীল লুঙ্গি পরে অঘোরবাবু দোকনে ঢুকলেন। বিষ্টুদা ঠোঁটে আঙুল রেখে বুঝিয়ে দিলেন, চুপ আর একটাও কথা নয়!

পার করো দয়াল, আমায় কেশে ধরে
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ হল। পরক্ষণেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মাতুল আসছেন। একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখে সেই মনোরম হাসিটি লেগে নেই। সাজ পোশাক অবশ্য রাজপুত্রের মতই আছে। শরীর ঘিরে ফুরফুরে সুবাস।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কি খবর তোমাদের?

আজ্ঞে, মোটামুটি ভাল। আপনার খবর?

তোর লজ্জা করে না, এলেই যত খবর নেবার ঘটা। কেন, একবার যেতে পারিস না!

সেই সাত সকালে বেরিয়ে যাই। সারাদিন ল্যাবরেটরিতে বার্নারের সামনে, অ্যাসিড, অ্যালক্যালি ফিউমস। ফিরি যখন শরীরে আর কিছু থাকে না।

বাবা, তুই যে দেখি বুড়োদের মত কথা বলছিস! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর চাকরি করবি কি করে? রবিবারেও তো আসতে পারিস?

আপনি থাকেন?

আমি না থাকলে, আর কেউ নেই? তোর দাদুর খবর জানিস?

কি খবর?

তিনি বানপ্রস্থে যাবার জন্যে প্রস্তুত। গেরুয়া ছাপান হয়ে গেছে। রঙটা মনে হয় ভালো ছিল না, তাই তেমন লাল হয়নি।

হঠাৎ বানপ্রস্থ! রাগারাগি হয়েছে বুঝি!

না, রাগারাগি হবে কেন, বৈরাগ্য এসেছে!

কোন্ বনে যাবেন? বন আর আছে, তেমন ফলমূলঅলা ভাল বন?

সারা ভারতে ওঁর তো একটাই ফেভারিট জায়গা আছে রে, হরিদ্বার। কংখল, হর-কি-প্যারী, লছমনঝুলা, কালী-কম্‌লিকা ধরমশালা। বার তিরিশ হরিদ্বার গেছেন আর একবার না হয় যাবেন। পিতৃদেব কোথায় ?

বাজারে গেছেন।

এত রাতে বাজারে !

আজ্ঞে রাত সম্পর্কে ওঁর ধারণা অন্য। ওঁর জীবনে রাত নেই। যত রাত বাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

একটু চা-টা খাওয়াবি, না, সে সব পাট উঠে গেছে।

না উঠবে কেন ? এ তো চায়েরই বাড়ি। টি হাউস।

তাহলে কড়া করে এক কাপ নামা দেখি। হৃদয়ে যেন লাথি মারে।

সে আবার কি ?

ও ইংরিজি করে না বললে বোঝা যায় না বুঝি ! চায়ে যেন বেশ কিক্ থাকে। কিকিং টি।

রান্না ঘরে গিয়ে খুটুর খুটুর করছি। মুকু পাশে এসে দাঁড়াল। আজকাল একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি, মুকু কি যেন একটা বলতে চায়। গভীর গোপন কোনও কথা। মনে আতঙ্ক পুষে রেখেছি। সরলকেও জটিল মনে হচ্ছে। হয় তো কিছুই বলার নেই। যাবার দিন এগিয়ে আসছে, তাই হয়ত কাছাকাছি এসে, এতদিনের দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে।

চুলে আজ তেল পড়েছে। টান টান খোঁপা। দু-চোখে কি একটু কাজল টেনেছে। মুকুর মেক-আপে নিশ্চয়ই আজ কাকীমার হাত পড়েছে। কোথায় তিনি ? কয়েক দিনের দুশ্চিন্তায় মুকুর মেদ এখন বেশ ঝরে গেছে। চেহারায় কনকের আদল এসেছে। কনক এতকাল মেদভারে মুকু হয়েছিল।

মুকু বললে, তুমি সরো, আমি চা করে দিচ্ছি। শুধু চা, আর কিছু খাবেন না ?

তুমি জিজ্ঞেস করে এস তো, তাহলে আচ্ছা করে ডবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে দি।

মুকুকে আর যেতে হল না। আমার মামা কি এক জায়গায় চুপ করে গোমড়া মুখে বসে থাকার ছেলে, চুপি চুপি মুকুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুকু টের পায়নি। ইশারায় জানালেন, বলো না। তারপর মুকুর কানের পেছন দিকে ফুস্ করে ফুঁ মারলেন।

মুকু চমকে উঠেছে। মাতুলের সে কি হাসি ! হোহো, হাহা, হিহি।

লাফাতে গিয়ে মাতুলের পায়ে বোধহয় মুকুর পা ঠেকেছিল। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রণাম করল। কেউ প্রণাম করলে, কেউ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখালে মাতুল একেবারে মহাদেব। চিবুক ছুঁয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা। জীবনে সুখী হ।

শুকনো আশীর্বাদে মাতুল সন্তুষ্ট হবেন ! তিনি কি আমার মায়ের তেমন ভাই ! বুক পকেট থেকে খুলে নিলেন সোনার পার্কার কলম, এই নাও, পুওর ম্যানের পুওর প্রেজেন্টেসান। এমনি করেই স্মৃতি ছড়িয়ে যাই।

মুকু কলমটা হাতে নিয়ে ভাবছে, নেওয়া উচিত হবে কি না। কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে।

মাতুল গান ধরেছেন,

> এই কথাটি মনে রেখো,
> তোমাদের এই হাসি খেলায়
> আমি যে গান গেয়েছিলাম
> জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়
> শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
> অনাদরে অবহেলায় ॥

মাতুলের গলা সামান্য ধরে এলো। তবু গাইলেন, দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে/সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে।

পরের লাইন আর উচ্চারণ করতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে কান্না বেরিয়ে এলো। পকেট থেকে রুমাল

বের করে চোখ ঢেকে মুখ নিচু করলেন। একটা হাত লম্বা টেবিলে, শরীর হেলে গেছে বাঁ পাশে।

এমন আবেগ আগে কখনো দেখিনি। আজ কি হল! কথা বলতেও সাহস হচ্ছে না। পিতৃদেব পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাতে বাজারের ব্যাগ। এত বড় ব্যাগ একমাত্র তিনিই তুলতে পারেন, বইতে পারেন।

ব্যাগটা কোনও মতে মাটিতে নামিয়ে, তিনি বললেন, কি হল জয়?

মাতুল চোখে রুমাল চাপা অবস্থায়, মুখ তুলে বললেন, আই অ্যাম এ ব্রোক।

ব্রোক? তার মানে?

আই অ্যাম ফিনিশড্।

ফিনিশড্? তার মানে?

চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন, চলুন, বলছি।

আমরা সেই শোকের মুহূর্তেও নিজেদের কর্তব্য ভুলিনি। সমস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, আদা আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ডবল ডিমের ওমলেট চলবে ত মামা! ঘাড় নাড়লেন। তার মানে, হয়ে যাক। বাজার-ব্যাগ থেকে লকলকে সবুজ পেঁয়াজকলি বেরিয়ে আছে।

মুকু কলমটা আমার হাতে দিয়ে বললে, কি হবে?

কি আবার হবে! তুমি রেখে দেবে যত্ন করে, দামী জিনিস। মাঝে মাঝে লিখবে।

কোনও কিছু নিতে আমার ভীষণ লজ্জা করে। এটা তুমি নাও। ওনার মন ভাল হলে, পরে বরং ফেরৎ দিও।

তা কখনও হয়, মামাকে তুমি চেন না। রাগলে একেবারে অন্য মানুষ। মুকু, কাকীমা কোথায়?

ও, তোমাকে বলা হয়নি, আমাকে বলে গেলেন, মনটা বড় খারাপ, একবার মামাশ্বশুরের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

কখন গেছেন?

তা বেশ কিছুক্ষণ হল। পাঁচটা নাগাদ গেছেন।

একা একা চলে গেলেন?

হ্যাঁ, আমাকে বললেন, হাতে নাকি একটাও পয়সা নেই।

পয়সা নেই, তা আমাকে বলতে কি হয়!

তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন? আমি কি জানি বলো?

তোমার ওপর রাগ করিনি। মানুষের জন্যে যতই কর না, পর কখনও আপন হয় না, নেভার!

সে যদি বলো, কাকীমা যেমন তোমার পর, ওদিক থেকে তুমিও ত কাকীমার পর! সম্পর্ক হাওয়ায় ভেসে থাকতে পারে না। সম্পর্ক রক্তের, সম্পর্ক দাবির। এক হয় জন্মসূত্রে, আর একহয় আইনের বাঁধনে। তুমি কি একবারও কাকীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

না, তা অবশ্য করিনি। মানে আমার ভাবনায় আসেনি।

তবে! শুধু শুধু অভিমান!

আমাকে আপনার লোক ভাবতে পারলে, নিজেই চাইতেন।

তা হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপারটা অত সহজ নয়! অনেকে পাওনা টাকাই মুখ ফুটে চাইতে পারে না। লোককে ধার দিয়ে নিজে উপোস করে মরে।

ঠিক আছে, আজ উনি আসুন। কত বড় কাকীমা হয়েছেন আমিও দেখছি।

মুকু পেঁয়াজ আর আদা কুচোতে বসে গেল। পেছন থেকে দেখলে অবিকল কনক। কোথায় যে গেল মেয়েটা? যদি কোনও দিন দেখা হয়, বাপের নাম ভুলিয়ে দোব! যদি মারা গিয়ে থাকে! কি হবে কনকের কথা ভেবে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া। এ জগতে কে কার?

ওমলেট নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই শুনলুম, পিতা বলছেন, তোমাকে আমি বার বার বারণ করেছিলুম কিনা?

মাতুল বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ করেছিলেন।
শুনেছিলে ?
না।
তা হলে এখন ভোগো। তুমি তো জীবনে কারুর কথা শোনো না জয়। তোমার তালে তাল না দিলে তুমি রেগে অগ্নিশর্মা হও। তুমি যখন কারুর কথা শোনো না, তোমার কথা আমরা শুনবো কেন ?
আমি এখন তা হলে কি করব ?
যেখানে যা যেমন আছে পড়ে থাক, তুমি আবার তোমার জগতে ফিরে যাও। জীবন থেকে এই কটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে দাও।
আমার এত টাকা ইনভেস্টমেন্ট সব যাবে ?
যাবে, কি আর করা যাবে ! আবার নতুন করে শুরু কর। Remember the faith that took men from home.
পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওমলেট দেখিয়ে বললেন, নাও খেয়ে নাও, তোমাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ইউ আর নট ইওর ফর্মার সেল্‌ফ।
মাতুল ডিমটা টেনে নিলেন। চামচেটা আর একটু হলেই মেঝেতে পড়ে যেত। পিতা পায়চারি করতে করতে আর একটি লাইন বললেন, At the call of a wandering preacher. ঘরের ও মাথা থেকে এ মাথায় আসতে আসতে বললেন, Our age is an age of moderate virtue/And of moderate vice/When men will not lay down the cross/Because they will never assume it/Yet nothing is impossible nothing./To men of faith and conviction./Let us therefore make perfect our will./O god, help us.
পিতা মাঝে মাঝে শিশির ভাদুড়ী হয়ে যান। থামতেই জিজ্ঞেস করলুম, চা খাবেন ?
নিশ্চয় খাবো।
চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আবার নতুন করে শুরু করো। সঙ্গীতই তোমার জীবন, নট দ্যাট সিনেমা। মাতুল কাঁচা লঙ্কা চিবিয়েছেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, শিগ্‌গির, এক গেলাস জল।
চায়ে চুমুক দিয়েই মাতুল, বাপ্‌ বলে উঠলেন। ঝালের মুখে চা, ব্রহ্মরন্ধ্র ছ্যাঁদা করে দেয়।
পিতা বললেন, তোমার খাবার কমবিনেশানটা তেমন ভাল হল না। ডিমের পরে চা। অ্যান্টি প্রোটীন হয়ে গেল।
ও আমি প্রায়ই খাই। কিছু হবে না।
যখন হবে তখন আর সামলাতে পারবে না, এই সিনেমা করার মত হবে। আচ্ছা তোমার ত একটা বাজেট ছিল ?
ছিল বই কি ?
তা হলে এমন ভাঁড়ে মা ভবানী হয়ে গেলে কি করে ?
এ লাইনে এত জোচ্চোর ঘোরে কে জানত ! সেট সাজাবার জন্যে একটা শুকনো গাছের ডাল সাপ্লাই করে, দুশো টাকা বিল করে দিলে। একটা স্টেথিসকোপের ভাড়া, তিনশো টাকা, নতুন কিনলে তিরিশ টাকা।
তুমি এ সব জানতে না ?
কি করে জানব, আমি তো এ লাইনে একেবারে নতুন !
তুমি ঈশপস্‌ ফেব্‌লটাও যদি একবার ভালো করে পড়তে, লুক্‌ বিফোর ইউ লিপ।
আমার এক লাখ টাকা ভুষ্টিনাশ হয়ে গেল। ছবি হয়েছে ওয়ান ফোর্থ।
এইভাবে ওড়াতে ওড়াতে চললে, কত লাখে গিয়ে শেষ হবে ?
তিনের কমে নামবে না।
তুমি ফিরে এসো জয়। এর চেয়ে তুমি আসামের জঙ্গল থেকে একটা হাতী কিনে পুষলে, অনেক

বেশি রোজগার করতে। তোমাকে আমি সম্বলপুরে, আমার বন্ধুর ফরেস্টে পাঠিয়ে দিতুম, সেখানে কাঠ ক্যারি করে, তোমার হাতী তোমাকে সারা জীবন খাওয়াত। বউমার গয়না সব গেছে ত ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইস্, ইস্।

বাড়ি মর্টগেজ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বহত আচ্ছা। তুমি ত তা হলে অনেক দূর এগিয়ে গেছ হে !

কোন্ দিকে ?

লোটা-কম্বলের দিকে। একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়। ভগবানদত্ত গলা, চেহারাটিও রাজপুত্তুরের মত। নেচে নেচে গাও, নেচে নেচে গাও,

পার করো দয়াল,
আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি
ঘোর সাগরে ॥

ওমলেট আর চায়েব অ্যাকসান অন্যভাবে শুরু হল। মাতুল বললেন, রাইজ আই মাস্ট। বই আমি শেষ করবই।

তাই যদি করবে, তা হলে আমার কাছে ছুটে এলে কেন ?

বড় আপন ভাবি বলে, পিতার চেয়েও আপনজন।

সাঁই করে তীর ছেড়েছেন, পিতার সেন্টিমেন্টে। পিতার কাছে কেউ সারেণ্ডার করলে, তিনি পর্বতের মত তাকে আগলে রাখবেন।

শেষ করতে গেলে, তোমার দু-লাখ চাই।

দেড়ে আমি ম্যানেজ করব।

দেড় পাবে কোথায় ?

মধুপুরের বাগান বাড়িটা বেচে দোব।

অসম্ভব ! মধুপুরের বাড়ি বেচবে কি হে ! সে বাড়িতে কত স্মৃতি থই থই করছে ! ইমপসিব্‌ল ! বাঙালীর এমনই নাম হয়েছে, বাড়ি-বেচা-বাঙালী। সারা কলকাতাটা বেচে দিয়ে বসে আছে।

মধুপুরে আমরা বছরে ক'বার যাই ! এরপর ওই মালির ফ্যামিলিই বাড়িটা দখল করে নেবে।

তুমি যখন বেচবে ভেবেছ, তখন তুমি থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান যুক্তি খাড়া করবে। আমার মত নেই। আমি কনস্ট্রাকটিভ, ডেসট্রাকটিভ নই।

আহা, আপনি একটা জিনিস ভুল করছেন, ছবিটা লেগে গেলে, কত লাখ আসবে একবার ভেবে দেখুন। তখন ওই বাহান্ন বিঘের দিকে, আপনার সেই প্রিয় বাগান বাড়িটা এক কথায় কেনা যাবে। অনেক বেশি জায়গা, অনেক ভালো এলাকা।

এ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টেন ইন দি বুশ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলে আমি বিশ্বাসী নই।

এ ছাড়া টাকা তোলার আমার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই।

টাকা টাকা করছ, মধুপুরের বাগান বেচে তুমি কত পাবে বলে মনে কর ! কে কিনবে ?

আমার এক অ্যাটর্নি বন্ধু।

অফার কত ?

বাড়িটা আগে দেখুক।

তোমার কি মনে হয় ?

হাজার চল্লিশ।

অ্যাবসার্ড। ওখানে অত দাম পাবে না। এ কি তোমার কলকাতা !

জমি জায়গার দাম সব জায়গাতেই বাড়ছে।

যতই বাড়ুক, তোমাকে ছাড়তে হলে থ্রো-অ্যাওয়ে প্রাইসেই ছাড়তে হবে। একে বলে ডিসট্রেস সেল। ধরলুম তুমি চল্লিশই পেলে, বাকি এক লাখ ষাট ? তোমার ত লাখ লাখের ব্যাপার।

আমাদের বাড়িটাকে সেকেণ্ড মর্টগেজ।

বহুত আচ্ছা। শুধু ডোবা নয়, একেবারে ভড়ভড় করে ডোবার ব্যবস্থা ! বেশ বেশ তারপর ?

তারপর আপনি।

আমি ? আমার ঝুলিতে কি আছে জয় ! সবই ত ডাক্তার আর পাওনাদারে শেষ করে দিয়েছে। পর পর মৃত্যুর মিছিল চলে গেল জীবনের ওপর দিয়ে।

ক্যাশ না থাক, গোল্ড আছে।

সোনা ?

হ্যাঁ সোনা, দিদির কম সে কম বিশপঁচিশ ভরি সোনার গয়না ছিল।

তুমি বলছ কি জয় ? ও সব অলঙ্কার, এক একটা মাস্টার পিস। এ যুগে ও সোনাও পাবে না, অমন কারিগরও মিলবে না। সেই জিনিস তুমি ছায়া ছবির পেছনে ওড়াবে ?

ওড়াব কেন ? সব আবার ফিরিয়ে আনব। ছবি রিলিজ হওয়া মানেই টাকা আসতে থাকা। পর পর সাতদিন হাউস ফুল হলেই ত হয়ে গেল।

আমি তোমার মত ওই কাচের ফেরিওলার স্বপ্ন দেখতে পারব না, যা এক লাথিতে চুরমার হয়ে যায়। ও সব গয়না আমি আমৃত্যু যক্ষের মত আগলে রাখব। চাও তো এই বাড়িটা বেচে দি।

মাতুল মাথা নিচু করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চারপাশ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় দূর থেকে ভেসে আসছে একটা রিকশার ঘণ্টার শব্দ। টুং টুং করে বাজতে বাজতে এগিয়ে আসছে। মনে হয় কাকীমা আসছেন।

মাতুল মাথা তুলে চারপাশে তাকালেন। বড় অসহায় মুখের ছবি। করুণ কণ্ঠে বললেন, বইটা হাফ কমপ্লিট করতে পারলে ডিসট্রিবিউটার ধরে বাকি টাকাটা আদায় করা যেত।

তোমার ত অনেক বড়লোক ছাত্র ছাত্রী, তাদের ধরো না জয়।

আপনার লোকই আমাকে ফেলে দিচ্ছেন, তারা ত পর ! আচ্ছা, আমি এখন যাই।

মাতুল উঠে দাঁড়ালেন। সেই কোঁচা লোটান রাজপুত্তুর। শরীরটাকে টান টান করে বললেন, আপনি কোনও ফাইনানসার যোগাড় করে দিতে পারেন ? একজন বিজনেস পার্টনার !

আমার পরিচিতরা সবাই স্মলমিন্‌সের মধ্যবিত্ত। তারা হাজার হাজার টাকা পাবে কোথায় ?

মাতুল বললেন, এই হল বাঙালী। মারোয়াড়ী কি গুজরাতী হলে আমার এ সব সমস্যাই হত না। বাঙালী লটারীর টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সিকিউরিটি, সেফ্‌টি এর বাইরে বাঙালীর কোনও শব্দ জানা নেই।

ধীরে ধীরে বিয়োগান্ত দৃশ্যের নায়কের মত মাতুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাত নামছে, রাত। চারপাশের দোর তাড়া বন্ধের আয়োজন চলেছে। দরজা জানালার সংখ্যা ত কম নয়। নিচের দায়িত্বে কাকীমা, ওপরের দায়িত্বে আমরা। ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, কাকীমা বসে আছেন আলসের এক পাশে চুপ করে।

মধ্যরাত। চারপাশে হু হু করছে শূন্যতা। দূরে, বহু দূরে কুকুরের পাল রাত কাঁপাচ্ছে। যারা জাগার তারা ঠিক জেগে আছে, ঝকঝকে চোখ মেলে, অসীম কৌতূহলে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। দেশলাইয়ের বাক্‌সে মানুষের নাচা কাঁদা, ওঠাবসা। অত ঊর্ধ্ব থেকে পৃথিবীর বিশাল বিটপীও আগাছার মত।

কাকীমা খুব শান্তগলায় বললেন, কে পিণ্টু !

আমি যেই হই; আজ আর আমি সাড়া দোব না। আমারও ত অভিমান থাকতে পারে !

মেসোমশাই মুকুকে নিয়ে আজ রাতের ট্রেনে চলে যাবেন।

প্রথমে বলেছিলেন প্লেনে যাবেন। কি কারণে হঠাৎ মতের পরিবর্তন হয়েছে। আমার অগোচরে কোথাও একটা কিছু ঘটে গেছে। ঠিক ধরতে পারছি না, তবে অনুমানে নানা সম্ভাবনা ভেসে ভেসে আসছে। কাকীমা মেসোমশাইকে কেন জানি না এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। আর মুকু যেন প্রহরীর মত বাবাকে চোখে চোখে রেখেছে। গুরুজন। সন্দেহ করা উচিত নয়; কিন্তু বিশ্রী একটা সন্দেহে মন কুঁকড়ে আছে। পৃথিবীর কিছুই দেখিনি, তবু যা দেখেছি, যা শুনেছি তাইতেই চোখ খুলে গেছে। এ বড় বিচিত্র স্থান। এখানে কি যে হয়, আর কি যে হয় না! এখানে জলেও ডিঙি চলে, ড্যাঙ্গাতেও ডিঙি চলে।

এত দিন পরে আমার সেই পুরনো ডায়েরীটা বেরিয়ে পড়েছে। সেই ডায়েরী যেটা কনক লুকিয়ে রেখে আমাকে সেই জবা-পালান রাতে ভীষণ বাঁচিয়েছিল। যে ডায়েরীর পাতায় মায়াকে নিয়ে ভট্টি-কাব্য লিখে নিজের মৃত্যু-বাণ নিজেই তৈরি করেছিলুম। ডায়েরী ওলটাচ্ছি, কত কি পাগলামিই যে বেরচ্ছে। একটা পাতায় কনকের হাতের লেখা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল। আমাকে কেমন লাগে কনক লিখেছে। প্রধান শিক্ষকের ক্যারেক্টার-সার্টিফিকেট যেন! তোমার সবই ভাল, গোটাকতক বস্তু ছাড়া। তোমার ভেতরে একটা অহংকারের ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তুমি ধরতে পার না। তুমি অনেকটা তোমার মামার মত। নিজেকে কখনই অত শ্রেষ্ঠ ভাবা উচিত নয়। এ ছাড়া, তোমার অভিমান! অত অভিমানী হলে পৃথিবী থেকে সরতে সরতে ক্রমে একঘরে হয়ে যেতে হয়।

কনক প্রচণ্ড জ্ঞানীর মত কত কিই যে লিখে রেখে গেছে! একটা পাতায় অদ্ভুত একটা গান লিখে রেখেছি। কোথা থেকে পেয়েছিলুম জানি না। মানুষের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে বড় মিলে যায়। উপায় থাকলে মেসোমশাইকে পড়তে দিয়ে, মুকুর মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতুম।

কোন্ দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই
আমি দেখবো, কোথায় পীর হও তুমি রে,
তীর্থে যাবে সেখানে কি পাপী নাই রে॥
বিবাদী তোর দেহে সকল,
অহর্নিশি করছে রে গোল
যথা যাবি, তথায় পাগল করবে তোরে॥
নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়,
সাথের বাঘে সবারে খায়,
তখন আর কে ঠেকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ছয় জন,
তারা সদাই করে জ্বলাতন
যথা যাবি তথায় জঞ্জাল ঘটাবে রে॥

মেসোমশাই মাঝে মধ্যেই বারান্দায় এসে গাছপালা দেখার ছলে নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মুকু এসে বলত, এখানে কেন, এখানে কেন, বাবা, আপনি ভেতরে যান। মেসোমশাই বলতেন, দাঁড়া না, দাঁড়া না একটু সবুজ দেখি। কাকীমা আড়াল থেকে বারে বারে ওপর দিকে তাকাতেন, আর সরে সরে যেতেন। কাজ থাকলেও কুয়োতলায় আসতেন না।

এ সব আমি দূর থেকে দেখতুম। সবাই ভাবত, আমি কিছু বুঝছি না। সাথের বাঘে সবারে খায়,

তখন আর কে ঠেকায় রে। মেসোমশাইকে সামনে রেখে মানুষ সম্পর্কে আমার এই খেয়ালখাতায় আরও দু'চার কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার কথা নয়। আমার একজন প্রিয় দার্শনিকের কথা। জীবনের মধ্যভাগে যিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। Man is a rope, tied betwen beast and overman. পশু আর অতিমানব যে দড়িতে বাঁধা, সেই দড়িটি হল মানুষ। সেই দড়ি চলে গেছে অতি গভীর এক খাদের ওপর দিয়ে। A dangerous across, অতি বিপজ্জনক এক পারাপার। সাংঘাতিক এক চলার পথ। ফিরে তাকালেই বিপদ। দোদুল্যমান এক রজ্জু। দাঁড়াবারও উপায় নেই। Man is something that shall be overcome. মানুষ এমন এক জীব যাকে পেরিয়ে যেতে হবে। মানুষকে অতিক্রম করতে না পারলে মানুষ হওয়া যাবে না। এ দেশের এক সাঁই লণ্ঠন হাতে মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। মানুষ হয়ে মানুষের কি জ্বালা!

মুকুরা চলে যাবে। আর মনে হয় কোনও দিনই দেখাসাক্ষাৎ হবে না। কি করে হবে? বড় দূর সম্পর্কের আত্মীয়। থাকেও বহু দূরে। মুকু খুবই ব্যস্ত। বাঁধা ছাঁদা চলছে। আমার সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে, যে দিন তিনজনে হই হই করে এলেন। এসেছিলেন এক মেসোমশাই ফিরে যাচ্ছেন আর এক মেসোমশাই। দিন কতক বাড়িটা বেশ ভরে ছিল। কত কি-ই যে ঘটে গেল। কাল থেকে আবার সেই শূন্যতা, সেই নির্জনতা। দ্বিপ্রহরের ছায়া ঘেরা বাগানে উদাস সুরে ঘুঘু ডাকবে। ফাঁকা রান্নাঘরে বেড়াল চেষ্টা করবে দুধের ডেকচির ঢাকা খুলতে। ফোকরে শুরু হবে চড়ুই পাখিদের পারিবারিক কলহ। ঘরের মাঝখানে মুকুদের বাঁধাছাদা জিনিস এখন থেকেই, যাই যাই, বিদায় বিদায় করছে। মুকুই সব করছে। মেসোমশাই গম্ভীর মুখে ইজি-চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন, মনোযোগী পরীক্ষার্থীর মত।

আজ আর বেরনো হল না। শনিবার অর্ধদিবস অফিস মানে বেলা তিনটের সময় ছুটি। পুরো ছুটিই করে নিলুম। চির বিদায়ের আগে এই পরিবারের সঙ্গে শেষ সঙ্গ করে নি। মুকু মাঝেমাঝে আসছে। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে চলে যাচ্ছে। নিচু হয়ে সুটকেস গুচোচ্ছে। বেডিংয়ের দড়ি ধরে টানছে। মেসোমশাইয়ের দুটি মেয়েই বেশ কাজের। ভদ্রলোক বড় রহস্যময়। দুটি মেয়ে যে আছে, নিজের চোখেই দেখলুম। আর কে আছেন তেমন পরিষ্কার হল না এতদিনেও। কাউকে ত একটা চিঠিও লিখতে দেখলুম না। আর কয়েক দিন থেকে গেলেই পারতেন। মুকুর রেজাল্ট বেরোবার সময় হয়েছে। বলার কিছু নেই। রহস্যময় পুরুষের রহস্যময় আচরণ।

রবিবাবু সেদিন আমার মনে অন্য এক ধরনের অ্যামবিশান জাগিয়ে দিয়েছেন। সেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের গল্পটা পড়ে বলেছিলেন, চালিয়ে যাও, তোমার হতে পারে। রবিবাবুকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। এত ধীরে, এত আস্তে কথা বলেন, কানের কাছে মুখ না নিয়ে গেলে শোনাই যায় না। সব সময় হাসি হাসি মুখ। দীর্ঘ, একহারা চেহারা। সাদা ট্রাউজার, জামা ভেতরে গুঁজে পরা। বেশ একটা ইংলিশম্যান, ইংলিশম্যান ভাব। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা একই তরঙ্গে ভাইব্রেট করেন। সেই সব মানুষের নিজেদের মধ্যে বেশ একটা মিল থাকে। তাঁদের একই সঙ্গে মন ভাল হয়, মন খারাপ হয়, সর্দি হয়, কাশি হয়, জ্বর হয়, পেট খারাপ হয়। এঁদের বায়োলজিক্যাল ক্লক একই সময় দেয়। রবিবাবু আর আমি, মনে হয় একই ভাইব্রেশানের মানুষ। স্বভাবের মিলও যথেষ্ট।

মানুষকে মানুষই এগিয়ে দেয়। মানুষই পেছিয়ে দেয়। কেউ উৎসাহিত করেন, কেউ হতাশা আনেন। কেউ মিইয়ে দেন, কেউ তাজা করে দেন। কেউ বলেন, তোমার হবে, কেউ বলেন ব্যর্থ চেষ্টা, তোমার দ্বারা কিছু হবে না বাপু।

রবিবাবুর উৎসাহে একটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফেঁদে ফেলেছি। জীবনে দেখা ত কম হল না! কত রকমের মানুষ! কতরকমের অসুখ! কতরকমের বিচিত্র পরিস্থিতি! জীবনে আনন্দের ভাগের চেয়ে, দুঃখের ভাগই বেশি। এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল। কে যেন বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধের বড় অভাব হে! গল্প পাবে, টনটন কবিতা পাবে, প্রবন্ধের দিকে কেউ বড় একটা যেতে চায় না। কোথায় রামেন্দ্রসুন্দর! কোথায় জগদীশচন্দ্র, কোথায় জগদিন্দ্র! প্রবন্ধভূমি তৃণহীন। খাঁ খাঁ করছে।

পাতা দুয়েক লিখে ফেলেছি। বিষয়বস্তু মানুষ। মানুষের হাতে কম দিন হল মার খেয়ে মরছি! খাবলে খুবলে শেষ করে দিলে। প্রবন্ধটা মনে হয় ভালই জমছে। মানুষের পিণ্ডি চটকে ছেড়ে দাও। একবার জন্মে গেলে, মানুষ নিজেকে আর মানুষ বলেই মনে করে না। মানুষ বলে ভাবতেই ভুলে যায়। নিজেকে মনে করে এক সেট অভ্যাস, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, জীবিকা, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা। ইন্দ্রিয়ের টংকারের এমন ঝঙ্কার, অন্য সুর শোনার উপায় নেই।

কমলনেত্র রাম, শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল রাজগৃহে অলস সময় কাটাতে কাটাতে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। শেষে মনস্থ করলেন, তীর্থ দর্শনে যাবেন। রাজা দশরথ বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। পড়ে গেল সাজো সাজো রব। রাজকুমার রাম যাবেন তীর্থপর্যটনে। সঙ্গে চললেন লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। পর্যটন শেষ করে রাম যথাসময়ে ফিরে এলেন।

রাম গেলেন এক মানুষ, ফিরে এলেন আব এক মানুষ। মুখে হাসি নেই। আহাব বিহার সব ত্যাগ। পদ্মাসনে বসে আছেন সারা দিন। গালে হাত। শরীর কৃশকায়। ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছেন। বাজকুমারের এ কি হল? রাজা দশরথ বড়ই চিন্তিত। ডেকে পাঠালেন বশিষ্ঠদেবকে। হে মুনি! আমার পুত্র কেন এমন খেদান্বিত! দিন দিন কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে চলেছে! বশিষ্ঠ বললেন, রাজন্! চিন্তিত হবেন না। এ অতি শুভলক্ষণ। রাজকুমারের বৈরাগ্যোদয় হয়েছে।

রামচন্দ্রের যখন এই অবস্থা, তখন রাজসভায় এলেন বিশ্বামিত্র। রাজা দশরথ, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমাব প্রয়োজন। রাক্ষসেব উৎপাতে আশ্রমে টেঁকতে পারছি না। রাক্ষস-নিধনেব প্রয়োজন। রাজা বললেন, রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। বিষণ্ণ রামচন্দ্র মুনির সামনে এসে বিরসমুখে দাঁড়ালেন।

রাম বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, অবয়ববিশিষ্ট এই স্থূল শরীরেই মানুষের আত্মবোধের জন্ম। সংসাররূপ মেঘমালার ক্ষণবিধ্বংসি বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুব জীবনে আমাব শান্তিলাভের আশা নেই। এ জীবন শরতের মেঘ, নিঃশেষিত তৈল প্রদীপ, জলতরঙ্গের মত চঞ্চল। পত্রের অগ্রভাবে অবস্থিত জলবিন্দুর মত এই ক্ষণ শরীর যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই ভাল। দীর্ঘায়ুব্যক্তি বৃদ্ধগর্দভ। আয়ুতেই আপদ, অশান্তি, আর বৃথা শ্রমের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল। কালরূপ মূষিক আয়ু কর্তন করে চলেছে। বায়ুভক্ষক সর্পের মত কাল-সর্প আয়ু হবণ করে চলেছে। ব্যাধিঘুণ কুবে কুরে ক্ষয় সাধন করছে। মূষিক-আয়ুর সামনে বসে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মৃত্যু-বিড়াল।

আহা! শ্রীরামচন্দ্রের কি সুন্দর কথা! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রবন্ধ লেখার এই মজা, র‍্যানডাম কোটেশান মেরে যাও। এ যেন পড়তে পড়তে লেখা, লিখতে পড়া। শ্রী রামচন্দ্রের কি হয়েছিল জানি না,আমি হাতে হাতে ফল পাচ্ছি। উদাসীর একতারা বাজছে মনের কোণে কোণে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের এক একটা, হিটলারের মত সায়ানাইড ক্যাপসুল চিবিয়ে, চোখ উলটে উলটে পড়ে যাচ্ছে। যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা কোন রিপুর এক্তিয়ারে পড়ে জানা নেই। সেইটা এই মুহূর্তে বেশ প্রবল হয়েছে। দেখি, রামচন্দ্র কি বলছেন? বালক যেমন বল নিয়ে খেলা করে, কালও সেই রকম নভোমণ্ডলে চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়ে উদয়, অস্তের খেলা খেলছে। কল্পান্তে এই প্রাণী মণ্ডলকে সংহার করে, তাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থিমাল্য গলায় ধারণ করে, কাল পুরুষ মহানন্দে নৃত্য করতে থাকবেন। প্রলয়ের সময় নৃত্যপর এই কালপুরুষের নিঃশ্বাসে ভূর্জপত্রের মত সুমেরু পর্বতও উড়ে যাবে। এই কালই ইন্দ্র, কালই রুদ্র, কালই কুবের, অথচ কালের কোনও রূপ নেই।

হে ঋষি! অগণিত ব্রহ্মাণ্ডমালা যেন পতনশীল ডুমুর ফল, অনন্ত প্রাণীমণ্ডল যেন মশা, আর কাল সেই ডুমুরফল-প্রসবকারী বৃক্ষ।

ত্রেতা ছেড়ে কলিতে চলে আসি। আমিই রাম, আমিই বিশ্বামিত্র। নিজেকেই প্রশ্ন করি, নিজেকে নিজে চিনিস? আলোকিত কাচের আধারে সাজিয়ে রাখা জিনিসের মত নিজের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাস, ইডিয়েট! প্রকৃতি তোকে নির্বোধ করে রেখেছে। চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। অহং-এর খোলে পুরে ভ্রান্ত জ্ঞানের ছলনায় ভুলিয়ে রেখেছে। নিজের শরীরটাকেই ভাল করে চিনিস না, রাসকেল। অন্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ শিরায় শিরায় রক্তের কুলুকুলু প্রবাহ, টের পাস? স্নায়ু কখন কি

ভাবে, কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে জানিস কি ? এই নে চাবি, জ্ঞান-প্রকোষ্ঠের দরজার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ নিচের দিকে। আহা, চমকে উঠিস না। কার ওপর দাঁড়িয়ে আছিস ! the merciless, the greedy, the insatiable, the murderous। অজ্ঞান উদাসীনতায় ভাসমান স্বপ্নখণ্ড। Hanging in dreams, as it were, upon the back of a tiger. বাঘের পিঠে চেপে স্বপ্ন দেখেছিস !

You that have seen man
As god and sheep.
Tearing to pieces the God in man
No less than the sheep in man
And laughing while tearing
This, this is your bliss
A poet's and fool's bliss.

পথে যে কন্টক আছে কি ভাবিলি তার ?/কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়/পর্বত শিখর-শায়ী বিস্তৃত তুষার/কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি/ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্তের জল/হা দুর্বল তুই তার কি ভাবিলি বল।

চমকে উঠেছি। মুকু পেছন থেকে এসে পিঠে হাত রেখেছে।

কি হল ? অমন চমকে উঠলে ?

না, অন্য একটা জগতে ছিলুম ত !

কি লিখেছ অত, পাতার পর পাতা ?

মানুষ।

তুমি লেখ না কি ?

সম্প্রতি চেষ্টা করছি।

চেপে গেলুম। গর্ব খর্ব করার প্রবন্ধ লিখছি, তা না হলে বলতে পারতুম, আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। রবিবাবু বলেছেন, বেশ লিখেছ।

মুকু কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মেয়েটি হঠাৎ কেন এমন সহজ হয়ে গেল ! এই শেষ মুহূর্তে। যাবার মাত্র কয়েকঘন্টা আগে। মুকুর চিবুক আমার ডান কাঁধের ওপর। ঘাড়ের কাছে দেহের উত্তাপ। শাড়ির আঁচলের হালকা স্পর্শ। আমি যেন মুকুর ভেতরে চলে গেছি !

মুকু বললে, তুমি যে লেখ, আগে জানলে শুনে যেতুম। নিশ্চয়ই াপা হবে। কাগজের নামটা জানালে যেখানেই থাকি যোগাড় করে পড়ে নিতুম।

লেখা সহজ, লেখা ছাপান খুবই কঠিন কাজ। ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ একদিন ছাপা হয়। কারুর কারুর ভাগ্যে সারা জীবন শুধুই ফিরে আসা। কেউ কেউ আবার এমন অপয়া, না মরলে লেখা ছাপা হয় না। নিজেই নিজের ব্যাডস্টার। যেই সরল, অমনি হুড় হুড় করে লেখা ছাপা হতে লাগল। যশ, খ্যাতি, এমন কি পসথুমাস অ্যাওয়ার্ড। ফ্রানজ কাফ্‌কার কি হয়েছিল ভাবো ? মেটামরফসিস পড়েছ ?

না।

পেলে পড়ে দেখো।

একবার উঠবে ?

কেন ?

একটু নিচে চলো, কাকীমা ডাকছেন।

ইমপসিব্‌ল। আমি যাব না।

যেতে আমার ইচ্ছে করে। এটা একটা ছুতো। কাকীমার সামনে যেতে ভীষণ ভয় করে। একসঙ্গে

অনেক কথা মনে পড়ে গিয়ে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসে। সামনে আয়না না থাকলেও বেশ বুঝতে পারি, চোখেমুখে কেমন যেন একটা অপরাধীর ভাব ফুটে ওঠে। চোখের সামনে ফিন ফিনে পাঞ্জাবি পরা অদ্ভুত চেহারার সেই লোকটিকে দেখতে পাই। বিষ্টুদার কথামত কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কোনও দিন সম্ভব হবে বলে মনেও হয় না।

মুকু বললে, ছিঃ অভিমান করতে নেই। ভদ্রমহিলা কাল তোমার কথা বলতে বলতে, চোখের জল ফেলেছেন। প্লিজ অভিমান কোরোনা। আজ আমি চলে যাচ্ছি না ? বেশ ভালই জান, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

এক কথায় মুকু আমাকে স্তব্ধ করে দিলে। এই যে কিছুকাল মানুষের পাশাপাশি থাকা, আবার চলে যাওয়া, পৃথিবী জুড়ে এই যে বিচ্ছেদের খেলা চলেছে, এই খেলা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় নেই। মুকুর সঙ্গে নিচে নামতেই হল। যাবার বেলায় তার একটা অনুরোধ রাখতেই হয়।

কাকীমা দরজার পাশে ডাক পিওনের মত দাঁড়িয়েছিলেন। যেন রেজিস্ট্রি চিঠি এনেছেন, সই করিয়ে ডেলিভারি দিয়ে যাবেন।

কাকীমা বললেন, আমি কি করেছি গো, তুমি আমার সঙ্গে হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিয়েছ ?

মুকু বললে, বাবুর অভিমান হয়েছে। আপনি বাবুকে না বলে মামাশ্বশুরের বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন ! বাবুর রাগ হয়েছে।

তুমি ত বাড়ি ছিলে না পিন্টু। তোমার কাকাবাবুর কোনও নেই। আমাকে কোথাও তো একটা যেতেই হবে। তোমাদের আর কত কষ্ট দোব বলো ! আমার ওপর রাগ কোরো না। এমনিই তো আমি আধমরা হয়ে আছি।

আপনার টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেছে, আমাকে বলতে কি হয়েছিল ?

আমি তো টাকা পয়সার জন্যে যাই নি, আমি তোমার কাকাবাবুর কথা বলতে গিয়েছিলুম। এত দিন হয়ে গেল, মানুষটা আসছে কেন ! মনে অনবরতই খারাপ চিন্তা আসছে।

মুকু বললে, আমি ডবল দুশ্চিন্তা নিয়ে চলেছি। এক আমার দিদির চিন্তা, দুই আপনার চিন্তা। মনে থাকলে একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন।

কাকীমা বললেন, হ্যাঁরে, মেয়েটা আজ চলে যাবে, কিছু ভালমন্দ একটা খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

মাংস ?

মাছই ভাল, ট্রেনে রাত জাগবে। নিয়ে যাবার জন্যে কিছু জলখাবার করে দি। লুচি, আলুর ঘি-মরিচ। তুই কিছু ভালো মিষ্টি এনে দে। বট্‌ঠাকুর আজ বেরোলেন কেন ?

আজ শনিবার, দুটো কি তিনটের মধ্যেই ফিরে আসবেন। বলে গেছেন আসার সময় সন্দেশ আনবেন।

কাকীমা বললেন, আয় ঘরে আয়।

চৌকির ওপর ভাঁজ করা একটা শাড়ি। আকাশের মত জমিতে, ছোট ছোট সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে। কোনও শিশু যেন প্রকৃতির পায়ে অঞ্জলি দিয়ে গেছে। কাকীমা শাড়িটা মুকুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বড় গরিব ভাই। তেমন দামী নয়। ফেলে দিও না, পোরো। মনে রেখো, অনেক দূরে এমন কেউ আছে, যে তোমার কথা ভাবে। কত ইচ্ছে মানুষের। কোনটাই বা পূর্ণ করা যায়। বলো, পরবে ? দামী নয় বলে, টান মেরে ফেলে দেবে না !

কাকীমা মুকুর হাত দুটো চেপে ধরলেন। চোখ দুটো ছলছলে হয়ে গেছে। ধরা ধরা গলায় মুকু বললে, ভালবাসায় এ কাপড় সোনার চেয়েও দামী কাকীমা। আপনাকে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। এই বাড়ির কাউকেই আমি ভুলতে পারব না। আপনারা হয় ত আমাকে ভুলে যাবেন !

আমরা তিনটি প্রাণী পোড়ো বাড়ির সেই অন্ধকার ঘরে, চোখে টল টল জল নিয়ে, স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে শেষ মূল্য পায় যেন তার

বেশি বেলা হয়নি। বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। শনিবার অর্ধদিবস হলেও, দুটোর আগে দোকানপাট বন্ধ হবে না। মুকুকে একটা কিছু দেবার ইচ্ছে আমারও ছিল। কাকীমাকে দেখে সেই ইচ্ছেটা আবও প্রবল হয়ে উঠল। একটা ভাবনা ছিল, যদি না নেয়। অহঙ্কার কমেছে, তবে কতটা কমেছে! কাকীমার দেওয়া শাড়িটা যখন নিয়েছে, তখন আমি একটা শাড়ি দিলে নেবে না কেন! ঝট্ করে স্নান সেরে একবার বেরিয়ে যাই। কতক্ষণ আর লাগবে! শ্যামবাজারের মোড়ে অনেক বড় বড় দোকান আছে। একটাই সমস্যা জীবনে কখনও শাড়ি কিনি নি। কাকীমাকে নিয়ে গেলে কেমন হয়! এখন তো বাড়িতে করাব মত তেমন কাজ নেই। ট্রেনের জলখাবাব করার অনেক সময় আছে।

কাকীমাকে বলতেই এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। বাড়ির বাইরে যেতে যে কোনও বয়েসের মেয়েই খুব আনন্দ পায়। এক ঘেঁয়ে জীবনে তবু একটু বৈচিত্র্য।

কাকীমা বললেন, খেয়ে যাবে, না এসে খাবে?

খাওয়ার পর বড় আলস্য আসে। চাপা থাক, এসে খাওয়া যাবে।

চান করে কিছু না খেলে তোমার যে পিত্তি পড়বে।

ধুর, অনিয়মে এত বড় হলুম, গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেল, আপনি এখন আমাকে নিয়মে ফেলতে চাইছেন! স্নান করতে করতে ভাবলুম, কাকীমাকে যত তাড়াতাড়ি আমাদের জীবনবৃত্তে টেনে নেওয়া যায় ততই ভাল। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার সেই বেড়াল পোষার অভিজ্ঞতা। এতটুকু বয়েস থেকে খাইয়ে, আদর করে, যত্ন করে সুন্দরী রমণী করে তুললুম, তারপর সে দেখি আমাকে আর পাত্তাই দেয় না। ডাকলে আসে না। কোলে তুলে নিলে আঁচড়ে পালাবার চেষ্টা করে। তার একটা আলাদা স্বাধীন জগৎ। সব ছেড়ে বেড়াল রমণী তার প্রকৃতিব জগতে ফিরে যেতে চায়। একদিন সে সত্যিই চলে গেল। পড়ে রইল তার ঘুমোবার বাকস, দুধ খাবার বাটি, পাউডারের পাফ, খেলার গোল লাল বল। বিজাতীয় মানুষের মায়ায় তাকে বাঁধা গেল না। ফেরার অপেক্ষায় দিন থেকে সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর ঘুরে গেল। বেড়াল আর এল না।

কাকীমারও নিজস্ব একটা জগৎ আছে। যেই জানবেন এখানকার পাট শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে যেতে চাইবেন তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থায়। নিরালম্ব মানুষ বাঁচতে পারে না, বিশেষত মেয়েরা। মেয়েরা বাঁচতে চায় দাবি নিয়ে, যে কোনও একটা সম্পর্ক নিয়ে। বলতে খারাপ লাগছে, কোনও কোনও মহিলা কারুর রক্ষিতা হয়েও বেশ দাপটে বেঁচে থাকেন। আমাদের পাড়ার ললিতবাবু! তাঁর একজন রক্ষিতা ছিলেন। বাবু মারা গেছেন। তাঁর সম্পত্তিতে মহিলা এখনও কেমন দাপটে বেঁচে আছেন! দানধ্যান, পূজাপার্বণ। রাধা গোবিন্দর মন্দির সংস্কার করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ নাম জ্বল জ্বল করছে। বছরে একবার বাড়িতে বিশাল ভোজ হয়। সকলকেই ত পাতা পেড়ে খেতে দেখি। নিন্দনীয় সম্পর্ককে মেনে নেবার উদারতা সমাজের এসেছে। কাকীমা কি সম্পর্কের জোরে এখানে থাকবেন! যে জমির ওপর মালিকানা নেই, সে জমির ওপর কেউ ইমারত বানায় না। ভালবাসার ভিত কোথায়! বাতাসের মত। শ্বাসপ্রশ্বাস নিলেও মূল্য বোঝা যায় না। কারুর আশ্রিতা হয়ে, কারুর দয়ায় বেঁচে থাকার পাত্রী কাকীমা নন।

বেরোবার সময় মুকু জিজ্ঞেস করলে, দু'জনে সেজেগুজে চললে কোথায়!

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি। তুমি বাড়ি পাহারা দাও।

কোথায় চললে বলবে তো?

ফুল কিনতে।

ফুল? ফুল কি হবে?

তোমার গলায় পরাব মালা করে।

হঠাৎ মুখ ফস্‌কে এমন একটা অশালীন কথা বেরিয়ে গেল। প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ভেবে ভীষণ ঘাবড়ে গেলুম। বোমার পলতেয় আগুন লাগিয়ে, মানুষ যেমন সিঁটিয়ে থাকে আমি সেই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ রইলুম। দৃষ্টি মুকুর মুখের দিকে। ভাবের কোনও পরিবর্তন যদি ধরা পড়ে!

না বিস্ফোরণ হল না। মুখে ক্রোধের কোনও প্রকাশ দেখা গেল না।

কিছু মনে করলে তুমি?

মুকু মুখ নিচু করল। যখন মুখ তুলল, চোখ দুটো ছলছলে। মালা পরার ভাগ্য করে আমি জন্মাই নি। মুকু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। প্রায় ছুটে চলে গেল। কাকীমা আমার মুখের দিকে তাকালেন আমি কাকীমার মুখের দিকে। ব্যাপারটা কি হল কিছুই বোঝা গেল না। মুকুর কোথাও একটা তীব্র বেদনা, তীক্ষ্ণ হতাশা জমে আছে। কেন? কারণটা কি? বড়লোকের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গোতে চলেছে! তার আবার দুঃখ কিসের!

আজ আমি নবাবী করব। ট্যাকসি চাপব। বাইরে কোথাও বসে প্রাণ যা চায় তাই খাব। পেট্রল পাম্পে শরৎদার গাড়ি তেল নিচ্ছে। চেনা গাড়িতে উঠব না। সারাটা পথ বক বক করবে। দুপা এগোতেই আর একটা গাড়ি পেয়ে গেলুম। গাড়িটা কোথা থেকে এল কে জানে! শ্মশান থেকে না কি! পেছনের আসনে সাদা ফুলের ছেঁড়া পাঁপড়ি পড়ে আছে। গাড়ি চলেছে শ্যামবাজারে দিকে। মুকুর মুখ কিছুতেই কেন ভুলতে পারছি না। সব বেদনা আজ যেন দুধের মত উথলে উঠেছে। মানুষ বুকের ভেতর কি যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওপর দেখে কিছুই বোঝাব উপায় নেই। বিজলী ছলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি ঝরি ;/বসন্ত জ্বলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি/স্বপন চলিয়া যায়/তন্দ্রা করে হায় হায়!

পাশে বসে আছেন কাকীমা অনেকটা করুণ ভৈরবীর মত। নারীর যত রকম রূপ আছে, সব মিলে মিশে এই বাইরে এসে কাকীমাকে এমন দেখাচ্ছে, যার তুলনা কাকীমা নিজেই। অন্য কারুর সঙ্গে তুলনা চলে না। কাকীমা মৃদু গলায় বললেন, কি ভাবছ তুমি?

আমি ভাবছি মুকুর কথা।

জানো আমিও ওই একই কথা ভাবছি। তোমার এই মেসোমশাই কেমন মানুষ পিন্টু?

সত্যি বলছি, আমি বিশেষ কিছু জানি না। কাউকে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টাও করি নি। মেসোমশাই মানে মেসোমশাই এইটুকুই জানি। আর জানি, পেশায় আইনব্যবসায়ী, প্রচুর পয়সার মালিক।

মানুষটি তেমন সুবিধের নয় পিন্টু।

কি রকম!

কাকীমা উত্তর দিতে ইতস্তত করছেন। গাড়ি ছুটছে হুহু করে। দুপুরের রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। পথ ফুরোবার আগে উত্তর পাব কি?

বললেন না তো, কি কম সুবিধের নয়?

তুমি দেখ, ওঁর বড় বড় দুই মেয়ে, এক মেয়েকে আমি দেখি নি, মুকুকে দেখেছি। তার মানে ভদ্রলোকের বয়েস নেহাৎ কম নয়!

তা তো নয়ই, দেখলেই বোঝা যায়। মনে হয় পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

পঞ্চাশ তো হবেই, বেশিও হতে পারে, তা হলে দ্যাখো!

কি দ্যাখার কথা বলছেন?

তুমি আমার কাছে আর কিছু জানতে চেও না। সংসারের অনেক নোঙরা দিক আছে, তুমি আমার পবিত্র ছেলে। তোমাকে সে সব আমি জানতে দোব না। কাকও পাখি, চন্দনাও পাখি। একজন খোঁজে আস্তাঁকুড় আব একজন খোঁজে গাছের উঁচু ডাল। বিশ্বাস কর পিন্টু, আমার নিজের ছেলে থাকলে তাকেও আমি হয়তো এত ভালবাসতুম না। আমি রাতে তোকে স্বপ্নে দেখি। আমার কত কল্পনা! তুই বড় হতে হতে একেবারে আকাশের মত হয়ে গেছিস। আমি কোথায় থাকবো জানি না, যেখানেই থাকি, দূর থেকে শুনব তোর নাম ডাক। সবাই বলবে, আমার পিন্টুর কথা। কত মানুষ তোর আশ্রয়ে থাকবে!

তোর জীবনে রাতটাও হয়ে থাকবে দিনের মত। কাগজে ছবি ছাপা হবে, নাম বেরবে। সব মানুষের মুখে মুখে তোর নাম ফিরবে! ভাবতে ভাবতে আমি কি রকম পাগলের মত হয়ে যাই, ছটফট করি মনে মনে, কেন হচ্ছে না! কেন এত দেরি হচ্ছে! সময় যে হু হু করে চলে যাচ্ছে। আমি কি দেখে যেতে পারবো! কে কখন কোথায় কি ভাবে থাকে! কাছ থেকে দূরে চলে যায়, দূর থেকে আসে কাছে। তোর ভাগ্য খুব ভাল পিন্টু। বঠ্ঠাকুরের মত মানুষ হয় না। একেবারে সাধুর মত। তোর সুখের জন্যে কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন!

কি ত্যাগ?

সে ত্যাগের কোনও তুলনা নেই। সাধারণ মানুষ যা পারে না। তোমার মেসোমশাই যা কোনও দিন পারবেন না। সেই ত্যাগ বোঝার বয়েস তোমার হয় নি। মানুষ যার জন্যে পাগল পাগল। দিন নেই, রাত নেই, ছটফট, ছটফট করছে।

একটু একটু বুঝেছি।

কাকীমা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। হুহু করে বয়ে আসছে দুপুরের গরম বাতাস। কানের পাশের চুল উড়ছে। ফেরান মুখের ওপর আলোর আভা খেলছে। বড় বড় চোখের পাতা স্থির, নিশ্চল। কপাল আর নাকের অংশ প্রোফাইলে ধরা পড়েছে। নাকছাবির পাথর ঝিলিক মেরে উঠছে মাঝে মাঝে।

এমন একজন মহিলাকে যেচে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে বৈধব্যের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়! রঙীন একটা জগৎ থেকে ম্লান বিমর্ষ এক জগতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া!

কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে ফেলা ছবি
আবার নতুন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তা কি আর জোড়া লাগে: যা আছে, যদ্দিন আছে, যেমন আছে সেই রকমই থাক। দেখাই যাক না কি হয়! তারপর না হয় প্রশ্ন করা যাবে, কেন মরে গেল নদী/আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি/তাই মরে গেল নদী॥ গাড়ী হুহু করে ছুটছে। মাইলের পর মাইল পথ গিলে ফেলছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই চলা কখনও যদি শেষ না হত।

অনেক দূরে কোথাও কোনও শিমুল গাছে তুলোর বীজ ফাটলে, একটা দুটো পলাতক বীজ পাখা মেলে উড়তে উড়তে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে বাতাসে ভাসতে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে অদ্ভুত একটা উড়ো চিন্তা মনের ঘরে ভেসে এল। বিলেতে একজন পুরুষ অথবা নারী বহুবার বিবাহ করতে পারে। সার জীবন একই স্বামী বা একই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। না পোষালেই বিবাহবিচ্ছেদ। বিপত্নীক কিংবা বিধবা হলেও আবার সংসার পাতারও কোনও বাধা নেই। তাহলে!

ছি ছি, এ আমি কি ভাবছি! মনের কোন স্তর থেকে আমার এই ভাবনার উদয়। কিছু বাজে বই পড়ে কি আমি অসম্ভব রকমের ডেঁপো হয়ে গেলুম! কেন পড়তে গেলুম লরেনসের 'ম্যানিফেসটো'

...another hunger
Very deep, and ravening...
redder than death, more clamorous.
The hunger for the woman..

চিন্তাটাকে যতই চেপে রাখতে চাইছি, ততই যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। যা ভাবছি, তা যদি ঘটে যায়, আমি মনে মনে ভীষণ সুখী হব। এমন একটা আলয় পেয়ে যাব, স্নেহের আলয়, যা দেহবোধে কলুষিত নয়! এ দেশের রক্ষণশীল মানুষের সে সাহসই হবে না। চরিত্র বড় আদরের বস্তু, সমমানের বস্তু। বস্তুটা আসলে কি তা জানা নেই। যদি এমন হত, আহারে চরিত্র নষ্ট হয়, তাহলে বহু মানুষ অনাহারে

মারা পড়ে প্রমাণ করে যেতেন, তিনি চরিত্রবান। হিন্দু রমণীর আদর্শ সামনে রেখে কাকীমা বলবেন, ছি ছি, তা হয় না, তা হয় না। জীবন এক ধরনের লটারি। মারার সুযোগ একবারই পাবে। লেগে যায় ভাল, নয় তো দান আর বাজির টাকা দুটোই তামাদি হয়ে গেল। কাকীমাকে গ্রহণের কথা বললে তিনি আমাকে নির্ঘাৎ জুতোপেটা করবেন। অথচ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কার বিধান দিয়ে গেছেন, স্বামী যদি নীচচরিত্রের হন, যদি প্রবাসী হয়ে থাকেন, রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হন, খুনী হন, তিনি যদি কোনও কারণে পতিত হয়ে থাকেন কিংবা ক্লীব, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তা হলে স্ত্রী অমন স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেন। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মত রিফর্মার হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। তাও কি ঠিকমত চালু হয়েছে। করা যায়। কিন্তু কজন করেন। করলেও সমাজ আওয়াজ দেয়। কেমন একটা ব্যভিচারের ইঙ্গিতে সকলে আধবোজা চোখে তাকাতে থাকে।

থাক, ঘটক হয়ে আর দরকার নেই। ভাবনার রাশ টেনে রাখো। কেউ শুনলে বলবে, ছোকরার জ্ঞানের বদহজম হয়েছে। তবু মনে হয়, আমাদের বল্গাহীন সংসারে বলগা ধরার ক্ষমতা, আমার পাশে কোলের ওপর আলতো পড়ে থাকা ওই দুটি হাতের ছিল। যে হাতে অনধিকারীর মত এখনও এক জোড়া শাঁখা প্রাণদণ্ডের প্রহর গুনছে।

কাকীমা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

মেয়েছেলে হয়ে জন্মাসনি খুব বেঁচে গেছিস। আমাদের জীবন বর্ণপরিচয়ের প্রথম দুটো অক্ষরে পড়ে আছে।

তার মানে?

অ, আর আ। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে।

কাকীমা হাসতে লাগলেন, আর আমি ভাবতে লাগলুম কথাটা অনেক অংশেই নির্ভুল। খুব ন্যায়ের কথা হচ্ছে, নীতিব কথা হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে, সংগীত হচ্ছে, হতে হতে শেষ কথা, চলো, তাহলে এবার একটু শোয়া যাক। শুদ্রকের মৃচ্ছকটিকের গোটাকতক লাইন মনে পড়ছে, প্রমোদিনীরা সব সময় যুবকের সঙ্গী হবে। পথের পাশের লতানে গাছের মত, সকলেরই তার ওপর সাধারণ অধিকার থাকবে। তোমার শরীর হল পণ্য, স্বর্ণের বিনিময়ে বিকিয়ে যাও। এখনকার কালে স্বর্ণ শব্দটি কেটে দাও, তার বদলে লেখ, অন্ন আর বস্ত্র।

আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। পাশাপাশি সার সার দোকান এমাথা থেকে ওমাথায় চলে গেছে। যোগমায়া বস্ত্রালয়, মহামায়া বস্ত্রালয়। সবই মায়ার খেলা। বাইরের আলোয় কাকীমাকে এর আগে, এত ভাল করে দেখি নি। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। গায়ের রঙ ফর্সা আর স্বাস্থ্য ভাল হলে মেয়েদের গালে অদ্ভুত একটা গোলাপী আভা খেলে। ঈশ্বর এক জীব সৃষ্টি করেছিলেন বটে, যার সবটাই নরম। মন নরম, দেহ নরম, পাঁউরুটির ভেতরের অংশটির মত।

কাউন্টারে একের পর এক শাড়ি নামছে। কচি কলাপাতার রঙ, নীল, আরও নীল, কমলা, লাল। একটু দেখতে শুনতে ভাল কোনও মহিলা কাউন্টারে এসে শাড়ি দেখতে চাইলে দোকানদারের উৎসাহ বেড়ে যায়। পাশ থেকে শাড়ি বেরোয়, মাথার ওপর থেকে শড়ি নামে। তিন চারজন চারপাশ থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের মত শাড়ি ছুঁড়তে থাকেন। কাকীমার নীলের ওপর একটা দুর্বলতা আছে। একটা নীল হাতে তুলে নিতেই বিক্রেতা বললেন, নীল ত পরেই আছেন, একখানা চাঁপাফুল নিন না, জমিটা খুব ভালো।

কাকীমা আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললুম, আপনারও একটা হবে। বলেই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঠিক যেন সমুদ্রের বালিতে বাড়ি তৈরির চেষ্টা। গোটা কতক ঢেউ-এ সব চুরমার।

কাকীমা বললেন, আর দু'একটা দোকান দেখা যাক। সেলসম্যান হতাশ হয়ে বললেন, অ্যাতো দেখালুম, তাও পছন্দ' হল না!

এইবার মহামায়া থেকে যোগমায়া। আরও বড় দোকান। অনেক বেশি আলো, অনেক বেশি খদ্দের।

কাকীমা দোকান দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, কিনতে হলে, বড় দোকান থেকে কিনব, ভালো দোকান থেকে কিনব। জান তো, আমার মামাশ্বশুরের বিশাল বড় কাপড়ের দোকান ছিল। বিয়ের পর থেকে কাপড়ের কথা শুনতে শুনতে, কাপড় চিনতেও শিখে গেছি।

কাকীমা আজ রাজরানীর মত হয়ে গেছেন। চেহারায়, চলনে বলনে। দুঃখের পরিবেশ ছেড়ে বেরতে পারলেই মানুষ সুখী হয়ে ওঠে। সুখ কোথায় আছে, কিসে আছে কারুর সঠিক জানা নেই। অনেকটা চোরকাঁটার মত। ঘাসের ওপব দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, হঠাৎ এক সময় নিচের দিকে তাকাতেই অবাক। কাপড়ে ফিনকি ফিনকি, রাশি রাশি আটকে আছে। আজ যে সব সুখের মুহূর্ত দিয়ে জীবন চলেছে, একটু পরেই চলে যাবে বহু দূরে। রেলগাড়ি যেমন ব্রিজ বা টানেল পেরিয়ে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। মাইলের পর মাইল সামনে পড়ে থাকে বৈচিত্র্যহীন দু সার অনুভূতিহীন লৌহপথ। কেন জানি না, আজ বড একঘেয়ে জীবন-ভাবনা আসছে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মত। জীবন যদি ব্লটিং পেপারেব মত এক ফোঁটা সুখের মুহূর্তকে ধরে অনেকটা বড় করে দিতে পারত, তা হলে বেশ হত।

দুমদাম কাপড নেমে এল কাউন্টারে। ঝলমলে রঙেব বাহার। চোখে জীবনের নেশা লেগে যাচ্ছে। শাড়িব সঙ্গে সঙ্গে শবীব দেখতে পাচ্ছি। শরীরের ভেতব মন দেখতে পাচ্ছি। মায়ার বন্ধন দেখতে পাচ্ছি, যে বাঁধনে জগৎসংসার ধুঁকছে, ফুঁসছে, ছিঁড়ছে, জোড়া লাগছে। শাড়ির রঙিন জমিতে স্বপ্ন হাঁটছে। আমি হাঁটছি, আমার পাশে মুকু হাঁটছে। সুখের হাত মেলানোয় কোনও তৃপ্তি নেই। দুঃখের সঙ্গে সুখ মিলে যখন দুঃখেব চোখেব জল মুছে গিয়ে, মুখে হাসি ফোটে তখন মন যেন কানায় কানায় ভবে ওঠে। দেহ কিছু নয়, অভ্যাসে বাঁচাটা বাঁচা নয়। মনের সঙ্গে মন মিলে গেলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে ওঠে।

কাকীমা শাড়ি পছন্দ করে ফেলেছেন। আমি বললুম, এবার আপনারটা। রঙ আমি পছন্দ করি, জমি পছন্দ করুন আপনি।

এই প্রস্তাবেব পেছনে আমাব একটা অপরাধ বোধ কাজ করছিল। খুব চড়া নয়, হালকা কোনও একটা রঙ বেছে নেব। বলা যায় না, যদি রঙিন শাড়ি পরা বন্ধ হয়ে যায় তা হলেও যেন পরতে পারেন। সেলসম্যান বলছেন, দিদির আমাব পছন্দ আছে। সেরা শাড়িটাই বেছেছেন।

কাকীমাব মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন হোমের আগুন লেগেছে মুখে।

আমি বললুম, এইবার দু একটা হালকা রঙ দেখাবেন?

দেখাতে বলে যেই পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়েছি, ভয়ে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। এতক্ষণ সুখের যে বুদবুদটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল, একটি পিনেব খোঁচায় যেন নিমেষে ফেটে গেল। সেই অদ্ভুত চেহারার অষ্টাবক্র লোকটি, যে আমাকে নানা গল্প শুনিয়ে হাতঘড়িটা নিয়ে সরে পড়েছিল, কোণের কাউন্টারে পাজামা কিনছে ঝুল মেপে মেপে। পাশে গা ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে অশ্লীল একজন মহিলা। দেখলেই মনে হয়, মহিলা দেহে বেঁচে আছেন, মনে নয়।

লোকটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছে। চোখ সরিয়ে নিলেও দেখতে পাচ্ছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এখুনি আক্রমণ করবে। প্যাঁচ মাববে? এবাব ধরে ফেলবে, দুজনকে এক সঙ্গে। সে ভাবে না তাকালেও আমি দেখতে পাচ্ছি, লোকটি হাসছে। চোখ দুটো হয়ে উঠেছে শিকারী বেড়ালের মত। পাজামা ফেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা কবছে।

আমি কাকীমার ডান হাত মুঠোয় চেপে ধরলুম। কাকীমা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি হল? কি হল তোমার!

আব সময় নেই। কাকীমাব হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এলুম দোকানের বাইরে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার মত হচ্ছিল। কোনও ক্রমে সামলে নিলুম। পেছন থেকে সেলসম্যান চিৎকার কবছেন, কি হল দাদা, শাড়ি! শাড়ি নেবেন না।

লোকটি দোকানের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখেছি আমি।

ভিড়ে গা মিলিয়ে, মিশে গিয়ে কাকীমাকে হাত ধরে টানতে টানতে, ছোটাতে ছোটাতে, ট্রাম ডিপোর

পাশ দিয়ে আর একটা রাস্তায় পড়লুম। লোক চলাচল কম। জনারণ্যে মিশে হারিয়ে যেতে হবে। বুঝতে না পেরে কাকীমা নানা রকম প্রশ্ন করে চলেছেন। আমার জবাব দেবার অবসর নেই। এ রাস্তা ও রাস্তা করে এক সময় মনে হল অনেক দূরে চলে এসেছি। আর ধরতে পারবে না, তবু সাবধানের মার নেই। সামনেই বিশ্রী চেহারার এক রেস্তোরাঁ। কলেজের ছেলে-মেয়েদের প্রেম করার জন্যে পর্দা ফেলা ছোট ছোট খুপরি। একটু গাঢাকা দিয়ে বসে থাকা উচিত। বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাকীমা হাঁপাচ্ছেন।

রেস্তোরাঁর খুপরি ঘরে দুজনে বসতেই, হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে এসে ময়লা পর্দাটা টেনে দিয়ে গেল। একবার ভাবলুম বলি, না, খোলা থাক, তারপর মনে হল একটু আব্রু থাকা ভাল। তেলতেলে, মোটা কাচের গেলাসে দু গেলাস জল দিয়ে গেল। গেলাসটা দু হাতে ধবে কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন, কি হল বলো তো?

কি বলি? কি ভাবে বলি! একটু ইতস্তত ভাব। বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানাতে হবে। বয় এসে, ধমকেব গলায় জিজ্ঞেস কবলে, কি খাবেন?

কি আছে?

ছেলেটি চোখ বুজিয়ে পাখি পড়ার মত বলতে লাগল, মোগলাই, ফিশ চপ, ফিশ ফ্রাই, কবিরাজী, মটন কারি, কষা, কোর্মা, মটন কাটলেট, প্রন কাটলেট, ডেভিল..।

গডগডিয়ে আরও কতদূবে চলে যেত কে জানে? থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেক আছে ভাই?

প্যাস্ট্রি আছে।

দুটো ওই আর দুকাপ চা।

ছেলেটি ক্ষুণ্ণ হযে বললে, আব কিছু না!

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি

পশ্চিম আকাশ কাচের মত লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য অস্ত গেল এই কিছুক্ষণ আগে। এক ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল পশ্চিম আকাশের দিকে। যত দূরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কে যেন একবাশ ঘুঁটি খেলার দানের মত আকাশের দিকে চেলে দিয়েছে। পাখি কেন সব সময় আলোর দিকে উড়ে যায়! সূর্যকে কি অনুসরণ করা যায়! পশ্চিম আকাশের অদ্ভুত ওই সোনালি আলো একটু পরেই নিবে যাবে। এ আকাশে রাত নামল, ও আকাশে ভোর। না, অত দর্শন ভাল নয়!

নিচে থাকতে না পেরে ওপরে চলে এসেছি। মুকুরা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। একটু পরেই গাড়ি নিয়ে আসব ছুটবে স্টেশানের দিকে। সারা বাড়িতে এখানে ওখানে যা কিছু ছড়ান ছিল সব ভরে ফেলেছে বাকসে। আমাদের যে সব জিনিস ছিল, যেগুলো লেগেছিল ওদের ব্যবহারে, সে সব জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কুলুঙ্গিতে আয়না ছিল, চিরুনি ছিল, একটা বুরুশ ছিল, চুলবাঁধা ফিতে ছিল, পাউডারের কৌটো, মেসোমশাইয়ের সেভিংসেট ছিল। সব অদৃশ্য হয়েছে, পড়ে আছে নিঃসঙ্গ ব্রাশ। কেমন যেন লাগে। কাঁদতে ইচ্ছে করে। একটু আগেও তারে সার সার কাপড় ঝুলছিল। সব যেন ভোজবাজি হয়ে গেছে, হাওয়ায় উড়ছে সাদা একটা গামছা।

মানুষের জীবন কিছুতেই পূর্ণ হতে চায় না, কেবলই শূন্য হয়ে যায়!

এই ছাতে কত কি ঘটে গেল। কত রাতে আমি আর কনক পাশাপাশি বসে থেকেছি। ক্ষয়া চাঁদ দেখেছি, পূর্ণ চাঁদ দেখেছি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। কনকের শাড়ির আঁচলে দু'জনে একসঙ্গে মাথা ঢেকেছি। তখন মনে হয়েছিল, এই সব মুহূর্ত বুঝি রাজার মাথার উষ্ণীষের হীরা, চুনি, পান্নার মত,

যতদিন বাঁচব ততদিনই মাথায় থেকে যাবে। কোথায় কি! মালা ছিঁড়ে মানিক পড়ে গেল কালের স্রোতে। ভাসতে ভাসতে চলে গেল। দূর থেকে দূরে! আর ফিরবে না। স্মৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। নতুন স্মৃতির পলি পড়বে। কোনও একদিন যক্ষের মত কোনও এক নির্জন ঘরে সিন্দুকের ডালা খুলবো। ক্যাঁচ করে শব্দ হবে। ভেতরে দেখব থরে থরে সাজান আমার জীবনের মৃতঝরা মুহূর্ত। মাকড়সার ঝুলে ঢাকা, ধূসর। তখন আমি বৃদ্ধ ; হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। চুল সাদা। চোখ দুটো মৃত মাছের মত। এই ত মানুষের জীবন, মানুষের নিয়তি! এই পথেই সকলকে চলতে হবে। বর্তমানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে না পারলে, অতীত বড় কষ্ট দেয়। সোনার হরিণ সামনে ছেড়ে পেছন পেছন ছুটে চলো। রোজই দাও নতুন নেশা।

প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্যের সুদূরতা আমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে ; আমার চলাকে পেছনে ফেলে জনশূন্য বনভূমি এগিয়ে চলে আরো জোরে।

দুঃখের দিনে গালিবকে বড় ভাল লাগে, হর কদম্ দূরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝ-সে ;/মেরী বফ্তার-সে ভাগে হৈ বয়াবাঁ মুঝ-সে ॥

শেষের কটা দিন মুকুও এই ছাতে এসেছে। আলসেতে বসেছে। কত কথা হয়েছে। জীবন-কথা। রাত বেড়ে গেছে। পেটা ঘড়ি বেজেছে। মাঝরাতে অদ্ভুত একটা ভৌতিক বাতাস ওঠে, প্রকৃতি ছমছম করতে থাকে। দু হাত দূরে বসে থাকা মুকুকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে থাকে। মধ্যরাতে মানুষ কেমন যেন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। এই ছাতে আমি কাল আসব, পরশু আসব, তারপরের দিন আসব, আসব একা, পাশে কেউ থাকবে না! যত দিন যাবে স্মৃতি ততই পুরনো হতে থাকবে। কালের হাত ধরে এরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সমুদ্রে জাহাজ যেমন হারিয়ে যেতে থাকে। সব শেষ মাস্তুলের ডগাটিও চলে যায় দৃষ্টিপথের বাইরে। সমুদ্র পড়ে থাকে ঢেউ নিয়ে, ফেনরাশি নিয়ে। মানুষের তিনটি অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী, আকাশ বাতাস আর শূন্যতা। এই তিনটিকে কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।

আকাশের সোনালি আগুন নিবে গেছে। গোলাপি পেখম মেলে রাত উড়ে আসছে। বন্ধু কাঁদতে দাও, শোনো তিরস্কার কোরো না, হৃদয়ের দুঃখভার কখনও তো খালি করতে হবে! রোনে সে ঐ নদীম সলামত ন কর মুঝে। আখির কভী তো অকদএ দিল বা করে কোঈ ॥

খস্ খস্ শব্দে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখি মুকু দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল ছাত এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। পশ্চিমে গাছগাছালি ভরা বিশাল এক ভূখণ্ড ক্রমশ ঢালু হতে হতে নেমে গেছে গঙ্গার কূলে। দূরে অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে মন্দিরেব ত্রিশূল। গাছের মাথায় মাথায় অন্ধকার নেমে আসছে ডানামোড়া পাখির মত। উনুনের ধোঁয়া কিছু দূর উঠেই বাতাসে থমকে গেছে।

মুকু আমার দিকে দু'পা এগিয়ে আসতেই চারপাশে সন্ধ্যার শাঁক বেজে উঠল। দিন ঘুমিয়ে পড়ল রাতের কোলে। মুকু কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শরতের একখণ্ড মেঘ থেকে চাপা একটা আলো এসে পড়েছে মুখে। চোখ দুটো যেভাবে চকচক করছে, তাতে মনে হচ্ছে সামান্য জল এসেছে। মুকু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও কথা নেই মুখে। অনেক সময় না-বলা কথা বলা-কথার চেয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের এমন অনেক ভাব আছে যা কথা দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। ভোরের মত সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলোয় উন্মুক্ত এই ছাদে মুকুর শেষবারের মত দাঁড়ান। মুহূর্তের নদীতে একই জলে মানুষ দুবার স্নান করতে পারে না। মুকু কি বলছে আমি জানি,

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাত বেলায়
তুলে নিও তোমাদের প্রাণের খেলায়।

মুকু ধরা-ধরা গলায় বললে, আমার একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বললুম, সময় হয়ে এল, একটু আগে বেরনোই ভাল।

মুকু আরও ধরাগলায় বললে, কাল তোমরা থাকবে, আমি থাকব না।

আমি বললুম, সব গোছগাছ হয়ে গেছে ? কিছু পড়ে নেই তো ? একবার ভালো করে সব দেখে নিয়েছ ?

মুকু বললে, কতদিন লাগবে তোমাদের ভুলতে !

আমি বললুম, তোমরা এসেছিলে দুজন, ফিরে যাচ্ছ একজন।

মুকুর গলায় এবার কান্নার শব্দ, দিদি রইল, পারো তো খুঁজে বের কোরো। যদি দেখা হয় বোলো মুকুকে যেন ভুল না বোঝে।

মুকু সারা ছাতটা একবার ঘুরে এল। ছাতে এলেই কনকের একটা নিজস্ব বসার জায়গা ছিল। ফুলগাছের টবের পাশে সেই বসার জায়গায়, মুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, কারুর সমাধির সামনে মানুষ যেভাবে দাঁড়ায়।

মুকুর পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললুম, এবার চলো।

মুকু সামনে ঝুঁকে ছিল। দুটো হাত ছিল সামনে জোড়া হয়ে। কথা শুনে মুকু সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় শরীর টান টান হল। খুব মৃদু গলায় বললে, তুমি যদি আমাকে রাখতে পারতে পিণ্টু ! চিরকালের জন্যে এখানে যদি আমাকে রাখতে পারতে !

মুকু আমার কাঁধের ওপর ভেঙে পড়ল। আমার খুব অবাক লাগছে, এতদিন পরে বাড়ি ফিরছে, কোথায় আনন্দে মন যাই যাই করবে। পরবাস থেকে নিজবাসে ফিরে চলার আনন্দ নেই ! তাহলে এ বেদনা কিসের। মুকু আমার কাঁধে মাথা রেখে বারে বারে বলতে লাগল, তুমি পারলে না, পারলে না, পারবে না, পারবে না।

কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মত লাগছে ! কে যে কখন কত আপন হয়ে যায় ! মুকু দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, তুমি তুমি তুমি তুমি !

আমি দাঁড়িয়ে আছি বেওকুফের মত। যে কোনও কথাই এই আবেগের কাছে বড় খেলো হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে মানুষের মনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশ কথায় সম্ভব হয় না, চোখের জলে হয়ত কিছুটা হয়, ঠোঁটের হাসিতে হয়ত হয়, চোখেব দৃষ্টিতেও হতে পারে। শব্দ শব্দের সীমা ছাড়াতে পারে না। যে আর্তনাদ মুখে ফোটে না, সে আর্তনাদ বুকে দাগ কেটে বসে। যে জল সমুদ্রে পথ পায় না সে জল শুষে নেয় মাটি। সীনে কা দাগ হৈ বহ নালা কা লব তক নগয়া/খাক কা রিজক হৈ বহ কতরা জো দরিয়া ন হুআ ॥

বিদায় ছাত বলে নিচে নামার মুখে সিঁড়িতে কাকীমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাদের ডাকতে যাচ্ছিলুম। ওঁরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কাকীমা অবাক হয়ে মুকুর দিকে তাকাচ্ছেন। আমাদের চেয়ে মুকু যেন বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। চাপা স্বভাবের মানুষের এই এক সমস্যা। প্রথমে কেউ তাদের চিনতে পারে না. ধরতে পারে না, যখন পারে তখন সে চলে যায় ধরার বাইরে।

এতক্ষণ ছাতে ছিলুম। সোনার বরণ আকাশ থেকে আঁধার আকাশ হয়ে তারার আলো গায়ে মেখে নিচে নেমে এসে বিদ্যুতের আলো কেমন যেন অস্বাভাবিক হলুদ হলুদ লাগছে। মনে হচ্ছে সব ন্যাবা হয়েছে। বড়ঘরে কাকীমা দুটি আসন পেতেছেন। মুকু আর মেসোমশাই খেয়ে যাবেন। এবাড়িতে তাঁদের শেষ আহার। কাকীমার যেন কোনও ক্লান্তি নেই ! দুপুরে কম ছুটোছুটি হয়েছে !

সেই নোংরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চোরের মত আমরা আবার সেই শাড়ির দোকানে ফিরে এসেছিলুম। দোকানের সেলসম্যান প্রশ্ন করেছিলেন, তখন কি হয়েছিল বলুন তো ! অমন করে পালালেন কেন ?

রেস্তোরাঁয় বসে বসে উত্তর একটা কাকীমার জন্যে তৈরিই করে ফেলেছিলুম, তারই একটা অংশ কাজে লেগে গেল। বললুম, একজন চেনা ভদ্রলোককে দেখে পালাতে হয়েছিল।

সেলসম্যানের চোখেমুখে কেমন যেন একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। কাকীমার মুখের দিকে বারে বারে তাকাতে লাগলেন। জানি কি ভাবছিলেন। অবৈধ প্রণয়ট্রনয়ের কথা নিশ্চয়ই। মন

এমন জিনিস ! সেই মুহূর্তে কেন জানি না নিজেকে বেশ ভাবুক ভাবুক লাগছিল। কাকীমাকে গল্পটা অবশ্য বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছিলুম। অফিসে শরীর খারাপ বলে ছুটি নিতে হবে ত, তাই অফিসের চেনা লোক দেখে অমন দুদ্দাড় করে পালিয়েছিলুম। গল্পে অবশ্য অনেক ফাঁক ছিল। কাকীমা যদি প্রশ্ন করতেন, উনিও কি ছুটিতে আছেন ! তাহলে আবার আমাকে আর একটা কিছু ভাবতে হত।

কাকীমা বললেন, তুমি আর বট্‌ঠাকুরও কিছু খেয়ে নাও, আসতে রাত হবে ত !

আমরা কত বেলায় খেয়েছি, আপনার খিদে পেয়েছে ?

আমার ক্রমশই পেট ফুলছে।

তাহলে ? আপনি বরং বাবাকে কিছু খেতে দিন।

উনি খাবার কথা শুনলে বিরক্ত হন।

তা হলে থাক।

দু'জনে প্রথামত আহারে বসলেন। মেসোমশাই যদিও দু একখানা খেলেন, মুকু স্রেফ খেলা করে গেল। কাকীমা অবশ্য করেছিলেন অনেক রকম। নানা ধরনের লোভনীয় পদ। এই অল্প সময়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আর কাউকে না পারুন আমাকে চমকে দিয়েছেন।

পিতা ঘড়ি দেখলেন। আমাকে বললেন, যাও এবার বেরিয়ে পড়, একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুদূর গিয়েই দেখি উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। রঙটা বেশ চেনা চেনা। সামনে একটা ঠ্যালা পড়ায় গাড়িটা আস্তে আস্তে আসছে। পেছনের আসনে মাতুল বসে আছেন। সেই পরিচিত ভঙ্গী, গালের ওপর একটি আঙুল। দোকানের আলোয় অনামিকার আঙটির পাথর জ্বলছে। শুনেছি পাথরটা হীরে।

মাতুল আমাকে দেখতে পান নি। ভাব কি ভাবনা জানি না, বিভোর হয়ে বসেছিলেন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মামা বলে ডাকতেই চমকে উঠলেন। মুহূর্তের বিস্ময় কেটে যেতেই মুখে খেলে গেল সেই ছেলেমানুষী হাসি। মাতুলের মধ্যে একটি শিশু লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝেই ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়।

জিজ্ঞেস করলেন, চললি কোথায় ?

একটা গাড়ি ডাকতে।

কেন গাড়ি কি হবে ?

মেসোমশাইরা স্টেশানে যাবেন, আজ চলে যাচ্ছেন।

মাতুল দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আয়, উঠে আয়। গাড়ি ডাকতে হবে না, আমি পৌঁছে দেবো।

আসনে বসতেই মাতুল বললেন, কি রকম সময়ে এসে পড়েছি বল ? জাস্ট ইন টাইম।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই, জানালায় একটা মুখ উঁকি মেরে সরে গেল। মাতুল সিঁড়ি ভেঙে আগে আগে উঠছেন, আর হেঁকে হেঁকে বলছেন, গাড়ি আ গিয়া হুজুর।

গলা পেয়ে পিতা বেরিয়ে এসেছেন সিঁড়ির মুখে, আরে, জয় তুমি ! আনএকসপেকটেড। এ যেন মেঘ না চাইতে জল।

মাতুল বললেন, তাই কি ! আমার মনে হল, আপনি আমাকে ডাকছেন।

তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?

তা না হলে এলুম কেন ?

বুঝলে, সেদিন তুমি চলে যাবার পর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আমি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি, মনে হয় তোমার খুব কাজে লাগবে।

আপনার আগেই কিন্তু আমি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি।

তাই নাকি, তাই নাকি ?

পিতা ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, ঠিক আছে পরে শোনা যাবে। আমি জানতুম, হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তা হলে চলো এঁদের আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার অসুবিধে

হবে না ত !

কাল হলে অসুবিধে হত। আজ আর কি অসুবিধে।

মাতুলের এই কথার মধ্যে কিসের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। পিতা তেমন খেয়াল করলেন না, আমার কানে কিন্তু লাগল।

সামান্যই জিনিসপত্র। হাতে হাতে উঠে গেল গাড়িতে। কাকীমা কোথা থেকে বিভিন্ন মাপের কৌটো যোগাড় করে গরম লুচি, আলুমরিচ, সন্দেশ, এমন কি একটা শিশিতে আচারও ভরেছেন।

মাতুল মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমার জন্যে যেন একটু থাকে বউদি, আমি ফিরে আসছি।

কাকীমার মুখটা মাঝে মাঝে কেমন যেন মেরী মাতার মত হয়ে ওঠে। মুখ চোখ সব কিছু চুঁইয়ে অদ্ভুত একটা স্নেহের ধারা নেমে আসে। এখন অত ভাবার সময় নেই, পরে ভাবা যাবে।

কাকীমা বললেন, আজ তো আমার রান্না দেবতার ভোগ হয়ে গেল, আপনি এলেন। সব রাখা আছে ভালয় ভালয় ফিরে আসুন।

সব প্রস্তুত। সময় যেন হেঁকে বলছে চলে এসো।

মুকু কোথায় ! দ্যাখো, দ্যাখো মেয়েটা আবার কোথায় গেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মুকু দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের নির্জন ঘরে। যে ঘরে এতদিন তারা থেকেছিল। রাতের পর রাত মুকুর সেই অনন্ত লেখাপড়া। মেসোমশাইয়ের পড়ান। জীবন যে ঘরে ছড়িয়েছিল এখন তা আবার গুটিয়ে গেছে। শূন্য ঘরে কণ্ঠস্বর এক ধরনের প্রতিধ্বনি তোলে।

মুকু বলে ডেকে নিজেই চমকে উঠলুম। নিজের গলা, নিজের বলা নিজের কাছে ফিরে এলে যা হয়। মুকু দাঁড়িয়েছিল আমার মায়ের ছবির সামনে। অবাক কাণ্ড ! ডাক শুনে, চমকে নয়, ধীরে ফিরে তাকাল।

মুকু এবার চলো, ট্রেনের সময় হয়ে যাবে।

হ্যাঁ যাই।

মুকু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার চোখের ওপর তার স্থির পরিষ্কার দৃষ্টি। ঠোঁট দু'বার কাঁপল, তিনবারের বার শব্দ বেরলো, আমি তাহলে যাই।

নিচু হয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করছিল, হাত দুটো ধরে ফেললুম। প্রণাম নেবার একটা বয়েস আছে। যখন আব কিছু নেবার থাকে না মানুষ তখনই প্রণম্য হয়ে ওঠে। মুকুর হাত সেই যে ধরেছিলুম ছাড়লুম এসে সদরে। কাকীমা মুকুকে দু হাতে বুকে চেপে ধরে চাটনি খাওয়ার শব্দ তুলে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দুজনেই ফুলে ফুলে উঠছেন।

আর সময় নেই, এবার চলে এসো। কালের হুঙ্কার।

দুপা এগিয়ে এসে কাকীমা মুকুকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। একে একে সবাই গাড়িতে উঠছেন। মেসোমশাই উঠতে উঠতে বললেন, আপনাদের ওপর যথেষ্ট উৎপাত করে গেলুম, ক্ষমা করবেন। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে কাকীমাকে বললেন, আসি তাহলে ? বলার সময় মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। হাসির প্রলেপ মাখিয়ে মেসোমশাই বললেন, ভুলবো না কোনও দিন।

কাকীমার মুখ দেখে মনে হল ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কেউ কিছু ভুলতে চান, কেউ কিছু মনে করিয়ে দিতে চান, কারুর স্মৃতিতে আনন্দ, কারুর বিস্মৃতিতে আনন্দ। কি বিচিত্র এই পৃথিবী !

পেছনের আসনে পিতাকে বসাবার জন্যে মাতুল ঝুলোঝুলি করছেন।

পিতা বললেন, ভাবছি আমি আর যাব না, তোমরা ত রয়েইছ।

মাতুল বললেন, বাঃ, আপনাকে গাড়িতে একবার তুলবো বলেই আমার আজ আসা।

তার মানে ? সে আবার কি ? হঠাৎ তোমার এমন উদ্ভট ইচ্ছে হল !

আজই যে শেষ দিন। অদ্যই শেষ রজনী।

কথা না বাড়িয়ে পিতৃদেব পেছনের আসনে বসলেন। মানুষের কথায় অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে,

গুটনো টোপের মত, দেখতে ছোট্ট এতটুকু, খুলতে শুরু করলে ফুটের পর ফুট কাহিনী বেরোতে থাকবে। সামনের আসনে আমি আর মাতুল বসলুম। গাড়ি ছেড়ে দিল। চাপা স্বরে সকলে বললেন, দুর্গা দুর্গা।

এতক্ষণের ছড়ান ছত্রাকার জিনিস বেশ যেন গুছিয়ে উঠেছে। গাড়ির এই স্বল্পপরিসরে সব কাহিনী বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। যাওয়া আর থাকা দুটো দিকই গতিশীল, এর মাঝে মাতুল এক রহস্যের উপাদান। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালুম। আমাদের সদরে সাদা শাড়ি পরে কাকীমা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ মনে হল অত বড় একটা ভূতুড়ে বাড়িতে কাকীমাকে একা পাহারায় রেখে আসা কি ঠিক হল। যতক্ষণ আমরা না ফিরছি ততক্ষণ কি বিশ্রী লাগবে। একেবারে ফাঁকা। শুধু বিশাল এক গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ির পদচারণের শব্দ!

পিতা মেসোমশাইকে ছোটখাটো নানারকম পরামর্শ আর আশ্বাস দিতে লাগলেন। গিয়েই একটা পৌঁছনো-সংবাদ পোস্ট করে দেবেন, ভুলবেন না। মেসোমশাই হ্যাঁ বলতে পারতেন, বললেন না। আইনের লোক বললেন, চিঠি লেখার অভ্যাস আমার তেমন নেই, ওই মেয়েকে বলব, সেই একটা পোস্ট করে দেবে।

পিতা বললেন, ওদিক থেকে আপনি চেষ্টা চালান, এদিক থেকে আমরাও চালাই কনককে যেমন করেই হোক ট্রেস-আউট করতে হবে।

মেসোমশাই বললেন, আপনাদের কি-ই বা করার আছে।

মেসোমশাইয়ের জবাবে গা জ্বলে জ্বলে উঠছে, আচ্ছা ঠোঁটকাটা লোক ত। পিতা প্রসঙ্গ পালটে মাতুলের সঙ্গে কথা শুরু করলেন, তোমার গাড়িটা বেশ কমফার্টেবল হে! চলো, একদিন দূরে কোথাও ঘুরে আসা যাক।

তা হলে আজই চলুন। কাল আর এ গাড়ি থাকবে না। আজই আমার গাড়ি চাপার শেষদিন। আজই আমাদের লাস্ট রাইড টোগেদার।

হঙ্ক, হঙ্ক, হর্নের শব্দে মাতুলের কথা চাপা পড়ে গেল। শিস দিয়ে ট্রাম চলেছে।

Lead us not into temptation but deliver us from evil.

আটটা বেজে দু মিনিটে ট্রেন ছাড়বে। এখনও সময় আছে। হুইলারের স্টলে দাঁড়িয়ে মাতুল ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন। চারপাশে লোকজন ছোটাছুটি করছে। ঝাঁকা ঝাঁকা ফজলি এসেছে মালদা থেকে। প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে। নীল পোশাক পরা রেলের একজন কর্মচারী লম্বা একটা কাগজে পেনসিলের টিক মেরে চলেছেন। মাথায় বিরাট বিরাট বোঝা নিয়ে পোর্টাররা ছুটছে। পেছন পেছন তাল রেখে চলার চেষ্টা করছেন এক একটি পরিবার। এই সব কালা আদমিদের মাঝখানে, প্ল্যাটফর্ম আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন এক সায়েব দম্পতি। সায়েবের বুকের কাছে ঝুলছে ছোট্ট একটি ক্যামেরা। মুকু, মেসোমশাই আর পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন কিছু দূরে ঘড়ির তলায়। এই বিপুল ব্যস্ততার মাঝে মানুষ কিছুই আর ভাবতে পারে না। গতির চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তাই আসে না। এখানে এলেই মনে হয় যেতে হবে, যেতে হবে। বেরিয়ে পড়েছি, একটা কোথাও যেতে হবে।

মাতুল বললেন, এই দ্যাখ আমার ছবি বেরিয়েছে।

একটি সিনেমা পত্রিকার পাতায় মাতুলের ছবি। পাশে আরও দুতিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সুন্দরী চিত্রা দেবী। আর একজন মানুষ দুজনের কাঁধের ফাঁক দিয়ে মুণ্ডুটা সামনে বের করে চোখ আর মুখের এমন একটা ভাব করেছেন, দেখলেই হাসি পায়। মাতুল বললেন, চিনিস না,

এঁর নাম নবদ্বীপ হালদার।

চতুর্দিকে এঁর গলা শুনেছি। সময় সময় একটু ভালগার মনে হলেও, সেরা কমেডিয়ান। মাতুল আর একজনকে দেখিয়ে বললেন, এঁকে চিনিস ?

আজ্ঞে না।

সে কি রে ! ইনি হলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

মানুষটিকে ভালো করে একবার দেখার ইচ্ছে হল। গানে গানে পাগল করে রেখেছেন। আজ দুপুরেই শুনেছি—বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি, আঁখি হিল্লোলে মরিমরি, কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী। যেমন কণ্ঠ তেমনি আবেগ। আমাদের পাড়ায় বিশাল এক ফাংসানে এসেছিলেন। প্যাণ্ডেলে যাঁরা ঢুকতে পারেন নি, এই রকম কয়েক হাজার শ্রোতা দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে বসেছিলেন। শিল্পীর এমনই জনপ্রিয়তা, মাইকে যেই বললেন, আমার অনুরোধ, গান শোনার জিনিস, দেখার নয়, আপনারা শান্ত হয়ে বাইরে থেকেই শুনুন, অমনি সব গোলমাল থেমে গেল।

মাতুল কাগজটা কিনলেন। মুকুর জন্যে কিনলেন, শার্লক হোমসের হাউণ্ডস অফ বাস্কারভিল। মাতুলকে হঠাৎ কেনায় পেয়ে বসল। লজেন্স, চকোলেট, মুসাম্বি, চোখে যা পড়ছে সবই কিনছেন, শেষে একটা ব্যাগ কিনে সব ভরে ফেললেন।

বোঝার আয়তন দেখে মুকু কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। বলা উচিত নয়, মেসোমশাই কৃপণ না হলেও বেশ হিসেবী। মেয়েকে কখনও কোনও উপহার কিনে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ মানুষ উপহার পেতে ভালবাসে। মেয়েরা আরও বেশি।

পিতা বললেন, বেশ করেছ। এ সব ব্যাপারে তোমার কোনও তুলনা হয় না। তোমরা মনটা হল রাজপথের মত।

ভস্ ভস্ শব্দ করতে করতে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে লাগল। শুরু হয়ে গেল প্রাথমিক খণ্ডযুদ্ধ। আমাদের চিন্তা নেই, রিজার্ভেসান আছে। অবস্থা মোটামুটি আয়ত্তে আসতেই মেসোমশাই বললেন, এবার তা হলে এগনো যাক। মিনিট দশেক আর সময় আছে।

কম্‌পার্টমেন্টের বাইরে নামের লিস্ট আর টিকিট নম্বর ঝুলছে। সেই দেখে মেসোমশাইদের স্থান খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না। সহযাত্রীদেরও বেশ ভালো বলেই মনে হল। উলটো দিকের বার্থে স্বামী-স্ত্রী। চাকরি নিয়ে বিদেশে চলেছেন। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীই বেশি চটপটে। তাঁদের মাথার ওপর একজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। মেসোমশাইদের মাথার ওপর একজন যুবক। যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি সুরূপ। চা বাগানের মালিক। কলকাতায় এসেছিলেন বন্দুকের কার্তুজ কিনতে, আর নতুন একটা গাড়ি বুক করতে। সঙ্গে এক পাঁজা ঝকঝকে, ভাল ভাল বই, সংস্কৃতির পরিচয় দিচ্ছে। মাতুলের সঙ্গে পরিচয় বেরিয়ে গেল। ছেলেটির মা আর মাতুল একই গুরুর কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। ছেলেটি ভদ্রতা জানেন। পরিচয় বেরিয়ে পড়তেই মাতুলকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

চাকরেবাবুর স্ত্রী আড়ে আড়ে মাতুলকে দেখছিলেন। না দেখে উপায় নেই। এমন খাপখোলা তরোয়ালের মত চেহারা সহজে চোখে পড়ে না। হিংসে করার মত অভিজাত চেহারা। আমার মাতামহেরই কৃতিত্ব। রক্তের ধারায় গন্ধর্ব আর কিন্নরের বীজ ঘুরছে।

যা ভেবেছিলুম তাই, মেসোমশাই যুবকটিকে লুফে নিলেন। সারাটা পথ কবজা কবার চেষ্টা করবেন। স্বার্থ-সিদ্ধি করতে গিয়ে বড় মেয়েটিকে খুইয়েছেন। হয়ত পড়েছেন, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। লোভ জাগলে সে কথা আর মনে থাকে না। মানুষ নামক প্রাণীর এইটাই মনে হয় স্বধর্ম। ভুল আবার ভুল, ভুলের ওপর ভুল, অবশেষে সেই স্তূপ চাপা পড়ে মৃত্যু।

গার্ডের বাঁশি বেজে উঠল। আচ্ছা আসি, সাবধানে যাবেন, মাকে আপনার কথা বলব, গিয়ে চিঠি ইত্যাদি মিলিত মিশ্রিত কথার স্রোত ঠেলে আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে এলুম। সেই মহিলা তখনও মাতুলের দিকে 'সতৃষ্ণ নয়ন' বলে যাকে, সেই চোখে তাকিয়ে আছেন। ওঁর স্বামীটির জন্যে বড় বেদনা হল। সংসারকে জ্ঞানীরা এমনিই বলছেন—ধোঁকার টাটি, মাতুলের মুখে কবীরের ভজন শুনেছি, কঙ্কর

চুন চুন মহল বানায়া, লোভ কহে ঘর মেরা, না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, তারপর ভুলে গেছি। সেই সংসারী মানুষ যদি এমন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর বাঁধেন, যাঁর আঁখিপাখি খাঁচা ছাড়া, তাঁর অবস্থা কি হবে ! বসে থাকতে হবে পথ চেয়ে। যৌবনের পালক ঝরে গিয়ে স্ত্রী যতদিন না রোঁয়া ওঠা শালিক হচ্ছেন ততদিন বালুকাবেলায় বসবাস।

মুকু ইশারায় জানালার কাছে সরে আসতে বলল। ট্রেনের শেষ পতাকা গার্ডের কামরার কাছে দোল খাচ্ছে। পাশের কমপার্টমেণ্টের জানালার কাছে একটি শিশু মায়ের কোলে ঝিকি মেরে মেরে কাঁদছে আর চিৎকার করছে, বাবা, বাবা। মেয়েটির বাবা জানালা দিয়ে হাত বের করে ক্রমান্বয়ে নাড়ছেন। ড্রাইভারে আর গার্ডসায়েবে পতাকায় পতাকায় কথা হচ্ছে, ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিলনমেলা ভেঙে দে। আব সময় নেই। ইঞ্জিনে গতির টান লেগেছে। কি আশ্চর্য ! মুকু কিছু বলছে না কেন ?

বলো, কিছু বলো।

মুকু বললে, বাড়ি গিয়ে মায়ের ছবির পেছনটা একবার দেখো।

ট্রেন ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে। মুকু চট করে আমাব হাতের মুঠোয় একটা চিরকুট গুঁজে দিল। গতির টানে হাত থেকে হাত খুলে গেল। মুকু আমার হাতে কি গুঁজে দিল, দেখতে গিয়ে যেই মুঠো খুললুম, চলমান ট্রেনের নিঃশ্বাসে, একটুকরো কাগজ উড়তে উড়তে ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের খাঁজে ঢুকে গেল।

পেছন থেকে পিতা আর মাতুল বলছেন, চলে এসো, চলে এসো।

কথা আমার কানে ঢুকছে না। লাইনে আর অপসৃয়মান সরীসৃপের চাকায় চাকায় ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে। দূরে ইনজিনে তাল ধরেছে, ভেঙে যায় চুরে যায়, ভেঙে যায় চুরে যায়। হাত নেড়ে বললুম, যাচ্ছি।

ঠ্যাঙা গার্ডের কামরা, এক জোড়া নুলো হাতের মত বাফার, আর লাল আলো নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য প্ল্যাটফর্ম আর অনেক নিচে জোড়া জোড়া লাইন। রত্ন হারিয়ে মানুষ যে চোখে তাকায় সেই চোখে পাতা লাইনের দিকে তাকালুম, যদি পাই লাফিয়ে পড়ব। কোথায় কি ! এক টুকরো কাগজের বদলে অসংখ্য টুকরো পড়ে আছে। পড়ে আছে কলার খোসা, ডাবের খোলা, তেল কালি, কয়লা ছাই।

কাঁধে হাতের স্পর্শ। মাতুল বললেন, চলে আয়। স্মৃতি লাইনে কেউ ফেলে যায় না, রেখে যায় মনে। কত যাবে, কত আসবে, মন খারাপ করলে চলে ! ভাবকে চেপে রাখবি মনে, তবে সে ঠেল মারবে সৃষ্টিতে !

মাতুল বীরের মত বলছেন বটে ; কিন্তু তাঁর চোখ দুটি ছলছল করছে। চশমার কাচে আলো পড়লেও দেখা যাচ্ছে। মাতুল শিল্পী মানুষ, তিনি সৃষ্টির কথা বলতে পারেন, আমার ত সবই অনাসৃষ্টি।

এসেছিলুম পাঁচ জন। ফিরে চলেছি তিন জন। ঘটনা প্রতিমুহূর্তেই জীবনের সার কথা বলে যেতে চায়। পাগল ছাড়া কেউ বোঝে না। আমাদের মণি পাগলী বেশ বলে, সুর করে গায়, আমার দিন থাকে না, আমার রাত থাকে না। আমার প্রাণ থাকে না, আমার মান থাকে না। তারপর মার্চিং সঙের মত ধমকে ধমকে বলতে থাকে, দশ, নয়, আট্, সাত্, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, শূন্য, ফক্কা ফাঁক।

মাতুল পিতাকে বললেন, চলুন, আজ আপনাকে সারা কলকাতা ঘোরাব। এমন সুন্দর রাত ! দখিনা বাতাস বইছে।

কলকাতায় কি ঘুরবে ! শুধু শুধু সময় নষ্ট। চলো বাড়ি ফিরে যাই।

কাল ত রবিবার ! ভয় পাচ্ছেন কেন ? অদ্যাই শেষ রজনী। কাল ত আর গাড়ি থাকবে না ! কলকাতার শনিবারের রাত দেখে নিন। কত দিন পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে ! আপনি আমার পিতার মত, নেক্সট টু মাই ফাদার !

তোমার কথায় আজ বড় বৈরাগ্যের সুর বাজছে। ব্যাপারটা কি বলো তো ! তখন বললে পথের সন্ধান পেয়েছ, সমস্যার সমাধান করে ফেলেছ। খুলে বলো ত।

মাতুল চালককে বললেন, পার্ক স্ট্রিট চলো। তারপর পিতাকে বললেন, সহজ সমাধান। সিম্পল

সলিউশান। ছবিটা যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই পড়ে থাক। গাড়িটা বেচে দিয়েছি। সেই টাকায় ছোটখাটো দেনা শোধ। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

সে কি, চাকরি! দাসত্ব তোমার মেজাজে ধরবে না। তুমি রজোগুণী মানুষ!

চাকরিটা একটু অন্যরকম, তাই সাহস করে নিতে পেরেছি। টিসকোর একটা মিউজিক কলেজ আছে। সেই কলেজে প্রিনসিপ্যালের চাকরি। মনে হয় দশটা পাঁচটার ব্যাপার নয়। মাইনেও ভাল। যদি কিছু টাকা জমাতে পারি, যদি একজন ফাইনানসার পাই, ছবিটা শেষ করব। যদি হিট করে, এক সপ্তাহে টাকা উঠে আসবে, তখন বাড়িটার মর্টগেজ ছাড়াব। গয়না উদ্ধার করব। এক মাস যদি রমরম করে চলে, মধুপুরের বাড়িটার সংস্কার করব, নতুন আর একটা ছবি ধরব।

সবই ভাল, তবে কি জান, বড় বেশি যদি রয়েছে। যদিগুলোকে যদি বাদ দিতে পারতে!

আজ্ঞে টাকার অভাব হলেই যদি আসবে। একমাত্র টাকাতেই যদির উৎপাটন সম্ভব! টাকাই হল সুপ্রিম ডেন্‌টিস্ট!

তোমার বুঝি সেই রকম ধারণা!

আজ্ঞে হ্যাঁ। টাকা হল জার্মান ট্যাঙ্কের মত গড়গড়িয়ে চলে।

খুব ভাল ধারণা হে! এই ত একজন মানিড ম্যানকে আমরা সি-অফ করে এলুম। তিনি কি সুখী! টাকা তাঁর জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? পারেনি। একটা মজার ইংরিজি উক্তি শোন, মন দিয়ে শুনবে, অনেক 'পান' আছে: The only incurable troubles of the rich are the troubles that money cannot cure. /Which is a kind of trouble which is even more troublesome if you are poor. শুনলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে ও হল গরিবের, দ্রাক্ষাফল টক জাতীয় কথা।

পিতা শব্দ করে হাসলেন, হেসে বললেন, তা হতে পারে, বড়লোক না হলে যাচাই করা যাবে না। টাকার দুটো পিঠই যে সমান, টাকা না হলে বুঝি কি করে!

প্রসঙ্গ পালটে পিতা বললেন, ও অমন ম্যাদামারা হয়ে বসে আছে কেন?

আমার কথা হচ্ছে। মাতুল বললেন, মন খারাপ হয়েছে। মা-মরা ছেলেরা সকলকে বড় আঁকড়ে ধরতে চায়। বড় ভাবপ্রবণ হয়। মনে একটা শূন্যতা নিয়ে ঘোরাফেরা করে।

তা বললে ত চলবে না। তোমার ইমোশানকে কে বসে বসে পাখার বাতাস করবে? মনকে শক্ত করতে হবে। যোদ্ধা হতে হবে।

মাতুল বললেন, বি চিয়ারফুল মাই বয়।

পেছনের কোনও কথাই আমার তেমন কানে যাচ্ছে না। আমি ভাবছি মুকু শেষ মুহূর্তে আমার হাতে যে চিরকুটটা গুঁজে দিয়েছিল, তাতে কি লেখা ছিল? কি এমন কথা যা মুখে বলা যায় না! অদৃষ্টলিপির মত যা ট্রেনের চাকায় চাকায়, ইন্‌জিনের নিঃশ্বাসের টানে উধাও হয়ে গেল। কি লেখা ছিল! মায়ের ছবির পেছনে কি আছে! কি রেখে গেছে মুকু! এই আলোকিত পার্ক স্ট্রিট, এই রাতের কলকাতায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার প্রস্তাব, কোনওটাই আমার ভাল লাগছে না।

মাতুলের নির্দেশে গাড়ি রাস্তার বাঁ দিকে থেমে পড়ল। আমাদের নামতে বললেন। সামনেই খুব ভদ্র চেহারার সায়েবী রেস্তোরাঁ। সামনের দিকটা পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা। ভেতরে মোম-মোলায়েম আলোর বাহার। যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাইতেই মনে হচ্ছে ফিলটার করা ভদ্রলোক।

পিতা বললেন, এখানে তুমি কি করবে?

আপনাকে এক কাপ সর্বাঙ্গ সুন্দর চা খাওয়াব, আর দু'একটা সুইস প্যাসট্রি।

বড় ফ্যাশানেব্‌ল জায়গা যে! কৃত্রিম মানুষে ভরা। এখানে খাওয়ার চেয়ে খাওয়ার ভড়ংটাই বড় হয়ে উঠবে জয়।

ও আপনি একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন। চায়ের তৃষ্ণাটা মিটিয়েনি। এই শহরে আজ আমার শেষ

রাতের আগের রাত। আজ একটু বেহিসাবি হতে দিন।

বেহিসাবি ? তোমার বেহিসেবটাই ত হিসেব জয় ! শিল্পীর জীবন, তোমাকে ক্ষমা করা যায়। তুমি যদি খেরোর খাতা খুলে বসো বড় বেমানান হবে ! কবে যাচ্ছ তুমি ?

কালকের দিনটা আছি।

মাতুলের সঙ্গে আমরা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লুম। এলাহি ব্যাপার। পিতা কিন্তু বেশ মানিয়ে নিলেন। একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এল। মনে হল রোজই তিনি সকাল বিকেল এখানে চা খেতে আসেন। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন, আমি তাকিয়ে রইলুম দেয়ালে সাঁদ করান বিশাল অ্যাকোরিয়ামের দিকে। স্বপ্ন ভরা, কাচের চৌকো আধার। আলোর তরল ধারায় রঙিন ইচ্ছের মত মাছ ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক নিচেই বসেছেন একজন পুরুষ আর মহিলা পাশাপাশি। দু'জনেই সুন্দর। মহিলার মুখ, চোখ, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে সুখের সমুদ্রে পদ্মের মত পাপড়ি মেলেছেন। বাতাসে নৌকা ভাসিয়েছেন। আমার ভীষণ মুকুর কথা মনে পড়ছে। আজ থেকে হয়ত সাত বছর পরে ওইরকম কোনও সুবেশ সুন্দর তরুণের সঙ্গে মুকু ঠিক ওই জায়গাটিতে এসে বসবে। ওইরকম সুখী চেহারা নিয়ে। পেছনে মাছ খেলবে। ঘাড় একপাশে কাত। বড় ঘনিষ্ঠ। কুচকুচে কালো চুলের চকচকে খোঁপা পিঠের কাছে, একমুঠো নরম কামনার মত দলা পাকিয়ে থাকবে। কি আশ্চর্য মানুষের মন। পাশেই বসে আছেন দুই গুরুজন। আর আমি কি সব ভাবছি ! মানুষের আগুন কি ভাবে জ্বলে ওঠে ! জলে ভাসমান এক টুকরো জ্বলন্ত কর্পূরের মত !

বড় সুস্বাদু প্যাস্ট্রি। জিভে পড়ামাত্র মিলিয়ে যাচ্ছে চকোলেটের গন্ধ নিয়ে। চায়ের তেমন কোনও আহামরি বুঝছি না। পিতা কিন্তু খুব তারিফ করছেন। বলছেন, রিয়েল ইংলিশ টি।

পিতা বললেন, তুমি কি একলা যাচ্ছ ?

না, সপরিবারে !

থাকার ব্যবস্থা ?

ভাল কোয়ার্টার।

বেশ, তা তোমার পিতৃদেব !

নিয়ে যাওয়া যাবে না। তিনি একই দিনে রওনা হচ্ছেন হরিদ্বার। আটকান গেল না।

কই আমাকে ত কিছু বললেন না ?

নিশ্চয়ই বলবেন। আপনি ওঁর বড় ছেলে। আমার ওপর ভীষণ অভিমান হয়েছে। অভিমান হলেই ওঁর বৈরাগ্য আসে।

তুমি কি বুঝবে বলো ! একে বলে, ওয়ান চাইল্ড সিন। ওঁর আর আমার একই অবস্থা !

বিল এসে গেল। পিতৃদেব আর মাতুল একসঙ্গে হাত বাড়ালেন। মাতুল বললেন, এটা আমার বিষয়।

পিতা বললেন, পাগল হয়েছ, জীবনে আমি কখনও অন্যের পয়সায় খাইনি, তুমি আমার সে রেকর্ড নষ্ট করে দিতে পার না ! তাহলে তোমার অপরাধ হবে। তাছাড়া; আমার বয়েস। বয়েসটার কথা একবার ভাবো !

বয়েস আমি ভাবতে রাজী আছি। আপনি আমার চেয়ে বড়। বয়েসে, সম্মানে ; কিন্তু পরের পয়সা ! কথাটায় বড় আঘাত পেলুম। আমি ত কখনও আপনাকে পর ভাবিনি। আপনি আমি আর দিদি একই বিছানায় দিনের পর দিন শুয়েছি। অসুখে আপনি আমার সেবা করেছেন। সে সব ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব !

স্নেহের ঋণ অর্থে শোধ করা যায় না জয়। সে চেষ্টা কোরো না। পৃথিবীটা তাহলে বিশাল এক গোলদারি দোকান হয়ে বসবে। কারেন্সি নোটে স্নেহ বিক্রি হবে। দশ টাকার ভালবাসা, বিশ টাকার ভালবাসা।

মাতুল করুণ মুখে বললেন, আপনার হিসেব থেকে একটা দিন আমাকে দিন, ওনলি ওয়ান ডে, তা না

হলে মনে হবে, আপনি আমাকে পপার ভাবছেন!

যেদিন তুমি প্রকৃত নিঃস্ব হবে সেদিন ত তুমি আরও কাছে চলে আসবে। মনে আছে, তুমি আমার কোলে বসে প্রথম আসরে গান গেয়েছিলে, একটি ভজন, জয় রঘুপতি, শ্রীরামচন্দ্র, সীতাপতি রঘুরাই। শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিভা মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, আর তখনই সে হয় প্রকৃত ধনী।

মাতুল করুণ মুখে বললেন, তাহলে আমি কি করব! আমার যে বড় আশা ছিল।

ঠিক আছে, আজ তুমিই দাও। অনুমতি দিলুম।

সামান্য ব্যাপার কত অসামান্য হয়ে ওঠে। মাতুলের মুখ দেখে মনে হল হাতে স্বর্গ পেলেন। টাকা-পয়সা মিটিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। রাত যেন আরও মদির হয়েছে।

মাতুল বললেন, এইবার, আমরা আর এক জায়গায় যাবো, যেখানে গেলে আপনি ভীষণ খুশি হবেন।

কোথায়?

আমার গুরু এসেছেন, অনেকদিন পরে এই কলকাতায়।

তোমার ত তিনজন গুরু।

শেষ তালিম যাঁর কাছে, সেই বিখ্যাত বিনায়ক রাও পটবর্ধন।

বলো কি! তিনি এসেছেন! কোথায় উঠেছেন?

প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের এক বাড়িতে।

চলো তাহলে?

নিউ মার্কেট থেকে তাহলে কিছু ফল আর ফুল কিনেনি। বড় সাত্ত্বিক মানুষ। এক ভরি ভাল আতর কিনতে পারলে বেশ হত।

আতর তুমি এ পাড়ায় পাবে না, ছুটতে হবে কলুটোলা।

নিউ মার্কেটের দিকে গাড়ি ঘুরল। ফলের বাজার লাল করে রেখেছে আপেল। আঙুর এসেছে। আপেলের দাপটে ন্যাসপাতি কোণঠাসা। দেখতে দেখতে ঠোঙা ভরে উঠল। থরে থরে সাজান শুকনো ফল। নিজেকে মনে হচ্ছে ওমর খৈয়াম। পারস্যের কোনও এক অতীত রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যেই মাতুলের আশি টাকা শেষ। গাড়ি চলেছে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের দিকে। ফল আর মেওয়ার গন্ধ ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে নতুন এক সুগন্ধ তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুলবুল শিস দিয়ে উঠবে।

দেবদারু গাছ দিয়ে ঘেরা সাবেক আমলের বিশাল এক বাড়ি। কলকাতার নির্জনতম এলাকা। যত না রাত, মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি রাত জমেছে এ তল্লাটে। আদ্যিকালের আলোকস্তম্ভ থেকে পাণ্ডুর আলো অন্ধকারের নিতম্বে সামান্য লজ্জা-বস্ত্রের মত দুলছে।

সামনেই বিশাল গেট। গেটের বাইরে আলোকিত কাঁচের ফলকে গৃহস্বামীর নাম ও নম্বর। মোরাম বিছান পথ বাঁ দিকে চলে গেছে ভদ্র মোচড় মেরে, অতি গভীর এক গাড়ি-বারান্দার দিকে। সেখানে সাদা একটা ডুম থেকে বৈধব্যের আঁচলের মত আলো লুটিয়ে পড়েছে। গাড়ির চাকায় চাকায় মোরামের মুমূর্ষু আর্তনাদ।

প্রাসাদের মত বিশাল বাড়িটি যেন সুর সাগরে ভাসছে। কোথাও কোনও এক জায়গায় একসঙ্গে গোটা তিনেক তানপুরা বাজছে। মাতামহ ঠিকই বলেন, সুরে বাঁধা তানপুরায় হরি ওঁ, হরি ওঁ শব্দ ওঠে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হতেই, দেবদারুর পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দের সঙ্গে সুর ভেসে এল। ভেতরে আলাপ চলেছে। ভরাট নিটোল কণ্ঠ।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা তিনজন কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলুম। সুরে অবগাহন। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে পালিশ করা বিশাল দরজার দিকে। সেখানে ঝকঝক করছে পেতলের হাতল। একটি মকরের মুখ।

মাতুল ফিস-ফিস করে বললেন, আহা মারু বেহাগ।

আমাদের অবস্থা ফণা তোলা সাপের মত। স্থির হয়ে গেছি। নড়তে চড়তে পারছি না। শরীর প্রতিটি কোষ দিয়ে আরকের মত সুর শুষছে। ইতিমধ্যে আলাপ থেকে শিল্পী নেমে এসেছেন বাণীতে,

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভিনবদনৈঃ
প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।

ধরতাই ভবানি শব্দটি খাদ থেকে একেবারে তারায় চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের সহস্রার ভেদ করে জ্যোতির্লোকে চলে যাচ্ছে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত ধাপে ধাপে উঠছি। হাতে ফল। একগুচ্ছ সাদা গোলাপ।

The hour has come: Let us wander into the night.

হলঘরে মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালুম। রাত বেশ গভীর। সারা বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। অন্যদিন হলে ঠিক পাশের ঘরেই মেসোমশাইয়ের নাক ডাকার শব্দ শোনা যেত। শোনা যেত, মুকু পাশ ফিরছে, ঘুমের ঘোরে হাত তুলেছে তাই চুড়ির মৃদু প্রতিবাদ, আঃ কি হচ্ছে!

এই চুড়িব শব্দের সঙ্গে আঃ, কি হচ্ছে শব্দটা এমন ভাবে আমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না। মনের সঙ্গে শব্দটা ভাল কিছু জড়িয়ে দিতে পারে নি, যেমন ঘন্টা আর শাঁখের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবালয়ে আরতির দৃশ্য, ধূপ আর ধুনোর গন্ধ, পুরোহিতের পৈতা শোভিত, উদার অনাবৃত গৌরবর্ণ পৃষ্ঠদেশ। উঃ আর আঃ-র সঙ্গে রোগশয্যা। ওই শব্দটি বড় দেহবাদী। মধ্যরাতে কাছাকাছি দুটি দেহের অবস্থান। উত্তাপ আবেগ, জীবলীলার যাবতীয় উষ্ণ প্রক্রিয়া। ইচ্ছা জড়ান একটি প্রতিবাদ শব্দ। যৌবন উদ্‌গমে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটি ঘরে শুয়ে, সারা রাত পাশের ঘরে এমনি শব্দ শুনেছিলুম। চুড়িব রিন রিন আর আঃ কি হচ্ছে! পরেব দিন সকালে আমার সেই একান্ত বান্ধবের দাদার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারি নি। সকালে বউদি যখন চা দিতে এলেন আমি মুখ নিচু কবে রইলুম। সব মানুষই অক্লেশে কেমন দুটো জীবন বহন করে চলে। সবাই জানে পোশাকের তলায় থাকে নগ্ন শরীর। এ জানা আরও এক ধাপ বেশি জানা;

মন যে এক নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্রী বস্তু, আর একবার জানা হল এই মুহূর্তে। রাত যখন নিস্তব্ধ গভীর, পৃথিবী যখন ঘন ঘোর, অশরীরীরা যখন বিচরণশীল, সাধকরা যখন ধ্যানের আসনে, সেই সময় সন্তান কেমন কবে মায়ের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবতে পারে! মানুষ বড় ক্ষুধার্ত প্রাণী।

ছবিটা একপাশে সামান্য হেলে আছে। মধ্যরাতে পরলোকগত কোনও নিকটজনের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়ালে যে গা ছম ছম করে, শরীরে এক ধরনের শিহরন হয় এই প্রথম অনুভব করলুম। ঘর থেকে ঘরে লাল মেঝে চলে গেছে। ওপাশের স্টোর রুমে, জানালার খাঁজে ফার্পো রুটির এক গাদা খালি ঠোঙা, পিতৃদেবের, যাকে রাখ সেই রাখের নির্দেশে পর্বত প্রমাণ হয়ে আছে। সেখানে ধেড়ে ইঁদুর নৃত্য করছে। বাইরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

দেয়ালে কোনও ছবি হেলে আছে দেখলে, পিতা বড় অসন্তুষ্ট হন। ঘটনা ঘটে গেছে বিকেলে, তারপর তিনি আর এ ঘরে আসার সুযোগ পাননি। যদি আসতেন ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। মৃতের প্রতি এত বড় অসম্মান! পারলে অপরাধীকেই ছবি করে ঝুলিয়ে দাও।

দু হাত বাড়িয়ে ছবিটিকে সোজা করতে গিয়ে আবার হাত সরিয়ে নিলুম। মা যেন ফিস ফিস করে বললেন, খোকা! তুই কত বড় হয়ে গেছিস।

সাহস করে মায়ের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখুনি হয়ত চোখের পাতা পড়বে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শোনা যাবে। ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। মনে হল জিজ্ঞেস করি, তুমি এখন কোথায় আছ মা? শুনেছি পরলোকে অনেক স্তর আছে! কোন্ লোকে

তোমার অবস্থান !

মা যেন বললেন, জীবন কেমন লাগছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর এখনই আমি কেমন করে দেবো ! যেমনই লাগুক, জীবন থেকে ত বেরিয়ে যেতে পারব না। পুরো মেয়াদ আমাকে খেটে যেতে হবে।

মনে আর চোখে যে ঘোর লেগেছিল, হঠাৎ সে ঘোর যেন কেটে গেল ! ছবি সেই ছবিই। বহুকাল আগে বেঁচে থাকা কোনও এক স্নেহময়ী জননীর ধূসর হয়ে আসা একটি পট। যিনি ছিলেন এখন আর নেই। ঠোঁটের কোণে সুখের দিনের এক চিলতে হাসি। যাঁকে ভুলতে ভুলতে প্রায় ভুলেই এসেছি। আজকাল ল্যাবরেটারিতে একটা জিনিসের দিকে প্রায়ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। বোতলেব মুখে ফানেল, ফানেলে ভাঁজ করা ফিল্টার পেপার, কাচের মত স্বচ্ছ তবল পদার্থ টুপ টুপ করে পড়ছে, ফিল্টার পেপারে জমে উঠছে তলানি। জীবনের নির্যাস কালের বোতলে টুপ টুপ করে পড়েই চলেছে, আমরা সব রেসিডিউ।

রবিবাবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, কি অমন দ্যাখো বলো ত হাঁ করে?

অনুমতি নিয়ে ছবির পেছনে হাত দিলুম। দেয়াল আর ছবিব মাঝখানে একটা খাম ছিল। দেয়াল বেয়ে খস্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিলুম। ছবিটিকে জ্যামিতিক কোণ মেপে সোজা করে, টেবিল ল্যাম্পের তলায় এসে বসলুম।

এখন আমার একটা নিজস্ব ঘর হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছিল কযেকদিন আগেই। দখল নিয়েছি আজ। পিতা যেদিন ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন হঠাৎ, সেই দিনই বললেন, রাতই হল মানুষের সাধনার সময়, অলৌকিক দর্শনের সময়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সময়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকবা বসেছেন আসনে, পৃথিবীর নাভিপদ্ম থেকে উঠছে অনাহত ওঁকাবধ্বনি, পাহাড়ের গা বেযে নেমে আসছে ঝবনা কলস্বনে, উত্তাল হিমবাহ নামছে ভীমগর্জনে, সাইবেরিয়াব বরফ-সমুদ্রে সশব্দে ফাটল ধরছে, এই সময়ের সঙ্গে কেউ যদি নিজেকে একবার জুড়ে দিতে পারে, তাব আরোহণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। জীবন বড় সংক্ষিপ্ত। যে যেখানে আছ শুরু করে দাও। শুরু করে দাও এখনই। সেই লালা বাবুব মত। যেই শুনলেন মা ডাকছে মেয়েকে, ওরে আয়, বেলা যে পড়ে এল, অমনি তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সব ছেড়ে। জানি প্রথম প্রথম একা শুতে একটু ভয ভয় করবে, পরে অভ্যস্থ হয়ে যাব। সন্দেহ হয়, এ ব্যবস্থা বোধ হয় আমাব পিতার পূর্ব পরিকলপনা। জীবনে একটি মেয়ে আসছে। ফল পেকে টুসটুসে হয়ে ঝুলছে।

সিল করা খাম। ভেতরে শক্তমত কিছু একটা আছে। আলোর সামনে তুলে ধরতেই বোঝা গেল, ভেতরে একটি আঙটি, আর ভাঁজ করা একটি কাগজ রয়েছে। খামটা সাবধানে ছিঁড়তে যাব, দরজায় টোকা পড়ল। তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলুম। গোপনে দেখতে হবে, কি রেখে গেছে মুকু।

দরজা খুলেই চমকে গেলুম। দাঁড়িয়ে আছেন কাকীমা। চোখ মুখ ভয়ে কেমন যেন বিবর্ণ। আমার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে এসে, ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, দরজা দাও, দরজা দাও।

দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েই মনে হল, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। হঠাৎ পিতা যদি উঠে আসেন খোঁজখবর নেবার জন্যে, আর যদি দেখেন ইনি রয়েছেন, তাহলে এমন কিছু ভাববেন না ত, যা একটু অন্য রকম। ভাবা গেল কিছু করা গেল না। কাকীমা মেঝেতে বসে পড়েছেন।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, কি হল ? ফিস্ ফিস্ করেই বললেন, কাছে আয়, বলছি।

পাশে বসতেই আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। হাত কাঁপছে। পিন্টু, আমি নিচে শুতে পারলুম না রে ! এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

কেন, শীত করছে ?

না, না শীত নয়। ভয়ে।

কিসের ভয় !

কাকীমা এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। খোলা জানালায় অন্ধকার আকাশ, সেই দিকে ভয়ে ভয়ে

একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার হাতে তাঁর হাতের মুঠো শক্ত হল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন।

সর্বনাশ, অজ্ঞান হয়ে গেলেন ? না মৃত্যু ! সন্ন্যাস রোগ আজকাল খুব হচ্ছে। বুকে কান পেতে দেখলুম। সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। বেঁচে আছেন। পরক্ষণেই মনে হল, মারা গেলে বেঁচে যেতেন। কোনও দিনই জানতে পারতেন না স্বামীর মৃত্যুর কথা। পরক্ষণেই মনে হল, মারা গেলেই থানা পুলিস হত। শুধু তাই নয়, ফাঁকা জীবন আরও ফাঁকা হয়ে যেত। তবু ত একজনের স্নেহ পাচ্ছি।

বিশ্রী ভঙ্গীতে শুয়ে পড়েছেন। কোনও রকমে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিতে পারলে বেশ হত। আমার সে শক্তি নেই। মেঝেতেই নানা কায়দা করে চিত করে শুইয়ে দিলুম। পা দুটো ধরে সোজা করে দিলুম। এক রকম হল। খোঁপা বালিশের কাজ করছে। শাড়িটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। এত দৈন্য কেন ? স্বামী ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কেউ নেই ?

কপালে ভিজে হাতের তালু, পাখার বাতাস, কাকীমা চোখ মেলে তাকালেন। পরিবেশে ফিরে আসতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল।

চাপাস্বরে বললুম, আমার বিছানায় একটু শুয়ে নিন।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসতে বসতে বললেন, এখানেই বেশ আছি।

কি হয়েছে আপনার ?

আগে ওই জলের গেলাসটা আন।

আলগোছে ঢকঢক করে জল খেলেন। হাত এখনও সামান্য কাঁপছে। বুকের কাছে জল ছলকে পড়েছে। চিবুকে একবিন্দু জল আটকে আছে। টেবিলের আলো পড়ে হীরের মত চিক চিক করছে। গেলাসটা পাশে রাখলেন। সরাতে গেলুম, বললেন থাক।

এইবার তা হলে বলুন, কি হয়েছে ?

কাকীমা জানালার বাইরের অন্ধকারের দিকে আবার একবার তাকালেন। মহাশূন্য থেকে কেউ কি ভেসে ভেসে আসবে। ওঁর ভাব দেখে আমার নিজেরই কেমন ভয় ভয় করছে। হঠাৎ একটা কথা ভেবে গা হিম হয়ে গেল। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে, যে কোনও মুহূর্তে, কাকাবাবু আসতে পারেন। অপঘাতে মারা গেলে আত্মা সহজে মুক্তি পায় না। আপন জনের কাছে ফিরে ফিরে আসতে চায় পূর্বের দেহ ধরে।

কাকীমা আর আমার মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে সেটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারলে একটু সাহস পাই। বলা যায় না ওই টুকুর মধ্যে প্রফুল্লকাকার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না ! আমার চোখে আবার সেই মর্গের দৃশ্য ফিরে আসছে। ঢালু বেয়ে এক একটি দেহ গড়িয়ে আসছে। কারুর মুদিত, কারুর নিমীলিত, কারুর বিস্ফারিত আতঙ্কিত চোখ। আততায়ীকে দেখে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। কারুর ঠোঁটের কোণে খেলোয়াড়ী হাসি-মৃত্যুর পরোয়া করি না।

মানুষ মনের কথা পড়তে পারে কি না জানি না, কাকীমা বললেন, আমার কাছে সরে আয়।

প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসলুম। মহিলার অনাবৃত ওপর বাহু বরফের মত শীতল। লাল সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটি মাদুলি। জানি ওটি কিসের ! সন্তানের প্রার্থনা। তাগার সুতো ঝুলছে। সেই ঝোলা অংশ মাঝে মাঝে আমার হাত স্পর্শ করছে। প্রথমবার চমকে দিয়েছিল।

কাকীমা বললেন, কি ব্যাপার বল ত পিন্টু ! এত দিন নীচে একা একা শুয়ে থাকি, কই কোনও দিন ত এমন হয় নি !

কি হল ?

হাতপাখা টানতে টানতে, কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। খেয়াল নেই। ইঁদুর, আরশোলা খুটুর খুটুর করছিল। ও অমন রোজ করে। অভ্যাস হয়ে গেছে। আলো নিবে গেলে ওদেরই রাজত্ব। কেন জানি না, হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বিছানায় শুলেই আমি মরে যাই। পড়লুম কি মরলুম। ঘুম ভাঙে সেই ভোরে। ঘুম ভাঙল, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। কি হচ্ছে, কিছুই বুঝতে

পারছি না। কেমন যেন শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। উঠে পড়লুম বিছানা ছেড়ে। ভাবলুম বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গার একটু হাওয়া বাতাস লাগালে হয়ত ঠিক হয়ে যাবে। অন্ধকারে দরজা খুলে বাইরের গলিতে পা দিয়েই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। রান্নাঘবের সামনের রকে সাদা মত কে একজন উবু হয়ে বসে। মাথাটা যেন দু হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। চোর নয় ত! বদমাইশ লোকও হতে পাবে। খুব জোরে কে বলে চিৎকার করার চেষ্টা করলুম, গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরলো না। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালার ইচ্ছে হল, চলতে পারলুম না। শরীর যেন পাথরের মত হয়ে গেছে। সেই মূর্তি পিন্টু উঠে দাঁড়াল। তোমার কাকাবাবু। তখন আমাব সাহস ফিরে এল। আমি বললুম, এ কি তুমি কখন এলে? কে তোমাকে সদর খুলে দিলে? এখানে বসে আছ, আমাকে ডাক নি কেন, মুখে কোনও কথা নেই। ভাবলুম, কোনও খবব না দিয়ে, এতদিন পরে ফিরেছে, তাই বোধহয় লজ্জায কোনও কথা বলছে না। আমাকে পাশ কাটিয়ে মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি পেছন পেছন ঘবে ঢুকে, হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বের করতে করতে, রাগের গলায় বললুম, তোমাব সেই ভাঙা লাইটারটা জ্বেলে ধরেও ত একটু উপকাব করতে পাব স্বার্থপব। আলো ত জ্বলল পিন্টু, তাবপব যা হল, তোমাকে বলে বোঝাতে পাবব না। ঘরে কেউ নেই। বিছানায নেই, খাটে নেই, খাটেব তলায় নেই, কোথাও নেই। আলো হাতে বাইরে এলুম, জোরে জোরে বললুম, কি গো, আমাব সঙ্গে চোব চোর খেলছ নাকি! চারপাশ বাকসর মত বন্ধ, মানুষটা এলো কোথা দিয়ে। রান্নাঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল তোলা। হঠাৎ ঘরের মধ্যে দুম করে একটা শব্দ হল। আলো হাতে ছুটে গেলুম। ঘবেব মাঝখানে তবলা ঠোকা হাতুড়িটা পড়ে আছে। তুমি বিশ্বাস কবো পিন্টু, হাতুড়িটা ও যাবাব সময় ঝুলিতে ভরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনও বকমে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

কাকীমা হঠাৎ দু হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধবে ফুঁপিয়ে উঠলেন, ও আব বেঁচে নেই, কিছুতেই বেঁচে নেই।

আর একটু হলেই আমাব মুখ ফসকে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ছিল, মিথ্যে বলার নৈতিক সাহস পেলুম এই ভেবে, মর্গে আমিই যে ঠিক দেখেছি, তার কি প্রমাণ আছে।

আমি জোব গলায় বললুম, আপনার চোখের ভুল। বড় বেশি ভাবছেন, তাই স্বপ্ন দেখেছেন।

তুমি বলতে চাও, আমি স্বপ্নে দরজা খুলেছি, স্বপ্নে আলো জ্বেলেছি? স্বপ্নে মানুষ এ সব পারে!

কি বলছেন আপনি? মানুষ স্বপ্নের ঘোরে মাইলের পব মাইল হেঁটে যেতে পাবে। বন্ধুব বাড়িতে গিয়ে তাস খেলে আসতে পারে। খুন করে আসতে পারে। দিনের পর দিন এই রকম হলে ওটা হয়ে দাঁড়ায় একটা অসুখ, ইংবিজীতে বলে স্লিপ ওয়াকিং। তখন ডাক্তার ডাকতে হয়। লেডি ম্যাকবেথ বাজাকে খুন করাব পর, ওই ভাবে মাঝরাতে প্রাসাদে বাতি হাতে হেঁটে বেড়াতেন।

অদ্ভুত নাম শুনে কাকীমাব যেন একটু বিশ্বাস হল। জিজ্ঞেস করলেন, লেডি ম্যাকবেথ কে?

ম্যাকবেথেব বউ। ও সব হল রাজারাজড়ার ব্যাপার। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় মানুষের ওরকম হয়।

পিন্টু তুমি আমার সঙ্গে একবার নিচে যাবে! একবার ভাল করে দেখা দরকার। তুমি যাই বলো, এ আমার চোখেব ভুল নয়। আমি খুব একটা ভীতু মেয়েমানুষ নই। পাড়াগাঁয়ে মানুষ। কাল আমি একবার থানায় যাবই। শুনেছি মানুষ হারিয়ে গেলে থানায় খবর দিতে হয়।

থানা কিছু করে না। নাম ঠিকানা লিখে রেখে ছেড়ে দেয়। বড় জোড় একটা ছবি চাইতে পারে। ছোট ছেলে হলে একটু যত্ন নেয়। ছেলেধরাব উৎপাত আছে। উদ্ধার করতে না পারলে, বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষে করাবে। বড়রা কোনও দিনই ছেলেধরার হাতে পড়বে না। হারিয়েও যাবে না। বড়দের রাস্তাঘাট সব চেনা। পুলিস জানে, কেউ সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ পরিবারকে জব্দ করার জন্যে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে অনেকদিন। কেউ কোনও অন্যায় করে ফেরার হয়ে যায়। সময় হলে সবাই আবার সুড়সুড় করে ফিরে আসে। পুলিস সব জানে। জানে বলেই বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না।

কিন্তু কনকের মত কেউ যদি মারা গিয়ে থাকে?

কনক মারা গেছে কে বললে ?

দ্যাখো দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা বড় সাংঘাতিক জায়গা। চান করতে করতে বান এসে গেলে সাঁতার জানা লোকও সামলাতে পারে না। ডুবে না গেলে মেয়েটা যাবে কোথায় ? মেয়েরা কি ছেলেদের মত পালাতে পারে ?

কেন পারবে না। পালানোর ব্যাপারে ছেলেতে মেয়েতে বিশেষ তফাত নেই। আমাদের পাড়ার ভারতী নায়িকা হবে বলে একা একা বম্বে পালিয়েছিল।

তারপর কি হল ?

এক মাস পরে ফিরে এল। ভারতীর মা রেগে তার সব চুল কামিয়ে ন্যাড়া করিয়ে দিলেন। পাড়ার লোক নায়িকা ভারতীর বদলে বলতে লাগল ন্যাড়া ভারতী।

নানা প্রসঙ্গ টেনে কাকীমাকে সহজ করে আনার চেষ্টা সফল হচ্ছে বলেই মনে হল। কাকীমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি আমি। কাকাবাবু একবার যখন এসেছেন, আবার আসবেন। ভৌতিক বইয়ে পড়েছি, মৃত আত্মা অনেক সময় খুনের কিনারা করে দিতে আসে। এই ভাবে কত ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে। পুলিস পারছে না, বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা ঘোল খেয়ে যাচ্ছে, মৃতের আত্মা এসে আততায়ীকে ধরে দিয়েছে। কাকীমার সঙ্গে কথা বলছি, চোখ দুটো পড়ে আছে দু দিকে, একটা অন্ধকার জানালার দিকে আর একটা বন্ধ দরজার দিকে। কোনও রকম আওয়াজ পেলেই কান খাড়া হয়ে উঠছে। রাতের দিকে এ বাড়িটা এমনিই কেমন যেন হয়ে ওঠে ! যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা ফিরে আসেন। কখনও শুধুই অপ্রাকৃত শব্দ, কখনও সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন। পিতৃদেবকে নিজের সন্দেহের কথা বলে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি। তিনি বলেন, ভগবান না হলে ভূত দর্শন হয় না। বেশ দর্শন না হোক শ্রবণ ত হয়। মাঝরাতে ছাদে গড়গড় করে কি একটা শব্দ প্রায়ই হয়। বিশাল ছাদের এ পাশ থেকে ওপাশে লোহার বলের মত কি একটা গড়িয়ে চলেছে। পিতাকে প্রায়ই বলি। তাঁর বিশ্বাসও হয় না, তেমন পাত্তাও দেন না। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে বললেন, এবার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকবে।

সে দিন ছিল পূর্ণিমা। মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে। শুরু হল সেই শব্দ। ভাবি লোহার বল গড়িয়ে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। পিতাকে জাগালুম, উঠুন উঠুন সেই শব্দ। এর আগে একবার হয়েছিল, যেই ডাক শুনে তিনি উঠে বসলেন, শব্দ থেমে গেল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে আমরা দুজন, আবার হবার অপেক্ষায় রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলুম। পিতা বললেন, তুমি ভুল শুনেছ। খাওয়ার গোলমালে জ্যান্ত মানুষের পেট মাঝরাতে অমন গড়গড় করে জানান দেয়, অতি আহারে ভূত হবার সম্ভাবনা। মিতাহারী হও, মিতবাক্ হও।

সেদিন আমার ভাগ্য ভালই ছিল। শব্দ থামল না, হতেই লাগল। তিনি শুনলেন, তারপর বললেন, চলো, লেট আস সি। প্রস্তাব শুনে গলা শুকিয়ে গেল। তিনি ছাড়ার পাত্র নন, আজ আমি তোমাকে ভূতদর্শন করাবোই। ভগবান আর ভূত একই বস্তু। ভাইব্রেশানের ইতর বিশেষ। যেমন কনডেনসেসানের ওপর নির্ভর করে, জল থেকে কুয়াশা, জল থেকে স্নো কিংবা আইস।

ছাদের দরজা বন্ধ। সিঁড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকার। বন্ধ দরজার ফাটলে সুতোর মত চাঁদের আলোর রেখা। হাতড়ে হাতড়ে উঠছি। বেঁচে আছি না মরে গেছি বোঝার ক্ষমতা নেই। দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল। বন্যার জলের মত চাঁদের আলোয় সিঁড়ির ধাপ ভেসে গেল। ধু ধু ছাদ, চাঁদের আলোয় ফট্ ফট্ করছে। গাছপালা, আকাশ বাতাস সব যেন চাঁদের আলোয় স্নান করে উঠেছে। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি প্রকৃতি তখন যেন জেগে ওঠে। বিশাল আরও বিশাল হয়ে যায়। উত্তর দিকে আলসে ঘেঁষে একটা নিম গাছ উঠে গেছে, ঝাঁপড়া হয়ে। তার পাতায় পাতায় চাঁদের আলো কুঁচি কুঁচি হয়ে ঝুলছে। মাঝে মাঝে বাতাস এসে প্রকৃতির ঝাড়লণ্ঠন দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিশাল আকাশের তলায় গড়ের মাঠের মত ছাদে আমরা দুটি প্রাণী। ক্ষুদ্র যে কত ক্ষুদ্র হতে পারে সে দিন বুঝেছিলুম।

পিতা বললেন, কি দেখছ ? কোথায় তোমার ভূত ? কোথায় লোহার বল ! এই ত তোমার ছাদ।

দেখে নাও। আমি এখানে বসি। তুমি দ্যাখো। যদি কিছু পাও, আমাকে জানিও, গিয়ে চেপে ধরব। নকল ভূত, ইমিটেশান ভূত দেখেই জীবনটা কেটে গেল, একটা রিয়েল ভূত দেখার বাসনা বহুদিনের।

ভূতের দর্শন পাওয়া গেল না ঠিকই, তবে সে রাতে পিতার অদ্ভুত এক রোমান্টিক চেহারার সঙ্গে পরিচয় হল। জনপদের মাথার ওপর বিশাল এক নির্জন ছাদে আমরা দুটি ভূতার্থী প্রাণী জীবন্ত ভূতের মত পাশাপাশি বসে রইলুম, দুই সমবয়স্ক বন্ধুর মত।

পিতা বললেন, রোজই ত আমরা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোই, এসো আজ আমরা বসে বসে জাপানীদের মত চাঁদের আলো দেখি। নিচে গিয়ে মাদুরটা নিয়ে এসো। কি, একা যেতে ভয় করবে ?

কি করে বলি ভয় করবে ! ভয় অবশ্যই করবে। রাত আমার কাছে ভীষণ রহস্যময়। যত রাত বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে এই বনেদী ভগ্ন প্রাসাদের বিভিন্ন দিক একটু একটু করে আমাব কাছে অচেনা হয়ে ওঠে। এমন কি খাটের তলাটাও আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। খাট থেকে পা নামাতে হলে মনে হয়, এই বুঝি কেউ খপ্ করে চেপে ধরল।

মাদুর এল। বিছনো হল। দু'জনে বসে আছি মুখোমুখি। রাত দুটো। পেটা ঘড়ি জানান দিল গঙ্গার দিকের থানা থেকে। পাহারাদারের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। মালা পাড়ায় একপাল কুকুর চিৎকাব করেই থেমে গেল। বহুদূরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের পাওযার হাউস সশব্দে খানিকটা স্টিম ছেড়ে রাত্রির প্রশান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

পিতা শুরু করলেন তাঁর যৌবনের কাহিনী। ছাত্র জীবনে কত ক্লেশ সহ্য করেছেন ! জ্ঞাতিদের উৎপাতে পিতামহের বাস্তুত্যাগ। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর শিক্ষালাভ। তাঁব পাণ্ডিত্য। শিক্ষক হিসেবে অসামান্য খ্যাতি। ধমনীতে যে রক্ত স্রোত বইছে, তার কণায় কণায় ত্যাগ, আদর্শ, সহিষ্ণুতা, উচ্চভাব, সন্ন্যাস। অর্থ নয়, জ্ঞান, ভোগ নয়, ত্যাগ, নীচতা নয়, উদারতা, এ পরিবারের রক্তের সঙ্কেত। মোর্স কোডে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই কথাই জানাতে চাইছে। ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে।

শেষে এসে পড়ল মায়ের প্রসঙ্গ। জীবনে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেন নি ! হাতে ঘড়ি বাঁধেন নি। বুকে সোনাব বোতাম ঝোলান নি। চুলে গন্ধ তেল মাখেন নি। ধুতি আর শার্ট পরে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। বাসর থেকে মাঝ রাতে মায়েব হাত ধরে উঠে এসেছিলেন, ক্রোধে, চটুল মহিলাদের চপল রসিকতা সহ্য করতে না পেরে। বাড়ি ফিরে এসে প্রথমে স্নান করেছিলেন, তারপর মুগুর আর বারবেল ভেঁজে মনকে শান্ত করেছিলেন। মা খুব কেঁদেছিলেন, আর বিবাহের অর্ধযাম উত্তীর্ণ হবার আগেই পিতাব ধমক খেতে শুরু করলেন। রাতকাটার আগেই নব বধূর রোমান্টিকতা কেটে গেল। ঘণ্টাখানেকেব মধ্যেই সংসার তাঁকে গ্রাস করে নিল। সামান্যতম সময় নষ্ট হল না বলে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠল খাঁগড়াই কাঁসার মত।

পিতা বললেন, তোমার মায়ের মেটালটা অসম্ভব ভাল ছিল, তাই এত সুন্দর অ্যালয় হয়ে গেল, বোঝাই যেত না, কে আমি, আর কে তুমি ! সেম ভাইব্রেশান ! তোমার দুভার্গ্য ! জন্মালে মরুভূমিতে উটের মত। তুমি তখন ছোট, সবে হামা দিতে শিখেছ, আমরা সব শিমুলতলায় গেলুম বেড়াতে। এমনি চাঁদিনী রাত। গোলাপ বাগান। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়। তোমার মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়েছে। কোলে শুয়ে আছ তুমি। কপালে সিঁদুরের টিপ জ্বল জ্বল করছে। আমি চাঁদ দেখব না তোমার মায়ের মুখ দেখব ! কে বেশি সুন্দর ! দেখতে দেখতে চোদ্দটা বছর কেটে গেল। মৃত্যুর আগে ছ'মাস যমে, মানুষে টানাটানি চলল। ছমাস আমি রাতে ঘুমোই নি। একবার রুগীর শিয়রে, একবার এই ছাদে। কত রাত একা একা কাটিয়ে গেছি এই ন্যাড়া ছাদে। অমাবস্যা গেছে, পূর্ণিমা গেছে। উত্তরে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছি, দক্ষিণে তাকিয়ে করেছি, দিক দেবতার ক্ষমতা নেই মানুষের যাবার পথ আটকায়। দীর্ঘ রোগ ভোগ করার পরও মুখের চেহারার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। রাত বারোটার সময় চিতায় শোয়ালুম। কোমর পর্যন্ত চুল চারপাশে ছড়ান। পা দুটো আলতায় টুকটুক করছে, চাঁদের মত মুখে গোল, লাল টিপ, সিঁথির সিঁদুর চলে গেছে ঊষার পথের মত। সেই চিতায় আগুন দিতে হল। হোমের শুকনো কাঠের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, মৃত্যু আগুন আর

সতী যেখানে আছে সেখানে পাপ থাকতে পারে না, ভূত থাকতে পারে না, ভয় থাকতে পারে না। সে এলাকা হল ভগবানের। গায়ে পুট করে এক বিন্দু জল পড়েছিল। মাথার ওপর নির্মল, নির্মেঘ নীল আকাশ, জল এল কোথা থেকে! পিতা বলেছিলেন, হয়ত স্বাতী নক্ষত্রের জল। ঝিনুকে পড়লে মুক্ত হত। তোমার গায়ে পড়েছে দ্যাখো মনটা যদি মুক্তোর মত হয়ে ওঠে! আমি যদি ঈশ্বর হতুম, সেই রাতে পিতার কাছে তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে, আমার মাকে ফিরিয়ে দিতুম। অন্তত এক রাতের জন্যে। তার পর পাশে বসে মজা করে শুনতুম তাঁদের দুজনের দীর্ঘ চোদ্দ বছরের জমা কথা। অমন রাত এখনও পর্যন্ত আর আসে নি, আসবে কি না তাও জানি না। অতীত দুঃখ আর সুখের স্মৃতি নিয়ে দূরাগত পাখির মত পাখা মুড়ে বসেছিল। এক সময় বললেন, আমার এস্রাজটা নিয়ে এসো।

চাঁদ ক্রমশ পাণ্ডুর হয়ে আসছে দীপ নেবা জীবনের মত। রাতের ছড়ান মায়াজাল ক্রমে ক্রমে গুটোতে শুরু করেছে, পূবের আকাশে সূর্যের নখরচিহ্ন দেখা দিয়েছে। এস্রাজ কাঁধে তুলে নিতে নিতে পিতা বললেন, আমার সব চেয়ে সমঝদার শ্রোতা ছিল তোমার মা। জানালার ধারে পা মুড়ে বসত। কোলেব ওপর লুটিয়ে পড়ত চাঁদের আলো। বসে বসে বাজনা শুনত।

তারে ছড়ের টান পড়ল। শুরু হল জৌনপুরী রাগে আলাপ। হৃদয়ের মোচড় পড়ল সুরে। পাখি উড়ে গেল।

আলগোছে গেলাসের জলটুকু শেষ করে কাকীমা বললেন, চলো না গো একবার দুজনে নিচে যাই। ব্যর্থ চেষ্টা। ভদ্রমহিলা ঘুরে ফিরে সেই এক প্রসঙ্গে ফিরে আসছেন। রাত বয়ে চলেছে। আর কতক্ষণই বা! একটু পরেই পাখি ডেকে উঠবে। শেষ রাতে মহিলা যদি পিতার সামনে দিয়ে এই ঘব থেকে বেবিযে যান, যতই কাকীমা বলি না কেন, বিশ্রী একটা সন্দেহ হতে পারে। এই কিছু দিন আগেই জবার ঘটনায় চরিত্রে দাগ পডতে পড়তে বেঁচে গেছি। জ্যোতিষীরা এক বাক্যে বলেছেন, খুব সাবধান ছোকবা, নাবীঘটিত বদনামের তীব্র যোগ রয়েছে। আর বসে থাকা যায় না। রাত বড় ভয়ঙ্কর সময়। অন্ধকারের শক্তি কখন গলায় ফাঁস পবিয়ে দেয় কে জানে?

চলুন তা হলে যাই। বড় টর্চটা সঙ্গে নি।

মেঝেতে হাতেব ভর বেখে কাকীমা মেঝে থেকে শরীর তুললেন। রাত্রির জড়তা লেগেছে। মাথার ওপব দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙলেন।

ধীবে ধীরে শব্দ না করে ঘবের দবজা ভেজিয়ে দিলুম। আলো আগেই নিবিয়ে দিয়েছি। অন্ধকারে পা টিপে টিপে দু'জনে নিচে নামছি। কাকীমার সেই ভয় ভয় ভাবটা আবাব ফিরে এসেছে। একটা ব্যাপার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না, স্বামীকে যদি ভালবাসা যায়, তা হলে স্বামীর প্রেতাত্মাকে কেন ভালবাসা যাবে না! মানুষের সব কিছুই কি ফাঁকিতে ভবা!

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে ভয়ে ভয়ে টর্চের বোতাম টিপলুম। কাকীমা বললেন বটে, তিনি খুব সাহসী। সাহসের তেমন প্রমাণ পাচ্ছি না। আমার শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপটে আছেন। নিজে কত সাহসী সে ত জানাই আছে। আলোর রেখা অন্ধকারের বুক চিরে সামনে এগিয়ে গেল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। আলোর সবণিতে পিন্ পিন্ করে এক ঝাঁক মশা উড়ছে।

আমরা দু'জনে জড়াজড়ি করে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার দিকে ধাপে ধাপে নেমে চলেছি। একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব মুখে এসে লাগছে। এই রহস্য পুরীতে একটা কেন, একশোটা ভূত থাকতে পারে। কাকীমার শোবার ঘরের দরজা হাট খোলা। হারিকেন নিবে গিয়ে এক পাশে ভূত হয়ে বসে আছে। বুকের ভেতরটা এবার সত্যিই কাঁপছে। চারপাশ খুব একটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কারুর ছেড়ে যাওয়া আসনে বসলে যেমন উত্তাপ থেকে মনে হয়, কেউ ছিলেন, একটু আগেই। সেই রকম মনে হচ্ছে।

রান্নাঘরের দরজায় আলো ফেলতেই, কাকীমা বললেন, ওই দ্যাখো শেকল খোলা।

ব্যাস! ওই একটিই কথা। ভারি শরীর কাঁচা মাটির পুতুলের মত ধীরে ধীরে আমার শরীরের ওপর ভেঙে পড়ল। টর্চটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে নিবে গেল। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত
বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তার
রথ চলে দেশ-দেশান্তরে ॥

জীবনে এমন একটা দুটো রাত আসে, যে রাত ভোর হলে বাঁচা যায়। ভয়ে চৈতন্য হারালে ভয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। না হারালে অবস্থা হয় আমার মত। টর্চ ছিটকে চলে গেছে বান্নাঘরের সামনের নর্দমায়। ড্যাম্প লেগে আলোর তার নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ লিক কবছিল। দেযালে হাত ঠেকলেই শক মারছিল। কানেকসান কেটে দেওয়া হয়েছে। কবে মিস্ত্রী আসবেন কে জানে, তাবপর আলো জ্বলবে। সে এখন বিশবাঁও জলে।

পরিস্থিতি মানুষকে কি ভাবে সাহসী করে তোলে! কি জানি কাকীমার চোখের ভুল কি না! হয়ত বান্নাঘরে শেকল তোলেন নি। নিজের ভুলে নিজেই অজ্ঞান। অন্ধকারে যেখানে যে ভাবে পড়ে আছেন, সেখান থেকে এখুনি সরাতে না পারলে ভূতের হাত থেকে বাঁচলেও, বিছে কিংবা সাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে কি না সন্দেহ!

মৃত্যুর জড়তার চেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে মানুষের কত প্রবল! শরীরে কোথা থেকে পালোয়ানের মত শক্তি এসে গেল। বড় এক বালতি জল তুলতে যার হাত কাঁপে, দম বেরিয়ে আসে, সে অনায়াসে একজন মহিলাকে, একটা হাত দুটো পায়ের তলায়, আর একটা হাত পিঠের নিচে দিয়ে কেমন অক্লেশে তুলে ফেলল! ভীষণ ভয় করছে। পৃথিবীর সবই প্রায় অচেনা, নিজেব বসতবাটীও যে কত অচেনা, ভয়ঙ্কব এই মুহূর্তেই বুঝছি।

বেড়াল যে ভাবে মুখে বাচ্চা নিয়ে লটরপটর করে হাঁটে, আমিও সেই ভাবে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করলুম। কাকীমার পিঠ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। সারা শবীব এলিযে আছে। দুটো হাত শরীরের দু'পাশে লটপট করছে। হাতের ওপর দিয়ে ঝুলে আছে ভাঁজ কবা দুটো পা। হাঁটুর ভাঁজ ভিজে ভিজে। এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে যে দৃশ্য মনে পড়ল, মন তোমার খুবে খুরে নমস্কার। রোগা পটকা রাজকাপুর যেন আওয়ারা ছবিতে দীঘল নার্গিসকে নিয়ে ড্রিম সিনে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে।

পা দিয়ে কি একটা সুট করলুম। হৃৎপিণ্ডে ধড়াস করে একটা শব্দ হল। সেই টর্চ। এতক্ষণ পাশেই পড়েছিল। এইবার সত্যি সত্যিই নর্দমায় গিয়ে পড়ল : যাক, আপদ শান্তি, বিপদ শান্তি ; কোনও রকমে সিঁড়ি অবদি পৌঁছতে পারলে, ধাপের ওপর বসিয়ে একটু বাতাসটাতাস করলে হয়ত সুস্থ হয়ে উঠবেন! এ দেশের মেয়েদের সাজপোশাকের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। লজ্জা রাখতে গিয়ে হার্ট ফেল করার অবস্থা! বুক বেঁধে মানুষ বিপদে ঝাঁপ দেয়, মাঝ রাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার কি মানে? মেয়েদের অনেক কিছুরই মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। চেষ্টা করাই বৃথা।

যে দিকে চলেছি সেই দিকেই সদর। সিংহ দরজা বললেই ভাল হয়। মানসিংহ স্বচ্ছন্দে টাট্টু চেপে টগবগিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন। দরজাটা আবার তিনপাট। বহুকালের পুরনো। বাঘের আঁচড়ের মত কালের আঁচড় খেয়ে ফাটা ফাটা, সরু সরু চিড় ধরেছে। এপাশ থেকে ওপাশের আলো নজরে পড়ে। যেন ঝিলমিল দরজা। এখন বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলো দেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বেশি না, আর সাত আট পা এগোতে পারলেই সদর। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় গোটা দুয়েক প্যাঁচ মেরে। সিঁড়ির তলায় ঘুপচিতে আগে আমাদের কুকুর থাকত। সেসব দিন চলে গেছে, এখন আমরা ঝাড়া হাতপা।

দরজার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা আবার ছ্যাং করে উঠল। দরজার তলার দিকে ছোট্ট একটা আলোর টিপ স্থির হয়ে আছে। জোনাকি? জোনাকির আলো স্থির হয় না। জ্বলে আর নেভে। ভয়ে, কৌতূহলে পা থেমে পড়ল। বিন্দু সূক্ষ্ম সরল রেখার আকারে বিশেষ একটি ফাটা ধরে জ্বলন্ত সুতোর

মত এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎ গতিতে নিচের দিক থেকে ওপরে উঠছে। যেন আলোর শুঁয়ে সাপ। এরকম একটা নয়, দেখতে দেখতে চোখের সামনে অসংখ্য আলোর ঝিলমিল তৈরি হয়ে গেল। মনে হচ্ছে দেওয়ালির রাত। আলোর রঙ কেমন যেন হলদেটে।

মন এইবার যুক্তিতর্কের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসবের মানে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি কমে আসছে। এ লোকের চেয়ে পরলোকের ক্ষমতা অনেক বেশি। কোনও রকমে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই ধীরে ধীরে বসে পড়লুম। অশরীরী ! কোনও অন্যায় ত করিনি, তবে কেন এমন করে ভয় দেখাচ্ছ।

চিন্তা, দৃষ্টি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পাতলা এক পর্দা কুয়াশা নেমে আসছে। চিন্তায় কিংবা কাজে সত্যিই কি আমি কোনও অন্যায় করিনি, পাপ করিনি ! জোর গলায় বলতে পার ? কিসের স্বার্থে তুমি একজন মহিলার কাছে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ চেপে রেখেছ ! তোমার অনুকম্পা ! নিজের ভেতরটা একবার ভাল করে হাতড়ে দেখ ত ?

দোতলা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে, গভীর ঘুমে শোনা স্বপ্নের শব্দের মত, ওপার নদী থেকে ভেসে আসা পিতার ভারি কণ্ঠস্বর, এ কি, সব খুলেটুলে রেখে গেল কোথায়, বাথরুমে না কি ? কোথায় গেলে হে। বাতাসে যে বইয়ের পাতা উড়ছে ! আঃ ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি।

প্রায় সংজ্ঞাহীন সেই অবস্থায় অদ্ভুত এক পাপবোধের তাড়নায় প্রাণপণ চেষ্টা করলুম উঠে দাঁড়াবার। কাকীমার স্বার্থে এখুনি আমার ওপরে উঠে যাওয়া উচিত, এমন একটা নির্দেশ উঠছে মনে। পারছি না, কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। দেহ যেন তালশাঁসের মত থ্যাস থ্যাস করছে।

দরজার দিকে চোখ চলে গেল। সেই আদ্যিকালের ফাটাফাটা দরজা, খিল দিয়ে জম্‌পেশ করে আঁটা। আলোর ঝিলমিলি আর নেই। খেলা করে চলে গেছে। এতক্ষণ গলায় কোনও স্বর ছিল না। স্বর ফিরে এসেছে। ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন। কাকীমা ধীরে ধীরে আমার কোল থেকে মাথা তুললেন। ফিসফিস করে বললুম, কোনও ভয় নেই, সট্‌ করে সিঁড়ির তলায় ঢুকে পড়ুন। বাবা উঠেছেন। একটু আগেই যাঁকে বিছে কামড়াতে পারে ভেবে অস্থির হয়েছিলুম, প্রাণে মরার ভয়ে তাঁকেই ঠেলে দিলুম অন্ধকার আবর্জনায়। তিনিও ভূত ভুলে অম্লান বদনে সেখানে চলে গেলেন। কেন গেলেন, না গেলে কি হত এ সব ভাবার কোনও প্রয়োজন হল না। আমরা দুজনেই মনে হয় এক নৌকোয় চেপে বসে আছি। উই আর অন দি সেম বোট, ফাদার।

মিথ্যে বলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। গলা তুলে বললুম, আমি নিচে।

অন্ধকারে নিচে কি করছ ?

সঙ্গে টর্চ আছে। কি একটা শব্দ হল, তাই দেখতে এসেছি।

অ্যাঁ, তাই না কি ? সাহস তাহলে বেড়েছে বলো ! ভেরি গুড। সন্দেহজনক কিছু পেলে ? আমি নামবো ?

আজ্ঞে না। তেমন কিছু দেখছি না।

সদরের খিলটা একবার ভাল করে চেক কোরো। ওটার দুপাশই খোলা হ্যাঁচকলের মত, ঠিকমত লাগে না। বাইরে থেকে সরু পাত গলিয়ে ঠেললেই খুলে যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, চেক করেই উঠব।

আমি এবার তা হলে শুয়ে পড়ছি, তুমি উঠে এসো। শোবার আগে ফুল এক গেলাস জল খেয়ে শোবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার ভুরুর কাছটা কুঁচকে উঠেছে। বেশি কথা না বলে উনি শুয়ে পড়ছেন না কেন ? দরজা বন্ধ ও ছিটকিনি লাগানোর শব্দ হল। কি আশ্চর্য ! ওঁর ঘরে ঢোকার জন্যে, ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছি কেন ? আমার কি কিছু হয়েছে ?

প্রায় শিস দেবার মত করে বললুম, বেরিয়ে আসুন।

অন্ধকারে কাকীমা এগিয়ে আসছেন। সাদা শাড়ি, সামান্য চুড়ির শব্দ, জীবন্ত একটি মনুষ্য শরীরের উত্তাপ আর গন্ধ, রহস্যময় রাত্রি। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কাকীমা ঠিক আমার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। চারপাশের দেয়াল কোথায় যেন সরে গেছে। মনে হচ্ছে গভীর এক অরণ্যে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই মহিলা, আমার আর পাশে নন, একেবারে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। মাংসপিণ্ড গলে গলে পড়ছে।

তুমি অমন থর থর করে কাঁপছ কেন পিণ্টু ! এ কি, তোমার গা যে আগুনের মত গরম ! জ্বর আসছে না কি ! ঘরে এসো, ঘরে এসো। এই নিচে কিছুতেই আমি আর একা থাকতে পারব না। ভোর অবদি তুমি আমার কাছে থেকে যাও। উনি জানতে পারবেন না।

ওপরে আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলুম। এ কার গলা ! ধরা ধরা, ভাঙা ভাঙা। আমার ভেতর থেকে আর একজন কেউ বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তাকে চিনি না। অনেক দিন ধরে দেখে আসছি, বাগানের একপাশে ছোট একটা গর্ত। সবাই বলে, ও কিছু নয়, ইঁদুরের গর্ত। মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করি, কে আছে ভেতরে ! এক ফালি অন্ধকার। সময় সময় কি একটা নড়েচড়ে, কোনও দিন দেখতে পাই না। হঠাৎ একদিন ফোঁস করে তেড়ে উঠল একটা সাপ। ফনা তুলে হেলছে, দুলছে। বিস্ময়ে আমি জড়বৎ। সত্যিই তা হলে ছিল ! ইঁদুরের গর্তে সাপ থাকে একথা তা হলে মিথ্যে নয় !

কাকীমা বললেন, জ্বলুক আলো। দিন ফুটলে তেজ কমে ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। তখন আর বোঝাই যাবে না, শুধু শুধু আলো জ্বলছে। তুমি কাঁপছ, তোমার জ্বর আসছে ? তুমি আমার কাছে এস। আমি তোমাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকি। আরাম পাবে। কে আছে তোমার ? কেউ ত নেই ?

যা আমি বলতে চাই, তা ত সাহস করে বলতে পারব না। আর একজন মুখ চেপে ধরছে। জ্বর নয়, এ হল আমার প্যাসান। এতকাল গর্তে শুয়েছিল ন্যাজ গুটিয়ে, শীতঘুমে। হঠাৎ জেগে উঠছে। গ্রীষ্ম এসেছে। সদর দরজার ফাটলে ফাটলে আগুন রেখার যে ঝিলিমিলি দেখেছিলুম, তা আমার জ্বলন্ত ধমনীরই প্রতিচ্ছবি। লাভার মত রক্তস্রোত বইছে। আমি আমার ছোট্ট, নির্জন ঘরে ফিরে যেতে চাই, যেখানে একটি দীপ জ্বলে আছে আমার অপেক্ষায়, আমার ফেলে আসা সাধনা, মুখ আঁটা একটি খামে আছে, একটি মেয়ের কোনও গোপন কথা। আমি যে পারছি না ফিরে যেতে। কে প্রবল ? আমি, না আমারই রক্তে পুষ্ট সেই অন্যজন। আমি তার কাছে পরাজিত হতে চলেছি স্ট্রেট সেটে। দুটো শরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে একটি আয়োজনের দিকে পায়ে পায়ে। একজন জানে না, আর একজন কি ভাবে অন্য আর একজন হয়ে গেছে। সে এখন পুরুষ। চৌকাঠ, মেঝে, নিবে যাওয়া হ্যারিকেনের কেরোসিন গন্ধ, অন্ধকারে ভাসমান চৌকি, একটি অন্যের ব্যবহৃত বিছানা শাড়ির ক্ষার ক্ষার গন্ধ, দেহের কিছু আবৃত অনাবৃত অংশ, জমাট বাতাস, ফিকে অন্ধকার। এই সেই বিছানা, যার একজন অংশীদার, কোনও এক রাতে, কোনও এক অরণ্যভূমির প্রান্তে, ভাগ্যের শিকার হয়ে নীল শিতল ঘরে একটি ধাতুর চাদরে পড়েছিলেন কারুর অনিশ্চিত অপেক্ষায়। কেউ আসেনি। সেখান থেকে লাশকাটা ঘরে, তারও পরে অবয়বহীন, নামহীন একটা হাড়ের খাঁচা। গভীর রাতে, ভৌতিক চেরাই ঘরের দেয়ালে। ছাত্ররা আসবে, দেখবে চিনবে, ফেমার, পেলভিস, ইলিয়াম, স্কাপুলা, ম্যাকসিলা, ম্যানডিবল—সব মানুষেরই তখন এক নাম।

অন্ধকার আমাদের দুজনকেই গ্রাস করে নিয়েছে। ফিস ফিস করে মহিলা বললেন, তুমি অমন থর থর করে কাঁপছ কেন ? ম্যালেরিয়া আসছে না কি ? একটু শান্ত হও, একটু স্থির হও।

আমি নিজেকেই বোঝাতে পারছি না, তা এই মহিলাকে বোঝাই কি করে, এ এক অন্য ধরনের ম্যালেরিয়া। শরীরে আমাদের সাপ আছে। সাধকরা জানেন। সারপেন্ট পাওয়ার। এক স্থান মূলাধারে আর স্থান সহস্রারে। ভুজঙ্গ রূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা। চতুর্দলবিশিষ্ট হস্তীপৃষ্ঠে পৃথ্বীবীজ লং, স্বয়ম্ভুশিবরেষ্টিতা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা, দেবতা ব্রহ্মা ও দেবী সাবিত্রী। সেই সর্প পিঠ বেয়ে ঘাড়ের পেছন দিয়ে সোজা উঠে পড়েছে মাথায়। মেরুদণ্ডে নিউরনের সঙ্কেত থ্যালামাসে গিয়ে ধাক্কা মারছে।

আজ্ঞাচক্রে এ কিসের আজ্ঞা ভেসে বেড়াচ্ছে। দ্বিদলবিশিষ্ট এই চক্রের একটি দলে হং অন্যদলে ক্ষং বীজ। মুক্ত ত্রিবেণীতে কোথায় আমার ওঁকারধ্বনি। পরশিব, দেবী সিদ্ধকালী, ষড়মুখ ও চার হস্তযুক্ত হাকিনী দেবীই বা কোথায়। শুধুই থ্যালামস। সেরিব্রাল করটেক্স বলছে, বড় নরম, বড় গরম, বড়ই গভীর আর গোপনীয়। সহস্রারে, সহস্রদলের মাঝে মিথুনাত্মক পরমশিব আর আদ্যাশক্তি। আমি তিনবার বলেছি, বাঁচাও বাঁচাও। কেউ আসেননি আমাকে বাঁচাতে। আমাব দ্বিতীয় 'আমি' শুধু খ্যা খ্যা করে হাসছে। তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখি। আমারি অন্তরে থেকে, আমারে দিতেছ ফাঁকি।

কাকের গলায় বললুম, আমি ওপরে যাই। টেবিলে আমার আলো জ্বলছে।

অন্য তরফে সাড়া নেই। বিস্ফোরণে প্রকোষ্ঠ আমার ভেঙ্গে পড়েছে। ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে মেটে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে। অন্ধকার আমাদের আবৃত করে রেখেছে তাই, আব একধাপ নিচে নামলেই কাল দিনের আলোয় নিজের মুখের সামনে নিজেই আর দাঁড়াতে পাবব না। দেহের ওপর দেহ ভাঙছে, তটের ওপর ঢেউ ভাঙছে, নিদ্রাশেষে স্বপ্ন ভাঙছে, মৃত্যু এসে ঘট ভাঙছে। সবই যখন ভাঙনের খেলা, আমার আমিও ভাঙবে, তবু শেষ চেষ্টা। এই বদ্ধঘরেও ভেসে এল দূব থেকে ভোরের প্রথম পাখির শিস্।

এস্কিমোরা যেমন কুঁজো হয়ে ইগলু থেকে বেরিয়ে এসে অরোবা বোরিয়ালিস দেখে আমি সেই ভাবে আর একটি শরীরেব তলা থেকে বেব করে আনলুম আমার ঘৃণিত শরীব। তোমাকে আমার ধিক্কার জানাই। তুমি শঠ, তুমি প্রবঞ্চক, তোমার ভেতবে বসে আছে তক্ষক। তুমি তার শিকার।

সদব দবজার ফাটলে সারসার রুপোলি রেখা। সদরে দিন এসে দাঁড়িয়েছে। এ দীনের আর ভাবনা কি! দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরমর হয়েছিল। আবার বেঁচে ফিরে এসেছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, যেন বহুকাল পরে, কত অচেনা ' দোতলার বাবান্দায় ঊষার আঁচল উড়ছে, প্রতিদিনের মত তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পাবছি না। অপবিত্র হয়ে মানুষ যেমন বলে, একটু সরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও, আমাকেও সেইভাবে পাশ কাটিয়ে সরে আসতে হল। টেবিলের আলো আমার জন্যে জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্ঞান ঠাসা কেতাব, সোনার জলের লেখায় ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। শূন্য ঘরে কেউ নেই, তবু মনে হচ্ছে অদৃশ্য একঘর মানুষ হই হই করে বলছে, এসো, এসো মায়ের ছবির দিকে তাকাতে পারছি না। দুটি চোখে আগের রাতের স্নেহের দৃষ্টি যেন আর নেই। ঘৃণা ধিক্কার ঠোঁটের অভ্র হাসি মিলিয়ে গেছে। রক্তের ঋণ শোধ করে এলুম মা।

হঠাৎ মনে হল গঙ্গার জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সব পাপ ধুয়ে যাক। ভূতের ব্যাখ্যা আমি পেয়ে গেছি। ভূত হল মানুষের দ্বিতীয় আমি। কখনও সে ছায়া, কখনও সে কায়া। সেই সুললিত কণ্ঠের মানুষটি, যিনি রোজ প্রাতে নাম গান করতে করতে স্নানে চলেন, তিনি চলেছেন। ভৈরবীতে ধরেছেন, রাই জাগো, বাই জাগো বলে ডাকে শুকসারি।

কোমরে গামছা বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়লুম। পিচ এখনও ভিজে ভিজে। রাত সারারাত শিশিরে কেঁদেছে।

একটি বাতের খতিয়ান বড় কম হবে না। কত লক্ষ প্রাণ এল, কত লক্ষ প্রাণ গেল, কত অপরাধ ঘটে গেল, কত পবিত্র অপবিত্র হল! ভোরের প্রসন্ন আলোয় পুরুষ আর মহিলারা স্নানে চলেছে। বিধবা মহিলাদের সাদা থান, হাতে ঝকঝকে কমণ্ডলু, কারুর কারুর হাতে পেতলের সাজিতে সাদা, আর নীল অপরাজিতা। টকটকে চেহারার বিলাসী বধূরাও চলেছে। বুকের ওপর আড়াআড়ি পেতে দিয়েছেন লাল ডুরে গামছা। রাতের আলস্য পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। শরীরে শয্যার গন্ধ, সুবাসিত তেলের গন্ধ, শাড়ির বেড় এখনও ঢিলেঢালা, খোঁপা আলগা। যাবার আগে রাত যেন আর এক তোলা যৌবন দান করে গেছে। সখীতে সখীতে কি যে আলাপ, চুড়ির শব্দের মত হাসি উঠছে রিনরিনিয়ে।

সেই বিশাল সন্ন্যাসী চলেছেন। গলায় রুদ্রাক্ষ। রক্তাম্বর পরনে। শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, উর্ধ্ব নেত্র, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা। গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে চলেছেন হরি ওঁ, হরি ওঁ। প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী যেন

সঙ্কুচিত হচ্ছে। প্রতিবার মন্ত্র উচ্চারণে বাতাস যেন কেঁপে উঠছে। আমিও চলেছি তাঁর পেছন পেছন।

গৈরিক জলধারা তরতর করে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সামনেই পশ্চিম। আকাশে তখনও অন্ধকারের শেষ পটিটুকু লেগে আছে। মন্দিরের চূড়া ভোরের আলো ধরে, সম্রাটের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জলে ভোরের আলো চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত নরনারী, নানা সুরে স্তোত্র পড়ে চলেছেন। কেউ কেউ ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে সবিতা স্তোত্র পড়ছেন, কেউ আবৃত্তি করছেন গায়ত্রী, কেউ করছেন পিতৃপুরুষের তর্পণ, অঞ্জলিবদ্ধ হাতের ফাঁক বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। ঝরা জলে খেলছে সূর্যের সাতটি রঙ।

সেই রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী সাঁতার দিয়ে প্রায় মাঝগঙ্গায় চলে গিয়ে শবের মত চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে ভাঁটার টানে শ্মশানঘাটের দিকে চলেছেন। দুটো হাত মাথার দু' পাশে টান টান, দুটো পা ছড়ান, দেহ চিত, ঊর্ধ্বমুখী, কোনও স্পন্দন নেই, নিখুঁত শবাসনে ভাসমান। কাছাকাছি কোনও শকুন থাকলে শব ভেবে বুকের ওপর এসে বসে পড়ত। জলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন স্নান করছিলেন। তিনি খুব অবজ্ঞাভরে বললেন, ভেলকি দেখাচ্ছে, ভেলকি। কথা শেষ করে ভুস করে একটা ডুব মারলেন, পরক্ষণেই উহু, উহু করে উঠে পড়লেন। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। পরিচিত একজন জিজ্ঞেস করলেন, কি হল মুকুজ্যে ?

দ্যাখ ত ভাই, পিঠে কি একটা মেরে গেল। মনে হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। ভীষণ জ্বলছে।

জল থেকে একটু ওপরে উঠতেই দেখা গেল, চওড়া পিঠের বাঁ পাশে, মেরুদণ্ডের কাছে রক্ত বেরচ্ছে। চোখের ভুল কি না জানি না, রক্তের অক্ষরে পরিষ্কার একটি শব্দ ফুটে উঠেছে, ওঁ। কে যেন দেগে দিয়ে গেছে, গরম লোহা দিয়ে।

সবাই বলতে লাগলেন, ও হে, আড়ট্যাঙরায় কাঁটা ঝেড়েছে, বেশ ভোগাবে কিছুদিন। আমার মনে হল ভদ্রলোক সন্ন্যাসী নিন্দার ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলেন। আমরা সবাই স্নান করছি, ট্যাঙরা মেরে গেল বেছে বেছে ওই নিন্দুককেই।

পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে জবা ফুলের মত। পাশের খেয়াঘাট থেকে একটি নৌকা ছেড়ে গেল ওপারের দিকে। তিনজন মঠবাসিনী বসে আছেন উদাস হয়ে। দুটো জেলে নৌকা তর তর করে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। কে একজন হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কি মাছ আছে গো কত্তা ? তারা কোনও উত্তর দিল না।

মেয়েদের স্নানঘাটের দিকে দৃষ্টি চলে গেল। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে কে একজন পেতলের ঘড়া জলে ভাসিয়ে দোল খাইয়ে খাইয়ে জল ধরার চেষ্টা করছে। ছোট ছোট তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। চমকে উঠলুম, মায়া। আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। ভিজে শাড়ি লেপটে গেছে সারা শরীরে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন হাতের মুদ্রা করে, চোখের সামনে ধরে সূর্য নমস্কার করছেন, ওঁ নমঃ বিবস্বতে। চোখ তাঁর সূর্যের দিকেই নেই, জবাকুসুম-সঙ্কাশং যেন নেমে এসেছেন মায়ার টোলখাওয়া বুকে। মনে হল একবার বলি, এই ব্যাটা আকাশের দিকে তাকা। সকাল না হতেই মানুষের খিদে। পেটের খিদে, মনের খিদে, দেহের খিদে।

শরীরের অদ্ভুত ভঙ্গি করে মায়া ঘড়াটা কাঁখে রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে ইশারা করলে, উঠে এসো। ভদ্রলোকের স্তোত্র ভুল হয়ে যাচ্ছে, জবা জবা করছেন। থাকতে না পেরে বলে ফেলেছি, কুসুমসঙ্কাশং। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কুসুম সঙ্কাশং।

ভিজে পাতা যেন সোনার পাত। জলের কিনারায় ফুল ভাসছে, ভাসছে চিতার কাঠকয়লা। ঘাটের বাইরে কাঁখে কলসি নিয়ে মায়া দাঁড়িয়ে আছে যক্ষিণী মূর্তির মত। ভিজে কাপড় থেকে জল ঝরেছে পায়ের কাছে। সামনে দাঁড়াতেই, মায়া বললে, কি গো একেবারে ভুলে গেলে ? বলেই সে ধীর পায়ে চলতে লাগল। দূরে আরও দূরে। বৈষ্ণব কবি হলে লিখতেন, আমার আঁখি ভ্রমর জড়িয়ে গেল তার ভিজে কাপড়ে জড়ান শরীরের ছন্দে।

I may load and unload
Again and again
Till I fill the whole shed,
And what have I then!

মুকুর খামটা আর খোলার অবসর পাচ্ছি না। একটু নির্জনতা চাই। সে ত মধ্যরাতের আগে আসবে না। দুপুরের দিকে একটু অবসর মিলতে পারে। মাতুলের বাড়িতে যে নেপালী যুবকটি কাজ করে, সেই বাহাদুর এসেছে একটি চিঠি নিয়ে।

স্নেহভাজনেষু, অদ্যাই এই শহরে আমার শেষ রজনী। কাল আমি লোটাকম্বল নিয়ে সরে পড়ছি। ভেব না যেন আমি পরাজিত। একে তুমি বলতে পার সাময়িক বাধা, এ টেমপোরারি সেট ব্যাক। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটু কাব্য করে যাই। রবার্ট ফ্রস্ট পড়ছিলুম, কাল রাতে। তোমার প্রিয় গায়ক ধনঞ্জয়বাবুর সেই গানের লাইন ভাসছিল মনে, কাল, সারা রাত, চোখে ঘুম ছিল না। ছিল না চোখে। আমার ছবিতে উনি যে দুটি গান করেছেন অনবদ্য হয়েছে। রেকর্ড কোম্পানী মাসখানেকের মধ্যেই ডিস্‌ক বাজারে ছাড়বেন, পারলে শুনে নিও। একটি গান আছে দরবারীতে। আমার বিশ্বাস, ওই গান বহুকাল বাঙলার আকাশে বাতাসে ঘুরবে। বড় বেদনার গান।

কাল রাতে প্রথম টের পেলুম প্রবাসী হবার কি বেদনা! মানুষ দীর্ঘকাল যেখানে বসবাস করে, গাছের মত সেখানে তার শিকড় নেমে যায়। গৃহীমানুষ আর যাযাবর মানুষে এই তফাত। জিপসী হলে এই সব ছোটখাট বন্ধন আমাকে আর এভাবে পীড়া দিতে পারত না। এই সাজান সংসার। ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর আমি এক যক্ষের মত এঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘরে দুঃস্বপ্নের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে, এখুনি নিবে যাবে, যতটা পারি, যতক্ষণ পারি দেখেনি। একটা জিনিস বড় বেদনার হে, মানুষ চলে যাবার পরও এই পৃথিবী থাকবে। গাছপালা, চাঁদ তারা সব থাকবে, সুর থাকবে সংগীত থাকবে। কালকের রাত বড় গোলমেলে ছিল। জানি না বিদায়ের আগের রাত এই রকমই হয় হয়ত! বর্তমান মানুষকে খুব একটা কষ্ট দিতে পারে না, যত কষ্ট দেয় স্মৃতি। তা ধরো বছর তিরিশ ধরে এই জমিতে আমার শিকড় নেমেছে, তাকে উপড়ে ফেলতে একটু কষ্ট হবে না! তুমি কি জীবনকে অত সহজ ভাব না কি! বেঁচে থাকার একটা স্পন্দন নেই! মানুষ যেখানে থাকে সেখানে তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু থাকে, দৃশ্য অদৃশ্য। দেহের যেমন ছায়া আছে, মনেরও তেমনি ছায়া আছে। শুধু মাটিতে নয়, মানুষ বেঁচে থাকে আকাশে বাতাসে মাটির গভীরে। চারপাশে বলয়ের মত অদৃশ্য একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে যায়। মাকড়সার জালের মত অদৃশ্য জাল তৈরি হয়। সেই জাল ছিঁড়ে আমাকে বেরতে হবে। মনের অবস্থাটা তা হলে একবার বোঝ। তুমি হলে কেঁদে ফেলতে। বসার ঘরের সোফাটোফা সব বিক্রি হয়ে গেছে, কাল সকালেই ক্রেতা এসে ঘর খালি করে সব নিয়ে যাবে। আমার সেই চাকা লাগান সাধের রুপোলী খাট, যেটা আমাকে এক মহারাজা প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাকেও বেচে দিলুম। অনেক পাওনাদার বাজাবে, বুঝলে! এছাড়া অন্য আর কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না। সঙ্গে রইল আমার সাধের তম্বুরা আর স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়াম। এ জিনিস সহজে পাওয়া যাবে না। এক গাদা ভাল ভাল ফুল গাছের টব আছে। তোমার যদি নেবার ইচ্ছে থাকে জানাও। বাহাদুরকে দিয়ে, ঠেলায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দোব। সাত আট রকমের গোলাপ আছে। ফুল ফুটলে তবু আমার কথা মনে পড়বে। ছেড়ে চলে যেতে মন কি চায়! কি করব বলো? সাধারণ চাকরি আমি করতে পারব না, অসম্ভব। কলকাতার সংগীত জগতে বড় দলাদলি। এখানে থাকলে, দেহ আর মন দুটোতেই শুকিয়ে মরতে হবে। যাই কিছু দিন ঘুরে আসি।

হ্যাঁ যে কারণে চিঠি, এক, আজ সন্ধেবেলা ইনস্টিট্যুটে গুরুজী সংগীত পরিবেশন করবেন। সঙ্গে আমিও আছি। পারলে তোমরা এস। ধরে নিতে পার, কলকাতার আসরে এই আমার সোয়ান সং। দুই

তোমার পিতৃদেবকে জিজ্ঞেস করো, বাহাদুর ছেলেটি বড় ভাল, ভীষণ কাজের, তোমাদের সংসারে ওর একটু স্থান হতে পারে কি ? সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। যদি না পারি তোমরা ওকে রাখবে কি ?

যদি গান শুনতে আস, গেটে আমার নাম করলেই হবে।

মন ভীষণ খারাপ, সাংঘাতিক আবেগ আসছে। এ আমার জয় না পরাজয় ? শোন তো রবার্ট ফ্রস্ট কি বলছেন :

The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not to bar
Our passage to our journey's end for good
But just to ask us who we think we are

চলি রে। ইতি, তোর মামা ॥

চিঠিটা পিতার হাতে তুলে দিলুম। পড়তে পড়তে ক্রমশই তাঁর মুখের ভাব গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হল। চিঠিটা টেবিলের ওপর চশমা চাপা দিয়ে রেখে বাহাদুরের দিকে তাকালেন, তোমার বাবা এখন কি করছেন ?

গান করছেন।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে বললেন, গেট রেডি।

আপনি কি এখন ও বাড়িতে যাবেন ?

অফকোর্স ! একটা সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখা যাক। তোমার কাকীমা নিশ্চয়ই বাড়িটা একটু আগলাতে পারবেন ?

কাকীমার নাম শুনে বুক ছাঁৎ করে উঠল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে এল। লোহা তপ্ত হয়েছিল, ভোরবেলাই জলে ডুবিয়ে এসেছি। গুরুজনের মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছি না। ভুলতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আদৌ ভোলা যাবে কি ? চরিত্রের স্ফটিক গোলক হাত ফসকে পড়ে গেছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যা ঘটে গেছে তা আর কেউ জানে না, জানে রাত আর জানে দুটি মাত্র প্রাণী। রাতের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ঘটনা চলে যাবে দূর থেকে দূরে, অতীত থেকে অতীতে। ঘটনা কোথায় চলে যায় ! মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড কি সময়ের নদীর কোনওখানে গিয়ে পলির মত সঞ্চিত হয় ? চর জেগে থাকে ? যেখানে মানুষ আবার কোনওদিন ফিরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখতে পারে, জীবনের পর জীবন ধরে সে কি করেছে ! সুকর্ম কুকর্মের নুড়ি নুড়ি সঞ্চয়। জানা নেই আমার প্রারব্ধ কি, আর আরব্ধ কি ?

পিতা বললেন, কি হল, মনে হচ্ছে তুমি যেন ঘোরে আছ ? তোমার গালটা অমন করে আঁচড়ে দিলে কে ? বাড়িতে ত বেড়াল নেই !

মিথ্যে যেন জিভের ডগায় ছত্রীসেনার মত প্রস্তুত ছিল। তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল, আজ্ঞে, সকালে গঙ্গার স্নানে গিয়েছিলুম, মাছে কাঁটা মেরে দিয়েছে।

সে কি, ওষুধ লাগিয়েছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এক মিথ্যে আর এক মিথ্যেকে টেনে আনে। নিজের সাহসে নিজেই অবাক।

তুমি তা হলে কাকীমাকে বলে এসো, আমি ততক্ষণ কাপড়জামা পরেনি।

নিচে নামতে পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল অপরাধী যেন অপরাধের জায়গায় ফিরে চলেছে। গিয়ে দেখব ক্ষতবিক্ষত পড়ে আছে পবিত্রতা। আবার ভালও লাগছে। কারা যেন জিভে সাপের ছোবলের নেশা করে ! বারে বারে, ফিরে ফিরে যায়। শরীর ভেঙে যায়, মৃতমাছের মত চোখের দৃষ্টি হয়, গাল ভেঙে যায়, তবু যায়। বিষের এতই মাদকতা। গালিবের মত বলতে ইচ্ছে করছে :

পিনহাঁ থা দাম সখ্‌ৎ করীব আশিয়াঁ কে,
উড়নে নহ পায়ে থে কেহ্‌ গিরিফতার হম হুয়ে ॥

পাখি ফাঁদ পাতা ছিল বাসার খুব কাছে। ধরা পড়ে গেলে উড়তে না উড়তেই ॥

নিচের দৃশ্যটি ভারি চমৎকার। তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদূর পরছেন। আঙুল দিয়ে একবার করে লাগাচ্ছেন। মাথার পেছনের চুলে আঙুল মুছে আবার সিঁদুর তুলে আবার পরছেন। দরজার আড়াল থেকে আমি দেখছি, আর ভাবছি, ভাগ্যের এ কি পরিহাস! কিছু বলতে পারছি না, ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরতে পারছি না। বেদান্তবাদী বলতেন, কি মায়া! যা নেই তা আছে মনে করে কি বিভ্রান্তি।

ঘাড় ঘুরিয়ে কাকীমা বললেন, থাক আর চুরি করে দেখতে হবে না, ঘরে এসো দুষ্টু ছেলে।

কথা শুনে অপরাধবোধ অনেক কমে গেল। এ জগতের বিশেষ কিছুই তো জানি না! কিসে কি হয়! কার মনে কি থাকে! মহিলাকে এই মুহূর্তে ভীষণ তাজা দেখাচ্ছে। বহুদিন আগে এক ফসলের বাগানে, শীতের ভোরে বাঁধাকপি দেখেছিলুম। পাতার ফাঁকে কপির ঠাস মুখটি উঁকি দিচ্ছে। সুন্দরী মহিলার নাকের ডগায় ঘামের মত ফুটে আছে সারা রাতের শিশির। সেদিন সেই দেখেছিলুম, আজ দেখছি কাকীমার মুখ। সারা পৃথিবীটা ঈশ্বরের কি সুন্দর সৃষ্টি! কোথা থেকে একটু দুঃখ এসে সব মাটি করে দিয়ে যায়।

সিঁথিতে সিঁদুরের শেষ টান মেরে, মাথার পেছনে আঙুল মুছলেন। কৌটোর ঢাকা বন্ধ করে আয়নার সামনে রাখলেন। এ ঘরে বাতাস ত তেমন আসে না। শরীরের কয়েকটি জায়গা এরই মধ্যে অল্প অল্প ঘেমে উঠেছে। এক রাশ ভিজে কালো চুল পিঠ ছেয়ে পড়ে আছে। আজ যেন পটে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। না কি আমার মনের ভুল! ভালো লাগার দৃষ্টিতে দেখছি বলেই কি ভাল লাগছে? যেমন রঙকলা পরে পৃথিবীকে দেখলে পৃথিবী ঠিক তেমন দেখাবে। মায়ের স্নেহের দৃষ্টিতে যেমন সব সন্তানই সুন্দর।

কাকীমা ধীরে ধীরে আমার সামনে এগিয়ে এলেন, কাছে খুব কাছে। বললেন, তুমি কী! তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই!

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কি বলতে চাইছেন? এমন কিছু, যা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কাকীমা আঁচলের গেরো খুলে, দলা পাকান একটা সুতোর তাল বের করলেন। সুতোর দলা কপালে ঠেকিয়ে আমার সামনে ধরলেন।

ছি ছি, তোমার পইতে খুলে পড়ে গেছে খেয়াল নেই। আর একটু হলেই আমার পায়ে ঠেকে যেত। আজকালকার ছেলে ত, কোনও কিছু মানামানি নেই। নাও এখুনি পরে নাও।

অবাক হয়ে যাবার মত ঘটনা। গলা থেকে পইতে খুলে পড়ে গেছে টের পাই নি। উন্মত্ততার শেষ সীমায় পৌঁছলে মানুষের এই রকমই হয়। শুনেছি হাঙরে জলের তলায় পা কেটে নিয়ে গেলে মানুষ তখনই টের পায় না। পইতেটো নিয়ে বললুম, এটা আর পরা যাবে না। গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। নতুন পইতে চাই।

ব্রাহ্মণ মানুষ, গলা খালি রেখ না। নতুন পইতে আছে ত?

তা আছে। তৈরি করে পরে নোব। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমরা একবার মামার বাড়ি যাচ্ছি। ওপর খোলা থাকছে।

থাক না। আমি ত এখুনি রান্না চাপাব। কি হবে, কিছু বলেছেন?

না, আপনার যা খুশি।

ওপরে আসতেই পিতা বললেন, তুমি এই বাকসটা সাবধানে ধর, বেশি ভারি নয়। আচ্ছা, এখন কি রিকশা পাওয়া যাবে?

কেন যাবে না। ওই ত মোড়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে!

তা হলে চলো। দেরি করে লাভ নেই।

রিকশা চলেছে প্যাঁকোর প্যাঁকোর করে। রাস্তায় লোক থই থই করছে। নিজেকে কেমন যেন বিবাহিত বিবাহিত লাগছে। কেমন যেন পাকা পাকা। পিতার গায়ে গা লেগে গেলে মনে হচ্ছে, একটা মন্দির অপবিত্র করে দিলুম। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এই মুহূর্তে আমার মুখের দিকে তাকালেই

বলে দিতে পারতেন, এই ছোকরাটি কুমারত্ব হারিয়েছে। আমি সব দেখছি ; কিন্তু কেমন যেন নেশায় বুঁদ হয়ে। সাপের ছোবল খেয়েছি আমার পরিষ্কার জিভে।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মাতুলের গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট রয়েছে। ইন্‌জিন আদুরে বেড়ালের মত ঘড় ঘড় করছে। স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন চোখা এক ভদ্রলোক। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মাতুল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা রিকশা থেকে নামতে না নামতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তার একপাশে মাতুল এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে জামাই চলে গেল। গাড়িটার সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। মানুষ কত কষ্ট করে একটা কিছু গড়ে তোলে, সেই গড়া জিনিস ভেঙে গেলে মন ত খারাপ হবেই। আমারই হচ্ছে।

পিতৃদেব এগিয়ে গিয়ে মাতুলের কাঁধে হাত রাখলেন, মন খারাপ কোরো না জয়। এর চেয়ে ভাল গাড়ি তোমার হবে।

মাতুল দুঃখের হাসি হেসে বললেন, যাহা যায়, তাহা যায়। চলুন, ভেতরে চলুন। আমার কি সৌভাগ্য !

সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে একটি সাদা, লোমওলা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন সবেতেই মহানন্দ। আমাদের দেখে ধেই ধেই নাচ শুরু হল। আমরা বসার ঘরে এসে যে সোফাগুলো একটু পরেই বিক্রি হয়ে যাবে তারই একটায় বসলুম। কিছু দূরে মেঝেতে গালচে পাতা, শোয়ান রয়েছে বিশাল একটি তম্বুরা। বসে আছে সেই হারমোনিয়াম। রুপোর পাত আর মাদার অফ পার্লসের কাজ করা।

মাতুল বললেন, বসুন, আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।

শুধু চা, সঙ্গে আর কিছু নয় কিন্তু !

কেন আর কিছু নয় কেন ?

আমরা মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালুম। মাতামহ এসে দাঁড়িয়েছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সাদা একটি পইতে প্রশস্ত বক্ষদেশের এ কোণ থেকে ও কোণে চলে গেছে। পায়ে খড়ম। খুটুর খুটুর আওয়াজ হচ্ছে। কপালে বেশ বড় মাপের একটি লাল চন্দন-টিপ।

পিতা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আসুন, আসুন, এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ? এতদিন ছিলেন কোথায় ?

মাতামহ চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ঘরে এলেন, খড়াস করে খড়মের শব্দ হল। মাতামহ বললেন, একটু ভাঙাগড়ার মধ্যে রয়েছি হরিশঙ্কর। অনেক কিছু ভাঙতে হচ্ছে, অনেক কিছু গড়তে হচ্ছে, তোমাকে একটা কথা বলি।

মাতামহ সামনের সোফায় বসলেন, মাতুল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কুকুর চলল পেছনে পেছনে।

মাতামহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বুঝলে, অত সহজ নয়। অনেক সময় লাগে। সব সময় সময়েও হয় না। আলাদা একটা মন চাই।

কিসের কথা বলছেন বলুন তো !

ছাড়বো বললেই সব ছাড়া যায় না। হাসি হাসি মুখে ভাঙা যায় না। বড় কষ্ট হয় বুঝলে, সবচেয়ে কষ্ট দেয় স্মৃতি। এই ঘরটা তোমার মনে পড়ে হরিশঙ্কর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পড়ে।

মনে পড়ে, ওই গালচেটা এখন যে জায়গায় পাতা আছে, ঠিক ওই জায়গায় !

আজ্ঞে হ্যাঁ ওই জায়গায়, ওই কোণটায় আমি বসেছিলুম।

আচ্ছা বলো তো, কত বছর, কত বছর পেছলে আবার সেই রাত ফিরে আসবে ? সেই সানাইয়ের সুর, সেই ফুলের গন্ধ। সময়ের চেয়ে মানুষের আর বড় শত্রু কে ? দেখনা, এই দশ মিনিট আগেও, আমার বয়েস দশ মিনিট কম ছিল। জয়ের গাড়িটা ছিল। আমাদের বয়েসে দশ মিনিট যোগ হল, পরমায়ু দশ মিনিট ক্ষয় হল, একটা সম্পদ চলে গেল। সময়কে আর একটু এগোতে দাও, দেখবে এই

ঘর খালি, আর একটু এগোতে দাও, সব ভোঁভাঁ। শূন্য ঘরে, ঘুলঘুলির চড়াইয়ের ডাক ঝনঝন করছে, যেন শাঁখার ওপর শাঁখারীর আধ খাওয়া চাঁদের মত করাত চলছে। এ বড় শক্ত ঠাঁই হে হরিশঙ্কর। এত দেখেও মনটাকে বাঁধতে পারলুম না!

মাতামহ সোফা ছেড়ে গালচের ওপর স্থান নিলেন। ভীষণ ব্যস্ততায় কাঁধে তুলে নিলেন তম্বুরা, সুর বাঁধাই ছিল, আঙুল ঠেকাতেই বাতাস ভরে গেল। গান ধরলেন :

উঠ গো করুণাময়ী
খোল গো কুটিরদ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি
হৃদি কাঁদে অনিবার ॥

মাতামহ ওস্তাদের মত হাঁটু মুড়ে বসেছেন। সামনে খাড়া হয়ে আছে তম্বুরা। চোখ দুটি মুদিত। মুখ জবাফুলের মত লাল। চোখের কোল বেয়ে নামছে জলের ধারা। এত সুন্দর গান কদাচিৎ শোনা যায়। এ যেন মাতামহের 'সোয়ান সং'।

পিতা বললেন, নেমে বোসো, নেমে বোসো।

দু'জনেই নেমে বসলুম। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। মাতুল এ ব্যাপারে একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত। যা কাল ছেড়ে যেতে হবে, তাকে আজও সুন্দর করে রেখেছেন। অবহেলায় এলোমেলো নয়। মাতুল এসে আসরে বসেই মাতামহের সঙ্গে হারমোনিয়াম ধরলেন। এ যেন এক মণি-কাঞ্চন যোগ। বাইরে প্রথম শরতের রোদ ঝলমল করছে। গোটাকতক হলদে আব সাদা প্রজাপতি খুব নাচানাচি করছে।

পিতা আপন মনেই বললেন, আহা এ লীলা কি ভাঙা যায়!

মাতামহ প্রথম গান শেষ করে, দ্বিতীয় গান ধরলেন,

রাজরাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা-ভিখারী আমি, করুণা-নয়নে চাও ॥

পিতা বললেন, আহা সকালেও কাফি কি সুন্দর লাগে?

মাতুল সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন,

চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও ॥
কলুষ কলঙ্কে ভরা আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়া লও ॥

একটি সুন্দর ট্রেতে বেশ দামী কাপ ডিশ সাজিয়ে মাইমা ঘরে এসেছেন। মাথায় পরিমিত ঘোমটা। গরম সিঙাড়ার গন্ধ ভাসছে। চায়ের পট তোয়ালের জামা পরেছে। বাহাদুব ট্রেটি মেঝেতে সাবধানে নামিয়ে রাখল। ভোজন রসিক মাতুল আজও আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। রাতে নিশ্চয়ই লুচি মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে। মাতুল প্রায়ই ঠাকুরের একটি কথা বলেন, রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না।

রাজরাজেশ্বর দেখা দাও

প্রথম চরণটি গেয়ে, গান শেষ হল। তম্বুরা রেখে মাতামহ উঠে দাঁড়লেন। পিতা বললেন, চললেন কোথায়? বসুন স্থির হয়ে।

আমি, আমি বসব? আমি যে একটা গেঁয়ো লোক, হেটো লোক!

আমিও ত তাই, আমি বসলে আপনিও বসবেন।

মাতুল মাথা নিচু করে আছেন। মাইমা একপাশে জড়সড়। বাহাদুর নিলডাউন। পিতার কথা অমান্য করারসাহস মাতামহের নেই। তিনি বসলেন।

পিতা বললেন, বউমা, দাও, এবার সবাইকে দাও। সিঙাড়া কি তুমি ভাজলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমাদের সামনে ডিশ ধরে দেবার জন্যে মাইমা যেই হাত বাড়ালেন, তখনই নজরে পড়ল, হাতে শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই। সব অলঙ্কার ছায়াছবিতে ভোজবাজি হয়ে গেছে।

প্লেটে প্লেটে সকলকে সিঙাড়া এগিয়ে দিয়ে মাইমা উঠে যাচ্ছিলেন, পিতা বললেন, বউমা বোসো।

তিনি মেঝেতে ভব্য হয়ে বসে আদেশ পালন করলেন। পিতা আমাকে বললেন, দেখি বাক্সটা।

খড়খড়ে কুমিরের চামড়ার সদৃশ্য বাক্স খুলে তিনি দুগাছা মোটা মোটা রুলি বের করলেন। সোনার বঙটা যেন সকালের প্রথম রোদের মত। রুলি দুটো মাইমাব দিকে এগিয়ে ধরে তিনি বললেন, নাও, পরে নাও। মেয়েদের হাত খালি রাখতে নেই।

মাইমা ভীষণ বিপদে পড়েছেন, একবার মাতুলেব মুখের দিকে, একবার মাতামহের মুখের দিকে, একবার পিতার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন আর ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন।

মাতামহ শেষে বললেন, একি করছ হরিশঙ্কর, ও যে সোনার, অনেক দাম।

হ্যাঁ, অনেক দাম, তাতে কি হয়েছে। তার চেয়েও দামী আমাদের দিতে পারার মন। লাখোপতি, কোটিপতিও দবিদ্র, যদি তার মনটা ক্ষুদ্র হয়।

তুমি এ কি হঠকাবিতা কবছ হরিশঙ্কর ! আমার নাতিটার বিয়ে এসে গেল, এসব তখন তোমার খুব লাগবে।

হ্যাঁ, তা লাগবে, তবে একটা কথা জেনে নিন, ঘুড়ি দুভাবে ওড়ে, এক, কেউ ধরাই দিয়ে তুলে দেয় দুই, নিজেই হেঁচকে হেঁচকে আকাশে তোলা যায়। নাতি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেবে, না পাবলে আপনাব নাতবউ নিবালঙ্কাবাই থাকবে। তা ছাডা, বউমা যে ঘব থেকে আসবে, তাঁবা মেয়েকে সাজিয়েই পাঠাবেন।

মাতামহ নীরব। মাইমা মৃদু গলায় মাতুলকে বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন ?

মাতুল উদাস মুখে বললেন, এ তো আমারই অক্ষমতা !

পিতা গম্ভীর গলায় বললেন, ভুল কোরো না, আমার উপর কারুর কিছু বলার নেই। বাধ্য মেয়ের মত নিয়ে আমাব সামনেই হাতে পরে ফেল। অবাধ্যতা, আমি ভীষণ অপছন্দ করি।

মাতুল নিজের মনেই বললেন, ছি ছি, এ আমার অক্ষমতা।

পিতা বললেন, অক্ষমতা, অক্ষমতা করে পেনডুলামের মত দুলছ কেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে কম্যাণ্ডার ফিরে এলেও দেশের মানুষ তাঁকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা কবে, বলে হিরোইক-ডিফিট। স্পেকুলেশানে হার-জিত থাকবেই। নাও পরে নাও। নষ্ট করার মত সময় আমার নেই।

মাতামহ বললেন, বউমা, পরে ফেল। জামাইকে আমার চিনি। বাধা পেলেই সে পাহাড়ী নদী।

মাইমা রুলি দুটি মাথায় ঠেকালেন, তারপর মর্যাদা অনুসারে সকলকে একে একে প্রণাম করলেন। দরজার সামনে বাহাদুর। তার মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। যেন হিমালয়ে রোদ পড়েছে।

সদর থেকে ধরাধরা গলায় কে ডাক ছাড়লেন, জয়বাবু আছেন, জয়বাবু!

সামনে যখন যাবি ওরে থাক-না পিছন পিছে পড়ে

আসুন, আসুন, বিষ্টুবাবু আসুন।

বিক্রেতা মাতুলের খাতির করার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ইনি একজন ক্রেতা। পরনে ঝলঝলে ট্রাউজার, দুপকেটঅলা বুশ শার্ট। পকেট দুটো কাগজপত্রে ঠাসা। একটা পকেটে উঁকি মারছে সোনালি সিগারেট কেস। আর এক পকেটে লেদার পার্স। ভদ্রলোকের বেশ গোব্দা চেহারা। ভুঁড়ি

ওলটানো-গামলার মত বুশ শার্টকে সামনের দিকে ঠেলে রেখেছে। চৌকাঠের ওপর দিয়ে ঘরে একটা পা ফেললেন, বেশ কম্পন অনুভব করা গেল। কাপ ডিশ চিন করে উঠল।

অ, আসর বসে গেছে !

আমার বলতে ইচ্ছে করল, আ, বসেছে। মুখে এসেও আটকে গেল। ভদ্রলোকের অবয়ব থেকে ঐশ্বর্যের বদ গন্ধ বেরচ্ছে। যা ধান্যেশ্বরীর গন্ধকেও হাব মানায়, এমন বদবিটকেলে ! আমরা সবাই মেঝেতে গালচের ওপর বসে আছি, তিনি দুম করে সোফায় গিয়ে বসলেন। সোফা সেই শরীরের ভারে নাচতে লাগল।

পিতার চোখ অনুসরণ করছে, প্রতিটি গতিবিধি, ভাবভঙ্গি। বেশ বুঝতে পারছি, মনে মনে বার কতক 'ভালগার' বলা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের নিচের ঠোঁট অসম্ভব পুরু। দুধে ভেজানো কালো পাঁউরুটির মত। আমার মনে হয়, ইনি খাবার সময় হুসহাস শব্দ করেন। ঢেউ করে ঢেঁকুর তোলেন। খেয়ে উঠে দাঁত খোঁচান, দাঁতের ফাঁকে থেকে খাদ্যাংশ বের করার জন্যে এক ধবনের চুসুক চুসুক শব্দ করেন। খাট কাঁপিয়ে দুম করে পাশ ফেরেন এবং পাশ বালিশ ব্যবহাব করেন। নিঃসন্দেহে ইনি একজন মদমত্ত পুরুষ। ঘামে অবশ্যই দুর্গন্ধ আছে। পিতা পরে একদিন নিশ্চয়ই বলবেন, ওয়েলদি ফ্রগ। সর্ব অঙ্গে টাকার পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড।

সোফাকে আর একবাব নাচিয়ে বললেন, স্প্রিং ঠিক আছে ত ! একটু দেবে দেবে গেছে মনে হচ্ছে।

মাতুল বললেন, না না, একেবারে নতুনের মতই আছে। আমার কাছে জিনিসপত্র খুব যত্নেই থাকে। তা ছাড়া বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে নেই।

অ।

পায়ের ওপর পা তুলে বার কতক নাচিয়ে নিলেন। বাহাদুর এসে এক প্লেট সিঙাড়া আর এক কাপ চা ধরে দিয়ে গেল। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে সিঙাড়াব প্লেট নিতে নিতে বললেন, এ সব আবার কেন, এসব আবাব কেন। দু আঙুলে একটা সিঙাড়া ধরে কামড মেবেই হা হা করতে লাগলেন। গরম লেগেছে। মুখ দিয়ে যেন ড্রাগনের নিঃশ্বাস বেরচ্ছে। কতটা গবম ঠিক আন্দাজ কবতে পাবেননি। কোনও রকমে গলা দিয়ে নামালেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বেশ কাবু হযে পডেছেন। মা যেমন গরম লেগে যাওয়া সন্তানকে দুলিয়ে দুলিয়ে হাওয়া খাইয়ে শান্ত কবার চেষ্টা করেন, ভদ্রলোক তেমনি আধখাওয়া সিঙাড়াটিকে হাওয়া খাওয়াতে লাগলেন। একটু সামলে নিযে বললেন, গান থামল কেন ? চলুক না চলুক। একটু ভৈরবী-টৈরবী।

মাতুলের ভুরুব কাছটা কুঁচকে গেল। আমি জানি এই ধরনেব কথা তিনি সহ্য করতে পাবেন না। ভেতরে ভেতবে তেতে উঠছেন। ফেটে পডলেন বলে। মাতামহের হাতেব মুঠো খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে সাধাবণত তাঁর যা বলার ইচ্ছে হয, তা হল, ধুর মড়া। খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছেন।

এতক্ষণে পিতা মুখ খুললেন, জয, ইনিই কি তোমাব সেই সোফাব ক্রেতা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পেমেণ্ট করেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতো ?

হাজার।

ভদ্রলোক ফড়াস করে চায়ে চুমুক মেরে বললেন, এখন মনে হচ্ছে দামটা একটু বেশি হয়ে গেছে। সাতশো-টাতশো হলেই ভাল হত। আবার একটা দোর্দণ্ড চুমুক।

পিতা কুমিরের চামড়ার সেই বাকসটি খুলে, একটা দশ টাকার নোটের কড়কড়ে বাণ্ডিল হাতে তুলে নিলেন। বাণ্ডিলটা ভদ্রলোকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, হিয়ার ইউ আর।

নোটের বাণ্ডিল সোফায় পড়ে অল্প একটু নেচে উঠল। ভদ্রলোক কাপ নামিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন,

এর মানে ?

পিতা বললেন, ভেরি সিম্পল। হাজাব আছে কিনা দেখে নিন, তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে যান।

কেন কেন, সোফা বিক্রি হবে না ?

না।

তার মানে ? আপনি কে ?

জানার প্রয়োজন নেই। চা খাওয়া হয়েছে ? আচ্ছা তা হলে আসুন।

পিতা হাত জোড় কবে মুখে অদ্ভুত এক হাসি ভাঙলেন। ভদ্রলোক বললেন, সে কি ! মেয়েব বিয়ে, জামাইকে সোফাসেট দোবো, সব ঠিক।

বেশ ত নতুন কিনে দিন, কত আর পড়বে, এই ধরনেব জিনিস হাজাব তিনেকে হয়ে যাবে, তবে বাঘছালেব কভার হবে না।

অ্যাঁ, এটা বাঘছাল নাকি ?

বসে আছেন, বুঝতে পাবছেন না !

বাঘছাল ! সোফায় বাঘছালের কভাব। এর দাম ত তা হলে দশ বারো হাজারও হতে পারে।

অবশ্যই পারে।

তাহলে ?

তা হলে টাকাটা তুলে নিয়ে দয়া করে আসুন।

কে যে আপনি ? কোথা থেকে যে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন !

মাতামহ দুম করে গালচের ওপর একটা চাপড় মেড়ে জানিয়ে দিলেন, আর বেশিক্ষণ সহ্য করব না। এইবার লেগে যাবে ধুন্দুমাব। মাতুল বললেন, কাকে কি বলছেন ? জানেন ইনি কে ?

ভদ্রলোক বললেন, আমার জানার দরকার নেই। বিক্রির সময় উনি কি ছিলেন !

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, আর ত সহ্য করা যাচ্ছে না। তোমার রাগ হচ্ছে না ?

রাগের বদলে দুঃখ হচ্ছে। এই ভদ্রলোকের কি অবস্থা দেখেছেন, লোভে একেবারে জরোজরো। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। শিকার ফসকে গেলে সব পশুরই এক অবস্থা হয়।

ভদ্রলোক এবাব উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে একটা ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছিল, সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কি হবে ?

পিতা বললেন, ওটা যেমন ঝুলছে, ঝুলবে, আলো দেবে।

অ। আর কিছু বিক্রি হবে, টি-সেট সরবত সেট।

মাতামহ বললেন, হ্যাঁগো, এ যে একেব পর এক ফ্যাচাং বাব করছে।

মাতুল বললেন, না, আর কিছু বিক্রি হবে না।

অ, হঠাৎ তা হলে অবস্থাব উন্নতি হয়ে গেল।

সোফার কভারে আদরের হাত বুলিয়ে বললেন, সত্যি বাঘের ছাল ?

মাতামহ বললেন, সন্দেহ থাকলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে এসো না বাপু।

ভদ্রলোক দু পা ফাঁক করে অসভ্য অহঙ্কারীর মত দাঁড়িয়ে, সোনার সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, আর এক হাজার বাড়িয়ে দোব ? কড়কড়ে হাজার।

মাতামহ বললেন, এ কি গো। এ যে আমাদেব সামনে সিগারেট ফোঁকার তালে আছে।

মাতামহ গালচে ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, পিতা হাত ধরে টেনে বসালেন, যাবেন কোথায়, পয়সা আর শূকরের বিষ্ঠা, দুটোরই এক রকম গন্ধ, একটু সহ্য আপনাকে করতেই হবে। পালাবেন কোথায় ?

ভদ্রলোক বাঁকা চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মাতুল হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন। আর তখনই দেখলুম, লোকটির ঘাড়ে এক ধাবড়া পাউডার।

মাতামহ বললেন, বুঝলে হরিশঙ্কর, আমাদের বাবুর অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে।
কি ক্ষমতা ?
ভূত ধরার। এই মড়াকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলো বলো ত ! সারাজীবন শুধু ভূত ভোজন আর ভূতের নৃত্য !
কি করবে বলুন ? আজকাল ভূত যে খুব জন্মাচ্ছে।
ঘরের বাইরে ভদ্রলোকের চড়া গলা শোনা গেল, মাল ত পেলুমই না, উলটে ঠ্যালা ভাড়াটাই আমার লস।
পিতা উঠে বাইরে গেলেন। মাতামহ বললেন, আরে ওকে ধরো ধরো, চড চাপড় মেরে দিতে পারে। বড় রাগী মানুষ।
বারান্দার রেলিং-এ কনুই রেখে ভদ্রলোক সিগারেট ফুঁকছেন। পিতা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ধোঁয়ার প্রকোপ বাঁচাতে বাঁচাতে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়ের ঠ্যালা ভাড়া কতো ?
দশ।
পিতা বুক পকেটে হাত দিলেন। দরজার সামনে মাতামহ। তিনি বললেন, দশ কি হে ! কোথায় যাবে ? বেশি বলছে হরিশঙ্কর। ঝট করে দিয়ে দিও না, একটু দরদস্তুর করা ভালো।
ভদ্রলোক বললেন, কতটা যেতে হবে জানেন ?
কতটা ? যতটাই হোক, তুমি যে লরির ভাড়া বলছ। পাঁচ দিয়ে ছেড়ে দাও হরিশঙ্কর। পাঁচের বেশি হতেই পারে না।
ভদ্রলোক বললেন, এই লোড নিয়ে কেউ পাঁচ টাকায় যাবে না।
না যায় না যাবে, থাক আমার মাল পড়ে।
পিতা বললেন, আপনি চুপ করুন। এই ক্লাসের সঙ্গে আজকাল আর তর্ক চলে না। যা চাইবে তাই দিতে হবে। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে।
ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কোন ক্লাস ?
এই ঠ্যালাঅলা, রিকশাঅলা, রেলওয়ে পোর্টার।
অ। তাই বলুন। আমি ভাবলুম, আমাকে বলছেন বুঝি।
না, আপনাকে বলব কেন ? এই নিন আপনার দশ টাকা।
ভদ্রলোকের প্রকৃতই কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে পকেটে পুরলেন।
মাতামহ বললেন, বাবু এখনও হাল ছাড়েননি, জপাবার চেষ্টা চলছে।
পিতা মাতামহের হাত ধরে ঘরে টেনে আনলেন। ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমাদের ছুটি। এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। বেশ একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল, কোথা থেকে এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল।
মাতুল ঘরে এলেন। ভদ্রলোক বিদায় নিয়েছেন। ঘরে ঢুকে মাতুল মৃদু হাসলেন। অপরাধীর হাসি। মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে তুমি এসব জিনিস আমদানী করো। যেমন সিন্ধুঘোটকের মত চেহারা।
এর বাবা মস্ত বড়লোক ছিলেন। ছেলেটা কেমন যেন একটু বখে গেছে।
ছেলে আর বোলো না। দামড়া বলাই ভালো।
পিতা বললেন, ওই রকমই হয়। বাপ বড়ো হলে ছেলে খারাপ হয়। বিদ্যাসাগরের ছেলে পানাপুকুর। মাতুল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, এ সব আপনি কি করছেন ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
বুঝলে না ? একে বলে শেষের সময় হাল ধরা। মেরামতির কাজ।
এমন ত কেউ করে না।
কেউ কেউ করে। করে বলেই সংসার অচল হয় না। কেউ না কেউ ঘড়িতে দম দেয় তাই সময় চলে, কাঁটা ঘোরে। এ বাড়ির যা গেছে তা গেছে। আর নতুন করে কিছু যাবে না।

আমাকে ত যেতেই হবে।
তুমি যাবে, অবশ্যই যাবে। স্থির পুরুষের কাছে ভাগ্য ফিরে আসে না। যে জলে স্রোত নেই, সে জলে কচুরিপানা, ঝাঁজির দঁক তৈরি হয়। তুমি বউমা দু'জনেই যাবে। বউমা তোমার সঙ্গে না থাকলে তুমি ভেসে যাবে। সব নৌকোরই নোঙর থাকা চাই। এ বাড়ি দেখবে বাহাদুর। মাইনে আমি দোব। আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখাশোনা করে যাব।
মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হঠাৎ এই সময় মাথায় হিমালয় চাপল! এই ত গত বছর, না আগের বছর ঘুরে এলেন।
পদ্মাসনে মাথা নিচু করে বসেছিলেন তিনি। প্রশ্ন শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, মাথা দোলাচ্ছেন, আর মেঝেতে আঙলু ঠুকছেন।
পিতা বললেন, কি, উত্তর দিন
মাতামহ মুখ তুললেন। সারা মুখে অদ্ভুত এক ধরনের বিষণ্ণ হাসি। বললেন, উত্তর চাও হরিশঙ্কর, উত্তর। নৌকো আব নোঙরের কথা বললে না? কোনও কোনও নৌকোর নোঙর না থাকাই ভাল হরিশঙ্কব। তাদের যে ভেড়ার মত ঘাট নেই। বাণিজ্য করাব মত হাট নেই। সে নৌকো কেবল ভেসেই চলে, ভেসেই চলে। ভাসতে ভাসতে একদিন সাগরে।
বড অভিমান জমেছে মনে, কিসের অভিমান। প্রসাদের গান করেন, সব অভিমান মায়ের দিকে ঠেলে দিতে পারেন না।
তুমি পারো হরিশঙ্কর? কোনও মানুষ পারে?
পিতা নীরব হয়ে গেলেন। একটা বয়েসে সব মানুষেব চোখেই কেমন এক ধরনের দৃষ্টি আসে, মরা আগুনের মত। সে দৃষ্টি জগতের কোনও কিছুকেই যেন স্পর্শ করতে চায় না। এখানে নেই, ওখানে নেই, কোথায় যে আছে ধরা যায় না। মেঘলা আকাশের মত নিষ্প্রভ। মাতামহের চোখ দুটি বেশ আয়ত। সেই আয়ত দুটি চোখে যেন এক জোড়া গাংচিল উড়ছে। সমুদ্রের দূর দিকচক্রবালে তারা ডানা মেলে চক্কর খেয়ে চলেছে।
পিতা উঠে পড়লেন। ঘরের এ পাশ থেকে ওপাশে দুবার ঘুরে এলেন। কল্পনায় অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। দশ বছর আগে, বিশ বছর আগে, তিরিশ বছব আগে, যেখানে যা ছিল, সেই সব বসাতে চাইছেন, জহুরী যেমন জড়োয়ার গহনায় চিমটে দিয়ে, লাল, নীল, সবুজ পাথর সেট করার চেষ্টা করেন।
ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যাই। যা ছিল তা আব নেই। যা আছে তাও হয়ত থাকবে না। যা যাবেই তা যাবেই, ব্যর্থ চেষ্টা, তবু চেষ্টা। মন যখন চাইছে, তখন ঘুরে আসুন একবার হরিদ্বাব। তবে পনের দিনের মধ্যে ফিরতে হবে। সব ব্যাপারে জীবনদর্শন, মৃত্যু, লক্ষ বকমেব প্যানপ্যানানি টেনে আনা এক ধরনের কল্পবিলাস। আমাদের অলস জীবনেই এ সব প্রশ্রয় পায়, ইওবোপেব মানুষ পাত্তা দেয় না। জয়, তোমার সেই খাটটা কত টাকায় বিক্রি করলে?
এখনও দাম পাইনি। দুপুরে তাঁরা আসবেন দেখতে।
এলে বোলো, খাট বিক্রি হবে না। বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করার অভ্যাস বড় খারাপ। আমি সহ্য করতে পারি না। তোমার টাকা পয়সার অবস্থা কি রকম? নতুন জায়গায় গিয়ে ক'দিন সামলাতে পারবে?
শ' পাঁচেক আছে।
আরও শ'পাঁচেক রাখো।
পিতা মাতুলের দিকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। মাতুল ইতস্তত করছেন।
নাও ধরো। জীবনে একটু বাস্তববুদ্ধি আনার চেষ্টা করো। পুরুষ হবে পুরুষের মত। মেয়েরা হবে মেয়েদের মত। নাও, নাও আমার সময়ের অনেক দাম।
মাতুল হাত পেতে নোট পাঁচখানা নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। পিতা বললেন, সেন্টিমেণ্টাল হয়ে সিন ক্রিয়েট কোরো না।

দরজার বাইরে আসতেই মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তুমি একবার আমার ঘরে আসবে। তোমার সঙ্গে একান্তে আমার দু' একটা কথা আছে।

হ্যাঁ, কেন যাবো না।

মাতামহ আমার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে বললেন, সুদের সুদ তুমিও আসতে পারো।

নারকেল গাছের তলায় মাতামহের কুটীর। ঠিক যেন বৈরাগীর আশ্রম। এই ঘরে আমাদের দু'জনের কত গানের আসর বসেছে। বেসুরো, বেতালা। পেছনেব দিকের ওই জানালায় এসে রাস্তার ছেলেরা কুকুব ডেকেছে, বেড়াল ডেকেছে।

আমবা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাতামহ দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরটি বেশ নিভৃত হয়ে উঠল। চৌকির ওপব কম্বল মোড়া বিছানা গোল করে গোটানো। দেয়ালে মা জগদম্বা রোজ যেমন হাসেন তেমনি হাসছেন। পুণ্যবান হয়ত সে হাসির খলখল শব্দ শুনতে পাবেন।

মাতামহ বললেন, তোমাকে আমি দুটো জিনিস দেখাবো হরিশঙ্কর। প্রথমে, তুমি আমাকে দেখো।

আপনাকে আর নতুন করে কি দেখবো বলুন।

হরিশঙ্কর আমার একটা কিছু হয়েছে, বুঝলে।

বৈরাগ্য!

সে ত মনে। আমি বলছি দেহে। দেখবে তুমি? এই দ্যাখো।

মাতামহ ডান পাটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। পায়ের পাতা ফুলে তপতপ করছে। একটু নয়, বেশ ফুলেছে। পিতা বললেন, এ কি? এ যে বেশ ফুলেছে। দেখি।

পিতা নিচু হয়ে পায়ের পাতার একটা জায়গা আঙুল দিয়ে টিপে আঙুলটা তুলে নিলেন। জায়গাটা দেবেই রইল। জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন হল এই বকম হয়েছে?

ক'দিন ধরেই অল্প অল্প ফুলছিল। আজ দিন তিনেক হল ভীষণ ফুলেছে।

দুটো পাতাই?

হ্যাঁ দুটোই, এই দ্যাখো না।

এর সঙ্গে আর কোনও অসুবিধে আছে?

আছে। প্রস্রাব তেমন ভালো হচ্ছে না। চলাফেরা করলে হাঁপ ধরছে, মাথা ঘুরছে।

খিদে?

একেবারে নেই। খেলেই গা গুলোচ্ছে। বমি বমি লাগছে। ওই দ্যাখো না, অনেকদিন আলুর চপ খাইনি, সকালে গোটাচারেক গবম চপ এনেছিলুম, আধখানা খেয়ে ফেলে রেখেছি। ওপবে গরম সিঙাড়া দিলে মুখে রুচলো না। চা অত ভালবাসতুম, চা-ও আর ভালো লাগে না। এক চুমুক খাই আব ফেলে দি। আমার কি হোলো বলো তো।

পিতা চৌকির একধারে বসে বললেন, হুঁ। আজই, এখুনি হগ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, না হয কল দিতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না।

তুমি এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি দাও না আগে। তোমার ওষুধে আমার ভীষণ কাজ হয়।

শুনুন, আমি ঠেকা দিতে পারি, পারিবারিক চিকিৎসা পর্যন্ত আমার জ্ঞান। ওর ওপর বিশেষ ভরসা কবা যায় না।

আমি হরিশঙ্কর অ্যালোপেথিতে যেতে চাই না। ভীষণ খবচ।

খরচের কথা কে আপনাকে ভাবতে বলেছে? সে ভাবনা আমার। আপনি জামাকাপড় পরে নিন।

এ বেলা থাক, ও বেলা হবে।

কথা একদম বাড়াবেন না। যা বলব তাই শুনতে হবে।

আচ্ছা, সে আমি পরছি। তোমার অবাধ্য হবার সাহস আমার নেই। তার আগে তোমাকে আর একটা জিনিস দ্যাখাই। বড় মূল্যবান!

মাতামহ সেই সিন্দুকটি খুললেন। কতকাল আগের কোন পূর্বপুরুষের জিনিস কে জানে। এক সময়

অনেক কারুকাজ ছিল। কাঠের দুটো চোখ বসানো। বয়েসে চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে গেছে। ডালাখোলা সিন্দুকের সামনে মাতামহ ঝুঁকে পড়লেন। দু হাত ক্রমশ নিচের দিকে নেমে চলেছে। এত কি জিনিস আছে!

একেবারে তলা থেকে কাপড়ের বাকসের মত একটা জিনিস বেরলো। সেটি নিয়ে তিনি চৌকিতে এসে বসলেন। সুতোব ফাঁস খুলতে খুলতে বললেন, বড় পবিত্র জিনিস হরিশঙ্কর, তুমি কুমারী পুজোর কথা শুনেছ?

শুনেছি, দেখিনি কোনও দিন।

তুলসীব বয়েস তখন সাত কি আট।

মাতামহ কথা বন্ধ করে, বাকসর ঢাকা খুললেন। অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ বেরলো। প্রাচীন কালেবও একটা গন্ধ আছে। সময়ের সুবাস। মাতামহ বললেন, এটা একটা বেনারসী। এর বুননে বুননে সোনা আর রূপোর সুতোব কেরামতি। জমি আব আঁজলা খুললে তোমাদের তাক লেগে যাবে। জমিদার প্রসন্ন চৌধুবীব বাড়িতে খুব বড পুজো হত।

কোথায়?

বলাগড়ে। সেইখানে তুলসীকে কুমাবী করেছিল। সে এক দৃশ্য হবিশঙ্কর। তুলসীব সেই রূপ। বেনাবসী পবেছে। গায়ে গহনার সাজ, এলো চুল, ফুলের মালা, মটুক, রাজরাজেশ্বরীর মত সিংহাসনে বসেছে, ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়া। তুমি দ্যাখো হরিশঙ্কব,পৃথিবীতে মানুষেব চেয়ে একটা বেনারসীব পবমায়ু কত বেশি। তুলসী কোথায় চলে গেল, তুলসী। যাবার আগে তোমাকেই দিয়ে যাই, বড পবিত্র জিনিস। যে সংসাবে থাকবে, সে সংসাবেব মঙ্গল।

আয়, আয়, প্রণাম কর।

কাছে এগিয়ে গেলুম। একজনেব না-থাকাটা যত দূরে সরে যাচ্ছে, তাঁব বেখে যাওযা জিনিসের মূল্য তত বেড়ে যাচ্ছে। তুমি ছিলে এই ত তাব প্রমাণ। এই ঘরে, ও ঘরে, এ বাড়িতে, ও বাড়িতে, দুটি পা চলে বেড়াত, একটি শবীর নিঃশ্বাস নিত, দুটি চোখ দেখত, হাসি খেলত ঠোঁটে, কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াত। সেই বলাগড, জানি না কোথায়। যাইনি কোনও দিন। গ্রামের পথে ধুলো উড়ছে। শবতের শিশিব পড়ে আছে ভোরের ঘাসে। শিউলি ঝরে, এখনও ঝরে। জমিদার প্রসন্ন চৌধুরী, কে তিনি? অষ্টমীর দ্বিপ্রহর, একটি মেয়ে এই বেনারসী পরে, সিংহাসনে বসে আছে, জলচৌকিতে রূপোর থালার ওপর তার দুটি পায়ে কি ফুল? জবা, পদ্ম, টগর, শিউলি। হোমের আগুন, ধূপের ধোঁয়া ধুনো, গুগগুল, চন্দন। কপালে ঘাম, ঠোঁটে মুক্তর বিন্দুব মত ঘাম। আমার মা। পৃথিবী আবও সাত বছর, দশ, বছব পাক খেল মহাশূন্যে। কে জানত তখন তিনিই আমাব মা হবেন। তারপর খেলা না ফুরাতে খেলা ঘর ভেঙে যায়। কেউ যদি এই সময ওই রবীন্দ্রসংগীতটি একটু শোনাতে পাবতেন:

ওই-রে তরী দিল খুলে
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওবে,
থাক্‌না পিছন পিছে পড়ে—

পিতা বললেন, মনটা বড খারাপ করে দিলেন।

শোনো হবিশঙ্কর,এ খাবাপে বড় আনন্দ আছে। তোমাকে বলি, আনন্দে তেমন আনন্দ নেই। থাকার চেয়ে না থাকাটা আরও বেশি থাকা। তুমি কত লেখাপড়া জানা মানুষ, তোমাকে আমি কি বলব? আমাব কাছে আর একটা জিনিস আছে দেখবে? সেটা কিন্তু তোমাকে আমি দিতে পারব না।

মাতামহ আবাব উঠে গেলেন সিন্দুকের কাছে। তলার দিকে হাত চালালেন। একটা বড খাম বেবিয়ে এল। তার মধ্যে অজস্র টুকরো টুকরো কাগজ। বেছে বেছে ভাঁজ করা একটা কাগজ তুলে নিলেন। দোক্তাব পাতার মত বঙ হয়ে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফাট ধরেছে।

এটা কি বলো তো? তুলসীর চিঠি। বিয়ের পর বাপের কাছে তার প্রথম চিঠি। সেই তোমবা

জামতাড়ায় চেঞ্জে গিয়েছিলে, সেইখান থেকে লিখছে, দ্যাখো, তোমার সম্পর্কে কি লিখেছে

'তোমার জামাই একটু রাগী হলে কি হবে, মনটা আকাশের মত, কিছুই লেগে থাকে না। সিল্কের কাপড়ের মত মসৃণ, তবে ঘষা লাগলেই গরম হয়ে ওঠে। তুমি কিছু ভেবো না, আমার চারদিকেই সুখ।'

জানতে তুমি! এসব তুমি জানতে? কত বড় ক্যারেকটার সার্টিফিকেট। বলো একবার। হাতের লেখাটা দ্যাখো, ছোট্ট ছোট্ট, মুক্তোর দানার মত। ছিল কালো, হয়ে গেছে বাদামী। হ্যাঁ গো, অদৃশ্য হয়ে যাবে না তো!

The road of excess leads to the Palace of Wisdom.

পিক পিক করে বারকতক হর্ন বাজল। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হবার শব্দ হল। বাথরুমে চান করতে করতে শুনছি। এই অবেলায় কে আবার এলেন! তিনজন গাড়িধারী আসতেন এ-বাড়িতে। প্রতাপ রায়। তাঁর খেলা শেষ। ফুল ঝরে গেছে, ভ্রমর উড়ে গেছে। মাতুল, তাঁর গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। পড়ে রইলেন পঙ্কজবাবু। মনে হয় তিনিই এসেছেন। পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কে নদীর মত জোয়ার ভাঁটা খেলে। দিনকতক খুব আসা-যাওয়া চলে। মাখামাখি, আহার-বিহার, তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কারুর সঙ্গে কারুর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে একটা গলা উঠে আসছে, সঙ্গে জুতোর সঙ্গত। পঙ্কজবাবুই এলেন। আজ বেশ একটু একা একা থাকতে ইচ্ছে করছিল। ভেবেছিলুম নিস্তব্ধ দুপুরের নির্জনতায় মুকুর খামটা খুলবো। সূর্যের আলোর দিকে তুলে ধরে দেখেছি, ভেতরে একটা আঙটি আছে। পাট করা, পুরু এক খণ্ড কাগজ আছে। সব ভেস্তে গেল। এইবার শুরু হবে, চা আনো, কিছু খাবার ব্যবস্থা করো।

স্নান করে বেরতেই পিতা বললেন, কী ব্যাপার বলো তো! আজ এতবার চান করছ! ঋতু পরিবর্তনের সময়, অসুখ-বিসুখে পড়বে না কি?

ভীষণ গরম লাগছিল, তাই!

তোমাদের সহ্যশক্তি বড় কম।

পঙ্কজবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, কার সহ্যশক্তি?

আজকালকার ছেলে-মেয়েদের।

ও, সে আমাদের জন্যেই, আমরাই দায়ী। আমরা সব শিখিয়েছি, সহ্য করতে শেখাইনি। দ্যাট ইজ নট এ পার্ট অফ আওয়ার এডুকেশান।

বাট দ্যাট ইজ অ্যাণ্ড ওয়াজ এ পার্ট অফ মাই এডুকেশান। আমাদের বাড়িতে তুমি একটা পাখা খুঁজে পাবে না। গরমে গরম সহ্য করো, শীতে শীত। তুমি মানুষ, জীবজগতের জীব, নিজেকে এডজাস্ট করো ঋতুর সঙ্গে। বাঘ পাখার বাতাস খায়!

তোমার আবার সব কিছু একসট্রিম। বাঘ থাকে জঙ্গলে, গাছের ঠাণ্ডায়, মানুষ থাকে শহরে কংক্রিটের জঙ্গলে। বাতাসের জন্যে একটু বাতাসের প্রয়োজন হতেই পারে। সহ্য জিনিসটা একটু অনাধবনের।

যেমন?

সহ্য মানে উতলা না হওয়া। সহ্য মানে নেগেশান নয়। সব আসুক। আমার পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠুক অমৃতে গরলে, আমি কিন্তু অটল।

রাইট ইউ আর। খুব ভালো বলেছ। আমরা বলি ভালো, করি তার উলটো।

আঃ সে তুমি ঠিক বলেছ। মানুষের আধখানা শয়তানের দখলে, আধখানা দেবতার দখলে। একবার

এ চুলের মুঠি ধরে একবার উনি ধরেন। আর আমরা চিৎকার করে বলি, প্রাণ যায়রে পাঁচু।
দার্শনিক আলোচনা হঠাৎ থামিয়ে পঙ্কজবাবু বললেন, নাও বাবা, রেডি হয়ে নাও, রেডি হয়ে নাও, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। দেরি হত না, টায়ার ফেঁসে গিয়ে এমন বিপদে ফেলে দিয়েছিল!
আমি কিছুই না বুঝে, দুই গুরুজনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। পিতা বললেন, নাও, নাও জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও, উনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!
কোথাও যেতে হবে?
হ্যাঁ, তোমাকে নিতে এসেছেন।
পঙ্কজবাবু বললেন, বিলেত থেকে হঠাৎ আমার ভায়রা এসেছে, তারা তোমাকে দেখার জন্যে একেবারে পাগল। কিছুতেই শুনবে না।
আমাকে আর দেখাব কি আছে? আমি ত তেমন কেউ নই।
পিতা একটু রুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার সব ভালো, তোমার ওই ঠোঁট ফোলানো অভিমানের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।
পঙ্কজবাবু বললেন, আহা, ওকে তুমি শুধু শুধু বকছ। তোমার রসকষশূন্য জীবন, অত রুক্ষ কি সবাই হতে পারবে! এ-সব কথা আসে অ্যামবিশান থেকে। আমাকে সবাই দেখুক এই ইচ্ছে পূর্ণ না হলেই অভিমানে মানুষ বলে, আমাকে দেখে কি হবে! বিজ্ঞান নিয়েই জীবন কাটালে, এইবাব একটু সাইকোলজি নাড়াচাড়া করো। আমি এখন খুব সাইকোলজি পড়ছি, মেয়ে বড় হয়েছে তো, স্ত্রীর বয়েস হচ্ছে। যাও বাবা, যাও, একটু সাজগোজ করে এসো।
ঘরে এসে জামাকাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে মেজাজটা ভীষণ খিচড়ে গেল। সারারাত জেগে, তালগোল পাকিয়ে শরীরটা তেমন ভালো নেই। চোখ দুটো ভেতরে টানছে। জ্বালা করছে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। এখন সেজেগুজে আদিখ্যেতা করতে যাও। কতরকমের বিপদ যে পৃথিবীতে আছে! নিজেকে নিয়ে মানুষ কতটুকু সময় বাঁচতে পারে। সব সময় দানখয়রাত করে দাও। ইনি আবার সাইকোলজি ধরেছেন, মনের ভেতর শুঁড় চালিয়ে কখন কি টেনে বের করে আনবেন কে জানে! আমার সাইকোলজি এখন খুব একটা সোজা রাস্তায় চলছে না।
গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে পঙ্কজবাবু বললেন, সামনে বোসো, সামনে বোসো। তোমাকে ছোট্ট একটু জ্ঞান দি। এ গুড পিস অফ অ্যাডভাইস। ডোন্ট মাইণ্ড মাই বয়।
আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন। কিছু মনে করব না।
সহ্যশক্তি আছে তো!
নিশ্চয় আছে।
ওয়েল। উঠে বোসো বলছি।
সামনের আসনে বসলুম। পঙ্কজবাবুর আসনের পেছন দিকে একটি তোয়ালে ঝুলছে। তিনি খুব শান্ত মেজাজে, ধীরে সুস্থে স্টিয়ারিং-এ বসলেন। নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে, পাশে হেলে পড়ে, গাড়ির কলকব্জা দেখলেন, তারপর সোজা হয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখে এক ঝলক হাসি। এতক্ষণ মাথা নিচু করেছিলেন। এত ফর্সা, শরীরে এত রক্ত, চোখ-মুখ গোলাপী হয়ে গেছে। হাসির রেখা আরও দীর্ঘ হল। মৃদু স্নেহের গলায় বললেন, ড্রাইভারে যখন গাড়ি চালায়, তখন তুমি সামনে বসো, পিছনে বসো, কিছু এসে যায় না। কিন্তু গাড়ি যখন তোমার এমন কেউ চালান, যিনি তোমার আত্মীয়, বন্ধু, কি প্রিয়জন, তখন তোমাকে সামনে চালকের পাশে বসতে হবে, ভদ্রতা। পেছনে বসলে মনে হবে তিনি ড্রাইভার, মনিবকে নিয়ে চলেছে। খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। হলে কি হবে! এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেন্টিমেন্ট।
চাবি ঘোরাতেই, ইঞ্জিন শব্দ করে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বাতাসে ঘুম এসে যাচ্ছে।
রোদ, ছায়া, লোকজন, কলরব, কোলাহল, সব যেন চলেছে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। শরীরে বেশ একটা আমেজ আসছে। শীতকালে গরমজলে স্নান করলে এই রকমের একটা আরাম হয়।

বুঝলে, গাড়িটাকে এবার সার্ভিসিং-এ পাঠাতে হবে।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি ঘুমচ্ছো না কি?

ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

অত রাত জেগে পড়ার অভ্যাস ছাড়ো। খুব তাড়াতাড়ি হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ভোরে উঠে পড়বে। ভোরের মত ভালো সময় আর কিছু নেই। তুমি আবার ভীষণ স্টুডিয়াস।

লাজুক লাজুক ভাবে বললুম, না না।

তোমার বাবার মুখে সব শুনেছি। তুমি একটু ইনট্রোভার্ট, তাই না!

সেরেছে, সদ্য-পড়া সাইকোলজির জ্ঞান তেড়ে আসছে। বললুম, মাঝে মাঝে ইনট্রোভার্ট, মাঝে মাঝে একস্ট্রোভার্ট।

তার মানে, তোমার স্প্লিট পার্সোন্যালিটি। দুটো ব্যক্তিত্ব, দুটো চরিত্র। একই শরীরে দু'ধরনের মানুষ। এটা মনে হয় তোমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য। হরিরও দুটো পার্সোন্যালিটি। কখনও বিমর্ষ, কখনও উচ্ছ্বসিত-কখনও ভীষণ হিসেবী, কখনও ভীষণ বেহিসেবী। আমরা সবাই তাই বুঝলে! নানারকম বুদ্ধি প্যাক করে ঈশ্বর আমাদের এইখানে পাঠিয়েছেন, যখন যেটা ঠেলে ওঠে, তখন আমরা সেইভাবে কাজ করি। শুনেছি তোমার খুব ধর্মভাব, ভগবৎ বিশ্বাস। খুব ভাল কথা। আজকালকার ছেলেরা সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দেশে যেন একটা মর্যাল ফেমিন এসেছে। তবে কি জানো, ধর্ম মানে কিন্তু সংসার ত্যাগ নয়। আমার মাকে দেখলে তো সেদিন! ওঁর দর্শনটর্শন হয়। ঠাকুর ওঁর সঙ্গে কথা বলেন। কিছু ক্ষমতাও লাভ হয়েছে। মুখ দেখে মানুষের স্বভাব, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব বলতে পারেন। ভালোমানুষ, খারাপমানুষ চিনতে পারেন। যাকে যা বলেন সব মিলে যায়। সবাই বলেন বাক্‌সিদ্ধা।

গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলা ঠিক নয়। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হয়। আর একটু হলেই রিকশার পেছনে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন। খ্যাঁক করে ব্রেক কষে কোনওরকমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে গেলেন। এইবার রাস্তার দিকে মন চলে গেছে। কথা বন্ধ। ঘুম ঘুম ভাব কেটে গেছে। নানারকম চিন্তা আসছে। নানারকম আশঙ্কা। কেবলই মনে পড়ছে, ঠাকুরের সেই গল্প

এক জেলে রোজই অন্যের পুকুরে মাছ চুরি করতে যায়। চোরকে ধরার জন্যে একদিন সবাই খুব সতর্ক হয়ে রইল। গভীর রাত, জেলে জাল ফেলেছে জলে। ঝপাত করে যেই না শব্দ হওয়া, সবাই তেড়ে এলো ধর ধর করে। জেলে দেখলে মহা বিপদ। পালাবার সব পথ বন্ধ। সে তখন ঢুকে পড়ল এক মানকচুর জঙ্গলে। ছাই গাদা। সর্বঅঙ্গে ছাই লেগে গেল। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সারাগায়ে বেশ করে ছাই মেখে সে গিয়ে বসল এক গাছতলায়। চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। যারা চোর ধরতে এসেছিল তারা চোর পেল না, পেল ধ্যানমগ্ন এক সাধুকে। খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এসে সাধুকে প্রণাম করতে লাগল। ফল-মূল মিষ্টি পয়সা প্রণামী পড়তে লাগল। সাধু কিন্তু চোখ খোলে না, কিছু গ্রহণ করে না। এতে সকলের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সাধু চোখ বুজিয়ে সেই কপট ধ্যানে ভাবতে লাগল, ছিলুম চোর, সাধুর ভান করাতেই আমার এত খাতির। সত্যি সাধু হলে আমার কি অবস্থা হবে! বলা যায় না ঈশ্বরকেও হয়তো পেয়ে যেতে পারি।

আমি কি সেই চোর! বসে আছি সাধুর আসনে! দু'দিন আগে হলে জোরগলায় বলতে পারতুম, না, আমি সাধুই। আজ আর বলার ক্ষমতা নেই। মেফিসটোফিলিস অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। চুরুট আর ওডিকোলোনের গন্ধ। ফাউস্ট এখন ক্রীতদাস। ব্রেক হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারতুম.

The pride of the peacock
is the glory of God
The lust of the goat
is the bounty of God

The wrath of the lion
is the wisdom of God
The nakedness of woman
is the work of God
The road of excess
leads to the palace of wisdom

গাড়ি ঢুকল বাড়িতে। সেই রাতের চেয়ে, বাড়িটিকে আরও বিশাল মনে হচ্ছে। আরও সুন্দর। আজ মনে হচ্ছে, অনেকের মধ্যে থাকলে মানুষ খুব একটা বেচালে চলতে পারে না। যে ফাঁক গলে শয়তান ঢোকে, সেই সব প্রবেশ পথে প্রহরী মোতায়েন হয়ে যায়।

আরে এসো, এসো বলে যিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনিই মনে হয় সেই বিলাতবাসী ভদ্রলোক। আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চান, সুরে বলব না বেসুরো বাজব ! কাঁচায় পাকায় মেশান এক মাথা চুল। চোখে সোনার ফ্রেমের ধোঁয়াটে চশমা। পরনে বিলিতি সুট। সাদা শার্টে অদ্ভুত সুন্দর ডোরা কাটা। দেখলেই বোঝা যায় এদেশের জামাকাপড় নয়। কেটেছে সায়েব দরজী।

সেদিন ভালো বুঝতে পারিনি, নিচের দিকে সেভাবে তাকিয়ে দেখা হয় নি, মেঝে-টেঝে পুরো মার্বেল পাথরে মোড়া। পা দিতে ভয় করে। ভয়ে জুতো জোড়া খুলে ফেললুম। আমার পায়ের চেয়ে মেঝে অনেক দামী। পঙ্কজবাবুর ভায়রাভাই কিন্তু জুতো পরেই চলাফেরা করছেন। সে জুতোর কি বাহার ! বাদামী রঙ, মুখটা সরু, পালিশ পেয়ে আয়নার মত ঝকঝক করছে।

স্টেশানের প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিংরুমে যে রকম হাতলঅলা বড় ডেকচেয়ার থাকে সেইরকম চেয়ারে বিলিতি ভদ্রলোক বসলেন। পায়ের ওপর পা তুলে। ভেবেছিলুম তোলা পাটা থির থির করে নাচাতে থাকবেন। ইংলিশ এটিকেট। পা পক্ষাঘাতের পায়ের মত অনড় রইল। পিতা উপস্থিত থাকলে বলতেন, দেখেছো কি সংযম ' দেখে শেখো।

সোনালী প্যাকেট থেকে সাধারণ মাপের চেয়ে বড় একটি সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপতে চাপতে বললেন, তোমার নাম ?

পলাশ চট্টোপাধ্যায়।

প্যাট করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া রিং রিং করে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বললেন, কি করো '

আজ্ঞে কেমিস্ট।

হাউ নাইস, হাউ নাইস ' তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভালো। আমি ডাক্তার, তুমি কেমিস্ট।

পঙ্কজবাবু ভেতরে গিয়েছিলেন, এক হাতে একটা বোতল, আর এক হাতে একটা গেলাস নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বোতল আর গেলাস টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, আপনি জল চেয়েছিলেন দাদা ?

হ্যাঁ, সে প্রায় এক যুগ আগে।

এই যে, এই মাত্র নিয়ে এলো। এ তল্লাটে মিনারেল ওয়াটার কেউ রাখেই না। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে নিয়ে এলো।

যাক পেয়েছে এই যথেষ্ট। এ দেশে এলে, একটাই আমার অসুবিধে, জল। জলাতঙ্ক বলতে পারো।

কই আমাদের ত কিছু হয় না !

হয় না মানে, হয়েই তো আছে। তোমরা গ্রাহ্য করো না।

গেলাসে জল ঢালবো দাদা ?

থাক, প্রয়োজন হলে আমিই ঢেলে নোবো। সিগারেটটা শেষ করে নি। আচ্ছা কফির কি হোলো !

আসছে। তৈরি হচ্ছে। ভেতরে জটলা হচ্ছে। অনেকদিন পরে দুই বোনে দেখা হয়েছে। কলর-বলর খুব চলেছে।

শোনো, শোনো, বলতে বলতে এক ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে বাইরে আসছিলেন, আমাকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। **তীক্ষ্ণ** দৃষ্টিতে বার কয়েক তাকালেন। বিলেতের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এঁরা দু'বোনেই অসাধারণ সুন্দরী। বিলেতে থাকার ফলে আরও ফর্সা হয়েছেন। ঠাণ্ডা দেশ গালে আপেলের রঙ তুলে দিয়েছে। চুলে বব ছাঁট। ঘাড়ের কাছে রেশমের চামরের মত দুলছে। মেয়েদের বিউটি কেমন বুঝতে শিখেছি। এক রাতেই পেকে ঝানু। হায় হায় সন্ন্যাসার্থী ! কি তোমার অধঃপতন। মহিলা কিছু একটা মেখেছেন। বিলিতি সেন্ট। ইংল্যাণ্ড হোলো ইয়ার্ডলের জায়গা। তারই সুবাসে ঘর আমোদিত।

মহিলা সংযত গলায় বললেন, অঞ্জু অপর্ণার চেয়ে কত বড় হবে ?

তুমি আবার ওই সব মেয়েলি হিসেব নিয়ে এলে ! আমার কি আর খেয়াল আছে ! কফির কি হোলো বলো তো !

আসছে, আসছে। মিনু বলছে, অঞ্জু অপর্ণার চেয়ে আট বছরের বড়ো। ইমপসিব্‌ল, আমার মনে হচ্ছে, হয় তিন, না হয় চার।

তোমার ছেলে, তুমিই ভালো জানবে। হঠাৎ তোমাদের এতো হিসেব-নিকেশ শুরু হয়ে গেলো !

পঙ্কজবাবু বললেন, মেয়েদের নিয়মই ওই, এমন এমন সমস্যা টেনে বের করবে ! ডায়েরি রাখার অভ্যাস না থাকলে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার কত শালে, কত তারিখে বিয়ে হয়েছিল, বলতে পারবো না। মাসটা মনে আছে, ঋতুর জন্যে। ফাল্গুন মাস, বসন্তের বাতাস, কোকিলের ডাক।

ভায়রা ভাই যোগ করলেন, চাঁদের আলো।

চাঁদ ? চাঁদ কি ছিলো, মনে পড়ছে না।

অপর্ণার মা কফির ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় অল্প একটু শাড়ির আঁচল টানা। সকালেই স্নান করেছেন। এলো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। কোথায় নেমেছে ! কোমর ছাপিয়ে আরও কত দূরে। এই বয়সেও অ্যাতো চুল ! কেমন করে এমন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য বজায় রেখেছেন। আনন্দে থাকলে মানুষ মনে হয় অমর হতে পারে। জীবন থেকে চিমটে দিয়ে একে একে অশান্তির কাঁটা তুলে তুলে ফেলে দাও, মৃত্যু চিন্তা, অর্থ চিন্তা, স্বার্থ চিন্তা, পারস্পরিক সম্পর্ককে মখমলের মত মসৃণ করে দাও, জীবনের দৈর্ঘ্য, যৌবনের দৈর্ঘ্য অনেক বেড়ে যাবে। এ পরিবারে সেটা সম্ভব হয়েছে। সব পরিবারে তা তো আর হয় না। নরম আঁচে, মুখ চাপা হাঁড়িতে, আঙুল মাপ জলে, জীবনের বিরিয়ানি গুমসোচ্ছে। জাফরান, জায়ফল, গরম মশলা, আবার এক ফোঁটা আতর। খুব সুতার ; কিন্তু খাদ্য !

অপর্ণার মা বললেন, তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এখানে বসে আছো। বড় লাজুক ছেলে।

কফির পেয়ালা চামচে সমেত তুলে নিতে নিতে ডাক্তারবাবু বললেন, লাজুক হলে কি হবে, ভীষণ বুদ্ধিমান। আমি এতক্ষণ বসে বসে ওর ওপর নজর রেখেছিলুম, হি ইজ ওয়েল কম্পোজড, বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি ম্যাচিয়োর্ড। সাম হাও হি ইজ ভেরি ডিস্টার্বড, ডিপ্রেসড, সাইকোলজিক্যালি শেকন।

পঙ্কজবাবু বললেন, কি করে বুঝলেন দাদা ?

বুঝবো না ? লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ারস আমি যে ওই করছি। অবজার্ভ এ পেশেন্ট সাজেস্ট এ রেমিডি। হি হ্যাজ এ ক্লোজড টাইপ অফ পার্সোন্যালিটি। ওর বাইরে যতটা আছে তার চেয়ে দশগুণ আছে ভেতরে। ফ্লোটিং লাইক অ্যান আইসবার্জ।

কাপেতে চামচেতে টিং করে একটা শব্দ হল। বাইরের সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ। এক জোড়া নারী পুরুষের কলকণ্ঠ। দ্বারপথে সেই যুবক। বুকের কাছে একটি ফুলের তোড়া, পাশেই গায়ে গা ঘেঁষে অপর্ণা। কী বিচিত্র চিত্র !

বিশাল ধরার চতুঃসীমায় যা কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু

বুক জ্বলে গেল। দরজাব সামনে অপর্ণা ওই বিলিতি যুবকটির পাশে লেফাফার গায়ে ডাক টিকিটের মত কেমন সেঁটে আছে। ছেলেটির হাতে আবার ফুলের তোড়া। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে এলো, না চার্চ থেকে? আমার এমন হিংসে হবার ত তেমন কোনও কারণ নেই। তবু হচ্ছে কেন? পঙ্কজবাবুর ডাক্তার ভায়রাভাই ঠিকই বলেছেন, এ ছোকরার প্রকাশিত অংশের চেয়ে অপ্রকাশিত অংশই বেশি। ব্যাটা ডুবসাঁতার কাটছে।

ঠিক টেনিস খেলোয়াড়দের মত লম্বা চওড়া চেহারা। ইংরেজ নবাবদের মত বাদামী চুল, ঘাড়ের ওপব কানের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। ঝুলপির কি বাহার! বিলেতে মানুষকে কি জিনিস বানিয়ে দেয়রে বাবা। প্যান্ট, শার্ট জুতো, নেকটাই, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হাতের কবজি আমার পায়েব গোছের মত। টকটকে ফর্সা। মণিবন্ধে কালো ব্যাণ্ডে সোনার রিস্ট ওয়াচ। একেবারে ছবির নায়ক। মুখ সামান্য লম্বাটে হলেও, অসম্ভব ধারালো। গ্রিসিয়ান নাক, স্পার্টান চোখ, স্প্যানিশ গোঁফ। আমি গো-হাবান হেরেছি। স্বয়ম্বর সভা হলে রাজকন্যে আমার গলায় ঘেঁটুফুলের মালা ঝুলিয়ে, গাধার পিঠে উলটো বসিয়ে রাজ্যছাড়া করে দিত।

পঙ্কজবাবুব ভাযরাভাই বললেন, কি হল, ফিরে এলে? দিয়ে এলে না?

যুবক খটখট করে জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন। চলনের কি দৃপ্তভঙ্গি। যেন লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের পর বিজয় সেনানীব পুরোভাগে মুর্শিদাবাদে ঢুকছেন। এ হাঁটা আমার কাঠামোয় সম্ভব হবে না। ঠ্যাং খুলে যাবে। যুবক বললেন, মিসেস পার্কার কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন।

সে কি, কোথায়?

নেপাল।

ফিরবেন কবে?

কেউ জানে না।

তা ফুল রেখে এলে না কেন?

কার কাছে রাখবো! ফ্ল্যাটে চাবি।

জানলে কি করে নেপাল গেছেন!

ওব টেলার বললেন। সামনেই তাঁব টেলারিং শপ।

দেন প্রেজেন্ট ইট টু অপর্ণা।

যুবক সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া হাসি হাসি মুখে আমার পিতার বধূমাতাব হাতে তুলে দিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নে মশগুল হয়ে বসে আছেন ওদিকে, এদিকে এইসব হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে চলেছে। অপর্ণা ফুল নিতে নিতে বললে, কাব জিনিস কে পায়!

অপর্ণা এই কথাটি বেশ বলেছে। কথার মধ্যে অল্প একটু দংশন আছে। পিঁপড়ের কুটুস কামড়। নিরাশমনে আলোব সামান্য ঝিলিক খেলে গেল।

পঙ্কজবাবু বললেন, একেই বলে মানুষ বরাতে খায়। যাও মা ফুলদানে জল দিয়ে যত্ন করে রেখে এসো। দেখাশোনা করলে সাতদিন ঠিক থাকবে। জলে একটু নুন ফেলে দিও।

বুকের কাছে, নীল, সাদা, লাল হলুদ, ফুলের স্তবক ধরে দেবী অপর্ণা এতক্ষণে আমার দিকে তাকাবার অবসর পেলেন। মানুষের মুখ যে কত উজ্জ্বল হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। হাসি যে কত স্বর্গীয় হতে পারে দেখা ছিল না। ভেতরে এতক্ষণ যে অভিমান গুমরোচ্ছিল এই হাসিতে সব শান্ত হয়ে গেল। আমার হাসি আমাকে ছেড়ে ঠোঁটে গিয়ে বসলো। বেশ বুঝলাম আমার নিয়ন্ত্রণ এখন ওই ফুলওয়ালীর হাতে। সেদিন কি ভাবে দেখেছিলুম জানি না, আজ দেখছি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মনের নানারকম রসে জারিয়ে আচারের মতো করে।

অপর্ণা হেসে ভেতরে চলে গেল। তার আসা, তার দাঁড়ান, তার চলে যাওয়া, শরীরে সূক্ষ্ম শাড়ির

বাঁধন, ভেতর থেকে ফুটে ওঠা অন্তর্বাসের আভাস, সব কিছুরই আজ কেমন যেন অন্য এক জগতের ইশারা। একই জগৎ, শিশুর চোখে একরকম, সাধকের চোখে একরকম, লম্পটের চোখে একরকম।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে অঞ্জনের পরিচয় করিয়ে দি। অঞ্জন, পলাশ চট্টোপাধ্যায়, আমার এক নিকট বন্ধুপুত্র। তোমার মতই ভাল ছেলে। তবে তুমি বর্ন অ্যাণ্ড ব্রট আপ ইন বিলেত, তোমার 'শিন অ্যাণ্ড লাসচার' এই দিশি বস্তুটির চেয়ে অনেক বেশি।

পঙ্কজবাবুর ভায়রা বললেন, ও দেশে মানুষের ভেতর থেকে ঠিক মানুষটিকে বের করে আনার কতরকম ব্যবস্থা। এ দেশের মত ওদেশে গাধাপিটে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা হয় না। গাধাকে দেওয়া হয় গাধার ট্রেনিং, ঘোড়াকে দেওয়া হয় ঘোড়ার ট্রেনিং। সাধে ওরা অত বড় হয়েছে!

অঞ্জন সোফা ছেড়ে উঠে এসে, আমার দু হাত ধরে করমর্দন করলেন। হাতের পাঞ্জায় বেশ জোর। উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল, আবার যে যার আসনে বসে পড়লুম। সারাদিন এইভাবেই বসে বসে কাটাতে হবে না কি? সে ত হবে মহা শাস্তি।

অঞ্জনের দিকে তাকালেই সে মৃদু হাসছে। একটা কিছু বলতে হয়, কিন্তু হীনম্মণ্যতা গলা চেপে ধরছে। নিজেকে ভীষণ ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। বোকার মত বসে থাকা যায় না, তাই বললুম, আপনি কি করেন?

আমি রোলস রয়েস ফ্যাকট্রিতে অ্যারোনটিকসের ট্রেনিং নিচ্ছি।

পঙ্কজবাবু বললেন, যাকে বলে অ্যাভিয়েসান টেকনোলজি। দারুণ লাইন। তোমার আর ক'বছর বাকি আছে?

এক বছর।

তারপর কি করবে?

তারপর হল্যাণ্ডে যাব হায়ার ট্রেনিং-এ। ফ্রানসেও একবার যেতে হবে।

ব্রাইট ফিউচার, ব্রাইট প্রসপেকট।

অঞ্জনের বাবা বসে বসে পাইপ খাচ্ছেন। বিদেশী টোব্যাকোর গন্ধ বাতাসে ভাসছে। কি সুন্দর এঁদের জীবন! বড় হতে হতে কত বড় হয়ে যাবেন। তুলনায় সত্যিই আমি এক পিগমি। কি দেহে, কি মেধায়, আমার কোনও বিকাশই হল না। এ পরিবারে আমার কোনও স্থান হওয়া উচিত নয়। এঁদের এত বড় বড় আত্মীয়-স্বজন! গর্ব না থাকলেও ধনী। আমাকে উপেক্ষার চোখে দেখলে কিছু বলার নেই। যেমন করেই হোক সরে পড়তে হবে।

অপর্ণার মা এসে আমাদের দু'জনকে ডাকলেন, তোমরা ভেতরে এসো বাবা। একটু মেলামেশা করো। সবই যে কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে!

অঞ্জন জুতোর ফিতে খোলার জন্যে নিচু হচ্ছিল, অপর্ণার মা বারণ করলেন, থাক, থাক, তুমি জুতো পরেই এসো, পরেই এসো, সায়েব মানুষ।

অঞ্জন জুতো খুলেই ফেলল। মোজা পরাই রইল। মাথা তুলে বললে, না না, বাইরের জুতো ভেতরে না ঢোকানোই উচিত। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। অঞ্জনের বাবা বললেন, সায়েব তখন যখন বিলেতে। এখন বাঙালী।

সেই বারান্দা পেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে, চওড়া সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠে এলুম। ঢাকা বারান্দায় জাফরির ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে। চারদিক মন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন সুন্দর। কোথা থেকে মৃদু ধূপের গন্ধ আসছে।

যে ঘরে আমরা এলুম, সে ঘর আগে দেখিনি। মেঝেতে সুন্দর একটা কার্পেট পাতা। ঘরটা বেশ বড়। গোটা তিনেক ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে। সুন্দর সুন্দর আলমারিতে রাশিরাশি বই। একপাশে একটা ঝকঝকে রিডিং টেবিল। গোটা দুয়েক সোফা। ঘরে আর কিছু নেই।

সেই ঘরের মধ্যে আমাদের দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে অপর্ণার মা বললেন, নাও তোমাদের মনের খোরাক রয়েছে। বসে বসে বইয়ের পাতা ওলটাও। আমরা আসবো যাবো। আজ আর বসে গল্প করার সময়

নেই। ইচ্ছে হলে, তোমরা ঘুরেও বেড়াতে পারো। ছাদেও যেতে পারো। বাগানেও নামতে পারো। ওই যে রেডিও, গান শুনতে পারো।

অঞ্জন বললে, ঠিক আছে মাসীমা। আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

অঞ্জন আমার চেয়ে হাজার গুণ স্মার্ট। চালচলনে কোনও জড়তা নেই। আমার যেন সব সময় পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। লাজুকলতা লজ্জাবতী। অঞ্জনকে আদৌ দাম্ভিক, অহঙ্কারী বলে মনে হচ্ছে না আর। অপর্ণার পাশে প্রথম দেখাটা ছিল হিংসের দেখা। কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখেছিলুম বলেই কুৎসিত লেগেছিল। আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।

অঞ্জন সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বললে, মেসোমশাইয়ের বেশ টেস্ট আছে দেখেছেন। সাধারণ বাঙালীর মত নয়।

সবই হোলো পয়সার ব্যাপার।

পয়সায় হয় না জানেন। কালচার একটা বড় জিনিস। এখনকার ইনডাসট্রিয়ালিস্টদের অনেকেই বেশ বড়লোক, ক'জনের রুচি আছে! কাল বাবার সঙ্গে বেলেঘাটায় এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিলুম। কি ব্যাড টেস্ট। ইউ কান্ট ইম্যাজিন। গায়ে এমন পারফিউম ঢেলেছেন পাশে বসা যায় না। বিদেশী জিনিস। হলে কি হবে, কোনটা ছেলেদের পারফিউম, কোনটা মেয়েদের সে জ্ঞান নেই, সেনস অফ প্রোপোরসান নেই। এমন কাপড়ের স্যুট বানিয়েছেন, যা অ্যামেরিকান গ্যাংস্টারদেরই মানায়। একটা কুকুর পুষেছেন, যাকে ট্রেনিং দিতে ভুলে গেছেন।

সারা বাড়ি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে বোঝাই। যেমন লাউড, তেমনি ভালগার।

তা ঠিক। আগেকার জমিদার আর এখনকার নিউ রিচদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাঁদের আলাদা একটা মেজাজ ছিল। মন অনেক বড় ছিল।

এই ঘরটাই দেখুন। কত নিট? অন্য কেউ হলে এর মধ্যে বাজোর জিনিস ঢুকিয়ে আগলি করে ফেলতেন। আসলে মা আর মাসীমা দু'জনেই তো শান্তিনিকেতনের মেয়ে। গুরুদেবের ট্রেনিং-এ রুচিবান।

অপর্ণা একজোড়া চটি এনে অঞ্জনের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, নিন পরে নিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। মোজা ময়লা হয়ে যাবে।

অঞ্জন পা গলাতে গলাতে বললে, মাপে একটু বড়।

বাবার পায়ের মাপ সাধারণের চেয়ে একটু বড়।

অপর্ণা বসল না, চলে গেল। শাড়ি পালটেছে। চুল এলো ছিল, এখন খোঁপা করেছে। আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিল। সে তাকানোয় কোন প্রাণ ছিল না। ইট-কাঠ-পাথর-পুতুলের দিকে মানুষ অমন দৃষ্টিতে তাকায়।

মন আবার ধোঁয়াটে ঘরের মত ভারি হয়ে উঠল। আমিও তো খালি পায়ে রয়েছি, চটি এলো না কেন। দিশি ছেলে শুধু পায়ে ঘুরতে পারে, বিদেশি ছেলের মোজা ময়লা হয়ে যায়। অদ্ভুত বিচার! আমি রোলস রয়েস থেকে এলে আমারও খাতির হত।

অঞ্জন বললে, আপনি কি করেন?

চাকরি, একটা কেমিকেল ফার্মে কেমিষ্ট হিসেবে সবে ঢুকেছি।

ও, আপনারও টেকনিক্যাল লাইন। আমি ভেবেছিলুম লিটারেচার।

কেন?

আপনাকে দেখলে তাই মনে হয়, কেমন একটা ড্রিমি, পোয়েটিক লুক।

বাঙালাদেশের এই বয়েসের সব ছেলেকেই মনে হয় ওই রকম দেখতে।

আপনারা অনেক আরামে থাকেন ত? ওদেশে ভীষণ খাটতে হয়। এতটুকু বসবার কি তাকাবার সময় পাওয়া যায়না। আপনি আমাদের ওখানে চলে আসুন। এদেশে কোনও কিছুরই তেমন ফিউচার নেই। বাবাকে বললে আপনার আই সি আইতে একটা পোজিসান হয়ে যেতে পারে। বিরাট ইন্টার-

ন্যাশানাল কোম্পানী।

ওঁরা অনেক ভাল ছেলে চাইবেন. অনেক বেশি কোয়ালিফায়েড।

আপনি কি খারাপ ছেলে না কি! তাছাড়া একসপিরিয়েনস হয়েছে।

অঞ্জনেব মা পেছনের দবজা দিয়ে ঘবে ঢুকলেন। এই ঘরের আরও তিনটে দরজা। কোনটা দিয়ে কোথায় যাওযা যায়. না গেলে বোঝা যাবে না। অঞ্জনের মা ঢুকতেই আমি উঠে দাঁড়ালুম।

তিনি বললেন. বোসো. বোসো. উঠলে কেন?

আমি প্রণাম করাব জন্যে নিচু হতেই. তিনি খপ্ করে আমাব হাত চেপে ধরলেন. না. না. পায়ে হাত দিতে হবে না. কেউ আমাকে প্রণাম করলে মনে হয় আমি বুড়ি হযে গেছি। তুমি বোসো। আমি বসলে ওই চেয়ারে বসবো।

হাত ছেড়ে দিলেন। নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে। মহিলার চেহারা প্রবীণা ফিলমস্টারেব মত। বার্ধক্য আসছে বেশ বোঝা যায়. হাতের দিকে তাকালে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে অল্প অল্প। তবে চোখ দুটো দেখার মত। টানা. টানা. বিশাল। অলস চোখ নয়। প্রতিটি কথার সঙ্গে চোখ হেলছে. দুলছে. ছোট হচ্ছে. বড হচ্ছে। একই সঙ্গে দুধরনেব ভাষায় তিনি কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা নিশ্চয় নাচ জানেন। যাঁরা নৃত্যশিল্পী একমাত্র তাঁবাই চোখে কথা বলতে পারেন। সারা শরীবের বাঁধুনী দেখে মনে হচ্ছে নাচাব অভ্যাস এখনও আছে। হাতেব আঙুল মুদ্রায় খেলছে।

আমি আমাব জাযগায় বসে পডলুম। অঞ্জন বললে. মা. মাসিমাকে তুমি বলে দিয়েছ তো. আমরা ঝাল মশলা. এ সব একেবাবে সহ্য কবতে পাবি না।

ও জানে। নতুন কবে বলাব দরকাব হবে না। তুই একবার ভেতরে আয় না। দরকার আছে।

ও তোমাদেব মেযে-মহল আমার ভাল লাগে না মা। বেশ তো এখানে বসে আছি দু'জনে।

আয় না একবার। চলে আসবি এখুনি।

অঞ্জন আমাব দিকে তাকিয়ে বলল. একটু বসুন. শুনে আসি কি বলছেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে. মা. আমি কিন্তু আগে থেকেই তোমাকে বলে বাখছি. ম্যাজিক আমি দেখাতে পারব না. আমার মুড নেই।

ম্যাজিক তোকে দেখাতে হবে না।

দু'জনেই দ্বিতীয় দবজা দিয়ে ভেতবে কোথাও চলে গেলেন। পাশাপাশি দু'জনকে মা আর ছেলে বলে মনেই হয় না। যেন অন্য কোনও জুটি। ম্যাজিক আবাব কি? অঞ্জন ম্যাজিক দেখাতে পারে নাকি! গুণের ঘাট নেই। আবার এক ধাক্কা! এক পাল্লায় আমি. আর এক পাল্লায় অঞ্জন। অঞ্জনের দিকটা ভাবে ভূমি স্পর্শ কববে।

আচ্ছা. আমাকেও তো ভেতবে যেতে বলতে পাবত। অপর্ণাও তো একবার আসতে পারত। মানুষকে যত দেখা যায় তত চেনা যায় নিত্য নতুন রূপে। এই বোকার মত বসে না থেকে. আমাব কিছু একটা করা উচিত। বেশ বুঝতে পেরেছি. আমার স্ট্যাটাসে যদি কেউ মিলতে পারে. সে হল মায়া. সে হল ওই কাকীমার মত কোনও মহিলা। অ্যারিস্টোক্র্যাট আমার ধাতে সইবে না। এই রকম জড়পিণ্ড কবে চেয়ারে বসিয়ে রেখে দেবে। এখন আমাব মনে হচ্ছে. সমস্ত ব্যাপারটাই খাড়া হয়েছে আমার পিতৃদেবের অনুরোধে। এঁরা ভদ্র। কোনও এক দূর অতীতে বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন. তোর ছেলে আর আমাব মেয়ে। তখন জানতেন না ছেলে কি আকার আকৃতি নেবে. মেয়েই বা কি চেহারা পাবে বড় হয়ে। এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।

না, এভাবে বসে থাকা যায় না। নিজেকেই নিজের ইডিয়েট বলতে ইচ্ছে করছে। আমি এই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। ঘরের বাইরে যাই। করিডর ধরে ফিরে চলি সিঁড়ির দিকে। ধাপে ধাপে নিচে। উপেক্ষায় শরীর জ্বলছে।

সিঁড়িতে কারুর সঙ্গে দেখা হল না। রোদের রেখা সরে গেছে। নিচের ঘরে টোব্যাকোর গন্ধ ভাসছে। গ্র্যাণ্ডফাদার চেয়ারের হাতলে সোনার ঠোঁট লাগান পাইপ কাত হয়ে পড়ে আছে।

স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সবাই এখন কিসের প্রবল আকর্ষণে অন্দর মহলে। হাওয়াই জাহাজের ইনজিনিয়ার সেখানে হাতের খেলা দেখাচ্ছেন।

ছ-ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আরও নিচে। পঙ্কজবাবুর গাড়িটা নেই। তার মানে ভাযরাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছেন। দু'সার সাবু গাছের ভেতর দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে গেটের দিকে। বাইরের পথে দাঁড়িয়ে মুক্তি আমাকে ডাকছে – পালিয়ে আয়। শিকল সোনার হলেও শিকল।

গেট আর প্রায় হাতখানেক দূরে। এখনও কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। ভেতরটা কেমন যেন ধুক্‌পুক্‌ করছে। যেন চুরি করে চোর পালাচ্ছে! আর মাত্র দু'পা। পলাশ দা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? নিজের হাতফসকে নিজেই পড়ে গেলুম। দূর আকাশের গায়ে, ছাদের আলসেতে অপর্ণা। ভিজে শাড়ি ভাঁজে ভাঁজে খুলে খুলে নেমে আসছে। নীলজমিতে ঝরছে শিউলি।

পাগলা মনটারে তুই বাঁধ্‌। কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ ?

যত জোরেই হাঁটি না কেন, কি যেন এক আকর্ষণ পেছন থেকে টানছে। হাঁটার বেগ যতটা হওয়া উচিত কিছুতেই যেন তা হচ্ছে না। স্বপ্নে একবার বাঘ দেখে দৌড়বার চেষ্টা করেছিলুম। কী ভীষণ চেষ্টা! মাটিতে পা খচমচ করছে অথচ শরীর ছুটছে না, এদিকে বাঘ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, মুখে তার কথামালার বাঘের মত এক ধরনের মিচকে হাসি। পালাতে না পেরে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিলুম। বাঘ সামনে এসে দুপায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলুম, বাঘ নয়, মানুষ। আমার সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। চোখে নিকেল ডাঁটির তলতলে গোল চশমা। খপ্‌ করে ডান হাতটা আমার কাঁধে ফেলে বললেন, শাখামৃগ, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে পার পাবি ভেবেছিস! বল্‌ লতা শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গ আছে না নেই। আমি আরও জোরে কেঁদে উঠে বললুম, বিশ্বাস করুন আমি জানি না।

তবু আমি হাতিবাগানে এসে গেলুম। বাজার এখন জমজমাট। গাছের বাজার, পাখির বাজার। জীবজন্তুর বাজার। পা থেমে পড়ল। অপর্ণা এখন অনেক দূরে। ছাদের আলসেতে ঝুঁকে আছে। মাথার ওপর সূর্যের অগ্নিগোলক জ্বলজ্বল করছে। গহনগভীর চুলের অরণ্যে ভেসে আছে একটি গোলাপের মুখ। মানুষ আবার গোলাপ হয় কি করে! গোলাপ দেখতে চাও সামনে তাকাও।

সারি সারি টবে তাজা তাজা গোলাপ ফুটে আছে। ছোটো ছোটো গাছে একটি করে নমুনা ফুল। সাদা, টকটকে লাল, ফিকে গোলাপী, হলদে। এর মধ্যে কোনো এক জাতির গোলাপের নাম মিস্‌ মারসেল। মানুষ পাগলের মত কিনছে। দরদাম করছে। কাঁধ দিয়ে এ ওকে ধাক্কা মারছে, ও একে। খাঁচার চন্দনা কর্কশ গলায় চিৎকার করে ক্রোধ প্রকাশ করছে। বাচ্চা দুটো বিলিতী কুকুর তিড়িং লাফাচ্ছে, আর শিশুর গলায় ডাকছে। চুলে পমেড মাখা, কাটগ্লাস চেহারার, গিলে করা হাফ হাতা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক, সিল্কের নীল শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলাকে বলছেন, টেরিয়ারের জাতই আলাদা। তেজ দেখেছ, তেজ!

মহিলার বয়স অনেক কম, সম্পর্ক দেখে মনে হচ্ছে মেয়ে নয়, স্ত্রীও নয়। অন্য কোনও ব্যাপার। বড়লোকদের সব থাকে, জীবনদায়িনী ব্যাধি। মহিলা কুকুর ছেড়ে সোনালী রঙের একটা খরগোসের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেকেচো, দেকেচো, কি সুন্দর!

ভদ্রলোকের ওপর হাত খামচে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন খরগোসের কাছে। অমন খরগোস আমিও দেখিনি জীবনে। খরগোস সাদা হয়। এ আবার কোন্‌ জাতের জীব! ভদ্রমহিলার আকর্ষণে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। পায়ে বার্নিশ করা জুতো। মহিলার কোমর

আঁকড়ে ধরে টাল সামলাতে সামলাতে বললেন, কি যে তুমি করো সুকু !

রাগের সঙ্গে স্নেহ, দেহবোধ মিলেমিশে মানুষের গলাটাকে কেমন করে দেয়। মহিলা চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, কোনও কম্মের নয়, একেবারে ঢ্যাঁড়োস।

আমি যেন সিনেমা দেখছি। ভীষণ মজা লাগছে। এক জায়গায় কত রকমের মানুষ ! একটু চিন্তা করলেই সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম রসবোধে মুগ্ধ হতে হয়। মহিলা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকেই বললেন, গায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। একটানেই উলটে পড়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে, নিজের মাথার চারপাশে গোল করে হাত ঘুরিয়ে বললেন, নাটবল্টু ঢিলে আছে।

ভদ্রমহিলার কানে গেল না। সোনালী খরগোস মন কেড়ে নিয়েছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে বলছেন, কী সুন্দর দ্যাখো, কী সুন্দর দ্যাখো।

সীতা যেন সোনার হরিণ দেখেছেন। মানুষ কেমন মেতে ওঠে। মন যেন ছটফটে মাছির মত। একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে। সোনার খরগোসের দিক থেকে সরে এলুম। ডল পুতুলের মত ফুটফুটে একটি মেয়েকে তার বাবা লোমওয়ালা সাদা একটা কুকুরছানা কিনে দিয়েছেন। মেয়েটির কোলে সেই কুকুর। কাকে দেখি, মেয়েটিকে না কুকুরটিকে। পৃথিবীর এই প্রান্তে, হাটের একটি বৃত্তে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে।

সরতে সরতে পায়রা-পাড়ার কাছে চলে এসেছি। গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার এক ভদ্রলোক, ছুঁচোলো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে কথা বলার তালে তালে নাচছে, পায়রা দর করছেন। পায়রা যে কত রাজকীয় পাখি এই প্রথম কাছ থেকে দেখে চিনলুম। দুধের মত সাদা। আদুরে আদুরে মুখ। দৈত্যের মত মানুষটির হাতে পায়রা যেন ঠিক মানাচ্ছে না। এ হাতে থাকবে বাজপাখি।

রঙমহলের রঙ দেখতে দেখতে সময় যে কিভাবে হুহু করে কেটে গেল। মানুষের বরাত ! রাজভোগের বদলে হবিষ্যটর। এতখানি বেলা হল, পেটে এখনও দানাপানি পড়ল না। অনেক আগেই খিদেয় পেট জ্বলছিল,এখন পিত্তি পড়ে মুখ তেতো লাগছে। বাড়িতেও মনে হয় আহারের ব্যবস্থা থাকবে না। কিছু খেতে পারলে মন্দ হত না। সিনেমা আর বাজার পাড়ায় চপকাটলেট ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না।

ঝোঁকের মাথায় তেড়ে বেরিয়ে এসে কেমন যেন লাগছে এখন। খুব ছেলেমানুষী হয়ে গেল। কি ভাবলেন ওঁরা কে জানে ! কি করব ! পালিয়ে না এসে আমার উপায় ছিল না। যেখানে গেলে মন কুঁকড়ে যায়, সেখানে এক মুহূর্তও থাকা চলে না। ও বাড়ি আমার বাড়ি নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ছোট মাপের মন। রাজাউজির মারতে শেখেনি। আমার জগৎ আলাদা।

আমার জগৎ আলাদা, এই ভাবনা আসামাত্রই মনে বেশ একটা বল পেয়ে গেলুম। ঘিনঘিনে সেই পাপবোধটা ধীরেধীরে মিলিয়ে গেল। পতন আর উত্থান এই ত মানুষের জীবন। একবার পড়েছি বলে পড়েই থাকবো, তা কেন ? আবার উঠবো ঠেলে। তবে এ কথাও ঠিক মনে এক ধরনের স্বাদ লেগেছে। জীবনে যে দিন প্রথম মাংস খেয়েছিলুম সে দিন কেমন লেগেছিল ! সব কিছুরই একটা প্রথম আছে। অক্ষর পরিচয়। অ লিখতে শেখা, আ লিখতে শেখা; প্রথম একা একা পথে বেরনো। প্রথম ইস্কুল, প্রথম কলেজ। প্রথম চুম্বন। মায়া যেদিন প্রথম আমাকে চুমু খেয়েছিল। ঘুঘু ডাকা এক দ্বিপ্রহরে, সবুজ গাছপালা চারপাশে। কচুরিপানা ভরা পুকুর। ফড়িং উড়ছে নেচে নেচে। কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবু ভেতরটা ঠিক সুরেই বেজে উঠেছিল। সে ঝঙ্কার যে কি ঝঙ্কার, যে জানে সে জানে।

পাঁচমাথার মোড়ে এসে ঘোষেদের একদা বিখ্যাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে পড়লুম। সামান্য কিছু খাওয়া দরকার। নিজেকে জেলভাঙা আসামীর মত মনে হচ্ছে। পেছন থেকে কেউ না এসে চেপে ধরে ! কি করা যায় ! বড় দো-টানায় পড়ে গেছি। দুটো জগৎ দু'পাশ থেকে কান ধরে টানছে। ভোগ আর ত্যাগ। কোথায় গেল আমার সেই রোম্যান্টিক মন ! দেহ ঢুকেছে মনে। অপর্ণার মুখের দিকেতাকাতে গিয়ে দৃষ্টি আমার কোথায় ঘুরছিল ! ছিঃ ছিঃ মন।

কে যেন খুব চড়া গলায় বললেন, কি খাবেন বলুন ? আমাদের অন্য কাস্টমার আছে।
ও হ্যাঁ, হিংয়ের কচুরি খাবো।
ক'খানা ?
চারখানা।
মিষ্টি ?
দুটো বালুসাই।
দোকানে খুব একটা ভিড় নেই। লোকটি খুব কাস্টমার দেখিয়ে গেল। ভাবজগতে থাকলে মানুষ সহজে কিছু শুনতে পায় ! আমার বলে এখন জীবনমরণ সমস্যা। মচকাবো তবু দোমড়াবো না। কিন্তু কিসের এ লড়াই ! বিয়ে যদি করতেই হয় তা হলে করে ফেলতে দোষ কি ! এমন তো কিছু গর্হিত কর্ম নয় ! সকলেই করে। সংসারে থাকতে হলে সংসারীই হতে হয়। সন্ন্যাসী হতে হলে সংসার ছাড়তে হয়। ন্যাজে খেলার কোনও মানে হয় না। আর বিয়ের আগে একটু এদিক সেদিক ! বিলেতে অমন অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়। এ দেশের বিলেত হতে বাকি কি আছে। সাজে পোশাকে, আহারে বিহারে সবেতেই সায়েবী ঢং এসে গেছে। প্রাচীনের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এলো। দোকান হলে লিখে দিত, রেমনান্টস্ ফর সেল। প্রাচীন বিশ্বাসের ঝড়তিপড়তি কিছু পড়ে আছে। জলের দামে বিকিয়ে যাবে।
তিনটে বেজে পনের মিনিট হল। বাড়ির সামনে দূর থেকে সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেলুম। পঙ্কজবাবু ঠিক ধাওয়া করে এসেছেন। কতক্ষণ এসেছেন কে জানে ! পা থেমে পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছে, যেদিক থেকে এসেছি আবার সেই দিকেই পালাই। ভাবলে কি হবে ! ঘটনা যেন অজগরের নিঃশ্বাস। নিঃশ্বাসের টানে ছাগলছানা পায়ে পায়ে এগিয়েই চলল। এই প্রথম, নিজেকে মনে হল শিকার। ঘটনার শিকার, পরিস্থিতির শিকার, দুটো মনের লড়াইয়ের শিকার।
সদর দরজার পাশেই কাকীমা দাঁড়িয়ে আছেন। দরজার একটা পাল্লা ভেজান। আর একটা ঈষৎ ফাঁক, সেই ফাঁকে চোখ রেখে কাকীমা স্থির। দৃষ্টি এতই সুদূরে, মন এমনই তন্ময়, আমি একেবারে সামনে না গিয়ে দাঁড়ান পর্যন্ত তিনি আমার আগমন টেরই পেলেন না। চমকে উঠে বল্লেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?
দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে আমাকে ঢুকতে দিলেন, তারপর দরজা আবার ভেজিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ছিলে কোথায় ? তুমি না কি কিছু না বলে ওঁদের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ ?
পালিয়ে এসেছো শব্দটা কানে বড় কর্কশ লাগল। মনে হল বলি, বেশ করেছি। আমি কি কারুর বন্দী পাখি। বলতে পারলুম না। সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। মুখে বলার সাহস নেই, মন বলছে, আমি তোমার জন্য বড় বিচলিত। একে ভালবাসা বলা যায় কি না জানি না। হয়তো যায় না। শীতের সকালে উষ্ণ জল অথবা নরম আঁচের রোদ যেমন মনের ভেতর একটা আমেজ তৈরি করে দেয়, তুমি সামনে এলে আমার সেইরকমের একটা সুখ সুখ অনুভূতি হয়। খুব বিশাল একটা ঘরে সার সার ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। লম্বা খাবার টেবিলে সুদৃশ্য চীনামাটির প্লেটে অদ্ভুত সব ভোজ্য সামগ্রী। বাদামী রঙের রোস্ট করা মুরগীর ঠ্যাং, ফিকে হলুদ পুডিং, তার ওপর কাঠি গোঁজা লাল একটি চেরি ফল। পাল তোলা গেলাসে স্বচ্ছ লাল পানীয়, রূপোর পাত্রে সরু চালের হালকা হলুদ বিরিয়ানী। জাফ্রানের রঙ, জায়ফল আর আতরের সুবাস। দুখণ্ড করা লাল বেদানার দানা, থোলো থোলো আঙুর, পালিশ করা আপেল, দূরে কোথাও কোনও ঝরনার ফিনিক ফিনিক শব্দ। তোমাকে দেখলে আমার কেন জানি না এইসবই মনে পড়ে। বড় ভোগের ইচ্ছে হয়। কৃশকায় এক সন্ন্যাসীকে চোখে হাত চাপা দিয়ে চলে যেতে দেখি। তাকে আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। বিশাল আকাশের চেয়ে কূপকেই সুখের মনে হয়। আগুন জ্বলে। সে আগুন হোমের নয়। যে আঁচে মশলা মাখা মুরগী ধীরে ধীরে বাদামী হতে থাকে, সেই রকম কোনও কাবাবের আঁচ।
মহিলা আমার দু'কাঁধে হাত রেখে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, কি হয়েছে তোমার ?
চমকে উঠে বললুম, না, কিছু হয়নি। আমার কি ওপরে যাওয়া উচিত, না সরে পড়বো ?

সরে পড়বে কেন ? ওঁরা দু'জনেই ভীষণ চিন্তায় আচ্ছন্ন। তুমি এখুনি ওপরে যাও।

ফাঁসীর আসামী যেভাবে বধ্যভূমির দিকে এগোয় আমি সেইভাবে ওপরে উঠে গেলুম। ভাবতে লাগলুম, কি ভাবে আমার কাহিনীকে সাজাবো। বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু বলতে হবে। মিথ্যেকে করে তুলতে হবে সত্যি।

সকালের সেই পোশাকে পঙ্কজবাবু বসে আছেন সোফায়। আমি পেছন থেকে দেখছি। বাতাসে চুল এলোমেলো। ঘরে পিতৃদেব নেই। দেয়ালে প্রায় নিঃশব্দে ঘড়ির দীর্ঘ পেণ্ডুলাম সময়ের রেখা টেনে চলেছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছি। এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে পিতা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন, চলো, তাহলে, আর দেরি করে লাভ নেই। নিশ্চয় কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কোঁচার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। মুখ তুলেই আমাকে দেখতে পেলেন। মুখের চেহারা একেবারে পালটে গেল। মনেই হল না কঠোর একটি পুরুষের মুখ। স্নেহের নরম ছায়া নেমেছে। মা যেন যুদ্ধ ফেরত সন্তানকে দেখছেন। অদ্ভুত গলায় বললেন, তুমি এসেছো!

পঙ্কজবাবু ধড়মড় করে ঘাড় ফেরালেন। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

পিতা বললেন, ওকে আগে ভেতরে আসতে দাও। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব বিপদে পড়েছিল।

পঙ্কজবাবু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন, কি হয়েছিল বাবা ?

সত্যি কথাই মুখে আসছিল : চাপা অভিমানে আমি পলাতক হয়েছিলুম। স্টেটাসে মিলবে না বলে সরে যেতে চেয়েছি। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা মানায় না। বলা গেল না, কিছুতেই বলা গেল না। পরিবারের বাইরে এই মানুষটি একেবারে আমাদের মত, যেন আর এক পিতা। মৃদু গলায় বললুম, আমার ভীষণ বড় বাইরে পেয়েছিল।

অ্যাঁ, সে কি ? তা তুমি কি করলে ?

আমি তীব্র বেগে বেরিয়ে এলুম। প্রাণপণে চেষ্টা করলুম বাড়ি আসার। হলো না। শেষে কলেজে চলে গেলুম। সেখানে কোনও রকমে, এই আর কি ?

আমাদের বাড়িতে সাতসাতটা বাথরুম, তুমি তীরবেগে ছুটলে, একবার বললে না ?

আমার বলতে ভীষণ লজ্জা করল।

পিতা বললেন, হি ইজ এ ফুল। পঙ্কজ এই হল বাঙালী। বাইরের জগতে নিজেকে এমন ভাবে প্রোজেকট করতে চায় যেন দেবতা। মানুষও যে অ্যানিম্যাল, তারও যে আহার, নিদ্রা, মৈথুন, আই অ্যাম সরি, রিয়েলি আই অ্যাম সরি, একস্কিউজ মাই ল্যাঙ্গোয়েজ।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুমি একবার বললে না কেন বাবা ? ইস কত কষ্ট পেলে।

ও প্রশ্ন আর নাই বা করলে পঙ্কজ। লজ্জা, লজ্জা। লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু পুরুষের ? পুরুষের ইডিওসিনক্রেসি। একবার ঠিক এই কাণ্ড করেছিল, আমাদের অফিস-রিক্রিয়েসান ক্লাবের ফাংসানে গিয়ে। আমি ডায়াসে অরকেস্ট্রার সঙ্গে এস্রাজ বাজাচ্ছি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি, বেশ বসে আছে সামনের সারিতে। হঠাৎ দেখি নেই। ভাবলুম, ছোটবাইরে করতে গেছে। অনুষ্ঠান শেষ। তবু বাবুর পাত্তা নেই। খোঁজ খোঁজ। কাকস্য পরিবেদনা। পরের দিন পনের টাকা ফাইন দিয়ে বাবুকে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে খালাস করে আনলেন আমার শ্বশুরমশাই। পুলিস পাঁচ আইনে চালান করে দিয়েছিল। লজ্জা !

পঙ্কজবাবু বললেন, কিসের লজ্জা ! আমাদের বাড়িতে তোমার কিসের লজ্জা ! তুমি তো ব্যাটাছেলে ! আজকাল মেয়েরাই উদোম হয়ে ফিরিঙ্গি নাচ, আই অ্যাম সরি। একস্কিউজ মাই ল্যাঙ্গোয়েজ।

পিতা বললেন, কিসের লজ্জা শুনবে ? সব খুলে গামছা পরে...।

গামছা পরবে কেন ? তোয়ালে, তোয়ালে পরবে।

আরে তার চেয়েও বড কথা, যে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, ওর ব্যাখ্যায় সে মানুষ মানুষই নয়, জন্তু। যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওকে ছেড়ে দাও। একটু সাফা হয়ে আসুক। অশুদ্ধ হয়ে আছে।

হ্যাঁ বাবা যাও, চট্ করে সেরে এসো। ওরা সব না খেয়ে তোমার জন্যে হাঁ করে বসে আছে। পঙ্কজবাবুর কথা শুনে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আবার যেতে হবে! মিউ মিউ করে বললুম, আবাব যেতে হবে!

বাঃ যেতে হবে না! তুমিই তো সব। তোমার জন্যেই তো সব আয়োজন!

পঙ্কজবাবু বললেন ভালো। তবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আয়োজন আমার জন্যে নয়। উপলক্ষ ভাযবাভাই। এক ঢিলে দু'পাখি মারা হচ্ছে। তবু বলেছেন, এই যথেষ্ট। এসে বসে আছেন কতক্ষণ! সেও তো কম কথা নয়! নিজের বোকামির জন্যে সকাল গেল, দুপুব গেল, এইবার বাতটাও যেতে বসেছে। পেটে হিঙের কচুরি ঠেলেঠেলে উঠছে। এই অসময়ে আর কি কিছু ভালো-মন্দ খাওয়া যাবে!

পঙ্কজবাবুর খুবখুবে গাড়ি আবার কলকাতামুখো। আবাব সেই মনস্তত্ত্ব। দু'হাতে স্টিযারিং। দু'চোখ রাস্তায়। মুখে ক্লান্তির ছায়া। আমাকে বললেন, বুঝলে, তোমাব মন আমি বুঝে ফেলেছি। তুমি সত্যি কথা বললে না। আসলে তোমাব অভিমান হয়েছে। বলো, ঠিক ধরেছি কি না! এইবার তুমি সত্যি বলো!

পঙ্কজবাবুর কথা শুনে গলা শুকিয়ে এলো। মিথ্যে কি ভাবে ধবা পডে যায়। পাপ অনেকটা পকসের মত। গায়ে গুটি বেরোয়। অভিজ্ঞ মানুষ দেখেই ধরে ফেলেন। পঙ্কজবাবু তন্ময় হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটি লেগে আছে। ইনি এক অন্য জাতের মানুষ। পাকা পিচ ফলের মত নরম। ভেলভেটের মত মন। এঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়ে গেলে ক্ষতি কি! আবাব একটা জটিল অবস্থাব মধ্যে পডার চেয়ে, মনে যা হয়েছে তা বলে ফেলাই ভালো।

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ধরেছেন ঠিক, আমি সত্যি কথা বলিনি। বলাব সাহস হয়নি।

তুমি ওভাবে তাহলে পালিয়ে এলে কেন?

আমার মনে হল।

মনে হল, বলে থেমে পড়তে হল। ভাষায় কুলোচ্ছে না। এমন কিছু শব্দ চাই যা বেশ ভদ্র, নরম অথচ স্পষ্ট।

বলো, কি তোমাব মনে হল? আমরা খারাপ লোক।

আজ্ঞে না। ছি ছি, খারাপ লোক কেন হবেন! আপনারা অসাধারণ। সেই তুলনায় আমি ভীষণ সাধারণ। আমার মনে হল, আপনাদের পরিবারে আমি একেবারেই মিসফিট।

মিসফিট? এমন মনে হবার কারণ!

আপনারা ধনী। আপনাদের আত্মীয়-স্বজন সব বড় বড় ব্যক্তি, জীবনে কত সুপ্রতিষ্ঠিত! সেই তুলনায় আমি একটা বোগাস। জীবনে খুব বেশি দূর ওঠার যোগ্যতাও আমার নেই। এইরকম একটা মিডিয়কার ছেলে ও পরিবারে অচল।

এই তোমার ধারণা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরা তাহলে তোমাকে আপন করে পেতে চাইছি কেন?

ঠিক জানি না। ধরতে পারছি না বলেই আশ্চর্য হচ্ছি।

তুমি খুব মেটিরিয়ালিস্ট!

একেবারেই না।

তাহলে তুমি ও রাস্তায় ব্যাখ্যা খুঁজতে যাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে ওইটাই তো পৃথিবীর রাস্তা। জীবনের রাজপথ।

রাজপথের পাশে পায়েচলা পথও থাকে যে-পথে তীর্থযাত্রীরা যাওয়া-আসা করে।

পঙ্কজবাবু গাড়িটাকে হেদোর ডানপাশে নির্জন একটা রাস্তার ধারে দাঁড় করালেন। ইন্জিন বন্ধ হয়ে

গেল। এক পাশে সার সার বাড়ি, বাগান। আর একপাশে বড় বড় গাছ। দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া। বিকেলের আলো মরে আসছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি কিচিরমিচির করছে। ডাইভিং বোর্ড থেকে মাঝে মাঝে এক একজন জলে ঝাঁপ মারছে। শব্দ হচ্ছে ঝপাং।

স্টার্ট বন্ধ করে পঙ্কজবাবু আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। কাল রাতে সদ্যপাওয়া মুখের কাটা দাগ আমার ভেতরটাকে কেবলই সামনে ঠেলে দিতে চাইছে আর আমি ক্রমশই কুঁকড়ে যাচ্ছি। পঙ্কজবাবু হঠাৎ খপ করে আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। হাত কাঁপছে। ভদ্রলোক যে কোনও কারণেই হোক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

চাপা গলায় বললেন, তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি।

ধরে ফেলেছি বলায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কী ধরে ফেলেছেন! আমার মন, আমার চিন্তা! বলা যায় না। কোনও কোনও মানুষের ভীষণ শক্তি বাড়ছে। পঙ্কজবাবুর পরের কথায় ভয় কেটে গেল।

তুমি গ্রহণ করেছ।

কাকে?

আমার মেয়ে অপর্ণাকে। তার ওপর তোমার একটা অধিকারবোধ জন্মেছে। বলো ঠিক কি না?

আজ্ঞে তা কি করে হয়?

হয়, খুব হয়, তা না হলে তোমার অভিমান হত না। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। শোন, অর্থ, কেরিয়ার এসবের প্রয়োজন আছে, তবে সব নয়, সবার ওপরে হল বংশ, কৌলীন্য, চরিত্র। প্রাচীনকালে গৌরীদানের প্রথা ছিল। যুগ পালটেছে। পালটালেও, ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত। জানো তো প্রবাদ আছে, মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ী হয়ে যায়। ছেলেদেরও পঁচিশের মধ্যে বিয়ে দেওয়া উচিত। এই তো সেই বয়েস। স্বপ্ন দেখার বয়েস, রোমান্সের বয়েস, ঘর বাঁধার বয়েস, আনন্দ করার বয়েস, দুঃখ সহ্য করার বয়েস। তোমার ঠাকুর বলতেন, হাঁড়ি যতক্ষণ কাঁচা, তলতলে, ততক্ষণই তার গায়ে আঁকিবুকি চলে। পেকে গেলে, পুড়ে গেলে আর কিছু চলে না। তুমি ওই বিলিতি বস্তু দেখে ভয় পেও না। ওরা আমাদের ঘণ্টা কয়েকের অতিথি। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আদর্শ আলাদা। তুমি একটু হাসো। তোমার সেই হাসি হাসি মুখ ফিরিয়ে আনো।

আমাকে হাসতেই হল। পঙ্কজবাবু সত্যিই আমাকে ধরে ফেলেছেন। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার রাস্তায় ভেসে পড়ল। উনি গুন গুন করে গান ধরেছেন, পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। সেই বিশাল বিশাল থামঅলা, শ্বেত পাথরের মত শুভ্র বাড়িটি ক্রমশই এগিয়ে আসছে। গাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াল। সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে অপর্ণা, বাবা, খুঁজে পেয়েছ, খুঁজে···একটি মুখ ঝুঁকে এলো জানালার কাছে। সুন্দর এক সুবাস।

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার

সারা শহরের যানচলাচল বিপর্যস্ত করে বিশাল এক মিছিল বেরিয়েছে। কোনও এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের। সিংহাসনে বসে আছেন ধর্মগুরু। সিল্কের গেরুয়া পরে। সিংহাসন চলছে কলে। একটা হুডখোলা মটোর গাড়িকেই ওই ভাবে সাজান হয়েছে। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। ধর্মগুরুকে দেখতে ভারি সুন্দর। তপ্তকাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ। মুখশ্রী যীশুখ্রীস্টের প্রায় কাছাকাছি। অতি সুন্দরী দুই মহিলা, দুপাশে বসে চামর ব্যজন করছেন। তার মধ্যে একজন বিদেশিনী।

জ্যামে আটকে পড়া বাসের জানালায় বসে বসে মিছিল দেখছি। ধর্মোন্মাদ নরনারী সুললিত সংগীত করতে করতে গুরুকে নিয়ে চলেছেন। এই যে সব বলেন ধর্মজগতে নারীসঙ্গ বর্জন করে চলতে হয়। ও মা সে মনে হয় প্রাথমিক স্তরে। একটু এগিয়ে গেলে, কি বা নারী, কি বা পুরুষ! 'সেকস্‌লেস' দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা। সে দেখাটা কেমন কে জানে! অমন কন্দর্পকান্তি চেহারা পেলে বুকঠুকে সংসার ত্যাগ

করে সাধন-জগত তোলপাড় করে দেখা যেত। পৃথিবী মোটেই মর্কটের জন্যে নয়। মিছিলে দু' একজন ভক্ত মহিলার ভাবোন্মেষ হয়েছে। তাঁরা টলেটলে চলেছেন। শাড়ীর আঁচল শরীর থেকে খুলে পথে লুটোচ্ছে। একেই বলে, সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।

অফিস থেকে যেটুকু আগে বেরোবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, সেটুকু সময় পথেই পড়ে রইল। বাড়ি ফেরার জন্যে মন ছটফট করছে। মুকুর রেখে যাওয়া খাম আমাকে আজ খুলতেই হবে। পৃথিবী যদি উল্টেও যায় আজ আমি খুলে দেখবোই।

মিছিল ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলে গেল। ট্রাম আর বাসের জট একটু একটু করে খুলছে। ভেবেছিলুম সন্দের আগে বাড়ি পৌঁছে যাবো, তা আর হল না। মুকুরা এতদিনে বাড়ি পৌঁছে গেছে। সেখানে কি হচ্ছে কে জানে! এসেছিলেন তিনজন, ফিরে গেলেন দু'জন। আমার মাতুলও মনে হয় এতক্ষণে তাঁর নতুন কর্মস্থলে পৌঁছে গেছেন। কতক্ষণের পথ। মাতামহকে পিতা আটকে দিয়েছেন। আগে শরীর, তারপর তীর্থধর্ম। আজ আসবেন একজন বড় ডাক্তারবাবু। তাঁরই নির্দেশে চিকিৎসা চলবে। রক্ত পরীক্ষা, দেহনির্যাস পরীক্ষা; ছুটোছুটি আমারই বাড়বে। তা বাড়ুক, কাউকে আমি হারাতে চাই না। জীবন হবে পূর্ণ, তা নয় কেবলই শূন্য হয়ে আসছে। সবাই যেন পা নামিয়ে বসে আছেন। ঈশ্বর একবার স্টার্ট বললে হয়। দৌড়তে শুরু করবেন। যে সূর্য রোজ সকালে ফিরে আসেন, দিবা শেষে তাঁর অস্তমুহূর্তে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের অস্তের তো আর উদয় নেই। সব সম্পর্ক শেষ করে, সব ধুচিয়ে চলে যাওয়া। নাঃ, ক্ষমতা থাকলে ধর্মগুরুই হতুম। তাঁকে ধরেই পড়ে থাকতুম, যাঁর উদয় নেই, অস্ত নেই, ক্ষয় নেই। সদা পূর্ণ।

বাস এতক্ষণ আটকে থাকার শোধ তুলে নিচ্ছে। ঝড়ের গতিতে ছুটছে। যাত্রীরা খুব খুশি। গতির উত্তেজনায় সব বাহবা বাহবা করছেন। আমার পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ। তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, যখন ভিড়িয়ে দেবে তখন বুঝবে মজা, বাহবা বেরিয়ে যাবে। একটু গলা চড়িয়ে কনডাকটারকে বললেন, ওহে আমরা বাড়ি যেতে চাই, হাসপাতালে নয়। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করলেন, দাদু, এখনও এতো প্রাণের মায়া! ঘাড় না ঘুরিয়ে বৃদ্ধ বললেন, নাতি, আমার জন্যে নয়, ভাবছি তোমার জন্যে, নাতবউ যে কাঁচা বয়েসে বিধবা হবে।

নাতির মুখে আর কথা সরল না। দুটো স্টপেজ পরে বৃদ্ধ নেমে গেলেন। তিনটে স্টপেজ পরে নেমে গেলেন ব্যঙ্গকারী যুবক। আকাশের আজ খুব শোভা। পূব আকাশে গুটি গুটি শামুকের গতিতে চাঁদ উঠে পড়েছে। আমাদের এ তল্লাটে এখনও বড় বড় গাছ আছে। ডালপালা থেকে জলের ফোঁটার মত ভিজে ভিজে চাঁদের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

বাড়ি একেবারে শান্ত। কাকীমা সবে গা ধুয়ে তারে ভিজে জামা মেলছেন। ভিজে শাড়ি জড়ানো শরীর। আমার পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। সামান্য অনুযোগের গলায় বললেন, তুমি বলেছিলে আজ তাড়াতাড়ি আসবে, এই তোমার তাড়াতাড়ি?

কী করবো! এক ঘণ্টার পথ আসতে দু ঘণ্টা সময় লাগল।

আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারে বোধ হয় বেশি টান পড়েছিল, পটাং করে ছিঁড়ে সায়া, ব্লাউজ সমেত উঠোনে নেমে এলো।

কাকীমা বললেন, যাঃ, হয়ে গেল, আবার কাচো।

আগে ভিজে কাপড়টা শরীর থেকে খুলুন, ঋতু পরিবর্তনের সময়, জ্বরে পড়লে কে দেখবে?

দেখার মানুষ আছে।

সে কে?

এই যে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

কাকীমা নিচু হয়ে জামা কাপড় তুলতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল, আমি সংসার পেতে ফেলেছি। আমাকে আর গৃহী করার প্রয়োজন কি? গৃহী তো হয়েই গেছি। আবার সেই রাত আসছে। আজ কী হবে! কে কোথায় থাকবে? আসুক রাত, তখন ভাবা যাবে।

কাকীমা বললেন, আজ সারা দুপুর বসে বসে তোমার জামাকাপড় সব কেচে দিয়েছি। ওপরের চেয়ারে পাট করা আছে। ইস্ত্রিতে দেবার হলে দিয়ে দিও।

এত কষ্ট করতে গেলেন কেন ?

আমার খুশী। তুমি এখন চা খাবে ?

খাবো।

তা হলে হাত মুখ ধুয়ে এসো।

সিঁড়ির ধাপ দুয়েক উঠেছি, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল খড়খড় করে। কাকীমা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লেন। আবার নেমে আসতে হল। দরজা খুলেই চমকে উঠতে হল। কী আশ্চর্য, ইনি তো সেই ভদ্রলোক। হাতিবাগানে সোনালী খরগোস দর করছিলেন, সাথে এক ঢলে পড়া সুন্দরী মহিলা নিয়ে।

আমি চিনতে পেরে চমকে উঠলেও, ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না। কাকীমার নাম করে বললেন, আছে ?

খুবই ঘাবড়ে যেতে হল, কে এই ভদ্রলোক ? সাজপোষাক ঠিক সেদিনকার মতই। শরীর থেকে ফিনফিনে ধারালো এক গন্ধ উঠে এসে নাকে লাগছে। মুখে পাউডার মেখেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এই রকম একজন মানুষ কাকীমাকে খুঁজছেন কেন ? বেশ সাবধানে, সংযত হয়ে বললুম, কেন বলুন তো ?

ভদ্রলোক হাসলেন ; বাঁধানো দাঁত। ভয় নেই। তুমি আমাকে চেন না। আমি তার মামাশ্বশুর। আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ ?

তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম। বললুম, আসুন, আসুন।

কালো ফিতে পাড় ধুতির কোঁচাটিকে সাবধানে হাতে ধরে ভদ্রলোক চৌকাঠ টপকে ভেতরে এলেন। জুতোর বার্নিস ঝিলিক মেরে উঠল। আমি জানি ভদ্রলোকের শরীরে তেমন জোর নেই। সেদিনে সেই 'বাকসম' মহিলার উৎসাহের আকর্ষণে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। ভেতরে পা রেখেই ভদ্রলোক গ্রাম্যসুরে চিৎকার করে উঠলেন, কই গো, কোথায় গেলে ?

কাকীমা কোনওরকমে একটা শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন, আসুন মামাবাবু আসুন।

নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলেন, ভদ্রলোক হাত দুটো খপ করে চেপে ধরে মহিলাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিতে চাইলেন। এক সার সোনার বোতাম বুকের কাছে দাঁত বের করে হাসছে। বয়েস মানুষকে কিছু লাইসেনস দেয় , কিন্তু এ মানুষটি তো লাইসেন্‌সাস। কেউ না জানুক আমি জানি।

কাকীমা সরে যাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, মামাবাবু, আপনি তা হলে ওপরেই বসুন।

ওপরে কেন ? নিচেটাই তো বেশ ভাল।

না না, বড় ড্যাম্প, মশা। আপনি বসতে পারবেন না।

এখন আমি সব পারি গো। এক সময় ছিল যখন গোকুল আড়্ডি ওয়েলার ঘোড়া জুতে ফিটন চাপত। স্কচ ছাড়া কিছু গলায় ঢালত না। এখন সব শেষ। কলসির জল গড়াতে গড়াতে এখন সব ফৌত।

মনে মনে ভাবলুম ফৌত তো হবেই, অসুখটা যে খুব সিরিয়াস ! সোনার হরিণ ধরে দিতে গিয়ে রামচন্দ্র কাত হয়ে গিয়েছিলেন, ইনি আবার সোনার খরগোস কেনেন !

কাকীমা বললেন, তা হোক, আপনি ওপরেই বসুন, আমি চা চাপাচ্ছি।

কাকীমা যেমন করেই হোক ভদ্রলোককে ওপরে পাঠাতে চান, ভদ্রলোকও নাছোড়বান্দা। নিচেটাই তাঁর পছন্দ। শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা কোথায় ?

এখনও ফেরেননি। অপিসে।

তা হলে একা একা আমি ওপরে কি করব। এলুম তোমার কাছে, তুমি আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছ ! ভদ্রলোকের মতিগতি ভাল নয়। সন্ধেবেলা শাঁখের শব্দে ঘরে ঘরে দেবতারা আসেন, কোথা

থেকে এই বৃদ্ধ মদন-মঞ্জরী এসে হাজির হলেন ! মেয়েদের জীবন কী ক্যাডাভারাস। খোলা পড়ে থাকার উপায় নেই। মিষ্টির মত। ভ্যান ভ্যান করে মাছি আসবে, বোলতা আসবে। তা আমার এত গায়ের জ্বালা কেন ? কারণ আছে। অবচেতনায় একটা অধিকারবোধ জন্মেছে। ঘটার আগেই ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। যাকগে, মরুকগে, এই কচলাকচলি দেখতে আর ভালো লাগছে না। আমার অত মাথাব্যথার কোনও কারণ নেই। আমার চেয়েও মামাশ্বশুর নিশ্চয়ই আপনার জন। অন্যের চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ করার আগে নিজের চরিত্র সামলান উচিত। চালুনির কি আর ছুঁচের বিচার চলে !

ওপরটা একেবারে পরিপাটি করে সাজান। দেখলেই বোঝা যায় এর পেছনে বেশ রুচিবান একজন মহিলার সারাদিনের হাতের স্পর্শ রয়েছে। রাগতে গিয়েও রাগা যায় না। অভিমান ফেলে দিতে হয় ছুঁড়ে। চান করে নিতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগল না। চায়ের আশায় বসেই আছি, বসেই আছি। কাকস্য পরিবেদনা। নিচে নামতেও ভরসা পাচ্ছি না। কি দেখতে কি দেখে ফেলব। চোখে উড়ে এসেছে পাপীর দৃষ্টি। বৃদ্ধ; তায় আবার আপনজন, তার ওপর ভোগী। অসীম ছাড়পত্র হাতে। মাঝখান থেকে এক কাপ চা জুটলো না বরাতে। নিজে করে খাবো, সে উৎসাহেও ভাঁটা পড়ে গেল।

হঠাৎ বুক-সেলফের দিকে নজর চলে গেল। পিতৃদেবের ধর্মভাব আসায় একের পর এক আধ্যাত্মিক বই কিনে চলেছেন। সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ কিনে এনেছেন। পাঁচটি খণ্ড পর পর পাশাপাশি সাজানো। এখনও পর্যন্ত একদিনও আমি খুলে দেখিনি। কী খেয়াল হল, দ্বিতীয় খণ্ডটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম। শুনেছি ধর্মজগতে এর চেয়ে খোলাখুলি ডায়েরি বিরল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে হল, বইটির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। যেখানেই খুলছি, সেইখানেই চোখ আটকে যাচ্ছে। সংস্কারমুক্ত প্রকৃত সাধকের উপলব্ধি বলেই এমন হচ্ছে।

পাতার পর পাতা ঘুরতে ঘুরতে একটি পরিচ্ছেদে এসে চোখ আটকে গেল। হেডিং, প্রলোভনে অবিকার, অহঙ্কারে পতন। অংশটি পড়ে অবাক হয়ে গেলুম। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে ব্রহ্মচারী বাড়ি ফিরছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'কিন্তু বিধির পাকে, দুর্ম্মতিবশতঃ এদিকে সেদিকে মাসাধিক কাল ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এই সময়ে কিছুদিন এক পরিচিত লোকের ভবনে আমায় অবস্থান করিতে হইল।' *যে ভদ্দরলোকের বাড়িতে উঠলেন তিনি একদিন বিষয় কর্মে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে বাধ্য* হলেন। যাবার সময় ব্রহ্মচারীজির ওপর বাড়ি এবং এক অবিবাহিতা মহিলার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গেলেন। 'চাকর চাকরানী ব্যতীত অন্য পরিজন না থাকায়, কামিনীর তত্ত্বাবধানের ভার বাবু আমারই ওপর রাখিয়া গেলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেতু সজনে নির্জনে নিঃসঙ্কোচে আমার সহিত উঁহাদের আলাপন, উপবেশন বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমার আসন ও শয়নের স্থান উঁহাদের আগ্রহে ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্যন্ত আমি নির্জ্জনে সাধনভজনে কাটাইতাম, রমণী তখন আপন গৃহকর্মে রত থাকিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ভৃত্যবর্গ বাহিরে চলিয়া যাইত। কামিনী তখন একাকিনী এক ঘরে না থাকিয়া আমার ঘরে আসনের কিঞ্চিৎ অন্তরে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্মপ্রস্তাব তুলিয়া, সরলতার ভানে, নিজের আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কট সমস্যায় পড়িয়া কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।'

ব্রহ্মচারীজী এর পর লিখছেন, 'উঁহার কোন চেষ্টায়ই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থায় উঁহাদের অসাধ্য কার্য কিছুই নাই। আমার কোন বিরুদ্ধ ব্যবহারে যদি উঁহার মর্মে ও অভিমানে আঘাত পড়ে, এখনই যুবতী আমার নামে কুৎসিত কথা বলিয়া, চীৎকার করিয়া দশজনকে একত্রে করিবেন, এবং মুহূর্ত মধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মত আমার অখ্যাতি অপযশ দেশে বিদেশে রটনা করিবেন। এক দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া আতঙ্কে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিয়াছেন— *পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত না থাকলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়।* মনে হইল ঠাকুরের এই অনুশাসন বাক্য, সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াই আজ আমি বিপন্ন হইলাম। তখন গুরুদেবের অভয়-চরণ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিক্ত সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া

অবশেষে "ও হরি ! তাই তুমি ব্রহ্মচারী।" বলিয়া সলজ্জ হাসিমুখে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।'

তারপর কী হল ! নিজের জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাইনি কাকীমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন চা হাতে। —কী পড়ছ অত মন দিয়ে ?

গম্ভীর গলায় বললুম, বই।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কী বই ?

একটা বই।

বাবুর রাগ হয়েছে ?

রাগ হতে যাবে কোন দুঃখে ?

হ্যাঁ, হয়েছে তো। কাটা কাটা কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। কী করব বলো ? বুড়োর যেন ছেলেমানুষের মত বায়না !

কাকীমা টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে আমার চেয়ারের পিঠে বুক ঠেকিয়ে মাথায় হাত রেখে দাঁড়ালেন। মাথার চুলে সরু সরু আঙুল খেলছে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে রিনিঠিনি। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘাড়ের কাছে অতি কোমল কিছুর ওঠাপড়া। গা সিরসির করছে। আয়েসে চোখ বুজে আসছে। শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে পড়ছি। কোমল অন্ধকার কম্বলের মত ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে। আমিও কী সাধক ব্রহ্মচারীর মত এঁকে প্রণাম করব ? পায়ে ধরব ? পা যে বড় সর্বনেশে অঙ্গ। পদযুগলে যে আমার মাতৃদর্শন হয় না। মন যে অন্যভাবে উতলা হয়ে ওঠে।

চিবুকটি মাথার ব্রহ্মতালুতে রেখে, আলগা দুটো হাত আমার দু'কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের কাছে মৃণাল কাণ্ডের মত ফেলে, মহিলা বড় আদরের গলায় বললেন, কী তুমি চা খাবে না ?

আমার ভেতরে আমার মৃত্যু হল। রমণীর সোহাগে গলে গিয়ে, শুভ্র সুগোল দুটি হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বললুম, নিশ্চয়ই খাবো। না খেয়ে পারি !

চিবুকটা ঘষে দিয়ে, বুকের কাছে হাত খেলিয়ে কাকীমা বললেন, আমার লক্ষ্মী ছেলে। তুমি চা খাও, আমি আসছি। বুড়োকে ভাগাই।

ঘাড় ঘুরিয়ে কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে ছোট্ট, চুল-ঘেরা কপালের দিকে নজর পড়ে গেল। কপালের মাঝখান থেকে টিপটা সরে অনেকখানি ডানপাশে সরে গেছে। কেন গেছে ? কী করে গেছে ? নানা সন্দেহে মন আবার জল থেকে সদ্য তোলা এক মুঠো কুঁচো কাঁকড়ার মত লাফাতে লাগল। কাকীমা নিচে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই চেক চেক শাড়িটা আজ পরেছেন। স্বাস্থ্যেরও যেন কিছু উন্নতি হয়েছে। মুখ যেন মোমের মত মসৃণ, কপালের দু'টো পাশ ঝকঝক করছে। শাড়ীর আঁটসাঁট বাঁধনে শরীরে অদ্ভুত এক ছন্দ খেলা করছে। দেখবো না, দেখতে চাই না, তবু চোখ উড়ে যাচ্ছে।

রমণীরে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা
জড়িত প্রকৃতি সনে
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা !

এ আবার কোথা থেকে কি লাইন এসে গেল ! পড়ছিলুম সাধকের সাধন-জীবনের বিভ্রান্তির কথা। আলো আসতে আসতে অন্ধকার ঘিরে এলো। অবশেষে ব্রহ্মচারীজীর কি হল—

'আমি তখন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া, নিশ্চয়ই আমার অপূর্ব শক্তিলাভ হইয়াছে ; তাই ঈদৃশ ব্যাপারে আমি নির্বিকার অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি যথার্থই সাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, নিরাপৎ ভূমি লাভ করিয়াছি।" কিন্তু হায়, এই প্রকার অযথা অহঙ্কারের কয়েক দিন পরেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে বুঝিলাম। ঘটনার সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহ্নির কালধূমে দুলভ ব্রহ্মচর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে

অন্তর্হিত করিল। আমি পূর্বের অপূর্ব পবিত্র অবস্থা হইতে স্খলিত হইলাম।'

বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ কাটার সময় যে রকম শব্দ হয় সেই রকম একটা শব্দ সদর রাস্তায় উঠেই থেমে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ হল। আবার গাড়ি! আবার এই অসময়ে কে এলেন! চকোলেট রঙের নতুন একটা গাড়ি বাড়ির সামনে থেমেছে। বিদেশী গাড়ি। বেশ লম্বাটে চেহারা। এ গাড়ির পেট্রলেও বিদেশী সুবাস। পেছনের দরজা খুলে পিতৃদেব নেমে এসে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সোজা অফিস থেকে আসছেন। সেই ধরনের ব্যক্তিত্ব মুখে চোখে এখনও লেগে রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদ অনেকটা ডকটর বি সি রায়ের মত। চেহারাতেও বেশ কিছুটা মিল আছে।

এতক্ষণের সৎ অসৎ চিন্তা মাখানো আমার মুখটি দোতলার বারান্দায় ঝুলেছিল। আঙুলের ইশারায় নিচে ডাকলেন। যেন মুক্তি পেলুম! নিজের চেষ্টায় নিজের থেকে বেরোতে পারছিলুম না। ক্রমশই এক অতলান্ত ইন্দ্রিয়ের জগতে ডুবতে বসেছিলুম।

পিতা বললেন, তুমি প্রস্তুত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সামনে উঠে বোসো। ডকটর সেন।

নামেই বাঙালী। চেহারায়, সাজ পোশাকে পাকা সাহেব। টকটকে ফর্সা মুখে, সোনার ফ্রেমের চশমা। চোখ দুটো চাপা অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে মাতামহের বাড়ির দিকে ছুটল। আমার ডান পাশে, ডাক্তারি ব্যাগ, যন্ত্রপাতি শুয়ে আছে। একটু পরেই লাফিয়ে উঠবে। গাড়িতে যেতে যেতে মনে হল, আমার জীবনে শূন্যতার পরিমাণ খুব বেড়ে গেছে, যে কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি ক্রমশই। আমি যদি মৃটেমজুরও হতে পারতুম মনের চেহারা ফিরে যেত!

ডকটর সেন খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন। গলা কিন্তু বেশ গম্ভীর, একধরনের ঝঙ্কারও আছে। ডকটর সেন বললেন, কে দেখছেন?

পিতা বললেন, কেউ না। জীবনের এই প্রথম অসুখ।

বয়েস?

প্রায় সেভেন্টি ফাইভ।

একেবারে ভার্জিন সিসটেম। দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি।

সারা পথে এই কটিমাত্র কথা। দু'জনে দু'জনের ভাব নিয়ে বসে রইলেন। গাড়ির চাকা মাইল খেয়ে চলেছে। সঙ্কীর্ণ পথ, বিশাল গাড়ি। সবেগে, সদম্ভে ছুটতে পারছে না। গাড়ির রূপ দেখে দু'পাশের মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। আর আমার বেশ অহঙ্কার হচ্ছে। মনে হচ্ছে সাধারণ স্তর থেকে কত উর্ধ্ব স্তরে উঠে পড়েছি। মনের কতরকম মতিভ্রম!

বাহাদুর এসে দরজা খুলে দিল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, বাবু কোথায়?

বড়োবাবু পুজোয় বসেছেন।

পিতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডকটর সেন। তিনি কপাল কুঁচকে বাড়িটার দিকে তাকালেন। নারকেল পাতা ঝুলে এসেছে। বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপছে। ভেবেছিলাম মাতামহ বোধহয় দোতলায় আস্তানা নিয়েছেন। না, তিনি যেখানে যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেই আছেন। সেই নারকেলগাছের তলায় আউট হাউসে। ঘরের মাঝখানে বসে আছেন, আসনে স্থির হয়ে। মায়ের ছবি ঝুলছে দেয়ালে, একপাশে কাত হয়ে। জগদম্বার সঙ্গে মাতামহের বড় সুন্দর সম্পর্ক। মা কখনও ডানপাশে কাত, কখনও বাঁ পাশে, কখনও সোজা। কখনও আদর, কখনও গালাগাল।

দরজার সামনে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে। মাতামহ বসে আছেন আমাদের দিকে পেছন ফিরে। স্থির, অচঞ্চল দীপশিখার মত। পিতা আমাকে ইশারা করে বললেন, যাও, ভেতরে যাও, আসন থেকে তোলো। ভেতরে গিয়ে আসনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লুম। চোখ দুটো বোজা। মুখে একটা অলৌকিক উদ্ভাস। অত্যাশ্চর্য একটা কিছু দেখে যেন পুলকিত! শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ধীর। ডাকতে সাহস পেলুম না। এমন মানুষের জন্যে ডাক্তার কি হবে! তবু ফিস ফিস করে বাতাসের সুরে ডাকলুম, দাদু!

দ্বিতীয়বার ডাকতেই শরীরে একটা মৃদু কম্পন লাগল। তৃতীয়বার ডাকতেই মাতামহর চোখ দুটো নিচের দিকে অল্প একটু খুলে গেল। যেন করমচা দ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে। লাল ভেলভেট। আমাকে দেখতে পেয়েছেন। মৃদু একটুকরো হাসি নেমে এল ঠোঁটের কোণে। দুটো চোখ এবার পুরো খুলে গেল। শ্রীরামচন্দ্রের চোখের মত আরক্তিম। দু কোণে, তলার দিকে জল টলটল করছে। সারা মুখে এমন একধরনের হাসি, যে হাসি মানুষ চেষ্টা করে হাসতে পারে না। বাঁ হাত মাথায় রেখে বললেন, কি রে কখন এলি ?

আমি একা নই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখুন।

মাতামহ খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরালেন। কোনও উত্তেজনা নেই, তাড়াহুড়ো নেই। গন্তব্যের সীমায় পৌঁছে গেলে মানুষ বোধহয় এইরকমই মন্থর হয়ে আসে। শূন্য ঘট আর পূর্ণঘটে যে তফাৎ। মেঝেতে বাঁ হাত ফেলে শরীরকে বাঁ দিকে সামান্য মোচড় মেরে মাতামহ আসন ছেড়ে উঠলেন, কী ব্যাপার ! তোমরা !

পিতা বললেন, হ্যাঁ, আমরা। ডকটর সেন এসেছেন। আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

পিতা বললেন, এখানে কেন ? ওপরে গেলে হয় না ?

হরিশঙ্কর, এইটাই যে আমার স্বস্থান।

ডক্‌টর সেন বললেন, এ ঘরেও কোনও অসুবিধে নেই।

মাতামহ বললেন, একটু আছে। তেমন সাজানো গোছানো নয়, তাছাড়া পাখা নেই।

পাখা কি হবে ? পাখার কোনও প্রয়োজন নেই। জুতো কি খুলতে হবে ?

না না, জুতো পরেই আসুন। এ ঘরে সবই চলে।

ঘরে একটা হাতল ভাঙা ধুমসো চেয়ার। পালিস নেই। কাঠের দানা বেরিয়ে পড়েছে। চেয়ারে একটা কম্বলের আসনপাতা। মাতামহ চেয়ারটা দেখিয়ে ডক্‌টর সেনকে বললেন, বসুন।

আমরা বসলুম চৌকির ধারে। মাতামহ দাঁড়িয়ে রইলেন। পিতা বললেন, আপনি বরং শুয়ে পড়ুন।

মাতামহ ভয়ে ভয়ে বললেন, হরিশঙ্কব, এঁকে মনে হচ্ছে খুব বড় ডাক্তার। বড়লোকের ডাক্তার। অনেক টাকা ভিজিট। আমার যে ভীষণ লজ্জা করছে।

ডক্‌টর সেন বললেন, লজ্জার কোনও কারণ নেই। ডাক্তারদের চেহারা একটু ভারিক্কিই হয়। ইনি আমার মাস্টারমশাই। ছাত্রজীবনে এমন শিক্ষক পেয়েছিলুম বলেই আজ দাঁড়াতে পেরেছি। আমিও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

মাতামহ যেন সামলে উঠলেন। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মুখে হাসি ফুটল, বললেন, তাহলে একটু করে চা হোক ভাঁড়ে।

হোক, আপত্তি নেই।

একটা করে নানখাতাই বিস্কুট।

সেটা কি জিনিস ?

ওই যে গো, এত বড় বড়, সুজি আর মিষ্টি দিয়ে তৈরি করে, খাস্তা মুচমুচে।

আপনার তো বেশি মিষ্টি খাওয়া উচিত হবে না।

আমি তো খাবো না। আমি তো কিছু খেতেই পারছি না।

কেন ? কি অসুবিধে হচ্ছে ?

ডাক্তার, আমি খুব ভোজনবিলাসী ছিলুম। অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক যেমন হয় আর কি ! লোভী। সেই লোভী বামুন এখন মরেছে। বেটী বললে, দাঁড়া এমন করে দোবো, যা মুখে দিবি, সব অমনি গা গুলিয়ে বেরিয়ে যাবে।

তার মানে নসিয়া ?

হ্যাঁ নসিয়া।

কী খাচ্ছেন তা হলে ? আজ কী খেয়েছেন ?

সত্যি কথা বলবো ?

সত্যিই তো বলবেন, তা না হলে চিকিৎসা হবে কি করে ?

হরিশঙ্কর তুমি রাগ করো না, আমি সত্যি বলছি। দুটো আলুর চপ আর একগাল মুড়ি।

দু'জনে সমস্বরে বললেন, আলুর চপ ?

ওই যে বললুম, লোভ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তারপর থেকেই পেট ফুলতে শুরু করল। বুকে পেটে এক হয়ে জয়ঢাক। খাদ্যটা বেশ বার করেছি কিন্তু। কম খরচে। একদিন খেলে দুদিন আর হাঁ করতে হয় না।

ডক্‌টর সেন বললেন, চা এখন থাক। আগে আপনাকে পরীক্ষা করি।

মাতামহ বললেন, একটা কথা বলব ? তোমরা রাগ করবে না বলো ? আমার নোটিস এসে গেছে। ভেতরে যেখানে যা যেমন আছে, সেইরকম থাক। শুধু শুধু নাড়ানাড়ি করে লাভ কি ? জমি থেকে গাছ উঠেছিল, শেকড় নামিয়েছিল, রস শুষেছিল, ডালপালা মেলেছিল, এবার শুকোবার পালা। দেখতে পাচ্ছি, কাঠুরিয়া আসছে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে।

ঘরের বাতাস থমথমে হল। ডক্‌টর সেন বললেন, তবু তো বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

পিতা হাত ধরে মাতামহকে চৌকির ছোবড়া ওঠা বিছানায় বসিয়ে দিলেন। ডক্‌টর সেন এগিয়ে এসে নাড়ী টিপে ধরলেন। শুরু হল পরীক্ষা। বুক, পেট, পিঠ, পায়ের ফোলা পরীক্ষা। পিঠের দিকে কোমরের ওপরে ভীষণ ব্যথা। ডক্‌টর সেনের হাত পড়তেই মাতামহ কুঁকড়ে গেলেন। ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে প্রেসার মাপা হলো। এই যন্ত্রটি দেখে মাতামহ ভীষণ আনন্দ পেলেন। হাতের ওপরে জড়ানো রবারের তাগাটি বারে বারে দেখছেন, আর বলছেন, ঠিক যেন রেল কোম্পানীর পোর্টার। বুকে একটা পেতলেব চাকতি লাগালেই হয়। ফোঁস ফোঁস করে বাতাস ঠেলে, ফিস্ করে হাওয়া বের করে ডক্‌টর সেন যখন যন্ত্রের পারদ স্তম্ভকে তুলছিলেন আর নামাচ্ছিলেন, তখন মাতামহের যেন আরও আনন্দ ! প্রশ্ন করলেন, ডাক্তার, মানুষের ভেতবটা কি ঠিক এই রকমই ছটফট করে ? লোভে, লালসায়, কামনায় ?

শিরার ওপর স্টেথিসকোপের গোল, ঠাণ্ডা চাকতি চেপে ধরে ডক্‌টর সেন নীরবে মাথা নাড়লেন।

About, about, in reel and rout
The death-fires danced at night ;
The water, like a witch's oils,
Burnt green and blue and white.

রাত ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে। কটা বাজলো কে জানে। দশটা-টশটা হবে হয়তো ! বাইরে বাতাস ছেড়েছে। নারকেল গাছের পাতা থেকে থেকে দুলে উঠছে। আমরা তিনটি প্রাণী গোল হয়ে বসে আছি। মাঝখানে পড়ে আছে একগাদা ওষুধপত্তর। কোনওটা সোনালী রাঙতা মোড়া, কোনওটা রূপালী। ছোটো বড়ো ওষুধের ফাইলে তরল টল টল করছে। পিতার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। দরজায় পিঠ রেখে বাহাদুর ঢুলছে। মাতামহের মুখ যথারীতি প্রসন্ন। শিশু যেন চলন্ত গাড়ির জানালায় বসে জগৎ দেখছে।

হঠাৎ মাতামহ নীরবতা ভঙ্গ করলেন, তোমরা অত ভাবচো কেন বলো তো ? যেতে হয় যাবো। আবার ফিরে আসবো, আবার যাবো। একদিন তো যেতেই হবে হরিশঙ্কব। আজ আব কাল। কে

থাকবে চিরকাল !

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আপনি একটা রেকর্ড নষ্ট করে দিলেন।

কী রেকর্ড ! আমি তো কোনও কিছু নষ্ট করিনি।

আমার একটা গর্ব ছিল, আপনি অন্তত মিনিমাম নব্বই বছর থাকবেন, একশো হলে আরও খুশি হতুম। শুধু থাকা নয়, বহাল তবিয়তে থাকা। দাঁত থাকবে, চোখ থাকবে, হাত, পা, বুদ্ধি নিজেব বশে থাকবে। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি হয় তো ফেল করবেন না। ইউ হ্যাভ মিজারেবলি ফেলড।

মাতামহ খুব আশা নিয়ে বললেন, তোমার কি মনে হয় পচাঁত্তর খুব একটা কম বয়েস ?

পচাঁত্তর একটা বয়েস হোলো ! বিদেশে পচাঁত্তর বয়েসে প্রাইম মিনিস্টার হয়, প্রেসিডেন্ট হয়। গ্ল্যাডস্টোনের কথা ভাবুন। কেন চার্লি চ্যাপলিন ! সত্তর না আশী বছর বয়েসে আবার বিবাহ কবলেন। জানেন, বাশিয়ার একটি অঞ্চলে মানুষের পরমায়ু দেড়শো, একশো আশী, দুশো। তার মানেটা কি ? জীবনটাকে ভাগ করুন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য। পঁচিশ বছবে তাদের দুধের দাঁত পড়ে, নতুন দাঁত ওঠে। পঞ্চাশে শুরু হয় যৌবন। আশীতে প্রৌঢ়, একশোতে বার্ধক্য। আপনি আমার মনোবল ভেঙে দিলেন। আমাদের ব্যায়াম, কুস্তি, আপনাব সাধন ভজন, উপবাস, সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা।

মাতামহ অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, এবারকার মত তুমি আমাকে ক্ষমা কবে দাও হরিশঙ্কর। আর কখনও এমন হবে না। কেন এমন হোলো বলো তো !

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কত বছর বেঁচে ছিলেন মনে আছে ?

সবাই বলে তিনশো বছর।

সেই জায়গায় সেভেণ্টি ফাইভ ! হোপলেস। আপনি আমাকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিলেন। এর চেয়ে বড় পরাজয় ভাবা যায় না।

তোমার কি মনে হয়, আমার অসুখটা খুবই খারাপ ?

শরীরের দুটো মেজর পার্টস একেবারে নষ্ট করে ফেলেছেন। কমপ্লিটলি আউট অফ অর্ডার। আর আপনি এতই উদাসীন, ভেতরে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে, কিছু টেরই পেলেন না। ধরা পড়ল শেষ সময়ে। এখন কি হবে !

কেন, এই সব ওষুধ খাবো। চুপ করে শুয়ে থাকবো। যা তা খাবো না। খাবার ইচ্ছে থাকলেও খেতে পারবো না। আচ্ছা, আমার কি হয়েছে বলো তো ?

আপনার কিডনী দুটো আর কাজ কবছে না।

যাকগে, না করুক গে। চোখ দুটো আর মাথাটা তো কাজ করছে। হাত দুটো দ্যাখো, এখনও গুলো ফোলালে অনেক নবকার্তিক ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। এ বয়েসে কিডনী নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। নাতিটা রয়েছে, বলা ঠিক হবে কি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এখন সাবালক।

মাতামহ ফিসফিস করে বললেন, হাবসী খোজাদের ও দুটো কেটেই দিত। আপদ একেবারে চুকেই যেত। পিতা হতাশ হয়ে বললেন, ও মাই গড ! কোথায় কিডনী আর কোথায় কি। অ্যানাটমি সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। হোয়্যার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ।

মাতামহ বিষণ্ন হলেন। জগদম্বার ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

পিতা বললেন, নিন, প্যাক আপ। আপনার আর এখানে থাকা চলবে না। এখানে থাকলে সেবা হবে না। কে দেখবে ! ওষুধ আছে, পথ্য আছে।

বাহাদুর ঘুম জড়ানো গলায় বললে, আমি পারবো বাবু। আমাকে সব বলে যান।

তুমি পারবে। তোমাদের আমি ভীষণ বিশ্বাস কবি, শ্রদ্ধা কবি। তোমবা হলে গ্যালাণ্ট ফাইটার, তবে একটা কথা কি জানলে, একটু লেখাপড়ার জ্ঞান না থাকলে সব উল্টে পাল্টে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওবাড়িতে একজন সেবাপরায়ণা মহিলা আছেন। যদ্দিন আছেন তদ্দিন একটু দেখাশোনা

করতে পারবেন। তারপর তো নিজেদের আপন জন এসেই যাচ্ছে। তখন আর আমাদের পায় কে ?

মাতামহ বললেন, তার মানে ?

আপনার নাতবউ আসছে। এই মাসেই আমি আশীর্বাদ সারবো।

ও সেই মেয়েটি! একেবারে তুলসী কেটে বসানো। হরিশঙ্কর তদ্দিন আমি বাঁচবো, কি বলো! এইতে তো আমার পরমায়ু, তাই না।

সোনালী একটা ওষুধের ফয়েল হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, একটা খেয়ে নেবো এখন ?

না, খালি পেটে নয়। কিছু খেয়ে তারপর।

অ', তা আশীর্বাদে আমি যাবো তো!

আপনি ছাড়া আশীর্বাদ হবে ?

কি মজা! কি দিয়ে আশীর্বাদ হবে ?

হীরের নাকছাবি।

ফাস ক্লাস, ওই নাকে যা মানাবে না ? তুলসীর নাকে একটা হীরের নাকছাবি ছিল, কি হলো বলো তো ?

পুড়ে গেল।

পুড়ে গেল ?

হ্যাঁ, পুড়ে গেল। নাকেই ছিল, দেহের সঙ্গে ছাই।

হীরেও পোড়ে।

সব পোড়ে, সব পোড়ে। পৃথিবী একটা হোপলেস প্লেস। একটা জিনিসও থাকে না। সবই চলছে, চলেই যাচ্ছে। আমি পঙ্কজকে বলবো, ও তোমার শীতের শেষ ফেস চলবে না, সুনার দি বেটার। আমি সময়কে বিশ্বাস করি না, ট্রেচারাস টাইম। আচ্ছা, আপনার কি দয়ামায়া নেই ?

কেন ? কেন ?

আমি এখনও অফিসের জামাকাপড় ছাড়িনি। নিন উঠুন, আর কতো দেরি করবেন ?

আমি যদি কাল যাই হরিশঙ্কর !

আবার আপনি কালকে বিশ্বাস করছেন ? এই মুহূর্তে আপনি কি জানেন, কাল কি হতে পারে আর না পারে! কেউ জানে ? এই যে তুলসী ভীষণ দই খেতে ভালবাসতো। কবিরাজ বলে গেলেন, বেশ আমি আর বাধা দোবো না। চামচে দুয়েক ভালো মিষ্টি দই রুগীকে দিতে পারেন। সন্ধে বেলা বলে গেলেন। আমি ভাবলুম, অত তাড়ার কি আছে, কাল সকালে দেওয়া যাবে। ভোর রাতে তুলসী চলে গেল। ব্যাসকেল কাল। আই হ্যাভ নো ফেথ অন হিম। বর্তমান ছাড়া আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না। অতীত আমার স্মৃতিতে। ভবিষ্যৎকে আমি হাসি মুখে গ্রহণ করি। গেট আপ।

মাতামহ মিউ মিউ করে একটা ছুতো বের করলেন, বাড়িটা হরিশঙ্কর এতটুকু একটা ছেলের ভরসায় ফেলে রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে!

বড় আপনি বিষয়মুখী! কি সোনাদানা আছে যে চোরে নিয়ে যাবে! ভিত থেকে উপড়ে বাড়িটা তো আর চোরে নিয়ে যেতে পারবে না।

সঙ্গে কি কি নোবো ?

নিজেকে নেবেন। আর আমরা নোবো ওষুধ। নাথিং লেস, নাথিং মোর।

রাত বেশ হয়েছে। তবু রিকশা পাওয়া গেল। একটু পরেই সিনেমার রাতের শো ভাঙবে। পাশেই সিনেমা হল। সব তীর্থের কাকের মত সিটে পা তুলে বসেছিল। রিকশা নিয়েও দুজনের কিছু বচসা হয়ে গেল। মাতামহ বললেন, একটা রিকশাই যথেষ্ট। নাতিটাকে কোলে নিয়ে নোবো। পিতা বললেন, না দুটো। দুটো, একটা, একটা, দুটো।

একজন রিকশাঅলা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েই রইল। আর একজনের ভাগ্য দুলতে লাগল। দুটো

বলামাত্র সে তড়াক করে লাফিয়ে নামে, একটা শুনলেই সিটে উঠে পড়ে। পিতার সিদ্ধান্তের ওপর কারুর চড়ে বসার ক্ষমতা নেই। শেষে আমরা দুই এক ভাগে দুটো ঝকঝকে রিকশায় উঠে বসলুম। ফুরফুরে বাতাসে রিকশা ভেসে চলল। মাতামহ আমার পাশে। আমার একটা হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, কেমন আছিস রে?

ভালো দাদু।

আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, আমরা যেন কলকাতার বাইরে চেঞ্জে এসেছি। তোর মনে হচ্ছে না!

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হ্যাঁরে, আমরা আর কোনও দিন একসঙ্গে বাইরে যেতে পারবো না!

কেন পারবো না। আপনি ভালো হয়ে উঠলেই আমরা মধুপুর কি সিমুলতলা যাবো।

না, রে, হরিদ্বার। সেই স্টেশান থেকে বেরোলেই মহাদেবের মূর্তি। মাথার ওপর একহাত তুলে ঘটি ধরে জল ঢালছেন। ওদিকে গঙ্গা বয়ে চলেছে, হর হর শব্দে। আহা, সে কি জায়গা রে! সব প্রদীপ ভাসিয়েছে ভক্তরা, ফুল ভাসিয়েছে। নেচে নেচে, ভেসে ভেসে চলেছে। সে কি দৃশ্য রে! হর, হর, গঙ্গে।

মাতামহ ভাবে বিভোর হয়ে গঙ্গা স্তোত্র আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥

হঠাৎ স্তোত্র থামিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, ওঃ কত বছর বেঁচে আছি। পাগল বলে কিনা, আমি রেকর্ড খারাপ করে দিলুম। একশোর আগে যাওয়া যাবে না। আমার দিন যায় বৃথা কাজে, রাত্রি কাটে নিদ্রায়। শূন্য জীবনে একশো বছর বেঁচে লাভ কি। তারা, কোন্ অপরাধে সংসারগারদে দাসখত লিখে নিয়েছ হায়। মাতামহ হঠাৎ ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

কি হলো? আপনি কাঁপছেন কেন? জ্বর আসছে?

কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মাঝে মাঝে আমার ওরকম হচ্ছে রে! ভয় নেই। তুই আমাকে একটু জড়িয়ে ধর। ঠিক হয়ে যাবে।

মাতামহ যেন শিশুর মত হয়ে গেছেন। বেশ করে দু হাতে জড়িয়ে ধরলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে কেমন একটা পরিবর্তন এসে গেল। মনে হল দেবালয়ে কোনও পবিত্র বিগ্রহকে আলিঙ্গন করেছি। ধূপ, ধুনো. গুগ্‌গুল, চন্দনের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। তরঙ্গের মত মাতামহের শরীর থেকে একটা কিছু আমার শরীরে চলে আসছে।

বাড়ি পৌঁছেও মাতামহের কাঁপুনি থামল না। অতটা প্রবল না হলেও কাঁপছেন। সেই অবস্থাতেই আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। বেশ মোটা একটা চাদরের তলা থেকে মুখটি শুধু বেরিয়ে রইল। মুখে এক ধরনের হাসি, যেন পুরো ব্যাপারটাই বড় মজার। শরীর শরীর খেলা।

পিতা বলতে লাগলেন, ইমিডিয়েটলি ওষুধ।

টেবিলের ওপর রাখা নানা রকম ওষুধ থেকে তিনি সঠিক ওষুধটি খুঁজতে লাগলেন। কাকীমা একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি চা খাবেন?

না, এত রাতে আর চা নয়। তুমি বরং একটু গরম জল আনো। ওঁকে চট করে একটু ওষুধ খাইয়ে দি।

ওষুধটা দেখিয়ে দিয়ে আপনি জামাকাপড় ছাড়ুন। আমি ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি।

পারবে তো বউঠান।

আপনি দেখুন না পারি কিনা।

পিতৃদেবের ওপরেও কাকীমার স্বাভাবিক একটা কর্তৃত্ব এসে গেছে। মেয়েরা চট্ করেই কেমন সংসারের হাল ধরে নেয়। ভয় ডরও কম।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তুমি এবার সেরে নাও। রাত অনেক হোলো। তুমি আমার জন্যে অত ভেবো না। তোমার ভাবনা কে ভাববে গো?

কাকীমা বিছানার দিকে সবে গিয়ে সামনে ঝুঁকে মাতামহর কপালে হাত রাখলেন। পিতা সেদিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কি, গরম?

হ্যাঁ, সামান্য ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

তুমি বরং দুপাশে দুটো পাশবালিস দিয়ে বেশ ঘন করে দাও। মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো। পায়ের দিকেরটা খোলা থাক।

কাকীমা মাতামহের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় কষ্ট হচ্ছে আপনার?

না, বউমা তেমন কষ্ট কোথাও হচ্ছে না। তোমরা সব খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আমি ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়িয়ে? কোথায় বেড়াতে যাবেন?

যে সব জায়গায় গেছি, সেই সব জায়গায় মনে মনে বেড়িয়ে আসি।

কাকীমা খাটের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বললেন, জ্বর বেশ বাড়ছে।

পিতা ইশারায় কাকীমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ডকটর সেন কি বলে গেলেন আমিও শুনেছি। শরীরের প্রধান একটি যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। যে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করছে মানুষের জীবনমরণ।

কেমন এক গা ছমছমে পরিবেশে রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হোলো। অনেকটা নমো নিত্যং ভঙ্গিতে। ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত বারোটা হোলো। কাকীমা আজ মাতামহের ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শোবেন। পাশের ঘরে পিতৃদেব। দু' ঘরেব মাঝের দরজাটা ভেজানো থাকবে। ওপাশে আমার ঘরে আমি। সাত সকালেই আমাকে বেরোতে হয়। আমার না কি নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ঘুমোনো উচিত।

পিতৃদেব বললেন, তুমি এখুনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো। অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। টেক কমপ্লিট রেস্ট। প্রয়োজন যদি হয় ডেকে তুলবো।

কাকীমা বললেন, তুমি ঘরে যাও। তোমার দুধ আমি দিয়ে আসবো।

দুধ? দুধ আমি খাই না।

তা খাবে কেন? খালি চা খেয়ে শরীর নষ্ট করবে।

পিতা বললেন, ঠিক হয়েছে। এইবার তুমি শক্ত পাল্লায় পড়েছ।

ঘরে এসে অবাক হয়ে গেলুম, কাকীমা কখন এসে পরিপাটি করে আমার বিছানাটি করে রেখে গেছেন। আলোটা আপাতত নেবানোই থাক। জানালার বাইরে প্রশস্ত রাত। বাতাস আজ খুব উতলা। কেন? কার জন্যে! কোথাও যেন একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আবার কি আসছে ঘাতক?

জানালার দিকে মুখ করে চেয়ার টেনে বসলুম। কালো আকাশের গায়ে জানালার গরাদ লম্বা লম্বা লাইন টেনেছে। বহু দূরে শ্মশানের দিক থেকে সমবেত কণ্ঠ ভেসে আসছে। আসছে, বলো হরি, হরি বোল। বামুণ্ডুলে প্রবীর ওপাশের বাড়িতে বেহালা ধরেছে। সরু সুতোর মত সুর ভেসে আসছে। পৃথিবী ক্রমশই যেন নেতিয়ে পড়ছে। যারা পেরেছে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা জাগবার তারা জেগে আছে।

ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা খুলে গেল। পদশব্দ, কাঁধের কাছে কোনও স্পর্শ, কাপড়ের আঁচল থেকে উঠে আসা বাতাসের ঝাপটার অপেক্ষায় আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। জোর করে একটা ভাব-তন্ময়তা আনার চেষ্টা। দরজা থেকে জানালার কাছ, সামান্য ব্যবধান। সময় চলে যায়। কোথায় কি? কেউ তো এলেন না। আর ধৈর্য নেই। ঘাড় ঘোরাতেই হোলো। ভেবেছিলুম অন্ধকার এই ঘরে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পাবো। হাতে দুধের গেলাস। লাল মেঝের দিকে তাকালে দেখবো, সাদা দুটি পা। কোথায় কি!

দরজার একটা পাল্লা সম্পূর্ণ খোলা। বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে। শূন্য বারান্দা সোজা চলে গেছে উত্তরে। দবজা খুলে গেছে, কেউ কিন্তু আসেন নি।

ব্যাপাবটা কি হল ? দখিনা বাতাসে উত্তরের দরজা খোলে কি করে ! যত গা ছমছমে ব্যাপার কি আমাব জীবনেই ঘটবে ! বারান্দা পেরিয়ে মাতামহের ঘরে এলুম। খাটের এক পাশে পিতা, আর এক পাশে কাকীমা। মাতামহ বলছেন, আমার তানপুরোটা নিয়ে আয় পিণ্টু। বাঁধ, আজ ডি-শার্পে বাঁধ। সুর দিয়ে বেটীর চরণ ছোঁবো। আহা ! কি সুন্দর জায়গা। ওই দ্যাখ, আকাশের গায়ে উত্তরাখণ্ডের পাহাড। হেসে হেসে আমার মা চলেছে। দে দে তানপুরোটা দে।

পিতা বললেন, কি হোলো বলো তো ! এইটুকু সময়ের মধ্যে এত প্রবল জ্বর এসে গেল ! ডিলিরিয়াম !

মাতামহ বললেন, আমি হারিনি হরিশঙ্কর। আমি হারিনি। আমি এখনও দৌড়োচ্ছি। ঠিক পারবো। পেরে যাবো। আমার এখনও দম আছে।

কাকীমা বললেন, জলপটি দোবো বটঠাকুর ?

তাব আগে থার্মোমিটার লাগাবো ?

কি দবকার ! আমি হাতেই বুঝতে পারছি, তিনের ওপর, চারের কাছাকাছি।

মাতামহ বললেন. খুলে ফেল, খুলে ফেল, সিন্দুকেব ডালাটা খুলে ফেল, ওবে গুপ্তধন আছে। গুপ্তধন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, এই তো ভালো ছিলেন, এর মধ্যে জ্বর এসে গেল, অ্যাতো প্রবল জ্বর !

তাই তো ভাবছি ! আমার মনে হয় ডাক্তারের কথা শুনে মনোবল ভেঙে পড়েছে। মন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। নিয়ে এসো, জলপটিই নিয়ে এসো। তুমি পা দুটো দ্যাখো তো !

চাদর তুলে পায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলুম, বরফের মত ঠাণ্ডা। পিতা বললেন, জ্বর আরও বাড়বে। দেবো না কি এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি।

কাকীমা বললেন, দিন না।

অ্যালোপ্যাথি চলছে।

চলুক।

টেবিলের ওপর ওষুধের বাকস তুলে পিতা ওষুধ খুঁজতে লাগলেন। গোল গোল গর্ত থেকে একটি করে শিশি তুলছেন, লেবেল পড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, ঠুকুস্ করে শব্দ হচ্ছে। শব্দ মৃদু ; কিন্তু এই পরিবেশে বড ভৌতিক। যেন যমে-মানুষে দাবা খেলা চলেছে। কলরিজের কবিতার লাইন মনে পড়ছে : The naked hulk alongside came/ And the twain were casting dice/ The game is done ! I have won ! I have won !/ Quoth She, and whistles thrice.

চারটি মাত্র ওষুধের গুলি, তাও তিনটি গেল মুখে, একটি গড়িয়ে পড়ে গেল। পিতা বললেন, হবার হলে তিনটিতেই হবে।

দুটো বোতলে গরম জল ভরে পায়ের পাতায় সেঁক চলতে লাগল। ওদিকে জোয়ারের জলেব মত রাত ক্রমশই বাডছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ উঠছে। কাদের বাড়ির শিশু কাঁদছে। ব্রংকাইটিসের রুগী কেশে উঠছে। ছাদের আলসেতে বসে পেঁচা ডেকে গেল। বাসার পাখি রাত শেষ হয়েছে ভেবে দু'বার ডেকে উঠেই মায়ের পাখার ঝাপটা খেয়ে থেমে গেল। কে একজন ও মা করে ডেকে উঠলেন। প্রবল বাতাস থেকে থেকে চারপাশ দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রাতের আসর খুব জমেছে।

রাত দুটো নাগাদ মাতামহ একটু শান্ত হলেন। জ্বরের প্রকোপ সামান্য কমেছে। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশ জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে হেসে ওঠে, মাতামহের মুখেও সেই রকম হাসি খেলে যাচ্ছে। কিছু একটা হচ্ছে যা আমরা জানি না। মানুষ কখন যে কোন জগতে চলে যায় !

পিতা বললেন, নাও বউঠান, তুমি এবার একটু শুয়ে পড়ো।

পিন্টুর দুধটা স্টোভ জ্বেলে আর একবার গরম করে দি।

তুমি এখনও দুধের কথা ভাবছো। মেয়েরা কাজের হলে যে কত কাজের হয়! তোমার স্বভাবটি ঠিক তুলসীব মত। সংসার একেবারে মাথায় করে রেখেছ। আচ্ছা সে কোথায় গেল, প্রফুল্ল! বড় ভাবিয়ে তুললে তো!

কাকীমা করুণ মুখে বললেন, বটঠাকুর, আপনি একটু সন্ধান করবেন! তার তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হ্যাঁ,এবার করতে হবে। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। দাঁড়াও, এদিকটা একটু সামলে নিই। নাও তুমি দুর্গা বলে শুয়ে পড়ো। আজ আর দুধেব হাঙ্গামা করতে হবে না। ঘড়ি কি বলছে দেখেছো! রাত ফিকে হয়ে আসছে।

নিজের ঘরে ঢুকে কেমন যেন একটা অতিপ্রাকৃত অনুভূতি হোলো। আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ উঠেছে। গোটা কতক তারা নেমে এসেছে নিচে। দপদপ কবে জ্বলতে জ্বলতে একটা উল্কা মাটির কাছাকাছি এসে হারিযে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হতে লাগল, আমার ঘবেব দেযাল, ছাদ, সমস্ত ঘেরাটোপ অদৃশ্য হয়ে গেছে। মহাশূন্যে চেযার পেতে বসে আছি। প্রচণ্ড বাতাসে চুল উড়ছে এলোমেলো। বিশালের এই অনুভূতি বেশিক্ষণ সহ্য করা গেল না। নিজেকে এত অসহায়, এত নগণ্য মনে হল, কেমন যেন একটা ভয় এসে গেল। নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলাব ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। হাত বাডিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালতে জ্বালতে মনে হল, আমবা কিসের এতো বড়াই করি, বিশাল শূন্যতায মুঠো মুঠো প্রাণ অসংখ্য জোনাকির মত জ্বলছে আর নিবছে। সৃষ্টিবৃক্ষের ডালে ডালে কখনও নাচছে, কখনও স্থিব। ড্রয়ার টানার শব্দে নিজেই চমকে উঠলুম। ত্যাবছা আলোয মুকুর সেই খাম। যেন এক জীবন্তপ্রাণী। দুজনে দুজনের দিকে তাকিযে আছি। শেয প্রহবেব ঘণ্টা বাজছে। দূরে।

হেসে নাও এ দু'দিন বই তো নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।

খামটার দিকে তাকিযে অনেকক্ষণ বসে বইলাম। খুলবো কি খুলবো না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষেব মনের গতি পালটে যায়! হঠাৎ দেহমুখী হয়ে উঠেছিল। আকাব, আকৃতি, কণ্ঠস্বব, মহিলাদেব অন্তর্বাস, অলঙ্কারেব শব্দ, শ্বাসপ্রশ্বাস, স্পর্শ যেন মধুর মত মন-মাছিকে টেনে নিত। নিজেকে মনে হত প্রবৃত্তির অতলে এক বৃহৎ অক্টোপাস। সব কটা শুঁড় দিযে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকডে ধবার চেষ্টা। মনের ম্যালেরিয়া হঠাৎ কোন কুইনিনে ছেডে গেল! ছেড়েছে, না আবাব কেঁপে কেঁপে আসবে!

পিতৃদেব ঠিকই বলতেন, ঈশ্বরটিশ্বর জানি না বাপু, সাব কথা হল নিজেব ওপব নিজেব কর্তৃত্ব! দূবে বসে নিজেকে দ্যাখো। যেই বেচাল দেখবে উঠে এসে কান ধবে মারো দুই থাপ্পড। নিজের শাসনে নিজেকে না রাখতে পাবলে সব অনুশাসনই কাগজেব ওপব কালো কালিব হবফ।

আজ এই উষাকালে প্রথম বুঝলুম, এর চেয়ে সত্য আব কিছু নেই। কি আমি গুরু গুরু কবে বাইরে ঘুরে মরছি। মন না রাঙায়ে কাপড রাঙালে কি হবে যোগী! মন্দিবে তোর নেইকো মাধব শাঁক ফুঁকে গোল করলি পোদো। মাধবকে আগে বসাতে হবে। যার পিতা এমন তাব কি অমন হওয়া সাজে! সবাই বলে আমগাছে আমই হয়, আমডা হয না। তা হলে। তাহলে, এ সব আমি কি ভাবি! কেন আমি ওসব করি। কি পাওয়া যায ওতে! জীবনের পথ কোন্ মহাশিখবেব দিকে চলে গেছে! অমৃতেব পথ। আত্মোপলব্ধিব পথ।

It rises through the mortal's hemisphere
Till borne by runners of the day and dusk.
It enters the occult Eternal Light
And clambers whitening to the invisible Throne.

নাঃ, আর নাচের পুতুলের মতো নাচব না। এ একটা সুতো ধরে টানবে হাতটা নেচে উঠবে। ও টানবে নেচে উঠবে পা। সব কটা সুতো ধরে তালে তালে টানবে, কাঠের পুতুল কোমর উঁচু মঞ্চে ঘুরে ঘুরে নাচবে। আর না। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে সেই অসাধারণ দুটি লাইন,

The conscious Doll is pushed
a hundred ways
And feels the push but not
the hands that drive.

গোটাকতক হাত আমি দেখতে পেয়েছি। একটা হাত হোলো এই খাম। এই হাতে একটি সুতো ধরা আছে। নাচালেই নাচতে হবে। দর্শকশূন্য মঞ্চে নিঃসঙ্গ নৃত্য। বাহবা বলে কেউ তালিও বাজাবে না। বেড়াল যেমন ইঁদুর মেরে দু হাত দূরে বসে থাকে, আমারও সেই অবস্থা। বহু দূরে একটি হাত সুতো ধরে বসে আছে। আমার সামনে পড়ে আছে টোপ। নির্বুদ্ধি মাছ মাঝে মাঝেই হাঁ করছে। গিলেছে কি মরেছে।

সময় আর বেশি নেই। মন বলছে—ও হে! লগন যে বয়ে যায়। খুলে ফেল। দেখো কি রহস্য আছে! তোমার জন্যে একটা আঙটি আছে। শ্যাম দেশের টুকটুকে লাল রুবি বসান খুব সুন্দর একটি আঙটি। যুবতীর নিবেদিত প্রেম। দীর্ঘ একটি চিঠিও আছে। সেই চিঠিতে তুমি হয়তো একটি পরিবারের অনেক গোপন কথা জানতে পারবে। জানতে পাবে একটি মেয়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশের কাহিনী। হয়তো অনুসন্ধানেব কিছু সূত্রও পেয়ে যেতে পারো। তাতে আমার লাভ? আমি কি গোয়েন্দা? আচ্ছা এই লেফাফায় যদি একটি দীর্ঘ পত্র থাকে, যে পত্রের ছত্রে ছত্রে মুকু নামক একটি মেয়ের আবেগ উষ্ণ ভালবাসা, থাকবেই এমন কোনও কথা নেই, যদি থাকে তাহলে আমার কি হবে? মনে বেশ একটা দোলা লাগবে। কিছুদিন বেশ কেটে যাবে আবার এক নতুন নেশার ঘোরে। চিঠির উত্তরে চিঠি। তার উত্তরে চিঠি। চলতে থাকবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলা। তারপব যা হয়, মন্থর হয়ে আসবে আদানপ্রদান। যোগাযোগের অক্ষর-সেতু স্তবকে স্তবকে খুলে পড়ে যাবে সময়ের স্রোতে। স্মৃতি ছাড়া কিছুই আর থাকবে না। আমি তো আর কিং আর্থার নই যে ঘোড়ার পিঠে চেপে ট্রালা, ট্রালা করে উদ্ধার করতে ছুটবো আমার লেডি-ইন-ডিসট্রেসকে। কনক আমার দুর্বলতা। মুকু আমার পরিচিতা। কনকের জন্যে আমি অনেক দূর যেতে প্রস্তুত ছিলুম। সেও এক তরফা। কনক আমার জন্যে একপাও যেতে প্রস্তুত ছিল না। সে কথা এখন স্পষ্ট। থাকলে এতদিনে আমাকে অন্তত একটা চিঠি দিত। একটা পোস্টকার্ড, গোটাদুয়েক লাইন। এ বাড়ি থেকে সেই জমিদারপুত্রের বাড়িতে অত সহজে চলে যেত না। স্টুডিওতে যেদিন দেখা হল সেদিন মনে হল প্রতাপবাবুকে সে মেনে নিয়েছে। হাবভাবে তেমন কোনও বিদ্রোহ নেই। ওই স্বার্থপর মেসোমশাইয়ের মেয়েরা খুব উদার হবে, ভাবাটাই অন্যায়। ফল তোমার পরিচয়? বৃক্ষে। ওই আইনজীবী ভদ্রলোক আর তার দ্বিতীয় কন্যাটির পাশে পঙ্কজবাবু আর অপর্ণা। মন! তুমি কি বলো? আকাশ আর পাতাল। ফাঁদে যদি পড়তে চাও, কোন ফাঁদ! আর প্রশ্ন নয়। কোনও ফাঁদেই আর এ শর্মা ধরা দেবে না। সংসারীমানুষ শেষটায় এমন ন্যাতাজোবড়া হয়ে যায়। মৃত্যু, অসুখ, উপেক্ষা, উদ্বেগ, অর্থাভাব, অভিমান। সার সার চৌরাশীটি নরকের কুণ্ড, তাহাতে ডুবায়ে ধরি পাতকীর মুণ্ড। ডাণ্ডশ যমদূতকে আর মারতে হয়না, পরিবার পরিজনেই মেরে শেষ করে দেয়। তুমি বীর্যবান হও, মোহশূন্য হও। চোখ কান বুজিয়ে যৌবনটি পার করে দাও।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর সঙ্গে ব্রহ্মচারীজীর জীবনের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। পরমাসুন্দরী,

পূর্ণযৌবনা ব্রাহ্মণ কন্যা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলছেন, 'ভেতরে অসহ্য জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারি না, তোমাকে মনে পড়লেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালসায় অস্থির হয়ে পড়ি। আমার এই কামনার পরিতৃপ্তি কর।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'এক সময় তোমার উপরেও আমার ভয়ানক লোভ ছিল। গুরুদেব তা এখন শান্ত করেছেন। ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছি। চিরকালের জন্যে ওসব কাজে বঞ্চিত হয়েছি।' যুবতী বললেন, 'তাহলে আমার এই ভাব যাতে নষ্ট হয়ে যায়, তার উপায় বলে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চয়ই আমি তোমার শান্তির ব্যবস্থা করব।'

শোনো মন, মন দিয়ে শোনো, ওই লেফাফাটি ধরার আগে কুম্ভীপাক কাকে বলে আর একবার শুনে নাও। সেই যুবতী সময় পেলেই ব্রহ্মচারীর কাছে এসে বসতেন, ধর্মকথা, সদুপদেশ শুনতেন, আর থেকে থেকেই কাতরভাবে বলতেন, অসহ্য জ্বালা, অসহ্য জ্বালা। যা হয় একটা কিছু করো। তুমি হলে কি করতে মন! এখন যা করছ তাই করতে। ব্রহ্মচারী কি করলেন শোনো।

যদিও কামোন্মত্তা কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে দেবদুর্লভ ব্রহ্মচর্যের অতুলনীয় অমৃতফল ইতিপূর্বেই আমি হারাইয়াছিলাম, তথাপি বর্তমানে গুরুর কৃপায় কামশূন্য অচঞ্চল অবস্থায় অতিরিক্ত গর্বিত থাকাতে, আমি ভাবিলাম—শুনিয়াছি বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে, নির্বিকার কামশূন্য অবস্থায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতির রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিলে, তাহাতে কামিনীর কামের উপশম হয়, এবং উপাসকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল আমি তাহাই করি না কেন? যুবতীর অঙ্গস্পর্শ করিতেই আমার নিষেধ, কিন্তু দূর হইতে পূজা করিতে দোষ কি?'

তারপর! মাঘ মাসের কোন এক পবিত্র তিথিতে!

সুযোগ এসে গেল। এই অনুচ্ছেদটি যত বার পড়ি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

'জনপ্রাণীশূন্য কোন এক নিভৃত স্থানে অবিলম্বে আমরা পৌঁছিলাম। পরে আসনে উপবেশনপূর্বক কামিনীকে কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিতে বলিলাম।'

পূজারীর সামনে, যজ্ঞবেদী, যজ্ঞের কাঠ, ঘি, বেলপাতা, অতসী, জবা, অপরাজিতা, ধূপ, ধুনো, চন্দন। সময় দিবা দ্বিপ্রহর। শ্রীশ্রী চণ্ডীর কিছু অংশ পাঠ করলেন, গায়ত্রী জপ করলেন। যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠল।

'কামিনী আমার ইঙ্গিতানুসারে প্রহৃষ্ট অন্তরে অমনি উলঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন দেবীর অভীপ্সিতা অতসী, অপরাজিতা, জবা, বিল্বদল অঞ্জলি পুরিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। পরে চণ্ডীর 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনান্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির ভাবে মনোযোগ পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য দেখিলাম—অকস্মাৎ উঁহার নাভিস্তর হইতে উরুদ্বয়ের মধ্যদেশ পর্যন্ত, গোলাকৃতি নিবিড় কালো ছায়ায় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িল; মধ্যাহ্নে প্রশস্ত সূর্যালোকে চতুর্দিক আলোকিত। আচম্বিতে গৌরাঙ্গীর অঙ্গবিশেষে মহাকালীর আবির্ভাব হইল। বহুক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিয়াও, ঘন কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে দীপ্তিময়ী কাল বিজলীর ঝিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।'

কিন্তু তারপর কি হোলো!

'অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। তখন দেখিলাম, রমণীর গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; কুঞ্চিত নয়নে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্বক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন। উঁহার পানে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। উঁহার চঞ্চল কটাক্ষে, তড়িৎ বেগে আমার ভিতরে কামোত্তেজনার সঞ্চার হইল।'

None can reach heaven who has not passed through hell.

ব্রহ্মচারীজী গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করছেন, রিপুর উত্তেজনা ক্রমশই যে

বাড়ছে। যতই সাধন ভজন করছি ততই বাড়ছে।

গোস্বামীজী বলছেন, ও রকম হয় নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের মত। আমার যখন ওইরকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অমনি মাথায় ঢেলে দিতাম ; কখনও বা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়ে হয়রান হ'লেই ব'সে পড়তাম।'

একই ব্যাপার, এই লেফাফা রমণীকে উলঙ্গ করলেই মনোহারিণী কটাক্ষে চিত্তচাঞ্চল্য। অভ্যন্তরে মুক্ত। কনকও থাকতে পারে। মেসোমশাইয়েব জীবনাতিবিক্ত জীবনের ইঙ্গিত থাকাও স্বাভাবিক। জল ঢালতে না পারি জলে ঢেলে দিতে পারি। বিসর্জনের এই তো প্রকৃষ্ট সময়। উষাকালেই ত যত মহৎ কাজ হয়। রাতের আততায়ী যাকে মেরে রেখে যায় তাকেও খুঁজে পাওয়া যায়।

রেবি দি পাস্ট। অতীতকে কবরখানায় ভবে দাও। খামটা হাতে নিয়ে নিচে নেমে গেলুম। গাছপালার বৃত্তের মধ্যে ইঁদারা সদৃশ আমাদের সেই বিশাল কুয়ো। যার মাঝামাঝি জায়গায় একটি সুড়ঙ্গের মুখ। যাব ভেতব থেকে বলাইবাবুর অভ্যুত্থান। কুয়োর ভেতর এখনও রাতের অন্ধকার থিব থিব করছে। মহাকাল যেন মুখব্যাদান কবে রয়েছে। ব্রহ্মচারীজী, যা দেবী সর্বভূতেষু, বলে কামোত্তেজিতা কামিনীব অঙ্গে অতসী পুষ্প ছুঁড়ে মেরেছিলেন, আমি উত্তেজক লেফাফাটি মনের জোবে টুক করে ছেড়ে দিলুম। সেকেণ্ড কয়েক সময়, জল স্পর্শ করার মৃদু শব্দ, যেন কোনও রঙীন পাখির ডানাব আলতো শব্দ। মনে হল গলায় একটা পাথর বাঁধা ছিল। খুলে পড়ে গেল। জীবনের একটা চাপা অধ্যায় থেকে মুক্তি। বৃত্তে ঘুরছিলুম, আজ সেই বৃত্তের মুখ খুলে গেল। পাতার আড়ালে একজোড়া পাখি শুকশারির গলায় যেন কথা বলছে। কি করলে, কি করলে!

সত্যিই, এ আমি কি করলুম ! বহুতল বাড়িব ছাদ থেকে লাফ মেবে, বাতাসের মধ্যে দিয়ে পড়তে পড়তে আত্মহত্যাকারীব মনেব যে অবস্থা হয়, আমার এখন ঠিক সেই অবস্থা। এ আমার কি ধরনেব হঠকারিতা। আমি কি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ' আমি এক ভোগী যুবক। দীর্ঘ ভোগেব পথ আমার সামনে ; বমণীয় রমণী, সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দর উপাধান, বিলাসের সামগ্রী, বংশ বিস্তারের অবাধ স্বাধীনতা। কেউ তো বলেন নি, ওহে তোমাকে বুদ্ধ হতে হবে, মহাবীর হতে হবে, চৈতন্য হতে হবে। নির্দেশ তো, তুমিই মানব হও। কাগজের কি দাম ? একটু সেন্টিমেন্ট। তৎক্ষণ থেকে ওঠা আবেগের তৎক্ষণ-বিলয়। কিন্তু আঙটিটা ! নিক্তিব ওজনে যার দাম !

মানুষের লোভ ! নির্লোভ, নিষ্কাম হওয়া মুখের কথা না কি ! আঙটির চিন্তায় মন একেবারে হাঁচবপাঁচর করে উঠল। এই বকম ছেলেকেই বলে, সেন্টিমেণ্টাল ফুল। ভাবার আগেই কাজ করে বসে। ঈশপস ফেবলসের সেই দাড়িঅলা ছাগল। লাফাবাব আগে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না।

সরসব করে পাতকোর বালতি নামিয়ে দিলুম। লেফাফা উদ্ধারের শেষ চেষ্টা। যদি তোলা যায় ! বালতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে নানাভাবে চেষ্টা করলুম। কোথায় কি ! কূপের শীতল জলে সমাধি। সব রহস্যের অবসান। জল সমেত বালতি তুলছি, পেছনে কাকীমা এসে দাঁড়ালেন, কি, মুখ ধোয়া হোলো ! আমার হাতে একটু জল ঢেলে দাও তো।

হাতময় কয়লাব কালি। উনুনে মনে হয় আগুন দিয়ে এলেন। ওপর দিকে তাকালুম। নীল আকাশে আমাদের বাড়িব সেই বিখ্যাত চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ফুঁসছে। ভোরের বাতাসে ধোঁয়ার রেখা এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। কাকীমা নিচু হতেই কাঁধ থেকে আঁচলটা সামনে লুটিয়ে পড়ল। কাকীমা বললেন, তুলে পিঠের দিকে পেঁচিয়ে দাও তো।

আবার সেই বমণীয় রমণীয়তা। ঠাকুর বলতেন কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই। আমি যতই অন্য কিছু ভাবাব চেষ্টা করিনা কেন সেই ভাবনা আসবেই। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে বাঘকে গুলি না খাওয়া পর্যন্ত মানুষখেকো হয়ে ঘুরতে হবেই।

আঁচলের কেরামতি শেষ করে, দু হাতে জল ঢেলে দিয়ে ওপরে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছি, কাকীমা এই যাঃ বলে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিছু একটা পড়ে যাবার টুকুস টুকুস শব্দ

হল।

কি হোলো বলে ঘুরে তাকাতেই দেখলুম, দু' টুকরো সাদা মত কি মেঝেতে পড়ে আছে।

ইস্ এ কি হোলো পিণ্টু! এতদিনের শাঁখা বেড়ে গেল আজ।

কি করে হোলো ?

পাতকোব পাড়ে হাত রেখেছি, খেয়াল ছিল না। অসাবধানে চাপ পড়ে গেছে। ভীষণ অলক্ষণ। কেন ভেঙে গেল বলো তো!

কত দিনের পুরোনো জিনিস! এতে অলক্ষণের কি আছে!

মেয়েদের ব্যাপার, ওসব তুমি বুঝবে না। তোমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে একজোড়া শাঁখা পরে আসবো। আর বাবাব নামে পুজো দোবো। সকালে যাবে, না বিকেলে ?

সকালে তো অফিস!

একদিন আমার জন্যে না হয় কামাই কবলে।

সে খুব অন্যায় হবে।

অপর্ণা বললে কি করতে!

একই উত্তর দিতুম। কাজ আগে।

ওরে আমার কাজি রে! যাও ওপরে যাও। চট কবে গা ধুয়ে নি। এর পর আজ আর দম ফেলার সময় পাবো না।

আমার সামনে গা ধোওয়া যাবে না!

সাতসকালে দুষ্টু দুষ্টু কথা বোলো না।

মাতামহ মশারিব ভেতর শিশুর মত নিদ্রাচ্ছন্ন। পিতাব টেবিলে এখনও পাংশু বাতি জ্বলছে। টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রাতুর। চারপাশে ছড়ানো বই। কোনওটা উপুড়, কোনওটা চিৎ। সবই হোমিওপ্যাথির বই। সাবা বাত এই নিয়েই কেটেছে। ভোরের দিকে টেবিলে মাথা বেখেছেন ক্লান্ত বীর। হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিযে দিলুম।

সুইচের শব্দ হতেই পিতা মাথা তুললেন। বললেন, সুপ্রভাত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুপ্রভাত।

কি বুঝছো ?

কিসেব ?

ওয়ান ডোজ, শেষ রাতে জ্বর ছেড়ে গেল। এখন কেমন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন!

কি করে হোলো ?

মিরাক্‌ল। সিম্পলি মিবাক্‌ল। এ আমার চ্যালেঞ্জ। একটু চাযেব ব্যবস্থা কবতে পাবো! ওই মহিলাকে আর খাটিও না। কাল সারা বাত বেচারা চোখের পাতা এক কবতে পারেনি।

যাচ্ছি, চা করে আনছি।

চা অবশ্য আমাকে আব করতে হল না। কেটলির খুটখাট শুনেই কাকীমা সব ফেলে ছুটে এলেন। হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে বললেন, থাক খুব হযেছে। যার কাজ তার সাজে অন্যেব মাথায় লাঠি বাজে। গালে একটা ঠোনা মেরে দিলেন। সবে স্নান করে এসেছেন। হাত দুটো কি ঠাণ্ডা! মহিলার প্রাণে যেন নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে। সুখ জিনিসটা কত ক্ষণস্থায়ী! কাকীমাকে দেখলে আমার আতঙ্ক হয়। ডাক্তার যখন জেনে ফেলেন, রুগীর রোগ ক্রমশই মৃত্যুর পবোযানা নিয়ে প্রাণকেন্দ্রেব দিকে এগিযে চলেছে তখন তিনি দেখেন আব মনে মনে বলতে থাকেন, হেসে নাও, এ দু'দিন বই তো নয। নেবার আগে প্রদীপ একবাব তেড়ে জ্বলে ওঠে।

চা পর্ব চলেছে। ক্রুশেন সল্টের শিশি নেমে এসেছে টেবিলে। চামচেটা ভারি অদ্ভুত। বাইচ খেলাব নৌকোর দাঁড়ের মত আকৃতি। ছোট্ট এতটুকু। চিমটে পবিমাণ ওষুধ তোলাব ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। বেশিও না কমও না। ডিশে দু চামচ ওষুধ ফেলে প্রথম চুমুক চাটি পিতৃদেব স্বাস্থ্যসম্মত করে তুললেন।

ডিশের চায়ে চুমুক মেরে মুখে যে কুঞ্চন উঠেছিল, দূরে কিছু একটা দেখেই সেইটাই হাসিতে রূপান্তরিত হল। মাতামহ বিছানায় উঠে বসেছেন। পিতা চেয়ার ঠেলে এগোতে এগোতে বললেন, কি, কেমন বোধ করছেন?

ভোরের প্রথম ফোটা ফুলের মত।

ঠিক বলছেন?

কোনও ভুল নেই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। এবার তাহলে অনুমতি দাও।

কিসের অনুমতি?

একবার ঘুরে আসি হরিদ্বার, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ।

আপনি শিশুর মত বায়নাদার হয়ে উঠেছেন। তারা কেবল খাবো খাবো করে, আপনি কেবল যাবো যাবো করছেন। আপনাকে আমি জলধব সেনের হিমালয় দিচ্ছি, বসে বসে পড়ুন। মানুষকে অত বঞ্চিত করতে চান কেন?

বঞ্চিত?

তাছাড়া আবার কি? আমাদের একটু সেবার সুযোগ দিন।

সেবা!

মাতামহ খলখল করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, কত বছর বয়েসে আমাদের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে বলো তো হরিশঙ্কর?

তা ঠিক, আমাদের স্ত্রীভাগ্য দু'জনেরই খুব খারাপ।

আমার ছেলেটাকে তো তুমিই মানুষ করলে!

ও কথা বলবেন না। ডোণ্ট ফ্যান মাই ইগো। মানুষ হবে বলেই মানুষ হয়েছে। কেউ কাউকে মানুষ করতে পারে না।

অত সব আমি জানি না বাপু। আমি যদ্দিন বাঁচবো তদ্দিন বলে যাবো। তোমার গুণগান করে যাবো।

আপনি না ঈশ্বরবিশ্বাসী?

ঈশ্বরবিশ্বাসী বলেই, কোনও কোনও মানুষে ঈশ্বরদর্শন করি।

এই তো সারের সার উপলব্ধি। যে ঈশ্বর আমার ভেতর সেই একই ঈশ্বর আপনার ভেতরেও। আপনার সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা।

হরিশঙ্কর, সারা জীবন যে আমি বড় অবহেলা পেয়ে এসেছি। তাই ভেতরটা কেমন যেন কলসিতে রাখা সিল্কের কাপড়ের মত কুঁকড়ে মুঁকড়ে গেছে।

বিউটিফুল, বিউটিফুল। বড় সুন্দর উপমা। আমিও তাহলে বলি, ভালবাসার জলের ছিটে আর সেবার ইস্তিরি দিয়ে আপনার রেশমের মত সেই মনকে আমরা মোলায়েম করে দোবো, মসৃণ করে দোবো। বমি বমি ভাব আছে না গেছে!

সে তো এখন বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে কিছু মুখে পড়লে।

আপনার ওষুধ এখন আমার হাতের মুঠোয়। পথ্যের ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। আচ্ছা এই যে আপনি পালাই পালাই করছেন, কালকের মত বিদেশ বিভুঁইয়ে হঠাৎ জ্বর এলে কি করতেন?

গাছতলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে জগদম্বার নাম জপ করতুম।

তা হলেই সব হোতো। হ্যাঁ, কে কোথায় গেলে! মুখ ধুয়ে নিন। খুব লাইট চা আর বিস্‌কুট খান। তারপর সব ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা জয়কে কি একটা টেলিগ্রাম করা দরকার!

না, না, ওকে আর বিরক্ত কোরো না। সত্যি কথা বলবো তোমাকে, বিয়ের পর অধিকাংশ ছেলেই কেমন যেন হাতছাড়া হয়ে যায়!

আঃ, সে তো একটু যাবেই। নান ক্যান হেল্‌প। বিবাহ একটা রেসপনসিবিলিটি। ঘরের মধ্যে ঘর।

রাত ভোরে পাখি ডাকলে যেমন নতুন দিন আশার আনন্দে মন ভরে যায়, মাতামহর উঠে দাঁড়ানোর

আনন্দও অনেকটা সেই রকম। নিবতে নিবতে আবার শিখা জ্বলে উঠেছে।

পিতা বললেন, আমি আজ বাজারে যাচ্ছি। আজকের বাজারে বেশ ঝামেলা আছে। চারামাছ চাই, বরফ চাই, মুড়ি চাই।

বরফ কি করবেন ?

সাংঘাতিক একটা টোটকা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এক গেলাস জলে এক মুঠো মুড়ি ফেলে, চারপাশে বরফ দিয়ে ঘণ্টাখানেক ফেলে রাখো। তারপর সেই শীতল মুড়ির জল বারেবারে চুমুকে চুমুকে খাওয়াও।

কাল জ্বর হোলো আজ বরফ জল, যদি অন্য রকম কিছু হয়ে যায় !

কি হতে পারে ?

যদি নিমোনিয়া হয়, কী ব্রংকাইটিস হয়, তাহলে কি হবে ?

তারও ওষুধ আছে। নাও তুমি গোটাকতক ব্যাগ নাও, আর দেরি না করাই ভাল। জ্যান্ত চারা মাছ এর পর বাজার থেকে উঠে যাবে।

সকালের বাজারের সে কি শোভা ! বেঁচে থাকার অনন্দে চারপাশ টগবগ করছে। বেগুনের বেগুনী, শাকের সবুজ, মাছের রুপোলি তবক, ঠ্যালাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। বাজার শেষ করে বরফের ডিপোয় গিয়ে মন বড় মিইয়ে গেল। ছোট্ট একটা গহ্বরে থান থান বরফ কাঠের গুঁড়োর বিছানায় শুয়ে আছে। ঘষা কাঁচের মত চেহারা। আগুন নয়, তবু ধোঁয়া উঠছে। মৃত্যুর শীতল মুখ গহ্বর থেকে যেন চিতার ধোঁয়া বেরোচ্ছে হিল হিল করে।

সুখের কথা বোল না আর
বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি,আছি ভাল
দুঃখেই আমি ভাল থাকি।

ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে ডাক পড়ল। আমার ওপর চায়ের ছাঁট থেকে কেফিন নিষ্কাসনের ভার পড়েছে। ফ্লাস্কে চায়ের ছাঁট আর সলভেন্ট ভিজছে। কাজটা খুব একটা দুরূহ নয়, তবে বিপজ্জনক। আগুন আর দাহ্য পদার্থ নিয়ে খেলা। একটু অসাবধান হলেই অগ্নিকাণ্ড। ডাকছেন যখন যে অবস্থাতেই থাকি যেতে হবে।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। কি হয়েছে তোমার ? এত বিমর্ষ কেন ?

আজ্ঞে, আমার দাদু ভীষণ অসুস্থ। মামা কলকাতা ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন।

কোন মামা ? যিনি সিনেমা তুলছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বোসো। সংসারের ঘোলা জলে সকলকেই ভাই হাবুডুবু খেতে হবে। কাল উষা একটা গান গাইছিল। ভারি সুন্দর ! সবটা মনে নেই। যে কটা লাইন মনে আছে :

এসেছ যখন ভবে
থাকার মাশুল দিতে হবে।
কত ডুববে উঠবে জীবন তরী
চঞ্চলতা এনো নাকো ॥

আজ্ঞে, পুরো গানটাই আমি জানি।

তাই না কি ! তুমি গান জানো ?

অল্পস্বল্প চর্চা ছিল। বাবা এসরাজ বাজান। মামা গাইয়ে। এ গানটা আমি উষাদির কাছেই শিখেছি।

তাই নাকি ? আচ্ছা প্রথম লাইনটা সুরে শোনাতে পারো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রোগ জানুক আর দেহ জানুক/মন তুমি আনন্দে থেকো/দেহাতীত হয়ে সদাই/আনন্দময়ীরে ডেকো ॥

যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে প্রথম চারটে লাইন শুনিয়ে দিলুম। সংগীত এমন জিনিস, এম ডির চোখ ছলছল করছে। তিনি চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখলেন। তসরের পাঞ্জাবির ঢোলা হাতা পিঠের কাছে খসখস করছে।

তুমি তো বড় গুণী ছেলে হে।

আজ্ঞে না, এমন কি আর গুণ। গান অল্পবিস্তর সব বাঙালীর ছেলেই গাইতে পারে

না, হে তোমার অনেক গুণ। নিজের গুণ নিজে বোঝা যায় না। তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। বেশ নিজনে একপাশে বসে তোমার গান শুনবো।

এম ডি নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বুঝলে, উষা মেয়েটি বড় ভাল। দেবী। এ সব মেয়ে ক্ষণজন্মা। লাখে এক। ওর কাছাকাছি এলে মানুষের ধর্মভাব হয়। নতুন দিগন্ত খুলে যায়। কত কি যে শেখার আছে ওর কাছে ! পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা পলাশ। ছেড়ে চলে যেতে হবে এই যা দুঃখ। আর কি আসা হবে ? আচ্ছা, তুমি ওই গানটা জানো, তোমার দ্বারে কেন আমি ভুলে যে যাই।

ঠিক সুরে পারি না, তবে মাঝে মাঝে গাইবার চেষ্টা করি।

আহা, কি লেখা ! দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই। বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে। নাঃ আমার দ্বারা আর ব্যবসাটাবসা হবে না। যত দিন যাচ্ছে তত রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছি।

সে তো ভালই। শুষ্কং কাষ্ঠং না হওয়াই ভাল।

আর কি আমার সে বয়েস আছে পলাশ ! আমাদের ওই বৈদ্যুতিক চালুনি যন্ত্রটা কোনো দিন দেখেছ !

না স্যার.

আবার সেই বাঙালের মত স্যার বলছ ? ওই সম্বোধনে দূরত্ব বেড়ে যায়। হ্যাঁ যা বলছিলুম, যন্ত্রটা বড় মজার ! প্রথমে এক পাশে কাত হয়ে কিছু জিনিস তুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে আর এক পাশে কাত হচ্ছে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বড় দানার জিনিস গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। থাকছে ছোট দানা। যন্ত্র তখন সেইগুলোকে নাচাচ্ছে। একেবারে পৃথিবীর কায়দা। এক প্রান্তে প্রবেশ, আর এক প্রান্তে প্রস্থান, মধ্যে নাচানাচি। আমরা সেই বৃদ্ধের দল, নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে নির্গমন পথের দিকে চলেছি। দিন এলে রাতের প্রদীপ ম্লান হবেই। কোনো দিন দাবার চাল দেওয়া দেখেছো

আজ্ঞে না।

বড় মজার দৃশ্য ! ছক থেকে মুণ্ডু ধরে দাবাড়ু একটি ঘুঁটি অল্প একটু তুলে একপাশে কাত করে ধরে আছেন। চাল ভাবছেন। এগোতে গিয়ে পেছিয়ে আসছেন। ঘুঁটির যাবার সময় হয়েছে। ঘরে স্থির হয়ে বসা আর চলবে না। খেলোয়াড়ের দ্বিধায় যাবো কি যাবো না ভঙ্গিতে ঘর ছুঁয়ে আছে। ঠিক আমার অবস্থা, একটা পা উঠে পড়েছে। আর একটা পা উঠল বলে। ডালে বসে থাকতে থাকতে পাখির ওড়া দেখেছ ?

আজ্ঞে না।

কি দেখেছ তুমি ! এবার দেরাদুনে গিয়ে, পাশেই ফরেস্ট, এই সব খুব ভালো করে লক্ষ করবে। পাখি যখন ডাল থেকে উড়তে চায় তখন তার চোখ দুটো দেখবে উদাস হয়ে যায়। ডানা দুটো বারকতক খুলবো কি খুলবো না করে, তারপর কিসের তাগিদে ঝপ করে উড়ে চলে যায়। আচ্ছা যে কারণে তোমাকে ডেকেছি, গেট রেডি ফর দেরাদুন। তোমার শীতের ভাল পোশাক আছে ?

আজ্ঞে না, কলকাতে হবে।

আজকালের মধ্যে অর্ডার দিয়ে দাও। শীত আসছে। ওখানে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি করাবে?

একটা গলাবন্ধ কোট।

শুধু ওপরের দিকটা ভাবলেই হবে না, তলার দিকটাও ভাবো। আমরা কি বলি? শীত করে, শীত পায়। তার মানে? করে মানে হাতে, পায় মানে পায়ের পাতায়। একটা গরম স্যুট করাও। টাকা চাই?

আজ্ঞে না।

না কেন?

আছে। দরকার হলে বলব।

না, তোমাকে আমি উপহার দোবো। এই এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি সম্পর্কটা ভাঙতে হবে। ওপন আপ মাই ডিয়ার বয়, ওপন আপ। আমি আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে দিচ্ছি, সামনের সপ্তাহে তোমাদের জন্যে দুন এক্সপ্রেসে টিকিট বুক করুক। শুক্রবার ভালো বার। রবিবার সকালে পৌঁছে যাবে। এখনো যথেষ্ট সময় আছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

আমি তা হলে এখন আসি। একটা কাজ চাপিয়ে এসেছি।

হ্যাঁ যাও। তিনটের সময় তোমাকে নিয়ে আমি টেলারের কাছে যাবো। সেই ভাবে নিজেকে ফ্রী করে

দুটো ব্লকের মাঝখানের খোলা বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে আমার একটা কথাই কেবল মনে হচ্ছিল, সওদাগরী অফিসের ওপরঅলারা কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত খুব একটা ভালো ব্যবহার করেন না। আমার বরাতে একি জুটছে। ঈশ্বরেরও তা হলে করুণা হয়। এক সঙ্গে সব দিক শুকিয়ে দেন না। নীলকণ্ঠের গানের মত, এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে তমকূলে সাজায়। বহু দূরে কোথায় কে জানে, তিনি বসে আছেন রত্নখচিত সিংহাসনে। তাঁর জানালায় সোনার গরাদ। আয়ত দুটি চোখ পড়ে আছে জীব জগতের দিকে। সবই দেখছেন। দেখেছেন, জীবনের ভাণ্ডার থেকে এ ছেলেটা তো কিছু পায় নি। যা ধরতে গেছে, সবই পালিয়েছে হাত ফসকে। একে কিছু দেওয়া যাক। একটু স্নেহ, দুটো ভালো কথা। যা পাওয়া যায়! যা আসে, আসুক সেই অপার করুণাময়ের হাত গলে। যা ই তা যখন পাই না, যা পাই তা মেনে নেওয়াই ভালো।

ল্যাবরেটারিতে ঘণ্টা দুয়েক চুটিয়ে কাজ করার পর জিনিসটা বাগে এসে গেল। কার ভেতর যে কী দশা হয়ে থাকে। চাবাগানের মেঝে ঝাঁট দেওয়া আবর্জনার মধ্যে কী ঐশ্বর্য! বিকার থেকে সলভেন্ট উড়ে চলে গেছে, পড়ে আছে ধবধবে সাদা মিহি গুঁড়ো, যার নাম কেফিন। দামী একটি ওষুধ। আজ আমার দিনটা খুব ভালো। পিতার এক পুবিয়া চায়নায় মাতামহ আরোগ্যের পথে। এম ডিকে গান শুনিয়ে খুশী করে দিয়েছি। বিকেলে যাবো স্যুটের মাপ দিতে। চলেছি হিমালয়ের কোলে দেরাদুনে বসবাস করতে। মনে হয় পদোন্নতিও হবে। কেমিস্ট্রিতে হাত পেকেছে। তার হালফিল প্রমাণ চোখের সামনে, বিকারে। প্রসেসটা কমার্সিয়ালাইজ করতে পারলে, টি-ওয়েস্ট থেকে কেফিন বের করে প্রতিষ্ঠান অনেক টাকা লাভ করবে। আর আমাকে পায় কে! আজ আবার জিমূতবাবু মাংসের কোর্মা চাপিয়েছেন। সুগন্ধে সব পাগল হয়ে যাচ্ছেন। আর মিনিট পনের পরেই তিনি আসছেন, নতুন ভাঁড়ে সিঁ সিঁ শব্দ ছাড়তে ছাড়তে।

মৃগ যেমন কস্তুরীর গন্ধে পাগল হয়ে যায়, আমিও তেমনি নিজের অহমিকায় বিভোর। ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠছি, আবার একটু নিচে নামছি। নিজেই নিজের গলায় বিজয়মালা পরাচ্ছি। কাঁধের পাশ থেকে কে বললেন, আপনাকে ডাকছেন।

এম ডি-র পিওন। কি ব্যাপার, এর মধ্যে তিনটে বেজে গেল। কই না তো, সবে একটা পনের। ভাব আর ভাবনার মাকড়সার জাল থেকে নিজেকে বের করে আনলুম। ঝুল বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে নাকে

নানারকম গন্ধ এসে লাগল। নিচের ফ্যাকট্রিতে সাবান তৈরি হচ্ছে। জুঁই ফুলের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। হঠাৎ অপর্ণার কথা মনে পড়ে গেল। এমন একটা ব্লাউজ পরেছে, গায়ের রঙের সঙ্গে জামার রঙ মিল গেছে। বুকের কাছে ছিলেকাটা সোনার হার দুষ্টু ছেলের মত চিকমিক করে হাসছে। শরীরের ভেতর কোথাও কোনও একটা কিছু মুচড়ে উঠল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ভিজে ভিজে বাতাসের মত সুখের অনুভূতিতে শরীর যেন অবশ হতে চাইছে।

এম ডি মৃদু হেসেই মুখ গম্ভীর করলেন। আমাকে বললেন, বোসো।

বসলুম। টেবিল আর সকালের মত খালি নেই। কাগজপত্রে ভরে উঠেছে। স্যাম্পল ভর্তি শিশি সারি সারি একপাশে। নিচের সিনথেটিক ল্যাবরেটারি থেকে ওপরে উঠে এসেছে। এম ডি স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছো ? স্থির আছ তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিজের ওপর নিজের কন্ট্রোল আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে, তুমি এখুনি একবার মেডিকেল কলেজে চলে যাও। আমি গাড়ি দিচ্ছি।

মেডিকেল কলেজে কেন ?

তুমি এমার্জেনসিতে যাবে। সেখানে তুমি পঙ্কজকে পাবে। হরিশঙ্করের অফিসের আরও কয়েকজনাকে পাবে।

সেখানে তারা কি করছেন ?

একদম উতলা হবে না। লাগাম টেনে রাখো। হরির মাইনর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ মনে হল আমি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছি। প্যারাচুটের দড়ি না খুললে প্যারাট্রুপারের মনের অবস্থা যেমন হয়, আমার মনের অবস্থাও সেই রকম হয়ে গেল। আকাশ বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে চলেছি নিচের দিকে। এরই মধ্যে শুনতে পেলুম, এম ডি বলছেন, বুঝতে পেরেছি। তোমাকে একা ছাড়া ঠিক হবে না। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। অনেক দিন আমার ওলড ফ্রেণ্ডকে দেখিনি। বহুবার বলেছি, আয় চলে আয়, আমার পাশে এসে দাঁড়া। পশ্চিমবাঙলার মাটিতে আচার্য রায়ের স্বপ্ন সফল করি। বোম্বাই আমাদের কান কেটে দিচ্ছে। শুনবে ? কারুর কথা শুনবে ? ভগবান একটা ষাঁড় তৈরি করতে গিয়ে হরিশঙ্কর করে ফেলেছেন। নিজের মাথার দাম নিজেই বুঝলো না। নাও চলো। গেট আপ।

এম ডি কি করছেন, কি বলছেন, দেখেও দেখছি না, শুনেও শুনছি না। কেমন যেন ভোরের কুয়াশার ভেতর বসে আছি। শীতের সকালে ময়দানের ছবির মত।

ধীরে ধীরে গাড়িতে এসে বসলুম। এম ডি আমার পাশে বসলেন। একটু আগে সাফল্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলুম। ভবিষ্যৎ উড়ে আসছিল, বার্ডস অফ প্যারাডাইসের মত রঙীন পাখা মেলে। আশঙ্কায় মন আর কোনও কাজ করছে না। স্থির হয়ে গেছে। দু'পাশ দিয়ে দৃশ্য ছুটে চলেছে। দেখেও দেখছি না।

এম ডি একবার শুধু বললেন, ঘটনার ওপর মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই পলাশ। যখন যা ঘটায় তখন তা ঘটবেই। আমরা শুধু দর্শক। তুমি অত মুষড়ে পোড়ো না। তুমিই না সকালে আমাকে গেয়ে শোনালে, কত ডুববে উঠবে জীবন তরী। চঞ্চলতা এনো না কো। এই তো তার হাতেনাতে পরীক্ষা।

মানুষ কি মন নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যায় আমার জানা নেই। আমার এই মুহূর্তের মনের অবস্থা দেখে হয়তো কিছুটা অনুমান করা যায়।

মেডিকেল কলেজের বিশাল চত্বরে গাড়ি এসে ঢুকলো। এপাশে ওপাশে এক একটা ব্লক ইটের দৈত্যের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত নিচু একটা সিঁড়ি দু'পাশ দিয়ে একটা চাপা বারান্দা মত

জায়গায় উঠে গেছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা, ব্লাডব্যাঙ্ক। পাশেই এমার্জেন্সি। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পঙ্কজবাবু। আমাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, অথচ আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। এম ডি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, চমকে উঠলেন —

এ কি আপনি ? না, না তুমি।

হ্যাঁ, আমি। ছেলেটাকে একা ছাড়ি কি করে। ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কি অবস্থা ? মারাত্মক কিছু !

তেমন মারাত্মক নয়। তবে হতে পারত। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তেমন হলে চোখ দুটো যেত।

ও তো একজন নামকরা পাকা কেমিস্ট। কি করে কি হল ?

আর বোলো না, এক জুনিয়ারের কীর্তি। কিসে কি হয় ধারণাই নেই। একোয়ারিজিয়া দিয়ে কি একটা করছিল, ফ্রেম কনট্রোল করতে পারেনি। এক টেস্ট টিউব মাল ছিটকে বুকে এসে পড়েছে। গেঞ্জিতে সোক করে, খুলে ফেলতে ফেলতেই ড্যামেজ হ্যাজ বিন ডান।

ডাক্তার অ্যাটেণ্ড করেছেন ?

হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্য ভালো, এমার্জেন্সিতে আজ তড়িৎ আছে।

তড়িৎ ! আমাদের সেই তড়িৎ ! যে বলত সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করব !

এখনও সেই ভাবই আছে। সুযোগ খুঁজছে। সংসারে একমাত্র বন্ধন মা। বুড়ী গেলে ওকে ধরে রাখা শক্ত।

চলো তা হলে, আমাদের বীর সৈনিককে একবার দেখে আসি। আজ ছাড়বে না রেখে দেবে ! পড়েছে তড়িতের হাতে। সহজে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হয় না।

যেতে যেতে পঙ্কজবাবু বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্কিনটা সামান্য পুড়ে গেছে। দিন পনেরর মধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে দেখবে। শুনলুম, তোমার মাতামহ ভীষণ অসুস্থ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালই অসুস্থ।

হরি সেই সব কথাই বলছিল, এমন সময় ওই কেয়ারলেস কেমিস্ট, সবই মানুষের নিয়তি ! কার যে কখন কি হয় !

এমারজেন্সিতে ঢুকতেই মাথা ঘুরে গেল। দিন আর কতটাই বা গড়িয়েছে, এর মধ্যেই আশেপাশে কত কি ঘটে গেছে। ফুটফুটে ডল পুতুলের মত একটি মেয়ে বাবার সাইকেলের পেছনে বসে ইস্কুলে যাচ্ছিল। স্পোকের মধ্যে পা ঢুকে চুলের বিনুনির মত পাকিয়ে গেছে। মেয়েটির পিতা হায় হায় করছেন, এ আমি কি করলুম, এ আমি কি করলুম।

খুড়ো ভাইপোর মাথায় শাবল ঝেড়ে দিয়েছে। মাথা একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেছে। পাশেই ছেলেটির মা দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে এনেছিলেন। রক্তে থানধুতি ভেসে গেছে। সঙ্গে একজন পুরুষ রয়েছেন। ভালো মানুষ স্কুল শিক্ষকের মত নিরীহ চেহারা।

কোন এক কারখানার কর্মী এসেছেন। মেশিনে হাত ঢুকে ডান হাতের তিনটে আঙুল কেটে ঝুলে পড়েছে। সঙ্গীসাথীরা, রক্ত দিতে হবে, রক্ত দিতে হবে বলে চিৎকার করছেন।

এক তরুণী শেষ রাতে বিষ খেয়ে বসে আছে। পেট থেকে পাম্প করে বিষ বের করার আয়োজন চলছে। মেয়েটির সাংঘাতিক চেহারার শাশুড়ী, মাকে শাসাচ্ছেন, কি মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন ! কুলটা। নিজে মরছে মরুক, আমার সোনারচাঁদ ছেলেটাকে জেল খাটাবার মতলব।

ডাক্তার আর সাদা পোশাক পরা সিস্টাররা ছুটোছুটি করছেন। সকলকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছিন্নভিন্ন এক একটি প্রাণী ওটিতে যাচ্ছেন। কারুর হাত যাবে, পা যাবে, কেউ সেলাই-ফোঁড়াই হয়ে বেরিয়ে আসবে। কারুর চোখ হয়তো আর খুলবেই না। কাঁদতে কাঁদতে এসে হাসতে হাসতে চলে যাবেন।

কেমন যেন দিশাহারা হয়ে যাবার মত অবস্থা। এই কুরুক্ষেত্রের কোথাও আমার পিতৃদেব নেই। তিনি বসে আছেন ভেতরের একটি বিশেষ ঘরে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পদ্মাসনে যেন ধ্যানে বসেছেন।

বুকে হলদে মলমের প্রলেপ। ডানা মেলে হলুদ রঙের একটি হাঁস যেন উড়ে চলেছে। সুন্দর চেহারার অবাঙালী একজন সিস্টার তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত। কিছুদূরে বসে আছেন ডাক্তারবাবু। তিনি নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমাদের দেখে পিতৃদেব উঠে দাঁড়াতে গেলেন। সিস্টার মৃদু ধমক দিলেন, ডোণ্ট মুভ, ডোণ্ট মুভ। আই হ্যাভ নট ফিনিশড্ ইয়েট।

ইনজেকসানের সিরিঞ্জে ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ভরতে ভরতে তিনি আমাদের দিকে ভুরু তুলে তাকালেন।

প্রথমে কথা বললেন এম ডি, কি রে, চিনতে পারিস?

পিতা দু'হাত তুলে বললেন, হ্যালো, মাই ওল্‌ড ফ্রেণ্ড।

হাত তোলার ফলে বুকে বোধহয় টান পড়ল। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মুখে ফুটে উঠতে গিয়েও উঠল না। হাসির তলায় চাপা পড়ে গেল। একেই বলে পুরুষ মানুষ। উত্তরাধিকার সূত্রে সিকির সিকি গুণও যদি পেতুম।

ইনজেকসানের শিশির রবার ছ্যাঁদা করে জল ভরতে ভরতে সিস্টার বললেন, ইওর রেস্টলেসনেস উইল বি কস্টলি ফর্ মি। মাইণ্ড ইট।

পিতা বললেন, আই অ্যাম সরি।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এ যেন কলেজ রিইউনিয়ন। চার বন্ধুর সঙ্গমে আমি এক উত্তরপুরুষ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। ওপাশে দগ্ধ জীবনের আক্রমণে শতছিন্ন প্রাণের আর্তনাদ, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জীবনমৃত্যুর সাপে নেউলে খেলা, এদিকে অতীতে বর্তমানে মহামিলন।

এম ডি বললেন, তড়িৎ দাড়িটাড়ি রেখে কি হয়েছিস! র‍্যাসপুটিনের মত চেহারা করেছিস।

ডাক্তার বললেন, তোর চেহারার মধ্যে একটা মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ভাব এসেছে রে। পশ্চিমবাঙলার নাম্বার ওয়ান শিল্পপতি।

পিতা বললেন, বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। উপায় নেই। থাইমলের দাগ লেগে যাবে।

সিস্টার পুট করে ওপর বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, নড়িবেন না, ছুঁচ ভাঙিলে বন্ধুগণ কিছুই করিতে পারিবেন না।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, পিতৃদেবের ডান চোখের ঠিক নিচে একটা পোড়া দাগ। একোয়ারিজিয়া সাংঘাতিক বস্তু। সোনা গলে যায়। মানুষ তো গলবেই। ওই জায়গাটার দিকে ডাক্তারদের এখনও চোখ পড়েনি।

ডাক্তারবাবু বললেন, একটু চা হোক।

তিনজনে সমস্বরে বললেন, হয়ে যাক। হয়ে যাক।

ওয়ার্ড বয় ছুটলেন, চা আনতে। মানুষের বুক বড় নরম জায়গা, সেখানে গরম হাইড্রোক্লোরিক আর নাইট্রিকের মিশ্রণ কি ক্ষতি করতে পারে ডাক্তার না হলেও আমার জানা আছে। শুধুমাত্র অসম্ভব মনের জোরে মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছেন। ছাত্রজীবনের বন্ধুদের সঙ্গে মাপা রসিকতা করে যাচ্ছেন।

চা শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন, নাও চলো, তোমাকে ভি আই পি কেবিনে পুরে দিয়ে আসি। আমাদের সেবা যত্নে দিন কতক থাকো।

তার মানে? তুমি আমাকে হাসপাতালে ভরে রাখবে? আমার দুঃস্বপ্নেও এমন সম্ভাবনা দেখিনি। এমন আহামরি কিছু হয়নি যে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

এম ডি বললেন, বার্নকেসে সেবাযত্নের প্রয়োজন। টোয়েন্টিফোর আওয়ারস্ সাফারিং। তুমিও কেমিস্ট্রি আমিও কেমিস্ট্রি। কিসে কি হয় ভালই জানিস। গোঁয়ারতুমি করিস নি।

আমার থাকার উপায় নেই।

পঙ্কজবাবু বললেন, ছেলের কথা ভাবছিস?

শুধু ছেলে কেন? শ্বশুর মশাই অসুস্থ। আমার ভরসায় এখানে আছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার বাড়ির দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

পিতা চেয়ার থেকে পা নামিয়ে জুতো খুঁজতে লাগলেন। তার মানে জুতো পরেই দৌড় মারবেন। কারুর ক্ষমতা নেই ধরে রাখে।

ডাক্তারবাবু উঠে এসে বললেন, হরি, নাউ আয় অ্যাম সিরিয়াস। এখন আর আমি তোর বন্ধু নই, ডাক্তার। জীবন নিয়ে খেলতে গিয়ে মৃত্যুকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমরা মৃত্যুর শত্রু। গেট আপ। তোমার ব্যাপারটাকে খুব সামান্য ভেবো না। পোড়ার ডিগ্রি আছে জানো! এটা তোমার কেমিস্ট্রি নয়। গেট আপ।

অসহায় মুখে পিতা উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু দিনের জন্যে নন প্লেয়িং ক্যাপটেন হয়ে গেলুম। সামলাতে পারবে তো!

সেই সর্তামার হাসি শুনতে পেলুম। গঙ্গার ঘাট ভেঙে ভেঙে উঠছেন আর বলছেন, ওই দ্যাখ তোর পথ। ফণীমনসার ঝোপের পাশ দিয়ে চলে গেছে অন্ধকারের দিগন্তে। জীবনের কাছ থেকে কিছু আশা করিসনি।

আব ইয়ে সমঝমে জফরকি আয়া
যো কুঁছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

নিখুঁত পরিপাটি বিছানায় মাতামহ বসে আছেন। চাদরের ওপর ধূসর একটি কম্বল বিছান। হাতে একটি বহুকালের পুরনো কীটদষ্ট বই। বইটি সামনে খুলে ধরে মাতামহ একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। সমস্ত পাতা পাঁপড় ভাজার মত মচমচে। দূর থেকে দেখছি, যেন ধ্যানস্থ মহাদেব।

আমার পদশব্দে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন। চোখ দুটি আরক্ত। জলে ছলছল করছে। মৃদু একটি হাসি ঠোঁটের কোণে নেমে এল। আমি জানি। আমি আজ এসেছি সব হাসি শুষে নেবার ব্লটিং পেপার হয়ে। যে সংবাদ বুকে চেপে রেখেছি, সে সংবাদ যেই লাফ মেরে নেমে আসবে বজ্রপতনের মত আতঙ্ক ছড়াবে।

মাতামহ বললেন, এসো লর্ড, তোমাকে আজ যেন একটু কমজোর মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল। বাবার অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।

অ্যাঁ, কি বললে? হরিশঙ্করের…!

মাতামহের হাত থেকে বইটি বিছানার ওপর খসে পড়ে গেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুড়ে গেছেন।

পুড়ে গেছে? ও তো পুড়েই আছে। আবার নতুন করে কি পুড়বে? এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয় নি তোর মনের মত। আরও পোড়াবে!

অ্যাসিডে বুক আর মুখের একটু পুড়ে গেছে।

তাকে কোথায় রেখে এলে?

হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে।

আমি যাবো। আমি এখুনি যাবো। সে এখন কেমন আছে? কথা বলছে? হাসছে?

হ্যাঁ কথা বলছেন।

তা হলে? ফিরে আসবে তো? না, সবাই যে ভাবে চলে গেল, সেই ভাবে চলে যাবে? অ্যাসিড নিয়ে সে কি করছিল? জানে না অ্যাসিডে মানুষ পুড়ে যায়? অ্যাতো জানে, এই সামান্য জিনিসটুকু

জানে না!

মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটো বেশ তপতপে ফুলে আছে। মুখটা আজ বড় বেশি ফর্সা দেখাচ্ছে। শরীরের রক্তস্রোতে ক্রমশই মনে হয় ভাঁটা পড়ে আসছে।

বউমা। মাতামহ গর্জন করে উঠলেন।

নিচের কলতলা থেকে কাকীমার গলা ভেসে এলো, যাই বাবা।

আমার জামা-কাপড় দাও।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কাকীমা দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারলেন।

আমার জামাকাপড় দাও। জান না কি হয়েছে? হরিশঙ্কর পুড়ে গেছে।

কি বললেন? কি হয়েছে বটঠাকুরের?

কাকীমা জলপায়ে ঘরে এলেন।

অ্যাসিডে পুড়ে গেছে। হাসপাতালে আছে। যে জাহাজে চেপে সমুদ্র পারি দিচ্ছিলুম সেই জাহাজ বুঝি এবার ডুবে যায় বউমা! সবই এই বুড়োর ভাগ্য। সুখ সইবে কেন? গাছতলায় যার আস্তানা, রাজপ্রাসাদে সেকি থাকতে পারে! আগুন লাগবেই।

আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন দাদু? সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি যে ঘরপোড়া গরু।

কাকীমা বললেন, একটু দাঁড়ান, আমিও যাবো।

আজ আর আপনাদের কাউকেই যেতে হবে না। আমি যাই। দু'একটা প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে আসি।

তুমি কি ভাবছ আমি মরে গেছি? অথর্ব হয়ে গেছি! তুমি জানো না, আমি সকলকে মেরে তবে যাবো। আমার পালা আসবে সব শেষে। আমি এক লোভী, ভোগী পুরুষ। জীবনে অনেক অপরাধ করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত করে আমাকে যেতে হবে সব শেষে। বেটী তুই হরিশঙ্করের দিকে হাত বাড়ালি কেন? অবিচার তোর আগাগোড়া। ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল। মিছে আশ ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পালা॥ পো-বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল। শেষে কচে-বার পেয়ে মাগো, পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥

কাকীমা অবাক হয়ে মাতামহকে দেখছেন। আমিও এমন মূর্তি কখনও দেখিনি। দু' গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। সংসার সমরাঙ্গনে পরাজিত নৃপতি আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

কাকীমা এগিয়ে গিয়ে মাতামহের হাত দুটো ধরে ফেললেন। শুধুমাত্র একটি শাড়ি একটু উঁচু করে পাক দিয়ে পরে আছেন। গায়ে জামা নেই। গা ধুতে ধুতে উঠে এসেছেন। উপায় ছিল না এর চেয়ে পরিপাটি হয়ে আসার। ইনি যেন আমার মাতামহের আর এক কন্যা।

হাত ধরে বিছানার দিকে নিয়ে যেতে যেতে কাকীমা বলছেন, বাবা, শান্ত হোন, শান্ত হোন, আপনার শরীর ভাল নেই। টলছেন। পড়ে যাবেন।

দু'জনে ধরাধরি করে বৃদ্ধ মানুষটিকে বিছানায় বসিয়ে দিলুম। কাকীমা প্রায় জড়িয়ে ধরে আছেন। নিয়তি নামক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অভিমানের তরোয়াল খুলে বারে বারে যুদ্ধে নামার চেষ্টা। অপরাজেয়কে যে পরাজিত করা যায় না! কে বোঝাবে সে কথা এই অভিমানী মানুষটিকে! মানুষ যদি বোকার মত কষ্ট পায় কিছু করার আছে? সংসার থেকে শুধুমাত্র আনন্দের অংশটি তুলে নেবার মত হাঁস কোথায় পাওয়া যাবে! তাহলে তো সকলকেই পরমহংস হতে হয়। এ কি সদলবলে মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনে আসা! এলুম একসঙ্গে, ফিরে গেলুম একসঙ্গে। অদৃশ্য মৃত্যুপুরুষ আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতো পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। কখন কোন্ সময় সে হঠাৎ গতি থামিয়ে দিয়ে বলবে, চলো, এবার তোমার ফেরার সময় হয়েছে, কেউ জানে না। সেই মহা অভিভাবকের অবাধ্য হবার ক্ষমতা কারুর নেই। মানুষের বৃথা এই আস্ফালন। আসলে মৃত্যুই আমাদের মধ্যে জীবিত হয়ে

ঘুরছে। আচ্ছা, চলি, বলে চলে গেলেই হয়ে গেল।

অতি কষ্টে মাতামহকে শান্ত করা গেল। গুম হয়ে রইলেন বিছানায়। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর তাহলে সে ফিরছে না! এই শূন্য বাড়ি। তুমি আর আমি আর বউমা!

যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমি আবার হাসপাতালে ফিরে গেলুম। দিনের চোখে নিদ্রা নামছে। দু'একটা আলো জ্বলেছে, তেমন জলুস নেই। পৃথিবী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ছোট্ট একটি কেবিনে শুয়ে আছেন পিতৃদেব। যে মানুষ সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে! আমার সঙ্গে খানকয়েক বইও আছে। এইবার সময়টা হয় তো সহজে কাটবে। আমার নিজের একবার অ্যাসিডে হাত পুড়েছিল। সেই সামান্য পোড়ার যন্ত্রণায় আমি একরাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। বুকের অনেকখানি জায়গা পুড়েছে। যন্ত্রণার তীব্রতা অনুমান করতে পারছি। যন্ত্রণার অংশীদার হওয়া যায় না। আনন্দ হয়তো ভাগ করে নেওয়া যায়। কষ্ট মানুষকে একাই ভোগ করতে হয়।

ঘরে আমিও ঢুকলুম, একজন সিস্টারও ঢুকলেন। খুবই কম বয়েস। ধরাচূড়া খুলে ফেললে মনে হতে পারে আমার বোন। মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের আবরণ। আমার হাত থেকে জিনিসপত্র একে একে বুঝে নিলেন। তোয়ালে, সাবান, কাপড়, ঢোলা জামা। চা আনতে বলেছিলেন, এক প্যাকেট ভালো চা। চিনির কিউব। কাপ ডিশ, চামচে, গেলাস, কেটলি, ছাঁকনি। ঝোলা থেকে একের পর এক জিনিস বেরুচ্ছে। যতটা সম্ভব বাড়ির পরিবেশে রাখার চেষ্টা। সে কি আর সম্ভব হবে। হাসপাতালও এক কারাগার, অসুখের কারাগার।

কেবিনের বাইরে উঁকি মেরে সিস্টার কাকে যেন ডাকলেন, সুখী, সুখী।

সাধারণ শাড়ি পরা এক মহিলা টুল থেকে উঠে এলেন। সিস্টার বললেন, প্রায় সব কিছুই এসে গেছে। বুঝে নাও। এঁর যখন যা দরকার হয়, কান খাড়া রাখবে, উঠে এসে দেবে। বসে বসে ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন।

সিস্টার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। হাই হিল জুতোর খুট খুট শব্দ চওড়া করিডরে দূর থেকে দূরে হারিয়ে গেল। মিষ্টি চেহারার শ্যামবর্ণা সুখী আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে টুলে গিয়ে বসল। সাদা ডোমে ঢাকা একটা ভুতুড়ে আলো দরজার সামনে কুয়াশার আঁচল পেতেছে।

পিতা ডাকলেন, এদিকে এসো।

কণ্ঠস্বর একেবারে পালটে গেছে। পুরোনো পিন দিয়ে রেকর্ড বাজালে যে রকম হয় সেই রকম খসখসে।

আপনার গলাটা এই রকম হয়ে গেল কেন?

ভোক্যাল কর্ড বেশ খানিকটা অ্যাসিড সোক করে ফেলেছে। ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন অ্যাফেকটেড। কথা বলতে গেলে বেশ লাগছে।

খুব কষ্ট হচ্ছে?

তা তো একটু হবেই। সহ্য করতে হবে। উপায় নেই। একে কি বলে জান, পিউরিফিকেসান অফ সোল। সুখে থাকলে মানুষ দেহ-যন্ত্রকে ভুলে যায়। এই যন্ত্রণায় আমি সব অনুভব করতে পারছি, হার্ট, লাংস, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, স্কিন, কিউটিস। চামড়ার আচ্ছাদনে একগাদা সেনসিটিভ যন্ত্রপাতি। হোয়্যার ইজ দি সোল? কোথায় সেই আত্মপুরুষ!

আমারও খুব জানার ইচ্ছে। হয়তো তিনি জানতে পেরেছেন। অসীম আগ্রহে বললুম, কোথায়?

নিচের দিকে নেই। হি মাস্ট বি সামহোয়্যার অ্যাট দি টপ। হি স্পিকস। আমারই কণ্ঠস্বর ধার করে তাঁর প্রশ্ন, তাঁর উত্তর। দেহবিদ খুঁজে পাবে না। খাঁচা খুললেই পাখি ঠিক উড়ে যায়। না, আর কথা বলব না। বেশ কষ্ট হচ্ছে। লেট মি সাফার অ্যালোন ইন সাইলেন্স।

হঠাৎ এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন? আপনি বলেছিলেন, অন্যায় আর পাপের পাথরে ধাক্কা না খেলে, জীবন তর তর করে স্রোতের টানে এগিয়ে যায়।

হ্যাঁ তা ঠিক। পাপের সূক্ষ্ম কাঁটা বড় সেনসিটিভ, চিন্তাতেও নড়ে ওঠে। আমি তো দেবতা নই, আমিও মানুষ। আমার লোভ আছে, লালসা আছে, হিংসা আছে, অন্যের অনিষ্ট চিন্তা আছে, কত কি আছে! মাছের আঁষটে গন্ধ আতরে ধুলেও কি যায় রে বাবা। অরক্ষিত মন পথের পাশে দরজা খোলা ঘরের মত। কখন কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে। অবারিত ব্যাপার। কত বার ধাক্কা খেতে খেতে, সাজা পেতে পেতে তবে মানুষ একটু মানুষ হয়।

আজ আমি এখানেই থাকি।

না, না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু তুমি কেন কষ্ট করবে? আমি এখন প্রোফেসনালদের হাতে। তাঁরাই হ্যাণ্ডেল করবেন। তা ছাড়া যন্ত্রণা নির্জনে সাফার করতেই ভালো লাগে। তোমার ওপর একজন বৃদ্ধ মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর ব্যাপার আরও সিরিয়াস।

আপনাকে একা ছেড়ে যেতে ভীষণ খারাপ লাগছে। বাড়ি একেবারে খাঁ খাঁ করছে। একা আমি থাকব কি করে? আপনার বিছানা শূন্য পড়ে থাকবে। ঘরে রাতের টেবিল ল্যাম্প জ্বলবে না। খাবার আসন পড়বে না।

উপায় নেই বাবা। পৃথিবীটাই এই রকম। কেউ হাসপাতালে যায়, কেউ বাড়ি যায়, কেউ মারা যায়, কেউ সেজেগুজে বিবাহ করতে যায়। কেউ জেলে যায়, কেউ বিদেশে যায়। কেউ মন্দিরে যায়, কেউ যায় নাচঘরে। সবই যাওয়া। যার যেমন গতি। রাত হচ্ছে। তুমি এবার এসো। বাড়িতে তোমার ভূমিকা এখন আমার ভূমিকা। আমার অনুপস্থিতি তুমি একটু ফিল করো। আজ যা সাময়িক কাল তা চিরকালের। মন খারাপের কিছু নেই। পুরুষ হও। পৌরুষ আনো। আবার কাল। যে জায়গাটা পুড়েছে, সে জায়গাটা বড় ভালো হে। হৃৎপদ্মে আগুন জ্বলছে। আচ্ছা গুড নাইট।

হন হন করে হাঁটিতে হাঁটিতে কলুটোলা পেরিয়ে প্রায় নেশাগ্রস্তের মত চিৎপুরে চলে এলুম। মানুষ যে সময় কাছে স্ত্রীকে পেতে চান, সে সময় সন্তান কিছু করতে পারে না। পিতার পাশে এখন আমার মাতার থাকা উচিত ছিল। সন্তান রক্তের অংশ হতে পারে, স্ত্রী হলেন মনের অংশ। আরও কাছের। দুঃখের, সুখের, দেহের। কি জানি, কি হয়!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। নাখোদা মসজিদের মিনে করা মিনার সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। সামনেই বিশাল প্রবেশপথ। হঠাৎ মনে হল আমি এক জাতিস্মর। বহুকাল আগে আমি এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতুম। হয়তো রাজা নবকৃষ্ণের আমলে, ভোলা ময়রার কালে। আমার একটা জুড়ি গাড়ি ছিল। শ'খানেক বছর আগের আমিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। চিকনের পাঞ্জাবি, জরির নাগরা, কানে আতর। অনেক রাত। পিরু মিঞার দোকানে ফিনফিনে রুমালি রুটি উড়ছে! কাবাবের গন্ধ ছুটছে। নিকি বাঈ ঘুরে ঘুরে ঘুঙুর পায়ে নাচছে।

অন্ধ একটি মানুষ সামনে হাত পেতে, লাঠি ঠুকঠুক করে চলেছে। মুখে হাঁকছে, আল্লা দেনেঅলা, আল্লা দেনেঅলা। হঠাৎ ভীষণ দাতা হবার ইচ্ছে হল। পুরো একটি টাকা হাতে ফেলে দিলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢক করে একটা শব্দ হল। পেছনেই জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের বিখ্যাত মাংসের দোকান। বৃহৎ একটি খাসীর পেছনের ঠ্যাংটি অস্ত্রের আঘাতে নেমে গেল। ত্রিপদ মৃত পশু ঘিনঘিনে চর্বির আস্তরণ নিয়ে পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল। বলছে, লোভ, লালসা, লালসা, লোভ। উলটো দিকের একটা দোকানে আজও সিককাবাব হচ্ছে যেমন হত একশো বছর আগে। কেন যে পা আমাকে আজ এদিকে চালিয়ে নিয়ে এলো।

আরে কে রে, পিণ্টু না?

প্রশ্ন এবং মানুষ দুটোই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে সুখেন আর জবা। সুখেনের হাতে নতুন একটা চামড়ার সুটকেস। চেহারা ভালই ছিল। আরও ভালো হয়েছে। জবার চেহারাতেও চেকনাই এসেছে। দেখলেই বোঝা যায় মা হতে চলেছে।

জবা বললে, আপনি এখানে কি করছেন? কারুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?

দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভীষণ আনন্দ হল। কি সুন্দর মানিয়েছে! জবা ফিরে

লাল রঙের একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে। আগেকার সেই চঞ্চল স্বভাব আর নেই। বললুম, না, কারুর জন্যেই দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ি ফিরছি।

সুখেন বললে, এ পথে কেন ?

এসেছিলুম মেডিকেল কলেজে। কি মনে হোলো, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম এদিকে।

হাসপাতালে আবার কি হল ?

সুখেনকে সংক্ষেপে সব বললুম। জবা বললে, আপনার তাহলে খুব বিপদ যাচ্ছে!

সুখেন বললে, তোর খুব তাড়া আছে ?

তাড়া মানে, যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায় ততই ভালো। তোরা কবে এলি, কোথায় আছিস ?

তিনদিনের জন্যে এসেছি। উঠেছি বালীগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। চল না, ওই রয়ালে গিয়ে একটু বসি। জবার ভীষণ চাঁপ খাবার ইচ্ছে। জানিস তো এই সময় মেয়েদের নানা রকম খাবার ইচ্ছে হয়।

জবা সুখেনের সুটকেস ধরা ডান হাতটা আদর করে খামচে দিল। রাস্তার দিকে মুখ নিচু করে বললে, অসভ্য !

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, বিশাল সুটকেস হাতে সুখেন এগিয়ে চলল, রয়ালের দিকে। বউকে আজ চাঁপ খাওয়াবেই রুমালি রুটি দিয়ে। জবা আমার পাশে পাশে ধীরে ধীরে হাঁটছে। শরীরের আয়তন বেড়েছে। আইবুড়ো বেলায় জবার একটা রিপু খুব প্রবল ছিল। সুখেনের হাতে পড়ে ভালই হয়েছে। মা হলে মনটা ঘুরে যাবে। ট্রামলাইন পার হবার সময় আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। চারপাশে লোকজন, যানবাহন, বেচারার ভয় করছে। হাতের তালু বেশ গরম। রক্ত এখনও শীতল হয়নি।

রয়ালের বাইরে বিশাল একটা উনুন। কাঠকয়লার আগুনের ওপর বিশাল এক কানা উঁচু পাত্রে ঘি আর মশলায় জবোজবো নিখুঁত সব মাংসের টুকরো। মৃদু আঁচে পুটপুট করে ফুটছে মানুষের রসনার সুখখণ্ড। আতরের ভুরভুরে গন্ধ। সুখেনের পেছন পেছন সিঁড়ির ধাপ ভাঙছে জবা। সিল্কের আবরণে শরীর টানটান। জবার দেহ সব সময়েই যেন গলা ছেড়ে চিৎকার করছে, আমাকে দ্যাখো, আমাকে দ্যাখো। অপর্ণার সঙ্গে কনকের সঙ্গে এই তফাৎ। মকর সঙ্গে কিছুটা মেলে। আমার মনে হয় মনের আকারের সঙ্গে মানুষের দেহের মিল থেকে যায়। মন অনুসারে দেহ সূক্ষ্ম হয়, স্থূল হয়।

ধপ করে টেবিলে একটা মেনু ফেলে দিয়ে গেল। এপাশে ওপাশে যাঁরা আহারে বসেছেন, সকলেরই চেহারা যেন কেমন কেমন। পাশবিক মানুষ দেখলেই যেন চেনা যায়। মাংস, মদ, মেয়েছেলে, সব নিয়ে একটা হাঁসফাঁস অবস্থা। দাঁতে মাংস ছিঁড়ছে। গজর গজর বকছে। হ্যা হ্যা করে হাসছে। গলগল ঘামছে। ঢুকে পড়ে বিপদ করেছি। ভেতরটা পালাই পালাই করছে।

জবা মেনু থেকে চোখ তুলে বললে, সব কিছুর বড্ড দাম যে গো! কি করবে ?

সুখেন আর আমি পাশাপাশি। জবা আমাদের উলটো দিকে। টেবিলে দু কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে আছে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, হাতে লাল সুতো দিয়ে একটা মাদুলি পরেছে। ব্লাউজের হাতা ফুঁড়ে লাল সুতোর ছোট্ট একটি অংশ বেরিয়ে এসে দোল খাচ্ছে। তেল চুকচুকে কপালে দিগন্তের লাল সূর্যের মত গোল একটি সিঁদুরের টিপ।

সুখেন অসহায়ের মত বললে, কি করবে তা হলে, অন্য কোথাও যাবে ?

সুখেন বউয়ের হাতে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ে বসে আছে। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। আমি বললুম, আপনি দামের জন্যে ভাবছেন কেন ? যা প্রাণ চায় খেয়ে যান। আজ আমি আপনাদের খাওয়াবো।

সুখেন বললে, তুই আপনি বলছিস কি রে ?

তাতে কি হয়েছে ! আমি চট্ করে কাউকে তুমি বলতে পারি না। নিন খাবার সিলেক্ট করে অর্ডার দিন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তুই খাওয়াবি ? চাকরি পেয়েছিস ?

হ্যাঁ রে।

সুখেন বললে, তবে আর কি ? চালাও চাঁপ, চালাও তন্দুর।

পরের পয়সায় খেতে তোমার লজ্জা করবে না !

না, বন্ধুর পয়সায় আবার লজ্জা কিসের ! তুমি জানো, আমার সব প্রেমপত্তর পিণ্টু লিখে দিত। কি ল্যাঙ্গোয়েজ ! তুমি অমনি কৃষ্ণের বাঁশী শোনা রাধিকার মত নেচে নেচে চলে এলে।

ও যে তোমার ভাষা নয়, তোমার লেখা নয় আমি জানতুম।

অর্ডার নিয়ে দোকানের কর্মচারী গম্ভীর মুখে চলে গেল। আমরা সামান্য পাতি খদ্দের। টেবিলে টেবিলে খাবার ব্যভিচার চলেছে। ঝাঁক ঝাঁক পায়রার মত ফড়ফড় করে নোট উড়ছে।

জবা বললে, এবার তাহলে একটা বিয়ে করে ফেলুন। না, করে ফেলেছেন ?

না, করিনি।

সেই মেয়েটি এখনও আছে ? খুব সুন্দরী।

না, তারা চলে গেছে।

সেই শাড়িটার খোঁজ করেনি ?

শাড়ি ! কোন শাড়ি ?

পাঁচিল টপকে এসে, আপনাব হাত থেকে যে শাড়িটা নিয়ে, পরে আমি চম্পট দিয়েছিলুম। মনে পড়ছে ?

ও হ্যাঁ, না সেটাব খোঁজ পড়েনি।

শাড়িটা আব নেই জানেন ! চুরি হয়ে গেছে। আমাদেব ওখানে যে কি চুরি হয়।

আমাদের নাকের পাশ দিয়ে খাবাব এসে টেবিলে নামল। দারুণ মোগলাই গন্ধ বেরলো। জিবে আধপোয়া জল। খাবাবেব প্লেট টানতে গিয়ে হাত যেন অবশ হয়ে এলো। এ আমি কি করছি ! পিতা হাসপাতালে, মাতামহ অসুস্থ। আমার সামনে মোগলাই খানা। তার সামনে পরস্ত্রী। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছি। এর চেয়ে স্বার্থপবতা আব কি হতে পারে ? এখন আব উপায় নেই। নাচতে এসে ঘোমটা টানা চলে না।

আপনি আমার থেকে একটু মাংস আর ঝোল নিন।

বাটি ধরা হাত জবার দিকে এগিয়ে গেল। সে, না না, একি কবছেন, এ কি করছেন, বলে দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধবল। শূন্যে চারটি হাত আর পোর্সিলিনের বাটি ঝুলে রইল।

হাত ছাড়ুন, আপনাব শাড়িতে পড়ে যাবে। আমি এতটা খেতে পারব না।

সুখেন বললে, দিচ্ছে যখন নিয়ে নাও। অনেকক্ষণ থেকে বলছিলে খিদে পেয়েছে।

তা বলে মরবো না কি !

মরবে কেন ? তুমি তো এখন দু'জন।

জবা হাত ছেড়ে, লজ্জায় মুখ নিচু করল। একটা তন্দুর, একটু ঝোল, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নিঃশব্দে আহার পর্ব চলেছে। জবা মাঝে মাঝে হুসহাস করছে একটু আধটু। গর্ভবতী রমণীর আহারের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। রয়াল রেঁধেছেও খাসা। যে দেহে নতুন একটি প্রাণ আসছে, সেই দেহের জিভ এমন জিনিসই পছন্দ করবে। সামান্য ঝাল লেগেছে। চোখ মুখ কেমন যেন বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। মৃদু মৃদু হাসছে। অন্যকে খাওয়ানোর এত যে তৃপ্তি, আগে কখনও বুঝিনি। তৃপ্তি মানুষের মুখকে দেবীর মুখের মত করে তোলে। কি থেকে, মানুষের মনে কি ভাব এসে যায় ! হঠাৎ মনে হল, আমি যখন গর্ভে ছিলুম, আমার মাও হয়তো এইভাবে সাধ খেয়েছিলেন। এমনি আগ্রহ নিয়ে, লাল একটি শাড়ি পরে। আজ আর আমার সে দৃষ্টি নেই, যে দৃষ্টিতে ছাদের ফুলগাছের টবের আড়লে থেকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতুম। অনেকদিন আগে। গা তখন শিরশির করে উঠত। মনে কু'ভাব আসত। মনটা বড় উৎফুল্ল হয়ে উঠল, এতদিনে, এতদিনে তা হলে মহিলাকে মা ভাবতে

পেরেছি।

বিলের টাকা দেবার জন্যে সুখেন লাফিয়ে উঠল। খবরদার! আমি দেবো বলেছি। সত্যভঙ্গ হবে।

খামচাখামচি করে সুখেনকে নিরস্ত করলুম। ঠাকুর বলে গেছেন, বিষয়ীর পয়সার খাবার মুখে তুলতে নেই। অন্তর পুরুষ সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। জবা বললে, আঃ, এরপর একটা পান খেতে পারলে যেন ষোলকলা পূর্ণ হত।

পান? পান খাবে, বলে সুখেন ঢাউস স্যুটকেস হাতে পানের দোকানের দিকে ছুটল। চারপাশে ভীষণ ভীষণ চেহারার মানুষের আনাগোনা। জবা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুচছে। সেন্টের গন্ধ উড়ছে।

জবা বললে, ভালো মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন। আমাদের ওখানে। দেখতে শুনতে ভালো। গান জানে, নাচ জানে। বাপের এক মাত্র মেয়ে। ভালো দেবে-থোবে। আপনার সঙ্গে বেশ মানাবে। ছিপছিপে চেহারা।

আমাব বিয়ে ঠিক হযে গেছে।

তাই নাকি! খবরটা এতক্ষণ চেপে রাখা হয়েছিল! আমাদের নেমন্তন্ন করবেন তো!

যদি হয় নিশ্চয় করব।

আবার যদি কেন? সামনের মাঘেই লাগিয়ে দিন। ও তখন তো আবাব ...।

জবা চোখ নামালো, নাঃ আমার আসা হবে না।

সুখেন এসে গেল, তুই পান খাবি?

আমি খাই না।

এঃ একটা তাহলে বেশি হয়ে গেল।

জবা বললে, আমাকে দাও। রুমালে মুড়ে রাখি। কাল খাওয়া যাবে। কি দাম নিলে গো?

কুড়ি পয়সা এক খিলি।

বলো কি? তোমায় নতুন লোক দেখে ঠকিয়েছে।

না, না, ঠকাবে কেন? মঘাই পান।

রাখো তোমার মঘাই। যা হয় একটা বললেই হোলো। এই বেড়ালই বনে গেলে বন বেড়াল।

না গো, দেখছ না কেমন সাদা সাদা। বরফে শোয়ান ছিল।

তোমার কলকাতা এক গলাকাটার জায়গা।

সুখেন ট্যাকসি ধরতে ছুটছিল। জবা হাঁ হাঁ করে উঠল, ট্রামে চলো, ট্রামে। অত বড়লোকি চাল ভালো নয়। ঢাউস স্যুটকেস আর একটা লাল বউ নিয়ে সুখেন ট্রামে উঠে পড়ল। যাবার সময় বলে গেল, একবার আমাদের ওখানে আয় না।

সুখেনের কি অদ্ভুত পরিবর্তন! ভেড়ার মত হয়ে গেছে। ঠাকুরের কথা মনে পড়ছে, সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

In the great crisis of life when existence itself is threatened the soul attains transcendent powers.

মানুষের জীবনে ভালো আর খারাপ একই সঙ্গে আসে। কালো আর আলো। আকাশে যখন মেঘের খেলা তখন বিশাল প্রান্তরে আলোছায়ার অদ্ভুত খেলা চলে। ছায়ার পেছন পেছন তাড়া করে আসে আলো। আলোর পেছন পেছন ছুটে চলে ছায়া।

লেটার বকসে পাশাপাশি দুটি চিঠি শুয়েছিল। কবে এসেছিল কে জানে? রোজ লেটার বকস দেখার অভ্যাস এ বাড়ির কারুরই নেই। চিঠি লেখাতেও আলস্য, চিঠি দেখাতেও আলস্য। চিঠি আদানপ্রদানের পরিসরও খুব কম। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা কে যে কোথায় আছেন আজও জানা হল না। আমাদের বংশের ডালপালা মনে হয় খুবই কম। নেই বললেই চলে? শাখাপত্রশূন্য একটি বৃক্ষকাণ্ড, একটি মাত্র লিকলিকে ডাল মেলে ঊষর প্রান্তরে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দুটির একটি খাম, আর একটি পোস্টকার্ড। দুটিই আমার নামে। আমার সেই মানুষ নামক জ্ঞানগর্ভ, এখান থেকে ওখান থেকে মারা প্রবন্ধটি একটি নামকরা মাসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। পত্রিকাটি বৃহৎ একটি ধর্মীয় সংস্থার। সন্ন্যাসী সম্পাদক লিখছেন,

মান্যবরেষু,

আপনার প্রবন্ধটি মনোনীত হয়েছে? দু-একটি জায়গা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট থাকায়, আপনাকে দেখা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যে কোনও দিন সকাল এগারোটার মধ্যে অথবা বিকেলে তিনটে থেকে ছটার মধ্যে দেখা করা যেতে পারে। ইতি সম্পাদক, নির্মলানন্দ।

সংক্ষিপ্ত চিঠি; কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী যে ঘুরছে এই প্রথম টের পেলুম। নিজের ভেতর নিজে লাফাচ্ছে। চারপাশ থেকে স্বপ্ন ঘিরে আসছে। সাংঘাতিক সেই প্রবন্ধ অবশেষে ছাপা হবে। জ্বল জ্বল করে উঠবে আমার নাম। নিজের হাতে নিজেই একবার হাত বুলোলুম। পাঁচটা আঙুল, একটা মাথা, সমবেত হয়ে পাতার পর পাতা অক্ষর সাজিয়েছে। ছত্রে ছত্রে মানুষনামক জন্তুর শ্রাদ্ধ। ভাব এসে গেল। চোখ ছল ছল করছে। ঠোঁটে ধরা পাত্র যেন শেষ মুহূর্তে হড়কে না যায়? যদি না যায় তা হলে বাকি জীবন আমি হোমাপাখির মত মহাশূন্যের ঊর্ধ্বলোকে লাট খেয়ে বেড়াব। পৃথিবীর মাস্তুলে আর পা ঠেকাবো না। শেলির স্কাইলার্কের মত দর্শনের গান গেয়ে ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে উঠে যাবো। উপায় থাকলে আজই ছুটে যেতুম। এখনও এগারোটা বাজেনি। উপায় নেই। কাকীমা খাবার তৈরি করছেন। আজ তিনি আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাবেনই। বাহাদুর এসেছে। মাতামহ তাকে ঘাটশীলার বাড়ির গল্প শোনাচ্ছেন। সুবর্ণরেখার স্বপ্ন দেখছেন। তিনিও যাবার বায়না ধরেছিলেন। ছেলেমানুষের মত ভুলিয়ে রেখেছি।

খামের চিঠিটা কার বুঝতে পারছি না। হাতের লেখা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। খামটা সাবধানে খুলতেই মুকুর চিঠি বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘ দু পাতা। মুক্তোর মত ছোট ছোট হাতের লেখা। পুঁতির কিংখাবের মত ঠাসবুনোনে সাজান।

এবার বুক কাঁপল অন্যভাবে। আর কেন? আবার কেন? আর আমার সময় নেই। পথ ঘুরে গেছে। মতির গতি অন্যরকম হয়ে গেছে। পিতা সেদিন পাপের কথা বলছিলেন। চমকে উঠেছিলুম। কার পাপে কি হয়ে গেল কে জানে। পিতৃদেব সব ব্যাপারেই একটু হুড়ুম দুড়ুম করলেও সাবধানী মানুষ। সব রকমের রিফ্লেকস অটুট আছে। তবু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কেন ঘটল? কেন কাল রাতে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলুম? গরদের শাড়ি পরে মা এসেছেন, মাথার সামনে। ভোরের ফিকে আলোয় চারপাশ গোলাপী। আমি যেন শুয়ে আছি, আমাদের খোলা ছাদে। আমি শুয়ে শুয়ে মাথার দিকে তাকিয়ে বললুম, মা তুমি? মা ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলেন। মুখে ফুটে উঠল সেই বিখ্যাত হাসি। যে হাসিতে গালে টোল পড়ত। মা বললেন, খোকা, তোর বাবাকে যদি নিয়ে যাই, তোর খুব অসুবিধে হবে? আমি ধড়মড় করে উঠে বসে বললুম, সে কি বলছ মা? মা বললেন, তুই তো বড় হয়েছিস। আমার যে বড় একা লাগছে! আমি ভীষণ জোরে, না বলে উঠলুম। অনেকটা ধমকের সুরে। মা যেন আমার শত্রু। এত জোরে না বললুম যে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও ভোর হয়নি। রাত তিনটে। ঘর অন্ধকার। ঘড়ি যেন অশরীরীর ভয়ে ঠক ঠক করছে। মনে এমন একটা ভয় হলো! পাশবালিশটাকে মা বলে আঁকড়ে ধরলুম। মনে হল জাহাজ ভাঙা নিঃসঙ্গ নাবিক অন্ধকার আকাশের তলায় উত্তাল সমুদ্রে মোচার খোলার মত ভেসে চলেছে। মৃত্যু সুনিশ্চিত। যতক্ষণ ভেসে থাকা যায়।

যতই দেখব না ভাবি, মুকুর চিঠির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। 'প্রিয় পলাশ'। পলাশ কারুর প্রিয় নয়।

কেন অশান্তি করছ মুকু ? 'তোমাকে একটা সুখবর দি ।' কার সুখবর ? তোমার না আমার ! আমার সব খবরই কুখবর । কবর খোঁড়ার খবর । 'আমি অনার্সে ফার্স্টক্লাস নিয়ে পাশ করেছি ।' ও তাই তো ! কয়েকদিন হল তোমার রেজাল্ট বেরিয়েছে । আমার নীরব অভিনন্দন গ্রহণ করো । 'এম. এ পড়ার জন্যে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো ঠিক করেছি । কই তুমি তো আমার চিঠির উত্তর দিলে না ! তোমাকে লিখতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে । জানি না, তুমি আমাকে কি ভাবছ ? মেয়েরা কোনও একজনের কাছে কিছু যে বলতে চায় ? সেই একজন যে কে, তাকি বলা যায় ? মানুষেই তো স্বপ্ন দেখে ? স্বপ্নও তো বাস্তব হয় ? বলো হয় না ? অপর্ণাকে আমার কিন্তু একেবারেই ভালো লাগেনি । বড় কাঁচা মেয়ে । কাঠের বন্দুকের মত সারা জীবন কাঁধে বয়েই বেড়াতে হবে । কেন তা জানি না । সে সব কথা তোমার কাছেই গোপন রেখো । ওপর দেখে মানুষ চেনা বড় শক্ত । সম্পর্কের খাতিরে সারাজীবন আমাদের অভিনয় করে যেতে হয় । মেয়েদের অভিধানে বিদ্রোহ শব্দটি নেই । লেখা পড়া শিখে আমরা স্বামীর ঘর করতে চলে যাই । এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারে । ভারত স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীন নই । তুমি কি হোম চৌধুরীর খোঁজ করেছিলে ?'

সে আবার কি ? এ যেন গোটা চারেক কিস্তি বাদ দিয়ে ধারাবাহিক উপন্যাস পড়া । কিছুই বুঝতে পারছি না । হোম চৌধুরীটা আবার কে ? মুকুর রেখে যাওয়া কাগজপত্র সব গভীর কুয়োর জলে । সলিল সমাধি হয়ে গেছে । জানার আর উপায় নেই । সব পারিবারিক গুপ্ত কথা লোপাট ।

বিকট শব্দে মোটরবাইক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল । কে আসতে পারেন ! ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ইনস্পেক্টার ! না কি পিতার কোনও বন্ধু ? মটোরবাইক-অলা বন্ধু তো কেউ নেই । মুকুর চিঠিটা সব আর পড়া গেল না । খামে ঢুকিয়ে রাখলুম । জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল । একজন পুলিস অফিসার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । চোখাচোখি হয়ে গেল । হাত নেড়ে নিচে ডাকলেন ।

হঠাৎ পুলিস কেন ? কি আবার হোলো । কিছুই তো বুঝতে পারছি না । সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে মনে মনে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম, না জেনে নিজেকে কোনও অপরাধে জড়িয়ে ফেলেছি কিনা ! একটা কথা ভেবে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল, ভদ্রলোক হাসপাতাল থেকে কোনও খারাপ সংবাদ আনেন নি তো ! ভাবা মাত্রই ভীষণ শীত করতে লাগল ।

পুলিস অফিসার রাস্তার ওপাশ থেকে এপাশে চলে এসেছেন । একেবারে সদরের সামনে । হাতে একটা সুটকেস । রাগী রাগী চেহারার বাইকটা ওপাশে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে । ভদ্রলোককে 'কি বলছেন.' বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরলো না । এই প্রথম অনুভব করলুম, চোর আর পুলিস দু'জনেই সমান । সামনে এসে দাঁড়ালে ভয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যায় ।

বিশাল আকৃতির মানুষটি বেশ মিষ্টি গলায় বললেন, প্রফুল্লবাবু এই নামে এ-বাড়িতে কেউ থাকেন ?

মনে হোলো একটা ঘুষি খেলুম । নাকটা যেন থেবড়ে গেল । প্রথমে মনে হল বলি, না । তারপর ভাবলুম, মিথ্যে বললে জল আরও ঘোলা হয়ে যাবে ! আমার তো কিছু জানার কথা নয় । আমি তো মর্গে কিছু দেখিনি । এই মুহূর্তে আমাকে অতি নিরীহ ভালো মানুষের অভিনয় করতে হবে । বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ থাকেন ।

তিনি এখন কোথায় ?

বেশ কিছুদিন হোলো বাইরে গেছেন ।

আপনি তার কে হন ?

কেউ না । আমাদের বাড়ির নিচের তলায় তিনি থাকেন । নিচেটা খালি পড়েছিল ।

প্রফুল্লবাবুর নিজের কেউ আছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্ত্রী আছেন ।

আমি ভেতরে আসতে পারি ?

হ্যাঁ আসুন না ।

আমি তার স্ত্রীর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

মনে হচ্ছে আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। সারা শরীর অবশ। পা যেন চলছে না। অভিজ্ঞ চোখে আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ ধরা না পড়ে যায়। আমি আগে আগে, জুতোর ভারি শব্দ তুলে পুলিস অফিসার পেছন পেছন উঠছেন।

দোতলায় উঠে এলুম কোনওরকমে। ভদ্রলোকের বিশাল চেহারায় ঘরের উচ্চতা কেমন যেন খাটো হয়ে গেল। আমাকে কিছু বলতে হল না। তিনি নিজেই চেয়ার টেনে বসে বললেন, তিনি কোথায়?

যেন তর সইছে না। কত তাড়াতাড়ি একটা মানুষকে গুঁড়ো করে ফেলা যায়, সুখের ডালিমকে দু হাতে নিঙড়ে রস ঝরানো যায়। চাপরাস পরা এই মানুষটির জগতে কর্তব্য ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ধীরে বললুম, বসুন, ডেকে আনছি।

ভেতরের ঘরে মাতামহ এখনও বাহাদুরের সঙ্গে বকবক করছেন। টের পাননি বাইরের ঘরে শমন এসে বসেছেন। গায়ে আইনের গন্ধ। মুখে মৃত্যুর শীতল হাসি। বৃদ্ধ সোনালি সুতো দিয়ে অতীতের জামদানী বুনে চলেছেন।

রান্নাঘরে কাকীমা বসে আছেন। হাসপাতালে যাবেন, সাজগোজ সারা। সাদা শাড়ি পরেছেন। পিঠে লুটোচ্ছে আঁচল, লতাপাতার কাজ করা। চান করেছেন। গাঁটবাঁধা ভিজে চুল কোমর ছাপিয়ে মেঝে ছুঁয়েছে। পরিষ্কার মাজা মুখে সিঁদুরের গোল টিপ চকচক করছে। ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ারে বাটির পর বাটি সাজিয়ে চলেছেন। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, বটঠাকুর যা যা ভালবাসেন সব আজ রেঁধেছি। কতো কম সময়ের মধ্যে সব করে ফেললুম বলো!

সবই শুনছি, কিছু বলতে পারছি না। কাকীমা আমার চোখের সামনে ভোরের কুয়াশার মত ক্রমশ সাদা হয়ে যাচ্ছেন। আমি অতি কষ্টে বললুম, ওসব এখন থাক। আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

বলেই মনে হল, গাছের গুঁড়িতে কাঠুরিয়ার শেষ কোপ পড়ল। বিশাল একটি গাছ বনের মাথা কাঁপিয়ে চারপাশে ভীষণ এক আলোড়ন তুলে আকাশ ছোঁয়ার আনন্দ ফেলে নেমে চলেছে মৃত্তিকার মৃত্যুর দিকে।

আমাকে আবার কে ডাকবে?

বাইরের ঘরে একবার আসুন।

হাতটা কোনওরকমে ধুয়ে কাকীমা আমার পেছন পেছন আসছেন। এখনও জানেন না কে এসেছেন। দরজার কাছে এসে হাত চেপে ধরে বললেন, এ কি! পুলিস! আমি তো কিছু করিনি।

অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন। কোনও ভয় নেই। পোশাক দেখে ভয় পাবেন না।

কাকীমা ঘোমটা টেনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। অফিসার বললেন, বসুন, আপনাকে দু-একটা জিনিস দেখিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

কাকীমা চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলুম। অফিসার বললেন, আপনিও আসুন। তা হলে একটু সাহস পাবেন ইনি।

অফিসার দু হাঁটুর ওপর সুটকেস রেখে ডালা খুলে ফেললেন। খুলতে খুলতে বললেন আপনার স্বামীর নাম প্রফুল্লচন্দ্র দাস?

কাকীমা ঘাড় নাড়লেন।

কতদিন হল বাইরে গেছেন?

খুব মৃদু সুরে কাকীমা বললেন, অনেকদিন।

কোথায় গেছেন?

কোন এক রাজবাড়িতে তবলা বাজাতে।

জায়গার নাম মনে আছে ?

না।

কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন ?

না।

এতদিন বাড়ি ছাড়া, চিঠিপত্র নেই, খোঁজখবর নেই, আপনি জানার চেষ্টা করেন নি, তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন ?

আমি কেবলই ভেবেছি, এই ফেরেন এই ফেরেন। আপনি কি তার কোনও খবব পেয়েছেন, কোথায় আছেন, কেমন আছেন।

উত্তেজনায় কাকীমাব মাথা থেকে আঁচল খুলে পড়েছে। অফিসার বললেন, উত্তেজিত হবেন না। আমার আবও প্রশ্ন আছে।

চেয়ারেব হাতল ধবে দাঁতে দাঁত চেপে কাকীমা কোনওরকমে বসে রইলেন। অফিসার সুটকেসের ডালার খাপ থেকে একটি ফটো বের করলেন, আচ্ছা দেখুন তো ইনিই কি আপনার স্বামী !

ছবি দেখে কাকীমা নীরবে ঘাড নাডলেন। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে খাদের দিকে নিয়ে চলেছেন। এ সেই ছবি। মর্গে শায়িত অবস্থায় তোলা। মুখ দেখে বুঝতে সামান্য সময় লেগেছিল। এইবার বুঝে ফেলেছেন। সিঙিমাছে কাঁটা মারলে মানুষ যে ভাবে লাফিয়ে ওঠে, কাকীমার সারা শরীরে একটা কাঁপন বয়ে গেল। একেবারে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে 'পিন্টু এ কি হোলো' বলে আঁচলে চোখ ঢাকলেন।

আমি ধীবে ধীরে শক্ত হয়ে উঠেছি। যা হবার তা তো হবেই। আর তো রোকা যাবে না। উল্কার বেগে ট্রেন ছুটে আসছে। লাইন ছেড়ে সরে যাবার আব সময় নেই। মাথা দিতেই হবে। ভদ্রলোক বোকাব মত ছবিটা কেন সবার আগে দেখাতে গেলেন ! সুটকেসে আরও তো অনেক কিছু দেখাবার ছিল।

কাকীমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, কি করে এমন হোলো ! কোথায় তাকে রেখেছেন ?

অফিসাব বললেন, স্থিব হোন, স্থির হোন। এখনও আমার অনেক প্রশ্ন আছে।

আব প্রশ্ন ! অনেক প্রশ্ন, প্রশ্নই থেকে যাবে। উত্তর আর পেতে হচ্ছে না। পাকা মানুষ, কি করে এমন কাঁচা কাজ করলেন ! ভাবনার এই মুহূর্তটিতে মাতামহ ঘরে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, একি, তোমাদের এসব কি হচ্ছে। বউমা।

কাকীমা কোনওরকমে উঠে দাঁডিয়ে মাতামহের প্রশস্ত বুকে আছড়ে পড়লেন। বাঁধ ভাঙা কান্না শুরু হোলো। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে ?

আমার দাদু।

কাকীমা ধীবে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসছেন। মাতামহের পায়েব কাছে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন। কিছু বুঝতে না পেরে মাতামহ বললেন, কি ব্যাপার বলো তো। হরিশঙ্কর ঠিক আছে ?

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে বউমা এমন ভেঙে পড়ল ?

প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন।

অ্যাঁ, সে কি ? কোথায় মারা গেছে ?

অফিসার উত্তর দিলেন, বসুন, সব বলছি। তার আগে কিছু কিছু জিনিস সনাক্ত করতে হবে। ওঁকে একবার দেখান তো, এই পাঞ্জাবিটা চিনতে পারেন কি না !

আমি বললুম আমি পাবি। পাঞ্জাবিটা প্রফুল্লবাবুর।

তবু একবার সামনে ধরুন না।

পাঞ্জাবিটার দিকে কাকীমা ফিরেও তাকালেন না। তাকাবার মত অবস্থাও নেই। কেমন যেন হয়ে গেছেন। অফিসার একটা বিড়ির কৌটো আর লাইটার বের করে বললেন, চিনতে পারেন ?

খুব পারি।

সুটকেসে আরও অনেক কিছু রয়েছে। সে সব আর বের করলেন না। যা যা বের করেছিলেন সব ঢুকিয়ে ফেললেন। বেরিয়ে এলো আরও গোটা তিনেক ফটো। ছবি তিনটে সুটকেসের ওপর পাশাপাশি ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কেউ কখনও এ বাড়িতে এসেছিল ?

দুজনকে চিনি না। তৃতীয় জনকে চিনি। সেই অষ্টাবক্র লোকটি, যে আমার ঘড়ি নিয়ে ভেগেছিল। একে চিনি বলতে গিয়েও বলা হল না। নিজেকে সামলে নিলুম। কি থেকে কি হয়ে যায়, বলা শক্ত। মনে হতে লাগল পুলিসের জাল ধীরে ধীরে আমার দিকেও এগিয়ে আসছে। এই মৃত্যুর খবর আমি যে অনেকদিন আগেই জেনেছি, অথচ বলিনি। অফিসার বললেন, কি হোলো চেনেন ? এসেছে কোনওদিন ?

না।

ওঁকে একবার দেখান।

কাকীমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যাবো। শেষ দেখা একবার দেখবো।

অফিসার বললেন, কোথায় যাবেন ? সব শেষ হয়ে গেছে। সে কি আজকের কথা ! অনেক আগেই আপনাদের খোঁজখবর করা উচিত ছিল। মর্গে আনক্লেমড ডেডবডি কতদিন পড়ে থাকবে।

মাতামহ বললেন, আপনাদের খোঁজ করা উচিত ছিল।

খোঁজখবর করতে করতেই ত এসেছি।

তাতে আমাদের কি লাভ হল ?

আপনাদের না হোক, আমাদের হল। কেসটা এখন সাজানো যাবে। তিনটেকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। খুনের উদ্দেশ্যটা তেমন ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। সব খুনেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় নারী, না হয় টাকা, বিষয় সম্পত্তি। দেখা যাক কি করা যায়। ভদ্রমহিলাকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন। দিন সাতেকের মধ্যেই কোর্টে ডাক পড়বে, তখন এই সব আর একবার সনাক্ত করতে হবে।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, ডেডবডি আপনারা পুড়িয়ে ফেলেছেন।

ভদ্রলোক সুটকেস হাতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, ডিসপোজড অফ। আচ্ছা আজ চলি, প্রয়োজন হলে আবার আসবো।

বাতাসে শব্দের ঘুসি মারতে মারতে মটোরবাইক দূর থেকে চলে গেল। ঘরের মাঝখানে কাকীমা উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে। আজ বড় পবিত্র সাজে সেজেছিলেন। সব চুরমার হয়ে গেল। মটোরবাইকের শব্দটা যেন বুক থেকে উঠে দূরে মিলিয়ে গেল। মাতামহ চেয়ারে স্তম্ভিত। হঠাৎ নুয়ে থাকা বাঁশের মত ছিটকে উঠলেন। সোজা দাঁড়িয়ে হাহা করে হাসতে লাগলেন। ভয় হল, পাগল হয়ে গেলেন না তো ! হাসি থেমে গেল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, সবই বেটির খেলা, সবই বেটির খেলা। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়; সুখের সংসার জ্বলেপুড়ে যায়।

কাকীমা ছুটে বাহাদুরের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে ছুটলেন। মাতামহ বললেন, এবার তা হলে কি হবে। এমন সুন্দর মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল। তুমি একবার দ্যাখো, কি করতে কি করে ফেলে।

শোবার ঘরের আয়নার সামনে কাকীমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের মুখোমুখি। সধবার সামনে বিধবা। প্রতিবিম্বের পাশে রাহুগ্রাসের মত আমার মুখের কিছু অংশ ভাসছে। কাকীমা আঁচল দিয়ে কপালের টিপটা ঘষে তুলে ফেললেন। সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেললেন ঘষে ঘষে। সেদিন দোরে ফেরিঅলা ডেকে শাঁখা পরেছিলেন। শাঁখাজোড়া নিজেই ভেঙে ফেললেন মটমট করে।

আমি সবই দেখছি। কিছু করার নেই। হঠাৎ আয়নার দিক থেকে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, চালো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বটঠাকুর না খেয়ে আছেন।

আচমকা আমি আবার একটা ধাক্কা খেলুম। মহিলা বলেন কি ? এত মনের জোর ! ইনি কি তাহলে সাধিকা। মায়া, মোহ, সংস্কার সব কিছু জয় করে বসে আছেন ! চিনতে ভুল হয়েছিল। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনি বলছেন কি ?

চোখের জল এখনও ভালো করে শুকোয় নি। ঠোঁট দুটো এখনও আবেগে কাঁপছে। পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন ধীর পায়ে। এতই কর্তব্যবোধ, যে এতবড় একটা শোক মিলিয়ে গেল, চাপা পড়ে গেল।

নিচু হয়ে টিফিন কেরিয়ার হাতে তুলে নিলেন। খরখরে সিমেন্টের মেঝেতে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল।দূরে চটকলের ভোঁ বেজে উঠল। অদ্ভুত তার বুকখালি করা স্বর। পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুর জন্যে সমবেত এক আক্ষেপ বাঁশী হয়ে কেঁপে কেঁপে বাজছে। ঠাকুর বলতেন সানাইয়ের সুরে সাধকের সমাধি হয়। এই বাঁশী শুনলে কি বলতেন!

হাতে টিফিন কেরিয়ার।সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা। কাকীমা আমার সামনে। চাপা গলায় বললেন, চলো।

আপনি যাবেন কি করে? এই অবস্থায়।

ভালো করে কথা বলতে পারছি না। এই প্রথম অনুভব করলুম, মন এক। আমার মন, তোমার মন, অহংবোধে খণ্ড খণ্ড। আসলে মন একটাই, বৃহৎ মন। তা না হলে আমার মনে হবে কেন, আমিও বিধবা হয়েছি! এই মহিলার শূন্যতা আমার মধ্যেও এসে গেছে।

কাকীমা নিজের মুঠোয় আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আর দেরি কোরো না। যাঁর কাছে গেলে আমি শান্তি পাবো তাঁর কাছে আমাকে যেতেই হবে।

মহিলাদের মন বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। শুনেছি ঈশ্বরও জানেন না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাতামহ উঁকি মেরে মেরে দেখছেন। মাতামহ জগৎমাতাকে চেনেন, সাধারণ রমণীর ব্যাপারে তিনি বড়ই অজ্ঞ। কতকাল হয়ে গেল মাতামহী চলে গেছেন। তারপর থেকে তো একেবারেই নাঙ্গাবাবা। স্ত্রীবিয়োগে স্বামীর অবস্থা স্মৃতিতে গাঁথা থাকলেও থাকতে পারে, স্বামী বিয়োগে স্ত্রীর অবস্থা জানবেন কি করে! মঞ্চভীত অভিনেতার মত উইংসের পাশ থেকে উঁকি মারছেন।

ওঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেলেমানুষের মত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চল্লে তোমরা?

হাসপাতালে।

বউমাও!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবু আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। কি তোমাদের বিচার। হরিশঙ্কর কি শুধু তোমাদেরই? আমার কেউ নয়!

আর একটু সুস্থ হলেই আপনাকে নিয়ে যাবো।

আর কত সুস্থ হবো বলতে পারো! আমার বয়েসের মানুষ আর কত সুস্থ হবে? তোমরা মানুষের বয়েসটা ভুলে যাও।

কাকীমা গড়গড় করে কলের পুতুলের মত কোনও দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলেছেন, সোজা সিঁড়ির দিকে। আর বেশি কথা বাড়াবার সময় নেই। ঠাস বাঁধাকপির মত এতকালের অবস্থা হঠাৎ শুকনো ফুলের মত ঝরতে শুরু করেছে। সব কিছু সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আর লাভ নেই। সময়ের চলন সহজে বোঝা যায় না। আজ যেন বুঝছি। মুহূর্ত নিমেষে মিনিটের সাঁকো পার হয়ে ঘণ্টার দিকে তর তর করে ছুটে চলেছে। কি দুর্বার তার গতি। একটা জিনিস এতকাল চাপা ছিল, হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ট্যাকসি চলেছে। পেছনের আসনে দু'জনের মাঝখানে টিফিন কেরিয়াব। এখনো গরম। কনুই লাগলে ছ্যাঁক করে উঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে কাকীমা বসে আছেন। কোথায় গেল আনন্দ, কোথায় সেই বেশভূষা! সময় কি আশ্চর্য জিনিস? মুহূর্তের চৌকাঠ ডিঙোলে কে যে কোথায় গিয়ে পড়বে জানা নেই। একটু আগে কি ছিল, একটু পরে কি হোলো। কিন্তু আমি তো এতদিন এই মুহূর্তটাকে ধরে রেখেছিলুম। প্রায় সফলও হয়েছিলুম। অনেক আগেই যা হোতো তা হয়েছে অনেক পরে। সময়ও তা হলে চুরি করা যায়:

দূরে মেডিকেল কলেজের হলদে বাড়ি। গাড়ি তো ঢুকছে। ভাবছি এবার কি হয়!

মনে করি এইখানে শেষ
কোথা বা হয় শেষ ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ ॥

হাসপাতালের লোহার খাটে পিতৃদেব বাবু হয়ে বসে আছেন। গায়ে একটি সিল্কের চাদর। জামা পবার উপায় নেই। পইতে গোল করে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন, বৈষ্ণবের কণ্ঠির মত। কোলের ওপর হলুদ মলাটেব একটি বই খোলা। দেখলেই চেনা যায়, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ। সেদিন বলছিলেন, ধর্মজগতে এই রকম একটি ক্যানডিড ডায়েরি আব দ্বিতীয় নেই। মানুষকে মানুষ বলে মেনে নিয়ে ধর্মের পথে এগিয়ে যাবার এমন শিক্ষা আর কোনও গ্রন্থে আছে কি না জানা নেই। খুঁজে দেখতে হবে। কোনও লুকোচুরি নেই, ওপব চালাকি নেই। পডতে পড়তে সেই কথাই আর একবার মনে হবে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। কেউ মোডকে মুডে দেবত্ব তোমাব খোলে পুরে দিয়ে যাবে না। ভেতরটাকে আগে খালি করো, ধুয়ে মুছে পবিষ্কার করো। এই আমিব মৃত্যু হলে তবেই সেই আমি এসে ধরা দেবে। সহসা একদা আপনা হইতে/ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে। গোস্বামীজী যদি আজ থাকতেন, ব্রহ্মচারীজী যদি থাকতেন, সামনে গিয়ে একবাব দাঁডাতুম। গুরু একদিনে যা পারেন, একা তা করতে কয়েক জীবন লাগে। দুর্ভাগ্য আমাব, এই ধর্মভূমি আজ শূন্য।

ঘবে ঢোকার আগে কাকীমা ফিসফিস কবে বললেন, খাবার আগে কোনও কিছু বলো না যেন ! অসুস্থ মানুষ, একবার মাত্র আহার করেন। সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমার যা হবাব তা তো হয়েইছে।

অবাক হয়ে মহিলাব মুখেব দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমি সন্তান হয়ে এই নিঃসঙ্গ মানুষটির জন্যে কখনো এভাবে ভাবিনি। ইনি কি তাহলে দেবী ! আমার চিনতে ভুল হয়েছিল।

গ্রন্থে বড তন্ময় হয়ে আছেন। মুখে কয়েকদিনেব না-কামানো দাডি একটা ঋষি ঋষি ভাব এনেছে। পেছনে ছবির ফ্রেমের মত জানালায় শবতেব নীল আকাশ। মেঘেব পেঁজা তুলো ভাসছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকালেন। চোখে অদ্ভুত এক সুদূরের দৃষ্টি। বেশ বোঝা যায় বহু দূরে চলে গেছেন। আমার অত্যন্ত ঈর্ষা হয়। অন্তরের হোমাগ্নি ধীরে ধীরে আমার চেয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এত কাণ্ড করে আগে শুরু কবেও আমি হেরে যাচ্ছি।

বই মুড়তে মুড়তে পিতা বললেন, এ কি, তোমবা এরই মধ্যে এসে গেছো !

এরই মধ্যে কি, আজ একটু দেবিই হয়ে গেছে।

বউঠান তুমিও আজ এসেছ ! আজকের দিনটা বড ভালো। আকাশের দিকে একবার তাকাও। মা আসছেন।

ভেবেছিলুম উত্তব দিতে গিয়ে কাকীমা হয়তো ভেঙে পড়বেন। অদ্ভুত সংযম। নিজেকে ঠিক ধরে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, পৃথিবী উলটে গেলেও আজ আমি আসতুম। কেউ আটকাতে পারত না।

সত্যিই তাই। ওব পৃথিবী তো উলটেই গেছে। পিতৃদেব পা নামিয়ে চটি খুঁজতে খুঁজতে বললেন, একদিকে আমি বড ভাগ্যবান। তোমাদের অযাচিত স্নেহ ভালবাসায় দিন আমার বেশ ভালই কাটছে। আচ্ছা প্রফুল্লব কোনও খবর পেলে ?

প্রশ্ন করে তিনি হাত ধোয়ার জন্যে ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি কাকীমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালুম। কী উত্তব দেবেন ? মিথ্যে বলবেন ? কাকীমা ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলেন। কী আশ্চর্য, আমাকেই সাবধান করছেন।

টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ার বেখে ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন, আপনি যা যা ভালবাসেন,

সবই আজ রেঁধেছি। জানি না তাড়াহুড়োয় কেমন হোলো ?

তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে টেবিলের কাছে এসে পিতা বললেন, তুমি এ কী করেছ বউঠান ? এত খাবার ক্ষমতা কি আমার আছে ? তোমার যত্নে, এই কদিনে আমার ভুঁড়ি নেমে গেল।

চাদরটা বুক থেকে সরে গেছে। সাবধানে চাপা দিতে দিতে বললেন, কী অস্বস্তিকর হয়েছে একবার দেখেছ ? ঘষা লাগলেই শিউবে উঠছে। ভগবান আর ক'দিন যে ফেলে রাখবেন !

কথা বলতে বলতে আহারে বসলেন। কাকীমা পাশে দাঁড়িয়ে বাটি সাজিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন। সরষে মাখা আস্ত একটি পার্শে মাছ ন্যাজা আব মুড়ো দুপাশে বেরে করে ধনুকের মত হয়ে আছে। কাকীমা তার ওপর ফোঁটাফোঁটা পাতিলেবুব রস ফেলছেন। কেউ জানে না, আমি জানি, এ হল চোখের জলের ফোঁটা। একই জগৎ মানুষের কাছে কি রকম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ! যিনি আহাবে বসেছেন, তাঁর আকাশে ঝলমলে আলো, যিনি আহার করাচ্ছেন তাঁব আকাশ কালো। আলো আব অন্ধকাবের কেমন পাশাপাশি অবস্থান।

পিতা খেতে খেতে বললেন, আজ যা রেঁধেছ বউঠান ! বহুকাল এমন সুস্বাদু বান্না খাইনি। আজ তুমি চুটিযে বেঁধেছ। এখন মনে হচ্ছে, আমি যদি হবিশঙ্কর না হযে ভীমসেন হতুম, তাহলে গোগ্রাসে সব খেযে ফেলতুম। রান্নাও এক সাধনা, তুমি সিদ্ধিলাভ কবেছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

কাকীমা হাসার চেষ্টা কবলেন। এইবার আর নিজেকে ধবে বাখতে পাবলেন না। বর্ষার প্রথম বৃষ্টির মত দু দানা বড বড অশ্রুর ফোঁটা টিন মোড়া টেবিলেব ওপব শব্দ কবে ঝবে পডল। পিতা হাত ধোয়াব জন্যে আসন ছেড়ে সবে উঠতে যাচ্ছিলেন, কাকীমার মুখেব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, কী হোলো ? আঘাত দিয়ে ফেললুম না কি !

কাকীমা দাঁতে ঠোঁট চেপে ভীষণ চেষ্টা করছেন, আর যেন কান্না না আসে। পারলেন না। বাঁধন আলগা হযে গেছে। গাল বেযে হু হু কবে জল নামছে। চোখে আঁচল চেপে ধরেছেন। এই প্রথম লক্ষ করলুম, ফর্সা গোল হাতে, কবজিব কাছে বক্তের ধাবা নেমে শুকিয়ে গেছে। জোর কবে শাঁখা ভেঙে ফেলার সময় অসাবধানে ফুটে গেছে।

পিতা উঠে দাঁড়িযেছেন। মাথায় দুজনেই প্রায় সমান সমান। দু'জনেরই সুঠাম শরীব। পিতাকে আজ বাজযোগীব মত দেখাচ্ছে। কাকীমা যেন নিরাভবণ আশ্রমবালিকা। কিছুই বুঝতে না পেরে পিতা আমাব দিকে তাকালেন, কি হোলো বলো তো !

আর চেপে রাখাব কোনও মানে হয় না। ধীবে ধীবে বলেই ফেললুম, প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন।

সে কি ? তা কি কবে হয় ? ওব তো মরার বয়েস হয়নি। আমাব চেয়ে অনেক ছোটো। আমি এখনো বেঁচে, সে কেন মরবে এত তাডাতাড়ি ! কোথা থেকে তোমরা খবর পেলে ?

একটু আগে বাড়িতে পুলিস এসেছিল, সি আই ডি।

কি হয়েছিল ?

খুন। মেবে ফেলেছে। পুলিস তিনজনকে অ্যাবেস্ট কবেছে।

সে কি ? ভদ্রলোকের ছেলে খুন হয় ? ভুল কথা, মিথ্যে কথা।

কাকীমা দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে একপাশে কাত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছেন। আমাকে আবার বলতে হল, আজ্ঞে মিথ্যে নয়, ওঁব শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস আমাদের দেখালেন, আব দেখালেন মৃত অবস্থায় তোলা একটা ছবি।

সে তো নিদ্রিত অবস্থাও হতে পারে !

আজ্ঞে না, ঘুমন্ত অবস্থা আর মৃত অবস্থার তফাত দেখলেই ধরা পড়ে।

পিতৃদেব কোনওরকমে হাতমুখ ধুয়ে এলেন। কী পরিহাস ভাগ্যের ! একটু আগে না জেনেই বলেছিলেন, আজ দিনটা কি ভালো ! নীল আকাশ। দ্যাখো মা আসছেন।

হাত মোছার কথা ভুলে গেছেন। মেঝেতে জল পড়ছে টপ টপ করে। ভিজে হাতেই বুকের কাছে চাদর চেপে ধরে বললেন, তা হলে কি হবে ? ডেড বডি আনার কি ব্যবস্থা হবে !

ডেড বডি আর নেই। ডিসপোজড অফ।

কেন, কার হুকুমে ?

মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে।

বাঃ বেশ মজা ! একপাশ দিয়ে নিঃশব্দে এলো, আর একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। কাউকে একবার জানতে দিলে না। ও কি ফুল ছিল, ও কি পাতা ছিল ! ও তো মানুষ ছিল। শিল্পী ছিল। অমন তবলা কে আর বাজাবে ? তা বলে বেঁচেও জ্বালাবে, মরেও জ্বালাবে !

পিতা ধীরে ধীরে কাকীমার দিকে এগোতে লাগলেন। আমার ভেতরটা বহুক্ষণ শূন্য হয়ে গেছে। সাধক এই শূন্যতায় ঈশ্বর লাভ করেন। আমি তো এক মিনমিনে কল্পবিলাসী। আমি আর কি পাবো ! পিতৃদেবের ডান হাত সামান্য ইতস্তত করে কাকীমার মাথার পেছন দিক স্পর্শ করল।

বউঠান,যা হবার তা তো হয়েইছে। সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর কি করার আছে ? ভাগ্যকে যে মানতেই হবে।

জলভবা চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে কাকীমা বললেন, আমি এখন কি করব ? আমি এখন কোথায় যাবো ? আমার যে কেউ নেই বটঠাকুর !

কেন, তোমার মামাশ্বশুর ? পয়সাঅলা মানুষ। ভোগ করার কেউ নেই।

প্রবল আতঙ্কে কাকীমা বললেন, না, না, মরে গেলেও আমি আর ওখানে যাবো না।

তা হলে, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। আমাদের জন্যে তুমি যা করেছ, সে ঋণ ভোলার নয়। আমাদের দিন চলে গেলে, তোমাধ দিনও চলে যাবে।

যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায় ?

তুমি যাবে না।

কি অধিকারে থাকবো ?

মহিলার আকস্মিক বাস্তববাদী প্রশ্নে আমার আদর্শবাদী পিতা থতমত খেয়ে গেলেন। মহিলারা সমাজ নামক প্যাঁচকলটিকে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি চেনে। কিছু ভেবে না পেয়ে পিতা বললেন, সে সব পরে ভাবা যাবে। তুমি থাকবে তোমার অধিকারে, আমাদের শ্রদ্ধার আসনে।

কাকীমা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হোলো না। ঘরে একসঙ্গে অনেকে এসে হাজির হলেন। সিস্টার, ডাক্তার, সেই কাজের মেয়েটি। ট্রেতে গরম জল, ভাসমান বরিক তুলো, ওষুধের শিশি, অ্যান্টিসেপটিক, ইনজেকসানের সিরিঞ্জ। লটবহরের শেষ নেই।

সন্ন্যাসীভাবাপন্ন সেই ডাক্তারবাবু কোনও দিকে না তাকিয়েই বললেন, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, একটু মেরামতির কাজ আছে। ভালই হিল আপ করছে। পারফেক্ট সিস্টেম। এই বয়েসে ভোগী মানুষের সুগার দেখা দেয়। তুই বেঁচে গেছিস। কৃচ্ছ্রসাধনের এই গুণ।

ডাক্তারবাবু নিজের খেয়ালে কথা বলছেন। সিস্টার মাঝে মাঝে কাকীমার দিকে তাকাচ্ছেন। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে। এক মহিলার আর এক মহিলার প্রতি স্বভাবসুলভ কৌতূহল। প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আর তেমন শোকাবহ নয়। আমারও চোখ আছে। সে চোখ জলে ঝাপসা নয়। বেমানান হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাকীমাকে আজ কালিদাসের বিরহী নায়িকার মত দেখাচ্ছে। উড়ু উড়ু চুল, ছলছলে চোখ। সাদা শাড়ি। উত্থান পতনে জায়গায় জায়গায় সামান্য ধুলোময়লা লেগেছে। জানি, আমার এ দৃষ্টি ভালো নয়। জানলে কি হবে ! বিল্বমঙ্গলের সাহস কোথায় ! কাঁটা ফুঁড়ে অন্ধ করে দিতে পারছি কই !

সিস্টার হঠাৎ হাসপাতালের কণ্ঠে বললেন, ঘর খালি করুন, ঘর খালি করুন।

কাকীমাকে কি তাঁর অসহ্য মনে হচ্ছে ! তাই নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে ব্যস্ত ? পিতৃদেব বললেন, তড়িৎ আজ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার আর পড়ে থাকার উপায় নেই। চারপাশ থেকে চাপ আসছে প্রচণ্ড।

আর দু-একদিন, তারপর ছুটি।

না, আজই। আমার আর উপায় নেই।

বাড়িতে এই সব ড্রেসিংট্রেসিং তোমার করবে কে? ট্রেইনড হ্যাণ্ড চাই।

ও আমি নিজেই করে নিতে পারব।

দিন দুয়েক বাড়ির বাইরে থাকলে, কি এমন হবে?

সে তুমি বুঝবে না ডাক্তার! অনেক রকম সমস্যা এসে গেছে।

সেভেন্টি পারসেন্ট সেরে এসেছে অবশ্য। ছেড়ে দেওয়া যায়। সিস্টার, ছাড়া যায়?

আমাদের সেবা যত্ন ওঁর যখন সহ্য হচ্ছে না, তখন তো ছেড়ে দিতেই হবে।

পিতৃদেব আশার আলো দেখতে পেলেন, তাহলে ড্রেসিংটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। একটা ট্যাকসি ডেকে আনুক, ওদের সঙ্গেই চলে যাই।

সিস্‌টার আবার বললেন, ঘর খালি করুন, ঘর খালি করুন।

লটবহর নিয়ে আমরা বাইরে এসে লম্বা একটা বেনচে বসে পড়লুম। সময় ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। চাদরে ঢাকা একটা দেহ চাকা লাগান স্ট্রেচারে চেপে আমাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরে চলে গেল। একটি মাত্র মানুষ, একটি মাত্র দেহ, শূন্য করিডর। পায়রা ডাকছে একঘেয়ে মন কেমন করা সুরে। অন্ধকার অন্ধকার জায়গায় পালিশ করা ঢাউস বেন্‌চে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে, পৃথিবী যেন থেমে গেছে। আমাদের কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। মাঝে মাঝে পুরনো দিন উঁকি মেরে যাচ্ছে। প্রথম যেদিন দু'জনে এলেন। সাজিয়ে গুজিয়ে সংসার পাতা। ঘোর বর্ষণে ভেজা। মুখোমুখি বসে লুডো খেলা। সরষের তেল আর পেঁয়াজ মেখে মুড়ি খাওয়া। ঝালে হুস্‌ হাস্‌ করা। এই পৃথিবীতে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। আজ এক রকম কাল এক রকম। মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে পৃথিবী এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

ডাক্তার আর সিস্টার দু'জনে মার্চ করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় একবার মাত্র আমাদের দু'জনের দিকে তাকালেন। পৃথিবীতে সকলেই বড় ব্যস্ত। ঘরের দরজার সামনে এসে পিতৃদেব আমাদের ইশারায় ডাকলেন। অ্যান্টিসেপটিকের চড়া উগ্র গন্ধ বেরোচ্ছে।

আচ্ছা, তুমি তাহলে এবার একটা ট্যাক্‌সি ডেকে আনো। আমি রেডি।

ট্যাকসিতে উঠে ঘড়ি দেখলুম, বেলা দুটো বেজে পনের মিনিট। আজ আর মাতামহের আহার জুটলো না।

সব দিক কি সামলান যায়! পেছনের আসনে দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন। আমি সামনের আসনে। আমাদের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, বাইরের জগতে কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। পৃথিবীর সাংঘাতিক হজম শক্তি। মাতামহের জন্যে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। মাঝে মাঝে চিন্তাও হচ্ছে, পিতৃদেব এই সমস্যার কি সমাধান করবেন!

বাড়ি ফিরে একটি অসহায় ছবি দেখা গেল। বাহাদুর রকে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। খিদেতে মুখ শুকিয়ে গেছে। মাতামহ মা-হারা শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাশ বালিশটা খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে।

ঘরে পা দিয়েই পিতৃদেব বললেন, তোমাদের কারুরই নিশ্চয় খাওয়া হয়নি। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার নার্ভ ভীষণ শক্ত, তোমার নার্ভ বউঠান আরও শক্ত। টেম্পারড স্টিল। এতটুকু জানতে দিলে না!

পিতার গলা পেয়ে মাতামহ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। মুখের অবস্থা দেখে মনে হল, যেন স্বপ্ন দেখছেন! ভাবাবেগে মুখে কথা আটকে যাচ্ছে, তুমি এলে হরিশঙ্কর! তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে, মাথা ঘুরে আবার বিছানাতেই বসে পড়লেন। শিশু যেমন অনেক দিন পরে প্রবাসী পিতাকে দেখে আনন্দ পায়, বৃদ্ধের চোখ মুখে সেই রকম আনন্দ খেলছে। পিতৃদেব এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিলেন।

মাতামহ বললেন, শুনেছ নিশ্চয়, আর একজন চলে গেল! বুঝলে, এরা সব মজা পেয়ে গেছে,

শাসনের বাইরে চলে গেছে। আসছে যাচ্ছে। সবই যেন নিজেদের খেয়াল খুশি ! পৃথিবী একটা কুৎসিত জায়গা। তুমি আছ বলেই থাকতে ইচ্ছে করে, তা না হলে কবে পগার-পার হয়ে যেতুম। বড় ভয় হয় হরিশঙ্কর ! যেই যাবো, আবার সঙ্গে সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

আপনি কিছুই জানেন না, এটা আপনার শেষ জন্ম। আর আপনাকে আসতে হবে না।

ধুৎ, তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে। আমাকে এখনও বার তিনেক আসতে হবে। আবার সেই নবধারাপাত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, স্কুল, নিলডাউন, বেত্রাঘাত। আবার সেই টোপোর মাথায় পিঁড়েতে বসা, আবার সেই এক এক করে চলে যাওয়া। পরের বার তোমাকে যেন একটু আগেভাগে পাই বাপু ! এবার তুমি বড় দেরি করে ফেলেছ। সামনের বার আমি গৌরীদান করব। তখন তুমি যেন আবার না না করে বেঁকে বোসো না। আর আমিও মেয়েটাকে প্রথম থেকেই খুব যত্ন করব। স্বাস্থ্যই সম্পদ। অসুখ করলে হাতুড়ে আর ডাকবো না। প্রথম থেকেই ভালো ডাক্তার। পয়সা একটু বেশি লাগে লাগুক, একেবারে বিধান রায়। ওই হেড়ম্ব কবিরাজ আর নয়। হ্যাঁগো, তোমার এটা শেষ জন্ম নয় তো ! আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ?

আমাকে এখনও লাখোবার জন্মাতে হবে। কয়লা ধুয়ে ধুয়ে হীরে। আপনার এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি, এই অবেলায় না খাওয়াই ভালো।

মাতামহ অবাক হয়ে বললেন, কেন, আমার আজ খাওয়া হয়নি ? কে বললে খাইনি ?

কাকীমা ধরা-ধরা গলায় বললেন, না, খাওয়া হয়নি। আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল।

মাতামহ প্রতিবাদের গলায় বললেন, কে বললে আমার খাওয়া হয়নি। তোমরা বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাও।

পিতৃদেব উৎকণ্ঠিত মুখে মাতামহের দিকে তাকালেন। বুঝতে পেরেছি কিসের আশঙ্কায় তাকাচ্ছেন ! মাতামহের স্মৃতি নষ্ট হয়ে আসছে না কি ? যাকে বলে ভীমরতি। মাতামহও বুঝতে পেরেছেন। এক গাল হেসে বললেন, একদিন খাওয়া হয়নি তো কি হয়েছে ? সারা জীবন তো খেয়েই আসছি। কতজনকে খেলুম বলো তো ?

এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলার সময় এ নয়। তবু বলছেন। এলোমেলো কথা বলে সময় নিচ্ছেন। এমন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, যার সমাধান খুব সহজ নয়। কাকীমা দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতেই বসে পড়েছেন। কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন। স্বামী অপঘাতে মারা যাবার পর কি কি করার আছে, শাস্ত্রের কি বিধান আছে, এঁরা মনে হয় সঠিক জানেন না। এখুনি আমাকে ছুটতে হবে কুলপুরোহিতের কাছে। অশৌচ হবে কি না, শ্রাদ্ধশান্তির প্রয়োজন হবে কি না, জেনে আসতে হবে। হলে কোথায় হবে ? কে করবে ? বংশধর তো কেউ নেই।

মাতামহ বললেন, তুমি কি খুব পুড়ে গেছ হরিশঙ্কর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বেশ ভালই পুড়েছি। শরীরটা মনে হয় দাগরাজি হয়ে গেল। ভেবেছিলুম অক্ষত শরীরে চিতায় শোবো, সে আর হোলো না।

অত ভেবো না হরিশঙ্কর, ক্ষত আর অক্ষত, আগুনের কাছে সবই সমান।

না, সে অনেক পরের কথা। আসুন এখনকার কথা ভাবা যাক। এই মহিলাটির কি হবে ?

বউমার ? কি হবে বলো তো ? বেচারা এত বড় এই পৃথিবীতে একেবারে একা হয়ে গেল। পাশে তো কাউকে দাঁড়াতে হয়।

কে দাঁড়াবে ?

কেন, আমরা সবাই মিলে দাঁড়াব। আমরা সব বউ মারার দল। এইবার আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব।

সমাজ ?

জুতো পেটা। তুমি জানো, যৌবনে আমার মেজাজ আর শক্তি দুটোই ছিল। মুখের চেয়ে হাত দুটোই চলত বেশি। সমাজের কাছ থেকে আমরা কি পেয়েছি হরিশঙ্কর ! উৎসবে, পালপার্বণে, অনেক তো পাতা পেড়ে খাওয়ান হয়েছে, সেজেগুজে গিয়ে অনেক উপহার দিয়ে আসা হয়েছে, লাভ কি হয়েছে ?

এই তো তুমি হাসপাতালে পড়েছিলে, ক'জন পাড়ার লোক তোমাকে দেখতে গিয়েছিল ?

তা না যাক, সমাজের কিছু নিয়ম তো মেনে চলতেই হবে ! বুঝতে পারছেন কি বোঝাতে চাইছি ?

খুব পারছি। বদনাম একবার রটে গেলেই হোলো। তা সে পথ তো আমি মেরে রেখেছি। মাথার ওপর বসে আছি এক পাকা বুড়ো। আমি থাকতে থাকতেই নাতিটার বিয়ে দিয়ে দাও। অনেক মৃত্যু দেখলুম হরিশঙ্কর, এইবার একটা ভালো কিছু দেখি। মৃত্যু কি মূর্খ ! ব্যাটা বেহেড, গবেট। জানে না বারে বারে এলে মৃত্যুর ধার কমে যায়। যারা যাত্রার পালা লেখে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে নিজেরই উপকার হত। মাঝে মাঝে একটু নাচগান, বিবাহ-জন্ম, হাসি-তামাশা না ঢোকালে দুঃখের জোর বাড়ে না। এলিয়ে যায়। বিয়েটা লাগিয়ে দাও হরিশঙ্কর। সানাই বাজুক। অনেক দিন লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা খাইনি। শাঁখের শব্দ, উলুধ্বনি। কোমর বেঁধে লেগে পড়ো। দরজায় দরজায় আলপনা। সিল্কের ঝালর, ছাদে ম্যারাপ। রজনীগন্ধার গন্ধ। আহা নাকে যেন এখনও লেগে আছে। রজনীগন্ধার গন্ধ নাকে এলে তোমার মন কেমন করে না হরিশঙ্কর ! আমার যে কত কথাই মনে পড়ে !

পিতৃদেব বললেন, ও সব কথা এখন থাক। আমার মনে হয় মামাশ্বশুরের কাছে থাকাটাই সেফ হবে।

কাকীমা সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি তুলে, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, না, না। এর চেয়ে আমার আত্মহত্যা করাই ভালো।

পিতৃদেব বোঝাতে চাইলেন, কেন বউঠান, তিনি তোমার আত্মীয়, আমরা তোমার পাশে থাকবো।

উত্তরে, আঁচলে মুখ ঢেকে কাকীমা ছেলেমানুষের মত মাথা ঝাঁকালেন।

দুই অভিভাবক পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত বসে রইলেন। কঠিন সমস্যা ! জোর করে একজন অসহায় মহিলাকে তো আর দূর করে দেওয়া যায় না। ভগবানের তাজ্জব খেলা। খোঁড়ার পা-ই গর্তে পড়ে ! যাঁর কেউ কোথাও নেই তাঁর স্বামীটিকে কেড়ে নিলেন।

কাকীমা হঠাৎ বললেন, আপনারা কোনও বাড়িতে আমাকে একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়ে দিন। কোনও রকমে আমার দিন চলে যাবে।

মাতামহ বললেন, তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। যা-তা আবোলতাবোল বোকো না। হরিশঙ্কর রাগী মানুষ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার কথা শুনে রেগে গেছে।

পিতা বললেন, না, আজ আর রাগারাগি নয়। আজ আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আজ আর কোনও আলোচনাও নয়। তবে মামাশ্বশুরকে খবরটা দিতে হবে। খবর তো দিতে হবে বউঠান !

কাকীমা নিরুত্তর।

খবর না দিলে খারাপ দেখাবে। আমাদের দোষারোপ করবেন।

কাকীমা নিরুত্তর।

মাতামহ বললেন, তুমি এখন আর ওকে খোঁচাখুঁচি কোরো না। এমন একটা কিছু করো যাতে বেচারা শান্তি পায়। কি করলে মানুষ শান্তি পায় বলো তো ?

শান্তি ! সংসারী মানুষ পায় না। শান্তি পেতে হলে সন্ন্যাসী হতে হবে। সংসারে শান্তি নেই। সাময়িক যুদ্ধবিরতি আছে। ভুলে থাকা যায়, শান্তি পাওয়া যায় না।

কি ভাবে তা হলে ভোলান যায় ?

সময়। সময়ের স্রোত পলি ফেলতে ফেলতে দুঃখ সুখ সবই চাপা দিয়ে দেবে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মত, কোনও দিন খুঁড়তে খুঁড়তে এক একটা স্মৃতি বেরিয়ে আসবে। দুঃখের স্মৃতি, সুখের স্মৃতি।

তা যা বলেছ ! কত কি-ই তো আমাদের জীবনে ঘটে গেল, সব কি আর মনে আছে ! টেনে বের করলে তবেই বেরোয়। এস্রাজ বাজাতে বাজাতে তোমার ওই আঙুলের কড়ার মত, জীবন যত দিন যায় তত দরকচা মেরে যায়।

পিতৃদেব ঘড়ির দিকে তাকাতে না তাকাতেই, চারটে বাজতে শুরু করল। শেষ ঘণ্টাটি বেজে যাবার

পর বললেন, এইবার একটু চায়ের জোগাড় করা যাক। আপনিও হাল্কা কিছু একটা খান।

তুমি চায়ের কি জোগাড় দেখবে ? সে তো আমাদের হাতে।

কাকীমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়লেন, আমি চা করে আনছি। বাবাকেও খেতে দিচ্ছি।

মাতামহ বললেন, আজ আর তোমার কিছু করে দরকার নেই।

পিতা বললেন,'সেটা ঠিক হবে না। নিজেকে যত কাজে ব্যস্ত রাখবে ততই ভালো। আমি তো তাই করেছিলুম। ওর মা মারা যাবার পর আমি সারা দিনরাত নিজেকে গাধার মত খাটাতুম। রাতেও ছাড়তুম না। সারা রাত বসে বসে অঙ্ক কষতুম। একটা টেলিস্কোপ কিনেছিলুম। সারা রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। সেই সময় আমার কত কি যে দর্শন হয়েছিল!

কি দেখেছিলে হরিশঙ্কর ? গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু!

সে সব তো ছিলই। প্রকৃতির জিনিস। অতিপ্রাকৃত কত কি যে দেখেছি! একদিন দেখলুম একটা মালা ভেসে চলেছে। দুধের মত সাদা আলোর ফুলে গাঁথা গোড়ের মালা। দুলে দুলে ভেসে চলছে।

অ্যাঁ বলো কি ? তুমি তো তা হলে সিদ্ধপুরুষ হরিশঙ্কর। আমি শুনেছি। কখনও দেখিনি। ওই মালা কোথায় যায় জানো ? কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দিরে। তোমার হয়ে গেছে। তুমি পেয়ে গেছ।

আর একদিন কি দেখলুম জানেন ? একটা সোনার খাট ভেসে চলেছে। ধীরে ধীরে পালতোলা নৌকোর মত।

মাতামহ আর কথা বলতে পাবলেন না। চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ যেন ভেঙে পড়লেন, যা ভেবেছি তাই হরিশঙ্কর। এই তোমার শেষ জন্ম। ওই পালঙ্ক তোমার! দেখা দিয়ে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলুম। তোমার সঙ্গে আবাব দেখা হবে সেই তিনশো বছর পরে। তিনবার আসবো। তিনবারেব মেয়াদ শেষ করে তারপর ফিরে যাবো।

মাতামহ স্তব্ধ। ঘর স্তব্ধ। উত্তরের রান্নাঘরে প্রাইমাস স্টোভ হু হু করছে।

There is no path in the sky and a monk must find the inner path.

তুমি তা হলে কি করবে পলাশ ?

আজ্ঞে, বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমি দেরাদুন যাই কি করে ?

আমিও তোমাকে এখুনি যাবার জন্যে পেড়াপেড়ি করছি না। আমি বরং আগে ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দি। অ্যাডভান্স পার্টি। তারপর তুমি আর আমি দু'জনে যাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমি দুচারদিনের জন্যে চট করে একবার সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি।

সে মন্দ হবে না। বাবা প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছেন।

তোমার দাদু কেমন আছেন ?

মোটামুটি ভালই, তবে অসুখটা তো তেমন সুবিধের নয়। দুটো কিডনীই ড্যামেজ হয়ে গেছে।

দুই রুগীকে তুমি একা সামলাচ্ছ কি করে ?

আমি ঠিক একা নই। একজন মহিলা আছেন। বাবার এক পরিচিত ভদ্রলোকের স্ত্রী। আমাদের বাড়ির নিচেব তলায় এসে উঠেছিলেন। ভদ্রলোক খুব সুন্দর তবলা বাজাতেন।

অতীতকালে চলে গেলে কেন ?

আজ্ঞে, তিনি আর নেই। মারা গেছেন।

কবে মারা গেলেন ? ওই বাড়িতেই ?

আজ্ঞে না। তিনি কোথায় কোন রাজ এস্টেটে যেন বাজাতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ফেরার নাম

নেই। এই দিন কয়েক আগে এক সি আই ডি অফিসার এসে খবর দিলেন ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। মর্গে পড়েছিলেন আনক্লেমড হয়ে। ডেডবডি যথাসময়ে পাচার হয়ে গেছে।

বলো কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মহিলার কেউ কোথাও নেই। তিনিও বিপদে পড়েছেন, আমরাও সমস্যায় পড়েছি। মহিলা অসম্ভব কাজের, সংসার মাথায় করে রেখেছেন। তিনি না থাকলে আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে যেতুম।

যাক ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বইছেন। কিন্তু এরপর তো থানা-পুলিস হবে। হবে না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিস তিনজনকে পাকড়াও করেছে। বলেও গেছেন কোর্টে কেস উঠলে মহিলাকে হাজিরা দিতে হবে।

দ্যাখো দিকিনি হরিটা আবার এক উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। ওই জন্যে সংসার খালি রাখতে নেই। তোমার জন্যে বিরাট এক স্যাক্রিফাইস করতে গিয়ে বেচারার জীবনে ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই জুটলো না। তোমরা সব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী করো, এত বড় একজন সর্বত্যাগী গৃহী সন্ন্যাসী হিমালয় চষে ফেললেও পাবে কি না সন্দেহ! নির্লোভ, আদর্শবাদী, জিতেন্দ্রিয়। সংকল্পের কি দৃঢ়তা! তুমি খুব ভাগ্যবান পলাশ! হরির রক্ত তোমার শরীরে, সেই জন্যে তোমাকে আমি শুধু ভালবাসি না, শ্রদ্ধাও করি। দেখো এই মানুষটির প্রতি কখনও কোনও অবিচার যেন না হয়। হীরের মত যত্ন করে রাখবে। বেশ ওই কথাই তা হলে রইল। আর হ্যাঁ, তুমি রোজ সকাল সকাল বাড়ি চলে যেও। ওই আটঘণ্টা থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি ফ্যাকট্রিকে বলে দিচ্ছি, দশ বারো বোতল ভিটামিন নিয়ে যাও, বাবাকে নিয়মমাফিক খাওয়াও, শরীরটা তাড়াতাড়ি সারবে।

পিতার প্রশংসায় সন্তান খুশি হয়, সন্তানের প্রশংসায় পিতা। কিন্তু এম ডির একটা কথা কাঁটার মত বিঁধে রইল মনে। স্যাক্রিফাইস। আমার জন্যেই আমার পিতা আজ নিঃসঙ্গ। জীবধর্ম ত্যাগ করে ঊর্ধ্বচারী সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ বিশ বছর লোটাকম্বল সম্বল করে ওই ভগ্নপ্রাসাদে স্মৃতির স্তূপে বসবাস করছেন। নিজের কণ্ঠস্বরই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর। স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে স্বপ্ন আমাকে ঘিরে। পিতার সন্তান-স্বপ্ন বাঁধা-রাস্তাতেই চলবে। সফল জীবিকা, সম্পদ, সুখের সংসার, সন্তান সন্ততি, পিতৃআজ্ঞাপালনকারী। জীবনের পালে বাতাস যখন মৃদু হয়ে আসবে তখন বৃদ্ধ হরিশঙ্কর, ত্যাগী সংযত হরিশঙ্কর, ক্যামেরার সামনে হাসি হাসি মুখে এসে বসবেন, কোলে, একটি দেবশিশু, টাঁপা টাঁপা, গোলাপী গাল, কুঁচফলের মত চকচকে চোখ, সদ্যোজাত দাঁতে হাসির জলতরঙ্গ, এপাশে আধঘোমটা টানা টইটম্বুর যুবতী, ওপাশে ঈষৎ গর্বিত একটি যুবক, অগ্রগামী হরিশঙ্করের পশ্চাদগামী যুবক হরিশঙ্কর। সুখের সংসারের ছায়া ধরা রইল ব্রোমাইড কাগজে। বসে আছেন পক্ককেশ পিতামহ হরিশঙ্কর, দাঁড়িয়ে যুবক হরিশঙ্কর, কোলে শিশু হরিশঙ্কর। তিনটি জেনারেশন সময়ের আঙিনায় কুচকাওয়াজ করে চলেছে। মানুষের টানে সোনপাঁপড়ির সুতোর মত সময় লম্বা হয়ে চলেছে। ট্র্যাডিশানের ছায়া লম্বা হয়ে চলেছে মানব-মনুমেন্টের দিকে।

বেলাবেলি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনের অবস্থা তেমন ভালো নয়। জীবনটা কেমন যেন মিইয়ে আসছে আবার। ভবিষ্যতের দিকে একটা রাস্তা খুলছিল। কোথা থেকে কোথায় চলে যাওয়া যেত। দেরাদুনে প্রবাস। পদোন্নতি। সুন্দরী স্ত্রী। মাঝে মাঝে মুসৌরী। গানহিল, লালটিব্বা থেকে হিমালয় দর্শন। চাকরিটা নেহাত খারাপ ছিল না। এ লাইনে পাকা হাত, কাজ জানা লোকের বেশ ডিম্যাণ্ড আছে। সবচেয়ে বড় কথা খোদ মালিকের স্নেহ ভালবাসা।

হাতে বারো ফাইল ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স প্যাক করা একটা কার্টন। ওজন নেহাত কম নয়। নড়বড়, নড়বড় করতে করতে চলেছি। আজ আমি সেই পত্রিকা অফিসে যাবই। স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। মনে হচ্ছে জীবনে আবার গ্রহণ লাগবে। তার আগেই সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। আমার চিন্তায় ভবিষ্যৎ যখন উঁকি মেরে যায়, ভালোই হোক আর খারাপই হোক, তখন তা ফলবেই। এ আমার কি ধরনের শক্তি ঈশ্বরই জানেন।

আজ শহরে খুব হাওয়া ছেড়েছে। সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। বাতাসের দাপটে পড়ন্ত বেলার রোদ যেন গুঁড়ো হলুদের মত উড়ছে। আকাশের মাঝখানটা মরকতমণির মত নীলচে সবুজ। বিন্দু বিন্দু চিল উড়ছে। বিকেল যেন গিলে করা পাঞ্জাবি পরে ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছে, ফুরফুরে মেজাজে।

ওষুধের কার্টুনটা আজ অফিসে রেখে এলেই হত। একটা হাত জোড়া হয়ে আছে। এমন কাউকে দেখছিনা যাকে ভিটামিন দেওয়া যায়। দিতে চাইলেও নেবার লোক নেই। কত দাতা এই ভাবে জগৎ জুড়ে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্কের কোনায় অন্যদিন এক অসুস্থ বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখি, আজ সেও নেই। কাল রাতে মারাই গেল কিনা কে জানে।

পত্রিকাব অফিস আর আশ্রম একই বাড়িতে। বড় মনোরম জায়গা। পশ্চিমে গঙ্গা। একপাশে ভদ্রগোছেব ছোট একটা বস্তি। বস্তির ঘরে ঘরে শিল্পকর্ম চলেছে। টেলারিং, বই বাঁধাই, শাল রিপেয়ারিং। কালো পিচের বাস্তা এইবাঁর সাবাদিনের উত্তাপ ছাডতে শুরু করেছে। একটা চাপা কলের সামনে মেয়েবা জল নিচ্ছে। এক জনেব খোঁপায আবার ফুলেব মালা। জল, যৌবন, মালা, বৈরাগ্য সব কিছুব পাশাপাশি অবস্থান। সময সময মানুষের কি বকম অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। পাছাপাড় শাড়িপরা খলবলে এক মহিলাকে দেখে ভীষণ ইচ্ছে হল ভিটামিনের শিশিগুলো সব দিয়ে দি। তাজা শরীর আরও একটু তাজা হোক। হাসির ধাব আরও একটু বাড়ুক। যারা আনন্দে আছে, তারা আরও একটু শক্তি লাভ করুক। দিতে গিয়ে মাব খেয়ে মরি আব কি!

আশ্রমের দরজাব সামনে কালো রঙের একটা মটোর দাঁড়িয়ে। বাড়িটার ওপব দিকে পশ্চিমের রোদ লেগেছে। বড় হবাব এই মজা! অনেকক্ষণ আলোয় থাকা যায়। অফিস ঘরে সুন্দর চেহারার এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। স্বাস্থ্য দেখলে তাক লেগে যায়। মুখে অপূর্ব এক জ্যোতি। অন্তরে সব সময যেন হাসছেন। সেই হাসির ঝিলিক লেগে আছে চোখে। সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, গান ফুবনো জলসাঘর। গান থামলেও ঝঙ্কার ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। এঁর সামনে আমার এই ভিটামিনেব কার্টুন যেন এক উপহাস।

সন্ন্যাসী চোখ তুলে তাকালেন। সামনে পড়ে আছে হিসেবের জাবদা খাতা। প্রশ্ন করলেন না, তবু প্রশ্ন বযেছে। ভাবের ভাণ্ডাবীব ভাষাব প্রযোজন খুব কম। আমি বিনীত ভঙ্গীতে বললুম, মহারাজ স্বামী নির্মলানন্দেব সঙ্গে দেখা কবব। এই যে তাঁর চিঠি, আমাকে দেখা কবতে বলেছিলেন।

এক নজরে চিঠিটা পড়ে ফেলে মহারাজ বললেন, আপনি বসুন।

কালো বঙের পালিশ করা চাবপাঁচ খানা চেয়ার। একটায় ধীরে ধীরে সংযত হয়ে বসে পড়লুম। ভেতরে বেশ এক ধরনেব গাম্ভীর্য আসছে। শান্তি নামছে। তেমন আর ভয় করছে না। চতুর্দিকে রাশি রাশি বই। স্বামীজীর ওপর, বামকৃষ্ণের ওপর। ধর্ম আছে, দর্শন আছে। সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ। দেয়ালে ঝুলছে স্বামী বিবেকানন্দেব বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ, ধ্যানস্থ রামকৃষ্ণ। আমার একেবারে চোখেব সামনে থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তোলা স্বামীজীর সেই ছবিটি। বড বড় চুল। মুখে স্মিত হাসি। চোখ দুটো জ্বলজ্বল কবছে। তেজের সঙ্গে প্রেম মিশে অদ্ভুত এক মুখচ্ছবি। জলে যেন আগুন লেগেছে। সারা ঘরে ধূপেব গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মহারাজের শরীরেও সুন্দর একটা গন্ধ। সারা শরীরে যেন হোমের গন্ধ। গোস্বামীজী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে বলেছিলেন, গায়ে হোমের ধোঁয়া মাখবে, শরীর পবিত্র হবে। মন ঘুরে যাবে। নির্দেশ পালন করে মাসখানেকেব মধ্যে ব্রহ্মচারীজীর তাই হয়েছিল। আমার কি হল? মন বলছে, আজ যেখানে এসেছ, তোমাকে তোমার ভবিতব্য সেখানে টেনে এনেছে। জীবনের গতি এবার ঘুরে যাবে। গোলক-ধাঁধা থেকে বেরোবার পথ পেয়ে যাবে। আজকেব দিনটা খেয়াল করে রাখিস।

মহারাজ ইন্টারন্যাল ফোনে স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামাতে নামাতে বললেন, বসুন আসছেন।

চিঠিটা ফেরত দিতে দিতে এক নজরে আমাকে আর একবার দেখে নিলেন। মনে হচ্ছে কত কালের চেনা। মানুষ যেমন নিজের হাতের, কি পায়ের দিকে ভাল করে তাকায় না, কোনও দিন ভাল করে

তাকালে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এই আমার হাত, হাতের আঙুল ! কি আশ্চর্য ! আমারও সেই রকম মনে হতে লাগল, এ সবই আমার চেনা, ভীষণ চেনা। কোনও দিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম, আজ আবার ফিরে এসেছি। তাই হই হই অভ্যর্থনা নেই। ঘরের লোক ঘরে ফিরে এসেছে। এই কিছুদিন আগে চিৎপুরে বড় মসজিদের সামনে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, আমার ভীষণ চেনা জায়গা। খুব অস্বস্তি হয়েছিল। চুলকোচ্ছে অথচ শত চেষ্টাতেও ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ডানপাশে ঘাড় ঘোরালেই আমি একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে ওপরে। মহারাজ হাসি হাসি মুখে আবার কাজে মন দিয়েছেন। স্বামীজী সামনের ছবি থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কি যেন বলতে চাইছেন ! হয়তো বুঝেছি ! বলছেন, উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। মাঝে মাঝে সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছি। স্বামী নির্মলানন্দ ওই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবেন। আর তখনই আমার জীবনের গতি পালটে যাবে। গলিঘুঁজির পথিক হঠাৎ বেরিয়ে পড়ব দিগন্তঘেরা মহাপ্রান্তরে। বিশাল এক ঈগল ইঁদুরের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে একেবারে পাহাড় চূড়ায়।

তরতর করে নেমে আসছেন স্বামী নির্মলানন্দ। জলের ছন্দে নেমে আসা দুটি পা, গৈরিক বসনের নেচে ওঠা প্রান্ত দেখতে পাচ্ছি। সাধকের শরীর যোগ-প্রভাবে এই রকমই লঘু, গতিময় হয়। আমি পড়েছি। নামার এই ধরনও একপ্রকার প্রাণায়াম। ব্রহ্মচারীজীর ডায়েরিতেই আছে। সাধকদের ক্ষিপ্ত হাত-পা ছোঁড়া অকারণ নয়। গুহ্য কারণে ভরা।

সিঁড়ির শেষ ধাপ লাফিয়ে নেমে স্বামীজী ঝড়ের গতিতে অফিস ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, কোথায় সেই ভদ্রলোক ?

যে ঘরে আমি একাই বসে আছি, সেখানে ভদ্রলোক কোথায় জিজ্ঞেস করার মানেটা কি ? তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম, আজ্ঞে, আমি !

স্বামী নির্মলানন্দের ক্ষুরধার চেহারা। শরীরে মেদ নেই। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। গায়ে ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, গেরুয়া রঙে ছোপানো। তার ওপর একটি উত্তরীয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা। উজ্জ্বল দুটি অনুসন্ধানী চোখ আমার দিকে স্থির হয়ে আছে।

মহারাজ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। বলশালী, ভোগী মানুষের লোলুপ হাসি নয়। সাধকের স্ফটিক স্বচ্ছ, জল-কল্লোলের হাসি। যেমন হঠাৎ শুরু, তেমনি হঠাৎ থেমে যাওয়া। ঠোঁটে শেষ সূর্যের আভার মত সামান্য একটু লেগে রইল।

তুমি পলাশ চট্টোপাধ্যায় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দু'হাতে আমার দুটো কাঁধ ধরে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিলেন। পড়েছিলুম শার্লক হোমস কৃশকায় ছিলেন। কিন্তু শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। স্বামী নির্মলানন্দের ঝাঁকানিতে, সব কিছু যেন ঝরে পড়ে গেল। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, মলিনতা, নীচ চিন্তা। সব ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে গেল। পায়ের নীচে। যেন সহস্র ধারার উষ্ণ জলে স্নান করে উঠলুম। ধ্বংস স্তূপে জেগে উঠল স্বর্গীয় পাখি, ফিনিকস্।

স্বামীজী বললেন, ভেবেছিলুম ষাট বছরের কোনও বৃদ্ধকে দেখবো। তুমি ত যুবক হে ! চলো ওপরে আমার ঘরে চলো।

স্বামী নির্মলানন্দ সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে উঠছেন, আমি পেছনে পেছনে। উঠতে উঠতে ভাবছি, আমার এই আরোহণ যেন অবরোহণ না হয়। ক্রমশই উঠে যাব, ওপরে আরও ওপরে। দোতলায় ঠাকুর ঘর। বেদীর ওপর সারদামায়ের ছবি। মার্বল পাথরের সাদা মেঝে। স্বামীজী বললেন, যাও আগে প্রণাম করে এসো।

মায়ের দিকে তাকিয়ে একপাশে একজন অল্পবয়সী মহিলা বসে আছেন। দৃষ্টি স্থির। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মহিলার দিকে তাকিয়ে বুকটা ছাঁত করে উঠল। কনক নাকি ! অনেকটা সেই রকম দেখতে !

মহিলার দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সবিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালুম। মনে মনে বললুম, মা ক্ষমা করো। পুরো মনটা তোমাকে দিতে পাবলুম না। সামান্য একটু টলে গেছে। চোখ বুজিয়ে মাকে দেখার চেষ্টাও সফল হল না। তরুণীর অশ্রুসজল দুটি চোখ, বেদনা মাখা মুখচ্ছবি বাবে বারে, ফিরে ফিরে এল। এ কি কোনও কিছু হারানোর বেদনা, না, না পাওয়ার বেদনা!

দশ হাত পেছনে স্বামী নির্মলানন্দ আমার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরও ওপরে উঠতে হবে। বাঁপাশে আর একটি সিঁড়ি তিন তলায় উঠে গেছে। তিন তলায় একটিমাত্র ঘর, সেই ঘরটিই স্বামী নির্মলানন্দের। একটি টেবিল, একটি চেয়ার, অসংখ্য বই। ঘরে শোওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সন্ন্যাসীর ভূমিশয্যাই শাস্ত্রের বিধান।

একটা মোড়া দেখিয়ে স্বামীজী বললেন, বোসো।

আদেশ পালন করলুম। স্বামীজী চেয়ারে বসে আমাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে বসে বড় অস্বস্তি শুরু হল। শো কেসে দাঁড় কবান ম্যানিকুইন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গেলে কাঁচের ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে দেখলে আমার মতই মনের অবস্থা হত। ছুটে পালাবারও উপায় নেই! নিজেকে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ মানুষ। ধরা না পড়ে যাই, লোভ, লালসা, কুঁচোকুঁচো কামনা, বাসনা, অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছের মত কিলবিল করছে।

মহারাজ বললেন, দেখি আমাব হাতে তোমাব ডান হাত রাখো।

নিক্তিতে ওজন করার মত কবে তিনি আমার হাতের ওজন নিলেন। জানি, এ এক আধ্যাত্মিক পরীক্ষা। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে করেছিলেন। হালকা হাতের মালিকের মনও হালকা। হৃদয় অগভীব, সঙ্কীর্ণ। পরীক্ষায় পাশ না ফেল? প্রশ্নও করতে পারছি না।

স্বামীজী বললেন, যাও বোসো।

মোড়ায় বসে পড়লুম। স্মিত হেসে স্বামীজী প্রশ্ন করলেন, কি করো?

আজ্ঞে চাকরি। কেমিস্ট।

বিজ্ঞানের ছাত্র? খুব ভালো। এরকম একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লিখলে কি করে? ডেকার্ট পড়েছ? কাণ্ট, হিউম, হেগেল, স্পিনোজা, হবস্?

কিছু, কিছু।

প্রবন্ধটা ভালই লিখেছ? একটা কাজ কেবল বাকি, আব একটু খাটতে হবে।

বলুন, প্রস্তুত আছি।

এই তো চাই। সব সময় নিজেকে তৈরি রাখবে সৈনিকেব মত। মনে মনে সব সময় বলবে, আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে। আমি থাকার জন্যে আসিনি, আমি যাবার জন্যে এসেছি।

আপনি মৃত্যুর কথা বলছেন?

মৃত্যু? মৃত্যু ত দুর্বলেব কথা, ভীরুর কথা। মৃত্যু বলে কিছু নেই। ট্র্যানজিসান। রূপান্তব। তুমি তো গীতা পড়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজই এক অধ্যায় কবে পড়াব চেষ্টা করি।

তা হলে সেই শ্লোকটি মনে করাব চেষ্টা করো,

অবক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহবাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥

অব্যক্ত হইতে সব দিনে ব্যক্ত হয়/রাত্রিতে আবার হয় অব্যক্তেই লয়/এইরূপে ভূতগণ যায় আব আসে/ রাত্রিতে বিলীন হয়, দিবায় প্রকাশে। মৃত্যুর এর চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা তুমি আর কোথায় পাবে? মৃত্যু নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না। ও হল এক ধরনের চিন্তা-বিলাস। দুটো কথা মনে রেখো, ডেথ-ইন-লাইফ, আব লাইফ ফিলড উইথ লিভিং। জীবনকে বেঁচে থাকায় ভরপুর করে তোলো।

কাজে কাজে বেলা বেড়ে গেলে হঠাৎ ঘড়ি দেখে আমরা লাফিয়ে উঠি, আরে এরই মধ্যে বারোটা বেজে গেল। জলের বিম্ব একদিন জলেই মিলিয়ে যাবে। কী, খুব খিদে পেয়েছে?

আজ্ঞে না।

তোমার মুখ বলছে। দাঁড়াও একটা সন্দেশ খাও। শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম সাধনং।

মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঘরের ও-প্রান্তে একটি কাঠের আলমারি। চারচৌকো সুদৃশ্য একটা টিনের কৌটো নিয়ে তিনি ফিরে এলেন আসনে।

কি সন্দেশ খাবে বলো? কড়া পাক? না নরম পাক?

আপনি যা দেবেন।

তোমার নিজের কোনও ইচ্ছে নেই?

আজ্ঞে না।

তুমি কি সব ব্যাপারেই নিজেকে এইভাবে সমর্পণ করে দিতে পারো?

নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর, তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। সকলের হাতে নিজেকে ছাড়তে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণকরণের ওপর তোমার বিশ্বাস আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব আছে।

কথামৃত পড়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রোজই পড়ি।

আর কি পড়ো?

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর শ্রীশ্রী সদ্গুরুসঙ্গ।

উপনিষদ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে তুমি নরমপাক খাও। নাও হাত পাত। সন্ন্যাসী মানুষ, কোথায় পাবো তোমার জন্যে প্লেট?

মহারাজ আমার হাতে বড় বড় দুটো সন্দেশ দিলেন। আকার আকৃতি দেখে খাবার আগেই প্রাণ ভরে গেল। ওপরে কুচো কুচো পেস্তা ছড়ান। মহাপুরুষের সামনে হাঁউ হাঁউ করে খেতেও লজ্জা করছে। খাদ্যগ্রহণকারী মানুষের চোখমুখের চেহারা পালটে যায়। লোভের ছায়া নামে। একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে মুখে পুরছি। অতি সুস্বাদু। এমন জিনিস কোথায় পাওয়া যায়? দোকানের নাম জানা থাকলে পিতা আর মাতামহের জন্যে নিয়ে যেতুম।

স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ আমার দিকে আর তাকাচ্ছেন না। একটি পাণ্ডুলিপিতে মন দিয়েছেন। ধীরে ধীরে দুটোকেই শেষ করে ফেললুম। মহারাজ মুখ না তুলেই বললেন, বাইরে ছাদের ওপাশে কল আছে, যাও হাত ধুয়ে এসো।

হাত ধুয়ে এসে বসতেই মহারাজ পাণ্ডুলিপি থেকে মুখ তুলে বললেন, দেখি, হ্যাঁ, এবার তোমার মুখের চেহারা পালটে গেছে। বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব এসেছে। বুদ্ধদেবের ধম্মপদ পড়েছ?

আজ্ঞে মাঝেমধ্যে উলটে দেখি।

তুমি করেছ কি? সব পড়ে বসে আছ? ইমিটেশান অফ ক্রাইস্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্করের **বিবেকচূড়ামণি**?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ জমিতে ভালই সার পড়েছে। এবার তা হলে ফুল ফুটবে!

ধীরে ধীরে আমার সাহস বাড়ছে। মহারাজের চোখের জ্যোতি লাইট হাউসের মত ঝড়ের রাতের নাবিককে স্থলের সঙ্কেত জানাচ্ছে। সাহস করে বলেই ফেললুম, স্বামীজী, বুদ্ধ কিন্তু বলেছেন, মূর্খ সারাজীবন জ্ঞানীর সঙ্গ করলেও জ্ঞানের পথের সন্ধান পায় না, যেমন চামচে কোনওদিন পায় না সূপের স্বাদ। বাঙলা ঠিক হল কিনা জানি না, ইংরেজী অনুবাদ আরও সুন্দর, If during the whole of his

life a fool lives with a wise man, he never knows the path of wisdom as the spoon never knows the taste of the soup.

পলাশ তুমি তো মূর্খ নও। তোমার জন্যে বুদ্ধের সেই উপদেশ, যে মানুষ জাগ্রত, সে যদি জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে মুহূর্তকাল কাটায় সে কিছু দিনের মধ্যেই জ্ঞানের পথ চিনতে পারে, যেমন জিভ চুমুকের সঙ্গে সঙ্গেই স্যুপের স্বাদ পায়। বুদ্ধের ওই উপদেশটিও মনে রেখো, অনাবৃত শরীর, জটাধারণ, পরিচ্ছন্নতায় উদাসীনতা, উপবাস, ভূমিশয্যা, ভস্মলেপন, আসন, কিছুতেই কিছু হবার নয়। বিশুদ্ধ হবার একমাত্র পথ সংশয় আর কামনা থেকে মুক্তি। এইবার তোমার **বিবেকচূড়ামণি** কি বলছেন,—

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।

ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥

বিচার, সৎ আর অসতের পার্থক্য বুঝে অসৎকে ত্যাগ করতে হবে। সাহায্য করবেন কে ? গুরু। স্নান দান, শত শত প্রাণায়াম, যাই করো না কেন, বিচার আর গুরুর উপদেশ ছাড়া পথ খুলবে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশে তালচটকা পাখির ঝাঁক দিন-শেষের-ওড়া উড়ছে। মহারাজ বললেন, আর না, একটু পরেই আরতি শুরু হবে, আমাকে প্রেয়ারে বসতে হবে। তোমার বাড়ির খবর বলো, কে কে আছেন ?

থাকার মধ্যে আছেন আমার বাবা, আর আমার দাদু। এছাড়া আমার আর কেউ নেই।

মহারাজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আমার নিতান্ত আপনজনের মত মৃদু হেসে বললেন, ভাগ্যবান, ভাগ্যবান। এই সুযোগ কাজে লাগাও। তোমার পথ ঈশ্বরই পরিষ্কার করে রেখেছেন। মায়ের স্নেহ যখন পাওনি, তখন অন্য আর কারুর স্নেহ-ভালবাসার আশা কোরো না। বিবাহ করার ইচ্ছে আছে না কি ?

একেবারেই না।

চাপাবার চেষ্টা চলছে ?

অল্প স্বল্প।

কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করো ; রেশমকীট যেমন গুটি কেটে বেরিয়ে যায়—

কোথা হতে আসিয়াছি, নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থদরশনে
এই বসুন্ধরাতলে ! লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশসমুদ্রের ঘাটের উপরি।

কার লেখা ?

রবীন্দ্রনাথ। নৈবেদ্য।

পরের স্তবক ?

ভাগ্য ভালো, মনে ছিল। কাল রাতেই মাতামহকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে শুনেছেন,

শুনা যায় চারিদিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসার শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরীপ্রান্তে পান্থশালা-'পরে। স্নানেপানে
অপরাহ্ন হয়ে এল গল্পে হাসি গানে।

মহারাজ শেষ স্তবকটি আবৃত্তি করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন,

এখন মন্দিরে তব এসেছি হে নাথ
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত

এ জন্মের পূজা সমাপিব। তারপর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।

টেবিলের ডানদিকের ট্রে থেকে আমার লেখাটি তুলে নিলেন। শোনো, সবই ঠিক আছে, একটা কাজ কেবল বাকি, অনেক উদ্ধৃতি আছে, সব কটার ফুটনোট দিতে হবে। প্রথমে নম্বর দেবে, এক, দুই, তিন, চার, তারপর তলায় তলায় উল্লেখ করবে সোর্স। পারবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যত তাড়াতাড়ি পারো দিয়ে যেও। মনোনীত করে রেখেছি। পারলে সামনের মাসেই ছেপে দোবো। হ্যাঁ, তোমাকে একটা বইও দিচ্ছি, রোজ নিয়ম করে দু-চার পাতা পড়বে।

বই আর পাণ্ডুলিপি দুটোই আমার হাতে এসে গেল। বইটির নাম স্বামী-শিষ্য সংবাদ। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ বললেন, এত বড় বড় চুল রেখেছ কেন?

ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। শরীরে একমাত্র এই চুলই দর্শনীয়। আর তো দেখাবার মত কিছু নেই। না বুকের ছাতি, হাতের গুলো। মিউ মিউ করে বললুম, বড় হয়ে গেছে, এইবার কাটবো।

হ্যাঁ কেটে ফেলো। দুর্বলতার সেবা কোরো না। পুরুষ হও, তবেই না পৌরুষ আসবে।

স্বামীজী হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীর পায়ে আমার সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন। চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ভেজিয়ে দিলেন। দোতলার ঠাকুর ঘর আলোয় আলোকময়। মেঝেতে ঢালাও কার্পেট। ধূপের গন্ধ। একটি হারমোনিয়াম। সারদামায়ের পুজো শুরু হয়েছে। সেই তরুণী এখনও একইভাবে স্থির। আরও অনেক ভক্ত এসেছেন। নিচের অফিসঘর বন্ধ। নির্জন একটি বেনচের তলায় অসংখ্য জুতো। একটি শিশু একা বসে।

One life, one death, one heaven one hell, one immortality and one annihilation

'দিদি আত্মহত্যা করেছে বলে মনে হয় না। দিদিকে তোমার চেয়ে আমি ভালো চিনি। দিদি ভয়ঙ্কর একরোখা মেয়ে, তেমনি সাহসী। অভদ্র নয়, বাচাল নয় কিন্তু অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ায়। শ্রদ্ধেয় গুরুজনকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজন শুধু বয়েস কি সম্পর্কের দাবিতে দিদির কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করতে পারবে না। বাবা ইদানীং যা যা করেছেন তোমাকে আমি জানিয়ে এসেছি। আমার যা সন্দেহ দিদি যদি তাই করে থাকে আমি বলব ভালই করেছে।'

মুকুর চিঠি ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে। মেসোমশাই ইদানীং কি করছেন। মাসীমা তো শ্যামদেশ থেকে হাঁটাপথে আসার সময় আরাকানের জঙ্গলে দেহ রেখেছেন। পথের ক্লেশ সহ্য করতে পারেন নি। বিপত্নীক মেসোমশাই কি তা হলে ইন্দ্রিয়ের কাছে হার মেনেছেন। প্রৌঢ় মানুষটির কি তাহলে পদস্খলন হয়েছে! কি জানি। সে সব বৃত্তান্ত ছিল মুকুর রেখে যাওয়া লেফাফায়। কনক কি এমন ভালো কাজ করলে! হোমচৌধুরীটি কে? কনকের কোনও পূর্বপরিচিত। গড নোজ। এ সব ব্যাপারে আমার আর কোনও আকর্ষণ নেই। বাতাস ঘুরে গেছে। হাওয়া-মুরগীর মুখ এখন অন্যদিকে। সব ধর্মগুরুই আমাকে নেতিবাচক কথা শুনিয়েছেন। এখন না, পরে। সতীমা ভয় দেখিয়েছেন। ঘুরঘুরে বাবা ভূত দেখিয়েছেন। জয়ামাতা বলে গেছেন বছর চারেক পরে। একমাত্র স্বামী নির্মলানন্দের কাছে কিছু পজেটিভ কথা শুনেছি। ঈশ্বর নয়, ভক্তিরস নয়, জ্ঞানমার্গ। নিজেকে ধরো। হাত জোড় করে বলো—দুর্বল আমি, সবল হও। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ। নিজের ওপর নিজের উঠে

পড়ে লাগাম ধরে বোসো। সেই আমির বশে এই আমিকে সঁপে দাও। সেখানে মুকুর ভালবাসা নেই, কনকের আকর্ষণ নেই, অপর্ণার আগমন-প্রত্যাশা নেই, কাকীমার কি জানি কি নেই। প্রফুল্লকাকার মৃত্যুর খবর অফিসিয়্যালি জানাজানি হয়ে যাবার পর আমি কাকীমাকে হিন্দুর ঘরের বিধবার মতই দেখতে চাই। শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। আচারনিষ্ঠ। তবু কেন জানি না, নারীর মন জয় করার আনন্দে ভেতরটা থেকে থেকে গুন গুন করে উঠছে। কি একটা হচ্ছে যা বলে বোঝানো যায় না। কোয়েলিয়া গান থাম' এবার বললেও গান থামছে না। তাই চিঠির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। সারি সারি মুক্তো দিয়ে সাজানো জ্বলজ্বলে যৌবনের আবেগ।

'তোমার চিঠি আমি আশা করি নি। তুমি জান না, আমি জানি, তোমার মধ্যে চাপা একটা অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার তোমাদের রক্তে। তোমার দোষ নেই। তোমার চেয়ে বয়েসে আমি অনেক ছোট, রাগ কোরো না, তোমাকে একটা কথা বলি, নিজেকে বেশি দিন খোলা ফেলে রেখো না। আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে দেখে এই শিক্ষাই হোলো, মানুষ বড় জটিল প্রাণী। কখন কি ভাবে, কোন আবেগে কেঁপে উঠবে নিজেই জানে না। লক্ষ প্রলোভনের তরঙ্গ খেলছে। কখন কোন্ বাতাস পালে ধরবে কেউ জানে না। আদর্শের শৌখিন পেয়ালা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে। তুমি কি জানো মেয়েরাও ভালোবাসতে পারে। ছেলেরা ভালোবাসার কিছুই জানে না। পেট্রলও জ্বলে, কয়লাও জ্বলে, পাটও জ্বলে। একটা দপ করে, জ্বলেই নেবে। আর একটা ধীরে জ্বলে, নেবেও ধীরে। জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে, নিঃশেষে ছাই হয়। শেষবারের মত আজ আমি তোমাকে একটা কথা নির্লজ্জের মত বলে যাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে কাছে পেতে চাই। তোমার কল্পনাবিলাস, তোমার ছেলেমানুষী, তোমার পবিত্রতা, তোমার চাপা অহঙ্কার বেদনা, নিঃসঙ্গতা, সব কিছু আমি ভালোবেসে পেতে চাই। কেন চাই, তা জানি না। তোমাকে ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারি না। এ আমার কি হল!'

মুকু রসিকতা করছে, না সত্যি কথা বলছে? মেয়েরা এমন প্রাণখুলে লিখতে পারে? কোনও মেয়ে আমার মত ছেলেকে ভালোবাসতে পারে? বিশ্বাস হয় না। কোনও মেয়ে কখনও আমাকে প্রেমপত্র লেখেনি। কো-এডুকেসান কলেজে মেয়েরা আমার পাশ দিয়ে চলে যেত, ফিরেও তাকাত না। সুন্দরী মেয়েদের বেশ অহঙ্কার থাকে। মুকু তো সুন্দরীই। ভরাট গোল চাঁদের মত মুখ। ছোট চুল-ঢাকা কপাল। উচ্চতায় আমার মাথায় মাথায়। মেয়েরা যাকে গড়ন বলে, সেই গড়নও বেশ সুন্দর। পাশ দিয়ে চলে গেলে ভোগী মানুষকে ফিরে তাকাতেই হবে। সে কেন আমার মত এক শুকনো খেঁকুরে বাবাজীকে প্রেমপত্র লিখবে? পৃথিবীতে কি এখন প্রেমের জোয়ার বইছে, যে নালা নর্দমা সব ভেসে যাবে!

'প্রথম প্রথম তোমাকে আমি আর পাঁচটা ছেলের মতই ভাবতুম। একটু চালিয়াত, বড় বড় কথা বলে। একটু বেশি বকে। পরে আমার সে ধারণা একেবারে পালটে গেল। মনে হল, তোমার ভেতরের শিশুটি আজীবন শিশুই থেকে যাবে। যত ঝড় ঝাপটাই আসুক তুমি সহজে ভেঙে পড়বে না। তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস লোক দেখানো নয়, অন্তরের জিনিস। জন্মসূত্রে পাওয়া। তোমার এ বিশ্বাস এসেছে মাতামহের দিক থেকে। জীবন সম্পর্কে আমার নিজের একটা পরিকল্পনা আছে। অনেক মানুষকে আমি ভয় পাই। যারা দেহের ভেতর মানুষের আত্মাটাকে দেখতে পায় না তারা জন্তু। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমরা দু'জনে একটা কিছু করতে পারি। চলার পথে মনের মত একজন সঙ্গী পেলে পথ যত দুর্গম আর দীর্ঘ হোক না কেন, জানার আগেই ফুরিয়ে যায়। তুমি অবশ্যই আমার এ চিঠির উত্তর দেবে। ঈশ্বরকে যেমন জ্ঞানের পথে, ত্যাগের পথে পাওয়া যায়, ভালবাসার পথেও পাওয়া যায়। তা যদি না হবে ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করলেন কেন? তোমাকে আমার কিছুই দেবার নেই। তুমি আমার সব নিয়ে বসে আছ। ইতি, মুকু।'

মুকুর চিঠিতে অদ্ভুত এক মাদকতা রয়েছে। সারা শরীর কেমন যেন কোরে উঠছে। ভালোবাসা খুব সহজেই মানসিক স্তর থেকে দেহের স্তরে নেমে যেতে চায়। সামান্য একটা চিঠিতেই আমার এই অবস্থা। মুকু কলকাতায় আসবে। শুধু আসবে না। কয়েক বছর থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। তখন

আমার কি হবে !

আমার মনের ধাঁচটা বেশ বুঝে গেছি। জুয়া খেলাব চাকার মত। হাত ঠেকাবারও প্রয়োজন হয় না। সামান্য ফুঁ দিলেই ঘুবতে থাকে। মুকু খুব খাঁটি কথা বলেছে, নিজেকে বেশী দিন খোলা ফেলে রেখো না। তোমার কথাই ঠিক। সব ফাঁকফোকোর এইবার ভরাট করব, তবে তোমাকে দিয়ে নয়। এমন কিছু দিয়ে, যা বঞ্চনা করে না, শিশিরের মত যা ভোরের প্রথম সূর্যেই উবে যায় না।

তবু চিঠিটা আমি ছিঁড়ে কুঁচি কুঁচি করতে পারলুম না। সাবধানে ড্রয়ারে ভরে রাখলুম মূল্যবান ট্রফির মত।

শ্রীনাথদার সেলুনেব দোলখাওয়া দবজায় নতুন কাঁচ বসেছে। কাঁচে আবার নকশা খেলছে। গাছের ডাল ধরে শকুন্তলা দাঁড়িয়ে। ভেতবের দেয়ালে নতুন রঙ পড়েছে। বেশ একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তেমন ভিড নেই। একজন মাত্র খদ্দেরের দাড়ি চাঁচা হচ্ছে। খুব খুঁতখুঁতে মানুষ। থুতনির তলায় হাতের উলটো পিঠ ঘষে বলছেন, এই জায়গাটায় আর একবার মারো কবিরাজ, খড়খড় করছে।

চামড়ার ফিতেতে ক্ষুর ঘষতে ঘষতে শ্রীনাথ বলছেন, দাড়ি উল্টোপাল্টা টানলেই পেকে যায়। এই বয়েসে এত শক্ত দাড়ি করে ফেলেছেন ! এর পর তো তরোয়াল দিয়ে কামাতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের বংশ একটু কড়াধাতের। মেজাজ কড়া, পায়ে কডা, দাডি কডা, সব কড়া। তুমি শ্রীনাথদা বকবক না করে তাডাতাড়ি ছেড়ে দাও তো।

শ্রীনাথদা চোখের ইশারায় আমাকে দ্বিতীয় চেয়ারে বসতে বলে, খুনীর মত ক্ষুর হাতে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাড়ি কামাবার সময় শ্রীনাথদার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যায়। যেমন অন্যের মুখে খাবার ভরে দিতে গিয়ে অনেকের নিজের মুখ হাঁ হয়ে যায়।

দাড়ি কামানো শেষ হল। ভদ্রলোক ঠ্যাং করে পয়সা ফেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আমাব গায়ে আধময়লা মার্কিনের টুকরো জড়াতে জড়াতে শ্রীনাথদা বললেন, দাড়ি কখনো উলটো টানবে না। টেনেছ কি মরেছো। তারের বুরুশ হয়ে যাবে। জামার কলারটা উলটে ভেতর দিকে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, চুল ভীষণ বড হযেছে যে গো ! তোমার ভীষণ চুলে মাথা। বেশ কবি কালিদাস, কবি কালিদাস চেহারা হয়েছে।

মার্কিনের গাঁট বাঁধতে বাঁধতে বললেন, দাঁড়াও একটু বিড়ি ফোঁকা কবেনি। একটা দাড়ি নামাতে জীবন বেরিয়ে গেল।

বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীনাথদা ঘাড়ের কাছে এসে, সামনে ঝুঁকে পাউডারের কৌটো তুলে নিলেন। এতদিনে পাফটা নতুন হয়েছে। পাউডারে ফুলের গন্ধ লেগেছে। দাড়ির চেয়ে চুলে আর পাউডারে দাদাব হাত খুব দ্রুত চলে। ঘাড়ের কাছে ঝপাঝপ পাউডাবের থুপ্‌পি চালাতে চালাতে বললেন, মেয়েছেলেটি তা হলে তোমাদের বাড়িতেই রয়ে গেল ?

কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পাউডারের কৌটোটা ঠকাস করে সামনের তাকে রাখলেন। ভদ্রলোকের জামায় বিশ্রী একটা সেলুন সেলুন গন্ধ। এমন একটা কথা বললেন যা এই গন্ধের চেয়ে দুর্গন্ধময়। মেয়েছেলে শব্দটাই কুৎসিত। হাত দুটো কাপড়ের টুকরোয় জড়ান। উঁচু চেয়ারে আয়নার তলাব তাকে পা পুরে বেকায়দায় আছি তাই, তা না হলে ছিটকে রাস্তায় নেমে যেতুম। ঠাণ্ডা, গম্ভীর গলায় বোকার মত বললুম, কোন্ মেয়েছেলে ?

ওই যে গো সেই তবলচীর বউটা।

কানের পাশে মুখ রেখে কথা বলছেন। বিড়ির গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। কতো ব্যাপারেই না মানুষেব মাথা ঘামে ! কে বলেছে, চার-দেয়ালে আমাদের সকলের পারিবারিক গোপনীয়তা বক্ষা হয় ! দেয়ালেব অসংখ্য চোখ, অসংখ্য কান। আমরা হাটের মাঝে জীবন মেলে বসে আছি।

শান্ত গলায় বললুম,- কোথায় আর যাবেন ? মহিলার কেউ কোথাও নেই।

খুব বেশি বয়েস হবে বলে মনে হয় না ! কি ভাগ্য বলো তো ?

কথা এইবার নিজের রাস্তা ধরেছে। পারিবারিক কথা পেঁয়াজের মত। যত ছাড়াবে তত কেচ্ছার গন্ধ

বেরোতে থাকবে। শ্রীনাথদার কথায় যে সহানুভূতির আভাস, তা অনেকটা মাছধরা চারের মত। কেচ্ছার রুই কাতলা গভীর জল থেকে টোপে ভেড়াতে হলে চার ফেলতে হয়। ভালো মানুষ সাজতে হয়, ন্যাকামো করতে হয়। সেলুন এমন একটা জায়গা, যেখানে এলেই সমাজের নারী ধরা পড়ে। ভাগ্যিস এসেছিলুম! মাত্র এই কয়েক দিনেই তা হলে অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে গেছে।

ঘাড়ের কাছে কাঁচির খেলা শুরু হয়েছে। সেই আবহসংগীতে শ্রীনাথদার গলা ভাসছে, ওই তবলচী শুনেছি খুব সুবিধের লোক ছিল না।' মামাটা তো খুব পয়সাঅলা লোক?

তা হবে!

সে তো আবার বিয়ে থা করে নি?

কে জানে?

আরে আমি সব জানি। লোকটার একটা মেয়েমানুষ আছে। এখন ব্যবসাফ্যাবসা সব লাটে তুলে দিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকে।

যে যা করে করুক, তাতে আমাদের কি?

তা ঠিক। তবে কি জানো, মানী গুণী লোকের কিছু হলে গায়ে বড লাগে। কষ্ট হয়।

কার কথা বলছেন?

এই তোমার বাবার কথা।

অ্যাসিড-ট্যাসিড নিয়ে কাজ করতে গেলে ও রকম দুর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তেই হতে পারে। ভয়ের কিছু নেই।

অ, হরিদার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, আপনি জানেন না?

শুনছিলুম, কি যেন একটা হয়েছে। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে, কোনটা যে কি বুঝি না বাপু। মাথাফাথা খারাপ হয়ে যায়। মেয়েছেলে বড় সাংঘাতিক জিনিস মাইরি। বাঘের মত। ছুঁলেই আঠারো ঘা।

মেয়েছেলে মানে?

ওই যে তবলচীর বউ! স্বামীর ঘর তো ভালো করে সাধ মিটিয়ে করতে পারলে না। না পারলে যা হয়, খাই খাই স্বভাব। আর তো সে দিন-কাল নেই, ধর্মটর্ম সব আলগা হয়ে গেছে। বিধবাদের আগে কত বাঁধন ছিল? মানুষের মন তো খুব নোঙরা! পাঁচজনে পাঁচকথা বললে বড় খারাপ লাগে। তোমাদের পরিবারের একটা সুনাম ছিল।

এখন কি দুর্নাম হচ্ছে?

হলেই হোলো।

শ্রীনাথদার কাঁচি চলছে 'হলেই হোলো' ছন্দে। মনটা ভীষণ দমে গেল। মানুষ দেখি সব পারে! আমার আদর্শবাদী একরোখা পিতৃদেবের অনেক শত্রু, আমি তা জানি। সুযোগ পেলেই বোলতার হুল চালাবে। ছাড়বে না। বিবর্তনের ধারায় জীবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে, মানুষের আগমন। বাঘের রক্তলোভী স্বভাব মানুষে এসে কুৎসালোভী হয়েছে।

শ্রীনাথদাকে তাড়া লাগালুম, আর বসা যাচ্ছে না, অত মেলামিলি, দশআনা-ছআনার প্রয়োজন নেই। একেবারে মুড়িয়ে কদমছাঁট করে দিন।

দাঁড়া রে বাবা। চুল কাটতে বসে অধৈর্য হলে হয়! বেশি ছোট করলে কামড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। সব কিছুর একটা শো আছে। যে মুখে যেমন মানায়।

আমি যা বলছি তাই করুন। একেবারে কদমছাঁট।

হ্যাঁ, কদমছাঁট! তুমি বললেই আমি করছি! আরে লোকের কথায় রাগ করতে আছে! চোরের ওপর রাগ করে ভাই ভুঁয়ে ভাত খেও না। যে যা করার তা করবেই। তুমি চুল বড় রাখলেও করবে, তুমি চুল ছোটো রাখলেও করবে। এই যে গজেনবাবু, ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে নিজে বুড়ো বয়েসে বিয়ে

করে চলে এলেন। বেশ তো আছেন বাবা! লজ্জা নেই, নিন্দের ভয় নেই। বুক ফুলিয়ে আসা-যাওয়া করেন। ছেলেটা বিবাগী হয়ে সরে পড়ল। বোকামি, বোকামি! তুই গৃহত্যাগ করলি কোন দুঃখে! তোর বাপের চোখের সামনে থেকে বাপকে আরও বেশি শাস্তি দিতে পারতিস! তোকে চোখের সামনে দেখত, আর বুড়োর বিবেকে খোঁচা লাগত। যাকে বউমা বলার কথা, তাকে বউ বলছে! পৃথিবীটা মানুষেই নষ্ট করে দিলে। হরিদাকে আমি চিনি। কোনো ছোট কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। যারা অপবাদ রটাচ্ছে, তারা সব খেয়ো কুত্তা।

শ্রীনাথদা ক্ষুর দিয়ে ঝুলপি সমান করছেন। কুত্তা বলার সময় উত্তেজনায় হাত কেঁপে গেল। লাগল, ভাগ্য ভালো কাটেনি। আর একবার চারপাশে পাউডার মেরে যখন খড়খড়ে বুরুশ দিয়ে চুল ঝাড়তে লাগলেন, তখন প্রায় কেঁদে ফেলার যোগাড়। মনে হচ্ছে ছালচামড়া গুটিয়ে যাবে। মার্কিনের টুকরোটা খুলতে খুলতে বললেন, এ পাড়াটা হোলো ছোটলোকের পাড়া। ছোটলোকের পাড়া। এক সময় ভালো ছিল। যত দিন যাচ্ছে...

কাপড়ের টুকরোটা এত জোরে ঝাড়লেন, বন্দুক ছোঁড়ার মত শব্দ হল। ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে এলুম। শ্রীনাথদা মোটামুটি লেখাপড়া জানা মানুষ। শুনেছি ম্যাট্রিক পাশ। নানা রকম বই পড়েন। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। ভদ্রলোক আবার কবিতা লেখেন। একবার দুবার পড়ে শুনিয়েছেন। নেহাৎ ফেলে দেবার মত নয়। পাতে দেওয়া চলে। ছেলের পর, পর পর দুটি মেয়ে হয়ে ভদ্রলোককে বড় বেকায়দা করে দিয়েছে। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চুল দাড়ি, দাড়ি চুল, এই কেবল চলছে।

বাজার একেবারে জমজমাট। সাইকেল, মটোর, ভ্যান, যাচ্ছে আসছে। মিষ্টির দোকানে জিলিপির পাহাড়। গরম সিঙাড়া ভাজার গন্ধ বেরোচ্ছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীণে প্রবীণে কথা হচ্ছে। স্তূপাকার খড় নিয়ে ঠ্যালা চলেছে। ওপর দেখে বোঝার উপায় নেই, সমাজের কোথায় পচন ধরেছে।

সারা বাড়িতে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। মাতামহের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। এইবার বুকোটা দপ করে জ্বলে উঠবে। কথা বললে মনে হয়, কোন্ সুদূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর। যেন কোনও পর্বতের ওপার থেকে উঠে আসছে মেঘের মত, জলভারে সিক্ত। হাসি! আর সে প্রাণ নেই। চোখ, মুখ সব সময় থমথমে। আমাদের অনেক অব্যবহৃত ঘরের কোনও একটায় মৃত্যু যেন অদৃশ্য অতিথির মত এসে বসে আছে, তার ফোলডিং স্ট্রেচার নিয়ে। গভীর রাতে সে আমাদের উত্তরের বারান্দায় ধীর পায়ে চলে বেড়ায়। তালা আঁটা ঘরের দিকে আমি দিনের বেলায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। তুমি এসেছো, আমি জানি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে।

পিতৃদেব সেরে উঠছেন। তবে সে মানুষ আর নেই। বিশাল একটা বোঝা নিয়ে চৈত্রের দুপুরে কোনও মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে এলে মুখচোখের অবস্থা যে রকম হয়, তাঁর মুখের অবস্থাও সেই রকম। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বীতশ্রদ্ধ। বই নিয়ে বসে থাকেন, চোখ চলে যায় সুদূরে। যেন কাউকে খুঁজছেন। এমন কেউ, যে পাশে এসে দাঁড়ালে জীবন আবার সহনীয় হয়ে উঠবে।

মাতামহ আমার চুলের দিকে তাকিয়ে পুরনো দিনের মত রসিকতা করার চেষ্টা করলেন। এ কি করে এলে, তিরুপতি গিয়েছিলে না কি? একেবারে কচুকাটা করে এলে। ঘাসছাঁটা করে দিয়েছে।

পিতৃদেব একবার মুখ তুলে তাকালেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ এলোমেলো। তিনি কোনো মন্তব্যই করলেন না। দু'জন খেয়ালী, করিৎকর্মা মানুষ আজ কর্মময় জগতের একপাশে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার সামর্থ্য নেই। মাতামহ তীর্থে যাবার জন্য ছটফট করছেন। পিতৃদেবের ইচ্ছে ছিল পুত্রবধূকে আনার আগে, এই জরাজীর্ণ বাড়িটাকে ভেঙেচুরে নতুন করবেন। ভেবেছিলেন চারপাশে খুশির ফোয়ারা ছুটবে। সবই বোধহয় ভেস্তে গেল।

কাকীমা চা তৈরি করছেন রান্নাঘরে। শাড়ির রঙ বদলে সাদা হয়ে গেছে। সাজগোজের আর সে ঘটা নেই। আঁচলে এক থোলো চাবি। পিতৃদেব সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। বিষণ্ণ মন আরও বিষণ্ণ হয়ে

গেছে। যে ভদ্রলোকের অসাবধানতায় বুকে অ্যাসিড ছিটকে লেগেছে, সেই ভদ্রলোককে ট্র্যানসফার করা হয়েছে গাজীপুরে।

কাকীমা মুখ তুলে তাকালেন, চা খাবে ?

এক চুমুক।

আজ কিন্তু বাজার করতে হবে।

করবো।

দু'জনেই চমকে উঠলুম নিচে কাশির শব্দ হচ্ছে। দমকা, একটানা। ব্রংকাইটিস বেশ চেপে ধরেছে। এক ফাঁকে শোনা গেল, কই গো কোথায় গেলে ?

গলা শুনে দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। সেই আল্‌গা চরিত্রেব মামাশ্বশুর। চুলে পমেড, মুখে পাউডার, গায়ে আতর। সর্বনাশ আবার এসেছেন। কাকীমার হাত থেকে চামচে পড়ে গেল। বাঘেব সামনে শিকার যেমন কাঁপতে থাকে, কাকীমা সেই রকম কাঁপছেন। আমাকে বললেন, তাড়াও, তাড়াও, যেমন করে পারো তাড়াও।

আমি তাড়াবার কে ?. ভদ্রলোক বড চটচটে। ধরলে সহজে ছাড়ানো যায় না।

ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে বললেন, ও ওপরে বুঝি!

জুতোর মুচমুচ শব্দ উঠন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। উঠে বাঁযে বাঁক নিলেই রান্নাঘর। কাকীমা আতঙ্কের গলায় বললেন, বট্‌ঠাকুরকে খবর দাও। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

আসুন না, ভয় করার কি আছে ? জোর করে নিয়ে যেতে পারবেন ?

না, না, ওকে দেখলেই আমার গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আমাকে টেনে নরকে নামাতে চায়।

পিতৃদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে উত্তরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। সিঁড়ি ভেঙে ভদ্রলোক উঠে আসছেন ধাপে ধাপে। চেহারা দেখলেই মনে হয় অন্য জীবনের মানুষ। ফোকোরে চামচিকি থাকে। এ বাড়ির কোনও ফোকোরেও এঁর স্থান হতে পারে না। হাতের আঙুলে আঙুলে লাল, নীল, সবুজ আঙটি। ঠোঁটে এতখানি একটা পাইপে লাগান সিগারেট। মাথার চারপাশ দিয়ে ফিন্ ফিন্ করে ধোয়া ছুটছে। সাদা পাঞ্জাবির বুকের কাছে ধোঁয়ার শুঁয়ে সাপ লিক লিক করছে।

পিতৃদেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আসুন। সামনেও একটা সিঁডি ছিল।

এক ছিটে কাশি মিশিয়ে বাবু বললেন, যে কোনও এক দিক দিয়ে এলেই হল। তা আছ কেমন ?

ভালই।

ভালো ত থাকবেই। সেবা যত্ন পাচ্ছ।

পিতৃদেবের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাত মুঠো হল। অসীম সংযমে নিজেকে ধরে থাকলেন। হাওয়ার মুখে পেপার ওয়েট চাপা কাগজের মত। ধীর গলায় বললন, তা হবে।

আঙুর গেল কোথায় ? ঝিগিরি করছে।

আপনার কি তাই মনে হয় ?

মনে হবে কেন, তাই হয়। সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয়। এখানে ওর পড়ে থাকার রাইটটা কি ? কি অধিকারে পড়ে আছে ?

প্রশ্ন আমাকে না করে তাকেই করুন।

সে এখন নেশার ঘোরে আছে।

কিসের নেশা ?

যৌবনের নেশা।

তার মানে ?

মানে বুঝে নাও।

পিতৃদেবের চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। হাত মুঠো হল। আক্রান্তকে রক্ষা করার জন্যে মাতামহ

উঠে এলেন। অসুস্থ হলে কি হবে! সেই ছ' ফুট লম্বা, সাত্ত্বিক চেহারা। গায়ের রং টকটক করছে।জীবিত স্তম্ভের মত পিতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে লোকটিকে মনে হচ্ছে ইন্দ্রিয়সেবী মর্কট। ভোগের দুর্ভোগে চোখের কোল দুটো টেঁপারির মত ফুলে আছে। মাতামহের এই সব পরিস্থিতি সামলাবার অসীম ক্ষমতা। জোঁকের মুখে নুন ছিটোতে জানেন। সাধনলব্ধ একটা শক্তিও আছে। এখন আমি অবাক হয়ে ভাবি, কাকীমা এই মামাশ্বশুরকে একদিন বলেছিলেন দেবতুল্য মানুষ। সাত ভরি সোনার গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলেন। রাতের বেলা নির্জনে মামাশ্বশুরের বাতের সেবা কবতেন। প্রফুল্লকাকা সন্দেহ করেছিলেন, যে সন্তানটি এসে নষ্ট হয়ে গেল সেটি কার? মানুষের মন বড় অপবিত্র! সেই কাকীমা এখন মানুষটিকে দেখে গোসাপের সামনে সাপের মত জড়সড। মেয়েদের চেনা বড শক্ত। হতে পারে, এই পরিবারে থাকতে থাকতে কাকীমার রুচি পাল্টে গেছে।

মাতামহ মানুষের চেহারা দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা নাম উদ্ভাবন করেন। সেই নামেই কথাবার্তা চলতে থাকে। মাতামহ বললেন, এই যে মর্কটানন্দ সকালেই সেজেগুজে হাজির!

ভদ্রলোক থতমত হয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে বললেন, আমার পিতৃদত্ত একটা নাম আছে। সেই নামে ডাকলে সুখী হব।

তোমাব সব নাড়ীনক্ষত্র আমি যে জানি প্রভু, সে নামে তোমাকে ডাকি কি করে! বাপ যদি আদর করে কানা ছেলের নাম রাখে পদ্মলোচন, তাতে কি লোচন পদ্মেব মত হবে!

ভদ্রভাবে কথা বলুন।

নিজে আগে ভদ্র হও। তুমি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলবে, আব আমবা তোমার প্রজার মত শুনে যাব, তা তো হয় না মানিক!

পিতা মাতামহেব দিকে তাকিয়ে বললেন, অপমান কবাব অধিকাব আমাদের নেই, অপমানিত হবার মত উদারতা আমাদের আছে। ওই মহিলার সঙ্গে ইনি সম্পর্কিত। একমাত্র আত্মীয়ও বলা চলে। ব্যবসা কবে পয়সা করেছেন। শিক্ষা আব সংস্কৃতি না থাকলে অর্থ মানুষকে একটু অসভ্য করে। ওঁব এই আচবণ আমাদের মেনে নিতেই হবে।

তুমি বলেছ ঠিক। মুখে মেয়েদেব মত কি বকম পাউডার মেখেছে দ্যাখো। যেন যাত্রার দলের মিনসে মাগী!

পিতৃদেব দু'হাতে মাথাব দুপাশ চেপে ধরে বলে উঠলেন, আবে ছি ছি। আপনি ভীষণ ভালগার হয়ে যাচ্ছেন।

রাখো তোমাব ভালগাব। সাবা জীবন আমি অনেক ভাগাড়ে ঘুবেছি। সংসারেব ট্র্যাফলগাবে সময় সময় ভালগার না হলে, মানুষ বড পেয়ে বসে।

পিতৃদেব ভদ্রলোককে বললেন, আপনি ঘরে এসে বসুন।

আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক বললেন, ছেলে তো বেশ বড় হয়েছে, এইবার একটা মেয়ে জুটিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও? সব ল্যাঠা চুকে যাক।

অসভ্যের ভাষা দ্যাখো? মেয়ে জুটিয়ে? স্বভাব যাবে কোথায়! চরকা দেখলেই তেল দিতে ইচ্ছে করে।

গা যেন জ্বলে উঠল। একটু ধাক্কা মারা উচিত! পিতা আজ অন্য নীতি শেখাচ্ছেন। এক সময় বলতেন, টিট ফর ট্যাট। হঠাৎ বলে ফেললুম, সোনালি খরগোস কেনা হোলো সেদিন?

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, কি, কি খরগোস?

যেন কিছুই জানেন না। বললুম, সেই যে হাতিবাগানে? সঙ্গে একজন সুন্দবী মহিলা! মহিলা আপনার হাত ধরে টানলেন। আপনার বয়েস হয়েছে তো। হ্যাঁচকা টানে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, গায়ে কিস্যু জোর নেই। আপনি তখন মাথার চারপাশে হাত ঘুরিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, মহিলার মাথার নাট-বল্টু সব ঢিলে। মহিলা মনে হয় আপনার স্ত্রী

ছিলেন।

আমি ইচ্ছে করে বয়েস আর স্ত্রী এই দুটো শব্দের ওপর জোর দিলুম।

ধূর্তের চোখে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি ? তুমি আমাকে হাতিবাগানে দেখেছো ? সঙ্গে সুন্দরী মহিলা ? হাসালে বাবা ! আমার কি আর সে বয়েস আছে ? কাকে দেখতে কাকে দেখেছ ? হাতিবাগানে অনেক দাদু, নাতনী দেখা যায় !

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন। ছোট্ট একটি কথা বললেন, স্বভাব না যায় মলে, বুঝলে, ইল্লৎ না যায় ধুলে !

পিতৃদেব বললেন, নোঙরা জল যত ঘোলাবেন ততই ঘুলিয়ে যাবে। আমরা যা জানি, যতটুকু জানি তার অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন নেই।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাকীমাকে ডাকো।

কাকীমা বললেন, এই তিন কাপ চা বাইরের ঘরে নিয়ে যাও। খাওয়া হয়ে গেলে ভাগিয়ে দাও। ভাগনে যখন নেই, ভাগনে-বউও তখন নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘাড়ধাক্কা। ওসব মানুষের আমি পরোয়া করি না। যখন ও বেঁচে ছিল তখন অনেক মিথ্যে বলেছি, অশান্তির ভয়ে। বুড়োর ভাগ্য ভালো যে ভাগনের হাতে খুন হয়নি।

কাকীমা হঠাৎ কি রকম বদলে গেছেন ? সেই মৃদু, ভীরু স্বভাব আর নেই। তিন কাপ চা ট্রের ওপর তুলে লগবগ, লগবগ করতে করতে বাইরের ঘরে এলুম। পিতা স্বহস্তে কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নিন চা খান।

আমি বললুম, কাকীমা দেখা করতে রাজী হচ্ছেন না।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, আমি কিছু বলতে পারি ? তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু বলব না।

কি আর বলবেন, ব্যাপার খুব জটিল।

এর মানে কি জানো, সেই পুরনো প্রবাদ, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস···

ব্যাশ, ব্যাশ, আর না, আব এগোবেন না।

মাতামহ অন্য পথে ঘুরে গেলেন। ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি রকম মামাশ্বশুর হে, ভাগনে-বউ দেখাই করতে চাইছে না !

আপনাবা ওর মাথাটা খেয়ে দিয়েছেন। স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন। জানে না, বক্ষিতার বেশি সম্মান ও এখানে পাবে না।

কি বললে ?

মাতামহ আসন ছেড়ে ছিটকে উঠলেন। চোখমুখ জবাফুলের মত লাল। ছ ফুট লম্বা মানুষ খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন চাবুকেব মত। যতই শরীর অসুস্থ হোক, যৌবনের ব্যায়াম আর কুস্তির চিহ্ন শরীবে এখনও লেগে আছে। হুঙ্কাব ছাড়লেন আর একবার, কি বললে তুমি ?

পিতৃদেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। মাতামহকে আগলাতে চান। ভদ্রলোক মিনমিনে গলায় বললেন, মারবেন নাকি ?

মাতামহ বললেন, তোমার মত ছুঁচোর গায়ে আমার হাত দিতে ঘেন্না করছে। স্রেফ দু'আঙুলে ঘাড়টি ধরবো, আর বেড়ালছানার মত তুলে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবো।

মাতামহ সত্যিই এগোচ্ছিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বুকের কাছে দাঁড়ালুম। জানি আমাকে ঠেলে এগোতে পারবেন না। শক্তি দিয়ে আটকাতে পারবো না। আমার সে ক্ষমতা নেই। স্নেহের দাবিতে এই সাধক মানুষটিকে হয়তো ঠেকানো যাবে। বিশ্রী একটা পরিণতিকে কোনোক্রমে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

ইন্দ্রিয়সেবী, মদ্যপ মানুষটি ভয় পেলেও অর্থের অহঙ্কারে যুঝে যাচ্ছেন। কাঁপা-কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমাকে তা হলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে !

মাতামহ বললেন, তোমাব আইনের মুখে আমি প্রস্রাব করি।

পেচ্ছাপই বলতেন। এত ক্রোধেও পিতার কথা ভোলেননি, শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করলেন। চাবির খোলোর শব্দে দরজার দিকে তাকালুম। কাকীমা ঘরে এলেন। এমন দৃপ্তভঙ্গি আগে কখনও দেখিনি। ঘরে ঢুকেই বললেন, আপনার আইন আমাদের কাঁচকলা করবে। আপনার স্বভাবচরিত্রের কথা একবার বলবো এঁদের সামনে! আশ্রয় দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে কি করেছিলেন? বলবো সব কথা এক এক করে! চলুন থানায়, এখুনি চলুন, আমি জানি, নিজের সুবিধের জন্যে আপনিই ভাগনেকে খুন করিয়েছেন। টাকার জোরে মানুষ সব করতে পারে। চলুন থানায়।

কাকীমা কোমরে আঁচল জড়িয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। ভদ্রলোক সিগারেট টানতে ভুলে গেছেন। মিউ মিউ করছেন, এ তুমি কি বলছ? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? এ তুমি কি বলছ?

সদরে গাড়িব হর্ন শোনা গেল। দরজা বন্ধ করার বোদা শব্দ। সামনের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

I shall go to her, but She shall not return to me

আমি শার্লক হোমস নই, তবু সিঁড়িতে জুতোর চলন দেখে অনুমান করতে পারছি, যিনি উঠে আসছেন তাঁর শরীর হালকা। মেজাজ বেশ খুশি খুশি। বেতালা নন, তাল, লয়, ছন্দের জ্ঞান আছে। অবশ্যই শৌখিন। কারণ পায়ের জুতো পঞ্চমে বাঁধা তবলার মত আধধায় বাজছে। কে আসছেন? এমন মানুষ একজনই আছেন, তিনি গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে।

দরজার আড়াল থেকে একটি মুখ উঁকি মারল। গোল্ড-ফ্রেমের রিমলেস চশমা। কপালের দুপাশে চুলের স্তবকের বিদ্রোহ। তসরের পাঞ্জাবি নেমে গেছে হাঁটু ছেড়ে। একটা কোণ, হাতার সামান্য অংশ দৃশ্যমান! ফুলপাড় কোঁচার একটু শাসন-ছাড়া অংশ চৌকাঠ ডিঙিয়ে থমকে গেছে। পাতলা ঠোঁটের ওপব তুলি দিয়ে আঁকা সূক্ষ্ম গোঁফ। টানা টানা দুটো চোখ জ্বল জ্বল করছে। চোখে শিশুর কৌতূহল, প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমি খেলা কবছে।

আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, মামা। মামা এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মামা আত্মপ্রকাশ করলেন। দু'হাত বাউলের মত ঊর্ধ্বে তুলে, গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলেন, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।

ঘরের বিশ্রী মাবমুখী থমথমে আবহাওয়া হঠাৎ তরল হয়ে গেল। কাকীমা আরও সাংঘাতিক কিছু বলার জন্যে হাত তুলেছিলেন, সে হাত বাতাসে স্থির। মাতামহেব বুকে লাগোয়া আমার মাথায় তাঁর স্নেহের হাত। পিতা কোমরের পেছন দিকে দু হাত রেখে পায়চারির ভঙ্গিতে স্থাণু। কাকীমার মামাশ্বশুব দু হাঁটুতে দু হাত রেখে গ্যাঁট হয়ে আছেন। ঠোঁটের পাইপ-লম্বা সিগারেট নিবে গেছে।

দৃশ্য দেখে মাতুলেব সংগীত একলাইনের বেশি এগলো না। তিনি বললেন, কি ব্যাপার, নাটক হচ্ছে না কি?

পিতা উল্টে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার জয়, তুমি?

মাতুল উত্তর দেবাব আগেই কাকীমা আবার আগেব কথার খেই ধরে শাসিযে উঠলেন, কি যাবেন থানায? যেতে চান? এখুনি চলুন। আজই তাহলে হাতে দড়ি পড়ুক।

মাতুল বললেন, কি ব্যাপার, চুরিটুরি হয়েছে না কি? আবে এ ভদ্রলোক তো আমাব চেনা। সিনেমা পাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। ভ্যাম্প গার্ল জুলিব সঙ্গে আপনাব তো খুব মাখামাখি। আবে মশাই চেষ্টা করলেই কি আর নায়িকা বানানো যায়! দুটি জিনিস চাই, শবীব আব এলেম। পযসা ঢেলে যান।

মামাশ্বশুর উঠে দাঁড়ালেন। সামনে কুঁজো হয়ে পড়েছেন। কাকীমাব দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে

তাকালেন। দু ঠোঁটের মাঝে সিগারেটের পাইপ। ওপরের ঠোঁটের চাপে নাকের দিকে উঁচিয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় দেহে একটু যেন যুবক-যুবক ভাব এসেছে। ঠোঁট থেকে পাইপ খুলে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আচ্ছা!

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে জুতোর শব্দ নেমে গেল ধাপে ধাপে নীচে। আশ্চর্য মানুষ! কি যে করতে চান বোঝা শক্ত। অসহায় একজন মহিলার উপকার? এ যেন সম্পত্তি দখলের লড়াই চলেছে। কাকীমা তো চলেই এসেছিলেন! স্বামী বেঁচে থাকলে কি হত? স্বামীর সঙ্গেই জীবন বেঁধে পেছন পেছন ঘুরতে হত। আজ অরক্ষিতা দেখে তেড়ে এসেছেন! ব্যবহারের বস্তু করতে চান। মূর্খ! দেহ তো কিনতেও পাওয়া যায়!

মাতুল বললেন, কি ব্যাপার? বাতাসে বারুদের গন্ধ?

পিতা বললেন, তুমি বোসো। আমার চিঠি পেয়েছ?

মাতুল বসতে বসতে বললেন, কই না, চিঠি তো পাই নি! কাল আমার রেডিও প্রোগ্রাম আছে, তাই আজ চলে এলুম। আপনি কি অসুস্থ! কি একটা হয়েছে! ঠিক ধরতে পারছি না।

পিতা বললেন, একটা নয়, এক সঙ্গে অনেক কিছু হয়েছে!

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন। যার অর্থ, সাধ করে ধরা দিতে এলে কেন বাপু! বেশ তো ছিলে, মনের আনন্দে!

মাতুল বললেন, আপনি চাদর গায়ে দিয়েছেন? চাদর তো আপনাকে কখনও গায়ে দিতে দেখি নি!

কাকীমা এই সব কথার ফাঁকে ভেতরে চলে গেলেন। অনেক কাজ। বাড়িতে অতিথি এসেছেন। যে সে অতিথি নন, ভোজনবিলাসী শিল্পী। মনের মত রান্না না হলে, পাতে বসে ঠকরে চলে যাবেন।

পিতৃদেব ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন। মাতামহের অসুস্থতা। প্রফুল্লকাকার মৃত্যু। নিজের দুর্ঘটনা। মামাশ্বশুরের আক্রমণ। শুনতে শুনতে মাতুল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। এসেছিলেন লঘু প্রজাপতির মত। ভেবেছিলেন পুষ্পোদ্যানে এসেছেন, যেমন আসতেন। বসন্ত যে বিদায় নিয়েছে! বৈশাখের জ্বলন্ত আগুনে সব শুকিয়ে গেছে। শীর্ণ শাখায় উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। প্রবীণ মানুষ দু'জনের অদ্ভুত প্রাণশক্তি। যতবার ভেঙেছে ততবার গড়েছেন নতুন ভাবে। এখনও সেই একই আশা। আবার হবে। আবার একদল আসবে শূন্যতা ভরে দিতে! আমার মন বলছে, এই শেষ। এ নাটকের যবনিকা পতনের সময় আসন্ন।

আমি যা ভাবছি, মাতুলও বোধহয় তাই ভাবছিলেন। সব শুনে উদাস মুখে বললেন, আবার সব ভাঙছে মনে হচ্ছে। ফাটল ধরেছে। বেশ কেমন সব গুছিয়ে উঠছিল!

পিতা বললেন, তুমি দুর্বল মানুষ, তাই তোমার চোখে ফাটল দেখছ, ভাঙন দেখছ। আমার কাছে এসব কিছু নয়। আমি থামতে জানি না, আমি ফিরতে জানি না। সহজে আমার মন ভেঙে পড়ে না। The tree the tempest with a crash of wood/throws down in front of us is not to bar/our passage to our journey's end for good./But just to ask us who we think we are. ভাঙলে ভাঙবে, আবার গড়ব।

মাতামহ বললেন, আমি তোমার দলে। তুমি রাজমিস্ত্রী, আমি তোমার জোগাড়ে। ইট, বালি, সিমেন্ট এগিয়ে দেবো, মশলা মেখে দোবো।

মাতুল বললেন, বাবাকে কাল আমি আমার ওখানে নিয়ে যাই। ভালো জল বাতাস, শরীরটা সারবে।

নট এ ব্যাড প্রোপোজাল। এটা তো বেদের টোল। তবু ওখানে একটু যত্ন-আত্তি পাবেন।

মাতামহ সাধকের মত আসন করে বসেছিলেন। বুদ্ধদেবের মত ডান হাতের তালুটি বুকের কাছে ধরে, ডাইনে বামে নাড়াতে নাড়াতে বললেন, আই ওন্ট গো। আই ওন্ট গো। আমার একপাশে হরি আর শঙ্কর, আর একপাশে হর হর গঙ্গে, হরিপাদপদ্ম বিহারিণী গঙ্গে, হিমবিধু মুক্তাধবল তরঙ্গে। আই ওন্ট গো। আমার যত্নআত্তির প্রয়োজন নেই। এ ঘর থেকে বের করে দাও, আমি রকে গিয়ে বসবো রক থেকে নামিয়ে দাও, সামনের রাস্তায় গিয়ে বসে থাকবো।

মাতুল মুখ ভার করে বললেন, আমার ওপর আপনি এখনো রেগে আছেন!

ধ্যার বোকা, রাগ হল যৌবনের অলঙ্কার। তিনকাল গিয়ে যার এককালে ঠেকেছে, তার আবার রাগ কি! অভিমান হয়তো ছিল, তাও ভেসে গেছে। এখন আমি উদাসী রাজনারায়ণ।

পিতা বললেন, আমি আপনাকে একদিন বলেছি কারুর মনে দুঃখ দেবেন না। দুঃখ টেনিস বলের মত বাউনস করে ফিরে আসে।

তুমি আমার গুরু হরিশঙ্কর। তোমার কথা ভুলতে পারি? আমি দুঃখ দেবার জন্যে বলিনি। ছোট্ট একটা ব্যাপার আছে।

কি ব্যাপার?

সে আমি বলতে পারবো না। আমার একটু লজ্জা লজ্জা করছে।

পিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লজ্জা! কিসের লজ্জা!

মাতামহ হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। কান্নার প্রথম আবেগ কোনওক্রমে সামলে নিলেন। বুকটা বিশাল হয়ে উঠল। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে, বাতাস দিয়ে আবেগের উৎসস্থল চেপে ধরলেন। ছোট ছোট বাক্যে বলতে লাগলেন, আমার মেয়ে তুলসী। তোমার স্ত্রী। আমি তাকে বড় অবহেলা করে এসেছি। সে একটা যুগ ছিল, সংসারে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদর হত বেশি। মাছের মুড়ো ছেলের পাতে, দুধের সব ছেলের ভাগে, ভালো জুতো, ভালো জামা। মা-মরা মেয়ে, ডুরে শাড়ি পরে, ধুলো পায়ে একা একা ঘুরছে। আমি এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই হরিশঙ্কর। কাকীমাদের মুখ ঝামটা খাচ্ছে থেকে থেকে। আর আমি? আমি এক শয়তান। আমাকে তখন ধর্মে পেয়েছে। ভণ্ডের ধর্ম। ধর্মের নামে মাংস চলছে, মাছ চলছে, অল্প-স্বল্প কারণবারি চলছে। ছেলেকে চপচপে গাওয়া ঘিয়ের মোহনভোগ খাইয়ে কাঁধে করে ওস্তাদের কাছে নিয়ে চলেছি ওস্তাদ বানাতে। তুলসী আমার একা। একদিন হঠাৎ বায়না শুরু করলে, কলকাতায় বিলিতি সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। কোনও দিন বায়না করে না, সেদিন যে কি হল! মাথায় যেন ভূত চাপল। বুঝলে হরিশঙ্কর, মারলুম ঠেসে এক চড়। ঘুরে পড়ে গেল চৌকাঠের ওপর। সামনের একটা দাঁতের কোণ ভেঙে গেল। ওই যে ছবি দেখছ হরিশঙ্কর, ওই যে দেয়ালে ঝুলছে, ওই ছবির তুলসী যদি এখন ফিক করে হাসে, তুমি দেখতে পাবে, একটা দাঁত একটু কোণা ভাঙা। এই বুড়ো সে জন্যে দায়ী। যার কোনও বিচার হল না! যার কোনও বিচার হবে না। তোমার ভাষায় যে হল, অলমাইটি ফাদার। তুলসীকে আমি কিছুই দিতে পারি নি হরিশঙ্কর, অবহেলা ছাড়া। যখন ভাবলুম এবার দিতে হবে, তখন সে চলে গেল অভিমানে, পাছে কিছু নিতে হয় বলে। তুমি জানো বিয়ের পর ওকে আমি একটা সাপ-বালা দিয়েছিলুম। জোড়া সাপ। সাপের চারটে চোখে চারটে লাল রুবি বসান ছিল। খুব বড় কারিগরের তৈরি।

পিতা বললেন, জানি।

তুমি জানো, একদিন সে ওটা ফেরৎ দিয়ে এলো।

জানি। আমিই বলেছিলুম দিয়ে আসতে।

তুমি? কেন বলেছিলে হরিশঙ্কর?

আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যে। আমি তখন খুব নীচ ছিলুম। অহঙ্কারে ফেটে পড়তুম। ক্রুড ছিলুম, ভালগার ছিলুম। আপনাকে বলেইছি, দুঃখ টেনিস বলের মত। কারুর দিকে ছুঁড়ে দিলেই ফিরে আসে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। কোনও মানুষই পারফেক্ট নয়। যত জ্বলবেন, যত পুড়বেন তত বিশুদ্ধ হবেন। আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চাই না। দুঃখে আপনার ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠুক। প্রতি স্পন্দনে একটি করে দেবদূত মুক্তি পাক। মনে পড়ে বায়রন তাঁর কন্যার দুঃখজনক অকাল মৃত্যুতে সমাধি ফলকে কি লিখেছিলেন?

মাতুল বললেন, I shall go to her, but she shall not return to me.

পিতা বললেন, তার মানে, আমি তার কাছে যেতে পারি, সে কিন্তু আমার কাছে আর ফিরে আসবে

মাতামহ বললেন, আমি যে তার কাছে যাবো বলেই বেরিয়ে এসেছি। আমি তো জানি সে আর আসবে না। যাহা যায় তাহা যায়। আমাব যৌবন আর ফিরবে না। কিশোরী তুলসী আর ফিরে আসবে না। পেছন দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধরবে না। জীবনে যত ভুল করে এসেছি সে সব আর শোধরান যাবে না। যা হযে গেছে তা হয়ে গেছে।

যাক না। আমার একটা ধারণা আছে শুনবেন ! আমাদের প্রত্যেকরই একটা করে অশরীরী ভৌতিক সত্তা আছে। ছাঁচের মত। আমাদের ধরাছোঁযার বাইরে। আমার একটা আমি আছে। আপনার একটা আপনি আছেন। কোথাও আছে। কোথায় আছে তা জানি না। প্রতিটি অনুশোচনার তরঙ্গে সেই ছাঁচের হৃদয় পাল্টাচ্ছে, মন পাল্টাচ্ছে, আকাব আকৃতি পাল্টাচ্ছে। আবার যখন আমরা ঢালাই হব তখন আমরা আবও সুন্দর হব। নিখুঁত হব। ভয় কি ? আপনি প্রাণ খুলে কেঁদে যান। অনুশোচনায় চড় চড করে পুডতে থাকুন। আমারও দিন আসছে। সকলেরই দিন আসবে। অতীত হাত ফসকে চলে গেছে যাক। ভবিষ্যৎ তো আছে।

মাতুল বললেন, দিদির তো তেমন দুঃখ করার কথা নয়। আমি তো সব সময় পাশেপাশেই থাকতুম। তারপব বিয়ের পর জামাইবাবু !

পিতা বললেন, জামাইবাবুর কথা আর বোলো না। তখন আমার তিন ভাগ অমানুষ ছিল আর এক ভাগ মানুষ। দোর্দণ্ডপ্রতাপে সংসাব করতে গিয়ে ঘাড-মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেলুম। তোমার দিদিকে আমি একেবাবে চেপে বেখেছিলুম। আমার তখন কি অহঙ্কার ! আমি পুরুষ ! জুজুর মত ভয় দেখিয়ে মজা পেতুম। আমাব সেই রেপ্লিকা, যেটা কোথাও না কোথাও আছে, সেটা দিন দিন আমার সঙ্কীর্ণতায় শুকিয়ে চামচিকিব মত হয়ে গেল। সামলে দেবার মত কেউ তো ছিল না পাশে। আমাকে ধাক্কা মারাব সাহস কারুর ছিল না। ভীরু আব কাপুরুষ নিযে সংসার করেছে অত্যাচারী হরিশঙ্কর। আব তুলসী ছিল ঠিক তুলসীবই মত। বুক ফাটতো, তবু মুখ ফুটতো না। রাবিশ্। আমি একটা রাবিশ্।

মাতামহ বললেন, তুমিও জ্বলছ হরিশঙ্কর ?

সর্বক্ষণ আমি জ্বলছি। আই অ্যাম এ বার্নিং মাস। অন্ধকাব নক্ষত্রের মত ধকধক করে জ্বলছি। জীবনেব পর জীবন জ্বলতে জ্বলতে একদিন হযতো পৃথিবীর মত হরিতাভ একটি গ্রহ হবো, তখন সেই মাটিতে জীবন জীবনেব মত খেলবে, প্রেমে, ভালোবাসায়, স্নেহে, আনন্দে। নিজেদের চিতা নিজেবাই সাজিয়ে যাই ততদিন। তাই তো আমি প্রফুল্লর স্ত্রীর প্রতি কঠোর হতে পারছি না আর আগের মত। বলতে পাবছি না নিজের পথ নিজে দেখে নাও। সে যে একেবারে অসহায় আশ্রিতা।

মাতুল বললেন, আপনার প্রতিপালনের মত সঙ্গতি আছে, একটা জীবন যদি আশ্রয় চায়, আশ্রয় দেওয়া উচিত।

জয়, মানুষেব তুমি কতটুকু জানো। এই সামান্য ব্যাপার কত অসামান্য হয়ে ওঠে একবার দ্যাখো

আমিও প্রস্তুত। এতকাল অকাবণে লড়েছি, এইবার একটা কারণে লড়ব। ছোবোল খেতে খে নীলকণ্ঠ হয়ে যাবো।

মাতামহ বললেন, তোমার পাশে আমি না থাকলে তুমি লড়বে কি করে। যত লড়াই তো আমবা দু'জনে করে এসেছি। এই যেমন একটু আগে এক পক্কড হয়ে গেল। ব্যাটাকে আমি মেরেই দিতুম নেহাৎ তোমার অবাধ্য হতে পারি না তাই !

মাতুল বললেন, লড়াইয়ের জন্যে সুস্থ শরীর চাই। ওখানে এক নম্বর হাসপাতাল, এক নম্বর ডাক্তাব, ভালো জল, ভালো হাওয়া। দিন কয়েক থেকেই চলে আসবেন।

মাতামহ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, যদি রাগ না করেন একটা কথা বলব !

পিতা বললেন, নিশ্চয় বলবেন।

আমার ভালো লাগে না। ওদের স্বভাবটা একটু ম্লেচ্ছ ধরনের। মুরগী, মুরগীর ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, এঁটো কাঁটার বিচার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক নেই। ধূপধুনো নেই। আমার ভালো লাগেনা হরিশঙ্কব ওস্তাদের বাড়ির হালচাল ওস্তাদের মত।

মাতুল বললেন, আপনি যে ভাবে থাকতে চান, সেই ভাবেই থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। মাছ-মাংস, ডিম বাড়িতে ঢুকবে না। আলাদা ঠাকুর ঘরের ব্যবস্থাও আছে।

কিন্তু! মাতামহ মুখ নিচু করে রইলেন। যখন মুখ তুললেন, চোখ দুটো ছলছল করছে। আবেগে বুক আবার প্রশস্ত হয়েছে। কোনও রকমে ঢোঁক গিলে বললেন, কিন্তু এখানে যে তুলসী আছে। তোমরা কেউ দেখতে পাও না হরিশঙ্কর, আমি দেখতে পাই, তুলসী এখনও এখানে আছে। আমার নাতিটার মুখের দিকে তাকাও। সেই চোখ, সেই নাক, মুখ, হাসির ধরন, ভাবভঙ্গি, সব তুলসীর মত। তার আত্মাও এখানে আছে। আমি যখনই আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকি, সে এসে আমার কপালে হাত রেখে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, বাবা, বড় কষ্ট? এই তো আমি তোমার মাথার কাছে বয়েছি।

মাতুল বললেন, ও আপনার মনের ভুল। দিদির খুব পুণ্য ছিল। দিদি কখনই ভূত হয়ে ঘুরতে পারে না।

পিতা বললেন, জয়, ব্যাপারটা ভূতপ্রেতের ব্যাপার নয়। এ সব বোঝার ক্ষমতা তোমার হবে না। এ [illegible]তে হলে তোমাকে আর এক প্লেনে চলে যেতে হবে। আমি জানি, উনি যে কথা বলছেন, তা সেন্টপারসেন্ট সত্য। এখানে যা শূন্য ওখানে তা পূর্ণ। তোমার চোখে যা নেই, আমার চোখে তা আছে, তোমার ভাবে নেই আমার ভাবে আছে। তুমি তো শিল্পী! তোমার তো এ সব বোঝা উচিত। সুরের পথে তুমি তো বিভিন্নলোকে চলে যেতে পারো ' পারো না?

হ্যাঁ, তা পাবি।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, জগতে কেউ দেখতে না পায়/লুকানো তাঁর বাতি/আঁচল দিয়ে আড়াল করে/জ্বালান সারা রাতি/ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই/আনাগোনা করে/অন্ধকারে হাসেন তিনি/আমাদের এই ঘরে!

মাতামহ ছেলেমানুষের মত বললেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। যেতেই যদি হয় আমি হরিদ্বারে যাবো।

কাকীমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, কি, তুমি বাজার করবে না? বেলা যে বেড়ে গেল।

মাতুল বললেন, চল, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, দু'জনে একসঙ্গে যাই। চল আজ বড়বাজারে যাই। কত দিন পরে এ বাড়িতে আমি পাত পাড়বো! বেশ গুছিয়ে বাজার করি দু'জনে মিলে।

পিতা বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে জয়। কখন রান্না হবে?

আপনি সময়ের কথা বলছেন? আপনি না বলেছিলেন, আমি সময়ের দাস নই। সময় আমার দাস। চালাও পানসি বেলঘোরিয়া।

কয়েক মাস আগে হলে পিতৃদেব এর উত্তরে কি বলতেন জানা নেই, আজ শুধু মৃদু হাসলেন। এ যেন বোমাবর্ষণের দিনে, নহবতে সানাই বসিয়ে বিবাহের আয়োজন। মাতুল আমার এক এমন চরিত্র যার উৎসাহ দমিয়ে দিতে সকলেরই খারাপ লাগে। প্রজাপতি ফুলের আনন্দে ডানা মেলে উড়বে। সেইটাই স্বাভাবিক। অ্যালবামে পেস্ট করে রাখবেন তাঁরা যাঁরা হৃদয়হীন।

ঝকঝকে নতুন গাড়ি। সামনে লেখা অস্টিন অফ ইংল্যাণ্ড। উর্দিপরা ড্রাইভার ফেদার ডাস্টার দিয়ে আদুরে গাড়ির ধুলো ঝাড়ছিলেন। মাতুল বললেন, গাড়িটা কি রকম ম্যানেজ করেছি বল?

কিনলেন?

ধ্যার, আমি তো এখন ফকির। জানিস তো, রাজার উলটো পিঠ ফকির, ফকিরের উলটো পিঠ রাজা। ওখানে আমার খুব খাতির বুঝলি। একেবারে ডনজুয়ান। চাটুজ্যেমশাইকে যেন বলিস নি! ডন জুয়ান কথাটা তেমন ভালো নয়।

ড্রাইভারকে বললেন, নিউমার্কেটে যাবো। কলকাতার কিছু চেনো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তো কলকাতারই ছেলে।

আমাকে বললেন, কতক্ষণ লাগবে বল তো?

আধঘণ্টা।

বুঝলি, বেশ জমে গেছে। কিছু একটা জানলে কিছু না কিছু কবা যায়, একেবারে বেকাব বসে থাকতে হয় না। তোকে আমি কিছুতেই আর্টের লাইনে আনতে পারলুম না। কি যে এক চাকবি ধরেছিস ?

আপনাকেও তো শেষ পর্যন্ত সেই চাকরিতেই যেতে হল।

এটাকে তুই ঠিক চাকরি বলতে পারিস না। অধ্যাপনা। না, এও চাকরিই বে। হল না, জীবনে যে সব স্বপ্ন ছিল, কিছুই তো বাস্তবে পরিণত কবা গেল না। চতুর্দিকে বার্থতা। তোদের বাড়িতেও তো এলোমেলো হাওয়া বইছে ' প্রফুল্লদাব স্ত্রীকে নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে হয়েছে !

বেশ ঘোলাটে। চারপাশে যা তা কথা চালু হয়ে গেছে।

তোরা কিছু বললি না, আমিও সাহস করে তখন জিজ্ঞেস কবলুম না। প্রফুল্লদা কি স্যাসাইড করেছেন ?

আজ্ঞে না ! সন্দেহজনক মৃত্যু। ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।

বাবা ' সে কিবে ? ভদ্রলোক খুন হয় ?

তাই তো হলেন।

চাটুজ্যেমশাইয়েব সাবাটা জীবনে একের পব এক কেবল উটকো ঝামেলা। এক যায় তো আর এক আসে।

তুই তখন ছোটো, বাড়িতে কাজ করতে এলো সুধীব। খুব ভালো, খুব ভালো। সুধীরেব প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। হঠাৎ একদিন পুলিস এসে ধরে নিয়ে গেল। কি ব্যাপার ! সুধীর এক ফেরাবী ডাকাত। পোঁটলাব ভেতব থেকে বিভলবার বেরোলো, আরও সব চোবাই মাল। সে এক হই হই ব্যাপাব। কিছুদিন পবে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এলেন রাঁধুনী হয়ে। বছর না ঘুরতেই তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বাবা এসে চেপে ধরলেন। জেবায় জেরায় অপরাধীর সন্ধান বেরোলো। ওই তোদেব পাড়ার মিষ্টিব দোকানেব বছব কুড়ি বয়েসের এক ছেলে। মার মার, কাট কাট ব্যাপাব। শেষে দুজনেই পাড়া ছাড়া হোলো। কিছু বলাব নেই। সবই হোলো গ্রহর কারসাজি। দ্যাখ এ যাত্রা আবার কি হয় ! আমিও চলে গেলুম বহুদূরে। তুই ওই ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে বল না, কেন এই সৎ ভালোমানুষটিকে বিপদে ফেলছেন। পযসাঅলা ও লোকটা কে হয় রে ?' ওই যে মর্কট মুনি ?

মামাশ্বশুর।

তার মানে প্রফুল্লদার মামা ! তুই বল আপনি ওইখানে গিয়ে সুখে থাকুন।

উনি যাবেন না। লোকটা ডিবচ।

সে আমি জানি। খুব ছোড়েল লোক। তাহলে, আমিই বরং আমার ওখানে নিয়ে যাই। তোর মামীব ছেলেপুলে হবে। আব একজন মহিলা থাকলে সুবিধে হবে।

চেষ্টা কবে দেখতে পারেন।

তোবা বল, তা না হলে ভদ্রমহিলা অন্যবকম ভাববেন। মানসম্ভ্রমে লাগবে।

দেখি আজ বাতে বাবাকে বলবো।

কথায কথায় গাড়ি নিউমার্কেটে এসে গেল। সায়েবী ব্যাপাব-স্যাপার। মাতুল আনন্দে ছটফট কবছেন। কখনও বলছেন বোনলেস ভেটকি কিনবেন। কখনও বলছেন, মেওয়া কিনবেন। কখনও বলছেন, এক ঝাঁক মুনিয়া পাখি কিনবেন। একবার এদিকে ছুটছেন, একবার ওদিকে ছুটছেন। পেছন পেছন গোটা তিনেক মুটে ছুটছে, সাহাব, সাহাব করে। মাতুলের হাত চেপে ধরে বললুম, আগে ঠিক করুন কি কিনবেন ? মনে মনে একটা ফর্দ তৈরি করুন।

তা হলে মাছ দিয়ে শুরু হোক, বোনলেস ভেটকি।

মাছের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মাতুল ওজন বললেন। কাটাছেঁড়া চলছে। হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, প্রফুল্লদার স্ত্রী মানে বউদি তো বিধবা হয়েছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে মাছ মাংস ডিম তো চলবে না ! তা হলে থাক। আমরা খাব আর উনি দেখবেন তা তো হয় না। চল তা হলে ভেজিটেবলের দিকেই যাওয়া যাক।

I could give all to time, except what I myself have held.

তম্বুরাটি বেশ মনের মত বাঁধা হয়েছে। মাতামহ ঠিক যেমনটি চান। মাতুল হারমোনিয়ামে ছোটো ছোটো তান ছাড়ছেন, ঠুংরির মুখ মোচোড় মেরে মেরে উঠছে। আমার কাঁধে তানপুরা। সামনে পাশাপাশি বসেছেন মাতামহ আব পিতৃদেব। সন্ধে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এইমাত্র চা হলো। এইবার আসর বসবে। কারুর মনেই তেমন সুখ নেই। সকলেরই মন বলছে, কিছু একটা ঘটবে। কি ঘটতে পারে জানা নেই। আজ অক্ষয়কাকাবাবু এলে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে বলতে পারতেন, কার ভাগ্যে কি নাচছে। মাতুলের একটু রেওয়াজের প্রয়োজন। আগামীকাল, তিন তিনটে সিটিং এ আই আর-এ। সকালে খেয়াল। গাইবেন দেশী টৌড়ী। সন্ধেবেলা গাইবেন ইমন। রাতে ঠুংরি।

মাতুল হারমোনিয়ামে একটা সাপাট তান মেরে, সুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আহা, আজ যদি প্রফুল্লদা থাকতেন !

পিতা বললেন, আমার শরীরটা ঠিক খাকলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গতে বসতে পারতুম। বুকটা এখনও ইনফ্লেমড হয়ে আছে।

মাতুল ঘাড় নিচু করে বার দুয়েক সুর ভেঁজেই গান ধবে ফেললেন। নিমেষে ঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেল। শ্রোতাবা স্তম্ভিত। এত বেলায় খাওয়া হয়েছে, তবু মাতুলের গলা অসাধারণ বলছে। ডি সার্পে গান ধরেছেন। তারায় গিয়ে যখন সুর টেনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ঘরের কাঁচের শার্সি চিন্ চিন্ করে উঠছে। পাশে রাখা চায়ের খালি কাপ-ডিশ উল্লাসে গলা মেলাচ্ছে। গানে বসলে মাতুলের চোখমুখ, হাবভাব একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। পুরো ব্যক্তিত্বটাই একেবারে পাল্টে যায়। মনে হতে থাকে বহুদূরের মানুষ। পৃথিবীব সব সম্পর্কের বাইরের এক সুর-সাধক। মীড়, মূর্ছনা, গমক, চক্রধা তানে ইমনের রূপ-কল্পনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

মাতামহ যে জায়গায় বসেছেন সেদিকে আলোব শেড একটা ছায়া ফেলেছে। তপ্তকাঞ্চনের মত গাত্রবর্ণ, স্থির বসে থাকাব ভঙ্গি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, মহাদেব যেন গান শুনতে এসেছেন। চোখ দুটি নিমিলিত। মুখে অসাধারণ এক তৃপ্তির ছোঁয়া লেগেছে। ছেলেব মত ছেলে হলে কোন্ পিতার না গর্ব হয় ! আমিও যদি কিছু একটা হতে পারি, পুত্রগর্বে আমার পিতার বুক ভরে যাবে। আমার দ্বারা আর কি হওয়া সম্ভব ? দরকচা মেরে গেছি।

মাতুল আমার হাতে কনুইয়ের খোঁচা মেরে ইশারায় বললেন, ধর, ধরে ফেল।

আমাব গলা সি শার্পে, ডি-তে তুলি কি করে ? মাতামহ চাপাস্বরে বললেন, ধব, ধর, ধবে ফেল। মাতুল ছোট্ট একটি তানের কাজ করে গানের মুখটি আমায় দিয়ে দিলেন। আর উপায় নেই। সময় সময় মানুষের ভেতরটা জেগে ওঠে। তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুর্বলও লোহাব গরাদ বাঁকিয়ে ফেলতে পারে। আমারও তাই হোলো। সুর আমার পরিচিত। আরোহণ, অবরোহণ, বাদী সমবাদী জানা। গানের বাণী আমার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাণী অধিকাংশ সময়েই অস্পষ্ট। সুরের তলায় লুকিয়ে থাকে। কিভাবে জানি না মুখটাকে ঘুরিয়ে সমে ফেলে দিলুম। মাতুল বললেন, বহত আচ্ছা !

সুরকে কি কি ভাবে কত ভাবে যে মোচড়ানো যায় ! কত বিচিত্র যে তার গতিপথ ! প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল একই ইমন চলছে, তবু একঘেয়ে, ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে না। লয় চলেছে ঘড়িব মত। সুরে

আর সময়ে টানাপোড়েন চলেছে। সুরের একটা আবরণী তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে সময় আর শ্রোতা স্তব্ধ।

শেষ চরণটি গেয়ে মাতুল গান ছাড়লেন। চোখ আধ্‌বোজা, ফর্সা মুখে চাপা আলো খেলছে। ফিস্ ফিস্ করে আমাকে বললেন, গান শেখ গান শেখ। বড় আনন্দ পাবি! কোথায় যে চলে যাবি! ম্যাজিসিয়ানের দড়ির খেলার মত সুর ওপরে উঠতে উঠতে তোকে অনন্তে নিয়ে যাবে। লেগে যা ব্যাটা।

মাতামহ তৃপ্ত মুখে মৃদু মৃদু হাসছেন আর হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মারছেন। পিতা বললেন, নিজের মেজাজের জন্যে তুমি একঘরে হয়ে রইলে। বাইরের জগতের সঙ্গে একটু যদি মানিয়ে চলতে শিখতে?

মাতুল হারমোনিয়ামে সুর টিপে বললেন, গান আমি ফেরি করতে পারব না। এ আমার অহঙ্কার নয়, আমার আদর্শ। এর জন্যে না খেয়ে মরতে হলেও আমি প্রস্তুত।

তুমি যে সংসার করে ফেলেছ জয়।

বাউলেরও তো সংসার থাকে। সেই ভাবেই নেচে নেচে আকাশবৃত্তি করে বেড়াবো।

মাতুল হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে গান ধরলেন। দেশ রাগে ঠুংরি। ধরা মাত্রই বাতাসে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। নির্বাপিত হোমকুণ্ডে আঘাত করলে চারপাশে যেমন স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে, সেই রকম কণা কণা সুর সারা ঘরে লম্বা লম্বা আলপিনের মত ছুটতে লাগল। মাতুল গাইছেন, সৈঁইয়া কবো তোবে শ্যাম। বেশ, একেবারে কান্নার রাগিণী। ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে দেয়। প্রথম লাইনটাই মাতুল কতভাবে গাইছেন!

> সৈঁইয়া করো তোরে শ্যাম
> করত জিয়া বিমতি রাতি ॥
> মানত নেহি মেরি বাতিয়া
> ক্যায়সে কাটাউ দিন রাতিয়া ॥

এক একটি শব্দ যেন সুরের ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কোনোটা জানালা গলে উড়ে যাচ্ছে দূর তারা-ভরা আকাশের দিকে। কোনোটা লাট খেয়ে ফিরে আসছে। কি যে হচ্ছে, বলে বোঝানো যাবে না। ফিনফিনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে মাতুল বসেছেন। অনামিকায় হীরেব আঙটি চিকমিক করছে। সিনেমা সব নিয়েছে, আঙটিটা নিতে পারেনি। ঘাড়ের কাছে চুল নেমে কুঁকড়ে আছে।

সেদিন চিৎপুরে বড় মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্বজন্মের হঠাৎ যে অনুভূতি হয়েছিল, আজও যেন তাই হচ্ছে। ছায়া ছায়া নির্জন রাস্তা ধরে জুড়িগাড়ি চেপে চলেছি। মধ্যরাতেব নির্জন পাতা কাঁপানো বাতাস। ঘোড়ার গলার রূপোর ঘণ্টা বাজছে শৌখিন সুরে। দূর থেকে ভেসে আসছে বাঈজীর গলা। কাফীসিন্ধুতে দাদরা ধরেছে। তবলার লগ্‌গি চলেছে। কতকাল আগের সেই নেশার রাত আজ আবার ফিরে এসেছে। গোলাপী বেনারসীর আবরণে সুঠাম শরীর। এক হাতে কান চেপে আর এক হাত শূন্যে ভাসিযে তেহাই মেরে সমে আসছে। নাকছাবির হীরের চোখ মাঝেমাঝে আলোর ছোবল মেরে যাচ্ছে। তবক লাগানো পানের খিলি, মোহরের থলি। আমি যে তখন কি ছিলুম? কি থেকে কি হলুম! একই সঙ্গীত আমরা তিনজনে শুনছি। পিতার চোখ মুদ্রিত। মাতামহের অশ্রুসজল। আর আমার। বড় সংসার করতে ইচ্ছে করছে। একে একে তারা আসছে। কনক, অপর্ণা, মুকু, এমন কি আমার প্রথম প্রেম মায়া। রাতের উতলা বাতাসে সুবের পথ বেয়ে তারা সব একে একে আসছে। এ যেন আমার ফুলশয্যার রাত।

রাস্তা দিয়ে হেঁকে চলেছে সেই চেনা ফেরিঅলা, ভারি চাপা গলা, মালাই। এ গলা আমি পূর্বজন্মে বহুবার শুনেছি। তখন হাঁকত, বেলফুল। পিতৃদেব বলেছিলেন, কোথাও না কোথাও আমাদের একটা অশরীরী ছাঁচ আছে। দেহগত আত্মার ক্ষণ আবেগে প্রতি মুহূর্তে সেই ছাঁচের আদল পাল্টাচ্ছে। সেন্‌সিটিভ ফটোগ্রাফিক প্লেটের মত পরবর্তী ব্যবহারের জন্যে সব ইমোশানের ছাপ ধরা থাকছে। সৃষ্টিকর্তা আলোর দিকে একস্-রে প্লেটের মত তুলে ধরবেন, পরবর্তী জন্মের সময় মেপে মেপে

হৃদয়বৃত্তি, দেহবৃত্তির পাওনা বুঝিয়ে দেবেন। এই নাও তোমার অর্জিত ফল। প্রারব্ধ বুঝে নিয়ে প্রবেশ কর মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে। এই মুহূর্তে আমার মন ছেয়ে গেছে অদ্ভুত এক কামমিশ্রিত আধ্যাত্মিক ভাবে। একজন মানবীকে পেতে চাইছি উপাস্য দেবী হিসেবে।

মাতুল গান শেষ করলেন। সুর জলপ্রবাহের মত ছোট বড় তরঙ্গের আকারে অসীমে ধাবিত হল। বাইরের জগতের প্রাত্যহিক কোলাহলের ছিটেফোঁটা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। গাড়ির শব্দ, লোক চলাচলের শব্দ, পথচারীর বাক্যালাপ।

মাতামহ হঠাৎ গান ধরলেন। সেই এক সুর। দেশ। উগ্রচণ্ডা ভাবে নয়। মৃদু সুললিত। মাতামহের এত সংযত সুর ভাঁজা আগে কখনো শুনিনি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যার অর্থ তানপুরাটা আমার হাতে দাও। মাতুল হারমোনিয়ামে অনুসরণ করছেন। মাতামহ সোজা বসেছেন। কাঁধে তানপুরা। ধীরে সুর ছাড়ছেন। আলাপে সুরের অবয়ব তৈরি হল। গান ধরলেন,

উঠো গো করুণাময়ী খোলো গো কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁদে অনিবার ॥

দুটি চরণই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন। সুর থেকে এতটুকু সরে যাচ্ছেন না। আবেগে মাঝে মাঝে গলা বুজে আসছে। ক্রমশই বুক চিতিয়ে উঠছে। মেরুদণ্ড সোজা হচ্ছে, হৃদি কাঁদে অনিবার বলার সময় সত্যিই কেঁদে ফেলছেন। দু চোখে ধারা নেমেছে। মুখে অদ্ভুত এক ধরনের দ্যুতি খেলছে। বহু আসরে বসে বহু নামজাদা সঙ্গীত গুণীর পরিবেশন শুনেছি, এমন জীবন-মরণ সঙ্গীত আগে কখনও শুনিনি। সুব মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মত আমাদের অন্তরাত্মা ভেদ কবে যাচ্ছে। মাতুলের সংযত হারমোনিয়াম অনুসবণ করে চলেছে। দরজার চৌকাঠে কাকীমা এসে বসেছেন। সারা ঘর ঝিম ঝিম করছে। মাতামহ তাবা থেকে মুদারায় নেমে এসে, করুণ আকৃতিতে বললেন, খুলো গো কুটীরদ্বার, তারপর নাভিপদ্ম থেকে একটি শব্দ তুললেন, ওঁ। এমন ওঁ-কার ধ্বনি শুনিনি কখনো। পর্বতের নির্জন গুহাব নিবিড়তা থেকে মেঘ গর্জনের শব্দেব মত উচ্চারিত হল। আমাদের সমস্ত শরীর শব্দ তবঙ্গে কেঁপে উঠল। তানপুরাটি মাতামহের শিথিল হাত থেকে ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে আসছে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললুম। পিতৃদেব আর মাতুল দু'জনে একসঙ্গে বললেন অপূর্ব, স্বর্গীয়!

মাতামহের কোন ভাবান্তর নেই। নিশ্চল, ভাষাহীন। সারা ঘরে অপূর্ব এক সুগন্ধ। একই সঙ্গে গোলাপ আব চন্দনেব সুবাস। পিতা বললেন, কোথা থেকে ধূপের গন্ধ আসছে!

মাতুল বললেন, মৃগনাভি।

মাতামহ স্থির নিশ্চল। পদ্মাসনে বসে আছেন। সারা মুখমণ্ডলে অদ্ভুত এক দ্যুতি। মুদ্রিত চোখে কাকে যেন দেখেছেন, যিনি সচারচর সাধারণ মানুষকে দেখা দেন না।

পিতা বললেন, এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

কোনও উত্তর নেই।

মাতুল হারমোনিয়াম ছেড়ে পাশে সরে এসে বললেন, আপনাকে প্রণাম করি। আপনার গান শুনে সময় সময় কত ব্যঙ্গ করেছি, আজ যা শোনালেন, তার কোনও তুলনা হয় না।

মাতুল পায়েব আঙুল স্পর্শ কবে চমকে উঠলেন, একি বরফের কুচি! চাটুজ্যে মশাই একবার দেখুন তো!

পিতা সামনে ঝুঁকে মাতামহের মুখের দিকে তাকালেন, হামাগুড়ি দিয়ে বুকে কান রাখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, হরি ওঁ, হরি ওঁ।

মাতুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কি হল?

উঠে দাঁড়াও।

আমরা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালুম।

এদিকে এস। এই দ্যাখো ব্রহ্মতালু খুলে গেছে। সাধক দেহত্যাগ করেছেন।

মাতুল হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে শুধু একবার বললেন, বাবা। সকলের

চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলেন ধরতে পারলুম না!

পিতৃদেব প্রহরীর মত পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'চোখে জল নেমেছে। মায়ের ছবির দিকে তাকালুম। চোখের ভুলও হতে পারে। মনে হচ্ছে মা যেন কিছু একটা বলে ঠোঁট বোজাচ্ছেন। কি বললেন তাও যেন শুনতে পাচ্ছি—বাবা চলে এসো। অনেকদিন হয়ে গেছে, আর না। এবার ঘরে ফিরে এসো।

কাকীমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। আমি আর সইতে পারলুম না। মৃত্যু যতই মহান হোক, সব থেকেও মানুষের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যেতে পারে, সেই প্রথম অনুভব করলুম। শূন্য একটা খোলসের মত মাতামহের পায়ের কাছে পড়ে গেলুম। সতীমা গঙ্গার ঘাটে যেদিন আমাকে স্পর্শ করেছিলেন সেদিন আমার ঠিক এই রকমই হয়েছিল। সেই ভয়াবহ প্রান্তর আবার ফিবে এসেছে। প্রদোষের অন্ধকার। ছাই ছাই রঙের মাঠ, গাছপালা, কাঁটা ঝোপ। ছোটো ছোটো টিলা। মাতামহ আগে আগে চলেছেন। সোনালি গেরুয়া বসন। মনে হচ্ছে পা যেন ফেলছেন না, অথচ আমি তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় উড়ে আসছে। ডানার সামান্যতম আস্ফালন নেই। তারা যেন ঘন অন্ধকারের চাদর টেনে আনছে। বহুবার ডাকার চেষ্টা করছি, বলার চেষ্টা করছি, দাদু আপনি কোথায় চলেছেন? গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি দিয়ে সাজানো, অদ্ভুত চেহারার একটা দুটো বাড়ি। মনে হচ্ছে ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। পত্রহীন একটি গাছের তলায় মাথায় হাত রেখে দুটি মানুষ পাশাপাশি উবু হয়ে বসে আছে। যেন উইয়ের ঢিবি। ফুটো ফুটো, বিঁধ বিঁধ হয়ে গেছে। মাতামহ সোজা চলেছেন। হঠাৎ আমার চোখ ঝলসে গেল। সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সোনার পাতে মোড়া দিগন্তে রুপোর চাঁদ উঠেছে। আমার সামনে বিশাল এক জলাশয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সোনালি আর রুপোলি তরঙ্গ খেলছে। মাতামহ ধীরে ধীরে সেই জলের ওপব দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সোনালি ছায়া ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখছি। রুপোলী সমুদ্রে স্বর্ণপ্রতিমাব ধীব নিমজ্জন। স্বচ্ছ জলে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলে দিলে যেমন হয়, মাতামহ ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরে নেমে গেলেন, স্বর্ণদ্যুতি নিক্ষেপ করতে করতে। আর তাঁকে দেখা গেল না। অসীম শূন্যতায় নির্জন দিগন্ত। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক নীল পাখি এসে জলের ওপর নিঃশব্দে উড়তে লাগল। মনে হল আমি এক তরল হোমকুণ্ডের তটভাগে এসে দাঁড়িয়েছি।

অচৈতন্য হয়েছিলুম কিনা জানি না, হঠাৎ পরিবেশে ফিরে এলুম একটি শব্দ তরঙ্গ ধরে—জয় রাম, জয় রাম। এ যেন আর এক স্বপ্ন। ঘরে প্রবেশ করছেন হরিদ্বারের সেই সন্ন্যাসী। মাতামহের গুরুদেব। বেটা হাম আ গিয়া। ঠারো ঠারো।

মাতামহকে উপবিষ্ট অবস্থা থেকে শায়িত করার চেষ্টা চলেছে। কাকীমা দরজার কাছ থেকে ঘরের আর একটু ভেতরে এসেছেন। পিতৃদেব আর মাতুল দুপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখে দু'জনেই অবাক হলেন গুরুজী, আপ?

হাঁ বেটা, হাম আ গিয়া।

সন্ন্যাসী পর পর কয়েকটি কাজ করতে বললেন। বেলপাতা চাই, তুলসী পাতা চাই, চন্দনবাটা চাই। গঙ্গাজলের প্রয়োজন। ফুল, ফুলের মালা, একটি সোনার তবক। মৃত্যুর পর মানুষের শরীর শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়া উচিত। মাতামহ কিন্তু প্রস্তর মূর্তির মত একই ভাবে মৃত্যুস্থ। ধ্যানস্থ বলি কি করে!

আমার আচ্ছন্নভাব কেটে এসেছে। এখন অনেক কাজ। তুলসীপাতা বাড়িতেই আছে। বেলপাতা চাই। সোনার তবক, সে কোথায় পাবো! পিতা কাকীমাকে বললেন, বউঠান একটু চন্দন ঘষে ফেলো। অন্তত এক বাটি। আমাকে বললেন, বেলপাতা, ফুল, ফুলের মালা নিয়ে এসো। যত তাড়াতাড়ি পারো। কোনও কৃপণতা করো না। সন্ন্যাসী মাতামহের পাশটিতে আসন করে বসেছেন। মৃদুস্বরে একই ভাবে বলে চলেছেন, জয় রাম, জয় রাম। বেরোবার সময় পিতৃদেব বললেন, বাইরেব কাউকে তুমি এই মৃত্যুর কথা বলবে না।

রাস্তায় নেমে গোটা কতক কথা ভাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। রাত নেহাৎ কম হয়নি। ফুল পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। সমস্যা বেলপাতার। আজ বৃহস্পতিবার হলে কথা ছিল না। মায়াদের পেছনের বাগানে বেলগাছ আছে। পুকুর ধারে। টাটকা বেলপাতা। কিন্তু যাই কোন মুখে। বহুকাল মায়ার খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। ভয়ে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ভয়। স্বার্থপর ভাবে ভাবুক আমাকে যেতেই হবে। দু-চারটে কথা শোনাবে বাঁকা বাঁকা। তা শোনাক।

বেড়ার পাশ দিয়ে অন্ধকার ছায়াঘেরা পথ। আঁস্তাকুড়ে সাদা মত একটা বেড়াল বসেছিল। পায়ের শব্দে থমকে থমকে পালাল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। রাতের মত দেবী শয্যা নিয়েছেন। ধূপ আর ধুনোর গন্ধ এখনও বাতাসে ভাসছে। মায়ার পিসীমা দাওয়ায় বসে দুলে দুলে মহাভারত পড়ছেন। অনেকটা গোঙানির মত শোনাচ্ছে। মাটির উঠনে তাঁর ছায়া দুলছে।

মায়া দেয়ালে পীঠ দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসেছিল। আমি দাওয়ার পাশে দাঁড়াতেই সে হাই তুলল। গোটা কতক তুড়ি বাজিয়ে, জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে? অন্ধকারে আমি তেমন স্পষ্ট নই। উত্তর দিলুম, আমি পিণ্টু।

তুমি? তা কি মনে করে? পথ ভুলে গেছ নাকি?

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। এত দুঃখেও আমি দেখলুম, মায়ার শরীরে জোয়ার এসেছে।

ফলপাকা বেলী ততী ছিটকায়া সুখ যাহি।
সাঁঙ্গ আপনা করি লিয়া সো ফিরি উঁগে নাহি ॥

মায়া আমার সামনে দাওয়ায় এসে বাঁশের বাতা ধরে সামনে ঝুঁকে দোলখাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল। আমি এক ধাপ নিচে মেটে উঠনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখের সামনে মায়ার বুক শরীরের আন্দোলনে থরথর করছে। বিকেলে চুলে তেল দিয়ে বড় খোঁপা বেঁধেছে। কপালে কাঁচ পোকার টিপ। পাশ থেকে লণ্ঠনের আলো ছিটকে এসে মুখের একপাশে পড়ে চিকচিক করছে।

মায়ার পিসীমা বললেন, এসো বাবা এসো। এতদিনে আমাদের মনে পড়ল? ঘর থেকে একটা আসন এনে দে মায়া।

আমি এখন বসতে পারব না। দুটো বেলপাতা নিতে এসেছি।

মায়া হিহি করে হেসে মাথার চুল খামচে দিয়ে বললে, পার্বতীর কাছে যাও, মহাদেবের মাথায় রাত বারোটার সময় একমাত্র তিনিই বেলপাতা ফেলতে পারেন, আর নয়তো দস্যু রত্নাকর।

এরা কেউই জানে না আমি আজ কি মন নিয়ে এখানে এসেছি। মায়ার দেহতত্ত্ব, পিসীমার ধর্মতত্ত্ব, সব কিছুই আজ স্বাদহীন। আমি খুব মৃদুস্বরে বলতে বাধ্য হলুম, মায়া, এইমাত্র আমার দাদু মারা গেলেন।

মায়া সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গুছিয়ে দাঁড়াল। আর সামান্যতমও চপলতা নেই। পিসীমা মহাভারত মুড়ে রেখে বললেন, আঁ, সে কি! অমন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ মানুষ! এই তো কালও দেখলুম বেশ সুস্থ মানুষ!

ঘণ্টাখানেক আগেও সুস্থ ছিলেন। গান গাইতে গাইতে সমাধি।

সমাধি?

হ্যাঁ বসে বসেই মৃত্যু। ব্রহ্মতালু খুলে গেছে।

বলো কি, সাধকের মৃত্যু? শুনেছি, খুব সাধন-ভজন করতেন।

মায়া বললে, বেলপাতা যে গাছে। রাতে বেলগাছে হাত দিতে আছে গো পিসী!

ঘরে চৌকির তলায় দেখ না। চুবড়িতে আছে কি না!

মায়া লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকলো। পিসী বললেন, হ্যাঁ বাবা আমি একবার দেখতে যেতে পারি?

কি উত্তর দেবো ভেবে পেলুম না। পিতৃদেব নিষেধ করেছিলেন, মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র কোরো না। কেন তা জানি না। বেলপাতা নোবো অথচ কিছু বলব না, তা কি করে হয়! আমতা আমতা করে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন আসতে পারবেন না! নিশ্চয় পারবেন।

অনেকে এসেছেন?

না, না। আপনাকেই আমি প্রথম বললুম। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই আশ্চর্যজনক ভাবে হরিদ্বার থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন। দাদুর গুরুদেব।

সাধকের মৃত্যু সংবাদ এই ভাবে বাতাসে ছড়ায়।

মায়া গোটাকতক শুকনো বেলপাতা হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। মায়াটাকে আমি আর কিছুতেই মানুষ করতে পারলুম না। এত কাছাকাছি গায়ে গা লাগিয়ে এসে দাঁড়ায়, নিজেরই লজ্জা করে। এইভাবে কোন দিন আমার একটা দাবি জন্মে যাবে, তখন আমার জায়গায় অন্য কাউকে দেখলে হয়তো খুনই করে ফেলবো।

মায়া বললে, দ্যাখো, এতে হবে!

একেবারে শুকিয়ে গেছে!

জানি এতে হবে না। পিসী, গাছে হাত দোবো?

তুই হাত দিস নি। ব্রাহ্মণ মানুষকেই বল। বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকে; আর একটা লণ্ঠন জ্বেলে নে।

অন্ধকার ঝুপসী বাগান। অসংখ্য ঝিঁঝি ডাকছে। মজা পুকুরে একটা ব্যাঙ কটর কটর করে অন্ধকার চিরোচ্ছে। ঝোপের মধ্যে খস্‌খস্‌ করে কি সব চলে বেড়াচ্ছে। মনে হয় সাপ। গরমকাল সাপেদের এই তো নিশাভ্রমণের সময়। আঙুলে একটু ঠুকরে দিয়ে গেলেই হোলো। মৃত্যুশোকে এত কাতর হলে কি হবে, নিজের জীবনের চিন্তা কত প্রবল!

মায়া আমার পাশে। মাঝে মাঝে আমার পায়ে তার শাড়ির তলার অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কাঁধে কাঁধে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। সরু পথ। লম্বালম্বা ঘাস। পুকুরে ছাঁচি পানা। জোলো গন্ধ ছাড়ছে। পুরনো পাঁচিলের গা ঘেঁষে বেলগাছ। বেশ ডালপালা মেলেছে। কোনো এক সময় তলায় একটা বেদী ছিল। ভেঙে উলটেপালটে পড়ে আছে। বেলগাছের কম তেজ!

মায়া লণ্ঠনটা নিচে রাখল। ঝোপে আলো পড়েছে। রাতের বেলা ঝোপঝাপ কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। অসংখ্য চোখ সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস্‌ করে যেন বলাবলি করছে—এরা কারা। বেলগাছের সবকটা ডালই আমার হাতের নাগালের বাইরে। ডিঙি মেরে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা গেলেও টেনে নামানো সম্ভব নয়। মায়া বললে, দাঁড়াও ওভাবে হবে না। হয় তুমি আমাকে কোলে তুলে ধরো, না হয় আমি তোমাকে তুলে ধরি।

লণ্ঠনের আলোয় মায়ার দিকে একবার তাকালুম। ভরাট স্বাস্থ্য। নিটোল নিতম্ব। আমি জড়িয়ে ধরতে পারি। তুলতে পারবো না। মায়া আমার মুখ দেখে বললে, বুঝেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ছোঁয়া পাতা তুমি নেবে না।

কি বলছো তুমি? আমাদের পরিবারে জাতের বিচার নেই।

খুব আছে। ব্রাহ্মণ শুদ্র না থাক। বড়লোক, গরীবলোক আছে।

সে কি?

তা হলে তুমি আসো না কেন? কেন আসো না?

কথা বলতে বলতে মায়া কোমরে আঁচল জড়াচ্ছে। মায়ার ঠোঁট দুটো ভারি পাতলা। মুখটা পানের মত। চোখ দুটো অদ্ভুত সজীব। আমি কিছু বোঝার আগে খপ্‌ করে দুহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে তুলে ফেলল, নাও এবার ব্রহ্মদত্যি হয়ে পাতা ছেঁড়ো। ধেড়ে ধেড়ে কাঁটা

আছে, খোঁচা খেয়ে মোরো না যেন।

সেই কোন কালে শিশু ভোলানাথ মায়ের কোলে উঠত। আজ মায়ার কোলে। টাটকা কচি কচি পাতা এখন আমার হাতের নাগালে। শরীরের নিম্নাংশ এদিকে বড়ই অসহায়। ভাঙা বেদীর ঢকঢকে ইটে মায়া তেমন অবলম্বন পাচ্ছে না। অল্প অল্প টলছে। দু'জনে এক সঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে না যাই।

মায়া বললে, হয়েছে! আর তোমাকে রাখতে পারছি না। আগের চেয়ে একটু মুটিয়েছ।

আমি বললুম, হয়েছে, এইবার নামাও।

ধীরে ধীরে পা দুটো মাটিতে নেমে এলো। মায়া তখনও জড়িয়ে ধরে আছে।

কি হোলো ছাড়ো।

যদি না ছাড়ি!

মায়া, প্লিজ, আমার দাদু মারা গেছেন। তুমি জানো না, এর চেয়ে শোকের আমার কাছে আর কিছুই নেই।

মায়া অনায়াসে বললে, দাদুরা মরবেই। এ আবার এমন শোকের কি? বুড়ো হলেই মানুষকে মরতে হয়।

তুমি ছাড়ো মায়া, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ছাড়তে পারি, যদি কথা দাও আজকালের মধ্যে তুমি অবশ্যই আসবে।

হ্যাঁ আসবো।

মনে থাকে যেন হাতে বেলপাতা।

মনে থাকবে।

আচ্ছা তুমি না বলছিলে, জাত মান না!

না মানি না, ওসব সেকেলে বিচার।

তুমি আমার ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে?

মায়ার প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ আবার কি অদ্ভুত আবদার! হঠাৎ মনে হল স্বামীজী যদি জাত যায় কি না দেখার জন্যে ব্রাহ্মণেতর জাতির হুঁকো খেয়ে থাকতে পারেন, আমি পারব না কেন, তাঁর মন্ত্রশিষ্য হয়ে!

মায়া চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললে, কি পারবে?

হ্যাঁ পারবো।

তবে দাঁড়াও, ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নি। নাও এসো।

মায়া দু'হাত দু'পাশে মেলে এমন ভাবে এসো বললে, সারা শরীর কেমন যেন করে উঠল। ঈশ্বর আমার চলার পথেই কি যত গর্ত খুঁড়ে রেখেছেন! এক কদম এগোই, কি একটা করে গর্তে গিয়ে পড়ি। এই অন্ধকারে বেলতলায় এ কি কাণ্ড! পিসী অবিলম্বে মায়ার কেন বিয়ে দিচ্ছেন না! মায়ার সময় হয়েছে।

রক্ত দিয়ে মানুষ ঋণ শোধ করে। আমি আমার ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত করে বেলপাতা নিয়ে নিজেকে ধিক্কার জানাতে জানাতে রাস্তা হাঁটছি। নিজেও এক শয়তান। অছিলার অভাব নেই। পাপের পথে যেতে চাস তো যা, আধ্যাত্মিক নজির খাড়া করিস কেন! ক্ষুদ্র কীট পর্বতের সঙ্গে তুলনা!

বিষ্টুদা সামনের কল থেকে জল নিয়ে দোকানে ঢুকছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কি ব্যাপার পিণ্টু, তুমি এত রাতে ডালপালা নিয়ে বাজারের দিকে চললে কোথায়?

এমন একজন মানুষকে সব কথাই বলা যায়। বললুম, বিষ্টুদা, একটু আগে দাদু মারা গেলেন। গান গাইতে গাইতে সমাধি।

সে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাজারে যাচ্ছি ফুল কিনতে। এই যে বেলপাতা যোগাড় করেছি অতি কষ্টে।

একটু দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। একা পারবে না। আরও তো অনেক কিছু কিনতে হবে।

এত রাতে দোকানপাট কি খোলা পাবে!

ফুলের দোকান কি খোলা থাকবে না?

না থাকলেও জগন্নাথের বাড়ি আমার চেনা। সেখান থেকে তুলে নোবো।

রাত বারোটার আগে বিষ্টুদার দোকান বন্ধ হয় না। আজ আমাদের জন্যে সাড়ে নটার মধ্যেই ঝাঁপ ফেলে দিলেন। বিষ্টুদা হন হন করে হাঁটেন। আজ হাঁটার বেগ আরও বেশি। হাঁটতে হাঁটতে বারে বারে বলছেন, আহা, বড় পুণ্যাত্মা মানুষ, আহা বড় পুণ্যাত্মা মানুষ। আমরা কি আর এভাবে যেতে পারবো! ভুগে, ভুগিয়ে তবে যাবো।

ফুলের দোকান খোলাই ছিল। এরকম সাধাবণতঃ হয় না। সবে ফুলের চালান এসেছে। এক ঝাঁকা টাটকা ফুল, আর মালা। গোলাপ আছে, পদ্ম আছে, রজনীগন্ধা আছে। বিষ্টুদা বললেন, বাঃ, অনেক ফুল।

জগন্নাথ বললে, ফুল যে সব বিক্রি হযে গেছে।

বিক্রি হয়ে গেছে মানে?

রাজাবাবু সব নিযে নিয়েছেন। বলে গেলেন, আমার নাতি এসে দাম দিযে নিয়ে যাবে।

বাজাবাবু কে?

ওই যে বাজনাবাযণবাবু যাঁব ছেলে জযনাবাযণবাবু, বিরাট বড গাইয়ে।

আমি অবাক হযে বললুম সে কি? আমিই তো তাঁর নাতি। তিনি কখন এসেছিলেন?

তা হবে। দেড়ঘণ্টা কি দুঘণ্টা হয়ে গেল। ওঁব যত ফুল তো সব আমার দোকান থেকেই যায়। আমাব বাবা সাপ্লাই কবতেন, এখন আমি কবি। পূজোপার্বণের তো শেষ ছিল না! ছেলের বিয়েতে হাজার টাকার ফুল কিনেছিলেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, সে কি, দুঘণ্টা আগে তো তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন।

বিষ্টুদা একটা খোচা মারলেন। মুখেব কথা মুখেই বয়ে গেল। বিষ্টুদা জগন্নাথকে বললেন, কত দাম?

ওঁর জিনিস বেশি আব কি নোবো! শখানেক দিযে দিন।

বিষ্টুদা আমাকে বললেন, টাকা আছে? না, আমি দোবো!

না না, আমার কাছে অনেক আছে।

জগন্নাথ বললে, টাকার চিন্তা কবছেন কেন? না থাকে পবে দিযে যাবেন।

না, টাকা আছে। কিন্তু এত ফুল বইবে কে?

জগন্নাথ হাসতে হাসতে বললে, সব ব্যবস্থা আছে।

দোকান ছেড়ে বাস্তায় নেমে এসে হাঁকতে লাগলেন, দুখিয়া দুখিয়া!

গায়ে গোলাপী বঙের, সিল্কের গেঞ্জী। গলায় সোনার হার। চওড়া পাড় দিশী ধুতি। বড় বড চুল। কেষ্টঠাকুবের মত মুখ। ফুল বেচাব মতই চেহারা। একেবারে ফুলবাবু। জগন্নাথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছে, বাজাবাবু এখন কেমন আছেন। মাঝে বলেছিলেন, শবীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। আজ দেখলুম একেবারে ফিট। বয়েস যেন পঞ্চাশ বছব কমে গেছে। একেবারে রাজবেশ। তাকালে চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছে কবে না। সাধকমানুষের ধরনই আলাদা।

দুখিয়া এসে গেছে। জগন্নাথ নিচু হয়ে ঝাঁকাব দুপাশ ধরে বললে, নে তোল। বাবুরা এসে গেছেন। যাবার জন্যে পা বাড়িযেছি, জগন্নাথ বললে, আপনার বিয়ে কবে লাগছে?

আমার বিয়ে?

হ্যাঁ, বাজাবাবু এর আগে যেদিন এসেছিলেন, আমাকে বললেন, জগন্নাথ, আমার শেষ কাজ নাতির বিয়ে। ছেলেব বিয়েতে কি দেখেছো! ধুমধাম করবো। বেনাবস থেকে সানাই আনাবো, বাজি পুড়বে। দু'হাজাব টাকার ফুল দিয়ে বাড়ি সাজাবো। আমি বললুম, বাবু শীতে করুন। ফুল দিয়ে কি ভাবে সাজাতে হয় আমিও দেখে নোবো। কৃষ্ণনগর থেকে মালাকার আনাবো। আচ্ছা নমস্কার!

দু'পা এগোতে না এগোতেই জগন্নাথ আবার **জিজ্ঞেস** করলে, কাল কি আছে ? এত ফুল যাচ্ছে ! আশীর্বাদ !

আর তো চেপে রাখা যায় না । এবার তো সত্যি কথা বলতেই হয় । বিষ্টুদার দিকে তাকালুম । জবাব তিনিই দিলেন, রাজাবাবু মারা গেছেন ।

অ্যাঁ, সে কি ? কখন মারা গেলেন ?

ঠিক যে সময়ে তোমার দোকানে এসে ফুলের অর্ডার দিলেন ঠিক সেই সময়ে ।

জগন্নাথ অবাক হয়ে বললে, তা হলে কি...

হ্যাঁ, তুমি ধরেছ ঠিক, যাবার পথেই বলে গেছেন ।

অসম্ভব, অসম্ভব বলে জগন্নাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল । হাতের মুঠোয় আমার দেওয়া একশো টাকার নোটটি ধরা ছিল । নোটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, এই নিন, এ ফুলের দাম আমি নিতে পারবো না ।

ফুলের দাম নেবেন না কেন ? এত টাকার ফুল !

যাবার আগে আমাকে শেষ দর্শন দিয়ে গেলেন । আমাকে কি ভীষণ ভালবাসতেন আপনারা জানেন না । আমার একমাত্র ছেলেটা গতবছর ন্যাবায় মরেই যেত । কত রকম ওষুধ জানতেন ! কি এক দাগ খাইয়ে দিলেন, ছেলেটা ভালো হয়ে গেল । বললেন, যাঃ ব্যাটা এবারের মত বেটী ছেড়ে দিলে । জীবনে পাপ কাজ করিস নি, তা হলে কোনও দিন আর দুঃখ পেতে হবে না ।

কথা বলতে বলতে বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট তুলে জগন্নাথ চোখ মুছল । গলা ধরে এসেছে । ধরা ধরা গলায় বললে, বউটাকে ধরে রোজ খুব পিটতুম । রাজাবাবু ছিলেন অন্তর্যামী । আমাকে বললেন, যে বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদে সে বাড়ি পাপের বাড়ি । কাঁদতে হয় তুই কাঁদ ব্যাটা, তাড়াতাড়ি উদ্ধার পেয়ে যাবি । আমি তাঁকে গুরুর মত মানতুম । সেই দিন থেকে আমি আর গায়ে হাত তুলিনি । আর সেই দিন থেকে আমার ভাগ্য ফিরে গেছে । আমি আজ অনাথ হয়ে গেলুম । ব্যাটা ফুলঅলা বলে কে আর আমাকে ভালবাসবে !

বিষ্টুদা বললেন, নাও টাকাটা ফিরিয়ে নাও ।

টাকাটা নিতেই হোলো । জগন্নাথ বললে, আপনারা এগিয়ে যান । আমিও আসছি । কিছু ভালো **ধূপ** নিয়ে যাই । বিষ্টুদা যেতে যেতে বললেন, একজন মানুষ কি ছিলেন বোঝা যায় মৃত্যুর পর । বেঁচে থেকে অনেকেই লম্বাচওড়া মারতে পারে, মরলে কেউ আর ফিরেও তাকায় না । কত ছোটো মানুষে বড় মানুষ থাকে দেখেছো ? সামান্য ফুলঅলা জগন্নাথ আগে নেশাভাঙ করত, বউকে ধরে পেটাত, একজন মানুষের কথায় কি রকম পালটে গেছে ! স্বভাব চরিত্র স্বাস্থ্য । ভাবতে পারো । ব্যবসাদাররা একটা পয়সার জন্যে মরে বাঁচে, সেই ব্যবসাদার একশো টাকার ফুল ভালোবেসে দিয়ে দিলে ! ঠাকুর বলতেন না ! হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেই একদিন একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালে সব অন্ধকার অমনি **নিমেষে** চলে গেল ।

যত আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসছি ততই একটা সুর ভেসে আসছে । অনেকটা স্তোত্রপাঠের মত ।

মায়ার পিসীমা সিঁড়ির একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন । ওপরে ওঠার সাহস নেই । আমাদের দেখে ভয়ে ভয়ে বললেন, আমি যেতে পারি ?

অনুমতি নিয়ে আমাদের পেছন পেছন উঠতে লাগলেন । মহিলা কবে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন জানি না । যবে থেকে দেখছি, গেরুয়াই পরেন । মাথায় জটা ধরেছে । হলঘরের সবকটা আলো জ্বলছে । বাড়ির মিয়োনো ভাবটা হঠাৎ কেমন কেটে গেছে ! মৃত্যুর মত মৃত্যু যেন জন্মের সমান ! এই কি সেই সত্য, তোমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই । তুমি মনে করলেই তুমি আছো । তুমি নেই মনে করলে তুমি নেই । বুদ্ধের বাণী স্মরণে আসছে, যে জানে এ জীবন তরঙ্গশীর্ষে ভাষমান ফেনার মত, মরীচিকার ছায়ার মত, সে কামনার শতদলে লুক্কায়িত মৃত্যুর তীক্ষ্ণ শরসন্ধান ব্যর্থ করেছে । যমরাজের অলক্ষ্যে

তাব চলাব পথ সামনে, আরও সামনে।

হরিদ্বারেব সেই জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী মুদিত নেত্রে স্তোত্রপাঠ করে চলেছেন। শুধুমাত্র তানপুরাটি বেজে চলেছে। নাদগম্ভীব কণ্ঠ। গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্। গোবর্দ্ধনং ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম ॥ নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্। নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নবকান্তকম্ ॥

ঘামতেল মাখা দেবীদুর্গার মুখ যেমন সন্ধিপুজোর সময় চকচক করে, মাতামহের মুখ সেইরকম চকচক করছে। কেমন করে এই ভাবে মৃত একটি শরীর বসে আছে! জীবন যে কত বড় তামাশা, মাতামহের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মৃত্যুর পথরেখায় মাতামহের প্রায় আশীবছরের ভোগ করা খোলসটি পড়ে আছে। আমি কি প্রকৃতই শোকার্ত! শোক নয়, কেমন যেন একটা শূন্যতার বোধে মন আচ্ছন্ন। আমাকে যিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন তিনি আর সেই আদরের নাম, পাতুয়ানী বলে ডাকবেন না। ঠোঙা থেকে একটি গরম আলুর চপ বের করে ফিস্‌ফিস্ করে বলবেন না, খেয়ে নে চট করে। দুর্বাসা মুনি দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। সাধু-সন্ত কোথায় কে এলেন, আব সে খবর এনে বলবেন না, চল্ জীবনটা সার্থক করে আসি। সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক, সবচেয়ে বড় বন্ধু, থাক তুই পড়ে, বলে আপন মনে চলে গেলেন। নিষ্ঠুর আপনি, স্বার্থপর আপনি।

এইবার বুকের মাঝখানটা কেমন করে উঠল। এখন নির্জনে বসে একটু কাঁদতে পারলে বেশ হত! ফোঁটা ফোঁটা জল, জীবনের চিড় খাওয়া জমিতে পড়ে প্রথম বর্ষাব গন্ধের মত আকুল করে তুলত। সে অবসর এখন আমাব নেই। জগন্নাথ কাঁদতে পারে, বিষ্টুদা পারেন, মায়ার পিসীমা আঁচলে চোখ মুছতে পারেন। তুলসীর মালা ঘুবিয়ে জপ করতে পারেন। আমার এখন সে সময় নেই।

সন্ন্যাসী স্তোত্র শেষ করে চোখ মেললেন। সারা ঘর দেখে নিলেন। তারপর মায়ার পিসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাঈজী ইধার আইয়ে।

একপাশে ফুলের ঝুড়ি। গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম সব মিলিয়ে লিলি অফ দি ভ্যালির মত অদ্ভুত এক গন্ধ তৈবি করে বাতাসে ছুঁড়ছে। মাযাব পিসীমা ধীব নম্রতায় সামনে এসে প্রণাম কবে বসলেন।

মাতামহেব অঙ্গবাগ শুরু হল। পিসীমা ভাগ্যবতী মহিলা। সন্ন্যাসীকে সাহায্যের তিনিই অধিকাবী হলেন। চোখের সামনে কত কি যে ঘটতে লাগল! কর্পূরের আগুনে সোনার তবক পুড়িয়ে মস্তকেব মধ্যদেশে স্থাপন করা হল। তাব ওপর চন্দন চর্চিত বিল্বপত্র স্থাপিত হল। মন্ত্রোচ্চারণের গুনগুন শব্দে ঘর মুখরিত। সর্বঅঙ্গে চন্দনেব তিলক। প্রশান্ত কপালে সুবৃহৎ একটি রক্ত চন্দনের ফোঁটা। মুদিত নযনে রাখা হল চন্দন লেপিত তুলসী পত্র। গলায় গোড়েব মালা। রেশমের উত্তরীয় দুই স্কন্ধের ওপব দিয়ে নেমে এল বুকেব কাছে। বাজযোগীর রাজবেশ। চলেছেন রাজাধিরাজের দরবারে। অন্তহীন কালপ্রবাহে মহাকালেব সিংহদ্যাব খোলা। মহারাজের সিংহাসন ঘিরে অনন্ত দরবার চলেছে। যার যখন আমন্ত্রণ আসে, সেজেগুজে চলে যায়।

সব আযোজন শেষ হল। এইবাব মনে হয় যাত্রা শুরু হবে। মাতুল কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আর একটু পরেই রাত ভোর হবে। রেডিওর ঘোষক বলতে থাকবেন, নির্ধারিত শিল্পীব অনুপস্থিতিতে গ্রামাফোন রেকর্ডে গান বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে। চিন্তা ছিঁড়ে গেল। পিতা বললেন, মহারাজ, আমার খুব ইচ্ছে, এই বাড়ির বাগানে এঁকে সমাহিত করি। এখানে আপনার একটা আসন হোক।

নেহি বেটা।

পিতা বললেন, তা হলে চন্দন কাঠে দাহ করার ব্যবস্থা হোক। আহা এই সময় আমার অক্ষযটা যদি থাকত!

ঘরের দূর কোণ থেকে কে যেন বললেন, থাকতো কি, আমি তো রয়েইছি।

সে কি তুমি কখন এলে? লক্ষ করিনি তো!

অনেকক্ষণ এসেছি হরিদা। আজ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিলুম, হঠাৎ কে যেন বললে, একবাব

ঘুরে যা। চন্দন কাঠ তো! তা একবার হীরালালের কাছে চলে যাই।

তাকে ভোরের আগে পাচ্ছ কোথায়?

সাধুজী বললেন, নেহি বেটা, চন্দন কাঠ জরুরৎ নেহি। আ্যায়সাই হো যায়গা।

শেষ ক'টা দিন মাতামহ যে ঘরটিতে কাটিয়ে গেলেন, দোর ঠেলে সেই অন্ধকার ঘরে একবার গেলুম। নিভাজ শয্যা। শেষ চাঁদের আলোর গলিত একটু অংশ বিছানায় শুয়েছিল। পাশের টেবিলে কীটদষ্ট সেই সাধনসঙ্গীতের বইটি। নিখুঁত ভাঁজ করা সাদা একটি গামছা। মানুষের প্রয়োজন কত সামান্য! বাদামী রঙের ন্যাকড়ার সেই জুতোটি বাইরে কোথাও আছে। খড়ম পরতে ভালোবাসতেন। খাটের পাশে খড়ম জোড়াটি হয়তো অপেক্ষা করে আছে। ভোর হয়ে আসছে, এইবার সেই পা দুটি এসে জাগিয়ে তুলবে। জানে না, হাঁটার ছুটি হয়ে গেছে! আধো আলো, আধো অন্ধকার ঘরে সব আছে নেই কেবল একজন। টেবিলে ঝকঝকে বাটি চাপা এক ড্যালা ছানা, গোটা দশবারো ভেজানো কিসমিস। দুটি খেজুর। কাঁসার গেলাসে চাপা জল। কাকীমা সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখে গিয়েছিলেন। আসর ভেঙে গেলেই রাতের সামান্য আহার শেষ করে শয্যা নেবেন। কেউ নেই, তবু মনে হল শূন্য ঘরে সেই লঘু তরল কণ্ঠস্বরটি বেজে উঠল, কি করে বেড়াচ্ছিস? আয় এখানে বোস। তোর মায়ের ছেলেবেলার গল্প শোন। কেন তুলসী নাম রেখেছিলুম জানিস? আমি ঘোর শাক্ত। তোর দিদিমা ছিল ঘোর বৈষ্ণব। শাক্তের ঘরে তুলসী এল। যিনিই শ্যাম তিনিই শ্যামা।

চলে এসো।

পিতৃদেবের গম্ভীর গলা। এইবার আমরা বেরোবো। সিলি সেন্টিমেন্টের আর সময় নেই।

যে সময় রাত চলে যায়, সেই সময়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মাতামহের অসাধারণ এই দেহত্যাগের সংবাদ ঠিকই ছড়িয়েছে। ভোরের সেই স্নানার্থী সন্ন্যাসী, যিনি গঙ্গায় চিত হয়ে ভেসে ভেসে ঘাট থেকে ঘাটে চলে যান, তিনি যে মাতামহকে চিনতেন, আমার জানা ছিল না। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, চললে রাজা। জয়নারায়ণ! দুপা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। ইচ্ছে যখন হয়েছে। আবার ফিরে এসে হাত দিয়ে খাট স্পর্শ করে দাঁড়ালেন। নাম সঙ্কীর্তনের দল রোজকার মতই নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছিল, তাঁরাও স্বেচ্ছায় আমাদের শবযাত্রার অনুগামী হলেন।

হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর ঝুলিতে জগন্নাথের ফুল। তিনি মুঠো মুঠো ফুল ছড়াচ্ছেন। সঙ্কীর্তনে প্রভাতী সুর। আমার মাতামহ চললেন চিরযাত্রায়। যে পথ চলে গেছে আগুনের শিখায় উর্ধ্বমুখে। এরপর আজ যাঁরা গঙ্গার স্নানে যাবেন, তাঁরা দেখলেন সারা পথে ছড়িয়ে আছে পদ্ম আর গোলাপের পাপড়ি, রজনীগন্ধা। তাঁরা ভাবলেন কেউ হয়তো অভিসারে গেছে। হ্যাঁ এও তো অভিসার!

মর্গ দেখেছি। শ্মশান এই প্রথম। পাশ দিয়ে বহুবার গেছি, ভেতরে কোনও দিন ঢুকিনি। স্থানটি বড় মনোরম। সামনেই একটি গেট। মাধবীলতা ঝুলছে। বড় বড় হরফে লেখা মহাশ্মশান। সেই শ্মশানই মহাশ্মশান যেখানে অতীতে কোনও মহাপুরুষ অগ্নিশয্যা পেতে গেছেন। শ্মশানের চোখে নিদ্রা নেই। দেখেই মনে হচ্ছে, সারারাত জেগেই ছিল। আলো এখনও জ্বলছে। ভিজে কাপড়ে একটি দল আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। দু-এক ছিটে জল গায়ে লাগল। এঁদের সারা হয়ে গেল। আমাদের এইবার শুরু হবে। কীর্তন যখনই থামছে কানে আসছে পাখির ডাক।

ভেতরে দুটি চিতা তখনও জ্বলছে। বাঁধা বটতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আপনজনেরা বসে আছেন। ভালোবাসার, ভালোবাসবার নশ্বর দেহখাঁচা চোখের সামনে চড় চড় করে পুড়ে যাচ্ছে। হাড়ফাটার অট্টহাসি মানুষের সমস্ত অহঙ্কারের ওপর ফোয়ারার মত ঝরে পড়ছে। জীবনের সব চিৎকার মৃত্যুর মুঠোয়। খাটিয়ার বাঁশ খুলে নিয়ে সাহসী একজন চিতার সামনে, আর একজন বলছেন, দাও দাও এইবার মাথাটা ভেঙে দাও। ফটাস করে একটা শব্দ হল। কিছু আগুনের ফুলকি পড়পড় করে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। আমার ভেতরটা যেন ছিটকে উঠল। মৃতের আসরে জীবিতেরা বড় অসহায়।

মাতামহ ধীরে ধীরে সাজানো কাঠের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চিতায়

অগ্নি প্রজ্বলিত হল। শিখা উঠছে, ক্রমশই ওপরে উঠছে। শোক নয়,কেমন যেন স্তম্ভিত অবস্থা আমার। দিগ্বিদিক আলোকিত কবে ফসফরাসের মত রুপোলি একটা দ্যুতি মাতামহের অবয়ব নিয়ে সোনালী আগুনের মধ্যে দুলতে লাগল। অলৌকিক দৃশ্য। সকলে একসঙ্গে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন—হরি ওম্। হরি ওম।

সামনে যখন যাবি ওরে থাক্-না পিছন পিছে পড়ে

দেহ যে মন্দির একথা কোনও ,দিন অনুভব করেছ ?

স্বামী নির্মলানন্দ প্রশ্ন করে চেয়াবের পেছনে হাসি হাসি মুখে পিঠ বাখলেন। সামনেব টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র। খান তিনেক মোটা মোটা বই। একটি দামী কলম। চেহাবা দেখে মনে হচ্ছে পার্কাব। স্বামীজী আজ গেরুয়া টুপি পরেছেন। সাধাবণত সন্ন্যাসীরা যে ধবনেব টুপি পরেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, কখনও ক্ষণিকেব তবে ওই রকম একটা অনুভূতি হয; তবে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয না।

কেন হয় না ?

এক গাদা চামচিকি ঢুকে কিচিরমিচিব শুরু করে দেয। সময সময দেহ বলে যে একটা বস্তু আছে সেই কথাটাই ভুল হয়ে যায়।

কে ভোলায় কখনও লক্ষ 'করেছ ?

হ্যাঁ, করেছি। যেমন ধরুন কোনও একটা জাযগায যেতে হবে, তখন দেহ নয়,হাঁটাটাই বড় হয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তখন দেহের কথা মনে পড়ে, আক্ষেপ আসে, কেন আমি অফুরন্ত পথ অক্লেশে হেঁটে যাবার শক্তি রাখি না, কেন আমি আরো সক্ষম দেহের অধিকারী হতে পাবিনি ! সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা আসে, কোনও ধনীব পবিবাবে জন্মালে, আমি ছেলেবেলায আবও ভালোমন্দ খেতে পেতুম ! ব্যাস্ দেহ ভুলে গেলুম, চোখের সামনে ভাসতে লাগল প্রাচুর্যের স্বপ্ন। কি কবলে ধনী হওয়া যায ' হাঁটছি, হেঁটেই চলেছি, তবে আমি নয়, হাঁটছে ধনীব স্বপ্ন, হাঁটছে পরিকল্পনা। আই এ এস পরীক্ষাটা দিতে পারলে, ডি এম। ডি এম মানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিরাট একটা জেলার রাজা। ফাইল, ডাকবাংলো, গাড়ি, প্রচুর ক্ষমতা। পবমুহূর্তেই আক্ষেপ, কেন আমি সেই ধরনের ভালো ছেলে হতে পারলুম না, যাব কাছে যে কোনও কমপিটিটিভ পরীক্ষা জলভাত। এই করতে করতে পথ ফুবোলো। যে কাজে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলুম, তখন সেই কাজটাই বড়ো হয়ে উঠল। এইভাবে অষ্টপ্রহব হরিনাম সঙ্কীর্তন চলেছেই চলেছে। কাব দেহ, দেহেই বা কে,কদাচিৎমনে পড়ে। কখনও লোভ, কখনও অহঙ্কার, কখনও ক্রোধ, কখনও হিংসা, এক এক ধবনেব প্রবৃত্তি এক এক সময় জেগে ওঠে। এ যেন জুড়ি গাড়ি যে চড়ে সেই তখন মালিক। সাঁই সাঁই চাবুক ঘুরছে গাড়ি চলছে কদম কদম।

বাঃ বলেছ ভালো। আচ্ছা এই মুহূর্তে তোমার কি দেহবোধ হচ্ছে ?

আজ্ঞে না, এখন কথার নেশায় আছি। শুরুতে একটু লজ্জা ছিল। লজ্জার ভাব কেটে এলো আত্মম্ভরিতা। বেশ কথা দিয়ে কথা গেঁথে গেঁথে এমন কিছু বলতে হবে যাতে আপনার মনে হবে, ছেলেটা খুব ইনটেলেকচুয়াল। মনে হলে কি হবে, আপনি আমার লেখাটা ছাপবেন।

তোমার লেখা তো আমি ছাপবই বলেছি।

কিন্তু প্রথম দিনেই যে আমার অহঙ্কার জাগিয়ে দিয়েছেন।

অহঙ্কার কিভাবে জাগালুম ?

ওই যে বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলুম কোনো রিটায়াড়ড জেন্টলম্যানকে দেখবো। আমার অহং যার অর্থ করেছে, আমার বুদ্ধি বয়েসের তুলনায় অনেক ম্যাচিওর, আমার অনেক বেশি পড়াশোনা। আমি আপনার সমতুল্য কিংবা তার চেয়েও বেশি। আবার এই যে আমি সব বলছি, এর পেছনেও

একটা ইচ্ছে ঠ্যালা মারছে, যে আমাকে বলছে, এমন কিছু বলো যা অনেকটা সেলফ অ্যানালিসিসের মত হয়। তাতে তোমার এই লাভ হবে, তুমি যাঁকে বলছো, তিনি তোমাকে সাধারণের চেয়ে অন্য চোখে দেখবেন।

স্বামীজী হাত তুলে আমাকে থামতে বললেন। থামার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কেমন যেন বোকা,বোকা লাগছে। বাতুল, বাচাল। দুটি উজ্জ্বল চোখ নির্নিমেষে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার অন্তঃসত্তা ক্রমশই যেন নগ্ন হয়ে পড়ছে। বেলুন যেভাবে চুপসে যেতে থাকে আমি সেইভাবে চুপসে যেতে লাগলুম। ন্যালব্যালে একটা রবারের ল্যাতকানো আবরণেব মত পড়ে রইলুম মেঝেতে। ছি ছি, এ আমি কি করলুম ?

স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছো এখন ?

ভাবছি, ছি ছি, এ আমি কি করলুম !

এ 'আমি'টা তোমার কোন 'আমি' ?

আজ্ঞে ?

এ 'আমি' তোমার কোন্ 'আমি' ! চোখ বুজিয়ে বসে একটু ভাবো। সার্চ উইদিন। আমাদেব ক'টা 'আমি' ?

দুটো।

রাইট, একটা তোমার দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অনেকটা মিউকাস মেমব্রেনের মত। চুলকুনি কাকে বলে জানো ? খোস, পাঁচড়া, দাদ, হাজা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ জানি।

থেকে থেকে চুলকে ওঠে। অসংখ্য মাইক্রসকোপিক জার্মস যেই নড়েচড়ে ওঠে অমনি চুলকোতে ইচ্ছে করে। মলম লাগাতে হয। লাগাতে লাগাতে একদিন সেরে যায়। দ্রষ্টা 'আমি'র হাতে এই 'দেহবদ্ধ আমি'টাকে সমর্পণ করে দাও, কমপ্লিট সারেণ্ডার, এলোমেলো বিশৃঙ্খল 'আমি'র নির্দেশ মানবো না, তুমি কে ! আমি কি তোমার দাস ?

স্বামীজী এই 'আমি'টা আবার কে ? তৃতীয় কোনও 'আমি' ?

ভালো প্রশ্ন ? আচ্ছা তুমি আগুনের শিখা ভালো করে দেখেছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ রোজই দেখি। লেবরেটারিব টেবিলে, সাবি সাবি বুনসেন বার্নার জ্বলে।

তিনটে অংশ দেখতে পাও ? একটা নীল অংশ, তাকে ঘিরে লাল একটা অংশ, তাব বাইরে সাদাটে একটা অংশ। বাইরের অংশ, যেটাকে বলে পেবিফারি, সেই অংশটি সদা চঞ্চল, বাতাসে হেলছে দুলচে, ফড়ফড় করছে। তারপরের অংশটি স্থির, শিখার সব চেয়ে উত্তপ্ত অংশ, দাহিকা শক্তি সব চেয়ে বেশি। নীল অংশটি শিখার আত্মপুরুষ। স্থির, শীতল। তোমার আঙুল ঢোকালেও পুড়বে না। এই নীল, শীতল অংশটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অগ্নিশিখা। মানুষও তো শিখা। নিথর নিষ্কম্প নীলাভ আত্মপুরুষ, পরেরটি জ্ঞানপুরুষ যার অহরহ প্রার্থনা, হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যাষাপি হিতং মুখং, তৎ ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। প্রশ্ন উঠছে সেই জ্ঞানময় কোষ থেকে। সংশয়ী, প্রশ্নকারী। তাব ওপব বসে আছে বালকবৎ, চঞ্চল, প্রাণময় আমি। সে কখনও অভিমানী, কখনও ক্রোধী, লোভী, কখনও উদার, কখনও সহিংস। কখনও অহিংস। কিন্তু তোমার কি হয়েচে জানো ?

আজ্ঞে না।

তোমার শিখাটি বড় কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। ভেতরটা বড় কুঁকড়ে আছে। জ্ঞানময় আবরণীটি পূর্ণ তেজে বিকশিত হতে পারছে না। প্রশ্ন করো, কেন ? লণ্ঠনের কাঁচটিকে ভালো করে পরিষ্কার করো। সাধুর কমণ্ডলুও রোজ মাজতে হয়, তবেই ঝকঝকে থাকে। ভেতরটাকে টেনে বাইবে আনো। ছোটো উদ্যান নয়, চাই তেপান্তরের মাঠ। দিগন্তকে যত পেছতে পারবে, মন তত ভালো দৌড়বে। সব জানালা দরজা খুলে দাও, একটু আলো বাতাস আসুক।

কী করে খুলবো ?

কেটে বেরিয়ে পড়ো। সংসারে তোমার কিসের আকর্ষণ। ভগবান তো পথ পরিষ্কার করেই রেখেছেন। তোমার সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ মাতামহ চলে গেলেন। তোমার পিতা বড় চাকরি করেন। তিনি অথর্ব নন, যে সেবা করতে হবে। স্বভাবে স্বাবলম্বী। তুমি তাঁর সেবা করো না, তিনিই মা-মরা ছেলেটির সেবা করেন। তুমি কেবল পাকা পাকা কথা বলো আর গুমরে গুমরে মরো। তোমার হল ব্রুডিং নেচার। এই বেলা তোমার হাল না ধরলে, তুমি নিউরটিক হয়ে যাবে। কিছু পেতে হলে বলিষ্ঠ হতে হবে। ঠাকুর বলতেন ডঙ্কামারা হৃদয় চাই। ঘায়ের মাছির মত ভ্যান্ ভ্যানে হলে, সংসার তোমাকে গিলে চেনে-বাঁধা কৃতদাস করে ফেলে রাখবে। এই সব শোনার পর এখন তোমার কেমন লাগছে ?

আজ্ঞে খুব খারাপ। মনে হচ্ছে পাংচার্ড।

ম্যানেনজাইটিস বলে একটা অসুখ আছে, শুনেছ নিশ্চয় ?

হ্যাঁ শুনেছি। রুগী সাধারণত বাঁচে না।

ট্রিটমেন্ট জানো ? লাম্বার পাংচার করতে হয়। মেরুদণ্ড থেকে খানিকটা ফ্লুইড বেরিয়ে যায়, রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। তোমার অহং খানিকটা বেরিয়ে গেল। মানুষ বাড়ি রঙ করে, বছর বছর জানালায় দরজায় রঙ চাপায়, নিজের ভেতরেও যে রঙ ধরাতে হয়, সেই সত্যটিই ভুল হয়ে যায়। পুরনো সংস্কার সব ফেলে দাও, বেদীটি মুছে পরিষ্কার করে আলপনা লাগাও, নীরবে অপেক্ষা করো, গুহাশায়িত সেই পরমপুরুষ হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হবেন, তোমার ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি বলিষ্ঠ আমি হয়ে উঠবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত/ প্রাপ্য বরান নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া/ দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি/ কি মানে ?

ওঠো, জাগো। শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে গিয়ে জ্ঞানলাভ করো। জ্ঞানীরা সেই পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন।

তা হলে, তুমি আগে মেরে থেকে ওঠো। সেপাইয়ের লাঠির মত হেলে থেকো না। এই নাও টাকা।

টাকা ?

হ্যাঁ, কিনে নিয়ে এসো।

কি কিনে আনবো ?

একটু আগে আমার এখানে আসার সময়, তোমার যা খেতে ইচ্ছে করছিল।

অবাক হয়ে বললুম, সে তো ফিশফ্রাই ! আপনি ! আপনি কি করে জানলেন ?

পড়ে, তোমাকে পড়ে। ভাবনা ভাষা হয়ে অক্ষরে ধরা থাকে। মাধ্যম, কাগজ, ছাপার কালি। যে ভাবনা ভাষা পায়নি তা লেখা হয় অন্তরে, এক ধরনের ম্যাগনেটিক কোডে। আমি যদি তুমি হই, তুমি যদি আমি হও, মানুষ মানুষের কাছে খোলা বইয়ের মত। বলো, তোমার ফিশফ্রাই খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কি না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছিল। শ্যামবাজারের মোড়ের সেই বিখ্যাত দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময় ইচ্ছেটা একবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাই কি খাওয়া উচিত ! ধর্মের পথে . ।

ধর্মের সঙ্গে আহারের কোনও সম্পর্ক নেই।

অনেকে বলেন।

ধর্ম কি অতই সহজ পলাশ, যে মাছ ছেড়ে দিলেই ঈশ্বর এসে ধরা দেবেন ! ডিম না খেলে তিনদিনে মোক্ষলাভ ! তা হলে গরুকেই তো গুরু বলে ধরতে হয়। সারা জীবন খড় আর ভুষি খেয়ে মাঠেঘাটে হাম্বা হাম্বা করে বেড়ায়।

নিত নাহানসে হরি মিলে তো
জলজন্তু হোয়,
ফলমূল খানে সে হরি মিলে তো
বান্দর বাঁদরী হোয়॥

আপনি টাকা দেবেন কেন ? আমার কাছে আছে।

আজ্ঞে না। তোমার টাকা তোমার কাছেই থাক। এই নাও, স্যালাড নিতে ভুলো না। শুধু ওষুধে কিছু হয় না, সঙ্গে অনুপান চাই।

রাস্তায় নেমে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, সবই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কত রকমের সাধনমার্গ আছে কে জানে ! কোনও মতে, কৌপিন সার। কোনও মতে সিল্কের গেরুয়া। এই সুন্দর বিকেল, মাতামহের কথা মনে পড়ছে। এমনি বিকেলে আমাদের দু'জনের কত জায়গায় যাবার ছিল। কোনওদিন নৌকাবিহার, কোনওদিন সাধুসন্দর্শন। মাঝে মধ্যে উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলতেন আর লেগে যেত লোকের সঙ্গে ধুমধাড়াক্কা। একদিন তো মাঝগঙ্গায় নৌকোর ওপরেই হাতাহাতি বেঁধে যাবার উপক্রম। এক দল হালুইকর এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল। খুব ক্যালোর-ব্যালোর করছে নিজেদের মধ্যে। মাতামহ গলুইয়ের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে কেবল বলছেন, ধ্যার ব্যাটা, ধ্যার ব্যাটা। সেই হল সূত্রপাত। মাতামহ এক স্মৃতি ফেলে রেখে গেছেন, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, তিনি কি নদী ছিলেন ! জীবনের দুপাশে অজস্র উপলখণ্ড ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে গেছেন। আজ স্বামীজীর কাছে এসে মনটা যেমন হাল্কা হয়ে গেল, সেই রকম ঘুলিয়েও গেল। মনের তলদেশে অনেক মাটি জমেছিল। কে জানত ! নিজেও জানতুম না। আধ্যাত্মিক মানুষেরা সবই কেমন সহজে টের পেয়ে যান !

বিখ্যাত সেই রেস্তোরাঁয় বিকেলের ভিড় লেগেছে। কাটলেট উড়ছে, ফ্রাই উড়ছে, দোপেঁয়াজা বিজকুড়ি কাটছে ডিমের ফুলকো আবরণের তলায়। ক্যাশ বাক্স নিয়ে মালিক যে জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্রাইয়ের অর্ডার দিতে গিয়ে চমকে উঠলুম। রাস্তার দিকে পেছন করে, এ কে বসে ? ঘাড়ের কাছে আলগা খোঁপা দুলছে। নীল, ফুল ফুল শাড়ি। সরু সরু দু আঙুলে ধরা ঝকঝকে কাঁটা ঠোঁটের কাছে, কাটলেটের টুকরো নিয়ে কামড়ের অপেক্ষায় হেলছে দুলছে। দুল ঝিলিক মারছে চাপা আনন্দে। উল্টো দিকে যে ছেলেটি বসে আছে, সেই বা কে ? বেশ লালটু মার্কা নায়ক নায়ক চেহারা। একে তো কোনও দিন অপর্ণাদের বাড়িতে দেখিনি। ও, কলেজের পর আজকাল এই সব হচ্ছে বুঝি ! ভেবেছে কারো চোখে পড়বে না কোনও দিন। পাপ কি চেপে রাখা যায় ! বাবা অফিসে, বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। সব শাসনের আড়ালে বসে প্রেম হচ্ছে। পাশের খালি চেয়ারে গিয়ে বসব না কি ! যেন চিনিই না ! না, চমকে দেবার মত সাহস আমার নেই। আমি এত চঞ্চলই বা হচ্ছি কেন ? রমণী-মায়াব রমণীয় ঊর্ণনাভ থেকে প্রায় তো বেরিয়ে এসেছি। অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙীন মাছের মত অবস্থা। পায়ু প্রদেশ থেকে বিষ্ঠার সরু সুতো পুরোটাই বেরিয়ে এসেছে। এখন সাঁতার কাটতে কাটতে এক সময় বিমোচিত হয়ে পড়ে যাবে।

খুব ফিসফিস করে মালিককে বললুম, দুটো ফিশফ্রাই, ভালো করে স্যালাড দিয়ে প্যাক করে দিন।

প্রকাশ্য স্থানে বাতাসের স্বরে কথা বললে মানুষ কি রকম অবাক হয়ে যায়, ভাবে লোকটা পাগল। দশ টাকার নোটটা তাঁর চোখের সামনে নাচাতে না থাকলে মালিক হয়তো দূর করে আমাকে তাড়িয়ে দিতেন। ব্যালেন্স ফেরত নিতে নিতে, ফিসফিস করেই বললুম, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন, যে বয়েসের যা। বেশি বয়েসে ডিপথিরিয়া বড় সাংঘাতিক জিনিস !

কিছু না বুঝেই বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাউণ্ডবক্স একেবারে নষ্ট করে দেয়। যাক বেঁচে গেছেন, এই ঢের।

আমার সঙ্গে কথা শেষ করেই, গলা সপ্তগ্রামে তুলে রেস্তোরাঁর সুরে, পাঠশালের সর্দার পোড়োর মত বললেন, দুটো ফিশ ফ্রাই, স্যালাড, মুড়ে দাও, বাইরে যাবে।

দোকানেব বাইরে চাতালের একপাশে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছি। অপরাহ্নের শ্যামবাজার টগবগ করছে। মনে মনে বলছি, হে ঈশ্বর ! অপর্ণা যেন আমাকে দেখতে না পায়। ভাবতে চেষ্টা করছি, আমি অপর্ণার পিতা। মেয়েটা সুপাত্রে পড়ুক। মনে মনে সম্পর্ক পাল্টালে ঈর্ষাটা হয়তো কমে যাবে। যতই বড়াই করি না কেন, নৈবেদ্য ছাগলে খেতে থাকলে, পাথরের দেবতাও নড়েচড়ে উঠবেন। আমি তো মানুষ। ভেতরটা খইয়ের মত চটরপটর ফুটছে। পাশ থেকে অপর্ণাকে দেখছি। গোল হাতের কবজিতে

কালো ব্যাণ্ডে বাঁধা সোনার ঘড়ি। প্রতিটি নখে লাল আপেলের মত নেলপালিশ। খুশিতে যেন ডগমগ করছে। মাঝে মাঝে হাসছে। মুক্তোর মত দাঁতের সারি অলঙ্কারের বাক্স থেকে কঙ্কনের মত স্বপ্রকাশ, অপ্রকাশ হচ্ছে। টেবিলে টেবিলে পিটপিটে কাটলেটের ওপর মরিচ গুঁড়ো পড়ছে না তো, পড়ছে আমার মনে। ভেতরে যেন কোস্তাকুস্তি চলেছে। আসক্তি আর নিরাসক্তি মনের মল্লভূমিতে যেন দুই পালোয়ান, পটাপট তাল ঠুকছে। ওদিকে মোগলাই পরোটার মণ্ডে চটাপট চাপড় পড়ছে।

অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। ছোট্ট হাঁ করে, মুখে মৌরির দানা ছুঁড়ছে। মেয়েটাকে সত্যিই ভারি সুন্দর দেখতে। ঈশ্বর কি এর চেয়েও সুন্দর! এখুনি দু'জনে বেরিয়ে আসবে। আর একটু আত্মগোপনের প্রয়োজন। দেখে ফেললে ওর লজ্জাটাই আমার লজ্জা হয়ে দাঁড়াবে। চট করে ফুটপাথে নেমে পড়ে ভিড়ে মিশে গেলুম। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে আবার যখন ফিরে এলুম, দোকান তখন বিপন্মুক্ত।

হাতে গরম প্যাকেট। মৃদু সুবাস নাকে এসে লাগছে। মনে ঘুরছে সেই গানের কলিটি, ঘরে ঘরে আলো/দেখে লাগে ভালো/মোর হৃদি গেহ/অন্ধকারে কালো। মাতামহ-শূন্য-পৃথিবীর এই পথের পাশে কোথাও যদি পরপারে যাবার একটা সাঁকো থাকত! এখুনি চলে যেতুম। রুপোর গাছে সোনার পাতা, মণিমুক্তোর ফল ধরেছে, চাঁদির পেখম মেলে ময়ূর নাচছে। তিনি লাল লাল পান্তুয়া খেতে বড় ভালবাসতেন। বড় ভালবাসতেন আমাকে। ভালবাসতেন সাধুসন্তের সঙ্গ। সেখানে গিয়ে যদি দেখি, সকলের সঙ্গে আসর সাজিয়ে কনকও বসে আছে! চাঁদের আলোর রঙের শাড়ি পরে। পাশে হাসিহাসি মুখে বসে আছেন আমার মা। তা কি আর হয়, এ জীবন থেকে যাঁরা হারিয়ে গেলেন, তাঁরা হারিয়েই গেলেন।

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন?
এ কি শুধু প্রহেলিকা?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে-জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন!
বাঁধিতে বাঁধিতে সুর সপ্তস্বরা শত-চুর!
মেলিতে মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন!

আমায় তিনি এই বস্তুটি লুকিয়ে চুরিয়ে আনতে বলেন নি, তবু আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়, উত্তপ্ত বস্তু দুটিকে জামার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলুম। কি অদ্ভুত আমার সংস্কার! স্বামীজী ছাদে পায়চারি করছিলেন। আঁধার আঁধার আকাশের তলায় গেরুয়ার শোভা কি খুলেছে! সন্ন্যাসীর আশ্রম কত পবিত্র হতে পারে, সংসার যে কত বদ্ধ পঙ্ককুণ্ড এই আমি প্রথম বুঝলুম। অর্থনীতির দাসত্ব নেই, ইন্দ্রিয়ের নিয়ত আবদারে চঞ্চল হতে হয় না, নারীর মুখ দর্শন না করলেও চলে। মনকে শুধু উর্ধ্বে তুলে রাখো। এখানে সদা বসন্ত।

স্বামীজী আমাকে দেখে দু চরণ গান গেয়ে উঠলেন: তোমার চরণ পেয়ে হরি! আজকে আমি হেসে মরি/কি ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায়রে কি ধন চাহি নাই।

বড় সুন্দর সাধা গলা। এই গানটি আমার মাতামহ প্রায়ই গাইতেন। গানটি আমার জানা। আমার এই মুহূর্তের আবেগের সঙ্গে ভীষণ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। প্রথম চরণটি গাইবার লোভ সামলাতে পারছি না। গেয়েই ফেললুম, আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে, বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই/ দু'জন যদি হত আপন, হত না মোর আপন সবাই।

স্বামীজী সোৎসাহে বললেন, এই তো, এই তো, বেরিয়ে এসো। সহজ হও, সুন্দর হও, নির্মল হও। বৈরাগ্য, বৈরাগ্য। নিত্য আমি অনিত্যরে আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ দ্বারে/ কেড়ে নিলে দয়া করে তাই হে চির! তোমারে চাই।

অনুচ্চ কণ্ঠে, সন্ধ্যার আবেশে, আমাদের দু'জনের কণ্ঠ বাতাসে ভেসে ভেসে মহালোকের দিকে পবিত্র পাখির মত উড়ে গেল। এমন বৈরাগ্যের ভাব আগে কখনও অনুভব করিনি। স্বামীজী আমার পাশে

এসে মাথায় হাত রাখলেন। সে স্পর্শের কি অনুভূতি ! কোথায় লাগে প্রেয়সীর হাত, পিতার হাত, মাতার হাত। স্নেহ আমরা কাকে বলি ! এ স্পর্শে স্নেহের স্নেহ, প্রেমের প্রেম, ভালোবাসার ভালোবাসা। আবেগে চোখে জল এসে গেল।

স্বামীজী বললেন, কি হবে সংসারে থেকে ! এমন একটা মন যখন পেয়েছ, আধারটিকে শুদ্ধ করে আত্মোপলব্ধির দিকে এগিয়ে চলো। তুমি অর্থ দিয়ে অর্থের সঙ্গে লড়তে পারবে না, তুমি ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতার সঙ্গে পারবে না, তুমি হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে পেরে উঠবে না। জাগতিক সব কিছুরই বড়র ওপর বড় আছে। প্রভুর ওপর মহাপ্রভু। একমাত্র বৈরাগ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যার ওপরে আর কেউ নেই। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ/নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ বৎস চরৈবেতি, চরৈবেতি।

হে রাজেন্দ্র, তোমা-কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয় সেথা বাহু মেলে
লহো ডাকি, সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে অগ্রসর করো প্রতিদিন—

চলো, ঘরে চলো, কি এনেছো দেখি। টোম্যাটো সসের বোতলটা নিয়ে এসো।

প্লেটে ফিশফ্রাই, স্যালাড, সস, মনে বৈরাগ্য। আকাশে সন্ধ্যা। নিচে আরতির আয়োজন। সামনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। শুধু সন্ন্যাসী নন, মহা পণ্ডিত। মন, তুমি আর কি চাও !

হে অন্তরযামী ত্রাহি !
তুমি বিনা মোর কেহ আর নাহি ॥

আমি সব মেনে নিতে পারি, পারি না কেবল একটা জিনিস, আমার মায়ের ছেড়ে যাওয়া সংসারে অন্যের কর্তৃত্ব। অন্যের বিশ্বাসে আমি হাত দিতে চাই না ; কিন্তু আমার নিজের একটা বিশ্বাস আছে। মানুষের এই আসা আর যাওয়ার পরও, সংগীতের মত একটা রেশ থেকে যায়। দেহ থেকে মুক্তি পাবার পর আত্মার স্বাধীনতা বেড়ে যায়। যেখানে আছি, সেখানে আছি, যেখানে নেই সেখানেও আছি। বিজ্ঞান ঘোড়ার ডিম কি বলবে ! তার পরিধি কতটুকু ! দুই-এর পাশে দুই রেখে গুনবে এক দুই তিন চার। এক যে চার হতে পারে, অনন্ত হতে পারে সেই সত্যটি জানা আছে কেবল সাধকদের। কবিদেরও সে অনুভূতি আছে। তা না হলে এমন লাইন আসে কোথা থেকে :

একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্তদীপ-জ্বালা
    দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা
একি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল
    পর্বতে কঠিন, তরু পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
    অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
    প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

সাধকের কথা মিথ্যে, আর টেস্ট টিউব নাড়া বিজ্ঞানীর কথা সত্য ! যাঁরা না চাখলে মিষ্টির মিষ্টতা করেন না, যাঁরা না দেখলে অস্তিকে নাস্তি করে দেন, তাঁদের কথায় কল চলতে পারে, মানুষ পারে না। কেউ না জানুক আমি জানি, এ বাড়ির সর্বত্র মায়ের অস্তিত্ব বর্তমান। একটা কাঁসার জোর করে মাটিতে ঠুকে বসাবার পর পাশ থেকে দেখলে কি দেখা যাবে ! বাটিকে ঘিরে আর

একটি বাটি কাঁপছে। অস্তিত্বের এই কম্পন মানুষের বেলায় অত সহজে বিলীন হয় না। কত লক্ষ যোনি ঘুরে মানুষের জন্ম! জীবচক্রের শেষ ক্রম। তারপর কি? সৃষ্টি বিজ্ঞানীরা জানেন না। জানেন সাধক। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, গান থেমেছে? বলব, হ্যাঁ থেমেছে; কিন্তু সুর ভেসে আছে।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ডায়েরি আমি লাইন বাই লাইন পড়েছি। ভাগলপুরের কাছে বস্তি বলে একটি অঞ্চলে ব্রহ্মচারীজীর দাদা থাকতেন। সেখানে নির্জন একটি ঘরে সেই মহাপুরুষ রাতে যে খাটে শুতেন, সেই খাটটি রোজ রাতে এসে কেউ প্রচণ্ড ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে চলে যেত। বন্ধ ঘরে মাঝরাতে এই উৎপাতের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না। হাসপাতাল সংলগ্ন আবাসস্থল। ব্রহ্মচারীজীর অগ্রজ বললেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, হতেই পারে। বহু অবাঞ্ছিত মৃত্যু এখানে প্রতিদিন হচ্ছে, বহু আত্মা ঘুরছে চারপাশে। সংলগ্ন হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে, একটি বেডের কথা তিনি বললেন। সেই শয্যায় যাঁকেই রাখা হত, তিনিই পরের দিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাতেন। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল, সেই খাটে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর অধিকার ছাড়তে পারেননি। মাঝ রাতে এসে আগন্তুকের বুকে চেপে বসে কিল চড় ঘুষি মারতেন। খামচে দিতেন। অবশেষে তুলে ফেলে দিতেন নিচে। কোনও সাধক নিশ্চয়ই ভূতের গল্প বানাবেন না। সাধারণ মানুষের মত তাঁরা ভূতের ভয়ও পাবেন না। যা সত্য তা সত্য। যার বিশ্বাস আছে তার আছে। প্রেত যদি বায়বীয় একটা ব্যাপারই হবে, তা হলে তার ওজন আসে কোথা থেকে! বুকে চেপে বসলে দম বন্ধ হয়ে আসে কেন? যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই না থাকবে, তা হলে কিল চড় ঘুষি মারে কি করে! সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা অজ্ঞাত বিজ্ঞান রয়েছে। পরমহংস বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে গেলে বুঝিয়ে দিতেন, সূর্যবিজ্ঞানে সবই সম্ভব। সূর্যের রশ্মিজালের মিলনে, গঠনে, অমিলনে, বস্তু জগতের উদ্ভব। সেই মহাত্মা শুধুমাত্র হাতে নাড়াচাড়া করে, গাঁদাকে গোলাপ আবার সেই গোলাপকে জবাতে রূপান্তরিত করতে পারতেন সকলের চোখের সামনে অক্লেশে। তিনি বলতেন সূর্যবিজ্ঞানই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য। সেই জন্যে সূর্যের আর এক নাম সবিতা। এর পাশাপাশি আরও বিজ্ঞান আছে, যেমন চন্দ্রবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, ক্ষণ বিজ্ঞান। এ সব জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন তিব্বতে থাকার সময়। তিনি প্রয়োজন বোধে তাঁর শরীরের যে কোনও অঙ্গকে আকারে বিশাল ও বিপুল করে ফেলতে পারতেন। যেমন আদেশ করার সময় তাঁর তর্জনীকে তিনি এমন স্ফীত করতে পারতেন আদিষ্ট বিস্ময়ে হতবাক্ হতেন। আমাদের চোখের, কানের, মনের অনেক পরিমিতি আছে। আমরা সব শব্দ শুনতে পাই না, সব আলো দেখতে পাই না। আমাদের মগজের তিনের চার অংশ ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগাবার কৌশল সাধারণ মানুষের নেই। একের চারেই এত সব হচ্ছে। সাধকরা বলেন ধ্যান কর। বিক্ষিপ্ত মনকে অন্তর্মুখী করো। সহস্রদলকে বিকশিত করো। তখন দেখবে, তুমিই বিশ্ব, বিশ্বই তুমি। যেখানে লয় নেই, ক্ষয় নেই, রূপান্তর আছে। সূর্যের সহস্রধারায়, বস্তুপুঞ্জ অণুতে, পরমাণুতে ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, গঠিত পুনর্গঠিত হচ্ছে। একই বহু, বহুই এক। বিশুদ্ধানন্দজী বলছেন, সমস্ত বস্তুর ভেতরেই সমস্ত বস্তু অল্পবিস্তর আছে। পরমাণুর গ্রহণ আর বর্জনই বস্তুর এক এক রূপে আবির্ভাব ও বিলয়। জড় বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞানের কি-ই বা শেখার আছে! কিছু দেখা, আর সেই দেখার ওপর ভিত্তি করে কিছু সূত্র নির্মাণ। কিছু শিখতে হলে যেতে হবে যোগীর কাছে, যাঁরা বলছেন: সূর্যই হল সব বিজ্ঞানের মূল স্তম্ভ। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এক কথায় জাগতিক আর ব্যবহারিক সব কিছুই সূর্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তির উৎস সূর্যমণ্ডল। শুধু তাই নয় সূর্যের পথ ধরে দেবযান সম্ভব। সূর্যই মুক্তির দ্বার। যোগে আর বিজ্ঞানে কোনও তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু প্রণালীতে। যোগের পথে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পথে যোগ দুই-ই সম্ভব।

আমার এই সব বিশ্বাসের কথা আমি কাউকে বলতে পারব না, বলতে চাইও না। কে শুনবে! পাগল ভেবে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে। আমি জানি, এ সংসার ছেড়ে মা এখনও যেতে পারেননি। তিনি অন্য তরঙ্গে, আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এমন রূপে বর্তমান। মাতামহ তা হলে অমন তুলসী তুলসী করতেন না। তাঁর সেই দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেনগৃহী তান্ত্রিক। তাঁর অনেক বিভূতি ছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত

সব দুর্ঘটনা থেকে পিতৃদেব কি ভাবে রক্ষা পেয়ে আসছেন ? এ-পাড়ায় আমাদের শত্রুর তো অভাব নেই। মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কে তাদের দাঁত ভেঙে দেন ! গুরুজনের সঙ্গে আমি তর্কে নামতে চাই না, আমি শুধু আমার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।

এই যে কাকীমা এখন ড্রয়াব খুলে সব কাপড়চোপড় গোছগাছ করতে লেগেছেন কার হুকুমে ! নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ড্রয়ারের দ্বিতীয় খোপে আমার মায়ের কিছু শাড়ি আর ব্লাউজ আছে, রেশমের মত নরম এক ধরনের পেটিকোট আছে। কি যেন তার নাম, স্যারঙ্গ না সারঙ্গ। সব ছেড়ে ওই সব নিয়ে টানাটানি করছেন কেন ! জানেন না ওগুলো হল পবিত্র স্মৃতি। আমি ঘরে বসে আছি, একবার আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। পিঠের দিকে আঁচলে ঝুলছে চাবির থোলো। আমাদের সংসারের চাবি, কবে কি ভাবে ওঁর অধিকারে চলে গেল ! তাজ্জব ব্যাপার ! ভদ্রমহিলা কি আমার মায়ের স্থান অধিকার করতে চাইছেন ! চেহারায় বেশ একটা লাবণ্য এসেছে। রঙ যেন ফেটে পড়ছে। চোখে এক ধরনের জ্যোতি এসেছে। সব ব্যাপারেই বাড়তি উৎসাহ ! ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন।

মাঝে মাঝে আমি আড় চোখে তাকিয়ে দেখছি। খুব শুদ্ধ দৃষ্টি নয়। শুদ্ধ হলে শরীরের চিন্তা আসত না। এই মহিলার পাশাপাশি থেকে সাধনভজন অসাধ্য। আচারের ঘরে অম্বলের রুগী বাঁচতে পাবে না ! তিলে তিলে মৃত্যুই আমার কপালের লিখন।

ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে এটা সেটা প্রশ্ন করছেন, যার উত্তরে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। মায়ের সঙ্গে আমার পিতার সম্পর্ক কেমন ছিল ! জানেন, আমার কিছুই জানার কথা নয় তবু যতসব মেয়েলী প্রশ্ন। কোনওটারই উত্তর আমি দিচ্ছি না, হুঁ হাঁ করে যাচ্ছি বা চুপ করে থাকছি। এক একটা জিনিস বেরোচ্ছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে, উত্তর ফিরছে না।

আমি খাটে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। পিতৃদেব দ্বিপ্রহরের আহারের পর সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার শরীরও ভাল নয়, তা ছাড়া মাতুল আজ সন্ধের ট্রেনে ফিরে চলেছেন। আজ আর আমাব অফিসে যাওয়া হল না। দেরাদুনে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। আর তানা-নানা কবে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকীমা মাতুলের সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না। ভদ্রমহিলার প্রখর মানসম্মান বোধ। বললেন, ওখানে গেলে তো আয়ার মত থাকতে হবে। এ কথা আর কাউকে অবশ্য বলেননি, বলেছেন আমাকেই, একান্তে। শুনে আমি স্তম্ভিত। সেই মুহূর্তে খুব খারাপ একটা কথা আমার জিভের ডগায় এসেছিল, কোনওরকমে আটকে ফেলেছিলুম, তা না হলে বলেই ফেলতুম, খেতে পেলে, শুতে চায় !

হঠাৎ ভালবাসা, কেন কুৎসিত ঘৃণাব চেহাবা নিল ! কারণটা কি ? স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন, নিজেকে অনুসন্ধান করো। অনুসন্ধানের ফলে যে সব বস্তু বেরিয়ে আসছে, দেখে চমকে উঠছি। কর্পোরেশনের ম্যানহোলে মনে হয় এর চেয়ে কম ময়লা জমে আছে। মনটা একেবারে পচে গেছে। অ্যামপুট না করলে বাঁচার আশা নেই। কুৎসিত এক ধরনের ঈর্ষায় ভেতরটা পুড়ছে। সর্বনাশ ! আমাব দেবোপম পিতৃদেবকে কি আমি রাইভ্যাল মনে করতে শুরু করেছি ! আমার আত্মহত্যা করা উচিত। সাধু সঙ্গে, সদ্‌গ্রন্থপাঠে আমার ঘোড়ার ডিম হবে। আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি। ঘরে বসে বসে, কারুর সঙ্গে না মিশেও আমি গোল্লায় চলে গেলুম। ভেকের মত ভোগী একটা সত্তা ভেতরে বসে কর্কশ ডাক ছাড়ছে।

আমার সমস্ত চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল। কাকীমা খুব সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি নিয়ে আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'দেখেছো, কি সুন্দর শাড়ি তখন তৈরি হত ! একেবারে নরম তুলতুলে। ডিজাইনটা দ্যাখো একবার ! কি তখন থেকে শুয়ে শুয়ে উঁ উঁ করছ ! ওঠো না।'

কাকীমা আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ওঠাতে চাইলেন। মেয়েদের এ এক ধরনের দানবীয় সোহাগ। ভালোবাসার জোয়ারে হজম করা যায়, ঘৃণায় মনে হয় অসহ্য উৎপাত। চুল ধরে তুলতে গিয়ে হাত ফসকে শাড়িটা পাটে পাটে ভেঙে মেঝেতে ধসে পড়ল। দুটো কান আমার গরম হয়ে উঠল। ধৃষ্টতা

সীমাহীন। মৃত মানুষ আর দেবতায় কোনও তফাৎ আছে ! এই শাড়িতে আমার মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণ লেগে আছে। যীশু খ্রীষ্টের অঙ্গাচ্ছাদনের মত এই বস্ত্র পবিত্র, আমার কাছে হোলি বাইবেলের মত।

উঠে বসে বললুম, এ কি করছেন আপনি ? এ সবে আপনাকে কে হাত দিতে বলেছে ! বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে ! এ বাড়ির আপনি কে ? হু আর ইউ !

রাগের ঝোঁকে এক নিঃশ্বাসে কথা ক'টা বলে ফেললুম। অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে জমছিল। থাইসিসের রুগীর ফুসফুসক্ষরিত রক্তের মত। অপমানে ভদ্রমহিলার টুকটুকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। মেয়েদের কি অদ্ভুত মন ! সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোলে জল এসে গেল। একটি করুণ ছবি ধীরে ধীরে, ভোরের শিশির ভেজা ফুলের মত চোখের সামনে ফুটে উঠল। নিচু হয়ে অতি যত্নে শাড়িটি তুলে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সাদা স্ট্যাচুর মত পিতৃদেব ঘরে এলেন।

আমি বলেছি, পলাশ।

চমকে উঠলুম। আমার পিতা জীবনে এই বোধ হয় প্রথম ভালো নাম ধরে সম্বোধন করলেন। মুখের চেহারা শীতল। চোখ দুটি ইস্পাতের ফলার মত তীক্ষ্ণ। আশ্চর্য ! পিতা কি এই মহিলাকে আগলাবার জন্যে ছুটে এসেছেন ? এটা কি এক ধরনের আস্কারা নয়, যার উৎস মানুষের মনের দুর্বলতা। পিতা আরও ঠাণ্ডা, আরও কঠিন গলায় বললেন, আমি বলেছি। তুমি না জেনে এই রকম রূঢ় কথা বলতে পারলে ? তোমার স্বভাব দেখছি বেশ পালটেছে ! পাখি তুমি, বেশ উড়তে শিখেছ, আর এ বাসার প্রয়োজন কি, তাই না ?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনিও বেশ পালটেছেন।

ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। এ আমি কি বলেছি ! পিতৃদেব বললেন, আমি ? আমি সেই একই আছি, দ্যাট সেম ওলড হরিশঙ্কর। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আমি পালটেছি, কাল আমার যে বয়েস ছিল, আজ তা একদিন বেড়েছে। আগামীকাল বেড়ে যাবে আরও এক দিন। তোমার দেখার ভুল। আমি জানি, তোমার কি হয়েছে ! তোমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে !

আপনি আমার পালটানোর কি দেখলেন ?

শুনবে তা হলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রথম পরিবর্তন, তোমার মধ্যে সব সময় একটা রাগের খেলা চলেছে। কোনও কথাই আগের মত আর সহজ সরল করে বলতে পারছ না। ছিলে ফুটন্ত ফুলের মত, হয়ে গেছ কুঁড়ি। অকারণে আজকাল তুমি আমাকে এড়িয়ে চলতে চাও।

কারণ আছে।

জানি জানি, কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

আপনি কারণটা সঠিক জানেন না।

হতে পারে। অনুমান সব সময় সঠিক পথে চলে না। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, স্নেহ আর ভালোবাসা দুটো মানুষকে এক সুরে বেঁধে দেয়, একই তরঙ্গে তারা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তুমি আমাকে ঘৃণা করো, বলো ঠিক কি না ! সত্য বলবে। বি ফ্র্যাঙ্ক।

স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে ফ্র্যাঙ্ক হতেই বলেছেন। কিছু চেপে রাখবে না। জলের তোড়ে ঠেলে বের করে দেবে। বললুম, ঠিক ঘৃণা নয়, তবে সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে। আপনার সব কিছু আর আগের মত সমর্থন করতে পারি না, মেনে নিই।

সমালোচনার মত কিছু দেখলে অবশ্যই সমালোচনা করবে। তুমি যেমন আমার পুত্র তেমনি আমার বন্ধু। বলো তুমি, কোথায় আমি তোমার সমর্থন হারিয়েছি ?

যেমন ধরুন, যে সব জিনিস আমার মা ব্যবহার করতেন, সে সব জিনিস আমার কাছে ভীষণ পবিত্র। সে জিনিস আমরা ছাড়া অন্যে কেন স্পর্শ করবে ?

তোমার মা কি আমার স্ত্রী ছিলেন না ?

ছিলেন।

দু'জনেরই সমান অধিকার ?

আমার কিছু বেশি, পবিত্রতার দিক থেকে। স্ত্রীর চেয়ে মা অনেক বেশি পবিত্র।

স্ত্রী পবিত্র নয় ?

মায়ের সঙ্গে সন্তানের রক্তের সম্পর্ক।

ও তার মানে, তুমি দুটো সম্পর্কে একটা ভেদ টানতে চাইছ ? একটা রক্তের সেই হেতু পবিত্র, আর একটা দেহের সেই হেতু অপবিত্র। দেহ কখন রক্তে এসে যায় জান কি ? তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, ফিউসান কাকে বলে জান ? জান কি এমন বন্ধন আছে যা অবিচ্ছেদ্য, মৃত্যু ছাড়া যে বন্ধন খোলে না। জানো তুমি ?

জীবিত অথবা মৃত স্ত্রীকে মানুষ ফেলে দিতে পারে, অস্বীকার করতে পারে, অবহেলা করতে পারে, মাকে তা করা যায় না, যারা করে তারা পাপী।

তার মানে ? তুমি বলতে চাইছ আমি তোমার মাকে জীবিত অবস্থায় অবহেলা করেছি, আর মৃত্যুর পর ভুলে গেছি ! হায় রে বিচাবক ! কি তার প্রমাণ !

যে জিনিস আপনি আমাকেও স্পর্শ করতে দিতেন না, সেই জিনিস আপনি এই মহিলাকে টেনে টেনে বের করার অনুমতি দিয়েছেন, শুধু তাই নয়,অসন্তোষ প্রকাশ করায় তেড়ে এসেছেন আমাকে। অথচ এই মহিলা একদিন আপনার বিছানায় বসেছিলেন বলে, আপনি আমাকে তিরস্কার করেছিলেন।

বিছানায় বসলে এখনও করব। পুরুষের শয্যা পবিত্রস্থান, সাধনপীঠ।

আর মায়ের স্মৃতি বাজারের প্রদর্শনী। মা আর আপনাতে জীবিত নেই। এবার সত্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তোমার ইঙ্গিত বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে পলাশ। তবে একটা কথা, তুমি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে এসে গেছ। মানুষ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই।

মনে আছে, সেই জবার ব্যাপারে আপনি আমাকে কি বলেছিলেন ?

তুমি কি তার রিটার্ন দিতে চাইছ ?

আমি কেন, জনসাধারণ কি বলছে খবর রাখেন ?

জনসাধারণ ? তারা কে ? আমি কি একটা পাবলিক ফিগার, যে তাদের ভয় করে চলতে হবে ! আমি হরিশঙ্কর, একটা ইনডিভিজুয়্যাল ম্যান, যে শুধু তার বিবেকের নির্দেশে চলে, বিবেকের কাছে সমথন খোঁজে। তুমি আমাকে দেখছ না ? ও, না, আমারই ভুল। তুমি তো চোখে দেখ না, তুমি দেখ কানে, লাইক স্নেকস্।

আপনি সংসারের চাবি এই ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়েছেন কেন ? জানেন এই চাবি আমার মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকত।

এ-তে তোমার মহাভারত এমন কি অশুদ্ধ হল ? তোমার শিক্ষা কি পরকে আপন করতে শেখায়নি। কনফিডেনস শব্দটা কি তোমার কাছে অপরিচিত ! তোমার বউ আসুক এ চাবি তো তারই। এটা তো স্টপ গ্যাপ।

বউ কোনও দিনই আসবে না। আমি বিয়ে করব না।

তুমি আমাকে ছোট করে বিদ্রোহ জানাতে চাও ?

আপনি ছোট হবেন না, জেনে রাখুন সেই মেয়েটি চরিত্রহীন।

তার মানে ? এও কি তোমার এক নতুন আবিষ্কার ?

নিজের চোখে দেখা।

আশ্চর্য ! চরিত্রহীনতা চোখে দেখা যায় ! সে তো অনুসন্ধানের বস্তু, আবিষ্কার করতে হয়।

সত্যের মত মানুষ হোঁচট খেয়েও তাব ওপর পড়তে পারে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে আমি সেই সত্যের ওপর পড়ে গেছি। মেয়েটি আমার চেয়েও ভাল একটি ম্যাচ যোগাড়

করে ফেলেছে। তার সঙ্গেই সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া, সেদিন বাগবাজারের মোড়ে পঙ্কজবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে এমন একটা কথা বলেছেন, যা শুনলে আপনাদের এতদিনকার বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

শুনতে পারি ?

পারেন। তিনি বললেন, পলাশ, তোমার বাবা এটা কি করলেন, আমার মেয়ে ইললিগ্যাল একজন শাশুড়ী নিয়ে কি ভাবে ঘর করবে ! আমাদের একটা নিখুঁত বংশের ধারা আছে।

ইজ ইট ? এই কথা বলেছে ? অল রাইট।

পিতৃদেবের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। কিছু কথা থাকে যা শত চেষ্টাতেও চাপা যায় না। ঠেলে বেরিয়ে আসে, একটার পেছনে আর একটা। এই মুহূর্তে নিজেকে, আমার পিতার চেয়েও মহান মনে হচ্ছে। আমি ইস্পাত, উনি খাগড়া। আমার ধারে উড়ে গেলেন।

আচ্ছা, পুরো ব্যাপারটা আমি একটু খতিয়ে দেখি। বিবেকের কাছে সারেণ্ডার করব, না জনসাধারণের কাছে !

সদর থেকে হাঁক এল, চিঠি আছে, পার্সেল।

ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলুম। বারান্দায় পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন, উদাসমুখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে খোদাই করা পাথরের মূর্তি। কাকীমা যেন দম দেওয়া পুতুল। শাড়িটা রেখে ড্রয়ার বন্ধ করলেন। টিস্ করে একটা শব্দ হল।

বেশ মোটা একটা প্যাকেট। পিতার নামে এসেছে। রেজিস্টার্ড পার্সেল। ফর দিয়ে সই করে নিলুম। মনে হচ্ছে একটা বই আছে। হঠাৎ বই এলো কোথা থেকে ?

বইয়ের প্যাকেট হাতে তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন সেইখানে গিয়ে বললুম, আপনার নামে একটা বই এসেছে। আকাশের দিক থেকে তাঁর চোখ ফিরল না। এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে চিকচিক করে। সুদূর থেকে ভেসে এল তাঁর গলা, খুলে দ্যাখো। বই আবার কে পাঠালে ?

যে সুরে বাজাই বেসুর লাগে
কোথায় যেন কসুর থাকে ;
জমে না হায়, গান থেমে যায়
পরাণ-ভরা হাহাকারে।

পরতে পরতে কাগজ জড়ান পার্সেল খুলতে একটু সময় লাগল। বই। বেশ স্বাস্থ্যবান। প্রথমেই যে দিকটা বেরলো, সেটা মলাটের পেছন দিক। হঠাৎ কে আবার বই পাঠালেন ! বইটা ওলটাতেই, মনে হল আমি আচমকা একটা গুলি খেলুম। সরাসরি একেবারে বুকে। জিভে তামাটে স্বাদ। পা দুটো থির থির করে কাঁপছে। বরফশীতল সরীসৃপ পা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, বুকের দিকে উঠে আসছে। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেতুম, আমার মুখ নীল হয়ে গেছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। বইটাকে কোনও রকমে উপুড় করে রেখে, প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকে খাটে বসে পড়লুম।

সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। ছি ছি, ভাবা যায় না। এ কার কাজ ! তাকে হাতের কাছে পেলে, খুন করে জেলে যেতেও রাজী ছিলুম। পিতাকে এ ভাবে অপমান করার শোধ তুলতুম। মানুষের ভেতরে ভেতরে কত বড় বড় পয়ঃপ্রণালী চাপা আছে ? ওপর দেখলে বোঝা যায় না। হাসছে। জোড় হাতে নমস্কার করছে। সহৃদয়তায় গলে পড়ছে। দেখা হলেই, কি, কেমন আছেন, বলে দাঁত বের করছেন। বিজয়ায় কোলাকুলির ঘটা। পিতৃদেব সেই কারণেই মাঝে মধ্যে বাথরুমে গেয়ে

ওঠেন, জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে। মুখে সবাই পরম বন্ধু, হৃদয় ভরা বিষ। এই পৃথিবীর সব ভালো, বৃক্ষ, লতা, স্রোতস্বতী, আকাশ-বাতাস, সব ভালো, কুৎসিত হল মানুষ ! বাঁদর যে আমাদের পূর্ব পুরুষ ! কেমন করে ভোলা যায় আমাদের সেই সলাঙ্গুল অতীতকে। একটু আগে আমিই বা কি-করে এলুম ! নিঃসঙ্গ পবিত্র এক যোদ্ধাকে অহঙ্কারের বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে এলুম। আমি এক মূর্খ।

পিতা বারান্দায় সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে যেন বয়ে চলেছে দিকহীন জীবনেব নদী, যার পরপার ঝাপসা অনিশ্চয়তায আচ্ছন্ন। পায়ে হাত রেখে প্রণাম কবায় চমকে উঠলেন, কে ? হঠাৎ কি হোলো তোমার ?

আমায় ক্ষমা করুন।

সন্তান তো সব সময় ক্ষমার স্রোতেই ভাসছে। পিতাব অপরাধের ক্ষমা কোথায় ?

আপনার কোনও অপরাধ নেই। কোন সমাজে আমরা বাস করছি, আমাব জানা ছিল না। ওই দেখুন, কি বিশ্রী, নোঙরা এক বই পাঠিয়েছে, অদৃশ্য কোনও এক প্রেরক।

আমি অনুমান করেছিলুম। একটি মহাপুরুষ-বাক্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যব হাতি চলে বাজার, তো কুত্তা ফুকে হাজার। ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মানুষকে এই ভাবেই এগিয়ে যেতে হবে বন্ধুর পথে। ডোণ্ট ফ্লিকার মাই বয়। ন্যায়কে অন্যায় কোনও দিনই পরাস্ত কবতে পাবে না, কোনও দিন পারেও নি, থমকে দিতে পারে। যাও, কেরোসিনে চুবিয়ে বইটাকে উনুনে ফেলে দাও। তুমি আমার বন্ধু। সমালোচনার অধিকার তোমাব আছে। সংশোধনেব প্রয়োজন থাকলে নিজেকে সংশোধন করার উদারতা যেন আমার থাকে। মৃত্যুর আর এক নাম 'রিজিডিটি', জীবনের আর এক নাম 'ফ্লেকসিবিলিটি'। পিণ্টু, লেট আস লাভ লাইফ, নট ডেথ।

কুৎসিত কদর্য বইটা যত তাডাতাডি পুড়িয়ে ফেলা যায় ততই ভালো। আব এক মুহূর্ত ফেলে রাখা উচিত হবে না। তার আগে আর একটা কাজ বাকি। কাকীমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। বড অন্যায় করে ফেলেছি। মহিলার সব গেছে, আছে শুদ্ধ জীবনের সামান্য আশা। কে না বাঁচতে চায়। ফুটপাথে সারারাত ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে যে পড়ে আছে, তার সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে, সেও একটু সময় চেয়ে নেবে। রোজ সকালে সূর্যোদয়েব দিকে তাকিয়ে সে-ও মনে মনে ভাবে, হয়তো আমাবও দিন আসবে, দেখি না, আব একটু অপেক্ষা করে।

মহিলা ওপরের কোনও ঘবেই নেই। কোথায় গেলেন ? নিচে ! সেই বিমর্ষ, মৃত্যু-শীতল কোটরে যেখানে উচ্ছৃঙ্খল, আশাহত একটি মানুষের প্রেত নিঃশব্দে জীবনকে গ্রাসের অপেক্ষায় আছে। এ কি ? সেই চাবির থোলোটা ড্রয়াবের মাথায় পড়ে আছে, যেটা একটু আগেও কাকীমার আঁচলে ছিল। এবাব যদি আমাব চোখে জল এসে থাকে, সে কি আমাব দুর্বলতা, আমার কোমলতা ! সংসার আমার জন্যে নয়। এ বড় করুণ স্থান। প্রতি মুহূর্তেই কাঁচেব ফলাব ওপর দিয়ে বক্তাক্ত হতে হতে হাঁটা !

নিচের ওই ঘরে ঢুকতে ইদানীং আমাব ভীষণ ভয় করে। মনে হয় হাঙরের মত এখুনি আমাকে আবার মুখে পুরে ফেলবে। অতীত ফিরে আসবে অনুশোচনা নিয়ে। প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ আসছে। দরজার কাছ থেকে খুব মৃদু সুরে ডাকলুম, কাকীমা। কোনো সাড়া পেলুম না। ফোঁসফোঁসানিটা সামান্য কমে এলো।

আবার ডাকলুম, কাকীমা।

এবারে চাপা গলায় উত্তব এলো, এসো।

নিরাভরণ ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ কবে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। নোনা ধরা, জ্যাম্প ঘরের চারপাশ থেকে হিল হিল করে উঠছে মৃত্যুর শীতল নিঃশ্বাস। অনেক দিন আগে বোতলে একটা পাথরকুচি গাছ রেখেছিলুম। একদিন নির্জন দুপুরে বোতলটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলুম। নীলচে সবুজ জলে, জালি জালি অসংখ্য সাদা সাদা শিকড় জীবন্ত প্রাণীর মত, অক্টোপাসের মত কি যেন খুঁজছে। মনে হল কাঁচের আবরণেব বাধা না থাকলে, আমাকেই জড়িয়ে ধরতে পাবে। এই ঘরেও দৃষ্টিকে আমি তেমন ভাবে চারপাশে ফেরাতে পাবি না। ভয় করে। চাবপাশে

ঝুলে আছে আমার কৃতকর্মের সরু সরু কীট।

সেই রাতে আমি যতটা কাছে যেতে পেরেছিলুম, আজ আর তা পারলুম না। চিরকালের জন্যে মনে পাপ ঢুকে গেছে। মন অপরিষ্কার হয়ে গেলে মানুষ কেঁচোর মত গুটিয়ে যায়। বেশ কিছুটা দূর থেকে বললুম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে কাকীমা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখের বড় বড় পাতা জলে ভিজে ভারি হয়ে ঝুলে আছে। গালে এক বিন্দু পলাতক জল টল টল্ করছে। এই কি বিধবা হবার বয়েস! কথাটা মনে হওয়া মাত্রই চমকে উঠলুম। এ আমি কি ভাবছি!

কাকীমা ধরা ধরা গলায় বললেন, তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি। ঠিকই করেছ। আমার বোকামি এখন আমি বুঝতে পেরেছি। পর কখনও আপন হয় না পিণ্টু। তুমি ঠিক করেছ, ঠিক করেছ।

ঠিক করেছ, ঠিক করেছ বলতে বলতে কান্নায় গলা ভেঙে এলো। এখন তো আমার আর কিছু করার নেই। ছোঁড়া পাথর, ওলটান দুধ আর বলা কথা, কোনও ভাবেই ফিরিয়ে আনা যায় না। আর কাছের মানুষ নই, দূরের মানুষের মতই বললুম, আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে, ওপরে চলুন।

কান্না সামলে কাকীমা বললেন, পিণ্টু, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

বলুন, সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।

মামাবাবু আজ রাতে চলে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে তোমরা আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও। তখন আমি না বলেছিলুম, এখন আমি হ্যাঁ বলছি। আমাকে কোথাও একটা যেতেই হবে। এখানে সত্যিই আর থাকা যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, কি থেকে কি হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমি বড় খাবাপ মানুষের বউ ছিলুম। আশেপাশে এমন একজন কেউ ঘুরছে, যে আমাকে সুখে থাকতে দেবে না। আমাকে কোথাও একটা যেতেই হবে।

এ সব কথা আপনি আমাকে না বলে, ওপরে এসে বাবাকে বলুন। আমি কে?

উত্তরে কোথা থেকে আবার একটু রাগের ছোঁয়া এসে গেল। মেয়েদের চরিত্রটাই এইরকম। এক ইঞ্চি পেলে, এক বিঘত চাইবে। ক্ষমা চাইলুম, তাতে হল না. অন্যায় হয়ে গেছে বললুম, তাতেও হল না। যার কেউ নেই, তার এত অভিমান সাজে না। কিসের অভিমান! কার ওপর অভিমান? পত্রশূন্য বৃক্ষের ছায়ার অভিমান!

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হল, আমি হয় দেবতা, না হয় শয়তান! যতদিন মোহ ছিল, ততদিন আকর্ষণ ছিল। এখন শুধু পড়ে আছে ঘৃণা। আমার দ্বিতীয় কাজটি এবার করা যাক। কে থাকবেন আর কে যাবেন আমার জানার প্রয়োজন নেই। এ সংসার ভেঙেই আছে। দু-একটি উটকো পাখি মাঝে মধ্যে উড়ে এসে গান শুনিয়ে যায়, তাকে বসন্ত বলে ভুল কোরো না মন?

গিধধোড় বইটার প্রথম মলাটের তলায় একটা চিঠি। মহামান্য হরিশঙ্করবাবু, অনেক দিন সব ভুলেটুলে গেছেন। আবার নতুন করে যখন শুরু করলেন, বইটা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আপনি জ্ঞানী মানুষ। চরিত্রের অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে চলেন। দ্বিতীয় পক্ষের প্রস্তাব ঝেঁটা মেরে উড়িয়ে দেন। তা মুনিদেরও তো মতিভ্রম হয়। নিজে কিনতে লজ্জা পাবেন ভেবে আমরা যৌতুক পাঠালুম। যে বউভাত হল না, মনে করুন এটি সেই বউভাতেরই উপহার। খাওয়াটা পাওনা রইল মাইরি। অন্নপ্রাশনে যেন বাদ না পড়ি। বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখি। ইতি জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।

আগুন আর বাইরে জ্বলবে কি! আগুন আমার ভেতরে জ্বলছে। আমি যদি পিতৃদেব হতুম, তাহলে চারপাশে চার জোড়া নহবত বসিয়ে, আকাশে তারা বাজির লহর তুলে, সকলের চোখের সামনে ওই মহিলাকে বিবাহ করতুম। কেন, বাঙলার শ্রেষ্ঠপুরুষ বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করে যাননি! তিনি তা পারবেন না। অন্য জাতের মানুষ। অন্তরে যাঁর সন্ন্যাস তাঁর চিন্তায় এসব কখনও আসবে না। এ পল্লীতে আমাদের আর থাকা উচিত হবে না। আমাদের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আর আভিজাত্য এতকাল যে সব শত্রু তৈরি করেছে তারা এইবার সুযোগ নেবে। এই হল প্রথম আঘাত। এর পর একে একে আসবে।

চিঠি সমেত যৌনবিজ্ঞানকে কেরসিন-স্নাত করে আগুনে সমর্পণ করা মাত্রই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শিখায় শিখায় সঙ্ঘর্ষে একটা অট্টহাসির মত শব্দ উঠছে। এ হাসি আমার পিতার পূত চরিত্রের, না নোংরা প্রতিবেশীদের।

মোটা বই পুড়তে বেশ সময় নিল। রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। প্রেতিনীর চুলের মত ধোঁয়া ভেতরের ছাদে পাক খাচ্ছে। ডাইনীর নৃত্য! চোখ জ্বালা করছে। পেছন থেকে ধরাগলায় কাকীমা বললেন, এ কি, এ আবার তুমি কি করছ? এখুনি যে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে?

এই চিঠি, ওই বই, এই মহিলা, সেই দুষ্ট প্রতিবেশী আমার মনেও কদর্য ভাব ঢুকিয়ে ছেড়েছেন। একেই বলে দ্রব্যগুণ। পেঁয়াজের সংস্পর্শে গন্ধ ধরবেই। চকিতে মনে উঁকি মেরে গেল, হলেও হতে পারে। নারী আর পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা ঘৃত আর অগ্নির মত। যিনি এই কয়েক মাসে সদগুরু সঙ্গ প্রায় মুখস্থ করে ফেললেন তাঁর তো জানা উচিত, নারী কি বস্তু। গোস্বামীজী স্পষ্ট বলছেন, স্ত্রী-দেহ এমনই উপাদানে গঠিত যে, নির্বিকার পুরুষের শরীরকেও তা আকর্ষণ করে। —ইহা বস্তু-গুণ। অর্থ ও স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক।

যে বস্তু পুড়ে ছাই হচ্ছে, তার নাম তো এই মহিলাকে বলা চলে না। ওই গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমার খুলে দেখাব সাহস হয়নি। না হলেও, ওই জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে লাভ করাব প্রয়োজন হয় না। রক্তে আছে। যতদিন যায় তত স্পষ্ট হয়, ততই প্রত্যক্ষ হয়। ধমনীতে ধমনীতে আর্তনাদ করে, আমি চাই, আমি চাই।

নির্বিকার গলায় বললুম, আগুন লাগার ভয় নেই। কিছু কাগজ পুড়ছে।

তোমাকে ডাকছেন।

যাচ্ছি।

উনুনেব মুখে একটা লোহার ঢাকনা টেনে দিলুম। দেহবিজ্ঞান ছাই হয়ে গেল। ইন্দ্রিয় কিন্তু রয়েই গেল। সাংঘাতিক এক ইঙ্গিত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমি আর ভালো করে কারুব দিকেই তাকাতে পাববো না। কেবলই মনে হবে, হলেও হতে পারে। মানুষের পক্ষে সবই যে সম্ভব?

পিতৃদেবের মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে বহু দূর থেকে বললেন, বোসো তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। ক'টা বাজল?

সাড়ে চারটে।

জয়েব ট্রেন ক'টায়?

আটটা কি সাড়ে আটটা হবে। আমাব সঠিক সময়টা জানা নেই।

যাই হোক এখনও সময় আছে। শোনো, এ পাড়ায় আমাদের অনেক শত্রু আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঙালীর স্বভাব তোমার অজানা নয়। আমরা কারুর সঙ্গে বড একটা মিশি না। আমাদেরও এক ধবনের উন্নাসিকতা আছে। নিজেদের বড বেশি শ্রেষ্ঠ ভাবি। নেকড়ের মত মানুষও সমাজবদ্ধ জীব। সমাজচ্যুতকে কামড খেতেই হবে। আমি প্রস্তুত। তবে আমি আর লড়াইয়ে অকাবণ শক্তিক্ষয় করতে চাই না। আমাব সব শক্তিকে এখন অন্য কাজে লাগাতে হবে। দিন শেষ হয়ে আসছে, কাজের কাজ এখনও কিছুই করা হল না। ঝুলিতে কিছুই তেমন ভরা হয়নি, একেবারেই শূন্য।। কিছু না নিয়ে, ম্লান মুখে আমি যাই কি করে! তুমি পবিত্র কোরআন পাঠ করেছ?

আজ্ঞে না, আমার পডাশোনা খুবই কম।

সময় পেলে পড়ে দেখো। তোমাকে আজ একটা কথা বলে রাখি, পরে আর হয়তো সময় পাবো না। পৃথিবীতে আমাদের থাকার সময় বড কম। এক জীবনে সব করে ওঠা যায় না। এলোমেলো পড়াশোনার কোনও দাম নেই। একটা ধারা ঠিক করে নিতে হয়। সেই জিনিসই পড়বে যা তোমাকে পজেটিভ কিছু দিতে পাবে, তোমার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, ধীরে ধীরে তোমার শূন্যতায় পূর্ণতা আনতে পারে। জগৎটাকে টুকরো টুকরো করে দেখো না। সব এক। সব মানুষ এক সব ধর্ম এক, সব অনুভূতিব উৎসও এক। কোবআন কি বলছেন জানো, যে ব্যক্তি পবলোকে ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে পবলোকেব ফসল বর্ধিত করে দিই। যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি

তাকে তারই কিছু দিই। পরলোকে এদের জন্যে আর কিছুই থাকবে না। তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।' শোনো, আমি আমার হঠকারিতা দিয়ে তোমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে চাই না। আমি পণ্ডিতের সঙ্গে পাণ্ডিত্য দিয়ে লড়তে পারি, অহঙ্কারীর সঙ্গে লড়তে পারি অহঙ্কার দিয়ে, অভিমানীর সঙ্গে অভিমান দিয়ে, অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার দিয়ে লড়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ভেতরে কোথাও একটা ছোট্ট শিখা জ্বলে উঠেছে। সেই শিখাটিকে সাবধানে আগলাতে হবে, বাড়াতে হবে। নিবে গেলে, আমার আর কিছুই থাকবে না।

হঠাৎ থেমে পড়লেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক গেলাস জল পেলে হত। আজকাল গলাটা বড় শুকিয়ে যায়। অ্যাসিডে বুকটা আমার ঝাঁজরা করে দিয়েছে।

আমি জল এনে দিচ্ছি।

উদাস সুরে বললেন, দেবে দাও। বয়েসটা সত্যিই বাড়ছে। আগে অন প্রিনসিপল কাউকে কখনও হুকুম করিনি।

তাতে কি হয়েছে?

না, না, মানুষের একটা আদর্শ নিয়েই চলা ভালো, অন্তত চেষ্টা করা উচিত।

এক গেলাস জল এনে হাতে দিলুম। গেলাসটা আলোর দিকে তুলে জলটা ভালো করে দেখতে দেখতে বললেন, এই দ্যাখো, কি সব ভাসছে।

কি ভাসছে? আশ্চর্য হয়ে গেলাসটা হাতে নিলুম। জল গড়িয়েই নিয়ে চলে এসেছি। তেমন খুঁটিয়ে দেখিনি। সত্যিই গুঁড়ো গুঁড়ো কি সব ভাসছে।

আমি পালটে আনছি।

কি বুঝলে?

আজ্ঞে?

স্নেহের বড়ই অভাব। বলো ঠিক কিনা! আমি একজন 'পারফেকসানিস্ট' পিণ্টু, আর সেইটাই আমার চরিত্রের মহা দোষ। আর একটা শিক্ষা কি হোলো বলো তো?

আজ্ঞে?

ব্রত ভঙ্গ করলে হতাশ হতেই হবে।

আমারই অপরাধ। আমি এখুনি আনছি, পরিষ্কার জল।

জল খেয়ে গেলাসের গায়ের জল কোঁচার খুঁটে মুছে টেবিলে সাবধানে রাখলেন। কত সাবধানী। জলের দাগে টেবিলের পালিশ নষ্ট হতে পারে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি না তো!

আজ্ঞে না, আমার আবার সময়ের দাম কি?

তা হলে বোসো। তোমার আর পাঁচ মিনিট সময় নিই। আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে বুঝলে? আর সেটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। যে চক্রান্ত প্রফুল্লকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে, সেই চক্রান্ত এবার আমাদের চারপাশে তার জাল বিস্তার করছে। এই মহিলাকে তারা সহজে ছাড়বে না। এমনও হতে পারে, এই মহিলা হয়তো তাদেরই একজন? তোমার কি মনে হয়?

আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, এর পেছনে ওই মামাশ্বশুরটি আছেন।

তিনি কি কারণে থাকবেন?

তাঁর স্বভাব।

পয়সার তো অভাব নেই? ভাত যখন ছড়াতে পারেন তখন কাকের অভাব হবার তো কথা নয়। শুনেছি…

যা বলতে চাই, তা গুরুজনের সামনে বলা যায় না।

কি হল, ইতস্তত করছ কেন ? সাহস করে বলো। উই আর ফ্রেণ্ডস।

আজ্ঞে, কোনও কোনও মানুষ বিশেষ কারণে কোনও কোনও মহিলায় আসক্ত হয়ে পড়তে পারেন. তখন তাঁরা যে কোনও সীমায় যেতেও পিছ-পা হন না।

দ্যাটস রাইট। তা হলে চক্রটাকে ভাঙতে হয়।

সে তো আমাদের কাজ নয়। পুলিসের কাজ।

পুলিস যথেষ্ট 'ইন্টারেস্ট' নাও নিতে পারে।

না নিলে না নেবে। আমরা আব কি করতে পারি।

আমরা খোঁচাতে পারি। আমাদের সন্দেহের কথা পুলিসকে জানাতে পারি।

যা গেছে তা গেছে, শুধু শুধু ঘাঁটাঘাঁটি কবে লাভ কি ? ব্যাপারটা তো খুবই নোংরা।

নোংবামি বলে অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। ভদ্রলোকদের এই ঠুনকো 'সেন্টিমেণ্ট ক্ষমা করা যায় ?

নোংবায় ঢিল ছুঁড়লে যে নিজেদেব মুখে ছিটকে আসবে। অনেক জল ঘোলা হবে।

তোমার মতে আমাদেব তা হলে এখন কি করা উচিত ?

ওঁকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দেওয়া।

কোথায় ?

মামাব ওখানে উনি যেতে রাজী হয়েছেন।

আমাকেও সেই কথাই বলছিলেন। হঠাৎ রাজী হবাব কারণ ?

তা জানি না. জেনেও কাজ নেই। যেতে রাজী হয়েছেন. বাধা না দেওযাই ভাল। এখানে থাকলে অশান্তি দিনে দিনে বাড়বে।

তা হলে তুমি একবাব জয়েব কাছে যাও। আব বেশি সময নেই। জয় শ্রাদ্ধের কাজটা এখানে কবলেই পারত !

এখানে যে কেউ নেই।

ওখানেই বা কে আছে ? যাক যা ভাল বুঝছে করুক। আমার আর সেদিন নেই যে জোর করব। সিঁড়িতে চটুবপটুব চটিব শব্দ হচ্ছে। এই দুঃসময় কে আবাব আসছেন ? বড সুললিত পদধ্বনি।

সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে

মেসোমশাই !

দরজার সামনে মুকু। স্বপ্ন দেখছি না তো ? মুকু হঠাৎ উড়ে এল না কি ?

মেসোমশাই, আমি আবার এসে গেছি।

পিতা চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন. এসো. এসো। তোমার বাবা ?

বাবা আসেননি।

সে কি ! তুমি একা একা এতটা পথ চলে এলে ?

আমি কত বড় হয়ে গেছি !

তা হয়েছ. তবু মেয়েদের একটু সাবধানে চলাফেবা করাই ভাল।

আমরা এক দল চলে এসেছি হই হই করে।

মুকু কথা বলতে বলতে পিতৃদেবের পায়ের কাছে থেবড়ে বসে পড়ল।

ওকি. তুমি মেঝেতে বসলে কেন ?

আপনার পায়ের কাছে বসতে ইচ্ছে করল। আপনি যদি আমার বাবা হতেন, কি ভালই হত!

পাগলী মেয়ে।

পিতার মুখে পাগলী সম্বোধন এই প্রথম শুনলুম। মুকু দু'হাতে পা স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। পিতা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মুকু কথার ফাঁকে ফাঁকে, বার কয়েক আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছে। দুর্দান্ত দেখতে হয়েছে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরেছে। একই রঙের ব্লাউজ। এলো চুলের গোড়ায় একটি ফিতে বেঁধেছে। রেশমের মত চুলের গুচ্ছ পিঠের কাছে দুলছে। আরও যেন ফর্সা হয়েছে। চোখমুখ আরও ধারাল হয়েছে। একবার তাকালে আধ্যাত্মিক শক্তির বলে মনকে ভগবতমুখী করে, কষ্টে চোখ ফেরাতে হয়। ফিরিয়ে নিলেও নিবে যাওয়া ধূপের ধোঁয়ার মত অনেকক্ষণ ভাসতে থাকে। বুকে বড় কষ্ট হয়।

হঠাৎ তুমি চলে এলে?

আবার পড়তে এলুম।

তোমার জিনিসপত্তর?

হস্টেলে।

ও তুমি হস্টেলে থাকবে! কেন, এখানে অসুবিধে আছে?

মুকু মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, না, না, অসুবিধে কিসের! একসঙ্গে কয়েকজন থাকব বলেই হস্টেলে থাকা।

ভালই করেছ। পুরো সময়টাই পড়াশোনায় দিতে পারবে।

কেমন আছেন আপনি? একটু রোগা হয়ে গেছেন।

বেশ বড় রকমের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক মাস বিছানায় পড়েছিলুম।

কি হয়েছিল?

অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিলুম।

আপনার খুব দুর্ঘটনা হয়, কেন বলুন তো?

প্রারব্ধ ক্ষয় করছি মা।

কাকীমা নেই?

হ্যাঁ আছে, ভেতরে আছে।

মুকু ভেতরে যাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় আমাকে ডেকে গেল। বেশ সাহস বেড়েছে। সেই চাপা ভাবটা আর নেই। পিতা বললেন, তুমি কিন্তু আর বেশি দেরি কোরো না। জয়কে গিয়ে খবরটা আগে জানিয়ে রাখো।

কাকীমা একটি ছোট পুঁটলি তৈরি করেছেন। দেখে মনে হচ্ছে যাবার জন্যে প্রস্তুত। হাত দুয়েক দূরে মুকু থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মনে হয় ধরতে পারেনি, মহিলার জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে গেছে। হয়তো লক্ষই করেনি, শাড়ির জমি কেন সাদা! সিঁথিতে সিঁদুর আছে না মুছে গেছে! আমি আসার আগে মুকু কি কোনও প্রশ্ন করেছিল?

মুকু অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে?

এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি সম্ভব! অতীত থেকে ফিরে আসতে হবে বর্তমানে। সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। তা ছাড়া এই মহিলা সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই। সমস্ত পরিস্থিতিটাকে ভদ্রমহিলা এমন ঘোলাটে করে তুলেছেন! পুরো পরিবারের মান-সম্মান ডুবে যাবে।

বললুম, কাকাবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। ইনি আজই চলে যাবেন।

তোমাদের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে দেখছি।

মুকু এগিয়ে গিয়ে কাকীমার পুঁটলির সামনে উবু হয়ে বসল। কাকীমা কেমন যেন দিশাহারা, অন্যমনস্ক। নৌকোর হাল ভেঙে গেলে তার আর চাল চলনের তেমন ঠিক থাকে না। গাছের মত। শিকড় নাড়ানাড়ি হলে মুষড়ে পড়বেই।

মুকু বললে, আপনি কোথায় যাবেন ? বাপের বাড়ি ?

কাকীমা নীরব্‌। একবার চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামালেন। মুকুর প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হল, কাকীমার কেউ কোথাও নেই। উনি আজই আমার মামার সঙ্গে বাইরে চলে যেতে চাইছেন।

কেন ? এখানে থাকার কি অসুবিধে ছিল ? এমন নির্ঝঞ্ঝাট বাড়ি আর কোথায় পাবেন। আপনি এখানেই থাকুন কাকীমা। মাঝে মাঝে আমি এসে আপনার সঙ্গে গল্প করে যাব। আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাব।

দুটো হাত পুঁটলির ওপর রেখে কাকীমা উদাস চোখে মুকুর দিকে তাকালেন। এমন শূন্য দৃষ্টি আগে কখনও দেখিনি। হয়তো কিছু বলার ছিল, ঠোঁট দুটো অল্প কেঁপে উঠল। কিছু বলতে পারলেন না। জলের ধারা নামল দু' চোখে।

মুকুর মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছে। জীবন এখনও যার শুরুই হয়নি, সে ভাঙা জীবনের কথা বুঝবে কি করে ? মুকু বসে বসেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে কাকীমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, কাঁদছেন কেন ? মামাবাবু খুব ভাল মানুষ। মেসোমশাইয়ের মত গম্ভীর নন। ভীষণ আমুদে। আমরা মাঝে মাঝে আপনাকে দেখতে যাব।

এই সব কথার উত্তরে কাকীমার অনেক কিছু বলার ছিল। আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ। সামনের বিমর্ষ পুঁটলিতে জীবনের যৎসামান্য উপকরণ। অনেক কিছুই মনে হয় ফেলে রেখে যেতে হবে। জীবনের প্রয়োজন কত সামান্য।

মুকু তুমি বোসো, আমি মামার ওখান থেকে চট করে একবার ঘুরে আসি।

আমি যাব তোমার সঙ্গে ?

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। মুকু জানে না, আমরা শত্রু পরিবৃত হয়ে বসে আছি। প্রায় সন্ধ্যায় সুন্দরী এক মহিলাকে সাথী করে রাস্তায় বেরনো, আর নিরস্ত্র সমরাঙ্গনে যাওয়া প্রায় একই ব্যাপার। কায়দা করে বললুম, তুমি এই এলে। কাকীমাও চলে যাবেন, তুমি থাকো, আমি যাব আর আসব।

মুকু চোখের এক ধরনের ভঙ্গি করল, যার অর্থ হতে পারে, ভীরু কোথাকার ? মুকুর আর আগের সে ভাব নেই। অনেক খোলামেলা, সামান্য চটুলও। স্বাধীনতা পেলে চরিত্রও কেমন পালটে যায় !

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, সবাই যেন আমার দিকে কোনও একটা প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে, কি গো, বইটা পেয়েছো তো। তোমার পিতা পড়া শুরু করেছেন ? জোড়া জোড়া, অসংখ্য চোখের সামনে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। পা পথ ভাঙছে দ্রুত গতিতে। বেশ বুঝতে পারছি, এ পল্লীতে আর বসবাস করা যাবে না। পালাতেই হবে।

নারকেল গাছের তলায় মাতামহের ছোট্ট খুপরিতে মাতুল বসে আছেন বিষণ্ণ বদনে। এক মাথা রুক্ষ চুল এলোমেলো। জীবনের মতই বিপর্যস্ত। মুখে সর্বক্ষণের সেই মধুর হাসিটি নেই। পর্বত তার এতকালের আড়ালটি সরিয়ে নিয়েছে।

উদাস গলায় বললেন, আয়, তোর কথাই ভাবছিলুম, এত দেরি করলি ?

একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্রী একটা ব্যাপারে আটকে গিয়েছিলুম।

কি আবার হল ?

ধীরে ধীরে সব কথাই বললুম, সব শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন, ছি ছি, তোদের পাড়াটা কি হয়ে গেল ? বইটা, চিঠিটা পোড়ালি কেন ? পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। জানিস তো, কান টানলে মাথা আসে। খুব ভুল করেছিস। মাঝে মাঝে মানুষকে উচিত শিক্ষা দিতে হয়, তা না হলে পেয়ে বসে।

বিমর্ষ ঘরে ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার ঘিরে আসছে। দাদুর তম্বুরাটি ঘরের কোণে এক পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারা মায়ের ছবিটি একটু হেলে গেছে, আর সেই রহস্যময় সিন্দুক, একপাশে। কতকালের স্মৃতি যে ওর মধ্যে জমা আছে। মায়ের চিঠি আছে, ব্যবহার করা জিনিস আছে, গান লেখা খাতা আছে, তন্ত্র-সাধনার নানারকম উপকরণ আছে। সিন্দুকটি ছিল মাতামহের প্রাণ। আগলে আগলে

রাখতেন, কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না।

মাতুল চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, ভদ্রমহিলাকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে সুখেই থাকবেন। একেবারে অনাথ হয়ে গেলুম রে পিন্টু! যতদিন জীবিত ছিলেন বুঝিনি। কত আঘাত দিয়েছি, অশান্তি করেছি, অনাদরও করেছি। কোন কিছু আর সংশোধনের উপায় নেই। শিল্পীর কখনও বিয়ে করা উচিত নয়। জীবনের সবচেয়ে বড ভুল বিবাহ। সংসার অক্টোপাসের মত সব সাধনাকে জড়িয়ে ধরতে চায়, ভীরু করে দেয়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবায়। কিছু কাজ আছে, যা একবার করে ফেললে, আর নিষ্কৃতি পাবার উপায় থাকে না, কিছু পথ আছে যে পথে এগোলে আর ফেরার উপায় থাকে না। তুই আমার ভাগনে, দিদি ছিল আমার মায়ের মত, তোকে আমি কত ভালবাসি, তোর ধারণা নেই, একটা কথা বলে যাই, জীবনকে বেশ বুঝেসুঝে খরচ করিস। নিজেকে চেনা বড কঠিন, সব সময় গুরুজনের পরামর্শে চলিস। নিজেকে এমন কারুর হাতে সমর্পণ করবি যিনি তোর দেহ-মন-বুদ্ধি-আত্মা সব কিছু খোলা বইয়ের মত পডতে পারেন।

তাব মানে গুরু।

পিতাব চেয়ে বড় গুরু আর কেউ নেই রে! আমি যে ভুল করেছি, তুই যেন সে ভুল আব করিস নি। জেনে বাখ ভুলও রক্তেব প্রবণতা। ভুল মানুষ করে না, ভুলের বীজই মানুষকে ভুল করায়। আমি নিজের দোষে সব ছাবখার করে ফেললুম। আজ আমি প্রবাসী। সংসারের ক্রীতদাস। আমার ডানা দুটো কেটে দিয়েছে ভাগ্য। আব আমি উডতে পাবব না। মুক্ত জীব হয়ে গেলুম বদ্ধ জীব।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের বাইবে নাবকেল গাছের তলায় এসে দাঁড়ালুম। সন্ধের বাতাস লেগেছে পাতায় পাতায়। দীর্ঘশ্বাসেব মত শব্দ উঠছে। হঠাৎ যেন চমকে উঠতে হয়। মাতামহ কি এখনও তাঁব প্রিয় জায়গাটিতে বসে আছেন, যেমন বসে থাকতেন গালে হাত দিয়ে। দোতলায় ওঠাব নির্জন সিঁডিটি চোখে পডছে। কেউ কোথাও নেই। সরু সরু ঘাসেব ডগা উদ্দাম বাতাসে বিরক্ত হচ্ছে। রাতের প্রথম ঝিঁঝিটি যন্ত্রেব সুর মেলাচ্ছে।

সন্ধ্যার উদাস আকাশেব দিকে তাকিয়ে মাতুল বললেন, সব ছারখাব হয়ে গেল। কোথায় গেল আমার সেই স্বপ্নেব শৈশব! ওই সিঁডিটার দিকে তাকালেই আমি দেখতে পাই, বাবা নেমে আসছেন ধীবে ধীবে, যৌবনের সে চেহাবা তোরা দেখিসনি। এক মাথা চুল ব্যাকব্রাশ কবা। বিলিতি পমেড পডে চক চক করছে। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। পায়ে গ্রিসিয়ান জুতো। সেই বাবু মানুষ ধীবে ধীরে সব ছাডতে ছাডতে, শেষে আমার চক্রান্তে শেষ ক'টা বছর এই ভাঙা ঘরে চাকরের মত কাটিয়ে গেলেন। আমি কার কথা শুনবো, বউয়েব কথা না নিজের বিবেকের কথা? ধীরে ধীবে আমাব আমি ঘুমিয়েই পডল। আব তো ফিরবে না কেউ? যাহা যায়, তাহা যায়।

সিঁডি ভেঙে উঠতে উঠতে মাতুল বললেন, ইট, কাঠ, পাথর প্রাণহীন তাই প্রাণের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী! মানুষ চলে যাবার পরেও, স্মৃতি বুকে করে এরা পড়ে থাকবে কত কাল। সিঁড়ির ধাপে ধাপে আমাব মায়েব পায়ের ছাপ, বাবার পায়ের ছাপ, দিদির পায়ের ছাপ, একদিন আমিও থাকব না, তুই থাকবি। তোর মনে পড়বে, এক সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে ওপরে উঠছিলুম, হয়তো এই আমাদের শেষ দিন, হু নোজ, দি ওয়ার্লড মে এণ্ড টু নাইট! কিছুই বলা যায় না, একেবারেই ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত। সুইচ-অন, সুইচ-অফ।

রান্নাঘরের সামনে বাহাদুর তোলা উনুনে কি একটা করছে! তাল-হারা নর্তকের মত মাতুল এলোমেলো ঘুরতে লাগলেন, ঘর বারান্দা, বারান্দা ঘর। কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। বারান্দাব চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে বললেন, এ বাড়ি রেখে আর লাভ কি? কে দেখবে? বেচে দেওয়াই ভালো, তুই কি বলিস?

না, এ বাড়ি বেচা চলবে না। আমার মাতামহের স্মৃতি আপনি কার হাতে তুলে দিতে চান?

তুই মাঝে মাঝে এসে দেখবি তো!

আপনার অবর্তমানে এ বাড়িতে এলে আমি কেঁদে ফেলব।

কাঁদবি। কাঁদলে মানুষ পবিত্র হয়। সব অহঙ্কার জল হয়ে ঝরে যায়। তোর কাছে চাবি রইল। আর একটা কাজ সময় মত করিস, সিন্দুকটা খুলে একবার দেখিস, কি রহস্য আছে।

আপনি পরের বার যখন আসবেন তখন দু'জনে একসঙ্গে খুলবো। ওর মধ্যে অনেক কিছু আছে। দাদু যে ভাবে আগলে আগলে রাখতেন!

আমি আবাব কবে আসব তার কি কোনও ঠিক আছে রে?

শ্রাদ্ধশান্তি আপনার কিন্তু এখানেই করা উচিত ছিল।

না রে, আমার মন চাইল না। এখানকার **প্রতিবেশীদের** আমি সহ্য কবতে পারি না, কিছু মনে করিসনি। শ্রাদ্ধ মানেই ভূতভোজন হয়ে যাবে। আমার অন্য প্ল্যান আছে, সাধুসেবা করব। অসাধারণ মৃত্যুর অসাধারণ পারলৌকিক কর্ম। তুই শুনলে আশ্চর্য হবি, তারামায়ের ছবির তলায়, দেয়ালে পেনসিল দিয়ে বাবা মৃত্যুর দিন-ক্ষণ-সময় সব লিখে রেখেছিলেন। ঠিক তাই হয়েছে। কি ব্যাপার বল তো। আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে রে। সাধনায় মানুষ কি না শক্তি লাভ করে! আমি যদি ওই শক্তির ছিটেফোঁটাও পেতুম! আমি এক কুলাঙ্গার। সংসার, সংসারই আমাকে মেরেছে।

সময় হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন।

হ্যাঁ, তুই তাহলে এক কাজ করিস, একটা ট্যাকসি ধরে কাকীমাকে নিয়ে চলে আয়।

বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন না!

তাও তো বটে! না দেখা করে যাই কি করে। ঠিক আছে তুই যা, আমি আসছি।

মুকু একা চুপ করে বসে আছে। কাকীমা রাস্তার দিকেব জানলার একপাশে চুপটি কবে দাঁড়িয়ে আছেন। পথ? পথকেই এবার জীবনের সাথী করতে হবে। সেই কথাই হযতো ভাবছেন।

মুকু, বাবা কোথায়?

হঠাৎ উঠে ছাদে চলে গেলেন। তোমাদের বাড়ির সুর কেটে গেছে।

তা একটু গেছে। তোমাকে সব বললে বুঝতে পারবে। দাদু হঠাৎ চলে গেলেন। এই ঘরেই। সে দৃশ্য এখনও ভাসছে চোখের সামনে। প্রফুল্লকাকাব অস্বাভাবিক মৃত্যু। কাকীমাকে নিয়ে দুবাত্মাদেব টানাহ্যাঁচড়া। বাবাব অ্যাকসিডেনট। সব সুর হঠাৎ বেসুরো। তুমি বোসো, আমি ছাদে ওঁব সঙ্গে একবাব দেখা কবে আসি।

আকাশে একটা দুটো তারা চোখ মেলেছে। পিতৃদেব পায়চাবি কবছেন। আগেকার মত সদম্ভে নয়। ভোরের বাতাসের মত মৃদু চরণে।

ছাদে চলে এসেছেন?

আর তো আমাব কিছু করার নেই।

মুকু একা বসে আছে!

সে তো তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তো তাব কোনও প্রয়োজন নেই।

কথাটা আচমকা, গুলির মত বুকে এসে বাজল। ইঙ্গিতটা মোটেই ভাল নয়। মুকু কি এমন কিছু বলেছে! অপমানজনক! আব কোনও তিক্ততার মধ্যে যেতে চাই না। প্রসঙ্গ পাল্টাই, নিচে চলুন। কাকীমা যাবেন, মামা আসছেন। সময় হয়ে এল।

আমি আব কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। যেখানে শুরু করেছিলুম আবার সেখানেই শেষ করে দিলুম। কারুর কোনও অভিযোগ থাকা উচিত নয়। এবার আমরা যে যাব পথে চলব। জীবনের শেষ যাত্রাপথ নিঃসঙ্গ হওয়াই ভাল।

আমার পথ তা হলে আমিই নির্বাচন কবতে পাবি। সে স্বাধীনতা তা হলে দিলেন?

অবশ্যই।

তা হলে আপনাকে আমি এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, আমি সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমে যোগ দিচ্ছি।

পায়চারি করতে করতে ছাদের দূর কোণে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে আসতে থমকে দাঁড়লেন, সন্ন্যাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেকে আমি সেইভাবে প্রস্তুত করে ফেলেছি।

সন্ন্যাস তোমার রক্তে নেই। জোর করে বৈরাগ্য হয় না। সন্ন্যাস আর ডাকাতি একই রকম সাহসের কাজ। একটা এ-দিক আর একটা ও-দিক। তোমার সে সাহস নেই। তোমাকে আমি যতটা জানি, তুমি তার সিকির সিকিও জান না। ওই ইচ্ছেটাও তোমার এক ধরনের রোমাণ্টিসিজিম্‌। জীবন যাদের খুব মাপা, তারা সন্ন্যাসী হতে পারে না। বলহীনের দ্বারা কিছুই লাভ করা সম্ভব হয় না। ড্রয়িংরুমে বসে ঈশ্বর লাভ করা যায় না।

পায়চারির জন্যে তিনি আবার পেছন ফিরলেন। ধীরে ধীরে দূরে ফুলগাছের টবের দিকে চলেছেন। আমার সমস্ত শ্রদ্ধা কেমন ঘৃণায় পরিণত হচ্ছে! আমার সব কিছু জানেন? আমার মানসিক শক্তি, আমার চিন্তা ভাবনা? সব উনি জেনে বসে আছেন। অসম্ভব!

ঠিক আছে, নিচে না আসেন, না আসবেন। মানুষটি কোনও দিন কারুর কাছে নতি স্বীকার করেননি। এ-ও তো এক ধরনের অহঙ্কার। মুকু বললে, কি হোলো, তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কথা কাটাকাটি করে এলে?

কি করে বুঝলে?

তোমার মুখ দেখে। তুমি আমার দেওয়া আঙটিটা ফেললে কোথায়? আঙুলে নেই তো।

রেখে দিয়েছি।

পরলে না কেন? তোমার সামনে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। কেন বলো তো? তুমি আমার আবোলতাবোল পড়ে কি ভাবলে?

আমার সব ভাবনার কথা তোমাকে পরে বলব মুকু। আজ আমার ভীষণ দুর্দিন। মনে মেঘ করেছে।

কাকীমাকে অমন জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন?

সে-ও আর এক কাহিনী। এখানে থাকলে বিপদ আছে।

তুমি কি ওঁদের ট্রেনে তুলতে যাবে?

হ্যাঁ।

আমিও তোমার সঙ্গে যাবো। অনেক কথা আছে।

চা-টা কিছু খেয়েছ?

সে পরে হবে। তুমি রেডি হয়ে নাও।

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। মাতুল বাড়ির চাবিটি পিতৃদেবের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন মাঝে মধ্যে একটু দেখাশোনা করবেন, আবার কবে আসতে পারব জানি না।

পিতা চাবিটি নিতে নিতে বললেন, আমি হয়তো সময় পাব না, তোমার ভাগনেই মাঝে মাঝে যাবে। তবে তুমি চেষ্টা কর যাতে এখানে ফিরে আসতে পারো। জানো তো, কথায় বলে, অপ্রবাসী, অঋণী। ইচ্ছে করলে এখানেও তুমি অনেক কিছু করতে পার।

কাকীমার বাঁ হাতে পুঁটলি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। পিতা বললেন, ওঠো বউঠান। মন খারাপ কোরো না। মেয়েছেলের জীবন, ঝড়ের এঁটো শালপাতার মত, যখন যে দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সাবধানে থেকো, মানিয়ে থেকো, আনন্দে থেকো।

দাঁতে আঁচল চেপে কাকীমা কান্নার শব্দ করলেন। অনেক চেষ্টায় বললেন, সাবধানে থাকবেন শরীরের একটু যত্ন নেবেন। হয়তো আরও কিছু বলার ছিল। ভাষা এলো না। মাতুলের স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বাহাদুর অদূরে দাঁড়িয়ে। লাল একটা জামা পরেছে। একমাত্র বাহাদুরের মুখেই হাসি। পাহাড়ের ছেলে পাহাড়ে চলেছে। যে একবার ঘর ছাড়তে পেরেছে, তার আর ভয় কি। বহতা নদী, রমতা সাধু।

পিতা বললেন, আর দেরি কোরো না। মায়ার বাঁধন যত তাড়াতাড়ি খুলে বেরনো যায়, ততই ভালো। মাতুল চমকে উঠলেন, উদাস সুরে বললেন, আসি তা হলে। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, উঠাও গাঁটরি।

Tell me in what part of the wood Do you want to flirt with me.

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কবজির কাছটা এখনও জ্বালা করছে। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে কাকীমা চেপে ধরেছিলেন। জলে ডোবার আগে মানুষ এই ভাবে আঁকড়ে ধরে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে হয়েছে। নয়তো চাকার তলায় চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটি ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে এখনও ভাসছে। একটি মুখ দূর থেকে দূরে ক্রমশই আরও দূরে সরে যাচ্ছে। চেষ্টা করলেও যে মুখটিকে আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না। আকাশের দিকে তাকালে ভেসে উঠবে। স্থির জলে ভাসবে। স্বপ্নে উঁকি মেরে যাবে। বিষণ্ণ, আশাহত দুটি চোখ। ভেজা ভেজা চোখের পাতা। বারে বারে কেঁপে ওঠা পাতলা দুটি ঠোঁট।

মুকু হাত ধরে টান মারল, তোমার দেখছি ঘোর লেগে গেছে! এমন ভাব করছ, কেউ যেন কখনও বিদেশ-টিদেশ যায় না! মানুষে মানুষে যেন ছাড়াছাড়ি হয় না! আমি বলে, কোথাকার মেয়ে সব ছেড়েছুড়ে এক কথায় কোথায় চলে এলুম, একটুও মন খারাপ হল না, আর তুমি পুরুষ মানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করছ! চলো।

শূন্য প্ল্যাটফর্ম কি অদ্ভুত দেখতে! এক জোড়া লাইন পড়ে আছে। কিছু কাগজ, দু'একটা ভাঁড়, তেল, কালি, রেল রেল গন্ধ। বাক্স, প্যাঁটরা, বেডিং-এর ওপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকা অপেক্ষমান কিছু যাত্রী। সকলকেই যেতে হবে। আগে আর পরে। নীল পোশাক পরা দু-একজন রেলকর্মী। গল্পরত দু-একজন টিকিট চেকার। লোহার ঠ্যালাগাড়ি চেপে মালপত্র আসতে শুরু করছে। সতর্ক, সময়নিষ্ঠ যাত্রীরা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে আসছেন। কাঁধে জলের বোতল, হাতে ব্যাগ। লাল জামা পরা পোর্টারের মাথায় মোটঘাট। সাহেবী চেহারার পাঞ্জাবী যুবক। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে লাস্যময়ী যুবতী। প্ল্যাটফর্ম আবার জমজমাট হয়ে উঠছে। একটু পরেই দুন এক্সপ্রেস ছাড়বে। সুরেলা গলায় মহিলাকণ্ঠ বারে বারে বিভিন্ন ভাষায় সেই সংবাদই ঘোষণা করছে। জোড়া লাইন কোন সুদূরে চলে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমিও এখুনি কোথাও চলে যাই। বারে বারে আসি, বারে বারে ফিরে যাই। আজ যদি না ফিরি কেমন হয়! স্বামী নির্মলানন্দ দেরাদুনে, আলমোড়ায়, মাদ্রাজে, যে কোনও জায়গায় আমার স্থান করে দিতে পারেন। আমি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মুকু বললে, তুমি অমন হাঁ করে লাইনের নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখছ কেন? প্রাণ ছটফট করছে বুঝি?

ধরেছ ঠিক।

আমারও ওই রকম করে। মনে হয় চলে যাই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। শুধু চলেই যাই। নাও চলো। কফি খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মুকু আমার শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। কেউ দেখলে ভাববে স্বামী-স্ত্রী। মুকু কি আমাকে জালে জড়াবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে?

রেলের ক্যানটিনটি বেশ বড়। লোকজন রয়েছে, তবে বসার জায়গা পেতে অসুবিধে হল না। কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি আসন। পাশের টেবিলে সৌম্য চেহারার এক প্রৌঢ় বসে আছেন। তাঁর উল্টো দিকে বসে আছেন এক প্রৌঢ়া। কাঁচাপাকা চুল। হাল্কা রঙের সিল্কের শাড়ি। ধবধবে সাদা ব্লাউজ। রঙ আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। কপালের মাঝখানে লাল টিপ, ভোরের সূর্যের মত ভাসছে। দু'জনেই কফির পেয়ালায় হাল্কা হাল্কা চুমুক মারছেন। মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। চারপাশে মৃদু একটি সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি। সুখ যেন মানুষের চেহারা ধরে এই রেলের ক্যান্টিনে কফির কাপ নিয়ে বসেছে। পৃথিবীতে সব আছে। যা চাইব, তাই দেখতে পাব। পমেড মাখা কাকীমার মামাশ্বশুর। মানী মানুষের কাছে যৌনবিজ্ঞান পাঠাবার মত কদর্য চরিত্র। মাতামহের মত গৃহী সাধক। মাতুলের মত আত্মভোলা শিল্পী। পিতার মত নিঃসঙ্গ সৈনিক। স্বামী নির্মলানন্দের মত সর্বত্যাগী জ্ঞানী সাধক। আলোয় কালোয় বেশ সাজিয়েছে ভগবান!

দু'হাতের তালুতে চিবুক ধরে মুকু বেশ বসেছে ! যেন হাতের ফাঁকে পদ্ম ফুটেছে । অবাক হয়ে আমাকে দেখছে । চোখাচোখি হতেই মৃদু হাসল । চোখ দুটো গভীর সরোবরের মত কেঁপে উঠল । নাকের পাশের ছোট্ট নাকছাবি উৎসব রাতের চুমকির মত ঝিলিক মেরে উঠল । বসন্ত নয়, তবু মনে হল, মনেব সব জানালা দরজা খুলে গেছে । দখিনা বাতাস বইছে । পাপিয়া বড় আকুল সুরে ডাকছে, পিউ কাঁহা ! মরেছে, আমি প্রেমে পড়ে গেছি । মুকুর মুখের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না । শুনেছি গভীর রাতে নির্জন পাহাড়ের ফাটল থেকে এক ধরনের রস বেরিয়ে আসে । যার নাম শিলাজতু । বড় দুর্লভ বস্তু । আমার মনের স্তরেও শিলাজতু জমছে ধীরে ধীরে । ধ্যাৎ, কি আমি সন্ন্যাস, সন্ন্যাস করছি ! জীবন্ত দেবী ছেড়ে, মৃত ঈশ্বরের সন্ধানে মহামূল্য জীবন অপচয় করে ফেলছি । কে জানে আবার এই পৃথিবীতে আসা হবে কি না ' শুদ্ধ কোনও পিতামাতার দৈহিক মিলনে, নির্জন কোনো প্রকোষ্ঠে, রজনীর গভীরে ছোট্ট একটি ভ্রূণের আকাবে আবার এই জীবন কি ধরা পডবে ! বাইরে তখন শ্রাবণের ধারা, ভিজে বাতাস, সিক্ত পাতার আনন্দোচ্ছ্বাস । কেউ-ই কারো দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না । দুটি দৃষ্টি মাইলের পর মাইল কি সব অপ্রকাশিত কথা লিখে চলেছে ভাষাহীন ভাষায় । সুখেনের কথা, জবাব কথা মনে পডছে । জবা মা হবে । আমার মা যেমন মা হয়েছিলেন ! নরনারীর মিলন যদি পাপেব হত, তাহলে শঙ্কব, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ আসতেন কি করে ?

আমার ডানহাত ধীরে ধীবে এগিয়ে গিয়ে মুকুর কবজি ধরে ফেলল । সারা শরীরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ ! আমাব সমস্ত মন সেই স্পর্শে নিবেদিত । সবুজ ফসলের ক্ষেতে যেন সেচের জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে । লক্ষ করিনি, কখন ওয়েটাব এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন । এ জগৎ থেকে চলে গেছি কোন মায়ার জগতে ! মানুষের এখনও বসবোধ আছে । ওয়েটাব ভদ্রলোক কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'জনের এই তন্ময়তা দেখছিলেন জানি না । চোখাচোখি হতেই মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি খাবেন ?

বেশ খিদে পেয়েছে । মুকুকে জিজ্ঞেস করলুম, কি খাবে ?

যা হয কিছু বল না !

মুকু ভদ্রলোককে সামনে থেকে সবাতে চাইছে । আমার সারা শরীরে আড়ামোড়া ভাঙার মত অদ্ভুত এক অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠছে । মন যে সব উপাদান আব উপাধানে সেজে উঠছে, তাতে এই মুহূর্তে নির্জন একটি ঘর পেলে ভাল হয, একটি শয্যা থাকা চাই । বলশালী এক দৈত্যকে কোমর ধরে আটকাতে চাইছি । সে আমায় খানাখন্দেব ওপর দিযে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে ।

ও হ্যাঁ, ওমলেট আর কফি ।

ওয়েটাব ধীরে ধীরে চলে গেলেন । টেবিলের ওপর ফেলে রাখা আমার হাতের আঙুল নিয়ে খেলতে খেলতে মুকু বললে, তুমি বেশ সুন্দব হযেছ ।

তুমিও ।

সে তোমার চোখে । আয়না কিন্তু অন্য কথা বলে ।

একটু রোগা হয়ে সত্যিই তুমি সুন্দর হয়েছ । আমি চোখ ফেরাতে পারছি না ।

মুকু মাথা নিচু করল । কপালের সামনে থেকে মাথাব পেছন অবধি সিঁথি চলে গেছে । স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন রাজবেশে সিঁদুর পরাচ্ছি । দূব থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের শব্দ । রজনীগন্ধাব সুবাস ।

পাশেব টেবিলে প্রৌঢ় দম্পতি মৃদু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন । মাঝে মাঝেই কানে আসছে একটি অঞ্চলের নাম, আলমোড়া । স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে আলমোড়া পাঠাতে চান । হিমালয়ের কাছাকাছি । আজ থেকে বেশি না, মাত্র তিরিশ বছর পরে, আমি আর মুকু ওই আসনে বসতে পাবি । সুখী আর সাত্ত্বিক চেহারা নিয়ে । এমন তো কিছু খাবাপ নয়, বড় মধুর ভবিষ্যৎ !

মুকু মুখ তুলে তাকাল । মন যদি চোখে আসে, চোখের চেহারা কি রকম হয় ? যেমন দেখছি এই মুহূর্তে । মুকু বললে, তোমাকে একটা ছবি দেখাব ?

কার ছবি ? তোমার ?

না। দেখাতে পারি একটা শর্তে। রাগ করা চলবে না।

দেখাও।

দু' প্লেট ওমলেট টেবিলে এসে নামল। মুকু মাথা নিচু করে কোলের ওপর রাখা হাতব্যাগে ছবি খুঁজছে। ডান হাতের দুগাছা চুড়ি, সংসারের শব্দে ঠুনুর ঠুনুর করছে। বড় একান্ত, বড় আপন, ভীষণ মায়ায় ভরা। গরম ওমলেটের অল্প অল্প ধোঁয়া মুকুর কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলের কাছে পাক খাচ্ছে। ব্যাগ থেকে হলদে রঙের একটা খাম তুলে মুকু টেবিলে আলগোছে রাখল। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওমলেটের দিকে। তাকাবার মতই ভাজা হয়েছে। কাঁচা সোনার রঙ ছাড়ছে।

কি আছে খামে ?

খুলে দ্যাখো।

খামটা খুলতেই হাফ সাইজের একটা ছবি বেরিয়ে এল। কনক ! কনক আর সুদর্শন চেহারার এক যুবক পাশাপাশি। কাঁধে কাঁধ লেগে আছে। কতদিন পরে কনককে আবার দেখতে পেলুম ! সেই উজ্জ্বল, ধারাল মুখ। টানাটানা চোখ, বাঁশির মত নাক।

ছেলেটি কে মুকু ?

বুঝতে পারছ না ?

কি ? সেই ?

হ্যাঁ সেই। আমার সন্দেহই ঠিক হল। সেই হোমচৌধুরী। যার কথা তোমাকে আমি চিঠিতে লিখেছিলুম।

বিয়ে হয়ে গেছে ?

কি মনে হচ্ছে ?

কনক তাহলে বেঁচে আছে ?

বহাল তবিয়তে। আমার দিদি অত সহজে হার স্বীকার করার মেয়ে নয়।

কোথায় আছে ?

জাহাজে !

তার মানে ?

দিদির বর রেডিও অফিসার। প্রচুর টাকা মাইনে। বিশ্ব ঘোরা চাকরি। আজ এ বন্দরে, কাল ও বন্দরে। কি মজা ! সারা পৃথিবী দেখে বেড়াবে।

কাদের জাহাজ ?

'পি' ও' লাইনার।

কত টাকা মাইনে মুকু ?

দশ-বারো হাজার তো হবেই।

মাসে ?

হ্যাঁ গো মাসে। পুরো মাইনেটাই সেভিংস, কারণ সবই তো ফ্রি।

ঈর্ষায় সারা শরীর জ্বলে উঠল। কি করলুম জীবনে ? ইডিয়েটের মত কল্পবিলাসে জীবনটা নষ্ট করে ফেললুম। সময় চলে গেছে। আর নতুন সুরে বাঁধতে চাইলেও বাঁধা যাবে না। যে বীজ বুনেছি সেই ফসলই তুলতে হবে। কেউ ফলায় জাফরান, কেউ খেসারি। যার যেমন বরাত।

মুকু চামচে দিয়ে ওমলেট কাটছে। ডিশের সঙ্গে চামচে লেগে কড়াশ কড়াশ শব্দ হচ্ছে। আঁতে ঘা লাগছে। মুখ তুলে বললো, কি, মন খারাপ হয়ে গেল ?

না, না মন খারাপ হবে কেন ?

সত্যি বলো তো, দিদিকে তুমি ভালবেসেছিলে কি না ?

ভালবাসা অনেক উচ্চস্তরের জিনিস। বেসেছিলুম কি-না জানি না, তবে ভাল লেগেছিল। বিয়ের কথা ভাবিনি।

সে তুমি কোনও দিনই ভাবতে পারবে না। তুমি স্প্লিট পার্সোনালিটিতে ভুগছো। কেউ যদি তোমার দুটো সত্তাকে কোনওদিন জোব কবে এক কবে দিতে পারে, তবেই তুমি সুখী হবে। যে বোঝে সে বোঝে।

তাব মানে ?

তোমার মুখের কথা এক, তোমার মনেব কথা আব এক। যে তোমার মুখের কথা শুনে চলে যাবে সে তোমার ওপর অবিচাব করবে, তোমার ক্ষতি কববে। তোমাকে বাঁধতে হবে, যেমন করে মানুষ নদীকে বাঁধে।

আমাব সন্ন্যাস, আমাব পবমার্থ !

রাখো তোমার সন্ন্যাস, তোমাব পবমার্থ। সন্ন্যাস কাকে বলে জানো ?

অ্যাঁ !

সন্ন্যাস কাকে বলে জানো ?

সন্ন্যাস মানে ত্যাগ।

কি ত্যাগ ?

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য।

তা হলে মানুষেব আব বইলটা কি ? ধবো বাঘ যদি আলোচালেব হবিষ্যি খায়, সিংহ যদি কলাপাতা চিবোয়, গণ্ডার যদি জাবনা চিবোয, তাতে বাঘত্ব, সিংহত্ব, গণ্ডারত্ব বজায থাকে ?

তোমার ব্যাখ্যায় সন্ন্যাস তাহলে কি ?

সৎ জীবন, কর্ম্মময় জীবন।

পাশের টেবিলের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আপনার রুমাল পড়ে গেছে।

নিচু হয়ে রুমালটা তুলছি, প্রৌঢ়া বললেন, তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। তুমি কি স্বামী নির্মলানন্দেব কাছে যাও ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক ধরেছি। মুকুকে দেখিযে বললেন, এ তোমাব কে হয় ?

উত্তর দিতে গিয়ে দু'বার ঢোক গিলতে হল, আমার বোন হয়।

বাঃ, বেশ মেয়েটি। কি পড়ছ মা ?

মুকু মুখে ওমলেট তুলছিল, নামিয়ে বেখে বললে, এম· এ।

ভদ্রমহিলা চোখেব ভঙ্গি কবে বললেন, তাই নাকি ? বাঃ এত কম বয়েসে এম· এ করছ ? প্রৌঢ় মানুষটিকে বললেন, হ্যাঁ গা, একবার তাকিয়ে দ্যাখো, আমাদেব সুজয়েব সঙ্গে ভারি সুন্দর মানাত, তাই না ?

ভদ্রলোক সরাসরি মুকুর দিকে না তাকিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বলে, হাসতে লাগলেন আপন মনে, তৃপ্ত মানুষের মত। দাঁতগুলি বড় সুন্দর। মুক্তোর মত সারি সারি বসান। হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন। তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে বললেন, চলো, চলো, সময় হয়ে গেছে। এখুনি ট্রেন ইন করবে।

ভদ্রমহিলা মুকুর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে মুকুর মাথায় হাত রেখে বললেন, পবিত্র হও, পবিত্র হও। আমাকে বললেন, একদিন তোমার বোনকে স্বামীজীর ওখানে নিয়ে এসো।

দু'জনে আগে পরে বেরিয়ে গেলেন। মুকু ওমলেটের ডিশের পাশে টেবিলের ধারে মাথা ঠেকিয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। ঘাড়ের কাছে এলিয়ে থাকা খোঁপা দুলে দুলে উঠছে। চওড়া পিঠে ব্লাউজেব ভি-অংশ হাসির দমকে হুক ছেড়ে খুলে যাবার মত হচ্ছে। মায়াবী মেয়ে, মায়াবী রাত, পাপীর চোখ।

ওয়েটার ভদ্রলোক দু'কাপ কফি এনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কোথায় রাখবেন ? মহাসমস্যা। বোঝা মুশকিল, মুকু হাসছে না কাঁদছে। জলের গেলাস দুটো একপাশে সরিয়ে কাপ দুটোর জায়গা কবে

দিলুম। ভদ্রলোক সন্দেহেব চোখে আমাব দিকে তাকিয়ে, কফি রেখে চলে গেলেন।

মুকু মাথা তুলল। জিজ্ঞেস করলুম, হাসছ কেন?

গম্ভীব মুখে বললে, আমাব বাজারটা একবার দেখলে?

কথা শেষ করেই আবার হাসতে লাগল। মেয়েদেব এই এক দোষ। শুরু কবতে জানে, শেষ করতে জানে না। হাসলে হাসি থামে না। কাঁদলে কান্না থামে না। এই ভাবে ফুলে ফুলে হাসলে, আর পাঁচজন কি ভাববেন!

হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, ভদ্রমহিলা আমাকে ছেলের বউ ঠিক করে ফেলেছেন, আমি এদিকে আব একজনেব বউ হব বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি।

কার?

টেবিলেব ওপব দিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে, সরু সরু আঙুল তুলে খিল খিল হেসে বললে, তোমার, তোমার।

হাতের চারটে আঙুল সাপেব ছোবলের মত মুখের এখানে ওখানে লাগছে। হাতের চুড়ি দু'গাছা দুলছে, ঝিলিক মারছে। মুকু পরিবেশ ভুলে গেছে। চারপাশে এত লোকজন! পাগল হয়ে গেল নাকি? ফিস্‌ফিস্‌ কবে বললুম, অ্যায় মুকু, কি হচ্ছে কি?

দু' হাত মাথার ওপর তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বললে, কি গো সন্ন্যাসী! দেখি, কে হারে, কে জেতে? উনি বলে গেলেন, পবিত্র হও। আমি যে অপবিত্র হবার জন্যেই এসেছি।

আবার হাসি।

মুকু প্লিজ! তোমাকে আমার ভয় করছে।.ও রকম কবছ কেন?

ভয় করছে? তুমি না পুরুষ মানুষ? যে মানুষ মাতৃগর্ভে জন্মেছে সে মানুষ কখনও পবিত্র হতে পারে না।

কি বলছ তুমি? ড্যামেজিং কথাবার্তা!

ভেবে দ্যাখো। জীবনের সব মুহূর্ত এক জায়গায় জড়ো করে করে, বেছে বেছে দ্যাখো সাদা, কালো, হলদে, সবুজ। জীবন বহু বর্ণের মুহূর্তের মালা।

মুকু কফিতে চুমুক চালাল। ফুড়ুত করে পাখি উড়ে যাবার মত শব্দ হল। চোখ মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। ছোট্ট কপালের চারপাশে চুল ঝুলে পড়েছে। অসাধারণ দেখাচ্ছে। মানবীকে মনে হচ্ছে দেবী। মনের কি মতিভ্রম! একটু ভালোবাসার কথা শুনেই, কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। মেয়েটা আমাকে ঠকাতে আসেনি তো!

প্রশ্ন কবলুম, হঠাৎ এই উদ্ভট খেয়াল চাপল কেন, আমাকে বিয়ে কববে?

শুনবে তা হলে, তোমাব জন্যে নয়, তোমার বাবার জন্যে।

সে আবার কি?

তোমার বাবাকে আমি ভালবাসি। অমন চরিত্র লাখে এক মেলে। উপায় থাকলে আমি তাঁকেই বিয়ে করতুম।

মুকুব কথা শুনে ঠোঁটের কাছে ধবে থাকা কাপ হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা বলে কি? সত্যিই পাগল হয়ে গেল না কি?

I am no prophet
and here is no great matter
I have seen
the moment of my greatness flicker

দুন্ এক্সপ্রেস স্টেশান ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে চলে গেল। দু'একজন পোর্টার আর রেলকর্মী ছাড়া আর কেউ পড়ে রইল না। আমরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে স্টেশানের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আজ খুব হাওয়া ছেড়েছে। চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে। সুবাস উড়ছে। কোথা থেকে এই ওমর খৈয়ামের রাত এল শহরে।

প্রায় শূন্য ট্রাম চলেছে এঁকেবেঁকে, ঘণ্টা বাজিয়ে। একটা দুটো ট্যাকসি পড়ে আছে শেষ যাত্রীর অপেক্ষায়। পাঞ্জাবী ড্রাইভার বনেটে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে অলসভাবে। কাঠের গোল ড্রামের ওপর নিঃসঙ্গ পুলিস। শহর এবার শুয়ে পড়বে।

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মুকু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার অনাবৃত ওপর বাহু আমার হাত স্পর্শ করছে। পাথরের মত শীতল। ভেতরে যার আগুন জ্বলছে তার আধার কি করে এমন স্নিগ্ধ হয়! মানব শরীর ঈশ্বরের এক অদ্ভুত সৃষ্টি! একই সঙ্গে গদ্যময়, কাব্যময়। জলে যেন আগুন জ্বলছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ রাত যেন শেষ না হয়। ভেতরে এক পূর্ণতার ভাব আসছে। অর্ধাঙ্গ যেন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। মনের সঙ্গে মনের লড়াই চলেছে। আচ্ছা তন্ত্রে তো প্রকৃতি নিয়ে সাধনার ইঙ্গিত আছে! ইঙ্গিত কেন, নির্দেশ আছে। পঞ্চমকার ছাড়া তন্ত্রসাধনা হবেই না। তন্ত্রের পথও তো সাধনার পথ, ঈশ্বরলাভের পথ। মুকু তো আমার ভৈরবীও হতে পারে। যার চুল কোঁকড়া, গুরু নিতম্ব, সে তো আদর্শ ভৈরবী। কিন্তু তন্ত্র যে বলছে শ্যামা রমণী না হলে ভৈরবী করা যায় না! ও ওরকম বলে! গাত্রবর্ণে কি এসে যায়! আসল বর্ণ তো মনে! কবি বলেছেন, ওপরে যত কালো আর ধলো, ভেতরে সবার সমান রাঙা। আচ্ছা, আমিই বা এত ঈশ্বর ঈশ্বর করছি কেন? দেরাদুনে একটা প্রোমোশান নিয়ে চলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের লাইনে অভিজ্ঞতা যত বাড়বে, মাইনেও তত বাড়বে। ফ্রী কোয়ার্টার। চিফ হলে গাড়ি। মুকুকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলেই তো হয়। ওপাশে হরিদ্বার, এপাশে অরণ্য, মাথার ওপর মুসৌরী।

মুকু হঠাৎ দু'হাতে আমার ডান হাত ধরে ঝুলে পড়ল। মাথাটা আমার ডান কাঁধে। আর একটু হলেই কেতরে পড়ে যেতুম। কোনওক্রমে সামলে নিলুম।

তখন থেকে কী দুষ্টুমি করছ বল তো!

মুকু হিহি করে হেসে বললে, শীত করছে। কেন বলো তো! জ্বর এলো না কি!

তোমার গা বরফের মত ঠাণ্ডা।

শীত কেন করে আমি জানি। স্নায়ুর শিহরণে মনে হয় জ্বর আসছে। আমি যে পুরুষ, এ প্রমাণ পেয়ে বড় ভাল লাগছে। আগুন যদি আগুন লাগাতে না পারে, তাহলে সে তো জোনাকি। আলো আছে, দাহিকা শক্তি নেই। আমারও একদিন শীতে এই রকম গা কেঁপে উঠেছিল। সে রাতের কথা এখনও ভুলতে পারিনি।

মুকু বললে, অনেক রাত হয়ে গেল। হস্টেলে ঢুকতে দেবে তো!

তোমার হস্টেল তুমিই জান। না দেয়, আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

মেসোমশাই আজ কেমন যেন হয়ে আছেন! প্রথমে বেশ ভালভাবেই কথা বলছিলেন, হঠাৎ কি হল উঠে চলে গেলেন।

মাঝে মাঝে উনি ওরকম হয়ে যান, এতক্ষণে ঠিক হয়ে গেছেন। তুমিই তো একটু আগে কি সব বলছিলে? তুমি গিয়ে সামলাবে।

তোমাকে তো তাহলে আমাকে মা বলে ডাকতে হবে। পারবে?

তোমার মাথায় একটা গাঁট্টা মারব।

মুকু হি হি করে হেসে উঠল। পাশ দিয়ে একজন রেলের ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ঘুরে তাকালেন। নাঃ, মুকুকে আর খোলা জায়গায় বেশীক্ষণ রাখা যায় না, বিপদের সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের সাহস মানে দুঃসাহস। জবাকে মনে পড়ছে। স্রেফ একটা সায়া আর ছোট্ট একটা ব্লাউজ পরে পাঁচিল টপকে আমাদের ছাদে পালিয়ে এল। সুখেনের এত টান! এই টানটাকে নিজের মধ্যে এনে যদি ঈশ্বরকে টেনে আনতে পারতুম, তাহলে নিজের সঙ্গে এই দোটানায় পড়তে হত না।

মুকু বললে, আমার আর ট্রামে বাসে চাপতে ইচ্ছে করছে না, একটা ট্যাক্সি করো।

তুমি খুব এক্সপেনসিভ।

জানো আমার কোষ্ঠীতে কি আছে, বড়লোকের বউ হব।

সে যবে হবে তবে হবে। আগে লেখাপড়া শেষ কর। অত বউ হব, বউ হব করছ কেন?

নিজেকে তৈরি করছি।

থাক আর তৈরি করতে হবে না। তৈরি হয়েই আছ।

কথাটার মধ্যে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত আছে।

শব্দটা তুমিই প্রথম বলেছ।

আমার মানেটা ছিল অন্যরকম, তোমার মানেটা একটু যেন কেমন কেমন!

তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?

ভূতে ধরেছে।

সে ভূত কি আমি?

তুমি ভূত হতে যাবে কেন? তুমি ভগবান।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার ট্যাকসির পেছনের দরজা খুলে দিল। মুকু আগে ঢুকলো, পরে আমি। আমার আসনে তার আঁচল বিছিয়ে আছে। কি যে হয়েছে কে জানে! কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েদের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝি না। শুনেছি, এই বয়েসটা খুব খারাপ। ফাঁদে পড়ার বয়স, ফাঁদে ফেলার বয়েস। জয় গুরু! তুমি আমায় রক্ষা কর। এতকালের শক্ত মন থ্যাসথেসে হয়ে আসছে।

চালক মিটার ফ্ল্যাগ নামালেন। রিনরিন করে শব্দ হল। আমাদের অন্ধকার কেঁপে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। হাওড়ার ব্রিজে উঠছে। গঙ্গার বাতাস যেন আরও উতলা। সারি সারি আলোর মালা মাথার ওপর দিয়ে সামনে চলে গেছে। গঙ্গার দু'কূলে আলোর খই ছড়িয়ে আছে।

মুকু ডান দিকে, আমি বাঁদিকে সম্মানজনক দূরত্বে। মাঝে ফুলের মত ছড়িয়ে আছে শাড়ির আঁচল। আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সামনে পাথরের মত মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছেন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। গঙ্গাবক্ষে আলোকিত একটি স্টিমার সাগরের দিকে চলেছে।

কাঁহা যাইয়েগা জী?

কোথায় যেতে হবে মুকু?

বিবেকানন্দ রোড।

গাড়ির গতি বাড়ছে। সর্দারজি পোল থেকে নেমে ডানদিকে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরলেন। আমাদের বাঁপাশে টাঁকশালের বিরাট বাড়ি। মুকু হঠাৎ বাঁদিকে হেলে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

মনে মনে বললুম, ঈশ্বর তুমি দ্যাখো, আমি কিন্তু কিছুই করিনি। জলজ্যান্ত একটি যুবতী মেয়ে আমাকে একা পেয়ে কী ভাবে প্রলুব্ধ করছে। আমিও তো মানুষ! দেবতাও নই, বৃদ্ধও নই।

মুকু আমার ডান হাতটা দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, পলাশ, বি সিরিয়াস!

তার মানে?

মুকুর মুখে আলো পড়েছে। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট। আমাদের চালক রেগে গিয়ে বললেন, আরে তেড়দেনি।

কী অর্থ কে জানে। মুকুব মুঠোব জোর বাড়ছে, পলাশ বি সিরিয়াস। গলাটা ধরা-ধরা শোনাল। এ আবার কি খেলা বে বাবা! চোখে যেন জল এসেছে! এ সবের অর্থ কী?

বি সিরিয়াস, বি সিরিয়াস করছ, তার মানেটা কি?

তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না।

তার মানে?

আমি তোমার জন্যেই কলকাতায় পড়তে এসেছি। আমি আর ফিরে যাব না।

কেন মিছে কথা বলছ! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

মুকু আমার শার্টের বুকের কাছটা খামচাতে লাগল, কি করলে বিশ্বাস করবে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। সত্যিই তো, কি করলে আমি বিশ্বাস কবব।

মুকু বললে, আমি আমার বাবাকে ঘৃণা করি।

কী যা-তা বলছ? বাবাকে ঘৃণা কর বলে আমাকে, আমার মত অপদার্থ একটা ছেলেকে ভালবাসতে হবে?

আমাব বাবাকে তুমিও ঘৃণা কর, আর সেইজন্যে তুমি আমাকেও ঘৃণা কর।

আগে করতুম, আজ এই মুহূর্ত থেকে আর করি না।

আমি তোমাকে প্রথম থেকেই ভালবাসি পলাশ। সত্যিই বাসি।

মুকুর গলা ভেঙে এসেছে। ভালবাসা শব্দটা এমনিই এলানো, আরও যেন এলিয়ে গেল ভাঙা গলার গুণে।

কোনও রকমে বললুম, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

তোমাব ওই বইয়ের ভাষা ছাড়ো। ওতে মন ভরে না। কাম আউট পলাশ। তুমি বেরিয়ে এসো।

এ কি নাটক হচ্ছে? চলমান মঞ্চে! এমন নাটক করে যদি ভালবাসতে হয়, বেসে কাজ নেই। ঘৃণা অনেক বেশি বাস্তব! আমার জামা খামচে ধরা মুকুর হাত ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। শরীরে শরীব এলিয়ে পড়ল। আমার দক্ষিণ অঙ্গ এখন মুকুর দখলে। বেশবাস বিস্রস্ত। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে। চুল উড়ে উড়ে এসে চোখেমুখে লাগছে। কি আব করি! তার পিঠের পেছন দিয়ে আমাব ডান হাত প্রসাবিত করে, ডান হাতের তলা দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মুকুর শরীবকে ঘনিষ্ঠ করে নিতে হল। সামান্য শিহরণ খেলে গেল মুকুর শরীরে। জানি আমার এ সাহস দুঃসাহসেরই সামিল, কিন্তু উপায় নেই! ডাকে সাড়া না দেওয়া এক ধরনের উপেক্ষা। মেয়েরা বড় অভিমানী হয়। তাছাড়া শরীরের যখন যে অঙ্গ কাজ করে, তখন সেই অঙ্গেব আলাদা একটা মগজ তৈবি হয়। মিটারের যেমন সাবমিটার! মেন লাইনের যেমন এক্সটেনসন লাইন। পা যখন লাথি মারে, পায়েব একটা মগজ হয়। হাত যখন কিছু স্পর্শ করে হাতেব একটা মগজ হয়।

মানুষের আবেগ বাঁধ বাঁধা নদীর মত। জল কেবলই পথ খোঁজে, কোথায় একটা ছিদ্র পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চাপ বেড়ে এক সময় বাঁধেব দেয়াল চৌচির হয়ে যায়। এতদিন জমে থাকা মুকুর আবেগ বন্যার জলের মত তোড়ে বেরিয়ে এল। সমস্ত শরীর যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি না জেনে বড় স্পর্শকাতব স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছি। এ যন্ত্রণা, না সুখ। হাতখানেক ব্যবধানে অপরিচিত একজন মানুষ। পাথরের মত মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছেন। আলোর ঝটকা আসছে, চলে যাচ্ছে। মুকু পা দিয়ে আমার পা খুঁজছে। ভুলে গেছে আমরা বসে আছি ট্যাকসির পেছনের আসনে।

মুকুর মাথা এখন কাঁধ ছেড়ে আমার বুকে নেমে এসেছে। আমি ভাবতেই পারছি না, রক্তমাংসের এক যুবতী আমার বক্ষলগ্ন! যে ইচ্ছা কল্পনায় উঁকি মেরে যেত, রাতের স্বপ্নে এসে ঘুরপাক খেত, তা এখন বাস্তব। ঈশ্বরলাভ হলে কি হয় আমার জানা নেই। তুলতুলে যুবতীলাভ হলে যা হয়, তা যার হয় সেই জানে। মনে হচ্ছে স্বর্গে ভেসে চলেছি পুষ্পক রথে। বৃষ্টি থেমে যাবার পর গাছের ডালে বসে দোয়েল যে রকম পুচ্ছ তুলে ডাকে আর নাচে, আমার মনও যেন বুকের কাছে সেইভাবে নাচছে। খোঁপা হয়ে ভেঙে পড়ছে। দেহ হয়ে দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কোথায় আমার তীর্থ বারাণসী! কোথায়

আমার পিতৃদেব ! কোথায় আমার মৃত মাতামহের জন্যে শোকাকুল মন। সব এই দেহে নিমজ্জিত ! চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পথ ঘুরে যাচ্ছে। হিমালয় সরে যাচ্ছে।

মুকু বললে, আমি আর কিছুতেই বাবার সংসারে ফিরে যাব না পলাশ। তুমি তোমার বাবাকে বলো।

মুকু, তিনি তোমার গুরুজন।

গুরুজন ? তুমি জান, তিনি কি ধরনের নোঙরা ! তুমি ছেলেমানুষ, সে সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তিনি আমাকে আর পিতার চোখে দেখেন না।

তুমি যা বলছ, সে কথা আমি কেমন করে বাবাকে বলব ! আমারও তো লজ্জাশরম আছে।

তুমি না পারো, আমি বলব ! এতে তো অন্যায়ের কিছু নেই ! আমরা তো পাপ করতে ছুটছি না ! তুমি শুধু অনুমতি দাও।

আজ আর ভাবতে পারছি না, আমাকে দু-একদিন সময় দাও। এত তাড়া কিসের ?

তোমাকে আমি চিনি, তোমার সময় বড় দ্রুত চলে। তোমাকে এখুনি ধরতে না পারলে পিছলে যাবে।

আমি একটু ভাবি।

তোমার কি মনে হয় আমি খারাপ মেয়ে, তোমার অযোগ্য ?

এ প্রশ্ন তো আমারও হতে পারে ?

এর উত্তরে তোমাকে আমি একশোর মধ্যে একশো দিয়ে দিলুম।

লক্ষ্মীটি তুমি এবার সোজা হয়ে বোসো।

মুক সোজা হয়ে উঠে বসল। খোঁপা ভেঙে পড়েছে। শাড়ির আঁচল অনেক আগেই খসে পড়েছে। নারী আর মৃত্তিকা প্রায় একই জাতের জিনিস। গাড়ি বিবেকানন্দ রোডে প্রবেশ করল। মোড়ের মাথায় একটি অলঙ্কারের দোকান। আধপাল্লা তখনও খোলা। সোনার অলঙ্কার পেছনের আয়না থেকে চোরা চাহনিতে তাকিয়ে আছে।

হস্টেলের প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটি সাবুগাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। গভীর বারান্দায় ফানুসের মত আলো ঝুলছে। বাড়িটির চেহারায় সাবেক কালের গাম্ভীর্য। এক ধরনের বিষণ্ণতা লেগে আছে। গাড়ি ভাড়া বুঝে নিয়ে সোজা চলে গেল। মুকু আমার সামনে নায়িকার মত দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মন ভবিষ্যতের ছবি আঁকছে। স্ত্রী নয়, তবু মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী যে কোনও মানুষের গর্ব।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ঢুকতে দেবে তো ?

হ্যাঁ দেবে।

আমি তাহলে চলি।

রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে তো ?

রোজ কি করে হবে ?

তা না হলে আমি মরে যাব।

কি ভাবে হবে ?

তুমি আসবে। এসে আমার খোঁজ করবে।

দেখি। কোনো কথাই কি তুমি স্পষ্ট করে বলতে পারো না ?

তোমার কাছে আজ যা স্পষ্ট কালই যে অস্পষ্ট হয়ে যাবে না, কে বলতে পারে ?

তুমি না পার, আমি পারি। মেয়েদের কামড় কচ্ছপের কামড়ের মত।

দুটো সাবু গাছের মাঝখান দিয়ে মুকু ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। কোথাও কেউ একজন ভীষণ জোরে জোরে কাশছে। মনে হচ্ছে এখুনি দম আটকে যাবে। সাবু গাছের পাতায় পাতায় রাতের বাতাস শাড়ির আঁচলের মত খসখস করছে। প্রায় জনশূন্য পথে দু'কদম হাঁটার পরেই মনে হল, আমি বড় নিঃসঙ্গ। বাড়ি ফিরে যেতেও মন চাইছে না। পিতৃদেবের একটি কথা মনে বড় লেগেছে। 'মুকু তো তোমার কাছে এসেছে' : তার মানে ? কাকীমা সম্পর্কে সমালোচনার প্রতিশোধ তিনি কি এইভাবেই

নিলেন ? অতটা নিচে নেমে আসার মানুষ তো তিনি নন। ওঁর যত তর্জনগর্জন সবই তো ইণ্টেলেকচুয়াল লেভেলে। কী জানি ? মানুষের দুর্গম অঞ্চলের কোথায় কি যে ঘাপটি মেরে বসে আছে ! পৃথিবীতে এমন কোনও লিভিংস্টোন নেই যে আবিষ্কার করেন ! তৃপ্তি, অতৃপ্তি, সুখ, দুঃখ, দড়ির মত পাকে পাকে এমন জড়িয়ে আছে, এককভাবে কোনোটাকেই পাওয়া সম্ভব নয়। একটু আগে বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি একটা মহাদেশ জয় করে ফেলেছি। এখন মনে হচ্ছে নেপোলিয়ানের মত সেন্ট হেলেনায় চলেছি নির্বাসনে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি পুরোপুরি মুকুর ক্লাচে চলে গেছি। মন, সংস্কার সব কিছুই তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। যতটা উচ্চে উঠেছিলুম তার চেয়ে ঢের নিচে নেমে গেছি। আবার আমি পরাজিত। পিতার তিক্ত কথাই সত্য হল। সন্ন্যাস আমার রক্তে নেই, সংস্কারে নেই। এক বিন্দু রক্ত অনুবীক্ষণের তলায় ফেললে হয়তো চমকে উঠব। অক্টোপাসের মত অসংখ্য প্রাণী লোভ, লালসার শুঁড় নেড়ে নেড়ে ভোগের বস্তু খুঁজছে। কোথায় আমার সেই নির্বেদ। আজ যদি আমার কোথাও যাবার জায়গা থাকত ! কিম্বা, কোথাও চলে যেতে পারতুম চিরকালের জন্যে ' এই নির্বান্ধব রাতের পৃথিবীতে সেই গৃহটি ছাড়া আমার আর কোনও আশ্রয় নেই। বেড়ালের মত ঘুরে ঘুরে সেই একই জায়গায় ফিরে যেতে হবে ন্যাজ তুলে।

হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি। কোথায় যে যেতে চাই ' যেদিকেই যাই না কেন, বাড়ির দিকেই চলেছি। একেই বলে হোমিং ইনস্টিংট। সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। সরবতের দোকানে রাতের লাইন পড়েছে। বরফের চাঙড়ায় থলে জড়িয়ে কাঠের মুগুর পেটাচ্ছে। সুখস্বপ্ন ভেঙে যাবার মত ঝুরঝুর শব্দ হচ্ছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় বরফের বাতাস এসে গায়ে লাগল। ভিজে ভিজে কাঠের গুঁড়ি ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

সানাইয়ের উৎসস্থলে এসে পড়েছি। বেহাগের সুরে বিয়ে বাড়ি জমে উঠেছে। সারা বাড়ির দেয়ালে লাল, নীল টুনির মালা ঝুলছে। কাপড় মোড়া টুঙির মাথায় বসে, মিহি পাঞ্জাবি পরে ওস্তাদজি সুর ছাড়ছেন। চারপাশে আলো, আর ফুলের মালার ঘেরাটোপ। ছাদের ওপর বিশাল ম্যারাপ, আলোর চাঁদোয়া তুলেছে। তেরপলে মানুষের ছায়া নাচছে। হই হই উপচে পড়ছে, ফ্রাই, ফ্রাই। সামনের রাস্তাটা ভিজে ভিজে। পেন্ট করা মুখ নিয়ে দু-তিনজন যুবক সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছে। সবচেয়ে লম্বা, চওড়া, স্বাস্থ্যবান যুবকটিই মনে হয় আজকের রাতের নায়ক। সিল্কের পাঞ্জাবি; কোঁচানো ধুতি, পায়ে নিউকাট। তিন চার রকম গন্ধ, একসঙ্গে মিলেমিশে বিয়েবাড়ির গন্ধ তৈরি করেছে। রজনীগন্ধা, সেন্ট, লুচিভাজা, মাছ, জল, কলাপাতা, সব মিলিয়ে স্বপ্নগন্ধী একরাত। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললুম। ফেলে দেওয়া পাতা আর গেলাসের গাদায় গুণ্ডা চেহারার কুকুরের খেয়োখেয়ি লেগেছে। আরও দূরে খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে ভুঁড়ি খোলা এক দৈত্য।

বাড়ির সদরে যখন এসে পৌঁছলুম তখন প্রায় রাত দশটা। সদর হাট খোলা। এমন তো বড় একটা হয় না। পিতৃদেব তো এত উদাসীন নন। কি জানি, কি ব্যাপার ! ওপরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। আলোর আভা অসুস্থা বৃদ্ধার মত ঘষটে ঘষটে সিঁড়ি বেয়ে কিছু দূর নেমে এসে এলিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এটা আবার কি ! বলাইবাবু। খোলের বাইরে মুখটি বের করে একপাশে চুপ করে বসে আছে।

বলাইবাবু, তুমি তো কোনও দিন নিচে নামো না, আজ হঠাৎ নেমে এলে ?

বলাইবাবুর মুখটি নড়ে উঠল। কচ্ছপও পোষ মানে। পোষ মানে না মানুষ। কাকীমা চলে গেছেন। ছোট্ট এই প্রাণীটি খুঁজতে খুঁজতে টাল খেতে খেতে নিচে নেমে এসেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, সেই পরিচিত পদশব্দের অপেক্ষায়। কাকীমা বলাইবাবুকে রোজ একবার করে পালিশ করতেন। খোলটি বহু বর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠেছে।

চলো, ওপরে চলো। বলাইবাবু আমরা তো আছি ! এক যায়, আর এক থাকে। মানুষের মত ভুলতে শেখ। এই দ্যাখো, একে একে আমার তো সবাই চলে গেছেন। যান না ! আমি ধীরে ধীরে সব ভুলে যাব। একে একে নতুন চরিত্র এসে আমার চারপাশে ঘিরে বসবে। মাইফেল চলবে দিনের পর দিন।

তারপর আবার একদিন সব ভোজবাজি ! শূন্য কার্পেট, ছেঁড়া ফুলের মালা, ঘুঙুরের দানা, বাতি ম্রিয়মাণ, ভোরের পানসে আলো, ঘুলঘুলিতে তন্দ্রাতুর পায়রার ডানার ঝটাপটি, মৃতের নিঃশ্বাসের মত ফিকে বাতাস। ছিল সব, নেই কিছু। নদীর একপার ভাঙে, আর একপার গড়ে। চলো বলাইবাবু, ওপরে চলো। তুমি আমার কোলে উঠে চলো। বর্ষার দুপুরের স্মৃতি। মাতামহ একেই বলতেন — সব ধুস্।

যে কথা ফোটে না গানে
বুঝি তাহা সুরে,
যে ছবি ফোটে না রঙে
ফোটে তা রেখায়।

সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই এস্রাজের সুর উঠল। বাগেশ্রীর ধরতাই। বড় সুন্দর ধরেছেন, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে। সুরের টানে শূন্য বাড়ি যেন কেঁদে উঠছে। আরও দু'ধাপ উঠতেই নাকে একটা সুন্দর গন্ধ এসে ঢুকল। এমন একটা কিছু রান্না চেপেছে, যাতে ঘি আছে, গবমমশলা আছে। বুকেব কাছে বলাইবাবু খোলে ঢুকে পড়েছে।

সেই হলঘর। একটি মাত্র আলো জ্বলছে। যে ঘর এক সময় গাইয়ে, বাজিয়ে আর শ্রোতায় ভরে থাকত সেই ঘরে একপাশে ছোট্ট একটি জাজিম পেতে পিতৃদেব এস্রাজ নিয়ে বসেছেন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। দেযালে ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে। মেঝেতে বলাইবাবুকে বাখতেই গুটিগুটি এগিয়ে চলল পাতা জাজিমের দিকে। বেশ সঙ্গীতরসিক হয়ে উঠেছে।

বাজাতে বাজাতে চোখ খুলে আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, সব হল ?

বুকটা কেমন যেন ছাঁত করে উঠল। সব হল, মানে ? যা হল, সে হওয়া তো ওঁর আশঙ্কাকেই সমর্থন করে। ভেতরে ভেতরে হয়তো এমন শক্তি অর্জন করে বসে আছেন, যাকে বলা চলে থার্ড আই। গাড়ির পেছনের আসনের মাথার ওপর দুটি অদৃশ্য চোখ। ভাবতেই ভেতরটা আবার কেঁপে উঠল।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ।

বেশ, বলে মাথা নাড়লেন। এস্রাজ বাজতে লাগল, সব যে হয়ে গেল কালো।

সামনে গিয়ে বসার সাহস হল না। নিজেকে বড় অশুচি মনে হচ্ছে। যেন নিজেকে সৎকার করে শ্মশান থেকে ফিরে এলুম। রান্নাঘরই ভাল। নির্জনে উনুনেব ওপর ছোট্ট একটি হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে। বড় মধুর সুবাস। বহুদিন পরে পিতৃদেব আবার রন্ধনের হাত খুলেছেন। আহা ! মাতামহ নেই। সমঝদার চলে গেছেন। খিচুড়ি বড় প্রিয় বস্তু ছিল। প্রিয় ছিল মোহনভোগ। আর ছিল তেলেভাজা। রান্নাঘরের চাবপাশে তাকিয়ে কাকীমার অনুপস্থিতি প্রথম অনুভব করলুম। বিশাল এই জগতে নিঃসঙ্গ এক মহিলা ক্রমশই দূর থেকে দূরে অনিশ্চিত এক পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আবার নতুন করে সকলের মন জয় করতে হবে। নিজের সংসার আর পরের সংসাবে অনেক তফাৎ। এই যাওযার ব্যাপাবে আমার কথা বলা অনুচিত হযেছে। কেন আমি সব তছনছ করে দিলুম। বলা যায় না, ওই নাবীপাগল মামাশ্বশুব হযতো খুঁজে খুঁজে ওইখানেই গিযে হাজিব হবেন। পাশে দাঁড়াবার মত আমাদেরও আর কেউ রইলেন না। মাতামহ তাঁব রাজসিকতা নিয়ে আর এগিয়ে আসবেন না। মাতুল প্রবাসী। প্রতিবেশীরা ঈর্ষাপরায়ণ।

এস্রাজ থেমে গেল। পিতা উঠে এলেন।

কী, খুব খিদে পেয়েছে ?

আজ্ঞে না।

বিকেলে কিছু খেয়েছিলে ?

একেবারে সরাসরি দুম করে মিথ্যেই বললুম, আজ্ঞে না।

তাহলে তো খিদে পাওয়া উচিত। এই তো তোমার খাবার বয়েস। আজ আর বেশি হ্যাঙ্গাম করলুম না, বুঝলে ? লাগিয়ে দিলুম ডালেচালে। অনেকদিন রাঁধিনি, জানি না কি বস্তু দাঁড়াল।

দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে।

গন্ধ কিন্তু ভালো রান্নার পরিচয় নয়। ঘি আর গরম মশলা, অনেকটা কি রকম জানো, ধাপ্পামারা মানুষের মত। মুখে না দিলে বোঝা যাবে না। টেস্ট অফ দি পুডিং ইজ ইন দি ইটিং।

খিচুড়ির হাঁড়িতে পিতৃদেব হাতা চালাতে লাগলেন। তলা ধরে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। দেয়ালে ছায়া নাচছে। হাতাটা হাঁড়ির মুখে শুইয়ে রেখে পিতা বললেন, বাড়ি একেবারে পরিষ্কার, কি বলো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথা থেকে উড়ো সব ঝামেলা এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে চলে গেল। একেই বলে গ্রহ। আবার সেই পুনর্মূষিক ভব। পিতা আর পুত্র। তুমি এখন সুখী তো ?

সুখী ?

প্রশ্নকে প্রশ্ন দিয়ে ঠেকালুম। সুখী কি না, অত সহজে বলা চলে ! দুঃখের অভাব যদি সুখ হয়, তাহলে সুখী। এইবার মনে হয় একটি সত্য কথা বলছি, আজ্ঞে সুখী কী না বলতে পারব না।

কেন ? অশান্তির কারণ তো সব চলে গেছে ! এখন আমরাই তো একচ্ছত্র নৃপতি !

বড় ফাঁকা হয়ে গেল না !

সেইটাই তো আমাদের পরিবেশ !

সইয়ে নিতে কয়েকদিন সময় যাবে।

তা ঠিক। আমরা বড় জড়িয়ে পড়েছিলুম। ধীরে ধীরে নিজেদের হারিয়ে ফেলছিলুম। একেই বলে মন না মতিভ্রম। তুমি ঠিকই বলেছ, সংসার আমাদের ধাতে সইবে না। আমরা বেশ পুরোমাত্রায় একলাষেঁড়ে হয়ে উঠেছি। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। হয় এইভাবেই আমাদের কাটাতে হবে, না হয় সন্ন্যাসীর ভেক ধরতে হবে।

ভেক বলছেন কেন ?

না, রেগে যেও না। তোমার কথা আমি বলিনি। আমি আমার কথা বলছি।

আপনি বিকেলেও আমাকে প্রায় একই কথা বলেছেন। অনেকটা চ্যালেঞ্জের মত। আমার দ্বারা ভালো কিছুই কি করা সম্ভব নয় !

শোনো, শোনো, ভাল কিছু এক জিনিস, আর স্বভাববিরুদ্ধ আর এক জিনিস। তোমাকে আমি যতটা চিনি, তুমি নিজেই হয়তো নিজেকে ততটা চেন না ! ছেলেবেলা থেকে শিবরাত্রির সলতের মত তোমাকে আগলে আগলে মানুষ করা হয়েছে, অনেকটা তুলোয় রাখা আঙুরের মত করে। প্রকৃতি থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন। ঝড় উঠলে, ভয় পাও, বিদ্যুৎ চমকালে বালিশে মুখ গোঁজো। সামান্য আরশোলা দেখলে নৃত্য করো। তুমি কেমন করে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে ! মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে দেখো, তাঁরা কেউ আদুরে ছিলেন না। ওই তো বইয়ের র‍্যাকে গোপীনাথ কবিরাজজীর লেখা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর জীবনী রয়েছে, পড়ে দেখো। গেরুয়ায় সন্ন্যাস নেই, সন্ন্যাস আছে মনে।

কে যে কখন কী, করে ফেলতে পারে, তা কী আগে থেকে বলা যায় !

পিন্টু, সে হল হঠকারিতা। হঠাৎ খুন করা যায়, আত্মহত্যা করা যায়, হাততালির লোভে ছোটখাট বীরত্ব দেখান যায়, নামের লোভে দাতা হওয়া যায়, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার বলি পূর্বজন্মের

অসীম সুকৃতি ছাড়া সন্ন্যাসী হওয়া অসম্ভব। তর্ক করে লাভ নেই, তিক্ততা বাড়বে। তৈরি হয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই খেতে বসতে হবে।

নীরবে আহার পর্ব শেষ হল। আজ আর পরিবেশনের ঘটা নেই। নানারকম পদ নেই। বেগুন ভাজা আর খিচুড়ি। চোখে পড়ছে মাতামহের খড়মজোড়া। একটি জলচৌকির ওপর সযত্নে রক্ষিত। বারান্দার তারে ঝুলছে কাকীমার শাড়ি। সারা বাড়ি স্মৃতিতে, স্মৃতিতে ছেয়ে আছে। স্মৃতিই বেদনার উৎস।

রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল। এমন মানুষ যে কোনও মহিলাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। সূক্ষ্ম সেলাই, রিপু, ফ্যান গালা, বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, সবই জানেন। এমন জানেন যাঁর কোনও তুলনা হয় না। মাতামহ থাকলে এতক্ষণ প্রশংসায় প্রশংসায় বাড়ি মাত করে দিতেন। সব ফাঁকা। সব ধ্বস্ হয়ে গেছে। কয়েকটি ব্যবহৃত জিনিস মাত্র পড়ে আছে। পাট করা একটি গামছা। কীটদষ্ট একটি বই। সিন্দুকে কি আছে খুলে দেখা হয়নি। আমি নিজে কোনওদিন খুলবোও না। খুলতে হলে মাতুলের সামনেই খুলবো।

পিতৃদেব বললেন, সারাদিন খুব খাটাখাটুনি করেছ, এইবার শুয়ে পড়। আমি আমার পুরনো অভ্যাসটা আবার ফিরিয়ে আনি। একা একা রাত জাগা। কত কি পড়ার রয়েছে! জমে জমে পাহাড় তৈরি হয়েছে।

টেবিলে আলোর সামনে গিয়ে বসলেন। একদিকে থাক থাক বই, আর একদিকে ছোট বড় নোটখাতা। মাঝে একফালি কাঁচে ঢাকা জায়গা। আজ আর আমার লেখাপড়ার মেজাজ নেই। শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে দেখছি অনন্ত আকাশ। তারার ফুল ছড়িয়ে আছে। সামনে পড়ে আছে জীবনের অনন্ত পথ। কনকের কথা মনে পড়ছে। সে ঠিকই করেছে। আমার দুর্বলতাকে আদৌ পাত্তা দেয়নি। দিলে বিপদেই পড়ত। যে নিজে চলতে পারে না, সে অপরকে চালাবে কি করে। মুকু মনে বড় টোল ধরিয়েছে। কী সব ঘটছে জীবনে? আগামীকাল আমি অফিস ফেরতা স্বামী নির্মলানন্দের কাছে যাব। য পলায়তি স জীবতি। আর এখানে নয়। ওই কাকীমা অবশ্যই আবার ফিরে আসবেন। পিতার এই নিঃসঙ্গতা অবশ্যই ঘুচে যাবে। সংসার কারুর জন্য বসে থাকে না। সব যেমন চলার তেমনি চলে। মায়ের অভাবে পিতার জীবন তো কই অচল হয়নি। আমার অভাব, অভাব বলেই মনে হবে না। কর্মী মানুষ, কাজে কাজেই ঠিক চালিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি কীভাবে ছেড়ে থাকব। যেখানেই যাই মন যে আমার কাঁদবে। মুকুর কথার কোনও মাথামুণ্ড নেই। মুকু আমার মা হবে, সৎ মা। সত্যিই যদি হয়, আমার আর কোনও পিছু টান থাকে না। অপরিসীম ঘৃণায় বৈরাগ্যের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তা কি আর হবে? ঘটনা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পথে নামাবে না। আমাকেই নামতে হবে ধাক্কা মেরে।

চোখ কখন বুজে এসেছিল জানি না। গভীর রাতে এস্রাজের সুর শুনেছিলাম মনে হয়। জয়জয়ন্তী বেজেছে কেঁদে কেঁদে। মুখে যা প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে সুরে সুরে। ধড়মড় করে বিছানায় যখন উঠে বসলুম, তখন যথেষ্ট বেলা হয়েছে। এভাবে কোনওদিন তো ঘুম ভাঙে না। কে যেন ঠেলা মেরে উঠিয়ে দিল। অনেকটা হাত ধরে ঠেলে তুলে দেবার মত করে। আলোয় চোখ ক্রমশ সয়ে এল। বাইরে কাকের কর্কশ চিৎকার। বালিশের পাশে পোস্টকার্ডের মত ছোট্ট একটা কি পড়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, জানালা দিয়ে আসা রোদের টুকরো। না, তা তো নয়। মুক্তোর মত কয়েকটি অক্ষর ভাসছে। তুলে চোখের সামনে ধরলুম। সাত সকালে চিঠি ডেলিভারি হল বিছানায় বালিশের পাশে। কে সেই পিওন!

একটি মাত্র লাইন, লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারা উচিত। হরিশঙ্কর।

তার মানে? এ কথার অর্থ কী! কোথায় তিনি? আমার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি মেরে, কে আমায় জাগাল? আমার কোনও আতঙ্ক! মশারি তুলে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা জড়িয়ে, টান লেগে একপাশের ফিতে ছিঁড়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে যাইনি এই আমার ভাগ্য!

টেবিলের আলো তখনও জ্বলছে। রাত-জাগা পাণ্ডুর রুগীর মত। বইপত্র সামান্য এলোমেলো।

আলো না নিবিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যাবার মানুষ তো তিনি নন। তার জগৎ তো কারণ-জগৎ। কার্য ছাড়া কারণ, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। অকারণে আলো জ্বলুক, এ তো তিনি চাইবেন না। বিছানায় শুয়েছিলেন বলে মনে হয় না। চাদর টানটান। মশারি ফেলে চারপাশ গুঁজে রেখেছিলেন, সেই ভাবেই গোঁজা রয়েছে, টেনে খোলার চিহ্ন নেই। মাতামহ যে ঘরে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে গেলেন, সে ঘরের দরজা খুললেই, সুন্দর অপার্থিব একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। এ ঘরেও তিনি নেই। বিছানার ওপর একটি ফুল পড়ে আছে। চাদরের মাঝখানে। রান্নাঘর শূন্য। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর চাপা গন্ধে গুমোট হয়ে আছে। শুকনো, খসখসে, স্নেহহীন মেঝে। কোনও কোনও জায়গা চাটনি কিংবা টক পড়ে সাদা সাদা হয়ে গেছে। এই ঘরে কনক রেঁধে গেছে, এখন সে কার ঘরনী। কাকীমা তাঁর নতুন গন্তব্যস্থলে এতক্ষণে মনে হয় পৌঁছে গেছেন। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজা খুলতেই ভস্ করে একটা বন্দী হাওয়া বেরিয়ে চলে গেল। ঘষা কাঁচ লাগানো পুবের জানালায় রোদ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

দোতলার সব দেখা হয়ে গেল। কোথাও তিনি নেই। অথচ মনে হচ্ছে আছেন। ধূপের গন্ধের মত। এইমাত্র জ্বলছিল। জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেছে। শেষ ধোঁয়া এখনও যেন বাতাসে সরু সুতোর মত পাক খাচ্ছে। ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আর একবার ভাবার চেষ্টা করলুম, কি হতে চলেছে? কি মানে ওই লাইনটির? ইংরেজীরই বাঙলা তর্জমা, স্ট্রাইক হোয়াইল দি আয়রন ইজ হট। কোন্ লোহা? কে লোহা? মশারি তুলে বালিশের পাশে একটি কার্ড ফেলে রেখে তিনি গেলেন কোথায়! এ আবার কী ধরনের রসিকতা! ভোরবেলা বাজার? জীবনে যাননি। মর্নিং ওয়াক! ওসব শৌখিন ব্যাপারে আদৌ অভ্যস্থ নন।

খোলা ছাদ, চারপাশে দৌড়োদৌড়ি করছে। ঝলমলে পৃথিবী সকালের বাতাসে দু'বাহু তুলে যেন নাচছে। আলোয় আলোকিত। সেই পায়রার ঝাঁক উড়ছে পূব আকাশে ঘুরে ঘুরে। একটা দুটো পাখি খুব নিচু দিয়ে ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে এ গাছ থেকে ওগাছে গিয়ে বসছে। দিন এলো বলে প্রকৃতিতে যেন শোরগোল পড়ে গেছে। আশা ছিল, হয়তো পিতৃদেবকে দেখব পরিচিত ভঙ্গিতে। সার সার ফুলগাছের টবের সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। শীত আসছে। ফুল আসবে। ছাদ ফাঁকা। প্রতিবেশীরা জেগে উঠেছেন। কলরব কানে আসছে। জলের বালতি জোরে বসাবার ধাতব শব্দ। এক মহিলা রোদের আলসেতে হলদে শাড়ি মেলছেন পরিপাটি করে। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রটি একপাশে পড়ে আছে। কালো পিঁপড়ের দল ভীষণ ব্যস্ত। মিছিল করে এগিয়ে চলেছে, টবের পাশ দিয়ে দিয়ে। গাছের পাতা থেকে কাণ্ড থেকে এক ধরনের তিক্ত গন্ধ বেরচ্ছে। বড় পরিচিত। গন্ধে যেন কিসের খবর ভাসছে। পুজো প্রায় এসে গেল। শিশিরের কাল আসছে। মাটির গভীরে, কোন্ অদৃশ্য লোকে কুঁড়ি জাগছে, এইবার তার মুখটি উঁকি দেবে পাতার ফাঁকে। পাশের নিমগাছ থেকে চকচকে দুটি কাঠবেড়ালি নেমে এসেছে। আলসে বেয়ে ন্যাজ তুলে ছুটছে।

শূন্যতার আঘাত এই প্রথম উপলব্ধি করলুম। কিছু না থাকা যে কত বড় শাস্তি! পাখিদের কি এরকম মনে হয়! আতঙ্ক হয়! ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল! মৃত্যু, সুস্পষ্ট একটা আঘাত। তবু সহ্য করা যায়। প্রাণ না থাকলেও সামনে একটা দেহ পড়ে থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের অনেকদিনের বোঝাপড়া। মনের একটা প্রস্তুতি আছে। কিন্তু শূন্যতা! রহস্যময় অনুপস্থিতি! বুকটা ধক্ করে ওঠে। ভীষণ আচমকা একটা আঘাত। সামলাতে কষ্ট হয়।

উদ্বেগ চেপে আবার নিচে নেমে এলুম। অসম্ভব রাগে শরীর জ্বলছে। পৃথিবীটা ক্রমশই যেন নাটুকে হয়ে উঠছে। একজন প্রৌঢ় মানুষ হঠাৎ এমন নাটকীয় হয়ে উঠলেন কেন? পুত্রের সঙ্গে মজা করছেন! অন্ধকার একতলায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে দিনের আলো ঢুকেছে। অন্ধকারের স্তরে কোথাও এখনও একটা ঝিঁঝি ডাকছে থেমে থেমে। রাত যে ভোর হল, সে খবর এখনও পায়নি। কাকীমা যে ঘরে রাঁধতেন, সেই ঘরে খুটুস খাটুস করে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। ইঁদুররা ফিরে এসেছে আবার। ঝিঁঝি থামলেই চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা ফিরে আসছে। চিড় খাওয়া সদর দুয়ার বাতাসে কাঁপছে। একপাশে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে খিল। আর কোনও সন্দেহ নেই। যতই খুঁজি না কেন, এ গৃহে তিনি নেই। দরজার

বাইরে রাজপথ। এক বাহু পশ্চিমে চলে গেছে গঙ্গায়, আর এক বাহু পূবে, প্রসারিত অনির্দেশ যাত্রায়। আমি এখন কি করি!

দুয়ার খুলে থাকি বসে
আসবে তুমি ফিরে।
প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখি
তোমার পথের ধারে ॥

ধীরে, খুব ধীরে, ভয়ে ভয়ে সদর দরজার একটা পাল্লা সামান্য একটু ফাঁক করতেই বাইরের জগৎ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এক ঝলক পরিষ্কার বাতাস, শুভ্র রুপোলি আলো, শব্দের গমক ছুটে এল। কিছুই হয়নি যেন! উদাসীন বহির্বিশ্ব যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলছে। সাইকেলের হাতলে পাটপাট কাগজ ডাঁই করে খবরের কাগজঅলা ছুটছে পূব থেকে পশ্চিমে। গয়লা চলেছে দুধের বালতি নিয়ে। খড়ের নূটি তালে তালে নাচছে। এপাশ থেকে ওপাশ, যত দূর দৃষ্টি যায় একবার তাকিয়ে দেখলুম। অজগরের মত পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ভেঙে পড়া ঝাড়লণ্ঠনের মত টুকরো টুকরো মানুষ এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। রাতের মুঠো আলগা হয়ে দিনের পৃথিবী খুলে পড়েছে! পাউরুটির সাইকেল ভ্যান বিকট শব্দে চমকাতে চমকাতে চলেছে। হাফপ্যান্ট পরা চালক সিটের ডাইনে বাঁয়ে উঁচু নিচু হয়ে প্যাডেল ঠেলছে।

দরজা বন্ধ করতেই জগৎ কাটা পড়ে গেল। ঘোলাটে আলো অন্ধকার। স্যাঁতসেঁতে বাতাস। বিষণ্ণ দরজা জানালা। মরচে ধরা সোজা সোজা গরাদ। ঝিঁঝি এখনও থেমে থেমে তাল ঠুকছে। উত্তরের বাগানে নিমগাছে বসে কাক ডাকছে খা খা ক'রে। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে আলো-অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালুম। কী ভীষণ শূন্যতা। ঊর্ধ্বাকাশে প্যারাচুট না খুললে, নিরালম্ব পড়ে যেতে যেতে মনের যে রকম অবস্থা হওয়া উচিত, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম। পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ কেটে গেছে। যার পা নেই তার বগল থেকে ক্রাচ কেড়ে নিলে এই রকমই হয়। পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। একেবারে একা। পূর্ণ কুম্ভ থেকে শূন্য কুম্ভ। হঠাৎ মনে হল, সেই অসহায় মহিলাটির তাহলে কাল কেমন লেগেছিল। কী মন নিয়ে তিনি চলে গেলেন! আমি তো পুরুষ! তাও মনে হচ্ছে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

পিতৃদেব! এ কি লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল না! এইভাবে প্রতিশোধ নিলেন! ভয়ে, লজ্জায়, আমি যেন খুনীর মত এই আবছা আলোয়, নোনা বাতাসে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিচারক-জগৎ বাইরে বয়ে চলেছে। কোনওক্রমে খবর একবার বাইরে রটে গেলে আমার ফাঁসী হয়ে যাবে। নিরুদ্দেশ সংবাদটিকে গুম করে দিতে হবে। তারপর সারা ভারত আমি চুঁড়ে ফেলব! কিন্তু! ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যদি আত্মহত্যা করে থাকেন! অসম্ভব! তিনি ভীরু ছিলেন না। জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা রাখেন। এই সময় কেউ যদি আমার পাশে থাকত! এমন কেউ যাকে সব কথা খুলে বলা চলে। যার পরামর্শ নেওয়া চলে। এমন কি মুকুর মত কেউ থাকলেও এই শূন্যতা সহনীয় হত।

ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠে এলুম। নিজেকে মনে হচ্ছে, ট্রেন দুর্ঘটনার পর, কী বোমা বর্ষণের পর একমাত্র জীবিত মানুষ! প্রতিদিনের অভ্যস্ত জগৎ উলটে পড়ে গেছে। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর নেই, পদশব্দ নেই, উত্তাপ নেই, চাহিদা নেই। অন্যদিন এতক্ষণে চা বসে যেত। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হত। চটি ঘুরে বেড়াত ফটফট করে। বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কোনও রসিকতা নয় তো! কিছু তো একটা বলে যাবেন? কী সাংঘাতিক মানুষ! কত বড় একজন অভিনেতা! কাল রাতে এতটুকু বুঝতে দিলেন

না। মনে হল পুরনো সেই মানুষটি ধীরে ধীরে ফিরে আসছেন। বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল। লাস্ট সাপারের অভিনয় করে গেলেন! নিজে রেঁধে শেষ আহার করে গেলেন আমার সঙ্গে। পরিকল্পনাটা কী একবারও যদি বুঝতে পারতুম! শেষ রাতেই যদি চলে গিয়ে থাকেন, কতদূর আর যেতে পেরেছেন! শহর থেকে বেরোবার তো মাত্র দুটি দরজা, হয় শেয়ালদা, না হয় হাওড়া। চাকরিতেও কী ইস্তফা দিলেন! আমার তেমন লোকবল থাকলে এক্ষুণি দিকে দিকে সকলকে ছুটিয়ে দিতুম। পালানর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যেত! থানায় গেলে কেমন হয়? সে বড় লজ্জার। চারপাশে ঢিঢি পড়ে যাবে। ধূর্ত প্রতিবেশীর দল সান্ত্বনা জানাবার ছলে এসে জল আরও ঘোলা করে দিয়ে যাবে! কী আমি করতে পারি! এই বাড়ি ফেলে কোথায় আমি দৌড়ই! কায়ার পেছনে ছায়ার মত! আমার সব পরিকল্পনা এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল।

টেবিলের আলোটা নিবিয়ে দি। এ বাড়িতে আলো আর জ্বলবে না। মাতামহের ভাষায়, সব ধুস্ হয়ে গেল। পঙ্কজবাবুর কাছে গেলে কেমন হয়? পাকা মাথা থেকে পাকা পরামর্শ বেরোতে পারে। একদিন অকারণে পিতৃনিন্দা করেছেন। না যাওয়াই ভাল। মানুষটির মনে তিন চার রকমের অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অর্থের, রূপের, সুন্দরী স্ত্রী কন্যার। স্বপ্নে আছেন, স্বপ্নেই থাকুন। জাগিয়ে লাভ নেই। বরং অক্ষয় কাকাবাবুর কাছে যাওয়া চলে। মাতুলকে খবর দিতে পারা যায়। তবে তিনিও কী কম বিব্রত! বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপিয়ে লাভ কী!

হাতলঅলা মেহগনি কাঠের ভারি চেয়ার টেবিলের দিকে আড় হয়ে আছে। এই মাত্র কেউ যেন ঠেলে উঠে চলে গেছেন। টেবিলঘড়ি প্রবল শব্দে টিক্ টক্ করে চলেছে। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে সময়ের টাট্টু ঘোড়া যেন দুলকি চালে ছুটছে ভবিতব্যের সওয়ার নিয়ে। যে চাবি নিয়ে এত লাঠালাঠি সেই চাবির গোছা পড়ে আছে টেবিলে অনাদরে, অবহেলায়। একটি নোটখাতার মাঝামাঝি জায়গায় কলম গোঁজা। কিছু কী লিখছিলেন! পাঁচখণ্ড সদগুরু সঙ্গ এক পাশে পর পর সাজানো। আর একপাশে কথামৃত।

খাতাটা খুলতেই চোখে পড়ল কী লিখছিলেন! নিজেকেই লেখা নিজের চিঠি—

হরিশঙ্কর, অনেকদিন হল, পৃথিবীতে এসেছ। কেন এসেছ জানো কি? আমার নির্দেশ কি তুমি বোঝো না! সংসার তোমার জন্যে নয়। যতবার তুমি গড়তে চেয়েছ, ততবারই আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। তোমার জীবনে ভোগ নেই, আছে দুর্ভোগ। আর কতকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে! তেল পুড়ে আসছে। আলোটা এবার নিজের দিকে তুলে ধর। অন্ধকারে এসে অন্ধকারে কেন বিদায় নেবে! প্রস্রবণের মুখ চাপা আছে। পুরুষকার দিয়ে সামান্য একটু উসকে দাও। কী সব বাজে অন্তঃসার শূন্য জিনিস নিয়ে মেতে আছ। বিজ্ঞানীর গর্ব তোমার সাজে না। তুমি আইনস্টাইন নও, তুমি রাদারফোর্ড নও। শুষ্ক দফতরের সামান্য একজন রাসায়নিক। তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জগৎ একটি কানাকড়িও পাবে না। জীবনসঙ্গিনীকে অনেক আগেই কেড়ে নিয়েছি। যে কর্তব্যের মুখ চেয়ে এতকাল পুতুল খেলছিলে, তোমার সেই উত্তরপুরুষ আজ তৈরি। জীবনের সুপথ, কুপথ, ঘুরপথ সবই চিনতে শিখেছে। স্নেহের শিকল কেটে এবার পাখিটিকে উড়িয়ে দাও। তার স্বাধীন ইচ্ছে তৈরি হয়েছে। আর তাকে প্রদীপের মত আগলে রেখ না। এবার তাকে সাবালক হতে দাও। হাবুডুবু না খেলে সাঁতার শেখা যায় না। জেনে রাখো এক জঙ্গলে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। তুমি তো বৃদ্ধ বাঘ হে! লোলচর্ম, পলিত কেশ। স্বপ্ন ছিল? অনেক স্বপ্ন! কিসের স্বপ্ন হরিশঙ্কর? জীবনটাই তো দীর্ঘ এক স্বপ্ন! স্বপ্নের আবার স্বপ্ন কী? জীবন তো সময়ের বুদবুদ। কেন পড়নি, ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু। অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। অহংলাঠিটি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহংলাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুছে যায়। ভেবে দেখ, এই জাগরণ অবস্থাও কিছু নয় হরিশঙ্কর। সেই গল্পটা মনে পড়ে এক কাঠুরে স্বপ্ন দেখেছিল। একজন হঠাৎ তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে কাঠুরে রেগে আগুন। 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম।

ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি?' যে ঘুম ভাঙিয়েছিল সে বললে, 'ও ত স্বপ্ন, ওতে আর কি হয়েছে!' কাঠুরে বললে, 'দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা'হলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।' সবই স্বপ্ন হরিশঙ্কর। কোনওটা দীর্ঘস্থায়ী, কোনওটা ক্ষণস্থায়ী। শঙ্কর তো পড়েছ? অত বড় অদ্বৈতজ্ঞানী আর কী এসেছিলেন! স্বপ্নে স্বপ্ন সত্য, জাগরণে সব মিথ্যা। তোমার অজ্ঞান, জগৎকে সত্য, অবিনশ্বর এই রকম একটা ভ্রম তৈরি করে তুলছে। আসলে তা নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাক্যে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলো। যখন জেগে আছ তখন স্বপ্ন মিথ্যা, যখন স্বপ্নে আছ তখন জাগরণ বৃথা, যখন তুমি গভীর নিদ্রায় তখন স্বপ্নও নেই, জাগরণও নেই। এইবার স্বপ্ন আর জাগরণকে এক করে ফেল তখন নিদ্রাটাকেই মিথ্যা বলে মনে হবে। কী সুন্দর কথা! একবার অভ্যাস করে দেখ, পারবে, তুমি পারবে। আমি ধীরে ধীরে তোমার মোহ ছেদন করে দিয়েছি।

যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবসংজ্ঞা তথাপরে॥

মৃত্তিকায় দিলে ঘট নাম, কনকে লাগালে কুণ্ডল নাম, শুক্তিতে নিয়ে এলে রজতের কল্প না, তেমনি আত্মাকে দিলে জীবনের চেহারা। রজ্জুতে সর্পভ্রম এল না। ঘট মৃত্তিকাই, দেহ চিদাত্মময়। তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়েছে, এবার আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও।

আর ঘুমাইও না মন।
মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কি হেতু এলে
আপনারে ভুলে গেলে
চাহ রে নয়ন মেলে
ত্যজ কুস্বপন॥

সময় ঝুরঝুর করে বালির মত ঝরে পড়ছে। দেহপিঞ্জর খুলে যাবার সময় আসন্ন। এতকাল স্নেহে অন্ধ হয়েছিলে। কর্তব্যের চাকা অবিরত ঘুরিয়েই গেছ, ঘুরিয়েই গেছ। কে তোমার আবেগের মূল্য দেবে! জগৎ বড় স্বার্থপর। কেউ কারুর নয় হরিশঙ্কর! আঁতে ঘা লাগলে সবাই বেঁকে বসবে, এমন কি সন্তানও! সমালোচনা এক জিনিস, সন্দেহ আর এক জিনিস। বার্ধক্যে যখন স্থবির হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে। বুদ্ধিভ্রংশ হবে, তখন কি তুমি অপমানের বোঝা নিয়ে পরাজিত সৈনিকের মত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে! ধিক্ হরিশঙ্কর, ধিক তোমাকে। সংসার এক ছোবড়া। যতই নিঙড়োও এক ফোঁটাও রস বের করতে পারবে না। বৈরাগ্য হিসেব করে আসে না। মুহূর্তে উদয় হয়, মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। যেন ঝড়ের পাখি। বন্ধ জানালার কাচে এসে সরু ঠোঁটের ঘা মারে। খুলে দাও, খুলে দাও, নয়তো উড়ে চলে যাবে। ঠাকুরের বলা সেই গল্পটি মনে পড়ছে! একজনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হলো না। যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোলজন স্ত্রী,—এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, বললে, 'ক্ষেপী! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়? আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ,—আমি চললুম!'

সে বাড়ির গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল।—এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায় !!!—ডাকাতি করার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে—মারো! লোটো! কাটো!

তুমি তো বারে বারে এই জীবনেই নতুন করে জন্মাতে চেয়েছ। এই কূপ থেকে আর একবার বেরিয়ে পড়। স্লেটের লেখার মত অতীতকে মুছে দিতে না পারলে, বর্তমানকে ফেলে দিতে না পারলে, ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়া যায় না। কিছুকাল, কিছু মানুষের সঙ্গে প্রারব্ধ ক্ষয় করে গেলে, এবার তবে

চলো নতুন জন্ম নিতে।

কালির ফোঁটায় লেখা এইখানেই শেষ হয়েছে। এ কবেকার লেখা ! কাল রাতের, না, তারও আগের। মনে হয় কাল প্রথম রাতে এই সব লিখেছেন। তারপর জীবনের প্রিয় সঙ্গী এস্রাজটিকে কাঁধে নিয়ে বসেছেন। শেষ ছড় টেনে জয়জয়ন্তীর করুণ সুরে রাতকে কাঁদিয়েছেন। আমি আধো-তন্দ্রায় সেই সুর শুনেছি।

ছোট্ট আর একটি নোট খাতা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেই বিখ্যাত হিসেবের খাতা। পাতায় পাতায় পরম নিষ্ঠায় পাই পয়সা খরচেরও হিসেব লেখা। শেষ পাতায় নতুন একটি সংযোজন। গহনার তালিকা, বিছাহার, সাতনরী হার, বাজু, মানতাসা, টায়রা, রুলি, চুড়ি, ব্রেসলেট, আঙটি। পর পর তালিকা নেমে গেছে নিচের দিকে। চল্লিশ ভরির মত সোনা। গোটা কতক গিনিও আছে। সোনার রিস্ট-ওয়াচ।

খাতার তলা থেকে ব্যাঙ্কের পাশবই উঁকি মারছে। জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টে প্রায় সত্তর হাজার টাকা পড়ে আছে। বড় কম্পানির কিছু শেয়ারও কেনা আছে। বছরে বছরে ডিভিডেণ্ড আসতে দেখি। বুকটা হঠাৎ দুধের মত উথলে উঠল। সব আমার, সব আমার। আমি ধনী, ভিখিরি নই। সব সাজিয়ে রেখে গেছেন আমার জন্যে। আমার সামান্য একটি কথায় এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। কী অসম্ভব মনেব তেজ ! কী দুর্জয় অভিমান। দিনের পর দিন আমি বসে থাকব এই ভগ্ন অট্টালিকায়। যা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দশ কাঠা জমির ওপর। যক্ষের মত আগলাব এই সব সোনাদানা। আর সেই মানুষটি পড়ে থাকবেন অজানা অঞ্চলে। কোনও অরণ্যে, কি পর্বতে, কি কোনও আশ্রমে। শীত আসবে, বসন্ত বিদায় নেবে, বর্ষার আকাশ মাথার ওপর গর্জন করবে। এদিকে ছাতে ফুলগাছের টবে টবে কুঁড়ির মুখ উঁকি দেবে। একটি দুটি ফুল ফুটবে। আমি শুধু বসে থাকব সুখী যক্ষের মত, আমার ভোগ নিয়ে, আমার ন্যাজে খেলানো স্বভাব নিয়ে, আত্মদর্শন-ইচ্ছার মুখোস পরান দেহ-বাসনা নিয়ে। বিষকুম্ভ পয়োমুখং হয়ে বসে থাকব এই স্মৃতির সৌধে। ভাঙছে যখন ভালো করেই ভাঙুক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এই অভিশপ্ত বংশ। যা কিছু আছে সবই দান করে দি আশ্রমকে। মানুষের চেষ্টায় যা গড়া সম্ভব হল না, গড়ে উঠুক ঈশ্বরের নামে। ওই লেখার পাশে আমিও তো লিখতে পারি, ঠাকুরের কথাতেই লিখতে পারি, 'বাপ কত বড় বস্তু ! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে ! মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে।' সব ঋণ শোধ করে আমি অঋণী হয়ে যেতে চাই।

হরিশঙ্করের পুত্র হরিশঙ্করই হবে। এক প্রান্তে আপনি উঠুন, আর এক প্রান্তে আমি। সময় হলে দেখা হবে দুজনে, কোনও অরণ্যে, কোনও পর্বতশীর্ষে, কোনও দেবালয়ে। তখন দুজনেই দুজনকে যাচাই করে নেবো। কে কত দূর এগিয়েছে বিচার করবেন সেই তিনি।

কোণের দিকে ঠকাস করে একটা শব্দ হল। বলাইবাবু উলটে গেছে। যাবার আগে বলাইবাবুর একটা ব্যবস্থা করে যেতে হয়। পুকুরে ছাড়লে সর্বগ্রাসী মানুষ খেয়ে শেষ করে দেবে। নদীতে ছাড়লে অনিশ্চয়তায় হারিয়ে যাবে। চলো, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেইখানেই ফিরে চলো। নাটক শেষ হয়ে গেছে বলাইবাবু। যবনিকা নেমে গেছে। দর্শকের আসন শূন্য। অভিনেতারা সবাই চলে গেছে। শূন্য মঞ্চে শুধু তুমি আর আমি। চলো, আর না। এখানে এবার শুরু হবে নতুন নাটক। সে কাহিনীতে তোমার আর আমার স্থান নেই।

বারান্দার কোণে ঝুড়িতে বলাইবাবুর খাদ্য। শাকপাতা, পাকা কলা। মানুষের হাতে শেষ খাওয়া খেয়ে যাও। বলাইবাবুর বেশ খিদে পেয়েছিল। শরীরের পাশ দিয়ে বিচিত্র মুখটি বের করে শাকের কুঁচি, কলার টুকরো টেনে নিতে লাগল। অবোধ জীব জানে না, এরপর কি হবে ! কে-ই বা জানে ! আমি-ই কি জানি, একটু পরে আমার কি হবে ! কাল কি জানতুম, আজ আমার কি হবে !

খাওয়া হয়ে গেল ? চলো, লক্ষ্মী ছেলে। তুমি ছেলে, না মেয়ে !

বলাইবাবুকে বুকের কাছে ধরে, পেছনের অন্ধকার অন্ধকার, ভাঙা ভাঙা, সিঁড়ি বেয়ে নিচে পাতকোতলায় নেমে এলুম। নতুন দিনের আলো লেগেছে গাছের পাতায় পাতায়। বহুকাল পরে বউ

কথা ক'ও এসে বসেছে নিমগাছের ঝিরিঝিরি পাতার আড়ালে। বড় অদ্ভুত ডাক। তার হলদে শরীর এক ঝলক নেচে গেল চোখের সামনে ঈশ্বরের খুশির মত। কুয়োর স্থির জলে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি। বহু দূর থেকে বিষণ্ণ একটি মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যিই আমি যেন জলে পড়ে গেছি। মন কেমন করা একটা শীতলতা ওপর দিকে ঠেলে উঠছে।

বলাইবাবু আজকাল আর খোলের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে নেয় না। গলাব কাছে তার মুখ খেলছে। ভিজে ভিজে স্পর্শ। ভেষজ ভেষজ গন্ধ। বলাইবাবু, ওই যে তোমার বর্তুলাকার জগৎ। ওইখান থেকেই তুমি এসেছিলে এক বর্ষার দুপুরে। যাও, আবার তুমি তোমার জল-জগতের নিঃসঙ্গ গভীরতায় ফিরে যাও। বড় মন কেমন করছে বলাইবাবু। আর কোনও দিন তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না। না, ওপর থেকে তোমাকে দুম করে ফেলব না। বালতিতে রেখে ধীরে ধীরে নামাব।

বলাইবাবু কিছুক্ষণ ভেসে রইল জলে। কূল-কিনারা পাচ্ছে না। মাথাটা বৃত্তাকারে জলে ঘুরে গেল একবাব, তাবপর ডিগবাজি খেয়ে বলাইবাবু তলিয়ে গেল জলে। একবাশ বুড়বুড়ি ভেসে উঠল জলের ওপর। পিতৃদেব লিখে গেছেন, আমরা সব সময়ের বুদবুদ।

গোটাকতক কাক ডেকে উঠল খা-খা করে। সমস্ত পৃথিবী যেন শুকিয়ে গেছে। বড় তৃষ্ণার্ত ডাক।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়ছে। পিতৃদেব যে উদ্দেশ্যেই যাত্রা করুন, আমাব সঙ্গে ব্যবধান তাঁর ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কোথায় যেতে পারেন? হরিদ্বারে? বৃন্দাবনে? বিন্ধ্যাচলে? এই এত বড় একটা দেশ। হাবাবো মনে কবলে অতি সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়।

চৌকির ওপর বসে চাবপাশে একবার তাকালুম। কড়িকাঠে চারটে আঙটা ঝুলছে। দূর অতীতে ওই আঙটা থেকে ঝুলত একটি দোলা। সেই দোলায় শুয়ে শুয়ে হাতপা ছুঁড়তো একটি অসহায় শিশু। ওই যে ছবি, আমার মা। ডুবে শাড়ি পবে হাঁটু গেড়ে সেই দোলাব পাশে বসে ধীরে ধীরে দোলাতেন, হাতের চুড়ি বেজে উঠত জলতবঙ্গেব সুরে। ঘুমপাড়ানী গান গাইতেন চিবকালের সুরে, আয় ঘুম, যায় ঘুম, বর্গি-পাড়া দিয়ে। তুমি আবার আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও মা। অতীতকে অলৌকিক কায়দায় টেনে আন বর্তমানে। আবাব একবাব নতুন কবে জীবন শুরু করি। যে সব ভুল এবারে করেছি, দ্বিতীয়বার আব তা কবব না। না, তা বুঝি আব হয় না! জীবন টুথপেস্টেব মত। যা একবাব বেরোয়, যতটুকু বেরোয়, ততটুকুই খবচ করে ফেলতে হয়।

পাশের অন্ধকার ঘব থেকে ঘড়ির চলনে, টুপটুপ্ শব্দ ভেসে আসছে। এ শব্দ তো এতক্ষণ কানে আসেনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেবে দেখলুম। নীল কাচ বসানো জানালা দিয়ে বিষাক্ত আলো এসেছে। দেয়াল ঘেঁষে সাব সার কালিব বোতল। একটার মুখে বিশাল এক ফানেল। টুপটুপ্ করে নীল কালি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। হলাহলের মত। কী আশ্চর্য! যাবাব আগে ফিলটারে কালিও চাপিয়ে গেছেন! এ এখন সারাদিন ধরে পড়বে। বলেছিলেন, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেইখানেই আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম। তুমি সুখী তো!

বাস্তায় বেবিয়ে সময়টা একবাব দেখে বাখলুম। বেলা এগাবোটা। সদরের দরজায় সবচেয়ে বড় তালাটা ঝুলিয়েছি। যক্ষপুবীব তালা। শূন্য বাড়িতে কিছু না থাক, সোনা আছে, দানা আছে, আর আছে স্মৃতির স্তূপ। মনের ঝুলিতে ভরে স্মৃতি বহন করা যায়, পার্থিব সম্পদের জন্যে সিন্দুক চাই, তালা চাই।

ক্রমশ ব্যবধান বাড়ছে। মোড়েব মাথায় এসে বাড়িটার দিকে তাকালুম। বিমর্ষ ইটের স্তূপ রোদে পুড়ছে। মাথার ওপর শবতেব নীল আকাশ। সাদা ভেলার মত ভাসছে মেঘখণ্ড। পাযরা উড়ছে চিকচিক কবে। আমার বাড়ি। যতই এগোচ্ছি, ততই যেন লোভ বাড়ছে। অসংখ্য, অদৃশ্য হাত পেছন থেকে টানছে। দশ কাঠা জমি, বাড়ি, চল্লিশ ভবি সোনা, ষাট সত্তর হাজাব নগদ টাকা, কোম্পানীব কাগজ, আমার চাকরি, পদোন্নতি, দেরাদুন। সাবুগাছ লাগান সেই বাড়িতে একটি মেয়ে। মুকু যার নাম। আজ বললে, কালই যে জলে নামতে প্রস্তুত। আবাব ওই আঙটা থেকে দোলার চেন নেমে আসবে। নির্জন শ্মশানসম বাড়িতে কচি প্রাণেব ক্রন্দন শোনা যাবে। চুড়ির জলতরঙ্গ বেজে উঠবে। রঙ-বেরঙের শাড়ি ঝুলবে। চুলে চিরুনি চালাবাব দীর্ঘ শব্দ শোনা যাবে, ঝাউয়ের ডালে নীল সমুদ্রের

বাতাসেব মত। আমাব তো ভোগই হল না, ত্যাগ হবে কি কবে ! আমাব লোটাকম্বলটি নিয়ে গেলেন, যিনি পাবেন তিনি। আমি হাঁটছি, হেঁটেই চলেছি, উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। মনেব প্রান্তরে খুলে গেছে দুটি পথ, ডানদিক গেছে স্বামী নির্মলানন্দের দিকে বৈরাগ্যেব পথ, বাঁদিক গেছে সেই সাবুগাছ ঘেরা মনোহর নিকেতনে। সেখানে আছে জীবনসঙ্গিণী। মন, তুমি বামাচাবী হবে ' মুকুকে রেখে তুমি তো ভারতটুঁড়ে পিতৃদেবকে খুঁজে আনতে পাব। দেবসেবা, পিতৃসেবা দু'হাতে চালাতে পাব .

ঠাকুব বলেছেন না পলাশ ! তাঁকে জেনে—এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসাবেব কার্য কর। যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। তোমরা ত্যাগ কেন কববে ? বাড়িতে বরং সুবিধা, আহাবেব জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্বদারার সঙ্গে তাতে দোষ নেই। শরীরের যখন যেটি দবকাব কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা কবাব লোক কাছে পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ কবে সংসাবে ছিলেন। এঁরা দুখানা তবৱাব ঘোরাতেন-একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মেব।

তাহলে ! আমার দশ কাঠা জমি, বাস্তার ধাবেব বাড়ি, চল্লিশ ভরি সোনা, হার্ড ক্যাশ সত্তর হাজাব, কোম্পানীব কাগজ ' জ্ঞান-সূর্যেব উদয়ে, পিতৃদেবের অভিমান-শিশিব উবে যাবেই। তিনি জ্ঞানী, হঠকারী নন। ফিরে তিনি আসবেনই, সংসাবেব টানে। অপেক্ষা করে দেখতে দোষ কি। হঠকারিতার আব এক নাম মূর্খতা।

বেশ, তাহলে তাই হোক। মুকুকে এনে কয়েকদিন পাহাবায় বেখে, আমি অনুসন্ধানে বেরোই। চমৎকাব সিদ্ধান্ত ' মনেব কথা শুনতে হয় ' মনই তো ঈশ্বব ' তা 'হলে বাঁদিকেই ঘুবি।